রবীন্দ্র-রচনাবলী

রবীন্দ্র-রচনাবলী

সপ্তম খণ্ড

বিশ্বভারতী
৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা ১৭

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

কবিতা ও গান

পলাতকা

জাতীয় মহাসমিতির উদ্‌বোধনে রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, ১৯১৭

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত চিত্র

পলাতকা

পলাতকা

ওই যেখানে শিরীষ গাছে
ঝুরু-ঝুরু কচি পাতার নাচে
ঘাসের 'পরে ছায়াখানি কাঁপায় থরথর
ঝরা ফুলের গন্ধে ভরভর—
ওইখানে মোর পোষা হরিণ চরত আপন মনে
হেনা-বেড়ার কোণে
শীতের রোদে সারা সকাল বেলা।
তারই সঙ্গে করত খেলা
পাহাড়-থেকে-আনা
ঘন রাঙা রোঁয়ায় ঢাকা একটি কুকুর-ছানা।
যেন তারা দুই বিদেশের দুটি ছেলে
মিলেছে এক পাঠশালাতে, একসাথে তাই বেড়ায় হেসে খেলে।
হাটের দিনে পথের কত লোকে
বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে যেত, দেখত অবাক-চোখে।

ফাগুন মাসে জাগল পাগল দখিন হাওয়া,
শিউরে ওঠে আকাশ যেন কোন্ প্রেমিকের রঙিন-চিঠি-পাওয়া।
শালের বনে ফুলের মাতন হল শুরু,
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে লাগল কাঁপন দুরুদুরু।
হরিণ যে কার উদাস-করা বাণী
হঠাৎ কখন শুনতে পেলে আমরা তা কি জানি।
তাই যে কালো চোখের কোণে
চাউনি তাহার উতল হল অকারণে;
তাই সে থেকে থেকে
হঠাৎ আপন ছায়া দেখে
চমকে দাঁড়ায় বেঁকে।

একদা এক বিকাল বেলায়
আমলকীবন অধীর যখন ঝিকিমিকি আলোর খেলায়,
তপ্ত হাওয়া ব্যথিয়ে ওঠে আমের বোলের বাসে,
মাঠের পরে মাঠ হয়ে পার ছুটল হরিণ নিরুদ্দেশের আশে।
সম্মুখে তার জীবনমরণ সকল একাকার,
অজানিতের ভয় কিছু নেই আর।

ভেবেছিলেম, আঁধার হলে পরে
ফিরবে ঘরে
চেনা হাতের আদর পাবার তরে।
কুকুর-ছানা বারে বারে এসে
কাছে ঘেঁষে ঘেঁষে
কেঁদে-কেঁদে চোখের চাওয়ায় শুধায় জনে জনে,
'কোথায় গেল, কোথায় গেল, কেন তারে না দেখি অঙ্গনে।'
আহার ত্যেজে বেড়ায় সে যে, এল না তার সাথি।
আঁধার হল, জ্বলল ঘরে বাতি ;
উঠল তারা ; মাঠে-মাঠে নামল নীরব রাতি।
আতুর চোখের প্রশ্ন নিয়ে ফেরে কুকুর বাইরে ঘরে,
'নাই সে কেন, যায় কেন সে, কাহার তরে।'

কেন যে তা সে-ই কি জানে। গেছে সে যার ডাকে
কোনো কালে দেখে নাই যে তাকে।
আকাশ হতে, আলোক হতে, নতুন পাতার কাঁচা সবুজ হতে
দিশাহারা দখিন হাওয়ার স্রোতে
রক্তে তাহার কেমন এলোমেলো
কিসের খবর এল।
বুকে যে তার বাজল বাঁশি বহুযুগের ফাগুন-দিনের সুরে—
কোথায় অনেক দূরে
রয়েছে তার আপন চেয়ে আরো আপন জন।
তারেই অন্বেষণ
জন্ম হতে আছে যেন মর্মে তারি লেগে,
আছে যেন ছুটে চলার বেগে,
আছে যেন চল-চপল চোখের কোণে জেগে।
কোনো কালে চেনে নাই সে যারে
সেই তো তাহার চেনাশোনার খেলাধুলা ঘোচায় একেবারে।
আঁধার তারে ডাক দিয়েছে কেঁদে,
আলোক তারে রাখল না আর বেঁধে।

চিরদিনের দাগা

ওপার হতে এপার পানে খেয়া-নৌকো বেয়ে
ভাগ্য নেয়ে
দলে দলে আনছে ছেলে মেয়ে।
সবাই সমান তারা
এক সাজিতে ভরে-আনা চাঁপা ফুলের পারা।
তাহার পরে অন্ধকারে
কোন্ ঘরে সে পৌঁছিয়ে দেয় কারে!

তখন তাদের আরম্ভ হয় নব নব কাহিনী-জাল বোনা—
দুঃখে সুখে দিন মুহূর্ত গোনা।
একে একে তিনটি মেয়ের পরে
শৈল যখন জন্মাল তার বাপের ঘরে,
জননী তার লজ্জা পেল ; ভাবল কোথা থেকে
অবাঞ্ছিত কাঙালটারে আনল ঘরে ডেকে।
বৃষ্টিধারা চাইছে যখন চাষি
নামল যেন শিলাবৃষ্টিরাশি।

বিনা-দোষের অপরাধে শৈলবালার জীবন হল শুরু,
পদে পদে অপরাধের বোঝা হল গুরু।
কারণ বিনা যে-অনাদর আপনি ওঠে জেগে
বেড়েই চলে সে যে আপন বেগে।
মা তারে কয় 'পোড়ারমুখী', শাসন করে বাপ—
এ কোন্ অভিশাপ
হতভাগী আনলি বয়ে— শুধু কেবল বেঁচে-থাকার পাপ।
যতই তারা দিত ওরে গালি
নির্মলারে দেখত মলিন মাখিয়ে তারে আপন কথার কালি।
নিজের মনের বিকারটিরেই শৈল ওরা কয়,
ওদের শৈল বিধির শৈল নয়।

আমি বৃদ্ধ ছিনু ওদের প্রতিবেশী।
পাড়ায় কেবল আমার সঙ্গে দুষ্টু মেয়ের ছিল মেশামেশি।
'দাদা' বলে
গলা আমার জড়িয়ে ধরে বসত আমার কোলে।
নাম শুধালে শৈল আমায় বলত হাসি হাসি—
'আমার নাম যে দুষ্টু, সর্বনাশী!'
যখন তারে শুধাতেম তার মুখটি তুলে ধরে
'আমি কে তোর বল দেখি ভাই মোরে ?'
বলত 'দাদা, তুই যে আমার বর!'—
এমনি করে হাসাহাসি হত পরস্পর।
বিয়ের বয়স হল তবু কোনোমতে হয় না বিয়ে তার—
তাহে বাড়ায় অপরাধের ভার।
অবশেষে বর্মা থেকে পাত্র গেল জুটি।
অল্পদিনের ছুটি ;
শুভকর্ম সেরে তাড়াতাড়ি
মেয়েটিরে সঙ্গে নিয়ে রেঙ্গুনে তার দিতে হবে পাড়ি।
শৈলকে যেই বলতে গেলেম হেসে—
'বুড়ো বরকে হেলা করে নবীনকে, ভাই, বরণ করলি শেষে ?'
অমনি যে তার দু-চোখ গেল ভেসে

মানা করে দিলেম তারে
তোমার বাড়ি যাওয়া একেবারে ।
সবার চেয়ে কঠিন দণ্ড ! চুপ করে সে রইল বাক্যহীন
বিদ্রোহিণী বিষম ক্রোধে । অবশেষে বারো দিনের দিন
গরবিনী গর্ব ভেঙে বললে এসে, 'আমি
আর কখনো করব না দুষ্টামি ।'
আঁচড়-কাটা সেই হিসাবের খাতা,
সেই কখানা পাতা,
আজকে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে তারি চোখের মতো ।
হিসাবের সেই অঙ্কগুলার সময় হল গত
সে শাস্তি নেই, সে দুষ্টু নেই ;
রইল শুধু এই
চিরদিনের দাগা
শিশু-হাতের আঁচড় কটি আমার বুকে লাগা ।"

মুক্তি

ডাক্তারে যা বলে বলুক নাকো,
রাখো রাখো খুলে রাখো,
শিয়রের ওই জানলা দুটো— গায়ে লাগুক হাওয়া ।
ওষুধ ? আমার ফুরিয়ে গেছে ওষুধ খাওয়া ।
তিতো কড়া কত ওষুধ খেলেম এ জীবনে,
দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে ।
বেঁচে থাকা, সেই যেন এক রোগ ;
কত রকম কবিরাজি, কতই মুষ্টিযোগ,
একটুমাত্র অসাবধানেই, বিষম কর্মভোগ ।
এইটে ভালো, ওইটে মন্দ, যে যা বলে সবার কথা মেনে,
নামিয়ে চক্ষু, মাথায় ঘোমটা টেনে,
বাইশ বছর কাটিয়ে দিলেম এই তোমাদের ঘরে ।
তাই তো ঘরে পরে,
সবাই আমায় বললে, লক্ষ্মী সতী,
ভালোমানুষ অতি !

এ সংসারে এসেছিলেম ন-বছরের মেয়ে,
তার পরে এই পরিবারের দীর্ঘ গলি বেয়ে
দশের ইচ্ছা বোঝাই-করা এই জীবনটা টেনে টেনে শেষে
পৌঁছিনু আজ পথের প্রান্তে এসে ।
সুখের দুখের কথা
একটুখানি ভাবব এমন সময় ছিল কোথা ।
এই জীবনটা ভালো, কিংবা মন্দ, কিংবা যা-হোক একটা-কিছু
সে-কথাটা বুঝব কখন, দেখব কখন ভেবে আগুপিছু ।

যেথায় যত জ্ঞাতি
লক্ষ্মী ব'লে করে আমার খ্যাতি ;
এই জীবনে সেই যেন মোর পরম সার্থকতা—
ঘরের কোণে পাঁচের মুখের কথা !
আজকে কখন মোর
কাটল বাঁধন-ডোর ।
জনম মরণ এক হয়েছে ওই যে অকূল বিরাট মোহানায়,
ওই অতলে কোথায় মিলে যায়
ভাঁড়ার-ঘরের দেয়াল যত
একটু ফেনার মতো ।

এতদিনে প্রথম যেন বাজে
বিয়ের বাঁশি বিশ্ব-আকাশ-মাঝে ।
তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণের ধুলায় পড়ে থাক্ ।
মরণ-বাসর ঘরে আমায় যে দিয়েছে ডাক
দ্বারে আমার প্রার্থী সে যে, নয় সে কেবল প্রভু,
হেলা আমায় করবে না সে কভু ।
চায় সে আমার কাছে
আমার মাঝে গভীর গোপন যে সুধারস আছে
গ্রহতারার সভার মাঝখানে সে
ওই যে আমার মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে হোথায় রইল নির্নিমেষে ।
মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী,
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারি ।
দাও, খুলে দাও দ্বার,
ব্যর্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও কালের পারাবার ।

ফাঁকি

বিনুর বয়স তেইশ তখন, রোগে ধরল তারে ।
ওষুধে ডাক্তারে
ব্যাধির চেয়ে আধি হল বড়ো ;
নানা ছাপের জমল শিশি, নানা মাপের কৌটো হল জড়ো ।
বছর দেড়েক চিকিৎসাতে করলে যখন অস্থি জরজর
তখন বললে, "হাওয়া বদল করো ।"
এই সুযোগে বিনু এবার চাপল প্রথম রেলের গাড়ি,
বিয়ের পরে ছাড়ল প্রথম শ্বশুরবাড়ি ।

নিবিড় ঘন পরিবারের আড়ালে আবডালে ।
মোদের হত দেখাশুনো ভাঙা লয়ের তালে ;
মিলন ছিল ছাড়া-ছাড়া,
চাপা হাসি টুকরো কথার নানান জোড়াতাড়া ।

আজকে হঠাৎ ধরিত্রী তার আকাশভরা সকল আলো ধরে
বর-বধূরে নিলে বরণ করে।
রোগা মুখের মস্ত বড়ো দুটি চোখে
বিনুর যেন নতুন করে শুভদৃষ্টি হল নতুন লোকে।
রেল-লাইনের ওপার থেকে
কাঙাল যখন ফেরে ভিক্ষা হেঁকে,
বিনু আপন বাক্স খুলে
টাকা সিকে যা হাতে পায় তুলে
কাগজ দিয়ে মুড়ে
দেয় সে ছুঁড়ে ছুঁড়ে।
সবার দুঃখ দূর না হলে পরে
আনন্দ তার আপনারই ভার বইবে কেমন করে।
সংসারের ওই ভাঙা ঘাটের কিনার হতে
আজ আমাদের ভাসান যেন চিরপ্রেমের স্রোতে—
তাই যেন আজ দানে ধ্যানে
ভরতে হবে সে-যাত্রাটি বিশ্বের কল্যাণে।
বিনুর মনে জাগছে বারেবার
নিখিলে আজ একলা শুধু আমিই কেবল তার;
কেউ কোথা নেই আর
শ্বশুর ভাশুর সামনে পিছে ডাইনে বাঁয়ে;
সেই কথাটা মনে ক'রে পুলক দিল গায়ে।

বিলাসপুরের ইস্টেশনে বদল হবে গাড়ি;
তাড়াতাড়ি
নামতে হল। ছ-ঘণ্টা কাল থামতে হবে যাত্রীশালায়,
মনে হল এ এক বিষম বালাই!
বিনু বললে, "কেন, এ তো বেশ।"
তার মনে আজ নেই যে খুশির শেষ।
পথের বাঁশি পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চঞ্চলা—
আনন্দে তাই এক হল তার পৌঁছনো আর চলা।
যাত্রীশালার দুয়ার খুলে আমায় বলে—
"দেখো, দেখো, এক্কাগাড়ি কেমন চলে।
আর দেখেছ বাছুরটি ওই, আ মরে যাই, চিকন নধর দেহ,
মায়ের চোখে কী সুগভীর স্নেহ।
ওই যেখানে দিঘির উঁচু পাড়ি—
সিসুগাছের তলাটিতে পাঁচিলঘেরা ছোট্ট বাড়ি
ওই যে রেলের কাছে—
ইস্টেশনের বাবু থাকে?— আহা ওরা কেমন সুখে আছে।"

যাত্রীঘরে বিছানাটা দিলেম পেতে,
বলে দিলেম, "বিনু, এবার চুপটি করে ঘুমোও আরামেতে।"

প্ল্যাটফরমে চেয়ার টেনে
পড়তে শুরু করে দিলেম ইংরেজি এক নভেল কিনে এনে।
গেল কত মালের গাড়ি, গেল প্যাসেঞ্জার,
ঘণ্টা তিনেক হয়ে গেল পার।
এমন সময় যাত্রীঘরের দ্বারের কাছে
বাহির হয়ে বললে বিনু, "কথা একটা আছে।"
ঘরে ঢুকে দেখি কে-এক হিন্দুস্থানি মেয়ে
আমার মুখে চেয়ে
সেলাম করে বাহির হয়ে রইল ধরে বারান্দাটার থাম।
বিনু বললে, "রুক্মিণী ওর নাম।
ওই যে হোথায় কুয়োর ধারে সার-বাঁধা ঘরগুলি
ওইখানে ওর বাসা আছে, স্বামী রেলের কুলি;
তেরোশো কোন্ সনে
দেশে ওদের আকাল হল— স্বামী-স্ত্রী দুইজনে
পালিয়ে এল জমিদারের অত্যাচারে।
সাত বিঘে ওর জমি ছিল কোন্-এক গাঁয়ে কী-এক নদীর ধারে—"
বাধা দিয়ে আমি বললেম হেসে,
"রুক্মিণীর এই জীবনচরিত শেষ না হতেই গাড়ি পড়বে এসে।
আমার মতে, একটু যদি সংক্ষেপেতে সারো
অধিক ক্ষতি হবে না তায় কারো।"
বাঁকিয়ে ভুরু, পাকিয়ে চক্ষু, বিনু বললে খেপে—
"কখ্খনো না, বলব না সংক্ষেপে।
আপিস যাবার তাড়া তো নেই, ভাবনা কিসের তবে।
আগাগোড়া সব শুনতেই হবে।"
নভেল-পড়া নেশাটুকু কোথায় গেল মিশে।
রেলের কুলির লম্বা কাহিনী সে
বিস্তারিত শুনে গেলেম আমি।
আসল কথা শেষে ছিল, সেইটে কিছু দামি।
কুলির মেয়ের বিয়ে হবে, তাই
পৈঁচে তাবিজ বাজুবন্ধ গড়িয়ে দেওয়া চাই;
অনেক টেনেটুনে তবু পঁচিশ টাকা খরচ হবে তারি;
সে ভাবনাটা ভারি
রুক্মিণীরে করেছে বিব্রত।
তাই এবারের মতো
আমার 'পরে ভার
কুলি নারীর ভাবনা ঘোচাবার।
আজকে গাড়ি চড়ার আগে একেবারে থোকে
পঁচিশ টাকা দিতেই হবে ওকে।

অবাক কাণ্ড এ কী।
এমন কথা মানুষ শুনেছে কি।

জাতে হয়তো মেথর হবে, কিংবা নেহাত ওঁচা,
যাত্রীঘরের করে ঝাড়ামোছা,
পঁচিশ টাকা দিতেই হবে তাকে !
এমন হলে দেউলে হতে কদিন বাকি থাকে।
"আচ্ছা, আচ্ছা, হবে, হবে। আমি দেখছি মোট
একশো টাকার আছে একটা নোট,
সেটা আবার ভাঙানো নেই !"
বিনু বললে, "এই
ইস্টিশনেই ভাঙিয়ে নিলেই হবে।"
"আচ্ছা, দেব তবে"
এই বলে সেই মেয়েটাকে আড়ালেতে নিয়ে গেলেম ডেকে,
আচ্ছা করেই দিলেম তারে হেঁকে—
"কেমন তোমার নোকরি থাকে দেখব আমি !
প্যাসেঞ্জারকে ঠকিয়ে বেড়াও ! ঘোচাব নষ্টামি !"
কেঁদে যখন পড়ল পায়ে ধরে
দু টাকা তার হাতে দিয়ে দিলেম বিদায় করে।

জীবন-দেউল আঁধার করে নিবল হঠাৎ আলো।
ফিরে এলেম দু-মাস যেই ফুরাল।
বিলাসপুরে এবার যখন এলেম নামি,
একলা আমি।
শেষ নিমেষে নিয়ে আমার পায়ের ধূলি
বিনু আমায় বলেছিল, "এ জীবনের যা-কিছু আর ভুলি
শেষ দুটি মাস অনন্তকাল মাথায় রবে মম
বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণীর সিঁথের 'পরে নিত্যসিঁদুর-সম।
এই দুটি মাস সুধায় দিলে ভরে
বিদায় নিলেম সেই কথাটি স্মরণ করে।"

ওগো অন্তর্যামী,
বিনুরে আজ জানাতে চাই আমি
সেই দু-মাসের অর্ঘ্যে আমার বিষম বাকি,
পঁচিশ টাকার ফাঁকি।
দিই যদি আজ রুক্‌মিণীরে লক্ষ টাকা
তবুও তো ভরবে না সেই ফাঁকা।
বিনু যে সেই দু-মাসটিরে নিয়ে গেছে আপন সাথে,
জানল না তো ফাঁকিসুদ্ধ দিলেম তারি হাতে।

বিলাসপুরে নেমে আমি শুধাই সবার কাছে,
"রুক্‌মিণী সে কোথায় আছে ?"
প্রশ্ন শুনে অবাক মানে—
রুক্‌মিণী কে তাই বা ক-জন জানে।

অনেক ভেবে "ঝামরু কুলির বউ" বললেম যেই,
বললে সবে, "এখন তারা এখানে কেউ নেই।"
শুধাই আমি, "কোথায় পাব তাকে।"
ইস্টেশনের বড়োবাবু রেগে বলেন, "সে খবর কে রাখে।"
টিকিটবাবু বললে হেসে, "তারা মাসেক আগে
গেছে চলে দার্জিলিঙে কিংবা খসরুবাগে,
কিংবা আরাকানে।"
শুধাই যত, "ঠিকানা তার কেউ কি জানে।"—
তারা কেবল বিরক্ত হয়, তার ঠিকানায় কার আছে কোন্ কাজ।
কেমন করে বোঝাই আমি— ওগো আমার আজ
সবার চেয়ে তুচ্ছ তারে সবার চেয়ে পরম প্রয়োজন ;
ফাঁকির বোঝা নামাতে মোর আছে সেই একজন।
"এই দুটি মাস সুধায় দিলে ভরে"
বিনুর মুখের শেষ কথা সেই বইব কেমন করে।
রয়ে গেলেম দায়ী
মিথ্যা আমার হল চিরস্থায়ী।

মায়ের সম্মান

অপূর্বদের বাড়ি
অনেক ছিল চৌকি টেবিল, পাঁচটা-সাতটা গাড়ি ;
ছিল কুকুর ; ছিল বেড়াল ; নানান রঙের ঘোড়া
কিছু না হয় ছিল ছ-সাত জোড়া ;
দেউড়ি-ভরা দোবে-চোবে, ছিল চাকর দাসী,
ছিল সহিস বেহারা চাপরাসি।
—আর ছিল এক মাসি।

স্বামিটি তার সংসারে বৈরাগী,
কেউ জানে না গেছেন কোথায় মোক্ষ পাবার লাগি
স্ত্রীর হাতে তার ফেলে
বালক দুটি ছেলে।
অনাত্মীয়ের ঘরে গেলে স্বামীর বংশে নিন্দা লাগে পাছে
তাই সে হেথায় আছে
ধনী বোনের দ্বারে।
একটিমাত্র চেষ্টা যে তার কী করে আপনারে
মুছবে একেবারে।
পাছে কারো চক্ষে পড়ে, পাছে তারে দেখে
কেউ বা বলে ওঠে, "আপদ জুটল কোথা থেকে"—
আস্তে চলে, আস্তে বলে, সবার চেয়ে জায়গা জোড়ে কম,
সবার চেয়ে বেশি পরিশ্রম।

কিন্তু যে তার কানাই বলাই নেহাত ছোট্ট ছেলে,
তাদের তরে রেখেছিলেন মেলে
বিধাতা যে প্রকাণ্ড এই ধরা ;
অঙ্গে তাদের দুরন্ত প্রাণ, কণ্ঠ তাদের কলরবে ভরা ।
শিশুচিত্ত-উৎসধারা বন্ধ করে দিতে
বিষম ব্যথা বাজে মায়ের চিতে ।
কাতর চোখে করুণ সুরে মা বলে, "চুপ চুপ—"
একটু যদি চঞ্চলতা দেখায় কোনোরূপ ।
ক্ষুধা পেলে কান্না তাদের অসভ্যতা,
তাদের মুখে মানায় নাকো চেঁচিয়ে কথা ;
খুশি হলে রাখবে চাপি
কোনোমতেই করবে নাকো লাফালাফি ।
অপূর্ব আর পূর্ণ ছিল এদের একবয়সী ;
তাদের সঙ্গে খেলতে গেলে এরা হত পদে পদেই দোষী ।
তারা এদের মারত ধড়াধ্বড় ;
এরা যদি উলটে দিত চড়,
থাকত নাকো গণ্ডগোলের সীমা—
উভয় পক্ষেরই মা
কানাই বলাই দোঁহার 'পরে পড়ত ঝড়ের মতো,
বিষম কাণ্ড হত
ডাইনে বাঁয়ে দু-ধার থেকে মারের 'পরে মেরে ।
বিনা দোষে শাস্তি দিয়ে কোলের বাছাদেরে
ঘরের দুয়ার বন্ধ করে মাসি
থাকত উপবাসী—
চোখের জলে বক্ষ যেত ভাসি ।

অবশেষে দুটি ছেলে মেনে নিল নিজেদের এই দশা ।
তখন তাদের চলাফেরা ওঠাবসা
স্তব্ধ হল, শান্ত হল, হায়
পাখিহারা পক্ষিনীড়ের প্রায় ।
এ সংসারে বেঁচে থাকার দাবি
ভাঁটায় ভাঁটায় নেবে নেবে একেবারে তলায় গেল নাবি ;
ঘুচে গেল ন্যায়-বিচারের আশা,
রুদ্ধ হল নালিশ করার ভাষা ।
সকল দুঃখ দুটি ভায়ে করল পরিপাক
নিঃশব্দ নির্বাক ।
চক্ষে আঁধার দেখত ক্ষুধার ঝোঁকে—
পাছে খাবার না থাকে, আর পাছে মায়ের চোখে
জল দেখা দেয়, তাই
বাইরে কোথাও লুকিয়ে থাকত, বলত, "ক্ষুধা নাই ।"

অসুখ করলে দিত চাপা ; দেবতা মানুষ কারে
একটুমাত্র জবাব করা ছাড়ল একেবারে ।
প্রথম যখন ইস্কুলেতে প্রাইজ পেল এরা
ক্লাসে সবার সেরা,
অপূর্ব আর পূর্ণ এল শূন্য হাতে বাড়ি ।
প্রমাদ গনি, দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি
মা ডেকে কয় কানাই বলাইয়েরে—
"ওরে বাছা, ওদের হাতেই দে রে
তোদের প্রাইজ দুটি ।
তার পরে যা ছুটি
খেলা করতে চৌধুরীদের ঘরে ।
সন্ধ্যা হলে পরে
আসিস ফিরে, প্রাইজ পেলি কেউ যেন না শোনে ।"
এই বলে মা নিয়ে ঘরের কোণে
দুটি আসন পেতে
আপন হাতের খইয়ের মোওয়া দিল তাদের খেতে ।

এমনি করে অপমানের তলে
দুঃখদহন বহন করে দুটি ভাইয়ে মানুষ হয়ে চলে ।
এই জীবনের ভার
যত হালকা হতে পারে করলে এরা চূড়ান্ত তাহার ।
সবার চেয়ে ব্যথা এদের মায়ের অসম্মান—
আগুন তারি শিখার সমান
জ্বলছে এদের প্রাণ-প্রদীপের মুখে ।
সেই আলোটি দোঁহায় দুঃখে সুখে
যাচ্ছে নিয়ে একটি লক্ষ্যপানে—
জননীরে করবে জয়ী সকল মনে প্রাণে ।

কানাই বলাই
কালেজেতে পড়ছে দুটি ভাই ।
এমন সময় গোপনে এক রাতে
অপূর্ব তার মায়ের বাক্স ভাঙল আপন হাতে,
করল চুরি পান্নামোতির হার ;
থিয়েটারের শখ চেপেছে তার ।
পুলিস-ডাকাডাকি নিয়ে পাড়া যেন ভূমিকম্পে নড়ে ;
যখন ধরা পড়ে-পড়ে
অপূর্ব সেই মোতির মালাটিরে
ধীরে ধীরে
কানাইদাদার শোবার ঘরে বালিশ দিয়ে ঢেকে
লুকিয়ে দিল রেখে ।

যখন বাহির হল শেষে
সবাই বললে এসে—
"তাই না শাস্ত্রে করে মানা
দুধে কলায় পুষতে সাপের ছানা।
ছেলেমানুষ, দোষ কী ওদের, মা আছে এর তলে।
ভালো করলে মন্দ ঘটে কলিকালের ফলে।"

কানাই বলাই জ্বলে ওঠে প্রলয়বহ্নিপ্রায়,
খুনোখুনি করতে ছুটে যায়।
মা বললেন, "আছেন ভগবান,
নির্দোষীদের অপমানে তাঁরি অপমান।"
দুই ছেলেরে সঙ্গে নিয়ে বাহির হলেন মাসি ;
রইল চেয়ে দোবে চোবে, রইল চেয়ে সকল চাকর দাসী,
ঘোড়ার সহিস বেহারা চাপরাসি।

অপমানের তীব্র আলোক জ্বেলে
মাকে নিয়ে দুটি ছেলে
পার হল ঘোর দুঃখদশা চলে চলে কঠিন কাঁটার পথে।
কানাই বলাই মস্ত উকিল বড়ো আদালতে।
মনের মতো বউ এসেছে, একটি-দুটি আসছে নাতনী নাতি—
জুটল মেলা সুখের দিনের সাথি।
মা বললেন, "মিটবে এবার চিরদিনের আশ—
মরার আগে করব কাশীবাস।"
অবশেষে একদা আশ্বিনে
পুজোর ছুটির দিনে
মনের মতো বাড়ি দেখে
দুই ভাইয়েতে মাকে নিয়ে তীর্থে এল রেখে।

বছরখানেক না পেরোতেই শ্রাবণ মাসের শেষে
হঠাৎ কখন মা ফিরলেন দেশে।
বাড়িসুদ্ধ অবাক সবাই— মা বললেন, "তোরা আমার ছেলে
তোদের এমন বুদ্ধি হল, অপূর্বকে পুরতে দিবি জেলে ?"
কানাই বললে, "তোমার ছেলে বলেই
তোমার অপমানের জ্বালা মনের মধ্যে নিত্য আছে জ্বলেই।
মিথ্যে চুরির দাগা দিয়ে সবার চোখের 'পরে
আমার মাকে ঘরের বাহির করে
সেই কথাটা এ জীবনে ভুলি যদি তবে
মহাপাতক হবে।"
মা বললেন, "ভুলবি কেন। মনে যদি থাকে তাহার তাপ
তা হলে কি তেমন ভীষণ অপমানের চাপ
চাপানো যায় আর কাহারো 'পরে
বাইরে কিংবা ঘরে।

মনে কি নেই সেদিন যখন দেউড়ি দিয়ে
বেরিয়ে এলেম তোদের দুটি সঙ্গে নিয়ে
তখন আমার মনে হল যদি আমি স্বপ্নমাত্র হই,
জেগে দেখি আমি যদি কোথাও কিছু নই—
তা হলে হয় ভালো।
মনে হল শত্রু আমার আকাশভরা আলো,
দেবতা আমার শত্রু, আমার শত্রু বসুন্ধরা—
মাটির ডালি আমার অসীম লজ্জা দিয়ে ভরা।
তাই তো বলি বিশ্বজোড়া সে লাঞ্ছনা
তেমন করে পায় না যেন কোনো জনা,
বিধির কাছে এই করি প্রার্থনা।"

ব্যাপারটা কী ঘটেছিল অল্প লোকেই জানে,
বলে রাখি সে কথা এইখানে।

বারো বছর পরে
অপূর্ব রায় দেখা দিল কানাইদাদার ঘরে।
একে একে তিনটে থিয়েটার
ভাঙাগড়া শেষ করে সে হল ক্যাশিয়ার
সদাগরের আপিসেতে। সেখানে আজ শেষে
তবিল-ভাঙার জাল হিসাবের দায়ে ঠেকেছে সে।
হাতে বেড়ি পড়ল বুঝি ; তাই সে এল ছুটে
উকিল দাদার ঘরে, সেথায় পড়ল মাথা কুটে।
কানাই বললে, "মনে কি নেই ?" অপূর্ব কয় নতমুখে—
"অনেকদিন সে গেছে চুকেবুকে।"
"চুকে গেছে ?" কানাই উঠল বিষম রাগে জ্বলে,
"এতদিনের পরে যেন আশা হচ্ছে চুকে যাবে বলে।"
নীচের তলায় বলাই আপিস করে—
অপূর্ব রায় ভয়ে ভয়ে ঢুকল তারি ঘরে
বললে, "আমায় রক্ষা করো।"
বলাই কেঁপে উঠল থরোথরো।
অধিক কথা কয় না সে যে ; ঘণ্টা নেড়ে ডাকল দরোয়ানে।
অপূর্ব তার মেজাজ দেখে বেরিয়ে এল মানে মানে।

অপূর্বদের মা তিনি হন মস্ত ঘরের গৃহিণী যে ;
এদের ঘরে নিজে
আসতে গেলে হয় যে তাঁদের মাথা নত।
অনেক রকম করে ইতস্তত
পত্র দিয়ে পূর্ণকে তাই পাঠিয়ে দিলেন কাশী।
পূর্ণ বললে, "রক্ষা করো মাসি।"

এরই পরে কাশী থেকে মা আসলেন ফিরে।
কানাই তাঁরে বললে ধীরে ধীরে—
"জান তো মা, তোমার বাক্য মোদের শিরোধার্য,
এটা কিন্তু নিতান্ত অকার্য।
বিধি তাদের দেবেন শাস্তি, আমরা করব রক্ষে,
উচিত নয় মা সেটা কারো পক্ষে।"
কানাই যদি নরম হয় বা, বলাই রইল রুখে
অপ্রসন্ন মুখে।
বললে, "হেথায় নিজে এসে মাসি তোমার পড়ুন পায়ে ধরে
দেখব তখন বিবেচনা করে।"

মা বললেন, "তোরা বলিস কী এ।
একটা দুঃখ দূর করতে গিয়ে
আরেক দুঃখে বিদ্ধ করবি মর্ম!
এই কি তোদের ধর্ম!"
এত বলি বাহির হয়ে চলেন তাড়াতাড়ি;
তারা বলে, "যাচ্ছ কোথায়।" মা বললেন, "অপূর্বদের বাড়ি।
দুঃখে তাদের বক্ষ আমার ফাটে;
রইব আমি তাদের ঘরে যতদিন না বিপদ তাদের কাটে।"
"রোসো, রোসো, থামো, থামো, করছ এ কী।
আচ্ছা, ভেবে দেখি।
তোমার ইচ্ছা যবে
আচ্ছা নাহয় যা বলছ তাই হবে।"

আর কি থামেন তিনি?
গেলেন একাকিনী
অপূর্বদের ঘরে তাদের মাসি।
ছিল না আর দোবে চোবে, ছিল না চাপরাসি।
প্রণাম করল লুটিয়ে পায়ে বিপিনের মা, পুরোনো সেই দাসী।

নিষ্কৃতি

মা কেঁদে কয়, "মঞ্জুলী মোর ওই তো কচি মেয়ে,
ওরই সঙ্গে বিয়ে দেবে?— বয়সে ওর চেয়ে
পাঁচগুনো সে বড়ো;
তাকে দেখে বাছা আমার ভয়েই জড়সড়।
এমন বিয়ে ঘটতে দেব নাকো।"

বাপ বললে, "কান্না তোমার রাখো!
পঞ্চাননকে পাওয়া গেছে অনেক দিনের খোঁজে,
জান না কি মস্ত কুলীন ও যে।

সমাজে তো উঠতে হবে সেটা কি কেউ ভাব।
ওকে ছাড়লে পাত্র কোথায় পাব।"
মা বললে, "কেন, ওই যে চাটুজ্যেদের পুলিন,
নাই বা হল কুলীন—
দেখতে যেমন, তেমনি স্বভাবখানি,
পাস করে ফের পেয়েছে জলপানি,
সোনার টুকরো ছেলে।
এক-পাড়াতে থাকে ওরা— ওরই সঙ্গে হেসে খেলে
মেয়ে আমার মানুষ হল ; ওকে যদি বলি আমি আজই
এখ্‌খনি হয় রাজি।"

বাপ বললে, "থামো,
আরে আরে রামোঃ।
ওরা আছে সমাজের সব তলায়।
বামুন কি হয় পইতে দিলেই গলায় ?
দেখতে শুনতে ভালো হলেই পাত্র হল ! রাধে !
স্ত্রীবুদ্ধি কি শাস্ত্রে বলে সাধে।"

যেদিন ওরা গিনি দিয়ে দেখলে কনের মুখ
সেদিন থেকে মঞ্জুলিকার বুক
প্রতি পলের গোপন কাঁটায় হল রক্তে মাখা।
মায়ের স্নেহ অন্তর্যামী, তার কাছে তো রয় না কিছুই ঢাকা ;
মায়ের ব্যথা মেয়ের ব্যথা চলতে খেতে শুতে
ঘরের আকাশ প্রতিক্ষণে হানছে যেন বেদনা-বিদ্যুতে।

অটলতার গভীর গর্ব বাপের মনে জাগে—
সুখে দুঃখে দ্বেষে রাগে
ধর্ম থেকে নড়েন তিনি নাই হেন দৌর্বল্য !
তাঁর জীবনের রথের চাকা চলল
লোহার বাঁধা রাস্তা দিয়ে প্রতিক্ষণেই,
কোনোমতেই ইঞ্চি-খানেক এদিক-ওদিক একটু হবার জো নেই।
তিনি বলেন, তাঁর সাধনা বড়োই সুকঠোর ;
আর কিছু নয়, শুধুই মনের জোর ;
অষ্টাবক্র জমদগ্নি প্রভৃতি সব ঋষির সঙ্গে তুল্য,
মেয়েমানুষ বুঝবে না তার মূল্য।

অন্তঃশীলা অশ্রুনদীর নীরব নীরে
দুটি নারীর দিন বয়ে যায় ধীরে।
অবশেষে বৈশাখে এক রাতে
মঞ্জুলিকার বিয়ে হল পঞ্চাননের সাথে।
বিদায়বেলায় মেয়েকে বাপ বলে দিলেন মাথায় হস্ত ধরি,
"হও তুমি সাবিত্রীর মতো এই কামনা করি।"

কিমাশ্চর্যমতঃপরং, বাপের সাধন-জোরে
আশীর্বাদের প্রথম অংশ দু-মাস যেতেই ফলল কেমন করে—
পঞ্চাননকে ধরল এসে যমে ;
কিন্তু মেয়ের কপালক্রমে
ফলল না তার শেষের দিকটা, দিলে না যম ফিরে ;
মঞ্জুলিকা বাপের ঘরে ফিরে এল সিঁদুর মুছে শিরে ।

দুঃখে সুখে দিন হয়ে যায় গত
স্রোতের জলে ঝরে-পড়া ভেসে-যাওয়া ফুলের মতো,
অবশেষে হল
মঞ্জুলিকার বয়স ভরা ষোলো ।
কখন শিশুকালে
হৃদয়-লতার পাতার অন্তরালে
বেরিয়েছিল একটি কুঁড়ি
প্রাণের গোপন রহস্যতল ফুঁড়ি ;
জানত না তো আপনাকে সে,
শুধায় নি তার নাম কোনোদিন বাহির হতে খেপা বাতাস এসে,
সেই কুঁড়ি আজ অন্তরে তার উঠছে ফুটে
মধুর রসে ভরে উঠে ।
সে যে প্রেমের ফুল
আপন রাঙা পাপড়ি-ভারে আপনি সমাকুল ।
আপনাকে তার চিনতে যে আর নাইকো বাকি,
তাই তো থাকি থাকি
চমকে ওঠে নিজের পানে চেয়ে ।
আকাশপারের বাণী তারে ডাক দিয়ে যায় আলোর ঝরনা বেয়ে ;
রাতের অন্ধকারে
কোন্ অসীমের রোদন ভরা বেদন লাগে তারে ।
বাহির হতে তার
ঘুচে গেছে সকল অলংকার ;
অন্তর তার রাঙিয়ে ওঠে স্তরে স্তরে,
তাই দেখে সে আপনি ভেবে মরে ।
কখন কাজের ফাঁকে
জানলা ধরে চুপ করে সে বাইরে চেয়ে থাকে—
যেখানে ওই শজনে গাছের ফুলের ঝুরি বেড়ার গায়ে
রাশি রাশি হাসির ঘায়ে
আকাশটারে পাগল করে দিবস-রাতি ।
যে ছিল তার ছেলেবেলার খেলাঘরের সাথি
আজ সে কেমন করে
জলস্থলের হৃদয়খানি দিল ভরে ।
অরূপ হয়ে সে যেন আজ সকল রূপে রূপে
মিশিয়ে গেল চুপে চুপে ।

পায়ের শব্দ তারই
মর্মরিত পাতায় পাতায় গিয়েছে সঞ্চারি।
কানে কানে তারই করুণ বাণী
মৌমাছিদের পাখার গুনগুনানি।

মেয়ের নীরব মুখে
কী দেখে মা, শেল বাজে তার বুকে।
না-বলা কোন্ গোপন কথার মায়া
মঞ্জুলিকার কালো চোখে ঘনিয়ে তোলে জলভরা এক ছায়া ;
অশ্রু-ভেজা গভীর প্রাণের ব্যথা
এনে দিল অধরে তার শরৎনিশির স্তব্ধ ব্যাকুলতা।
মায়ের মুখে অন্ন রোচে নাকো—
কেঁদে বলে, "হায় ভগবান, অভাগীরে ফেলে কোথায় থাকো।"

একদা বাপ দুপুরবেলায় ভোজন সাঙ্গ করে
গুড়্‌গুড়িটার নলটা মুখে ধরে,
ঘুমের আগে, যেমন চিরাভ্যাস,
পড়তেছিলেন ইংরেজি এক প্রেমের উপন্যাস।
মা বললেন, বাতাস করে গায়ে,
কখনো বা হাত বুলিয়ে পায়ে,
"যার খুশি সে নিন্দে করুক, মরুক বিষে জ্বরে'
আমি কিন্তু পারি যেমন করে
মঞ্জুলিকার দেবই দেব বিয়ে।"
বাপ বললেন, কঠিন হেসে, "তোমরা মায়ে ঝিয়ে
এক লগ্নেই বিয়ে কোরো আমার মরার পরে,
সেই কটা দিন থাকো ধৈর্য ধরে।"
এই বলে তাঁর গুড়গুড়িতে দিলেন মৃদু টান।
মা বললেন, "উঃ কী পাষাণ প্রাণ,
স্নেহমায়া কিচ্ছু কি নেই ঘটে।"
বাপ বললেন, "আমি পাষাণ বটে।
ধর্মের পথ কঠিন বড়ো, ননির পুতুল হলে
এতদিনে কেঁদেই যেতেম গলে।"
মা বললেন, "হায় রে কপাল। বোঝাবই বা কারে।
তোমার এ সংসারে
ভরা ভোগের মধ্যখানে দুয়ার এঁটে
পলে পলে শুকিয়ে মরবে ছাতি ফেটে
একলা কেবল একটুকু ওই মেয়ে,
ত্রিভুবনে অধর্ম আর নেই কিছু এর চেয়ে।
তোমার পুঁথির শুকনো পাতায় নেই তো কোথাও প্রাণ,
দরদ কোথায় বাজে সেটা অন্তর্যামী জানেন ভগবান।"

বাপ একটু হাসল কেবল, ভাবলে, "মেয়েমানুষ
হৃদয়তাপের ভাপে ভরা ফানুস।
জীবন একটা কঠিন সাধন— নেই সে ওদের জ্ঞান।"
এই বলে ফের চলল পড়া ইংরেজি সেই প্রেমের উপাখ্যান।

দুখের তাপে জ্বলে জ্বলে অবশেষে নিবল মায়ের তাপ ;
সংসারেতে একা পড়লেন বাপ।
বড়ো ছেলে বাস করে তার স্ত্রীপুত্রদের সাথে
বিদেশে পাটনাতে।
দুই মেয়ে তার কেউ থাকে না কাছে,
শ্বশুরবাড়ি আছে।
একটি থাকে ফরিদপুরে,
আরেক মেয়ে থাকে আরো দূরে
মাদ্রাজে কোন্ বিন্ধ্যগিরির পার।
পড়ল মঞ্জুলিকার 'পরে বাপের সেবা-ভার।
রাঁধুনে ব্রাহ্মণের হাতে খেতে করেন ঘৃণা,
স্ত্রীর রান্না বিনা
অন্নপানে হত না তাঁর রুচি।
সকালবেলায় ভাতের পালা, সন্ধ্যাবেলায় রুটি কিংবা লুচি ;
ভাতের সঙ্গে মাছের ঘটা,
ভাজাভুজি হত পাঁচটা-ছটা ;
পাঁঠা হত রুটি-লুচির সাথে।
মঞ্জুলিকা দুবেলা সব আগাগোড়া রাঁধে আপন হাতে।
একাদশী ইত্যাদি তার সকল তিথিতেই
রাঁধার ফর্দ এই।
বাপের ঘরটি আপনি মোছে ঝাড়ে,
রৌদ্রে দিয়ে গরম পোশাক আপনি তোলে পাড়ে।
ডেস্কে বাক্সে কাগজপত্র সাজায় থাকে থাকে,
ধোবার বাড়ির ফর্দ টুকে রাখে।
গয়লানী আর মুদির হিসাব রাখতে চেষ্টা করে,
ঠিক দিতে ভুল হলে তখন বাপের কাছে ধমক খেয়ে মরে।
কাসুন্দি তার কোনোমতেই হয় না মায়ের মতো,
তাই নিয়ে তার কত
নালিশ শুনতে হয়।
তা ছাড়া তার পান-সাজাটা মনের মতো নয়।
মায়ের সঙ্গে তুলনাতে পদে-পদেই ঘটে যে তার ত্রুটি।
মোটামুটি—
আজকালকার মেয়েরা কেউ নয় সেকালের মতো।
হয়ে নীরব নত
মঞ্জুলী সব সহ্য করে, সর্বদাই সে শান্ত,
কাজ করে অক্লান্ত।

যেমন করে মাতা বারংবার
শিশু ছেলের সহস্র আবদার
হেসে সকল বহন করেন স্নেহের কৌতুকে,
তেমনি করেই সুপ্রসন্ন মুখে
মঞ্জুলী তার বাপের নালিশ দণ্ডে দণ্ডে শোনে,
হাসে মনে মনে।
বাবার কাছে মায়ের স্মৃতি কতই মূল্যবান
সেই কথাটা মনে ক'রে গর্বসুখে পূর্ণ তাহার প্রাণ।
"আমার মায়ের যত্ন যে-জন পেয়েছে একবার
আর কিছু কি পছন্দ হয় তার।"

হোলির সময় বাপকে সেবার বাতে ধরল ভারি।
পাড়ায় পুলিন করছিল ডাক্তারি,
ডাকতে হল তারে।
হৃদয়যন্ত্র বিকল হতে পারে
ছিল এমন ভয়।
পুলিনকে তাই দিনের মধ্যে বারেবারেই আসতে যেতে হয়।
মঞ্জুলী তার সনে
সহজভাবে কইবে কথা যতই করে মনে
ততই বাধে আরো।
এমন বিপদ কারো
হয় কি কোনোদিন।
গলাটি তার কাঁপে কেন, কেন এতই ক্ষীণ,
চোখের পাতা কেন
কিসের ভারে জড়িয়ে আসে যেন।
ভয়ে মরে বিরহিণী
শুনতে যেন পাবে কেহ রক্তে যে তার বাজে রিনিরিনি।
পদ্মপাতায় শিশির যেন, মনখানি তার বুকে
দিবারাত্রি টলছে কেন এমনতরো ধরা-পড়ার মুখে!

ব্যামো সেরে আসছে ক্রমে,
গাঁঠের ব্যথা অনেক এল কমে।
রোগী শয্যা ছেড়ে
একটু এখন চলে হাত-পা নেড়ে।
এমন সময় সন্ধ্যাবেলা
হাওয়ায় যখন যূথীবনের পরানখানি মেলা,
আঁধার যখন চাঁদের সঙ্গে কথা বলতে যেয়ে
চুপ ক'রে শেষ তাকিয়ে থাকে চেয়ে
তখন পুলিন রোগী-সেবার পরামর্শ-ছলে
মঞ্জুলীরে পাশের ঘরে ডেকে বলে—
"জানো তুমি তোমার মায়ের সাধ ছিল এই চিতে
মোদের দোঁহার বিয়ে দিতে।

সে ইচ্ছাটি তাঁরই
পুরাতে চাই যেমন করেই পারি ।
এমন করে আর কেন দিন কাটাই মিছিমিছি ।"

"না না, ছি ছি, ছি ছি ।"
এই ব'লে সে মঞ্জুলিকা দু-হাত দিয়ে মুখখানি তার ঢেকে
ছুটে গেল ঘরের থেকে ।
আপন ঘরে দুয়ার দিয়ে পড়ল মেঝের 'পরে—
ঝরঝরিয়ে ঝরঝরিয়ে বুক ফেটে তার অশ্রু ঝরে পড়ে ।
ভাবলে, "পোড়া মনের কথা এড়ায় নি ওঁর চোখ ।
আর কেন গো । এবার মরণ হোক ।"

মঞ্জুলিকা বাপের সেবায় লাগল দ্বিগুণ ক'রে
অষ্টপ্রহর ধরে ।
আবশ্যকটা সারা হলে তখন লাগে অনাবশ্যক কাজে,
যে-বাসনটা মাজা হল আবার সেটা মাজে ।
দু-তিন ঘণ্টা পর
একবার যে-ঘর ঝেড়েছে ফের ঝাড়ে সেই ঘর ।
কখন যে স্নান, কখন যে তার আহার,
ঠিক ছিল না তাহার ।
কাজের কামাই ছিল নাকো যতক্ষণ না রাত্রি এগারোটায়
শ্রান্ত হয়ে আপনি ঘুমে মেঝের 'পরে লোটায় ।
যে দেখল সে-ই অবাক হয়ে রইল চেয়ে,
বললে, "ধন্যি মেয়ে ।"

বাপ শুনে কয় বুক ফুলিয়ে, "গর্ব করি নেকো,
কিন্তু তবু আমার মেয়ে সেটা স্মরণ রেখো ।
ব্রহ্মচর্য-ব্রত
আমার কাছেই শিক্ষা যে ওর । নইলে দেখতে অন্যরকম হত ।
আজকালকার দিনে
সংযমেরই কঠোর সাধন বিনে
সমাজেতে রয় না কোনো বাঁধ,
মেয়েরা তাই শিখছে কেবল বিবিয়ানার ছাঁদ ।"

স্ত্রীর মরণের পরে যবে
সবেমাত্র এগারো মাস হবে,
গুজব গেল শোনা
এই বাড়িতে ঘটক করে আনাগোনা ।
প্রথম শুনে মঞ্জুলিকার হয় নিকো বিশ্বাস,
তার পরে সব রকম দেখে ছাড়লে সে নিশ্বাস ।
ব্যস্ত সবাই, কেমনতরো ভাব
আসছে ঘরে নানা রকম বিলিতি আসবাব !

দেখলে বাপের নতুন করে সাজসজ্জা শুরু,
হঠাৎ কালো ভ্রমরকৃষ্ণ ভুরু,
পাকাচুল সব কখন হল কটা,
চাদরেতে যখন-তখন গন্ধ মাখার ঘটা।

মার কথা আজ মঞ্জুলিকার পড়ল মনে
বুক-ভাঙা এক বিষম ব্যথার সনে।
হোক-না মৃত্যু, তবু
এ বাড়ির এই হাওয়ার সঙ্গে বিরহ তাঁর ঘটে নাই তো কভু।
কল্যাণী সেই মূর্তিখানি সুধামাখা
এ সংসারের মর্মে ছিল আঁকা ;
সাধ্বীর সেই সাধনপুণ্য ছিল ঘরের মাঝে,
তাঁরই পরশ ছিল সকল কাজে।
এ সংসারে তাঁর হবে আজ পরম মৃত্যু, বিষম অপমান—
সেই ভেবে যে মঞ্জুলিকার ভেঙে পড়ল প্রাণ।

ছেড়ে লজ্জাভয়
কন্যা তখন নিঃসংকোচে কয়
বাপের কাছে গিয়ে,
"তুমি নাকি করতে যাবে বিয়ে !
আমরা তোমার ছেলেমেয়ে নাতনি-নাতি যত
সবার মাথা করবে নত ?
মায়ের কথা ভুলবে তবে ?
তোমার প্রাণ কি এত কঠিন হবে।"

বাবা বললে শুষ্ক হাসে,
"কঠিন আমি কেই বা জানে না সে ?
আমার পক্ষে বিয়ে করা বিষম কঠোর কর্ম,
কিন্তু গৃহধর্ম
স্ত্রী না হলে অপূর্ণ যে রয়
মনু হতে মহাভারত সকল শাস্ত্রে কয়।
সহজ তো নয় ধর্মপথে হাঁটা,
এ তো কেবল হৃদয় নিয়ে নয়কো কাঁদাকাটা।
যে করে ভয় দুঃখ নিতে, দুঃখ দিতে,
সে কাপুরুষ কেনই আসে পৃথিবীতে।"

বাখরগঞ্জে মেয়ের বাপের ঘর।
সেথায় গেলেন বর
বিয়ের কদিন আগে। বৌকে নিয়ে শেষে
যখন ফিরে এলেন দেশে

ঘরেতে নেই মঞ্জুলিকা। খবর পেলেন চিঠি পড়ে,
পুলিন তাকে বিয়ে করে
গেছে দোঁহে ফরাক্কাবাদ চলে,
সেইখানেতেই ঘর পাতবে ব'লে।
আগুন হয়ে বাপ
বারে বারে দিলেন অভিশাপ।

মালা

আমি যেদিন সভায় গেলেম প্রাতে,
সিংহাসনে রানীর হাতে
ছিল সোনার থালা,
তারই 'পরে একটি শুধু ছিল মণির মালা।

কাশী কাঞ্চী কানোজ কোশল অঙ্গ বঙ্গ মদ্র মগধ হতে
বহুমুখী জনধারার স্রোতে
দলে দলে যাত্রী আসে
ব্যগ্র কলোচ্ছ্বাসে।
যারে শুধাই "কোথায় যাবে?" সে-ই তখনি বলে
"রানীর সভাতলে।"
যারে শুধাই "কেন যাবে?" কয় সে তেজে চক্ষে দীপ্ত জ্বালা
"নেব বিজয়মালা।"

কেউ বা ঘোড়ায়, কেউ বা রথে
ছুটে চলে, বিরাম চায় না পথে।
মনে যেন আগুন উঠল খেপে,
চঞ্চলিত বীণার তারে যৌবন মোর উঠল কেঁপে কেঁপে।
মনে মনে কইনু হর্ষে, "ওগো জ্যোতির্ময়ী,
তোমার সভায় হব আমি জয়ী।
শূন্য ক'রে থালা
নেব বিজয়মালা।"

একটি ছিল তরুণ যাত্রী, করুণ তাহার মুখ,
প্রভাত-তারার মতো যে তার নয়নদুটি কী লাগি উৎসুক।
সবাই যখন ছুটে চলে
সে যে তরুর তলে
আপন মনে বসে থাকে।
আকাশ যেন শুধায় তাকে—
যার কথা সে ভাবে কী তার নাম।
আমি তারে যখন শুধালাম—
"মালার আশায় যাও বুঝি ওই হাতে নিয়ে শূন্য তোমার ডালা?"
সে বলে, "ভাই, চাই নে বিজয়মালা।"

তারে দেখে সবাই হাসে ;
মনে ভাবে, "এও কেন মোদের সাথে আসে
আশা করার ভরসাও যার নাইকো মনে,
আগে হতেই হার মেনে যে চলে রণে।"
সবার তরে জায়গা সে দেয় মেলে,
আগেভাগে যাবার লাগি ছুটে যায় না আর-সবারে ঠেলে।
কিন্তু নিত্য সজাগ থাকে ;
পথ চলেছে যেন রে কার বাঁশির অধীর ডাকে
হাতে নিয়ে রিক্ত আপন থালা ;
তবু বলে, চায় না বিজয়মালা।

সিংহাসনে একলা ব'সে রানী
মূর্তিমতী বাণী।
ঝংকারিয়া গুঞ্জরিয়া সভার মাঝে
আমার বীণা বাজে।
কখনো বা দীপক রাগে
চমক লাগে,
তারাবৃষ্টি করে ;
কখনো বা মল্লারে তার অশ্রুধারার পাগল-ঝোরা ঝরে।
আর-সকলে গান শুনিয়ে নতশিরে
সন্ধ্যাবেলার অন্ধকারে ধীরে ধীরে
গেছে ঘরে ফিরে।
তারা জানে, যেই ফুরাবে আমার পালা,
আমি পাব রানীর বিজয়মালা।

আমাদের সেই তরুণ সাথি বসে থাকে ধুলায় আসন-তলে ;
কথাটি না ব'লে।
দৈবে যদি একটি-আধটি চাঁপার কলি
পড়ে স্খলি
রানীর আঁচল হতে মাটির 'পরে,
সবার অগোচরে
সেইটি যত্নে নিয়ে তুলে
পরে কর্ণমূলে।
সভাভঙ্গ হবার বেলায় দিনের শেষে
যদি তারে বলি হেসে—
"প্রদীপ জ্বালার সময় হল সাঁঝে
এখনো কি রইবে সভামাঝে।"
সে হেসে কয়, "সব সময়েই আমার পালা,
আমি যে ভাই, চাই নে বিজয়মালা।"

আষাঢ় শ্রাবণ অবশেষে
গেল ভেসে
ছিন্নমেঘের পালে,
গুরু গুরু মৃদঙ্গ তার বাজিয়ে দিয়ে আমার গানের তালে।
শরৎ এল, শরৎ গেল চলে;
নীল আকাশের কোলে
রৌদ্রজলের কান্নাহাসি হল সারা;
আমার সুরের থরে থরে ছড়িয়ে গেল শিউলিফুলের ঝারা।
ফাগুন-চৈত্র আম-মউলের সৌরভে আতুর,
দখিন হাওয়ায় আঁচল ভরে নিয়ে গেল আমার গানের সুর।
কণ্ঠে আমার একে একে সকল ঋতুর গান
হল অবসান।
তখন রানী আসন হতে উঠে,
আমার করপুটে
তুলে দিলেন, শূন্য ক'রে থালা,
আপন বিজয়মালা।

পথে যখন বাহির হলেম মালা মাথায় প'রে
মনে হল বিশ্ব আমার চতুর্দিকে ঘোরে
ঘূর্ণি ধুলার মতো।
মানুষ শত শত
ঘিরল আমায় দলে দলে—
কেউ বা কৌতূহলে,
কেউ বা স্তুতিচ্ছলে,
কেউ বা গ্লানির পঙ্ক দিতে গায়।
হায় রে হায়
এক নিমেষে স্বচ্ছ আকাশ ধূসর হয়ে যায়।
এই ধরণীর লাজুক যত সুখ,
ছোটোখাটো আনন্দেরই সরল হাসিটুক,
নদীচরের ভীরু হংসদলের মতো
কোথায় হল গত।
আমি মনে মনে ভাবি, "এ কি দহনজ্বালা
আমার বিজয়মালা।"

ওগো রানী, তোমার হাতে আর কিছু কি নেই।
শুধু কেবল বিজয়মালা এই?
জীবন আমার জুড়ায় না যে,
বক্ষে বাজে
তোমার মালার ভার;
এই যে পুরস্কার

এ তো কেবল বাইরে আমার গলায় মাথায় পরি ;
কী দিয়ে যে হৃদয় ভরি
সেই তো খুঁজে মরি ।
তৃষ্ণা আমার বাড়ে শুধু মালার তাপে ;
কিসের শাপে
ওগো রানী, শূন্য ক'রে তোমার সোনার থালা
পেলেম বিজয়মালা ?

আমার কেমন মনে হল, আরো যেন অনেক আছে বাকি—
সে নইলে সব ফাঁকি ।
এ শুধু আধখানা ;
কোন্ মানিকের অভাব আছে, এ মালা তাই কানা ।
হয় নি পাওয়া, সেই কথাটাই কেন মনের মাঝে
এমন করে বাজে ।
চল্ রে ফিরে বিড়ম্বিত, আবার ফিরে চল্,
দেখবি খুঁজে বিজন সভাতল—
যদি রে তোর ভাগ্যদোষে
ধুলায় কিছু পড়ে থাকে খসে ।
যদি সোনার থালা
লুকিয়ে রাখে আর-কোনো এক মালা ।

সন্ধ্যাকাশে শান্ত তখন হাওয়া ;
দেখি সভার দুয়ার বন্ধ, ক্ষান্ত তখন সকল চাওয়া-পাওয়া ।
নাই কোলাহল, নাইকো ঠেলাঠেলি,
তরুশ্রেণী স্তব্ধ যেন শিবের মতন যোগের আসন মেলি ।
বিজন পথে আঁধার গগনতলে
আমার মালার রতনগুলি আর কি তেমন জ্বলে ।
আকাশের ওই তারার কাছে
লজ্জা পেয়ে মুখ লুকিয়ে আছে ।
দিনের আলোয় ভুলিয়েছিল মুগ্ধ আঁখি
আঁধারে তার ধরা পড়ল ফাঁকি ।
এরই লাগি এত বিবাদ, সারাদিনের এত দুখের পালা ?
লও ফিরে লও তোমার বিজয়মালা ।

ঘনিয়ে এল রাতি ।
হঠাৎ দেখি তারার আলোয় সেই যে আমার পথের তরুণ সাথি
আপন মনে
গান গেয়ে যায় রানীর কুঞ্জবনে ।
আমি তারে শুধাই ধীরে, "কোথায় তুমি এই নিভৃতের মাঝে
রয়েছ কোন্ কাজে ।"

সে হেসে কয়, "ফুরিয়ে গেলে সভার পালা,
ফুরিয়ে গেলে জয়ের মালা,
তখন রানীর আসন পড়ে বকুল-বীথিকাতে,
আমি একা বীণা বাজাই রাতে।"
শুধাই তারে, "কী পেলে তাঁর কাছে।"
সে কয় শুনে, "এই যে আমার বুকের মাঝে আলো করে আছে।
কেউ দেখে নি রানীর কোলে পদ্মপাতার ডালা,
তারি মধ্যে গোপন ছিল, জয়মালা নয়, এ যে বরণমালা।"

ভোলা

হঠাৎ আমার হল মনে,
শিবের জটার গঙ্গা যেন শুকিয়ে গেল অকারণে ;
থামল তাহার হাস্য-উছল বাণী ;
থামল তাহার নৃত্য-নূপুর ঝরঝরানি ;
সূর্য-আলোর সঙ্গে তাহার ফেনার কোলাকুলি,
হাওয়ার সঙ্গে ঢেউয়ের দোলাদুলি
স্তব্ধ হল এক নিমেষে
বিজু যখন চলে গেল মরণপারের দেশে
বাপের বাহুর বাঁধন কেটে।
মনে হল, আমার ঘরের সকাল যেন মরেছে বুক ফেটে।
ভোরবেলা তার বিষম গণ্ডগোলে
ঘুম-ভাঙনের সাগরমাঝে আর কি তুফান তোলে।
ছুটোছুটির উপদ্রবে
ব্যস্ত হত সবে,
হাঁ হাঁ করে ছুটে আসত "আরে আরে করিস কী তুই" ব'লে ;
ভূমিকম্পে গৃহস্থালি উঠত যেন টলে।
আজ যত তার দস্যুপনা, যা-কিছু হাঁক ডাক
চাক-ভরা মৌমাছির মতো উড়ে গেছে শূন্য করে চাক।
আমার এ সংসারে
অত্যাচারের সুধা-উৎস বন্ধ হয়ে গেল একেবারে ;
তাই এ ঘরের প্রাণ
লোটায় ম্রিয়মাণ
জল-পালানো দিঘির পদ্ম যেন।
খাট-পালঙ্ক শূন্যে চেয়ে শুধায় শুধু, "কেন, নাই সে কেন।"

সবাই তারে দুষ্টু বলত, ধরত আমার দোষ,
মনে করত, শাসন বিনা বড়ো হলে ঘটাবে আপসোস।

সমুদ্র-ঢেউ যেমন বাঁধন টুটে
ফেনিয়ে গড়িয়ে গর্জে ছুটে
ফিরে ফিরে ফুলে ফুলে কূলে কূলে দুলে দুলে পড়ে লুটে লুটে
ধরার বক্ষতলে,
দুরন্ত তার দুষ্টুমিটি তেমনি বিষম বলে
দিনের মধ্যে সহস্রবার করে
বাপের বক্ষ দিত অসীম চঞ্চলতায় ভরে।
বয়সের এই পর্দা-ঘেরা শান্ত ঘরে
আমার মধ্যে একটি সে কোন্ চির-বালক লুকিয়ে খেলা করে;
বিজুর হাতে পেলে নাড়া
সেই যে দিত সাড়া।
সমান-বয়স ছিল আমার কোন্‌খানে তার সনে,
সেইখানে তার সাথি ছিলেম সকল প্রাণে মনে।
আমার বক্ষ সেইখানে এক তালে
উঠত বেজে তারই খেলার অশান্ত গোলমালে।
বৃষ্টিধারা সাথে নিয়ে মোদের দ্বারে ঝড় দিত যেই হানা
কাটিয়ে দিয়ে বিজুর মায়ের মানা
অট্ট হেসে আমরা দোঁহে
মাঠের মধ্যে ছুটে গেছি উদ্দাম বিদ্রোহে।
পাকা আমের কালে
তারে নিয়ে বসে গাছের ডালে
দুপুরবেলায় খেয়েছি আম করে কাড়াকাড়ি—
তাই দেখে সব পাড়ার লোকে বলে গেছে, "বিষম বাড়াবাড়ি।"
বারে বারে
আমার লেখার ব্যাঘাত হত, বিজুর মা তাই রেগে বলত তারে
"দেখিস নে তোর বাবা আছেন কাজে?"
বিজু তখন লাজে
বাইরে চলে যেত। আমার দ্বিগুণ ব্যাঘাত হত লেখাপড়ায়;
মনে হত, "টেবিলখানা কেউ কেন না নড়ায়।"

ভোর না হতে রাতি
সেদিন যখন বিজু গেল ছেড়ে খেলা, ছেড়ে খেলার সাথি,
মনে হল এতদিনে বুড়ো-বয়সখানা
পুরল ষোলো-আনা।
কাজের ব্যাঘাত হবে না আর কোনোমতে,
চলব এবার প্রবীণতার পাকা পথে
লক্ষ্য করে বৈতরণীর ঘাট,
গম্ভীরতার স্তম্ভিত ভার বহন করে প্রাণটা হবে কাঠ।
সময় নষ্ট হবে না আর দিনে রাতে,
দৌড়োবে মন লেখার খাতার শুকনো পাতে পাতে—

বৈঠকেতে চলবে আলোচনা
কেবলই সৎপরামর্শ কেবলই সদ্‌বিবেচনা।

ঘরের সকল আকাশ ব্যেপে
দারুণ শূন্য রয়েছে মোর চৌকি-টেবিল চেপে।
তাই সেখানে টিকতে নাহি পারি
বৈরাগ্যে মন ভারি,
উঠোনেতে করছিনু পায়চারি।
এমন সময় উঠল মাটি কেঁপে
হঠাৎ কে এক ঝড়ের মতো বুকের 'পরে পড়ল আমায় ঝেঁপে।
চমক লাগল শিরে শিরে,
হঠাৎ মনে হল বুঝি বিজুই আমার এল আবার ফিরে।
আমি শুধাই, "কে রে, কী রে।"
"আমি ভোলা", সে শুধু এই কয়,
এই যেন তার সকল পরিচয়,
আর কিছু নেই বাকি।
আমি তখন অচেনারে দু-হাত দিয়ে বক্ষে চেপে রাখি,
সে বললে, "ওই বাইরে তেঁতুলগাছে
ঘুড়ি আমার আটকে আছে,
ছাড়িয়ে দাও-না এসে।"
এই বলে সে
হাত ধরে মোর চলল নিয়ে টেনে।

ওরে ওরে এই মতো যার হাজার হুকুম মেনে
কেটেছিল নটা বছর, তারি হুকুম আজো মর্ততলে
ঘুরে বেড়ায় তেমনি নানান ছলে।
ওরে ওরে বুঝে নিলেম আজ
ফুরোয় নি মোর কাজ।
আমার রাজা, আমার সখা, আমার বাছা, আজো
কত সাজেই সাজো।
নতুন হয়ে আমার বুকে এলে,
চিরদিনের সহজ পথটি আপনি খুঁজে পেলে।
আবার আমার লেখার সময় টেবিল গেল নড়ে,
আবার হঠাৎ উলটে পড়ে
দোয়াত হল খালি,
খাতার পাতায় ছড়িয়ে গেল কালি।
আবার কুড়োই ঝিনুক শামুক নুড়ি,
গোলা নিয়ে আবার ছোঁড়াছুঁড়ি।
আবার আমার নষ্ট সময় ভ্রষ্ট কাজে
উলটপালট গণ্ডগোলের মাঝে

ফেলাছড়া-ভাঙাচোরার 'পর
আমার প্রাণের চির-বালক নতুন করে বাঁধল খেলাঘর
বয়সের এই দুয়ার পেয়ে খোলা।
আবার বক্ষে লাগিয়ে দোলা
এল তার দৌরাত্ম্য নিয়ে এই ভুবনের চিরকালের ভোলা।

ছিন্ন পত্র

কর্ম যখন দেবতা হয়ে জুড়ে বসে পূজার বেদী,
মন্দিরে তার পাষাণ-প্রাচীর অভ্রভেদী
চতুর্দিকেই থাকে ঘিরে;
তারই মধ্যে জীবন যখন শুকিয়ে আসে ধীরে ধীরে,
পায় না আলো, পায় না বাতাস, পায় না ফাঁকা, পায় না কোনো রস,
কেবল টাকা, কেবল সে পায় যশ,
তখন সে কোন্ মোহের পাকে
মরণ-দশা ঘটেছে তার, সেই কথাটাই ভুলে থাকে।

আমি ছিলেম জড়িয়ে পড়ে সেই বিপাকের ফাঁসে;
বৃহৎ সর্বনাশে
হারিয়েছিলেম বিশ্বজগৎখানি
নীল আকাশের সোনার বাণী
সকাল-সাঁঝের বীণার তারে
পৌঁছোত না মোর বাতায়ন-দ্বারে।
ঋতুর পরে আসত ঋতু শুধু কেবল পঞ্জিকারই পাতে,
আমার আঙিনাতে
আনত না তার রঙিন পাতার ফুলের নিমন্ত্রণ।
অন্তরে মোর লুকিয়ে ছিল কী যে সে ক্রন্দন
জানব এমন পাই নি অবকাশ।
প্রাণের উপবাস
সংগোপনে বহন করে কর্মরথে
সমারোহে চলতেছিলেম নিষ্ফলতার মরুপথে।

তিনটে চারটে সভা ছিল জুড়ে আমার কাঁধ;
দৈনিকে আর সাপ্তাহিকে ছাড়তে হত নকল সিংহনাদ;
বীডন কুঞ্জে মীটিং হলে আমি হতেম বক্তা;
রিপোর্ট লিখতে হত তক্তা তক্তা;
যুদ্ধ হত সেনেট-সিন্ডিকেটে,
তার উপরে আপিস আছে, এমনি করে কেবল খেটে খেটে
দিনরাত্রি যেত কোথায় দিয়ে।
বন্ধুরা সব বলত, "করছ কী এ।

মারা যাবে শেষে !"
আমি বলতেম হেসে,
"কী করি ভাই, খাটতে কি হয় সাধে।
একটু যদি ঢিল দিয়েছি অমনি গলদ বাধে,
কাজ বেড়ে যায় আরো—
কী করি তার উপায় বলতে পারো ?"
বিশ্বকর্মার সদর আপিস ছিল যেন আমার 'পরেই ন্যস্ত,
অহোরাত্রি এমনি আমার ভাবটা ব্যতিব্যস্ত।

সেদিন তখন দু-তিন রাত্রি ধরে
গত সনের রিপোর্টখানা লিখেছি খুব জোরে।
বাছাই হবে নতুন সনের সেক্রেটারি,
হপ্তা তিনেক মরতে হবে ভোট কুড়োতে তারই।
শীতের দিনে যেমন পত্রভার
খসিয়ে ফেলে গাছগুলো সব কেবল শাখা-সার,
আমার হল তেমনি দশা :
সকাল হতে সন্ধ্যা-নাগাদ এক টেবিলেই বসা ;
কেবল পত্র রওনা করা,
কেবল শুকিয়ে মরা।
খবর আসে "খাবার তৈরি", নিই নে কথা কানে,
আবার যদি খবর আনে,
বলি ক্রোধের ভরে
"মরি এমন নেই অবসর, খাওয়া তো থাক্ পরে।"

বেলা যখন আড়াইটে প্রায়, নিঝুম হল পাড়া,
আর সকলে স্তব্ধ কেবল গোটাপাঁচেক চড়ুই পাখি ছাড়া ;
এমন সময় বেহারাটা ডাকের পত্র নিয়ে
হাতে গেল দিয়ে।
জরুরি কোন্ কাজের চিঠি ভেবে
খুলে দেখি বাঁকা লাইন, কাঁচা আখর চলছে উঠে নেবে,
নাইকো দাঁড়ি-কমা,
শেষ লাইনে নাম লেখা তার মনোরমা।
আর হল না পড়া,
মনে হল, কোন্ বিধবার ভিক্ষাপত্র মিথ্যা কথায় গড়া,
চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে আবার লাগি কাজে।
এমনি করে কোন্ অতলের মাঝে
হপ্তা তিনেক গেল ডুবে।
সূর্য ওঠে পশ্চিমে কি পুবে,
সেই কথাটাই ভুলে গেছি, চলছি এমন চোটে।
এমন সময় ভোটে

আমার হল হার,
শত্রুদলে আসন আমার করলে অধিকার ;
তাহার পরে খালি
কাগজপত্রে চলল গালাগালি ।

কাজের মাঝে অনেকটা ফাঁক হঠাৎ পড়ল হাতে,
সেটা নিয়ে কী করব তাই ভাবছি বসে আরাম-কেদারাতে ;
এমন সময় হঠাৎ দখিন-পবনভরে
ছেঁড়া চিঠির টুকরো এসে পড়ল আমার কোলের 'পরে ।
অন্যমনে হাতে তুলে
এই কথাটা পড়ল চোখে, "মনুরে কি গেছ এখন ভুলে ।"
মনু ? আমার মনোরমা ? ছেলেবেলার সেই মনু কি এই ।
অমনি হঠাৎ এক নিমেষেই
সকল শূন্য ভ'রে,
হারিয়ে-যাওয়া বসন্ত মোর বন্যা হয়ে ডুবিয়ে দিল মোরে ।
সেই তো আমার অনেক কালের পড়োশিনি,
পায়ে পায়ে বাজাত মল রিনিঝিনি ।
সেই তো আমার এই জনমের ভোর-গগনের তারা
অসীম হতে এসেছে পথহারা ;
সেই তো আমার শিশুকালের শিউলিফুলের কোলে
শুভ্র শিশির দোলে ;
সেই তো আমার মুগ্ধ চোখের প্রথম আলো,
এই ভুবনের সকল ভালোর প্রথম ভালো ।
মনে পড়ে, ঘুমের থেকে যেমনি জেগে ওঠা
অমনি ওদের বাড়ির পানে ছোটা ।
ওরই সঙ্গে শুরু হত দিনের প্রথম খেলা ;
মনে পড়ে, পিঠের 'পরে চুলটি মেলা
সেই আনন্দমূর্তিখানি, স্নিগ্ধ ডাগর আঁখি,
কণ্ঠ তাহার সুধায় মাখামাখি ।
অসীম ধৈর্যে সইত সে মোর হাজার অত্যাচার
সকল কথায় মানত মনু হার ।
উঠে গাছের আগডালেতে দোলা খেতেম জোরে,
ভয় দেখাতেম পড়ি-পড়ি ক'রে,
কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠে তাহার করুণ মিনতি সে,
ভুলতে পারি কি সে ।
মনে পড়ে, নীরব ব্যথা তার,
বাবার কাছে যখন খেতেম মার ;
ফেলেছে সে কত চোখের জল,
মোর অপরাধ ঢাকা দিতে খুঁজত কত ছল ।
আরো কিছু বড়ো হলে
আমার কাছে নিত সে তার বাংলা পড়া বলে ।

নামতাটা তার কেবল যেত বেধে,
তাই নিয়ে মোর একটু হাসি সইত না সে, উঠত লাজে কেঁদে।
আমার হাতে মোটা মোটা ইংরেজি বই দেখে
ভাবত মনে, গেছে যেন কোন্ আকাশে ঠেকে
রাশীকৃত মোর বিদ্যার বোঝা।
যা-কিছু সব বিষম কঠিন, আমার কাছে যেন নেহাত সোজা।

হেনকালে হঠাৎ সেবার,
দশমীতে দ্বারিগ্রামে ঠাকুর ভাসান দেবার
রাস্তা নিয়ে দুই পক্ষের চাকর-দরোয়ানে
বকাবকি লাঠালাঠি বেধে গেল গলির মধ্যখানে।
তাই নিয়ে শেষ বাবার সঙ্গে মনুর বাবার বাধল মকদ্দমা,
কেউ কাহারে করলে না আর ক্ষমা।
দুয়ার মোদের বন্ধ হল,
আকাশ যেন কালো মেঘে অন্ধ হল,
হঠাৎ এল কোন্ দশমী সঙ্গে নিয়ে ঝঞ্ঝার গর্জন,
মোর প্রতিমার হল বিসর্জন।
দেখাশোনা ঘুচল যখন, এলেম যখন দূরে,
তখন প্রথম শুনতে পেলেম কোন্ প্রভাতী সুরে
প্রাণের বীণা বেজেছিল কাহার হাতে।
নিবিড় বেদনাতে
মুখখানি তার উঠল ফুটে আঁধার পটে সন্ধ্যাতারার মতো;
একই সঙ্গে জানিয়ে দিলে সে যে আমার কত,
সে যে আমার কতখানিই নয়!
প্রেমের শিখা জ্বলল তখন, নিবল যখন চোখের পরিচয়।

কত বছর গেল চলে,
আবার গ্রামে গিয়েছিলেম পরীক্ষা পাস হলে।
গিয়ে দেখি, ওদের বাড়ি কিনেছে কোন্ পাটের কুঠিয়াল,
হল অনেক কাল।
বিয়ে করে মনুর স্বামী
কোন্ দেশে যে নিয়ে গেছে, ঠিকানা তার খুঁজে না পাই আমি।
সেই মনু আজ এতকালের অজ্ঞাতবাস টুটে
কোন্ কথাটি পাঠাল তার পত্রপুটে।
কোন্ বেদনা দিল তারে নিষ্ঠুর সংসার—
মৃত্যু সে কি। ক্ষতি সে কি। সে কি অত্যাচার।
কেবল কি তার বাল্যসখার কাছে
হৃদয়ব্যথার সান্ত্বনা তার আছে।
ছিন্ন চিঠির বাকি
বিশ্বমাঝে কোথায় আছে খুঁজে পাব না কি।

"মনুরে কি গেছ ভুলে।"
এ প্রশ্ন কি অনন্ত কাল রইবে দুলে
মোর জগতের চোখের পাতায় একটি ফোঁটা চোখের জলের মতো।
কত চিঠির জবাব লিখব কত,
এই কথাটির জবাব শুধু নিত্য বুকে জ্বলবে বহ্নিশিখা,
অক্ষরেতে হবে না আর লিখা।

কালো মেয়ে

মরচে-পড়া গরাদে ওই, ভাঙা জানলাখানি ;
পাশের বাড়ির কালো মেয়ে নন্দরানী
ওইখানেতে বসে থাকে একা,
শুকনো নদীর ঘাটে যেন বিনা কাজে নৌকোখানি ঠেকা।

বছর বছর করে ক্রমে
বয়স উঠছে জমে।
বর জোটে না, চিন্তিত তার বাপ ;
সমস্ত এই পরিবারের নিত্য মনস্তাপ
দীর্ঘশ্বাসের ঘূর্ণি হাওয়ায় আছে যেন ঘিরে
দিবসরাত্রি কালো মেয়েটিরে।
সামনে-বাড়ির নীচের তলায় আমি থাকি "মেস্"-এ।
বহুকষ্টে শেষে
কলেজেতে পার হয়েছি একটা পরীক্ষায়।
আর কি চলা যায়
এমন করে এগ্‌জামিনের লগি ঠেলে ঠেলে।
দুই বেলাতেই পড়িয়ে ছেলে
একটা বেলা খেয়েছি আধ-পেটা,
ভিক্ষা করা সেটা
সইত না একবারে,
তবু গেছি প্রিন্সিপালের দ্বারে
বিনি মাইনেয়, নেহাত পক্ষে, আধা মাইনেয়, ভর্তি হবার জন্যে।
এক সময়ে মনে ছিল আধেক রাজ্য এবং রাজার কন্যে
পাবার আমার ছিল দাবি,
মনে ছিল ধনমানের রুদ্ধ ঘরের সোনার চাবি
জন্মকালে বিধি যেন দিয়েছিলেন রেখে
আমার গোপন শক্তিমাঝে ঢেকে।
আজকে দেখি, নবাবঙ্গে
শক্তিটা মোর ঢাকাই রইল, চাবিটা তার সঙ্গে।
মনে হচ্ছে, ময়নাপাখির খাঁচায়
অদৃষ্ট তার দারুণ রঙ্গে ময়ূরটাকে নাচায় ;

পদে পদে পুচ্ছে বাধে লোহার শলা,
কোন্ কৃপণের রচনা এই নাট্যকলা।
কোথায় মুক্ত অরণ্যানী, কোথায় মত্ত বাদল-মেঘের ভেরী।
এ কী বাঁধন রাখল আমায় ঘেরি।

ঘুরে ঘুরে উমেদারির ব্যর্থ আশে
শুকিয়ে মরি রোদ্দুরে আর উপবাসে।
প্রাণটা হাঁপায়, মাথা ঘোরে,
তক্তপোশে শুয়ে পড়ি ধপাস করে।
হাতপাখাটার বাতাস খেতে খেতে
হঠাৎ আমার চোখ পড়ে যায় উপরেতে—
মরচে-পড়া গরাদে ওই, ভাঙা জানলাখানি,
বসে আছে পাশের বাড়ির কালো মেয়ে নন্দরানী।
মনে হয় যে, রোদের পরে বৃষ্টিভরা থমকে-যাওয়া মেঘে
ক্লান্ত পরান জুড়িয়ে গেল কালো পরশ লেগে।
আমি যে ওর হৃদয়খানি চোখের 'পরে স্পষ্ট দেখি আঁকা;
ও যেন জুঁইফুলের বাগান সন্ধ্যা-ছায়ায় ঢাকা;
একটুখানি চাঁদের রেখা কৃষ্ণপক্ষে স্তব্ধ নিশীথ রাতে
কালো জলের গহন কিনারাতে।
লাজুক ভীরু ঝরনাখানি ঝিরি ঝিরি
কালো পাথর বেয়ে বেয়ে লুকিয়ে ঝরে ধীরি ধীরি।
রাত-জাগা এক পাখি,
মৃদু করুণ কাকুতি তার তারার মাঝে মিলায় থাকি থাকি।
ও যেন কোন্ ভোরের স্বপন কান্নাভরা,
ঘন ঘুমের নীলাঞ্চলের বাঁধন দিয়ে ধরা।
রাখাল ছেলের সঙ্গে বসে বটের ছায়ে
ছেলেবেলায় বাঁশের বাঁশি বাজিয়েছিলেম গাঁয়ে।
সেই বাঁশিটির টান
ছুটির দিনে হঠাৎ কেমন আকুল করল প্রাণ।
আমি ছাড়া সকল ছেলেই গেছে যে যার দেশে,
একলা থাকি "মেস্"-এ।
সকাল-সাঁঝে মাঝে মাঝে বাজাই ঘরের কোণে
মেঠো গানের সুর যা ছিল মনে।

ওই যে ওদের কালো মেয়ে নন্দরানী
যেমনতরো ওর ভাঙা ওই জানলাখানি,
যেখানে ওর কালো চোখের তারা
কালো আকাশতলে দিশেহারা;
যেখানে ওর এলোচুলের স্তরে স্তরে
বাতাস এসে করত খেলা আলস-ভরে;
যেখানে ওর গভীর মনের নীরব কথাখানি
আপন দোসর খুঁজে পেত আলোর নীরব বাণী;

তেমনি আমার বাঁশের বাঁশি আপনভোলা,
চার দিকে মোর চাপা দেয়াল, ওই বাঁশিটি আমার জানলা খোলা।
ওইখানেতেই গুটিকয়েক তান
ওই মেয়েটির সঙ্গে আমার ঘুচিয়ে দিত অসীম ব্যবধান।
এ সংসারে অচেনাদের ছায়ার মতন আনাগোনা
কেবল বাঁশির সুরের দেশে দুই অজানার রইল জানাশোনা।
যে-কথাটা কান্না হয়ে বোবার মতন ঘুরে বেড়ায় বুকে
উঠল ফুটে বাঁশির মুখে।
বাঁশির ধারেই একটু আলো, একটুখানি হাওয়া,
যে-পাওয়াটি যায় না দেখা স্পর্শ-অতীত একটুকু সেই পাওয়া।

আসল

বয়স ছিল আট,
পড়ার ঘরে বসে বসে ভুলে যেতেম পাঠ।
জানলা দিয়ে দেখা যেত মুখুজ্যেদের বাড়ির পাশে
একটুখানি পোড়ো জমি, শুকনো শীর্ণ ঘাসে
দেখায় যেন উপবাসীর মতো!
পাড়ার আবর্জনা যত
ওইখানেতেই উঠছে জমে,
একধারেতে ক্রমে
পাহাড়-সমান উঁচু হল প্রতিবেশীর রান্নাঘরের ছাই;
গোটাকয়েক আকন্দগাছ, আর-কোনো গাছ নাই;
দশ-বারোটা শালিখপাখি
তুমুল ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে করত ডাকাডাকি;
দুপুরবেলায় ভাঙা গলায় কাকের দলে
কী যে প্রশ্ন হাঁকত শূন্যে কিসের কৌতূহলে।

পাড়ার মধ্যে ওই জমিটাই কোনো কাজের নয়;
সবার যাতে নাই প্রয়োজন লক্ষ্মীছাড়ার তাই ছিল সঞ্চয়;
তেলের ভাঙা ক্যানেস্তারা, টুকরো হাঁড়ির কানা,
অনেক কালের জীর্ণ বেতের কেদারা একখানা
ফুটো এনামেলের গেলাস, থিয়েটারের ছেঁড়া বিজ্ঞাপন
মরচে-পড়া টিনের লণ্ঠন,
সিগারেটের শূন্য বাক্স, খোলা চিঠির খাম,
অ-দরকারের মুক্তি হেথায়, অনাদরের অমর স্বর্গধাম।

তখন আমার বয়স ছিল আট,
করতে হত ভূবৃত্তান্ত পাঠ।
পড়ার ঘরের দেয়ালে চার পাশে
ম্যাপগুলো এই পৃথিবীকে ব্যঙ্গ করত নীরব পরিহাসে;

পাহাড়গুলো মরে যাওয়া শুঁয়োপোকার মতো,
নদীগুলো যত
অচল রেখার মিথ্যা কথায় অবাক হয়ে রইত থতমত
সাগরগুলো ফাঁকা,
দেশগুলো সব জীবনশূন্য কালো-আখর-আঁকা।
হাঁপিয়ে উঠত পরান আমার ধরণীর এই শিকল রেখার রূপে—
আমি চুপে চুপে
মেঝের 'পরে বসে যেতেম ওই জানলার পাশে।
ওই যেখানে শুকনো জমি শুকনো শীর্ণ ঘাসে
পড়ে আছে এলোথেলো, তাকিয়ে ওরই পানে
কার সাথে মোর মনের কথা চলত কানে কানে।
ওই যেখানে ছাইয়ের গাদা আছে
বসুন্ধরা দাঁড়িয়ে হোথায় দেখা দিতেন এই ছেলেটির কাছে।
মাথার 'পরে উদার নীলাঞ্চল
সোনার আভায় করত ঝলমল।
সাত সমুদ্র তেরো নদীর সুদূর পারের বাণী
আমার কাছে দিতেন আনি!
ম্যাপের সঙ্গে হত না তার মিল,
বইয়ের সঙ্গে ঐক্য তাহার ছিল না এক তিল।
তার চেহারা নয় তো অমন মস্ত ফাঁকা
আঁচড়-কাটা আখর-আঁকা—
নয় সে তো কোন্ মাইল-মাপা বিশ্ব,
অসীম যে তার দৃশ্য; আবার অসীম সে অদৃশ্য।

এখন আমার বয়স হল ষাট
গুরুতর কাজের ঝঞ্ঝাট।
পাগল করে দিল পলিটিক্‌সে,
কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা স্বপ্ন আজকে নাগাদ হয় নি জানা ঠিক সে;
ইতিহাসের নজির টেনে সোজা
একটা দেশের ঘাড়ে চাপাই আরেক দেশের কর্মফলের বোঝা,
সমাজ কোথায় পড়ে থাকে, নিয়ে সমাজতত্ত্ব
মাসিক পত্রে প্রবন্ধ উন্মত্ত।
যত লিখছি কাব্য
ততই নোংরা সমালোচন হতেছে অশ্রাব্য।
কথায় কেবল কথারই ফল ফলে,
পুঁথির সঙ্গে মিলিয়ে পুঁথি কেবলমাত্র পুঁথিই বেড়ে চলে।

আজ আমার এই ষাট বছরের বয়সকালে
পুঁথির সৃষ্টি জগৎটার এই বন্দীশালে
হাঁপিয়ে উঠলে প্রাণ
পালিয়ে যাবার একটি আছে স্থান—

সেই মহেশের পাশে
পাড়ায় যারে পাগল বলে হাসে।
পাছে পাছে
ছেলেগুলো সঙ্গে যে তার লেগেই আছে।
তাদের কলরবে
নানান উপদ্রবে
একমুহূর্ত পায় না শান্তি,
তবু তাহার নাই কিছুতেই ক্লান্তি।
বেগার-খাটা কাজ
তারই ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে কেউ মানে না লাজ।
সকালবেলায় ধরে ভজন গলা ছেড়ে,
যতই সে গায়, বেসুর ততই চলে বেড়ে।
তাই নিয়ে কেউ ঠাট্টা করলে এসে
মহেশ বলে হেসে,
"আমার এ গান শোনাই যাঁরে
বেসুর শুনে হাসেন তিনি, বুক ভরে সেই হাসির পুরস্কারে।
তিনি জানেন, সুর রয়েছে প্রাণের গভীর তলায়,
বেসুর কেবল পাগলের এই গলায়।"
সকল প্রয়োজনের ব্যহির সে যে সৃষ্টিছাড়া,
তার ঘরে তাই সকলে পায় সাড়া।
একটা রোগা কুকুর ছিল, নাম ছিল তার ভুতো,
একদা কার ঘরের দাওয়ায় ঢুকেছিল অনাহূত,
মারের চোটে জরজর
পথের ধারে পড়ে ছিল মর-মর,
খোঁড়া কুকুরটারে
বাঁচিয়ে তুলে রাখলে মহেশ আপন ঘরের দ্বারে।
আরেকটি তার পোষ্য ছিল, ডাক-নাম তার সুর্মি,
কেউ জানে না জাত যে কী তার, মুসলমান কি কাহার কিংবা কুর্মি।
সে-বছরে প্রয়াগেতে কুম্ভমেলায় নেয়ে
ফিরে আসতে পথে দেখে চার বছরের মেয়ে
কেঁদে বেড়ায় বেলা দুপুর দুটোয়।
মা নাকি তার ওলাউঠোয়
মরেছে সেই সকালবেলায়;
মেয়েটি তাই বিষম ভিড়ের ঠেলায়
পাক খেয়ে সে বেড়াচ্ছিল ভয়েই ভেবাচেকা—
মহেশকে যেই দেখা
কী ভেবে যে হাত বাড়াল জানি না কোন্ ভুলে;
অমনি পাগল নিল তারে কাঁধের 'পরে তুলে,
ভোলানাথের জটায় যেন ধুতরোফুলের কুঁড়ি;
সে অবধি তার ঘরের কোণটি জুড়ি

সুর্মি আছে ওই পাগলের পাগলামির এক স্বচ্ছ শীতল ধারা
হিমালয়ে নির্ঝরিণীর পারা।
এখন তাহার বয়স হবে দশ,
খেতে শুতে অষ্টপ্রহর মহেশ তারই বশ।
আছে পাগল ওই মেয়েটির খেলার পুতুল হয়ে
যত্নসেবার অত্যাচারটা সয়ে।
সন্ধ্যাবেলায় পাড়ার থেকে ফিরে
যেমনি মহেশ ঘরের মধ্যে ঢোকে ধীরে ধীরে,
পথ-হারানো মেয়ের বুকে আজো যেন জাগায় ব্যাকুলতা—
বুকের 'পরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে গলা ধ'রে আবোলতাবোল কথা।
এই আদরের প্রথম-বানের টান
হলে অবসান
ওদের বাসায় আমি যেতেম রাতে।
সামান্য কোন্ কথা হত এই পাগলের সাথে।
নাইকো পুঁথি, নাইকো ছবি, নাই কোনো আসবাব,
চিরকালের মানুষ যিনি ওই ঘরে তাঁর ছিল আবির্ভাব।
তারার মতো আপন আলো নিয়ে বুকের তলে—
যে-মানুষটি যুগ হতে যুগান্তরে চলে,
প্রাণখানি যাঁর বাঁশির মতো সীমাহীনের হাতে
সরল সুরে বাজে দিনে রাতে,
যাঁর চরণের স্পর্শে
ধুলায় ধুলায় বসুন্ধরা উঠল কেঁপে হর্ষে,
আমি যেন দেখতে পেতেম তাঁরে
দীনের বাসায়, এই পাগলের ভাঙা ঘরের দ্বারে।
রাজনীতি আর সমাজনীতি পুঁথির যত বুলি
যেতেম সবই ভুলি।
ভুলে যেতেম রাজার কারা মস্ত বড়ো প্রতিনিধি
বালুর 'পরে রেখার মতো গড়ছে রাজ্য, লিখছে বিধান বিধি।

ঠাকুরদাদার ছুটি

তোমার ছুটি নীল আকাশে,
তোমার ছুটি মাঠে,
তোমার ছুটি থইহারা ওই
দিঘির ঘাটে ঘাটে।
তোমার ছুটি তেঁতুলতলায়,
গোলাবাড়ির কোণে,
তোমার ছুটি ঝোপেঝাপে
পারুলডাঙার বনে।

তোমার ছুটির আশা কাঁপে
কাঁচা ধানের খেতে,
তোমার ছুটির খুশি নাচে
নদীর তরঙ্গেতে ।

আমি তোমার চশমা-পরা
বুড়ো ঠাকুরদাদা,
বিষয়-কাজের মাকড়সাটার
বিষম জালে বাঁধা ।
আমার ছুটি সেজে বেড়ায়
তোমার ছুটির সাজে,
তোমার কণ্ঠে আমার ছুটির
মধুর বাঁশি বাজে ।
আমার ছুটি তোমারই ওই
চপল চোখের নাচে,
তোমার ছুটির মাঝখানেতেই
আমার ছুটি আছে ।

তোমার ছুটির খেয়া বেয়ে
শরৎ এল মাঝি ।
শিউলি-কানন সাজায় তোমার
শুভ্র ছুটির সাজি ।
শিশির-হাওয়া শিরশিরিয়ে
কখন রাতারাতি
হিমালয়ের থেকে আসে
তোমার ছুটির সাথি ।
আশ্বিনের এই আলো এল
ফুল-ফোটানো ভোরে
তোমার ছুটির রঙে রঙিন
চাদরখানি প'রে ।

আমার ঘরে ছুটির বন্যা
তোমার লাফে-ঝাঁপে ;
কাজকর্ম হিসাবকিতাব
থরথরিয়ে কাঁপে ।
গলা আমার জড়িয়ে ধর,
ঝাঁপিয়ে পড় কোলে,
সেই তো আমার অসীম ছুটি
প্রাণের তুফান তোলে ।

তোমার ছুটি কে যে জোগায়
জানি নে তার রীত,
আমার ছুটি জোগাও তুমি,
ওইখানে মোর জিত।

হারিয়ে-যাওয়া

ছোট্ট আমার মেয়ে
সঙ্গিনীদের ডাক শুনতে পেয়ে
সিঁড়ি দিয়ে নীচের তলায় যাচ্ছিল সে নেমে
অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে।
হাতে ছিল প্রদীপখানি,
আঁচল দিয়ে আড়াল ক'রে চলছিল সাবধানী।

আমি ছিলাম ছাতে
তারায় ভরা চৈত্রমাসের রাতে।
হঠাৎ মেয়ের কান্না শুনে, উঠে
দেখতে গেলেম ছুটে।
সিঁড়ির মধ্যে যেতে যেতে
প্রদীপটা তার নিবে গেছে বাতাসেতে।
শুধাই তারে, "কী হয়েছে, বামী।"
সে কেঁদে কয় নীচে থেকে, "হারিয়ে গেছি আমি।"

তারায় ভরা চৈত্রমাসের রাতে
ফিরে গিয়ে ছাতে
মনে হল আকাশ-পানে চেয়ে
আমার বামীর মতোই যেন অমনি কে এক মেয়ে
নীলাম্বরের আঁচলখানি ঘিরে
দীপশিখাটি বাঁচিয়ে একা চলছে ধীরে ধীরে।
নিবত যদি আলো, যদি হঠাৎ যেত থামি
আকাশ ভরে উঠত কেঁদে, "হারিয়ে গেছি আমি।"

শেষ গান

যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে ; এই জীবনের সকল সাদা কালো
যাদের আলোক-ছায়ার লীলা ; মনের মানুষ বাইরে বেড়ায় যারা
তাদের প্রাণের ঝর্না-স্রোতে আমার পরান হয়ে হাজার ধারা

চলছে বয়ে চতুর্দিকে। নয় তো কেবল কালের যোগে আয়ু,
নয় সে কেবল দিনরজনীর সাতনলি হার, নয় সে নিশাস-বায়ু।
নানান প্রাণের প্রীতির মিলন নিবিড় হয়ে স্বজন-বন্ধুজনে
পরমায়ুর পাত্রখানি জীবন-সুধায় ভরছে ক্ষণে ক্ষণে।
একের বাঁচন সবার বাঁচার বন্যাবেগে আপন সীমা হারায়
বহু দূরে ; নিমেষগুলির ফলের গুচ্ছ ভরে রসের ধারায়।
অতীত হয়ে তবুও তারা বর্তমানের বৃন্তদোলায় দোলে—
গর্ভ-বাঁধন কাটিয়ে শিশু তবু যেমন মায়ের বক্ষে কোলে
বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের গ্রন্থি দিয়ে। তাই তো যখন শেষে
একে একে আপন জনে সূর্য-আলোর অন্তরালের দেশে
আঁখির নাগাল এড়িয়ে পালায়, তখন রিক্ত শুষ্ক জীবন মম
শীর্ণ রেখায় মিলিয়ে আসে বর্ষাশেষের নির্ঝরিণী-সম
শূন্য বালুর একটি প্রান্তে ক্লান্ত সলিল স্রস্ত অবহেলায়।
তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের সূর্য-ডোবার বেলায়
তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো—
ব'লে নে ভাই, এই যে দেখা এই যে ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সংগমে কান্নাহাসির গঙ্গাযমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
এই ভালো রে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায় ;
তারার সাথে নিশীথ-রাতে ঘুমিয়ে পড়া নূতন প্রাণের আশায়।

শেষ প্রতিষ্ঠা

এই কথা সদা শুনি, "গেছে চলে", "গেছে চলে।"
তবু রাখি ব'লে
বোলো না, "সে নাই।"
সে-কথাটা মিথ্যা, তাই
কিছুতেই সহে না যে,
মর্মে গিয়ে বাজে।

মানুষের কাছে
যাওয়া-আসা ভাগ হয়ে আছে।
তাই তার ভাষা
বহে শুধু আধখানা আশা।
আমি চাই সেইখানে মিলাইতে প্রাণ
যে-সমুদ্রে 'আছে' 'নাই' পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান।

শিশু ভোলানাথ

রবীন্দ্রনাথ

স্ট্রাসবুর্গ। ১৯২১
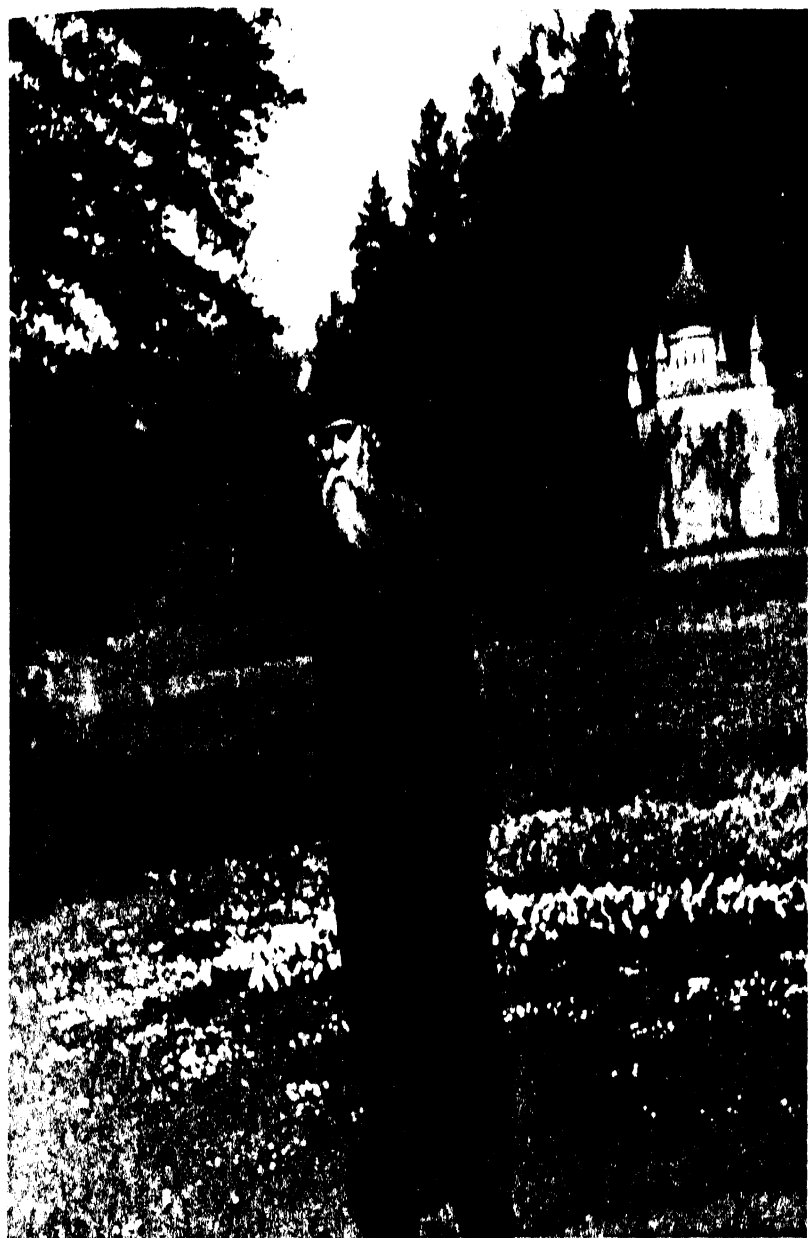
শিশু ভোলানাথ

শিশু ভোলানাথ

ওরে মোর শিশু ভোলানাথ,
তুলি দুই হাত
যেখানে করিস পদপাত
বিষম তাণ্ডবে তোর লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় সব ;
আপন বিভব
আপনি করিস নষ্ট হেলাভরে ;
প্রলয়ের ঘূর্ণচক্র-'পরে
চূর্ণ খেলেনার ধূলি উড়ে দিকে দিকে ;
আপন সৃষ্টিকে
ধ্বংস হতে ধ্বংসমাঝে মুক্তি দিস অনর্গল,
খেলারে করিস রক্ষা ছিন্ন করি খেলেনা-শৃঙ্খল ।

অকিঞ্চন, তোর কাছে কিছুরই তো কোনো মূল্য নাই,
রচিস যা তোর ইচ্ছা তাই
যাহা খুশি তাই দিয়ে,
তার পর ভুলে যাস যাহা ইচ্ছা তাই নিয়ে ।
আবরণ তোরে নাহি পারে সম্বরিতে দিগম্বর,
স্রস্ত ছিন্ন পড়ে ধূলি-'পর ।
লজ্জাহীন সজ্জাহীন বিত্তহীন আপনা-বিস্মৃত,
অন্তরে ঐশ্বর্য তোর, অন্তরে অমৃত ।
দারিদ্র্য করে না দীন, ধূলি তোরে করে না অশুচি,
নৃত্যের বিক্ষোভে তোর সব গ্লানি নিত্য যায় ঘুচি ।

ওরে শিশু ভোলানাথ, মোরে ভক্ত ব'লে
নে রে তোর তাণ্ডবের দলে ;
দে রে চিত্তে মোর
সকল-ভোলার ওই ঘোর,
খেলেনা-ভাঙার খেলা দে আমারে বলি ।
আপন সৃষ্টির বন্ধ আপনি ছিঁড়িয়া যদি চলি
তবে তোর মত্ত নর্তনের চালে
আমার সকল গান ছন্দে ছন্দে মিলে যাবে তালে ।

শিশুর জীবন

ছোটো ছেলে হওয়ার সাহস
আছে কি এক ফোঁটা,
তাই তো এমন বুড়ো হয়েই মরি।
তিলে তিলে জমাই কেবল
জমাই এটা ওটা,
পলে পলে বাক্স বোঝাই করি।
কালকে-দিনের ভাবনা এসে
আজ-দিনেরে মারলে ঠেসে
কাল তুলি ফের পরদিনের বোঝা।
সাধের জিনিস ঘরে এনেই
দেখি, এনে ফল কিছু নেই
খোঁজের পরে আবার চলে খোঁজা।

ভবিষ্যতের ভয়ে ভীত
দেখতে না পাই পথ,
তাকিয়ে থাকি পরশু দিনের পানে,
ভবিষ্যৎ তো চিরকালই
থাকবে ভবিষ্যৎ,
ছুটি তবে মিলবে বা কোন্‌খানে?
বুদ্ধি-দীপের আলো জ্বালি
হাওয়ায় শিখা কাঁপছে খালি,
হিসেব করে পা টিপে পথ হাঁটি।
মন্ত্রণা দেয় কতজনা,
সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা,
পদে-পদে হাজার খুঁটিনাটি।

শিশু হবার ভরসা আবার
জাগুক আমার প্রাণে,
লাগুক হাওয়া নির্ভাবনার পালে,
ভবিষ্যতের মুখোশখানা
খসাব একটানে,
দেখব তারেই বর্তমানের কালে।
ছাদের কোণে পুকুরপারে
জানব নিত্য-অজানারে
মিশিয়ে রবে অচেনা আর চেনা;
জমিয়ে ধুলো সাজিয়ে ঢেলা
তৈরি হবে আমার খেলা,
সুখ রবে মোর বিনামূল্যেই কেনা।

বড়ো হবার দায় নিয়ে, এই
বড়োর হাটে এসে
নিত্য চলে ঠেলাঠেলির পালা।
যাবার বেলায় বিশ্ব আমার
বিকিয়ে দিয়ে শেষে
শুধুই নেব ফাঁকা কথার ডালা!
কোন্‌টা সস্তা, কোন্‌টা দামি
ওজন করতে গিয়ে আমি
বেলা আমার বইয়ে দেব দ্রুত,
সন্ধ্যা যখন আঁধার হবে
হঠাৎ মনে লাগবে তবে
কোনোটাই না হল মনঃপূত।

বাল্য দিয়ে যে-জীবনের
আরম্ভ হয় দিন
বাল্যে আবার হোক-না তাহা সারা।
জলে স্থলে সঙ্গ আবার
পাক-না বাঁধন-হীন,
ধুলায় ফিরে আসুক-না পথহারা।
সম্ভাবনার ডাঙা হতে
অসম্ভবের উতল স্রোতে
দিই-না পাড়ি স্বপন-তরী নিয়ে।
আবার মনে বুঝি না এই,
বস্তু বলে কিছুই তো নেই
বিশ্ব গড়া যা খুশি তাই দিয়ে।

প্রথম যেদিন এসেছিলেম
নবীন পৃথ্বীতলে
রবির আলোয় জীবন মেলে দিয়ে,
সে যেন কোন্ জগৎ-জোড়া
ছেলেখেলার ছলে,
কোথাথেকে কেই বা জানে কী এ!
শিশির যেমন রাতে রাতে,
কে যে তারে লুকিয়ে গাঁথে,
ঝিল্লি বাজায় গোপন ঝিনিঝিনি।
ভোরবেলা যেই চেয়ে দেখি,
আলোর সঙ্গে আলোর এ কী
ইশারাতে চলছে চেনাচিনি।

সেদিন মনে জেনেছিলেম
নীল আকাশের পথে
ছুটির হাওয়ায় ঘুর লাগাল বুঝি!

যা-কিছু সব চলেছে ওই
ছেলেখেলার রথে
যে-যার আপন দোসর খুঁজি খুঁজি ।
গাছে খেলা ফুল-ভরানো
ফুলে খেলা ফল-ধরানো,
ফলের খেলা অঙ্কুরে অঙ্কুরে ।
স্থলের খেলা জলের কোলে,
জলের খেলা হাওয়ার দোলে,
হাওয়ার খেলা আপন বাঁশির সুরে ।

ছেলের সঙ্গে আছ তুমি
নিত্য ছেলেমানুষ,
নিয়ে তোমার মালমসলার ঝুলি ।
আকাশেতে ওড়াও তোমার
কতরকম ফানুস
মেঘে বোলাও রঙ-বেরঙের তুলি ।
সেদিন আমি আপন মনে
ফিরেছিলেম তোমার সনে,
খেলেছিলেম হাত মিলিয়ে হাতে ।
ভাসিয়েছিলেম রাশি রাশি
কথায় গাঁথা কান্নাহাসি
তোমারই সব ভাসান-খেলার সাথে ।

ঋতুর তরী বোঝাই কর
রঙিন ফুলে ফুলে,
কালের স্রোতে যায় তারা সব ভেসে ।
আবার তারা ঘাটে লাগে
হাওয়ায় দুলে দুলে
এই ধরণীর কূলে কূলে এসে ।
মিলিয়েছিলেম বিশ্ব-ডালায়
তোমার ফুলে আমার মালায়
সাজিয়েছিলেম ঋতুর তরণীতে,
আশা আমার আছে মনে
বকুল কেয়া শিউলি -সনে
ফিরে ফিরে আসবে ধরণীতে ।

সেদিন যখন গান গেয়েছি
আপন মনে নিজে,
বিনা কাজে দিন গিয়েছে চলে,
তখন আমি চোখে তোমার
হাসি দেখেছি যে,
চিনেছিলে আমায় সাথি বলে ।

তোমার ধুলো তোমার আলো
আমার মনে লাগত ভালো,
শুনেছিলেম উদাস-করা বাঁশি।
বুঝেছিল সে-ফাল্গুনে
আমার সে-গান শুনে শুনে
তোমারও গান আমি ভালোবাসি।

দিন গেল ওই মাঠে বাটে,
আঁধার নেমে প'ল ;
এপার থেকে বিদায় মেলে যদি
তবে তোমার সন্ধেবেলার
খেয়াতে পাল তোলো,
পার হব এই হাটের ঘাটের নদী।
আবার ওগো শিশুর সাথি,
শিশুর ভুবন দাও তো পাতি,
করব খেলা তোমায় আমায় একা।
চেয়ে তোমার মুখের দিকে
তোমায়, তোমার জগৎটিকে
সহজ চোখে দেখব সহজ দেখা।

৪ কার্তিক ১৩২৮

তালগাছ

তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে।
মনে সাধ, কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়
একেবারে উড়ে যায় ;
কোথা পাবে পাখা সে ?

তাই তো সে ঠিক তার মাথাতে
গোল গোল পাতাতে
ইচ্ছাটি মেলে তার,
মনে মনে ভাবে, বুঝি ডানা এই,
উড়ে যেতে মানা নেই
বাসাখানি ফেলে তার।

সারাদিন ঝরঝর থথর
কাঁপে পাতা-পত্তর,
ওড়ে যেন ভাবে ও,

মনে মনে আকাশেতে বেড়িয়ে
তারাদের এড়িয়ে
যেন কোথা যাবে ও।

তার পরে হাওয়া যেই নেমে যায়,
পাতা-কাঁপা থেমে যায়,
ফেরে তার মনটি —
যেই ভাবে মা যে হয় মাটি তার,
ভালো লাগে আরবার
পৃথিবীর কোণটি।

২ কার্তিক ১৩২৮

বুড়ি

এক যে ছিল চাঁদের কোণায়
চরকা-কাটা বুড়ি
পুরাণে তার বয়স লেখে
সাতশো হাজার কুড়ি।
সাদা সুতোয় জাল বোনে সে
হয় না বুনন সারা
পণ ছিল তার ধরবে জালে
লক্ষ কোটি তারা।

হেনকালে কখন আঁখি,
পড়ল ঘুমে ঢুলে,
স্বপনে তার বয়সখানা
বেবাক গেল ভুলে।
ঘুমের পথে পথ হারিয়ে,
মায়ের কোলে এসে
পূর্ণ চাঁদের হাসিখানি
ছড়িয়ে দিল হেসে।

সন্ধেবেলায় আকাশ চেয়ে
কী পড়ে তার মনে।
চাঁদকে করে ডাকাডাকি,
চাঁদ হাসে আর শোনে।
যে-পথ দিয়ে এসেছিল
স্বপন-সাগর-তীরে
দু-হাত তুলে সে-পথ দিয়ে
চায় সে যেতে ফিরে।

হেনকালে মায়ের মুখে
যেমনি আঁখি তোলে
চাঁদে ফেরার পথখানি যে
তক্‌খনি সে ভোলে।
কেউ জানে না কোথায় বাসা
এল কী পথ বেয়ে,
কেউ জানে না, এই মেয়ে সেই
আদ্যিকালের মেয়ে।

বয়সখানার খ্যাতি তবু
রইল জগৎ জুড়ি—
পাড়ার লোকে যে দেখে সেই
ডাকে, 'বুড়ি বুড়ি'।
সব-চেয়ে যে পুরানো সে,
কোন্ মন্ত্রের বলে
সব-চেয়ে আজ নতুন হয়ে
নামল ধরাতলে।

১৫ ভাদ্র ১৩২৮

রবিবার

সোম মঙ্গল বুধ এরা সব
আসে তাড়াতাড়ি,
এদের ঘরে আছে বুঝি
মস্ত হাওয়া-গাড়ি ?
রবিবার সে কেন, মা গো,
এমন দেরি করে ?
ধীরে ধীরে পৌঁছয় সে
সকল বারের পরে।
আকাশ-পারে তার বাড়িটি
দূর কি সবার চেয়ে ?
সে বুঝি মা তোমার মতো
গরিব-ঘরের মেয়ে ?

সোম মঙ্গল বুধের খেয়াল
থাকবারই জন্যেই,
বাড়ি-ফেরার দিকে ওদের
একটুও মন নেই।
রবিবারকে কে যে এমন
বিষম তাড়া করে,
ঘণ্টাগুলো বাজায় যেন
আধ ঘণ্টার পরে।

আকাশ-পারে বাড়িতে তার
কাজ আছে সব-চেয়ে ?
সে বুঝি, মা, তোমার মতো
গরিব-ঘরের মেয়ে ?

সোম মঙ্গল বুধের যেন
মুখগুলো সব হাঁড়ি
ছোটো ছেলের সঙ্গে তাদের
বিষম আড়াআড়ি ।
কিন্তু শনির রাতের শেষে
যেমনি উঠি জেগে,
রবিবারের মুখে দেখি
হাসিই আছে লেগে ।
যাবার বেলায় যায় সে কেঁদে
মোদের মুখে চেয়ে ।
সে বুঝি, মা, তোমার মতো
গরিব-ঘরের মেয়ে ?

৫ আশ্বিন ১৩২৮

সময়হারা

যত ঘণ্টা, যত মিনিট, সময় আছে যত
শেষ যদি হয় চিরকালের মতো,
তখন স্কুলে নেই বা গেলেম ; কেউ যদি কয় মন্দ,
আমি বলব, 'দশটা বাজাই বন্ধ ।'
তাধিন তাধিন তাধিন ।

শুই নে বলে রাগিস যদি, আমি বলব তোরে,
'রাত না হলে রাত হবে কী করে ।
নটা বাজাই থামল যখন, কেমন করে শুই ?
দেরি বলে নেই তো মা কিচ্ছুই ।'
তাধিন তাধিন তাধিন ।

যত জানিস রূপকথা, মা, সব যদি যাস বলে
রাত হবে না, রাত যাবে না চলে ;
সময় যদি ফুরোয় তবে ফুরোয় না তো খেলা,
ফুরোয় না তো গল্প বলার বেলা ।
তাধিন তাধিন তাধিন ।

মনে পড়া

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু কখন খেলতে গিয়ে
হঠাৎ অকারণে
একটা কী সুর গুনগুনিয়ে
কানে আমার বাজে,
মায়ের কথা মিলায় যেন
আমার খেলার মাঝে।
মা বুঝি গান গাইত, আমার
দোলনা ঠেলে ঠেলে ;
মা গিয়েছে, যেতে যেতে
গানটি গেছে ফেলে।

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন আশ্বিনেতে
ভোরে শিউলিবনে
শিশির-ভেজা হাওয়া বেয়ে
ফুলের গন্ধ আসে,
তখন কেন মায়ের কথা
আমার মনে ভাসে ?
কবে বুঝি আনত মা সেই
ফুলের সাজি বয়ে,
পুজোর গন্ধ আসে যে তাই
মায়ের গন্ধ হয়ে।

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন বসি গিয়ে
শোবার ঘরের কোণে ;
জানলা থেকে তাকাই দূরে
নীল আকাশের দিকে,
মনে হয় মা আমার পানে
চাইছে অনিমিখে।
কোলের 'পরে ধরে কবে
দেখত আমায় চেয়ে,
সেই চাউনি রেখে গেছে
সারা আকাশ ছেয়ে।

৯ আশ্বিন ১৩২৮

পুতুল ভাঙা

'সাত-আটটে সাতাশ', আমি
বলেছিলেম বলে
গুরুমশায় আমার 'পরে
উঠল রাগে জ্বলে ।
মা গো, তুমি পাঁচ পয়সায়
এবার রথের দিনে
সেই যে রঙিন পুতুলখানি
আপনি দিলে কিনে
খাতার নীচে ছিল ঢাকা ;
দেখালে এক ছেলে,
গুরুমশায় রেগেমেগে
ভেঙে দিলেন ফেলে ।
বললেন, 'তোর দিনরাত্তির
কেবল যত খেলা ।
একটুও তোর মন বসে না
পড়াশুনার বেলা !'

মা গো, আমি জানাই কাকে ?
ওঁর কি গুরু আছে ?
আমি যদি নালিশ করি
এক্‌খনি তাঁর কাছে ?
কোনোরকম খেলার পুতুল
নেই কি, মা, ওঁর ঘরে ?
সত্যি কি ওঁর একটুও মন
নেই পুতুলের 'পরে ?
সকাল-সাঁজে তাদের নিয়ে
করতে গিয়ে খেলা
কোনো পড়ায় করেন নি কি
কোনোরকম হেলা ?
ওঁর যদি সেই পুতুল নিয়ে
ভাঙেন কেহ রাগে,
বল্‌ দেখি মা, ওঁর মনে তা
কেমনতরো লাগে ?

৯ আশ্বিন ১৩২৮

মূর্খু

নেই বা হলেম যেমন তোমার
অম্বিকে গোঁসাই।
আমি তো, মা, চাই নে হতে
পণ্ডিতমশাই।
নাই যদি হই ভালো ছেলে,
কেবল যদি বেড়াই খেলে
তুঁতের ডালে খুঁজে বেড়াই
গুটিপোকার গুটি,
মূর্খু হয়ে রইব তবে?
আমার তাতে কীই বা হবে,
মূর্খু যারা তাদেরই তো
সমস্তখন ছুটি।

তারাই তো সব রাখাল ছেলে
গোরু চরায় মাঠে।
নদীর ধারে বনে বনে
তাদের বেলা কাটে।
ডিঙির 'পরে পাল তুলে দেয়,
ঢেউয়ের মুখে নাও খুলে দেয়,
ঝাউ কাটতে যায় চলে সব
নদীপারের চরে।
তারাই মাঠে মাচা পেতে
পাখি তাড়ায় ফসল-খেতে,
বাঁকে করে দই নিয়ে যায়
পাড়ার ঘরে ঘরে।

কাস্তে হাতে চুবড়ি মাথায়,
সন্ধে হলে পরে
ফেরে গাঁয়ে কৃষাণ ছেলে,
মন যে কেমন করে।
যখন গিয়ে পাঠশালাতে
দাগা বুলোই খাতার পাতে,
গুরুমশাই দুপুরবেলায়
বসে বসে ঢোলে,
হাঁকিয়ে গাড়ি কোন্ গাড়োয়ান
মাঠের পথে যায় গেয়ে গান,
শুনে আমি পণ করি যে
মূর্খু হব বলে।

দুপুরবেলায় চিল ডেকে যায় ;
হঠাৎ হাওয়া আসি
বাঁশ-বাগানে বাজায় যেন
সাপ-খেলাবার বাঁশি ।
পুবের দিকে বনের কোলে
বাদল-বেলার আঁচল দোলে,
ডালে ডালে উছলে ওঠে
শিরীষফুলের ঢেউ ।
এরা যে পাঠ-ভোলার দলে
পাঠশালা সব ছাড়তে বলে,
আমি জানি এরা তো, মা,
পণ্ডিত নয় কেউ ।

যাঁরা অনেক পুঁথি পড়েন
তাঁদের অনেক মান ।
ঘরে ঘরে সবার কাছে
তাঁরা আদর পান ।
সঙ্গে তাঁদের ফেরে চেলা
ধুমধামে যায় সারা বেলা,
আমি তো, মা, চাইনে আদর
তোমার আদর ছাড়া ।
তুমি যদি মুর্খু বলে
আমাকে মা না নাও কোলে
তবে আমি পালিয়ে যাব
বাদলা মেঘের পাড়া ।

সেখান থেকে বৃষ্টি হয়ে
ভিজিয়ে দেব চুল ।
ঘাটে যখন যাবে, আমি
করব হুলুস্থুল ।
রাত থাকতে অনেক ভোরে
আসব নেমে আঁধার করে,
ঝড়ের হাওয়ায় ঢুকব ঘরে
দুয়ার ঠেলে ফেলে,
তুমি বলবে মেলে আঁখি,
‘দুষ্টু দেয়া খেপল না কি ?’
আমি বলব, ‘খেপেছে আজ
তোমার মুর্খু ছেলে ।’

১০ আশ্বিন ১৩২৮

সাত সমুদ্র পারে

দেখছ না কি, নীল মেঘে আজ
আকাশ অন্ধকার।
সাত সমুদ্র তেরো নদী
আজকে হব পার।
নাই গোবিন্দ, নাই মুকুন্দ,
নাইকো হরিশ খোঁড়া।
তাই ভাবি যে কাকে আমি
করব আমার ঘোড়া।

কাগজ ছিঁড়ে এনেছি এই
বাবার খাতা থেকে,
নৌকো দে-না বানিয়ে, অমনি
দিস, মা, ছবি এঁকে।
রাগ করবেন বাবা বুঝি
দিল্লী থেকে ফিরে ?
ততক্ষণ যে চলে যাব
সাত সমুদ্র তীরে।

এমনি কি তোর কাজ আছে, মা,
কাজ তো রোজই থাকে।
বাবার চিঠি এক্‌খুনি কি
দিতেই হবে ডাকে ?
নাই বা চিঠি ডাকে দিলে
আমার কথা রাখো,
আজকে নাহয় বাবার চিঠি
মাসি লিখুন-নাকো !

আমার এ যে দরকারি কাজ
বুঝতে পার না কি ?
দেরি হলেই একেবারে
সব যে হবে ফাঁকি।
মেঘ কেটে যেই রোদ উঠবে
বৃষ্টি বন্ধ হলে,
সাত সমুদ্র তেরো নদী
কোথায় যাবে চলে !

১০ আশ্বিন ১৩২৮

জ্যোতিষী

ওই-যে রাতের তারা
জানিস কি মা, কারা ?
সারাটিখন ঘুম না জানে
চেয়ে থাকে মাটির পানে
যেন কেমনধারা !
আমার যেমন নেইকো ডানা,
আকাশ-পানে উড়তে মানা,
মনটা কেমন করে,
তেমনি ওদের পা নেই বলে
পারে না যে আসতে চলে
এই পৃথিবীর 'পরে ।

সকালে যে নদীর বাঁকে
জল নিতে যাস কলসি কাঁখে
সজনেতলার ঘাটে,
সেথায় ওদের আকাশ থেকে
আপন ছায়া দেখে দেখে
সারা পহর কাটে ।
ভাবে ওরা চেয়ে চেয়ে
'হতেম যদি গাঁয়ের মেয়ে
তবে সকাল-সাঁজে
কলসিখানি ধরে বুকে
সাঁতরে নিতেম মনের সুখে
ভরা নদীর মাঝে' ।

আর আমাদের ছাতের কোণে
তাকায়, যেথা গভীর বনে
রাক্ষসদের ঘরে
রাজকন্যা ঘুমিয়ে থাকে,
সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তাকে
জাগাই শয্যা'পরে ।
ভাবে ওরা, আকাশ ফেলে
হত যদি তোমার ছেলে,
এইখানে এই ছাতে
দিন কাটাত খেলায় খেলায়
তার পরে সেই রাতের বেলায়
ঘুমোত তোর সাথে ।

যেদিন আমি নিষুত রাতে
হঠাৎ উঠি বিছানাতে
স্বপন থেকে জেগে

জানলা দিয়ে দেখি চেয়ে
তারাগুলি আকাশ ছেয়ে
ঝাপসা আছে মেঘে।
বসে বসে ক্ষণে ক্ষণে
সেদিন আমার হয় যে মনে
ওদের স্বপ্ন বলে।
অন্ধকারের ঘুম লাগে যেই
ওরা আসে সেই পহরেই,
ভোরবেলা যায় চলে।
আঁধার রাতি অন্ধ ও যে,
দেখতে না পায়, আলো খোঁজে,
সবই হারিয়ে ফেলে।
তাই আকাশে মাদুর পেতে
সমস্তখন স্বপনেতে
দেখা-দেখা খেলে।

১০ আশ্বিন ১৩২৮

খেলা-ভোলা

তুই কি ভাবিস, দিনরাত্তির
খেলতে আমার মন ?
কক্‌খনো তা সত্যি না মা—
আমার কথা শোন্।
সেদিন ভোরে দেখি উঠে
বৃষ্টিবাদল গেছে ছুটে;
রোদ উঠেছে ঝিলমিলিয়ে
বাঁশের ডালে ডালে ;
ছুটির দিনে কেমন সুরে
পুজোর সানাই বাজছে দূরে,
তিনটে শালিখ ঝগড়া করে
রান্নাঘরের চালে—
খেলনাগুলো সামনে মেলি
কী যে খেলি, কী যে খেলি,
সেই কথাটাই সমস্তখন
ভাবনু আপন মনে !
লাগল না ঠিক কোনো খেলাই,
কেটে গেল সারাবেলাই,
রেলিঙ ধরে রইনু বসে
বারান্দাটার কোণে।

খেলা-ভোলার দিন মা, আমার
আসে মাঝে মাঝে ।
সেদিন আমার মনের ভিতর
কেমনতরো বাজে ।
শীতের বেলায় দুই পহরে
দূরে কাদের ছাতের 'পরে
ছোট্ট মেয়ে রোদ্‌দুরে দেয়
বেগ্‌নি রঙের শাড়ি ।
চেয়ে চেয়ে চুপ করে রই,
তেপান্তরের পার বুঝি ওই,
মনে ভাবি ওইখানেতেই
আছে রাজার বাড়ি ।
থাকত যদি মেঘে-ওড়া
পক্ষিরাজের বাচ্ছা ঘোড়া
তক্‌খুনি যে যেতেম তারে
লাগাম দিয়ে কষে ।
যেতে যেতে নদীর তীরে
ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীরে
পথ শুধিয়ে নিতেম আমি
গাছের তলায় বসে ।

এক-এক দিন যে দেখেছি, তুই
বাবার চিঠি হাতে
চুপ করে কী ভাবিস বসে
ঠেস দিয়ে জানলাতে
মনে হয় তোর মুখে চেয়ে
তুই যেন কোন্ দেশের মেয়ে,
যেন আমার অনেক কালের
অনেক দূরের মা ।
কাছে গিয়ে হাতখানি ছুঁই
হারিয়ে-ফেলা মা যেন তুই,
মাঠ-পারে কোন্ বটের তলার
বাঁশির সুরের মা ।
খেলার কথা যায় যে ভেসে,
মনে ভাবি কোন্ কালে সে
কোন্ দেশে তোর বাড়ি ছিল
কোন্ সাগরের কূলে ।
ফিরে যেতে ইচ্ছে করে
অজানা সেই দ্বীপের ঘরে
তোমায় আমায় ভোরবেলাতে
নৌকোতে পাল তুলে ।

১১ আশ্বিন ১৩২৮

পথহারা

আজকে আমি কতদূর যে
গিয়েছিলেম চলে !
যত তুমি ভাবতে পারো
তার চেয়ে সে অনেক আরো,
শেষ করতে পারব না তা
তোমায় ব'লে ব'লে ।

অনেক দূর সে, আরো দূর সে,
আরো অনেক দূর ।
মাঝখানেতে কত যে বেত,
কত যে বাঁশ, কত যে খেত,
ছাড়িয়ে ওদের ঠাকুরবাড়ি
ছাড়িয়ে তালিমপুর ।

পেরিয়ে গেলেম যেতে যেতে
সাত-কুশি সব গ্রাম,
ধানের গোলা গুনব কত
জোদ্দারদের গোলার মতো,
সেখানে যে মোড়ল কারা
জানি নে তার নাম ।

একে একে মাঠ পেরোলুম
কত মাঠের পরে ।
তার পরে, উঃ, বলি মা শোন্,
সামনে এল প্রকাণ্ড বন,
ভিতরে তার ঢুকতে গেলে
গা ছম্‌ছম্ করে ।

জামতলাতে বুড়ি ছিল,
বললে 'খবরদার' !
আমি বললেম বারণ শুনে
'ছ-পণ কড়ি এই নে গুনে',
যতক্ষণ সে গুনতে থাকে
হয়ে গেলেম পার ।

কিছুরই শেষ নেই কোত্থাও
আকাশ পাতাল জুড়ি ।
যতই চলি যতই চলি
বেড়েই চলে বনের গলি,
কালো মুখোশপরা আঁধার
সাজল জুজুবুড়ি ।

খেজুরগাছের মাথায় বসে
দেখছে কারা ঝুঁকি ।
কারা যে সব ঝোপের পাশে
একটুখানি মুচকে হাসে,
বেঁটে বেঁটে মানুষগুলো
কেবল মারে উঁকি ।

আমায় যেন চোখ টিপছে
বুড়ো গাছের গুঁড়ি ।
লম্বা লম্বা কাদের পা যে
ঝুলছে ডালের মাঝে মাঝে,
মনে হচ্ছে পিঠে আমার
কে দিল সুড়সুড়ি ।

ফিসফিসিয়ে কইছে কথা
দেখতে না পাই কে সে ।
অন্ধকারে দুদ্দাড়িয়ে
কে যে কারে যায় তাড়িয়ে,
কী জানি কী গা চেটে যায়
হঠাৎ কাছে এসে ।

ফুরোয় না পথ ভাবছি আমি
ফিরব কেমন করে ।
সামনে দেখি কিসের ছায়া,
ডেকে বলি, ‘শেয়াল ভায়া,
মায়ের গাঁয়ের পথ তোরা কেউ
দেখিয়ে দে-না মোরে ।’

কয় না কিছুই, চুপটি করে
কেবল মাথা নাড়ে ।
সিঙ্গিমামা কোথা থেকে
হঠাৎ কখন এসে ডেকে
কে জানে মা, হালুম ক’রে
পড়ল যে কার ঘাড়ে ।

বল্ দেখি তুই, কেমন করে
ফিরে পেলেম মাকে ?
কেউ জানে না কেমন করে ;
কানে কানে বলব তোরে ?
যেমনি স্বপন ভেঙে গেল
সিঙ্গিমামার ডাকে ।

১৫ আশ্বিন ১৩২৮

সংশয়ী

কোথায় যেতে ইচ্ছে করে
শুধাস কি মা, তাই ?
যেখান থেকে এসেছিলেম
সেথায় যেতে চাই ।
কিন্তু সে যে কোন্ জায়গা
ভাবি অনেকবার ।
মনে আমার পড়ে না তো
একটুখানি তার ।
ভাবনা আমার দেখে বাবা
বললে সেদিন হেসে,
'সে-জায়গাটি মেঘের পারে
সন্ধ্যাতারার দেশে ।'
তুমি বল, 'সে-দেশখানি
মাটির নীচে আছে,
যেখান থেকে ছাড়া পেয়ে
ফুল ফোটে সব গাছে ।'
মাসি বলে, 'সে-দেশ আমার
আছে সাগরতলে,
যেখানেতে আঁধার ঘরে
লুকিয়ে মানিক জ্বলে ।'
দাদা আমার চুল টেনে দেয়,
বলে, 'বোকা ওরে,
হাওয়ায় সে-দেশ মিলিয়ে আছে,
দেখবি কেমন করে ?'
আমি শুনে ভাবি, আছে
সকল জায়গাতেই
সিধু মাস্টার বলে শুধু,
'কোনোখানেই নেই ।'

রাজা ও রানী

এক যে ছিল রাজা
সেদিন আমায় দিল সাজা ।
ভোরের রাতে উঠে
আমি গিয়েছিলুম ছুটে,
দেখতে ডালিম গাছে
বনের পিরভু কেমন নাচে ।
ডালে ছিলেম চড়ে,
সেটা ভেঙেই গেল পড়ে ।

সেদিন হল মানা
আমার পেয়ারা পেড়ে আনা,
রথ দেখতে যাওয়া,
আমার চিঁড়ের পুলি খাওয়া।
কে দিল সেই সাজা,
জান কে ছিল সেই রাজা?

এক যে ছিল রানী
আমি তার কথা সব মানি।
সাজার খবর পেয়ে
আমায় দেখল কেবল চেয়ে।
বললে না তো কিছু,
কেবল মুখটি করে নিচু
আপন ঘরে গিয়ে
সেদিন রইল আগল দিয়ে।
হল না তার খাওয়া,
কিংবা রথ দেখতে যাওয়া।
নিল আমায় কোলে
সাজার সময় সারা হলে।
গলা ভাঙা-ভাঙা
তার চোখ-দুখানি রাঙা।
কে ছিল সেই রানী
আমি জানি জানি জানি।

দূর

পুজোর ছুটি আসে যখন
বকসারেতে যাবার পথে—
দূরের দেশে যাচ্ছি ভেবে
ঘুম হয় না কোনোমতে।
সেখানে যেই নতুন বাসায়
হপ্তা দুয়েক খেলায় কাটে
দূর কি আবার পালিয়ে আসে
আমাদেরই বাড়ির ঘাটে!
দূরের সঙ্গে কাছের কেবল
কেনই যে এই লুকোচুরি,
দূর কেন যে করে এমন
দিনরাত্তির ঘোরাঘুরি।
আমরা যেমন ছুটি হলে
ঘরবাড়ি সব ফেলে রেখে
রেলে চড়ে পশ্চিমে যাই
বেরিয়ে পড়ি দেশের থেকে,

তেমনিতরো সকালবেলা
ছুটিয়ে আলো আকাশেতে
রাতের থেকে দিন যে বেরোয়
দূরকে বুঝি খুঁজে পেতে ?
সে-ও তো যায় পশ্চিমেতেই,
ঘুরে ঘুরে সন্ধে হলে,
তখন দেখে রাতের মাঝেই
দূর সে আবার গেছে চলে ।
সবাই যেন পলাতকা
মন টেঁকে না কাছের বাসায় ।
দলে দলে পলে পলে
কেবল চলে দূরের আশায় ।
পাতায় পাতায় পায়ের ধ্বনি,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ডাকাডাকি,
হাওয়ায় হাওয়ায় যাওয়ার বাঁশি
কেবল বাজে থাকি থাকি ।
আমায় এরা যেতে বলে,
যদি বা যাই, জানি তবে
দূরকে খুঁজে খুঁজে শেষে
মায়ের কাছেই ফিরতে হবে ।

বাউল

দূরে অশথ তলায়
পুঁতির কণ্ঠিখানি গলায়
বাউল দাঁড়িয়ে কেন আছ ?
সামনে আঙিনাতে
তোমার একতারাটি হাতে
তুমি সুর লাগিয়ে নাচো !
পথে করতে খেলা
আমার কখন হল বেলা
আমায় শাস্তি দিল তাই ।
ইচ্ছে হোথায় নাবি
কিন্তু ঘরে বন্ধ চাবি
আমার বেরোতে পথ নাই ।
বাড়ি ফেরার তরে
তোমায় কেউ না তাড়া করে
তোমার নাই কোনো পাঠশালা ।
সমস্ত দিন কাটে
তোমার পথে ঘাটে মাঠে
তোমার ঘরেতে নেই তালা ।

তাই তো তোমার নাচে
আমার প্রাণ যেন ভাই বাঁচে—
আমার মন যেন পায় ছুটি।
ওগো তোমার নাচে
যেন ঢেউয়ের দোলা আছে,
ঝড়ে গাছের লুটোপুটি।
অনেক দূরের দেশ
আমার চোখে লাগায় রেশ,
যখন তোমায় দেখি পথে।
দেখতে যে পায় মন
যেন নাম-না-জানা বন
কোন্ পথহারা পর্বতে।
হঠাৎ মনে লাগে,
যেন অনেক দিনের আগে,
আমি অমনি ছিলেম ছাড়া।
সেদিন গেল ছেড়ে,
আমার পথ নিল কে কেড়ে,
আমার হারাল একতারা।
কে নিল গো টেনে,
আমায় পাঠশালাতে এনে,
আমার এল গুরুমশায়।
মন সদা যার চলে
যত ঘরছাড়াদের দলে
তারে ঘরে কেন বসায়?
কও তো আমায় ভাই,
তোমার গুরুমশায় নাই?
আমি যখন দেখি ভেবে
বুঝতে পারি খাঁটি,
তোমার বুকের একতারাটি,
তোমায় ওই তো পড়া দেবে।
তোমার কানে কানে
ওরই গুনগুনানি গানে
তোমায় কোন্ কথা যে কয়!
সব কি তুমি বোঝ?
তারই মানে যেন খোঁজ
কেবল ফিরে ভুবনময়।
ওরই কাছে বুঝি
আছে তোমার নাচের পুঁজি,
তোমার খেপা পায়ের ছুটি?
ওরই সুরের বোলে
তোমার গলার মালা দোলে

তোমার দোলে মাথার ঝুঁটি।
মন যে আমার পালায়
তোমার একতারা-পাঠশালায়,
আমায় ভুলিয়ে দিতে পার ?
নেবে আমায় সাথে ?
এ-সব পণ্ডিতেরই হাতে
আমায় কেন সবাই মার ?
ভুলিয়ে দিয়ে পড়া
আমায় শেখাও সুরে-গড়া
তোমার তালা-ভাঙার পাঠ।
আর কিছু না চাই,
যেন আকাশখানা পাই,
আর পালিয়ে যাবার মাঠ।
দূরে কেন আছ ?
দ্বারের আগল ধরে নাচো,
বাউল আমারই এইখানে।
সমস্ত দিন ধ'রে
যেন মাতন ওঠে ভ'রে
তোমার ভাঙন-লাগা গানে।

দুষ্টু

তোমার কাছে আমিই দুষ্টু
ভালো যে আর সবাই।
মিত্তিরদের কালু নীলু
ভারি ঠাণ্ডা ক-ভাই !
যতীশ ভালো, সতীশ ভালো,
ন্যাড়া নবীন ভালো,
তুমি বল ওরাই কেমন
ঘর করে রয় আলো।
মাখনবাবুর দুটি ছেলে
দুষ্টু তো নয় কেউ—
গেটে তাদের কুকুর বাঁধা
করতেছে ঘেউ ঘেউ।
পাঁচকড়ি ঘোষ লক্ষ্মী ছেলে,
দত্তপাড়ার গবাই,
তোমার কাছে আমিই দুষ্টু
ভালো যে আর সবাই।
তোমার কথা আমি যেন
শুনি নে কক্‌খনোই,

জামাকাপড় যেন আমার
সাফ থাকে না কোনোই !
খেলা করতে বেলা করি,
বৃষ্টিতে যাই ভিজে,
দুষ্টুপনা আরো আছে
অমনি কত কী যে !
বাবা আমার চেয়ে ভালো ?
সত্যি বলো তুমি,
তোমার কাছে করেন নি কি
একটুও দুষ্টুমি ?
যা বল সব শোনেন তিনি,
কিচ্ছু ভোলেন নাকো ?
খেলা ছেড়ে আসেন চলে
যেমনি তুমি ডাকো ?

ইচ্ছামতী

যখন যেমন মনে করি
তাই হতে পাই যদি
আমি তবে এক্‌খনি হই
ইচ্ছামতী নদী ।
রইবে আমার দখিন ধারে
সূর্য ওঠার পার,
বাঁয়ের ধারে সন্ধেবেলায়
নামবে অন্ধকার ।
আমি কইব মনের কথা
দুই পারেরই সাথে,
আধেক কথা দিনের বেলায়,
আধেক কথা রাতে ।

যখন ঘুরে ঘুরে বেড়াই
আপন গাঁয়ের ঘাটে
ঠিক তখনি গান গেয়ে যাই
দূরের মাঠে মাঠে ।
গাঁয়ের মানুষ চিনি, যারা
নাইতে আসে জলে,
গোরু মহিষ নিয়ে যারা
সাঁতরে ওপার চলে ।

দূরের মানুষ যারা তাদের
নতুনতরো বেশ,
নাম জানি নে, গ্রাম জানি নে
অদ্ভুতের একশেষ।

জলের উপর ঝলোমলো
টুকরো আলোর রাশি।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে পরীর নাচন,
হাততালি আর হাসি।
নীচের তলায় তলিয়ে যেথায়
গেছে ঘাটের ধাপ
সেইখানেতে কারা সবাই
রয়েছে চুপচাপ।
কোণে কোণে আপন মনে
করছে তারা কী কে।
আমারই ভয় করবে কেমন
তাকাতে সেই দিকে।

গাঁয়ের লোকে চিনবে আমার
কেবল একটুখানি।
বাকি কোথায় হারিয়ে যাবে
আমিই সে কি জানি?
একধারেতে মাঠে ঘাটে
সবুজ বরন শুধু,
আর-এক ধারে বালুর চরে
রৌদ্র করে ধূ ধূ।
দিনের বেলায় যাওয়া আসা,
রাত্তিরে থম্ থম্!
ডাঙার পানে চেয়ে চেয়ে
করবে গা ছম্ ছম্।

২৩ আশ্বিন ১৩২৮

অন্য মা

আমার মা না হয়ে তুমি
আর-কারো মা হলে
ভাবছ তোমায় চিনতেম না,
যেতেম না ওই কোলে?
মজা আরো হত ভারি,
দুই জায়গায় থাকত বাড়ি,
আমি থাকতেম এই গাঁয়েতে,
তুমি পারের গাঁয়ে।

এইখানেতেই দিনের বেলা
যা-কিছু সব হত খেলা
দিন ফুরোলেই তোমার কাছে
পেরিয়ে যেতেম নায়ে।
হঠাৎ এসে পিছন দিকে
আমি বলতেম, 'বল্ দেখি কে ?'
তুমি ভাবতে, চেনার মতো,
চিনি নে তো তবু।
তখন কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে
আমি বলতেম গলা ধরে—
'আমায় তোমার চিনতে হবেই,
আমি তোমার অবু !'

ওই পারেতে যখন তুমি
আনতে যেতে জল,
এই পারেতে তখন ঘাটে
বল্ দেখি কে বল্ ?
কাগজ-গড়া নৌকোটিকে
ভাসিয়ে দিতেম তোমার দিকে,
যদি গিয়ে পৌঁছোত সে
বুঝতে কি, সে কার ?
সাঁতার আমি শিখি নি যে
নইলে আমি যেতেম নিজে,
আমার পারের থেকে আমি
যেতেম তোমার পার।
মায়ের পারে অবুর পারে
থাকত তফাত, কেউ তো কারে
ধরতে গিয়ে পেত নাকো,
রইত না একসাথে।
দিনের বেলায় ঘুরে ঘুরে
দেখা-দেখি দূরে দূরে—
সন্ধেবেলায় মিলে যেত
অবুতে আর মাতে।

কিন্তু হঠাৎ কোনোদিনে
যদি বিপিন মাঝি
পার করতে তোমার পারে
নাই হত মা রাজি।
ঘরে তোমার প্রদীপ জ্বেলে
ছাতের 'পরে মাদুর মেলে
বসতে তুমি, পায়ের কাছে
বসত ক্ষান্তবুড়ি,

উঠত তারা সাত ভায়েতে,
ডাকত শেয়াল ধানের খেতে,
উড়ো ছায়ার মতো বাদুড়
কোথায় যেত উড়ি।
তখন কি মা, দেরি দেখে
ভয় হত না থেকে থেকে
পার হয়ে মা, আসতে হতই
অবু যেথায় আছে।
তখন কি আর ছাড়া পেতে ?
দিতেম কি আর ফিরে যেতে ?
ধরা পড়ত মায়ের ওপার
অবুর পারের কাছে।

দুয়োরানী

ইচ্ছে করে, মা, যদি তুই
হতিস দুয়োরানী !
ছেড়ে দিতে এমনি কি ভয়
তোমার এ ঘরখানি।
ওইখানে ওই পুকুরপারে
জিয়ল গাছের বেড়ার ধারে
ও যেন ঘোর বনের মধ্যে
কেউ কোত্থাও নেই।
ওইখানে ঝাউতলা জুড়ে
বাঁধব তোমার ছোট্ট কুঁড়ে,
শুকনো পাতা বিছিয়ে ঘরে
থাকব দুজনেই।
বাঘ ভাল্লুক অনেক আছে,
আসবে না কেউ তোমার কাছে,
দিনরাত্তির কোমর বেঁধে
থাকব পাহারাতে।
রাক্ষসেরা ঝোপে ঝাড়ে
মারবে উঁকি আড়ে আড়ে,
দেখবে আমি দাঁড়িয়ে আছি
ধনুক নিয়ে হাতে।

আঁচলেতে খই নিয়ে তুই
যেই দাঁড়াবি দ্বারে
অমনি যত বনের হরিণ
আসবে সারে সারে।

শিঙগুলি সব আঁকাবাঁকা,
গায়েতে দাগ চাকা চাকা,
লুটিয়ে তারা পড়বে ভুঁয়ে
পায়ের কাছে এসে।
ওরা সবাই আমায় বোঝে,
করবে না ভয় একটুও যে,
হাত বুলিয়ে দেব গায়ে,
বসবে কাছে ঘেঁষে।
ফলসা-বনে গাছে গাছে
ফল ধরে মেঘ করে আছে,
ওইখানেতে ময়ূর এসে
নাচ দেখিয়ে যাবে।
শালিখরা সব মিছিমিছি
লাগিয়ে দেবে কিচিমিচি,
কাঠবেড়ালি লেজটি তুলে
হাত থেকে ধান খাবে।

দিন ফুরোবে, সাঁঝের আঁধার
নামবে তালের গাছে।
তখন এসে ঘরের কোণে
বসব কোলের কাছে।
থাকবে না তোর কাজ কিছু তো,
রইবে না তোর কোনো ছুতো,
রূপকথা তোর বলতে হবে
রোজই নতুন করে।
সীতার বনবাসের ছড়া
সবগুলি তোর আছে পড়া ;
সুর করে তাই আগাগোড়া
গাইতে হবে তোরে।
তার পরে যেই অশথবনে
ডাকবে পেঁচা, আমার মনে
একটুখানি ভয় করবে
রাত্রি নিষুত হলে।
তোমার বুকে মুখটি গুঁজে
ঘুমেতে চোখ আসবে বুজে—
তখন আবার বাবার কাছে
যাস নে যেন চলে !

১৪ আশ্বিন ১৩২৮

রাজমিস্ত্রী

বয়স আমার হবে তিরিশ,
দেখতে আমায় ছোটো,
আমি নই মা, তোমার শিরিশ,
আমি হচ্ছি নোটো।
আমি যে রোজ সকাল হলে
যাই শহরের দিকে চলে
তমিজ মিঞার গোরুর গাড়ি চড়ে।
সকাল থেকে সারা দুপুর
ইঁট সাজিয়ে ইঁটের উপর
খেয়ালমতো দেয়াল তুলি গড়ে।
ভাবছ তুমি নিয়ে ঢেলা
ঘর-গড়া সে আমার খেলা,
কক্‌খনো না সত্যিকার সে কোঠা।
ছোটো বাড়ি নয় তো মোটে,
তিনতলা পর্যন্ত ওঠে,
থামগুলো তার এমনি মোটা মোটা।
কিন্তু যদি শুধাও আমায়
ওইখানেতেই কেন থামায়?
দোষ কী ছিল যাট-সত্তর তলা?
ইঁট সুরকি জুড়ে জুড়ে
একেবারে আকাশ ফুঁড়ে
হয় না কেন কেবল গেঁথে চলা?
গাঁথতে গাঁথতে কোথায় শেষে
ছাত কেন না তারায় মেশে?
আমিও তাই ভাবি নিজে নিজে।
কোথাও গিয়ে কেন থামি
যখন শুধাও, তখন আমি
জানি নে তো তার উত্তর কী যে।

যখন খুশি ছাতের মাথায়
উঠছি ভারা বেয়ে।
সত্যি কথা বলি, তাতে
মজা খেলার চেয়ে।
সমস্ত দিন ছাত-পিটুনি
গান গেয়ে ছাত পিটোয় শুনি,
অনেক নীচে চলছে গাড়িঘোড়া।
বাসনওয়ালা থালা বাজায়;
সুর করে ওই হাঁক দিয়ে যায়
আতাওয়ালা নিয়ে ফলের ঝোড়া।

সাড়ে চারটে বেজে ওঠে,
ছেলেরা সব বাসায় ছোটে
হো হো করে উড়িয়ে দিয়ে ধুলো।
রোদ্‌দুর যেই আসে পড়ে
পুবের মুখে কোথায় ওড়ে
দলে দলে ডাক দিয়ে কাকগুলো।
আমি তখন দিনের শেষে
ভারার থেকে নেমে এসে
আবার ফিরে আসি আপন গাঁয়ে।
জান তো, মা, আমার পাড়া
যেখানে ওই খুঁটি গাড়া
পুকুরপাড়ে গাজনতলার বাঁয়ে।
তোরা যদি শুধাস মোরে
খড়ের চালায় রই কী করে?
কোঠা যখন গড়তে পারি নিজে;
আমার ঘর যে কেন তবে
সব-চেয়ে না বড়ো হবে—
জানি নে তো তার উত্তর কী যে!

৬ কার্তিক ১৩২৮

ঘুমের তত্ত্ব

জাগার থেকে ঘুমোই, আবার
ঘুমের থেকে জাগি—
অনেক সময় ভাবি মনে
কেন, কিসের লাগি?
আমাকে, মা, যখন তুমি
ঘুম পাড়িয়ে রাখ
তখন তুমি হারিয়ে গিয়ে
তবু হারাও নাকো।
রাতে সূর্য, দিনে তারা
পাই নে, হাজার খুঁজি।
তখন তা'রা ঘুমের সূর্য,
ঘুমের তারা বুঝি?
শীতের দিনে কনকচাঁপা
যায় না দেখা গাছে,
ঘুমের মধ্যে লুকিয়ে থাকে
নেই তবুও আছে।
রাজকন্যে থাকে, আমার
সিঁড়ির নীচের ঘরে।

দাদা বলে, 'দেখিয়ে দে তো',
বিশ্বাস না করে।
কিন্তু, মা, তুই জানিস নে কি
আমার সে রাজকন্যে
ঘুমের তলায় তলিয়ে থাকে,
দেখি নে সেইজন্যে।

নেই তবুও আছে এমন
নেই কি কত জিনিস ?
আমি তাদের অনেক জানি,
তুই কি তাদের চিনিস ?
যেদিন তাদের রাত পোয়াবে
উঠবে চক্ষু মেলি
সেদিন তোমার ঘরে হবে
বিষম ঠেলাঠেলি।
নাপিত ভায়া, শেয়াল ভায়া,
ব্যাঙ্গমা বেঙ্গমী
ভিড় ক'রে সব আসবে যখন
কী যে করবে তুমি !
তখন তুমি ঘুমিয়ে পোড়ো
আমিই জেগে থেকে
নানারকম খেলায় তাদের
দেব ভুলিয়ে রেখে।
তার পরে যেই জাগবে তুমি
লাগবে তাদের ঘুম,
তখন কোথাও কিচ্ছুই নেই
সমস্ত নিজ্‌ঝুম।

২৭ আশ্বিন ১৩২৮

দুই আমি

বৃষ্টি কোথায় নুকিয়ে বেড়ায়
উড়ো মেঘের দল হয়ে,
সেই দেখা দেয় আর-এক ধারায়
শ্রাবণ-ধারার জল হয়ে।
আমি ভাবি চুপটি করে
মোর দশা হয় ওই যদি !
কেই বা জানে আমি আবার
আর-একজনও হই যদি !

একজনারেই তোমরা চেন
আর-এক আমি কারোই না।
কেমনতরো ভাবখানা তার
মনে আনতে পারোই না।
হয়তো বা ওই মেঘের মতোই
নতুন নতুন রূপ ধরে
কখন সে যে ডাক দিয়ে যায়,
কখন থাকে চুপ করে।
কখন বা সে পুবের কোণে
আলো-নদীর বাঁধ বাঁধে,
কখন বা সে আধেক রাতে
চাঁদকে ধরার ফাঁদ ফাঁদে।
শেষে তোমার ঘরের কথা
মনেতে তার যেই আসে,
আমার মতন হয়ে আবার
তোমার কাছে সেই আসে।
আমার ভিতর লুকিয়ে আছে
দুই রকমের দুই খেলা,
একটা সে ওই আকাশ-ওড়া,
আরেকটা এই ভুঁই-খেলা।

২৮ আশ্বিন ১৩২৮

মর্তবাসী

কাকা বলেন, সময় হলে
সবাই চ'লে
যাই কোথা সেই স্বর্গ-পারে।
বল্ তো কাকী
সত্যি তা কি
একেবারে?
তিনি বলেন, যাবার আগে
তন্দ্রা লাগে
ঘণ্টা কখন ওঠে বাজি,
দ্বারের পাশে
তখন আসে
ঘাটের মাঝি।
বাবা গেছেন এমনি করে
কখন ভোরে
তখন আমি বিছানাতে।

তেমনি মাখন
গেল কখন
অনেক রাতে।
কিন্তু আমি বলছি তোমায়
সকল সময়
তোমার কাছেই করব খেলা,
রইব জোরে
গলা ধরে
রাতের বেলা।
সময় হলে মানব না তো,
জানব না তো,
ঘণ্টা মাঝির বাজল কবে।
তাই কি রাজা
দেবেন সাজা
আমায় তবে ?
তোমরা বল, স্বর্গ ভালো
সেথায় আলো
রঙে রঙে আকাশ রাঙায়,
সারা বেলা
ফুলের খেলা
পারুলডাঙায় !
হোক-না ভালো যত ইচ্ছে—
কেড়ে নিচ্ছে
কেই বা তাকে বলো, কাকী ?
যেমন আছি
তোমার কাছেই
তেমনি থাকি !
ওই আমাদের গোলাবাড়ি,
গোরুর গাড়ি
পড়ে আছে চাকা-ভাঙা,
গাবের ডালে
পাতার লালে
আকাশ রাঙা।
সেথা বেড়ায় যক্ষীবুড়ি
গুড়িগুড়ি
আসশেওড়ার ঝোপে ঝাপে।
ফুলের গাছে
দোয়েল নাচে
ছায়া কাঁপে।
লুকিয়ে আমি সেথা পলাই,
কানাই বলাই

দু-ভাই আসে পাড়ার থেকে।
ভাঙা গাড়ি
দোলাই নাড়ি
ঝেঁকে ঝেঁকে।
সন্ধেবেলায় গল্প বলে
রাখ কোলে,
মিটমিটিয়ে জ্বলে বাতি।
চালতা-শাখে
পেঁচা ডাকে,
বাড়ে রাতি।
স্বর্গে যাওয়া দেব ফাঁকি
বলছি, কাকী,
দেখব আমায় কে কী করে।
চিরকালই
রইব খালি
তোমার ঘরে।

২৯ আশ্বিন ১৩২৮

বাণী-বিনিময়

মা, যদি তুই আকাশ হতিস,
আমি চাঁপার গাছ,
তোর সাথে মোর বিনি-কথায়
হত কথার নাচ।
তোর হাওয়া মোর ডালে ডালে
কেবল থেকে থেকে
কত রকম নাচন দিয়ে
আমায় যেত ডেকে।
মা ব'লে তার সাড়া দেব
কথা কোথায় পাই,
পাতায় পাতায় সাড়া আমার
নেচে উঠত তাই।
তোর আলো মোর শিশির-ফোঁটায়
আমার কানে কানে
টলমলিয়ে কী বলত যে
ঝলমলানির গানে।
আমি তখন ফুটিয়ে দিতেম
আমার যত কুঁড়ি,
কথা কইতে গিয়ে তারা
নাচন দিত জুড়ি।

উড়ো মেঘের ছায়াটি তোর
কোথায় থেকে এসে
আমার ছায়ায় ঘনিয়ে উঠে
কোথায় যেত ভেসে।
সেই হত তোর বাদল-বেলার
রূপকথাটির মতো ;
রাজপুত্তুর ঘর ছেড়ে যায়
পেরিয়ে রাজ্য কত ;
সেই আমারে বলে যেত
কোথায় আলেখ-লতা,
সাগরপারের দৈত্যপুরের
রাজকন্যার কথা ;
দেখতে পেতেম দুয়োরানীর
চক্ষু ভর-ভর,
শিউরে উঠে পাতা আমার
কাঁপত থরোথরো।
হঠাৎ কখন বৃষ্টি তোমার
হাওয়ার পাছে পাছে
নামত আমার পাতায় পাতায়
টাপুর-টুপুর নাচে ;
সেই হত তোর কাঁদন-সুরে
রামায়ণের পড়া,
সেই হত তোর গুনগুনিয়ে
শ্রাবণ-দিনের ছড়া।
মা, তুই হতিস নীলবরনী,
আমি সবুজ কাঁচা ;
তোর হত, মা, আলোর হাসি,
আমার পাতার নাচা।
তোর হত, মা, উপর থেকে
নয়ন মেলে চাওয়া,
আমার হত আঁকুবাঁকু
হাত তুলে গান গাওয়া।
তোর হত, মা, চিরকালের
তারার মণিমালা,
আমার হত দিনে দিনে
ফুল-ফোটাবার পালা।

বৃষ্টি রৌদ্র

ঝুঁটি-বাঁধা ডাকাত সেজে
দল বেঁধে মেঘ চলেছে যে
আজকে সারাবেলা।
কালো ঝাঁপির মধ্যে ভরে
সূর্যকে নেয় চুরি করে,
ভয়-দেখাবার খেলা।
বাতাস তাদের ধরতে মিছে
হাঁপিয়ে ছোটে পিছে পিছে,
যায় না তাদের ধরা।
আজ যেন ওই জড়োসড়ো
আকাশ জুড়ে মস্ত বড়ো
মন-কেমন-করা।
বটের ডালে ডানা-ভিজে
কাক বসে ওই ভাবছে কী যে,
চড়ুইগুলো চুপ।
বৃষ্টি হয়ে গেছে ভোরে
শজনেপাতায় ঝরে ঝরে
জল পড়ে টুপটুপ।
লেজের মধ্যে মাথা থুয়ে
খাঁদন কুকুর আছে শুয়ে
কেমন একরকম।
দালানটাতে ঘুরে ঘুরে
পায়রাগুলো কাঁদন-সুরে
ডাকছে বকবকম।
কার্তিকে ওই ধানের খেতে
ভিজে হাওয়া উঠল মেতে
সবুজ ঢেউয়ের 'পরে।
পরশ লেগে দিশে দিশে
হিহি করে ধানের শিষে
শীতের কাঁপন ধরে।
ঘোষাল-পাড়ার লক্ষ্মী বুড়ি
ছেঁড়া কাঁথায় মুড়িসুড়ি
গেছে পুকুরপাড়ে,
দেখতে ভালো পায় না চোখে
বিড়বিড়িয়ে বকে বকে
শাক তোলে, ঘাড় নাড়ে।
ওই ঝমাঝম বৃষ্টি নামে
মাঠের পারে দূরের গ্রামে
ঝাপসা বাঁশের বন।

গোরুটা কার থেকে থেকে
খোঁটায়-বাঁধা উঠছে ডেকে
ভিজছে সারাক্ষণ ।
গদাই কুমোর অনেক ভোরে
সাজিয়ে নিয়ে উঁচু ক'রে
হাঁড়ির উপর হাঁড়ি
চলছে রবিবারের হাটে,
গামছা মাথায় জলের ছাঁটে
হাঁকিয়ে গোরুর গাড়ি ।
বন্ধ আমার রইল খেলা,
ছুটির দিনে সারাবেলা
কাটবে কেমন করে ?
মনে হচ্ছে এমনিতরো
ঝরবে বৃষ্টি ঝরোঝরো
দিনরাত্তির ধরে !
এমন সময় পুবের কোণে
কখন যেন অন্যমনে
ফাঁক ধরে ওই মেঘে,
মুখের চাদর সরিয়ে ফেলে
হঠাৎ চোখের পাতা মেলে
আকাশ ওঠে জেগে ।
ছিঁড়ে-যাওয়া মেঘের থেকে
পুকুরে রোদ পড়ে বেঁকে,
লাগায় ঝিলিমিলি ।
বাঁশবাগানের মাথায় মাথায়
তেঁতুলগাছের পাতায় পাতায়
হাসায় খিলিখিলি ।
হঠাৎ কিসের মন্ত্র এসে
ভুলিয়ে দিলে একনিমেষে
বাদলবেলার কথা ।
হারিয়ে-পাওয়া আলোটিরে
নাচায় ডালে ফিরে ফিরে
বেড়ার ঝুমকোলতা ।
উপর নীচে আকাশ ভরে
এমন বদল কেমন করে
হয়, সে-কথাই ভাবি ।
উলটপালট খেলাটি এই,
সাজের তো তার সীমানা নেই,
কার কাছে তার চাবি ?
এমন যে ঘোর মন-খারাপি
বুকের মধ্যে ছিল চাপি

রবীন্দ্র-রচনাবলী

সমস্ত খন আজি—
হঠাৎ দেখি সবই মিছে
নাই কিছু তার আগে পিছে
এ যেন কার বাজি।

পূরবী

উৎসর্গ

বিজয়ার করকমলে

দ্বিতীয়া

পূরবী

পূরবী

যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে ; এই জীবনের সকল সাদা কালো
যাদের আলো-ছায়ার লীলা ; সেই যে আমার আপন মানুষগুলি
নিজের প্রাণের স্রোতের 'পরে আমার প্রাণের ঝর্না নিল তুলি ;
তাদের সাথে একটি ধারায় মিলিয়ে চলে, সেই তো আমার আয়ু,
নাই সে কেবল দিন-গণনার পাঁজির পাতায়, নয় সে নিশাস-বায়ু ।
তাদের বাঁচায় আমার বাঁচা আপন সীমা ছাড়ায় বহু দূরে ;
নিমেষগুলির ফল পেকে যায় নানা দিনের সুধার রসে পুরে ;
অতীত কালের আনন্দরূপ বর্তমানের বৃন্ত-দোলায় দোলে—
গর্ভ হতে মুক্ত শিশু তবুও যেন মায়ের বক্ষে কোলে
বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের বাঁধন দিয়ে । তাই তো যখন শেষে
একে একে আপন জনে সূর্য-আলোর অন্তরালের দেশে
আঁখির নাগাল এড়িয়ে পালায়, তখন রিক্ত শীর্ণ জীবন মম
শুষ্ক রেখায় মিলিয়ে আসে বর্ষাশেষের নির্ঝরিণী-সম
শূন্য বালুর একটি প্রান্তে ক্লান্ত বারি স্রস্ত অবহেলায় ।
তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের অপরাহ্ণবেলায়
তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো—
বলে নে, 'ভাই, এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া এই ভালো এই ভালো ।
এই ভালো আজ এ সংগমে কান্নাহাসির গঙ্গা-যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায় ।
এই ভালো রে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
পুণ্য ধরার ধুলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে ।
এই ভালো রে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়—
তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে পড়া নূতন প্রাতের আশায় ।'

বিজয়ী

তখন তারা দৃপ্ত বেগের বিজয়-রথে
ছুটছিল বীর মত্ত অধীর, রক্তধূলির পথ-বিপথে ;
তখন তাদের চতুর্দিকেই রাত্রিবেলার প্রহর যত
স্বপ্নে-চলার পথিক-মতো,

মন্দগমন ছন্দে লুটায় মন্থর কোন্ ক্লান্ত বায়ে ;
বিহঙ্গগান শান্ত তখন অন্ধ রাতের পক্ষছায়ে।

মশাল তাদের রুদ্রজ্বালায় উঠল জ্বলে—
অন্ধকারের ঊর্ধ্বতলে
বহ্নিদলের রক্তকমল ফুটল প্রবল দম্ভভরে ;
দূর-গগনের স্তব্ধ তারা মুগ্ধ ভ্রমণ তাহার 'পরে।
ভাবল পথিক— এই যে তাদের মশাল-শিখা,
নয় সে কেবল দণ্ডপলের মরীচিকা।

ভাবল তারা— এই শিখাটাই ধ্রুবজ্যোতির তারার সাথে
মৃত্যুহীনের দখিন হাতে
জ্বলবে বিপুল বিশ্বতলে।
ভাবল তারা এই শিখারই ভীষণ বলে
রাত্রি-রানীর দুর্গ-প্রাচীর দগ্ধ হবে,
অন্ধকারের রুদ্ধ কপাট দীর্ণ করে ছিনিয়ে লবে
নিত্যকালের বিত্তরাশি ;
ধরিত্রীকে করবে আপন ভোগের দাসী।

ওই বাজে রে ঘণ্টা বাজে।
চমকে উঠেই হঠাৎ দেখে অন্ধ ছিল তন্দ্রামাঝে।
আপনাকে হায় দেখছিল কোন্ স্বপ্নাবেশে
যক্ষপুরীর সিংহাসনে লক্ষমণির রাজার বেশে ;
মহেশ্বরের বিশ্ব যেন লুঠ করেছে অট্ট হেসে।

শূন্যে নবীন সূর্য জাগে
ওই যে তাহার বিশ্ব-চেতন কেতন-আগে
জ্বলছে নূতন দীপ্তিরতন তিমির-মথন শুভ্ররাগে ;
মশাল-ভস্ম লুপ্তিধুলায় নিত্যদিনের সুপ্তি মাগে।
আনন্দলোক দ্বার খুলেছে, আকাশ পুলক-ময়—
জয় ভূলোকের, জয় দ্যুলোকের, জয় আলোকের জয়।

মাটির ডাক

১

শালবনের ওই আঁচল ব্যেপে
যেদিন হাওয়া উঠত খেপে
ফাগুন-বেলার বিপুল ব্যাকুলতায়,
যেদিন দিকে দিগন্তরে
লাগত পুলক কী মন্তরে
কচি পাতার প্রথম কলকথায়,

সেদিন মনে হত কেন
ওই ভাষারই বাণী যেন
লুকিয়ে আছে হৃদয়কুঞ্জছায়ে ;
তাই অমনি নবীন রাগে
কিশলয়ের সাড়া লাগে
শিউরে-ওঠা আমার সারা গায়ে ।
আবার যেদিন আশ্বিনেতে
নদীর ধারে ফসল-খেতে
সূর্য-ওঠার রাঙা-রঙিন বেলায়
নীল আকাশের কূলে কূলে
সবুজ সাগর উঠত দুলে
কচি ধানের খামখেয়ালি খেলায়—
সেদিন আমার হত মনে
ওই সবুজের নিমন্ত্রণে
যেন আমার প্রাণের আছে দাবি ;
তাই তো হিয়া ছুটে পালায়
যেতে তারি যজ্ঞশালায়,
কোন্ ভুলে হায় হারিয়েছিল চাবি ।

২

কার কথা এই আকাশ বেয়ে
ফেলে আমার হৃদয় ছেয়ে,
বলে দিনে, বলে গভীর রাতে—
'যে-জননীর কোলের 'পরে
জন্মেছিলি মর্ত-ঘরে,
প্রাণ ভরা তোর যাহার বেদনাতে,
তাহার বক্ষ হতে তোরে
কে এনেছে হরণ করে,
ঘিরে তোরে রাখে নানান পাকে ।
বাঁধন-ছেঁড়া তোর সে নাড়ী
সইবে না এই ছাড়াছাড়ি,
ফিরে ফিরে চাইবে আপন মাকে ।'
শুনে আমি ভাবি মনে
তাই ব্যথা এই অকারণে,
প্রাণের মাঝে তাই তো ঠেকে ফাঁকা,
তাই বাজে কার করুণ সুরে—
'গেছিস দূরে অনেক দূরে',
কী যেন তাই চোখের 'পরে ঢাকা ।

তাই এত্‌দিন সকল খানে
কিসের অভাব জাগে প্রাণে
ভালো করে পাই নি তাহা বুঝে ;
ফিরেছি তাই নানামতে
নানান হাটে, নানান পথে,
হারানো কোল কেবল খুঁজে খুঁজে ।

৩

আজকে খবর পেলেম খাঁটি—
মা আমার এই শ্যামল মাটি,
অন্নে ভরা শোভার নিকেতন ;
অভ্রভেদী মন্দিরে তার
বেদী আছে প্রাণ-দেবতার,
ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন ।
এইখানে তার অঙ্ক-মাঝে
প্রভাত-রবির শঙ্খ বাজে,
আলোর ধারায় গানের ধারা মেশে ;
এইখানে সে পূজার কালে
সন্ধ্যারতির প্রদীপ জ্বালে
শান্ত মনে ক্লান্ত দিনের শেষে ।
হেথা হতে গেলেম দূরে
কোথা যে ইঁটকাঠের পুরে
বেড়া-ঘেরা বিষম নির্বাসনে ;
তৃপ্তি যে নাই, কেবল নেশা,
ঠেলাঠেলি, নাই তো মেশা,
আবর্জনা জমে উপার্জনে ।
যন্ত্র-জাঁতায় পরান কাঁদায়,
ফিরি ধনের গোলক-ধাঁধায়,
শূন্যতারে সাজাই নানা সাজে ;
পথ বেড়ে যায় ঘুরে ঘুরে,
লক্ষ্য কোথায় পালায় দূরে,
কাজ ফলে না অবকাশের মাঝে ।

৪

যাই ফিরে যাই মাটির বুকে,
যাই চলে যাই মুক্তি-সুখে,
ইঁটের শিকল দিই ফেলে দিই টুটে ;
আজ ধরণী আপন হাতে
অন্ন দিলেন আমার পাতে,
ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে ।

আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে
নিশ্বাসে মোর খবর আসে
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ ;
ছয় ঋতু ধায় আকাশ-তলায়,
তার সাথে আর আমার চলায়
আজ হতে না রইল ব্যবধান ।
যে দূতগুলি গগনপারের,
আমার ঘরের রুদ্ধ দ্বারের
বাইরে দিয়েই ফিরে ফিরে যায়,
আজ হয়েছে খোলাখুলি
তাদের সাথে কোলাকুলি
মাঠের ধারে পথতরুর ছায় ।
কী ভুল ভুলেছিলেম, আহা,
সব চেয়ে যা নিকট তাহা
সুদূর হয়ে ছিল এতদিন ;
কাছেকে আজ পেলেম কাছে—
চার দিকে এই যে ঘর আছে
তার দিকে আজ ফিরল উদাসীন ।

২৩ ফাল্গুন ১৩২৮

পঁচিশে বৈশাখ

রাত্রি হল ভোর ।
আজি মোর
জন্মের স্মরণপূর্ণ বাণী,
প্রভাতের রৌদ্রে-লেখা লিপিখানি
হাতে করে আনি
দ্বারে আসি দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ ।

দিগন্তে আরক্ত রবি ;
অরণ্যের ম্লান ছায়া বাজে যেন বিষণ্ণ ভৈরবী ।
শাল-তাল-শিরীষের মিলিত মর্মরে
বনান্তের ধ্যান ভঙ্গ করে ।
রক্তপথ শুষ্ক মাঠে,
যেন তিলকের রেখা সন্ন্যাসীর উদার ললাটে ।

এই দিন বৎসরে বৎসরে
নানা বেশে ফিরে আসে ধরণীর 'পরে—
আতাম্র আম্রের বনে ক্ষণে ক্ষণে সাড়া দিয়ে,
তরুণ তালের গুচ্ছে নাড়া দিয়ে,

মধ্যদিনে অকস্মাৎ শুষ্কপত্রে তাড়া দিয়ে,
কখনো বা আপনারে ছাড়া দিয়ে
কালবৈশাখীর মত্ত মেঘে
বন্ধহীন বেগে।
আর সে একান্তে আসে
মোর পাশে
পীত উত্তরীয়তলে লয়ে মোর প্রাণদেবতার
স্বহস্তে সজ্জিত উপহার—
নীলকান্ত আকাশের থালা,
তারি 'পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পিয়ালা।

এই দিন এল আজ প্রাতে
যে অনন্ত সমুদ্রের শঙ্খ নিয়ে হাতে,
তাহার নির্ঘোষ বাজে
ঘন ঘন মোর বক্ষোমাঝে।
জন্ম-মরণের
দিগ্বলয়-চক্ররেখা জীবনেরে দিয়েছিল ঘের,
সে আজি মিলাল।
শুভ্র আলো
কালের বাঁশরি হতে উচ্ছ্বসি যেন রে
শূন্য দিল ভরে।
আলোকের অসীম সংগীতে
চিত্ত মোর ঝংকারিছে সুরে সুরে রণিত তন্ত্রীতে।

উদয়-দিক্‌প্রান্ত-তলে নেমে এসে
শান্ত হেসে
এই দিন বলে আজি মোর কানে,
'অম্লান নূতন হয়ে অসংখ্যের মাঝখানে
একদিন তুমি এসেছিলে
এ নিখিলে
নবমল্লিকার গন্ধে,
সপ্তপর্ণ-পল্লবের পবনহিল্লোল-দোল-ছন্দে,
শ্যামলের বুকে,
নির্নিমেষ নীলিমার নয়নসম্মুখে।
সেই-যে নূতন তুমি,
তোমারে ললাট চুমি
এসেছি জাগাতে
বৈশাখের উদ্দীপ্ত প্রভাতে।

'হে নূতন,
দেখা দিক্ আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।
আচ্ছন্ন করেছে তারে আজি
শীর্ণ নিমেষের যত ধূলিকীর্ণ জীর্ণ পত্ররাজি।

মনে রেখো, হে নবীন,
তোমার প্রথম জন্মদিন
ক্ষয়হীন—
যেমন প্রথম জন্ম নির্ঝরের প্রতি পলে পলে ;
তরঙ্গে তরঙ্গে সিন্ধু যেমন উছলে
প্রতি ক্ষণে
প্রথম জীবনে।
হে নূতন,
হোক তব জাগরণ
ভস্ম হতে দীপ্ত হুতাশন।

'হে নূতন,
তোমার প্রকাশ হোক কুজ্ঝটিকা করি উদ্‌ঘাটন
সূর্যের মতন।
বসন্তের জয়ধ্বজা ধরি
শূন্য শাখে কিশলয় মুহূর্তে অরণ্য দেয় ভরি—
সেই মতো, হে নূতন,
রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে করো উন্মোচন।
ব্যক্ত হোক জীবনের জয়,
ব্যক্ত হোক তোমা-মাঝে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়।'

উদয়দিগন্তে ওই শুভ্র শঙ্খ বাজে।
মোর চিত্ত-মাঝে
চির-নূতনেরে দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।

২৫ বৈশাখ ১৩২৯

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তারে
তোমার নবীন ছন্দে ? আজিকার কাজরি গাথায়
ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায় ;
বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার যে বাণী
বিদ্যুৎ-নাচন, গানে সে আজি ললাটে কর হানি বিধবার বেশে
কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলি-'পরে ?
আশ্বিনে উৎসব-সাজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে
শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে ;
প্রতি বর্ষে দিত সে যে শুক্লরাতে জ্যোৎস্নার চন্দনে

ভালে তব বরণের টিকা ; কবি, আজ হতে সে কি
বারে বারে আসি তব শূন্যকক্ষে তোমারে না দেখি
উদ্দেশে ঝরায়ে যাবে শিশিরসিঞ্চিত পুষ্পগুলি
নীরবসংগীত তব দ্বারে ?

জানি তুমি প্রাণ খুলি
এ সুন্দরী ধরণীরে ভালোবেসেছিলে । তাই তারে
সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্য নব সংগীতের হারে ।
অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তার 'পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জুনের অগ্নিবাণ-সম ;
তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্মল, নির্মম,
করুণ, কোমল । তুমি বঙ্গভারতীর তন্ত্রী-'পরে
একটি অপূর্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে ।
সে তন্ত্র হয়েছে বাঁধা ; আজ হতে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুর কখনো ধ্বনিবে মন্দ্ররবে,
কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে । বঙ্গের অঙ্গনতলে
বর্ষা-বসন্তের নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাস উথলে ;
সেথা তুমি এঁকে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র রেখায়
আলিম্পন ; কোকিলের কুহুরবে, শিখীর কেকায়
দিয়ে গেলে তোমার সংগীত ; কাননের পল্লবে কুসুমে
রেখে গেলে আনন্দের হিল্লোল তোমার । বঙ্গভূমে
যে তরুণ যাত্রীদল রুদ্ধদ্বার-রাত্রি-অবসানে
নিঃশঙ্কে বাহির হবে নবজীবনের অভিযানে
নব নব সংকটের পথে পথে, তাহাদের লাগি
অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি
জয়মাল্য বিরচিয়া, রেখে গেলে গানের পাথেয়
বহ্নিতেজে পূর্ণ করি ; অনাগত যুগের সাথেও
ছন্দে ছন্দে নানাসূত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর,
গ্রন্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে, হে তরুণ বন্ধু মোর,
সত্যের পূজারি ।

আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে,
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীত রূপে আপনারে করে গেলে দান
দূরকালে । তাহাদের কাছে তুমি নিত্য-গাওয়া গান
মূর্তিহীন । কিন্তু যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ তারা যা হারাল তার সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা ? বন্ধুমিলনের দিনে বারংবার
উৎসব-রসের পাত্র পূর্ণ তুমি করেছ আমার
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজন্যে, শ্রদ্ধায়,
আনন্দের দানে ও গ্রহণে । সখা, আজ হতে হায়,

জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি উঠিবে মোর হিয়া
তুমি আস নাই বলে, অকস্মাৎ রহিয়া রহিয়া
করুণ স্মৃতির ছায়া ম্লান করি দিবে সভাতলে
আলাপ আলোক হাস্য প্রচ্ছন্ন গভীর অশ্রুজলে।

আজিকে একেলা বসি শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে,
মৃত্যুতরঙ্গিণীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শুধাই— আজি বাধা কি গো ঘুচিল চোখের,
সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দনলোকের
আলোকে সম্মুখে তব, উদয়শৈলের তলে আজি
নবসূর্যবন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নব ছন্দে, নূতন আনন্দগানে। সে গানের সুর
লাগিছে আমার কানে অশ্রুসাথে মিলিত মধুর
প্রভাত-আলোকে আজি ; আছে তাহে সমাপ্তির ব্যথা,
আছে তাহে নবতন আরম্ভের মঙ্গল-বারতা ;
আছে তাহে ভৈরবীতে বিদায়ের বিষণ্ণ মূর্ছনা,
আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন অর্চনা।

যে খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে সিন্ধুপারে
আষাঢ়ের সজল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে
হয়েছে আমার চেনা ; কতবার তারি সারিগানে
নিশান্তের নিদ্রা ভেঙে ব্যথায় বেজেছে মোর প্রাণে
অজানা পথের ডাক, সূর্যাস্তপারের স্বর্ণরেখা
ইঙ্গিত করেছে মোরে। পুনঃ আজ তার সাথে দেখা
মেঘে-ভরা বৃষ্টিঝরা দিনে। সেই মোরে দিল আনি
ঝরে-পড়া কদম্বের কেশর-সুগন্ধি লিপিখানি
তব শেষ-বিদায়ের। নিয়ে যাব ইহার উত্তর
নিজ হাতে করে আমি ওই খেয়া-'পরে করি ভর—
না জানি সে কোন্ শান্ত শিউলি-ঝরার শুক্লরাতে,
দক্ষিণের দোলা-লাগা পাখি-জাগা বসন্তপ্রভাতে,
নবমল্লিকার কোন্ আমন্ত্রণ-দিনে, শ্রাবণের
ঝিল্লিমন্দ্র-সঘন সন্ধ্যায়, মুখরিত প্লাবনের
অশান্ত নিশীথ রাত্রে, হেমন্তের দিনান্তবেলায়
কুহেলীগুণ্ঠনতলে।

ধরণীতে প্রাণের খেলায়
সংসারের যাত্রাপথে এসেছি তোমার বহু আগে,
সুখে দুঃখে চলেছি আপন মনে ; তুমি অনুরাগে
এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাঁশিখানি লয়ে হাতে
মুক্ত মনে, দীপ্ত তেজে, ভারতীর বরমাল্য মাথে।
আজ তুমি গেলে আগে ; ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন
তোমা হতে গেল খসি, সর্ব আবরণ করি লীন
চিরন্তন হলে তুমি, মর্ত কবি, মুহূর্তের মাঝে।

গেলে সেই বিশ্বচিত্তলোকে, যেথা সুগম্ভীর বাজে
অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সংগীতধারায়
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্যে তারায় তারায়।
সেথা তুমি অগ্রজ আমার ; যদি কভু দেখা হয়,
পাব তবে সেথা তব কোন্ অপরূপ পরিচয়
কোন্ ছন্দে, কোন্ রূপে ? যেমনি অপূর্ব হোক-নাকো,
তবু আশা করি যেন মনের একটি কোণে রাখ
ধরণীর ধূলির স্মরণ, লাজে ভয়ে দুঃখে সুখে
বিজড়িত— আশা করি, মর্তজন্মে ছিল তব মুখে
যে বিনম্র স্নিগ্ধ হাস্য, যে স্বচ্ছ সতেজ সরলতা,
সহজ সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শান্ত কথা,
তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভ্যর্থনা
অমর্তলোকের দ্বারে— ব্যর্থ নাহি হোক এ কামনা।

আষাঢ় ১৩২৯

শিলঙের চিঠি

শ্রীমতী শোভনা দেবী ও শ্রীমতী নলিনী দেবী কল্যাণীয়াসু

ছন্দে লেখা একটি চিঠি চেয়েছিলে মোর কাছে,
ভাবছি বসে এই কলমের আর কি তেমন জোর আছে।
তরুণ বেলায় ছিল আমার পদ্য লেখার বদ-অভ্যাস,
মনে ছিল হই বুঝি বা বাল্মীকি কি বেদব্যাস,
কিছু না হোক 'লঙ্‌ফেলো'দের হব আমি সমান তো—
এখন মাথা ঠাণ্ডা হয়ে হয়েছে সেই ভ্রমান্ত।
এখন শুধু গদ্য লিখি, তাও আবার কদাচিৎ,
আসল ভালো লাগে খাটে থাকতে পড়ে সদা চিৎ।
যা হোক একটা খ্যাতি আছে অনেক দিনের তৈরি সে,
শক্তি এখন কম পড়েছে তাই হয়েছে বৈরী সে ;
সেই সেকালের নেশা তবু মনের মধ্যে ফিরছে তো,
নতুন যুগের লোকের কাছে বড়াই রাখার ইচ্ছে তো—
তাই বসেছি ডেস্কে আমার, ডাক দিয়েছি চাকরকে,
'কলম লে আও, কাগজ লে আও, কালি লে আও, ধাঁ কর্‌কে।'

ভাবছি যদি তোমরা দুজন বছর তিরিশ পূর্বেতে
গরজ করে আসতে কাছে, কিছু তবু সুর পেতে।
সেদিন যখন আজকে দিনের বাপ-খুড়ো সব নাবালক,
বর্তমানের সুবুদ্ধিরা প্রায় ছিল সব হাবা লোক,
তখন যদি বলতে আমায় লিখতে পয়ার মিল করে,
লাইনগুলো পোকার মতো বেরোত পিল্ পিল্ করে।
পঞ্জিকাটা মানো না কি ? দিন দেখাটায় লক্ষ নেই ?
লগ্নটি সব বইয়ে দিয়ে আজ এসেছ অক্ষণেই।

যা হোক তবু যা পারি তাই জুড়ব কথা ছন্দেতে,
কবিত্ব-ভূত আবার এসে চাপুক আমার স্কন্ধেতে।
শিলঙগিরির বর্ণনা চাও ? আচ্ছা না হয় তাই হবে,
উচ্চদরের কাব্যকলা না যদি হয় নাই হবে—
মিল বাঁচাব, মেনে যাব মাত্রা দেবার বিধান তো ;
তার বেশি আর করলে আশা ঠকবে এবার নিতান্ত।

গর্মি যখন ছুটল না আর পাখার হাওয়ায় শরবতে,
ঠাণ্ডা হতে দৌড়ে এলুম শিলঙ-নামক পর্বতে।
মেঘ-বিছানো শৈলমালা গহন-ছায়া অরণ্যে।
ক্লান্ত জনে ডাক দিয়ে কয়, 'কোলে আমার শরণ নে।'
ঝর্না ঝরে কল্‌কলিয়ে আঁকাবাঁকা ভঙ্গিতে,
বুকের মাঝে কয় কথা যে সোহাগ-ঝরা সংগীতে।
বাতাস কেবল ঘুরে বেড়ায় পাইন বনের পল্লবে,
নিশ্বাসে তার বিষ নাশে আর অবল মানুষ বল লভে।
পাথর-কাটা পথ চলেছে বাঁকে বাঁকে পাক দিয়ে,
নতুন নতুন শোভার চমক দেয় দেখা তার ফাঁক দিয়ে।
দার্জিলিঙের তুলনাতে ঠাণ্ডা হেথায় কম হবে,
একটা খদর চাদর হলেই শীত-ভাঙানো সম্ভবে।
চেরাপুঞ্জি কাছেই বটে, নামজাদা তার বৃষ্টিপাত ;
মোদের 'পরে বাদল-মেঘের নেই ততদূর দৃষ্টিপাত।

এখানে খুব লাগল ভালো গাছের ফাঁকে চন্দ্রোদয়,
আর ভালো এই হাওয়ায় যখন পাইন-পাতার গন্ধ বয়।
বেশ আছি— এই বনে বনে যখন-তখন ফুল তুলি ;
নাম-না-জানা পাখি নাচে, শিস দিয়ে যায় বুলবুলি।
ভালো লাগে দুপুর বেলায় মন্দমধুর ঠাণ্ডাটি,
ভোলায় রে মন দেবদারু-বন গিরিদেবের পাণ্ডাটি।
ভালো লাগে আলোছায়ার নানারকম আঁক কাটা,
দিব্যি দেখায় শৈলবুকে শস্য-খেতের থাক কাটা।
ভালো লাগে রৌদ্র যখন পড়ে মেঘের ফন্দিতে,
রবির সাথে ইন্দ্র মেলেন নীল-সোনালির সন্ধিতে।
নয় ভালো এই গুর্খাদলের কুচকাওয়াজের কাণ্ডটা,
তা ছাড়া ওই ব্যাঘ্রপাইপ নামক বাদ্যভাণ্ডটা।
ঘন ঘন বাজায় শিঙা— আকাশ করে সর্‌গরম্‌,
গুলিগোলার ধড়্‌ধড়ানি, বুকের মধ্যে থর্‌থরম্‌।
আর ভালো নয় মোটরগাড়ির ঘোর বেসুরো হাঁক দেওয়া,
নিরপরাধ পদাতিকের সর্বদেহে পাঁক দেওয়া।
তা ছাড়া সব পিসু মাছি কাশি হাঁচি ইত্যাদি,
কখনো বা খাওয়ার দোষে রুখে দাঁড়ায় পিত্তাদি,
এমনতরো ছোটোখাটো একটা কিংবা অর্ধটা
যৎসামান্য উপদ্রবের নাই বা দিলাম ফর্দটা।

দোষ গাইতে চাই যদি তো তাল করা যায় বিন্দুকে—
মোটের উপর শিলঙ ভালোই, যাই না বলুক নিন্দুকে ।
আমার মতে জগৎটাতে ভালোটারই প্রাধান্য—
মন্দ যদি তিন-চল্লিশ, ভালোর সংখ্যা সাতান্ন ।
বর্ণনাটা ক্ষান্ত করি, অনেকগুলো কাজ বাকি,
আছে চায়ের নেমন্তন্ন, এখনো তার সাজ বাকি ।

ছড়া কিংবা কাব্য কভু লিখবে পরের ফরমাশে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জেনো নয়কো তেমন শর্মা সে ।
তথাপি এই ছন্দ রচে করেছি কাল নষ্ট তো,
এইখানেতে কারণটি তার বলে রাখি স্পষ্টত—
তোমরা দুজন বয়সেতে ছোটোই হবে বোধ করি,
আর আমি তো পরমায়ুর ষাট দিয়েছি শোধ করি ।
তবু আমার পক্ক কেশের লম্বা দাড়ির সম্ভ্রমে
আমাকে যে ভয় কর নি দুর্বাসা কি যম ভ্রমে,
মোর ঠিকানায় পত্র দিতে হয় নি কলম কম্পিত,
কবিতাতে লিখতে চিঠি হুকুম এল লম্ফিত—
এইটে দেখে মনটা আমার পূর্ণ হল উৎসাহে,
মনে হল, বৃদ্ধ আমি মন্দ লোকের কুৎসা এ ।
মনে হল আজো আছে কম বয়সের রঙ্গিমা,
জরার কোপে দাড়ি-গোঁপে হয় নি জবড়-জঙ্গিমা ।
তাই বুঝি সব ছোটো যারা তারা যে কোন্ বিশ্বাসে
একবয়সী বলে আমায় চিনেছে এক নিশ্বাসে ।
এই ভাবনায় সেই হতে মন এমনিতরো খুশ আছে,
ডাকছে ভোলা 'খাবার এল'— আমার কি আর হুঁশ আছে ।
জানলা দিয়ে বৃষ্টিতে গা ভেজে যদি ভিজুক তো ;
ভুলেই গেলাম লিখতে নাটক আছি আমি নিযুক্ত ।
মনকে ডাকি, 'হে আত্মারাম, ছুটুক তোমার কবিত্ব—
ছোট্ট দুটি মেয়ের কাছে ফুটুক রবির রবিত্ব ।'

জিৎভূমি । শিলঙ
২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০

যাত্রা

আশ্বিনের রাত্রিশেষে ঝরে-পড়া শিউলি-ফুলের
আগ্রহে আকুল বনতল ; তারা মরণকূলের
উৎসবে ছুটেছে দলে দলে ; শুধু বলে, 'চলো চলো ।'
অশ্রুবাষ্প-কুহেলীতে দিগন্তের চক্ষু ছলোছলো,
ধরিত্রীর আর্দ্র বক্ষে তৃণে তৃণে কম্পন সঞ্চারে,
তবু ওই প্রভাতের যাত্রীদল বিদায়ের দ্বারে

হাস্যমুখে ঊর্ধ্ব-পানে চায় ; দেখে, অরুণ আলোর
তরণী দিয়েছে খেয়া, হংসশুভ্র মেঘের ঝালর
দোলে তার চন্দ্রাতপতলে ।

ওরে, এতক্ষণে বুঝি
তারা-ঝরা নির্ঝরের স্রোতঃপথে পথ খুঁজি খুঁজি
গেছে সাত-ভাই চম্পা ; কেতকীর রেণুতে রেণুতে
ছেয়েছে যাত্রার পথ ; দিগ্‌বধূর বেণুতে বেণুতে
বেজেছে ছুটির গান ; ভাঁটার নদীর ঢেউগুলি
মুক্তির কল্লোলে মাতে, নৃত্যবেগে ঊর্ধ্বে বাহু তুলি
উচ্ছলিয়া বলে, 'চলো, চলো ।' বাউল উত্তরে-হাওয়া
ধেয়েছে দক্ষিণ মুখে, মরণের রুদ্রনেশা-পাওয়া ;
বাজায় অশান্ত ছন্দে তালপল্লবের করতাল,
ফুকারে বৈরাগ্যমন্ত্র ; স্পর্শে তার হয়েছে মাতাল
প্রান্তরের প্রান্তে প্রান্তে কাশের মঞ্জরী, কাঁপে তারা
ভয়কুণ্ঠ উৎকণ্ঠিত সুখে— বলে, 'বৃন্তবন্ধহারা
যাব উদ্দামের পথে, যাব আনন্দিত সর্বনাশে,
রিক্তবৃষ্টি মেঘ-সাথে, সৃষ্টিছাড়া ঝড়ের বাতাসে,
যাব— যেথা শংকরের টলমল চরণপাতনে
জাহ্নবীতরঙ্গমন্দ্র-মুখরিত তাণ্ডব-মাতনে
গেছে উড়ে জটাভ্রষ্ট ধুতুরার ছিন্নভিন্ন দল,
কক্ষচ্যুত ধূমকেতু লক্ষ্যহারা প্রলয়-উজ্জ্বল
আত্মঘাতমদমত্ত আপনারে দীর্ণ কীর্ণ করে
নির্মম উল্লাসবেগে, খণ্ড খণ্ড উল্কাপিণ্ড ঝরে,
কণ্টকিয়া তোলে ছায়াপথ ।'

ওরা ডেকে বলে, 'কবি,
সে তীর্থে কি তুমি সঙ্গে যাবে, যেথা অস্তগামী রবি
সন্ধ্যামেঘে রচে বেদী নক্ষত্রের বন্দনাসভায়,
যেথা তার সর্বশেষ রশ্মিটির রক্তিম জবায়
সাজায় অন্তিম অর্ঘ্য ; যেথায় নিঃশব্দ বেণু-'পরে
সংগীত স্তম্ভিত থাকে মরণের নিস্তব্ধ অধরে ।'

কবি বলে, 'যাত্রী আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে
যেখানে সে চিরন্তন দেয়ালির উৎসবপ্রাঙ্গণে
মৃত্যুদূত নিয়ে গেছে আমার আনন্দদীপগুলি,
যেথা মোর জীবনের প্রত্যুষের সুগন্ধি শিউলি
মাল্য হয়ে গাঁথা আছে অনন্তের অঙ্গদে কুণ্ডলে
ইন্দ্রাণীর স্বয়ম্বর-বরমাল্য সাথে ; দলে দলে
যেথা মোর অকৃতার্থ আশাগুলি, অসিদ্ধ সাধনা,
মন্দির-অঙ্গনদ্বারে প্রতিহত কত আরাধনা

নন্দনমন্দারগন্ধ-লুব্ধ যেন মধুকর-পাঁতি,
গেছে উড়ি মর্তের দুর্ভিক্ষ ছাড়ি ।
আমি তব সাথি,
হে শেফালি, শরৎ-নিশির স্বপ্ন, শিশিরসিঞ্চিত
প্রভাতের বিচ্ছেদবেদনা, মোর সুচিরসঞ্চিত
অসমাপ্ত সংগীতের ডালিখানি নিয়ে বক্ষতলে,
সমর্পিব নির্বাকের নির্বাণবাণীর হোমানলে ।'

৫ আশ্বিন ১৩৩০

তপোভঙ্গ

যৌবনবেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি,
হে কালের অধীশ্বর, অন্যমনে গিয়েছ কি ভুলি,
হে ভোলা সন্ন্যাসী ।
চঞ্চল চৈত্রের রাতে
কিংশুকমঞ্জরী সাথে
শূন্যের অকূলে তারা অযত্নে গেল কি সব ভাসি ।
আশ্বিনের বৃষ্টিহারা শীর্ণশুভ্র মেঘের ভেলায়
গেল বিস্মৃতির ঘাটে স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায়
নির্মম হেলায় ?

একদা সে দিনগুলি তোমার পিঙ্গল জটাজালে
শ্বেত রক্ত নীল পীত নানা পুষ্পে বিচিত্র সাজালে,
গেছ কি পাসরি ।
দস্যু তারা হেসে হেসে
হে ভিক্ষুক, নিল শেষে
তোমার ডম্বরু শিঙা, হাতে দিল মঞ্জিরা বাঁশরি ।
গন্ধভারে আমন্থর বসন্তের উন্মাদন-রসে
ভরি তব কমণ্ডলু নিমজ্জিল নিবিড় আলসে
মাধুর্যরভসে ।

সেদিন তপস্যা তব অকস্মাৎ শূন্যে গেল ভেসে
শুষ্কপত্রে ঘূর্ণবেগে গীতরিক্ত হিমমরুদেশে
উত্তরের মুখে ।
তব ধ্যানমন্ত্রটিরে
আনিল বাহির তীরে
পুষ্পগন্ধে লক্ষ্যহারা দক্ষিণের বায়ুর কৌতুকে ।
সে মন্ত্রে উঠিল মাতি সেঁউতি কাঞ্চন করবিকা
সে মন্ত্রে নবীনপত্রে জ্বালি দিল অরণ্যবীথিকা
শ্যাম বহ্নিশিখা ।

বসন্তের বন্যাস্রোতে সন্ন্যাসের হল অবসান ;
জটিল জটার বন্ধে জাহ্নবীর অশ্রুকলতান
শুনিলে তন্ময় ।
সেদিন ঐশ্বর্য তব
উন্মেষিল নব নব
অন্তরে উদ্‌বেল হল আপনাতে আপন বিস্ময় ।
আপনি সন্ধান পেলে আপনার সৌন্দর্য উদার,
আনন্দে ধরিলে হাতে জ্যোতির্ময় পাত্রটি সুধার
বিশ্বের ক্ষুধার ।

সেদিন, উন্মত্ত তুমি, যে নৃত্যে ফিরিলে বনে বনে
সে-নৃত্যের ছন্দে-লয়ে সংগীত রচিনু ক্ষণে ক্ষণে
তব সঙ্গ ধরে ।
ললাটের চন্দ্রালোকে
নন্দনের স্বপ্ন-চোখে
নিত্য-নূতনের লীলা দেখেছিনু চিত্ত মোর ভরে ।
দেখেছিনু সুন্দরের অন্তর্লীন হাসির রঙ্গিমা,
দেখেছিনু লজ্জিতের পুলকের কুণ্ঠিত ভঙ্গিমা,
রূপ-তরঙ্গিমা ।

সেদিনের পানপাত্র, আজ তার ঘুচালে পূর্ণতা ?
মুছিলে চুম্বনরাগে-চিহ্নিত বঙ্কিম রেখা-লতা
রক্তিম অঙ্কনে ?
অগীত সংগীতধার,
অশ্রুর সঞ্চয়ভার
অযত্নে লুণ্ঠিত সে কি ভগ্নভাণ্ডে তোমার অঙ্গনে ?
তোমার তাণ্ডব নৃত্যে চূর্ণ চূর্ণ হয়েছে সে ধূলি ?
নিঃস্ব কালবৈশাখীর নিশ্বাসে কি উঠিছে আকুলি
লুপ্ত দিনগুলি ?
নহে নহে, আছে তারা ; নিয়েছ তাদের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া
রাখ সংগোপনে ।
তোমার জটায় হারা
গঙ্গা আজ শান্তধারা,
তোমার ললাটে চন্দ্র গুপ্ত আজি সুপ্তির বন্ধনে ।
আবার কী লীলাচ্ছলে অকিঞ্চন সেজেছ বাহিরে ।
অন্ধকারে নিঃস্বনিছে যত দূরে দিগন্তে চাহি রে—
'নাহি রে, নাহি রে ।'

কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে,
দিনধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহমাঝে,
উৎকণ্ঠিত বেগে ।

নির্জন প্রান্তরতলে
আলেয়ার আলো জ্বলে,
বিদ্যুৎ-বহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।
চঞ্চল মুহূর্ত যত অন্ধকারে দুঃসহ নৈরাশে
নিবিড় নিবদ্ধ হয়ে তপস্যার নিরুদ্ধ নিশ্বাসে
শান্ত হয়ে আসে।
জানি জানি, এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান
চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান
দুরন্ত উল্লাসে।
বন্দী যৌবনের দিন
আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।
বিদ্রোহী নবীন বীর, স্থবিরের শাসন নাশন,
বারে বারে দেখা দিবে ; আমি রচি তারি সিংহাসন,
তারি সম্ভাষণ।

তপোভঙ্গ-দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।
দুর্জয়ের জয়মালা
পূর্ণ করে মোর ডালা,
উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।
ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী,
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহল-কোলাহল আনি
মোর গান হানি।

হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব—
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্মরণবেশে।
বারে বারে পঞ্চশরে
অগ্নিতেজে দগ্ধ করে
দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।
বারে বারে তারি তূণ সম্মোহনে ভরি দিব বলে
আমি কবি সংগীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চলে
মৃত্তিকার কোলে।

জানি জানি, বারংবার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনা
শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে, ওগো অন্যমনা,
নূতন উৎসাহে।
তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে
বিলীন বিরহতলে,
উমাকে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তদুঃখদাহে।

ভগ্ন তপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী,
আমি সেই কবি।

আমারে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্যবিলাসী,
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খলখল ওঠে অট্টহাসি
দেখে মোর সাজ।
হেনকালে মধুমাসে
মিলনের লগ্ন আসে,
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্য-বিকশিত লাজ।
সেদিন কবিরে ডাকো বিবাহের যাত্রাপথতলে,
পুষ্পমাল্যমাঙ্গল্যের সাজি লয়ে, সপ্তর্ষির দলে
কবি সঙ্গে চলে।

ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্ত-আঁখি
দেখে তব শুভ্রতনু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি,
প্রাতঃসূর্যরুচি।
অস্থিমালা গেছে খুলে
মাধবীবল্লরীমূলে,
ভালে মাখা পুষ্পরেণু, চিতাভস্ম কোথা গেছে মুছি।
কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি-পানে ;
সে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনিগানে
কবির পরানে।

কার্তিক ১৩৩০

ভাঙা মন্দির

পুণ্যলোভীর নাই হল ভিড়
শূন্য তোমার অঙ্গনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।
অর্ঘ্যের আলো নাই বা সাজালো
পুষ্পে প্রদীপে চন্দনে
যাত্রীরা তব বিস্মৃতপরিচয়।
সম্মুখপানে দেখো দেখি চেয়ে,
ফাল্গুনে তব প্রাঙ্গণ ছেয়ে
বনফুলদল ওই এল ধেয়ে
উল্লাসে চারি ধারে।

দক্ষিণবায়ে কোন্ আহ্বান
শূন্যে জাগায় বন্দনাগান,
কী খেয়াতরীর পায় সন্ধান
আসে পৃথ্বীর পারে ?
গন্ধের থালি বর্ণের ডালি
আনে নির্জন অঙ্গনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়,
বকুল শিমুল আকন্দ ফুল
কাঞ্চন জবা রঙ্গনে
পূজাতরঙ্গ দুলে অম্বরময় ।

২

প্রতিমা নাহয় হয়েছে চূর্ণ,
বেদীতে নাহয় শূন্যতা,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়,
নাহয় ধুলায় হল লুণ্ঠিত
আছিল যে চূড়া উন্নতা,
সজ্জা না থাকে কিসের লজ্জা ভয় ?
বাহিরে তোমার ওই দেখো ছবি,
ভগ্নভিত্তিলগ্ন মাধবী,
নীলাম্বরের প্রাঙ্গণে রবি
হেরিয়া হাসিছে স্নেহে ।
বাতাসে পুলকি আলোকে আকুলি
আন্দোলি উঠে মঞ্জরীগুলি,
নবীন প্রাণের হিল্লোল তুলি
প্রাচীন তোমার গেহে ।
সুন্দর এসে ওই হেসে হেসে
ভরি দিল তব শূন্যতা,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয় ।
ভিত্তিরন্ধ্রে বাজে আনন্দে
ঢাকি দিয়া তব ক্ষুণ্ণতা
রূপের শঙ্খে অসংখ্য 'জয় জয়' ।

৩

সেবার প্রহরে নাই আসিল রে
যত সন্ন্যাসী-সজ্জনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয় ।
নাই মুখরিল পার্বণ-ক্ষণ
ঘন জনতার গর্জনে,
অতিথি-ভোগের না রহিল সঞ্চয় ।

পূজার মঞ্চে বিহঙ্গদল
কুলায় বাঁধিয়া করে কোলাহল,
তাই তো হেথায় জীববৎসল
আসিছেন ফিরে ফিরে।
নিত্য সেবার পেয়ে আয়োজন
তৃপ্ত পরানে করিছে কূজন,
উৎসবরসে সেই তো পূজন
জীবন-উৎসতীরে।
নাইকো দেবতা ভেবে সেই কথা
গেল সন্ন্যাসী-সজ্জনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।
সেই অবকাশে দেবতা যে আসে—
প্রসাদ-অমৃত-মজ্জনে
স্খলিত ভিত্তি হল যে পুণ্যময়।

মাঘ ১৩৩০

আগমনী

মাঘের বুকে সকৌতুকে কে আজি এল, তাহা
বুঝিতে পারো তুমি?
শোন নি কানে হঠাৎ গানে কহিল 'আহা আহা'
সকল বনভূমি?
শুষ্ক জরা পুষ্প-ঝরা
হিমের-বায়ে-কাঁপন-ধরা
শিথিল মন্থর
'কে এল' বলি তরাসি উঠে শীতের সহচর।

গোপনে এল, স্বপনে এল, এল সে মায়াপথে,
পায়ের ধ্বনি নাহি।
ছায়াতে এল, কায়াতে এল, এল সে মনোরথে
দখিন-হাওয়া বাহি।
অশোকবনে নবীন পাতা
আকাশ-পানে তুলিল মাথা,
কহিল, 'এসেছ কি?'
মর্মরিয়া থরোথরো কাঁপিল আমলকী।

কাহারে চেয়ে উঠিল গেয়ে দোয়েল চাঁপা-শাখে
'শোনো গো, শোনো শোনো।'
শ্যামা না জানে প্রভাতী গানে কী নামে তারে ডাকে
আছে কি নাম কোনো?

কোকিল শুধু মুহুর্‌মুহু
আপন মনে কুহরে কুহু
ব্যথায়-ভরা বাণী ।
কপোত বুঝি শুধায় শুধু, 'জানি কি, তারে জানি ?'

আমের বোলে কী কলরোলে সুবাস ওঠে মাতি
অসহ উচ্ছ্বাসে ।
আপন মনে মাধবী ভনে কেবলই দিবারাতি,
'মোরে সে ভালোবাসে ।'
অধীর হাওয়া নদীর পারে
খেপার মতো কহিছে কারে,
'বলো তো কী-যে করি ?'
শিহরি উঠি শিরীষ বলে, 'কে ডাকে, মরি মরি !'

কেন যে আজি উঠিল বাজি আকাশ-কাঁদা বাঁশি
জানিস তাহা না কি ?
রঙিন যত মেঘের মতো কী যায় মনে ভাসি
কেন যে থাকি থাকি ?
অবুঝ তোরা তাহারে বুঝি
দূরের পানে ফিরিস খুঁজি—
বাহিরে-আঁখি-বাঁধা,
প্রাণের মাঝে চাহিস না যে, তাই তো লাগে ধাঁধা ।

পুলকে-কাঁপা কনকচাঁপা বুকের মধু-কোষে
পেয়েছে দ্বার নাড়া,
এমন করে কুঞ্জ ভরে সহজে তাই তো সে
দিয়েছে তারি সাড়া ।
সহসা বনমল্লিকা যে
পেয়েছে তারে আপন-মাঝে,
ছুটিয়া দলে দলে
'এই যে তুমি' 'এই যে তুমি' আঙুল তুলে বলে ।

পেয়েছে তারা, গেয়েছে তারা, জেনেছে তারা সব
আপন মাঝখানে—
তাই এ শীতে জাগালো গীতে বিপুল কলরব
দ্বিধাবিহীন তানে ।
ওদের সাথে জাগ্‌ রে কবি,
হৃৎকমলে দেখ্‌ সে ছবি,
ভাঙুক মোহঘোর ।
বনের তলে নবীন এল, মনের তলে তোর ।

আলোতে তোরে দিক-না ভরে ভোরের নব রবি,
বাজ্ রে বীণা বাজ্ ।
গগন-কোলে হাওয়ার দোলে ওঠ্ রে দুলে কবি,
ফুরালো তোর কাজ ।
বিদায় নিয়ে যাবার আগে
পড়ুক টান ভিতর-বাগে,
বাহিরে পাস ছুটি ।
প্রেমের ডোরে বাঁধুক তোরে, বাঁধন যাক টুটি ।

মাঘ ১৩৩০

উৎসবের দিন

ভয় নিত্য জেগে আছে প্রেমের শিয়র-কাছে,
মিলনসুখের বক্ষোমাঝে ।
আনন্দের হৃৎস্পন্দনে আন্দোলিছে ক্ষণে ক্ষণে
বেদনার রুদ্র দেবতা যে !
তাই আজ উৎসবের ভোরবেলা হতে
বাষ্পাকুল অরুণের করুণ আলোতে
উল্লাসকল্লোলতলে ভৈরবী রাগিণী কেঁদে বাজে
মিলনসুখের বক্ষোমাঝে ।

নবীন পল্লবপুটে মর্মরি মর্মরি উঠে
দূর বিরহের দীর্ঘশ্বাস ।
উষার সীমন্তে লেখা উদয়সিন্দূররেখা
মনে আনে সন্ধ্যার আকাশ ।
আম্রের মুকুলগন্ধে ব্যাকুল কী সুর
অরণ্যছায়ার হিয়া করিছে বিধুর,
অশ্রুর অশ্রুত ধ্বনি ফাল্গুনের মর্মে করে বাস—
দূর বিরহের দীর্ঘশ্বাস ।

দিগন্তের স্বর্ণদ্বারে কতবার বারে বারে
এসেছিল সৌভাগ্য-লগন ।
আশার লাবণ্যে ভরা জেগেছিল বসুন্ধরা,
হেসেছিল প্রভাতগগন ।
কত-না উৎসুক বুকে পথপানে ধাওয়া,
কত-না চকিত চক্ষে প্রতীক্ষার চাওয়া
বারে বারে বসন্তেরে করেছিল চাঞ্চল্যে মগন,
এসেছিল সৌভাগ্য-লগন ।

আজ উৎসবের সুরে তারা মরে ঘুরে ঘুরে
বাতাসেরে করে যে উদাস ।
তাদের পরশ পায়, কী মায়াতে ভরে যায়
প্রভাতের স্নিগ্ধ অবকাশ ।
তাদের চমক লাগে চম্পকশাখায়,
কাঁপে তারা মৌমাছির গুঞ্জিত পাখায়,
সেতারের তারে তারে মূর্ছনায় তাদের আভাস
বাতাসেরে করিল উদাস ।

কালস্রোতে এ অকূলে আলোচ্ছায়া দুলে দুলে
চলে নিত্য অজানার টানে ।
বাঁশি কেন রহি রহি সে আহ্বান আনে বহি
আজি এই উল্লাসের গানে ?
চঞ্চলেরে শুনাইছে স্তব্ধতার ভাষা,
যার রাত্রি-নীড়ে আসে যত শঙ্কা আশা ।
বাঁশি কেন প্রশ্ন করে, 'বিশ্ব কোন্ অনন্তের পানে
চলে নিত্য অজানার টানে ।'

যায় যাক, যায় যাক, আসুক দূরের ডাক,
যাক ছিঁড়ে সকল বন্ধন—
চলার সংঘাত-বেগে সংগীত উঠুক জেগে
আকাশের হৃদয়-নন্দন ।
মুহূর্তের নৃত্যচ্ছন্দে ক্ষণিকের দল
যাক পথে মত্ত হয়ে বাজায়ে মাদল ।
অনিত্যের স্রোত বেয়ে যাক ভেসে হাসি ও ক্রন্দন,
যাক ছিঁড়ে সকল বন্ধন ।

ফাল্গুন ১৩৩০

গানের সাজি

গানের সাজি এনেছি আজি,
ঢাকাটি তার লও গো খুলে—
দেখো তো চেয়ে কী আছে ।
যে থাকে মনে স্বপন-বনে
ছায়ার দেশে ভাবের কূলে
সে বুঝি কিছু দিয়াছে ।
কী যে সে তাহা আমি কি জানি,
ভাষায়-চাপা কোন্ সে বাণী
সুরের ফুলে গন্ধখানি
ছন্দে বাঁধি গিয়াছে—
সে ফুল বুঝি হয়েছে পুঁজি,
দেখো তো চেয়ে কী আছে ।

দেখো তো, সখী দিয়েছে ও কি
সুখের কাঁদা, দুখের হাসি,
দুরাশাভরা চাহনি।
দিয়েছে কি না ভোরের বীণা,
দিয়েছে কি সে রাতের বাঁশি
গহন-গান-গাহনি।
বিপুল ব্যথা ফাগুন-বেলা,
সোহাগ কভু, কভু বা হেলা,
আপন মনে আগুন-খেলা
পরানমন-দাহনি—
দেখো তো ডালা, সে স্মৃতি-ঢালা
আছে আকুল চাহনি?

ডেকেছ কবে মধুর রবে,
মিটালে কবে প্রাণের ক্ষুধা
তোমার করপরশে,
সহসা এসে করুণ হেসে
কখন চোখে ঢালিলে সুধা
ক্ষণিক তব দরশে—
বাসনা জাগে নিভৃতে চিতে
সে-সব দান ফিরায়ে দিতে
আমার দিনশেষের গীতে—
সফল তারে করো-সে।
গানের সাজি খোলো গো আজি
করুণ করপরশে।

রসে বিলীন সে-সব দিন
ভরেছে আজি বরণডালা
চরম তব বরণে!
সুরের ডোরে গাঁথনি করে
রচিয়া মম বিরহমালা
রাখিয়া যাব চরণে।
একদা তব মনে না রবে,
স্বপনে এরা মিলাবে কবে,
তাহারি আগে মরুক তবে
অমৃতময় মরণে
ফাগুনে তোরে বরণ ক'রে
সকল শেষ বরণে।

ফাল্গুন ১৩৩০

লীলাসঙ্গিনী

দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে
মনে হল যেন চিনি—
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলাসঙ্গিনী ?
কাজে ফেলে মোরে চলে গেলে কোন্ দূরে,
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে ?
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে—
বাজাইলে কিঙ্কিণী।
বিস্মরণের গোধূলিক্ষণের
আলোতে তোমারে চিনি।

এলোচুলে বহে এনেছ কী মোহে
সেদিনের পরিমল ?
বকুলগন্ধে আনে বসন্ত
কবেকার সম্বল ?
চৈত্র-হাওয়ায় উতলা কুঞ্জমাঝে
চারু চরণের ছায়ামঞ্জীর বাজে,
সেদিনের তুমি এলে এদিনের সাজে
ওগো চিরচঞ্চল।
অঞ্চল হতে ঝরে বায়ুস্রোতে
সেদিনের পরিমল।

মনে আছে সে কি সব কাজ, সখী,
ভুলায়েছ বারে বারে—
বন্ধ দুয়ার খুলেছ আমার
কঙ্কণঝংকারে।
ইশারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে
ঘুরে ঘুরে যেত মোর বাতায়নে এসে
কখনো আমের নবমুকুলের বেশে
কভু নবমেঘভারে।
চকিতে চকিতে চলচাহনিতে
ভুলায়েছ বারে বারে।

নদীকূলে-কূলে কল্লোল তুলে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।
বনপথে আসি করিতে উদাসী
কেতকীর রেণু মেখে।

বর্ষাশেষের গগন-কোনায়-কোনায়
সন্ধ্যামেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়
নির্জন ক্ষণে কখন অন্যমনায়
ছুঁয়ে গেছ থেকে থেকে—
কখনো হাসিতে কখনো বাঁশিতে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।

কী লক্ষ্য নিয়ে এসেছ এ বেলা
কাজের কক্ষ-কোণে।
সাথি খুঁজিতে কি ফিরিছ একেলা
তব খেলা-প্রাঙ্গণে।
নিয়ে যাবে মোরে নীলাম্বরের তলে
ঘরছাড়া যত দিশাহারাদের দলে,
অযাত্রা-পথে যাত্রী যাহারা চলে
নিষ্ফল আয়োজনে?
কাজ ভোলাবারে ফেরো বারে বারে
কাজের কক্ষ-কোণে।

আবার সাজাতে হবে আভরণে
মানসপ্রতিমাগুলি?
কল্পনাপটে নেশার বরনে
বুলাব রসের তুলি?
বিবাগী মনের ভাবনা ফাগুন-প্রাতে
উড়ে চলে যাবে উৎসুক বেদনাতে,
কলগুঞ্জিত মৌমাছিদের সাথে
পাখায় পুষ্পধূলি।
আবার নিভৃতে হবে কি রচিতে
মানসপ্রতিমাগুলি।

দেখো না কি, হায়, বেলা চলে যায়—
সারা হয়ে এল দিন।
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীন।
এতদিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশি,
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিশ্বাসি
গানহারা উদাসীন।
কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়,
সারা হয়ে এল দিন।

এবার কি তবে শেষ খেলা হবে
নিশীথ-অন্ধকারে ।
মনে মনে বুঝি হবে খোঁজাখুঁজি
অমাবস্যার পারে ?
মালতীলতায় যাহারে দেখেছি প্রাতে
তারায় তারায় তারি লুকাচুরি রাতে ?
সুর বেজেছিল যাহার পরশ-পাতে
নীরবে লভিব তারে ?
দিনের দুরাশা স্বপনের ভাষা
রচিবে অন্ধকারে ?

যদি রাত হয় না করিব ভয়—
চিনি যে তোমারে চিনি ।
চোখে নাই দেখি, তবু ছলিবে কি
হে গোপনরঙ্গিণী ।
নিমেষে আঁচল ছুঁয়ে যায় যদি চ'লে
তবু সব কথা যাবে সে আমায় বলে,
তিমিরে তোমার পরশলহরী দোলে
হে রসতরঙ্গিণী ।
হে আমার প্রিয়, আবার ভুলিয়ো,
চিনি যে তোমারে চিনি ।

ফাল্গুন ১৩৩০

শেষ অর্ঘ্য

যে তারা মহেন্দ্রক্ষণে প্রত্যুষবেলায়
প্রথম শুনালো মোরে নিশান্তের বাণী
শান্তমুখে ; নিখিলের আনন্দমেলায়
স্নিগ্ধকণ্ঠে ডেকে নিয়ে এল ; দিল আনি
ইন্দ্রাণীর হাসিখানি দিনের খেলায়
প্রাণের প্রাঙ্গণে ; যে সুন্দরী, যে ক্ষণিকা
নিঃশব্দ চরণে আসি কম্পিত পরশে
চম্পক-অঙ্গুলি-পাতে তন্দ্রাযবনিকা
সহাস্যে সরায়ে দিল, স্বপ্নের আলসে
ছোঁয়ালো পরশমণি জ্যোতির কণিকা ;
অন্তরের কণ্ঠহারে নিবিড় হরষে
প্রথম দুলায়ে দিল রূপের মণিকা ;
এ-সন্ধ্যার অন্ধকারে চলিনু খুঁজিতে,
সঞ্চিত অশ্রুর অর্ঘ্যে তাহারে পূজিতে ।

ফাল্গুন ১৩৩০

বেঠিক পথের পথিক

বেঠিক পথের পথিক আমার
অচিন সে জন রে ।
চকিত চলার ক্বচিৎ হাওয়ায়
মন কেমন করে ।
নবীন চিকন অশথ-পাতায়
আলোর চমক কানন মাতায়,
যে রূপ জাগায় চোখের আগায়
কিসের স্বপন সে ।
কী চাই, কী চাই, বচন না পাই
মনের মতন রে ।

অচিন বেদন আমার ভাষায় মিশায় যখন রে
আপন গানের গভীর নেশায়
মন কেমন করে ।
তরল চোখের তিমির-তারায়
যখন আমার পরান হারায়
বাজায় সেতার সেই অচেনার
মায়ার স্বপন যে ।
কী চাই, কী চাই, সুর যে না পাই
মনের মতন রে ।

হেলায় খেলায় কোন্ অবেলায়
হঠাৎ মিলন রে ।
সুখের দুখের দুয়ের মেলায়
মন কেমন করে ।
বঁধুর বাহুর মধুর পরশ
কায়ায় জাগায় মায়ার হরষ,
তাহার মাঝার সেই অচেনার
চপল স্বপন যে ।
কী চাই, কী চাই, বাঁধন না পাই
মনের মতন রে ।

প্রিয়ার হিয়ার ছায়ায় মিলায়
অচিন সে জন যে ।
ছুঁই কি না ছুঁই বুঝি না কিছুই
মন কেমন করে ।

চরণে তাহার পরান বুলাই
অরূপ দোলায় রূপেরে দুলাই
আঁখির দেখায় আঁচল ঠেকায়
অধরা স্বপন যে।
চেনা অচেনায় মিলন ঘটায়
মনের মতন রে।

ফাল্গুন ১৩৩০

বকুল-বনের পাখি

শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখি,
দেখো তো, আমায় চিনিতে পারিবে না কি।
নই আমি কবি, নই জ্ঞান-অভিমানী,
মান-অপমান কী পেয়েছি নাহি জানি,
দেখেছ কি মোর দূরে-যাওয়া মনখানি—
উড়ে যাওয়া মোর আঁখি ?
আমাতে কি কিছু দেখেছ তোমারি সম,
অসীম-নীলিমা-তিয়াষি বন্ধু মম ?

শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখি,
কবে দেখেছিলে মনে পড়ে সে কথা কি ?
বালক ছিলাম, কিছু নহে তার বাড়া,
রবির আলোর কোলেতে ছিলেম ছাড়া,
চাঁপার গন্ধ বাতাসের-প্রাণ-কাড়া
যেত মোরে ডাকি ডাকি।
সহজ রসের ঝর্না-ধারার 'পরে
গান ভাসাতেম সহজ সুখের ভরে।

শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখি,
কাছে এসেছিনু ভুলিতে পারিবে তা কি।
নগ্ন পরান লয়ে আমি কোন্‌ সুখে
সারা আকাশের ছিনু যেন বুকে বুকে,
বেলা চলে যেত অবিরত কৌতুকে
সব কাজে দিয়ে ফাঁকি।
শ্যামলা ধরার নাড়ীতে যে তাল বাজে
নাচিত আমার অধীর মনের মাঝে।

শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখি,
দূরে চলে এনু, বাজে তার বেদনা কি ?
আষাঢ়ের মেঘ রহে না কি মোরে চাহি।

সেই নদী যায় সেই কলতান গাহি—
তাহার মাঝে কি আমার অভাব নাহি।
কিছু কি থাকে না বাকি।
বালক গিয়েছে হারায়ে, সে কথা লয়ে
কোনো আঁখিজল যায় নি কোথাও বয়ে ?

শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখি,
আর-বার তারে ফিরিয়া ডাকিবে না কি।
যায় নি সেদিন যেদিন আমারে টানে,
ধরার খুশিতে আছে সে সকলখানে ;
আজ বেঁধে দাও আমার শেষের গানে
তোমার গানের রাখী।
আবার বারেক ফিরে চিনে লও মোরে,
বিদায়ের আগে লও গো আপন ক'রে।

শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখি,
সেদিন চিনেছ আজিও চিনিবে না কি।
পারঘাটে যদি যেতে হয় এইবার,
খেয়াল-খেয়ায় পাড়ি দিয়ে হব পার,
শেষের পেয়ালা ভরে দাও হে আমার
সুরের সুরার সাকী।
আর কিছু নই, তোমারি গানের সাথি,
এই কথা জেনে আসুক ঘুমের রাতি।

শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখি,
মুক্তির টিকা ললাটে দাও তো আঁকি।
যাবার বেলায় যাব না ছদ্মবেশে,
খ্যাতির মুকুট খসে যাক নিঃশেষে,
কর্মের এই বর্ম যাক-না ফেঁসে,
কীর্তি যাক-না ঢাকি।
ডেকে লও মোরে নামহারাদের দলে
চিহ্নবিহীন উধাও পথের তলে।

শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখি,
যাই যবে যেন কিছুই না যাই রাখি।
ফুলের মতন সাঁঝে পড়ি যেন ঝরে,
তারার মতন যাই যেন রাত-ভোরে,
হাওয়ার মতন বনের গন্ধ হ'রে
চলে যাই গান হাঁকি।
বেণুপল্লবমর্মররব-সনে
মিলাই যেন গো সোনার গোধূলিখনে।

ফাল্গুন ১৩৩০

সাবিত্রী

ঘন-অশ্রুবাষ্পে-ভরা মেঘের দুর্যোগে খড়্গ হানি
ফেলো, ফেলো টুটি ।
হে সূর্য, হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনকপদ্মখানি
দেখা দিক্ ফুটি ।
বহ্নিবীণা বক্ষে লয়ে, দীপ্ত কেশে, উদ্‌বোধিনী বাণী
সে পদ্মের কেন্দ্রমাঝে নিত্য রাজে, জানি তারে জানি ।
মোর জন্মকালে
প্রথম প্রত্যুষে মম তাহারি চুম্বন দিলে আনি
আমার কপালে ।

সে চুম্বনে উচ্ছলিল জ্বালার তরঙ্গ মোর প্রাণে,
অগ্নির প্রবাহ ।
উচ্ছ্বসি উঠিল মন্দ্রি বারংবার মোর গানে গানে
শান্তিহীন দাহ ।
ছন্দের বন্যায় মোর রক্ত নাচে সে চুম্বন লেগে,
উন্মাদ সংগীত কোথা ভেসে যায় উদ্দাম আবেগে
আপনা-বিস্মৃত ।
সে চুম্বনমন্ত্রে বক্ষে অজানা ক্রন্দন উঠে জেগে
ব্যথায়-বিস্মিত ।

তোমার হোমাগ্নি-মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি,
তারে নমো নম ।
তমিস্র সুপ্তির কূলে যে বংশী বাজাও, আদিকবি,
ধ্বংস করি তম,
সে বংশী আমারই চিত্ত, রন্ধ্রে তারই উঠিছে গুঞ্জরি—
মেঘে মেঘে বর্ণচ্ছটা, কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবীমঞ্জরী,
নির্ঝরে কল্লোল ।
তাহারি ছন্দের ভঙ্গে সর্ব অঙ্গে উঠিছে সঞ্চরি
জীবনহিল্লোল ।

এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্ন তান, সুরের তরণী ;
আয়ুস্রোতমুখে
হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে, কৌতুকে ধরণী
বেঁধে নিল বুকে ।
আশ্বিনের রৌদ্রে সেই বন্দী প্রাণ হয় বিস্ফুরিত
উৎকণ্ঠার বেগে, যেন শেফালির শিশিরচ্ছুরিত
উৎসুক আলোক ।
তরঙ্গহিল্লোলে নাচে রশ্মি তব, বিস্ময়ে পুরিত
করে মুগ্ধ চোখ ।

তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমাতে দিয়েছ যে ভরে
কেই বা সে জানে।
কী জাল হতেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে
মোর গুপ্ত-প্রাণে।
তোমার দূতীরা আঁকে ভুবন-অঙ্গনে আলিম্পনা ;
মুহূর্তে সে ইন্দ্রজাল অপরূপ রূপের কল্পনা
মুছে যায় সরে।
তেমনি সহজ হোক হাসিকান্না ভাবনাবেদনা—
না বাঁধুক মোরে।

তারা সবে মিলে থাক্ অরণ্যের স্পন্দিত পল্লবে,
শ্রাবণবর্ষণে ;
যোগ দিক নির্ঝরের মঞ্জীরগুঞ্জনকলরবে
উপলঘর্ষণে।
ঝঞ্ঝার মদিরামত্ত বৈশাখের তাণ্ডবলীলায়
বৈরাগী বসন্ত যবে আপনার বৈভব বিলায়,
সঙ্গে যেন থাকে।
তার পরে যেন তারা সর্বহারা দিগন্তে মিলায়,
চিহ্ন নাহি রাখে।

হে রবি, প্রাঙ্গণে তব শরতের সোনার বাঁশিতে
জাগিল মূর্ছনা।
আলোতে শিশিরে বিশ্ব দিকে দিকে অশ্রুতে হাসিতে
চঞ্চল উন্মনা।
জানি না কী মত্ততায়, কী আহ্বানে আমার রাগিণী
ধেয়ে যায় অন্যমনে শূন্যপথে হয়ে বিবাগিনী,
লয়ে তার ডালি।
সে কি তব সভাস্থলে স্বপ্নাবেশে চলে একাকিনী
আলোর কাঙালি ?

দাও, খুলে দাও দ্বার, ওই তার বেলা হল শেষ—
বুকে লও তারে।
শান্তি-অভিষেক হোক, ধৌত হোক সকল আবেশ
অগ্নি-উৎসধারে।
সীমন্তে, গোধূলিলগ্নে দিয়ো এঁকে সন্ধ্যার সিন্দূর,
প্রদোষের তারা দিয়ে লিখো রেখা আলোকবিন্দুর
তার স্নিগ্ধ ভালে।
দিনান্তসংগীতধ্বনি সুগম্ভীর বাজুক সিন্ধুর
তরঙ্গের তালে।

হারুনা-মারু জাহাজ
২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৪

পূর্ণতা

স্তব্ধরাতে একদিন
নিদ্রাহীন
আবেগের আন্দোলনে তুমি
বলেছিলে নতশিরে
অশ্রুনীরে
ধীরে মোর করতল চুমি—
'তুমি দূরে যাও যদি,
নিরবধি
শূন্যতার সীমাশূন্য ভারে
সমস্ত ভুবন মম
মরুসম
রুক্ষ হয়ে যাবে একেবারে।
আকাশবিস্তীর্ণ ক্লান্তি
সব শান্তি
চিত্ত হতে করিবে হরণ—
নিরানন্দ নিরালোক
স্তব্ধ শোক
মরণের অধিক মরণ।'

২

শুনে, তোর মুখখানি
বক্ষে আনি
বলেছিনু তোরে কানে কানে—
'তুই যদি যাস দূরে
তোরি সুরে
বেদনা-বিদ্যুৎ গানে গানে
ঝলিয়া উঠিবে নিত্য,
মোর চিত্ত
সচকিবে আলোকে আলোকে।
বিরহ বিচিত্র খেলা
সারা বেলা
পাতিবে আমার বক্ষে চোখে।
তুমি খুঁজে পাবে প্রিয়ে,
দূরে গিয়ে
মর্মের নিকটতম দ্বার—
আমার ভুবনে তবে
পূর্ণ হবে
তোমার চরম অধিকার।'

৩

দুজনের সেই বাণী
কানাকানি,
শুনেছিল সপ্তর্ষির তারা ;
রজনীগন্ধার বনে
ক্ষণে ক্ষণে
বহে গেল সে বাণীর ধারা ।
তার পরে চুপে চুপে
মৃত্যুরূপে
মধ্যে এল বিচ্ছেদ অপার ।
দেখাশুনা হল সারা,
স্পর্শহারা
সে অনন্তে বাক্য নাহি আর ।
তবু শূন্য শূন্য নয়,
ব্যথাময়
অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন ।
একা-একা সে অগ্নিতে
দীপ্তগীতে
সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন ।

হারুনা-মারু জাহাজ
অক্টোবর ১৯২৪

আহ্বান

আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারংবার
ফিরেছি ডাকিয়া ।
সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া ।
দীপখানি তুলে ধ'রে, মুখে চেয়ে, ক্ষণকাল থামি
চিনেছে আমারে ।
তারি সেই চাওয়া, সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি
চিনি আপনারে ।

সহস্রের বন্যাস্রোতে জন্ম হতে মৃত্যুর আঁধারে
চলে যাই ভেসে ।
নিজেরে হারায়ে ফেলি অস্পষ্টের প্রচ্ছন্ন পাথারে
কোন্ নিরুদ্দেশে ।

নামহীন দীপ্তিহীন তৃপ্তিহীন আত্মবিস্মৃতির
তমসার মাঝে।
কোথা হতে অকস্মাৎ কর মোরে খুঁজিয়া বাহির
তাহা বুঝি না যে।

তব কণ্ঠে মোর নাম যেই শুনি, গান গেয়ে উঠি—
'আছি, আমি আছি।'
সেই আপনার গানে লুপ্তির কুয়াশা ফেলে টুটি
বাঁচি, আমি বাঁচি।
তুমি মোরে চাও যবে অব্যক্তের অখ্যাত আবাসে
আলো উঠে জ্বলে—
অসাড়ের সাড়া জাগে, নিশ্চল তুষার গলে আসে
নৃত্যকলরোলে।

নিঃশব্দচরণে উষা নিখিলের সুপ্তির দুয়ারে
দাঁড়ায় একাকী,
রক্ত-অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নাম ধরি কারে
চলে যায় ডাকি।
অমনি প্রভাত তার বীণা হাতে বাহিরিয়া আসে,
শূন্য ভরে গানে ;
ঐশ্বর্য ছড়ায়ে দেয় মুক্তহস্তে আকাশে আকাশে,
ক্লান্তি নাহি জানে।

কোন্ জ্যোতির্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে
রচিতেছে গান
আলোকের বর্ণে বর্ণে ; নির্নিমেষ উদ্দীপ্ত নয়নে
করিছে আহ্বান।
তাই তো চাঞ্চল্য জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে
রোমাঞ্চিত তৃণে।
ধরণী ক্রন্দিয়া উঠে, প্রাণস্পন্দ ছুটে চারি ধারে
বিপিনে বিপিনে।

তাই তো গোপন ধন খুঁজে পায় অকিঞ্চন ধূলি
নিরুদ্ধ ভাণ্ডারে।
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে আপনার দৈন্য যায় ভুলি
পত্রপুষ্পভারে।
দেবতার প্রার্থনায় কার্পণ্যের বন্ধ মুষ্টি খুলে,
রিক্ততারে টুটি
রহস্যসমুদ্রতল উন্মথিয়া উঠে উপকূলে
রত্ন মুঠি মুঠি।

তুমি সে আকাশভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক, হে কল্যাণী,
দেবতার দূতী।
মর্তের গৃহের প্রান্তে বহিয়া এনেছে তব বাণী
স্বর্গের আকৃতি।
ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃতবারি
মৃত্যুর আড়ালে,
দেবতার হয়ে হেথা তাহারি সন্ধানে তুমি, নারী,
দু বাহু বাড়ালে।

তাই তো কবির চিত্তে কল্পলোকে টুটিল অর্গল
বেদনার বেগে,
মানসতরঙ্গতলে বাণীর সংগীতশতদল
নেচে ওঠে জেগে।
সুপ্তির তিমিরবক্ষ দীর্ণ করে তেজস্বী তাপস
দীপ্তির কৃপাণে;
বীরের দক্ষিণ হস্ত মুক্তিমন্ত্রে বজ্র করে বশ,
অসত্যেরে হানে।

হে অভিসারিকা, তব বহুদূর পদধ্বনি লাগি
আপনার মনে
বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা বসে জাগি
নির্জন প্রাঙ্গণে।
দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলিপরশ।
তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায়-আতুর অন্ধকার
সঙ্গসুধারস।

নিদ্রাহীন বেদনায় ভাবি কবে আসিবে পরানে
চরম আহ্বান।
মনে জানি এ জীবনে সাঙ্গ হয় নাই পূর্ণ তানে
মোর শেষ গান।
কোথা তুমি, শেষবার যে ছোঁয়াবে তব স্পর্শমণি
আমার সংগীতে।
মহানিস্তব্ধের প্রান্তে কোথা বসে রয়েছ রমণী
নীরব নিশীথে।

মহেন্দ্রের বজ্র হতে কালো চক্ষে বিদ্যুতের আলো
আনো আনো ডাকি—
বর্ষণ-কাঙাল মোর মেঘের অন্তরে বহ্নি জ্বালো
হে কালবৈশাখী।
অশ্রুভারে ক্লান্ত তার স্তব্ধ মূক অবরুদ্ধ দান
কালো হয়ে উঠে।

বন্যাবেগে মুক্ত করো, রিক্ত করি করো পরিত্রাণ,
সব লও লুটে।

তার পরে যাও যদি যেয়ো চলি, দিগন্ত-অঙ্গন
হয়ে যাবে স্থির।
বিরহের শুভ্রতায় শূন্যে দেখা দিবে চিরন্তন
শান্তি সুগম্ভীর।
স্বচ্ছ আনন্দের মাঝে মিলে যাবে সর্বশেষ লাভ,
সর্বশেষ ক্ষতি—
দুঃখে সুখে পূর্ণ হবে অরূপসুন্দর আবির্ভাব,
অশ্রুধৌত জ্যোতি।

ওরে পান্থ, কোথা তোর দিনান্তের যাত্রাসহচরী।
দক্ষিণপবন
বহুক্ষণ চলে গেছে অরণ্যের পল্লব মর্মরি—
নিকুঞ্জভবন
গন্ধের ইঙ্গিত দিয়ে বসন্তের উৎসবের পথ
করে না প্রচার।
কাহারে ডাকিস তুই, গেছে চলে তার স্বর্ণরথ
কোন্ সিন্ধুপার।

জানি জানি, আপনার অন্তরের গহনবাসীরে
আজিও না চিনি।
সন্ধ্যারতিলগ্নে কেন আসিলে না নিভৃত মন্দিরে
শেষ পূজারিনী।
কেন সাজালে না দীপ, তোমার পূজার মন্ত্র-গানে
জাগায়ে দিলে না
তিমিররাত্রির বাণী, গোপনে যা লীন আছে প্রাণে
দিনের অচেনা।

অসমাপ্ত পরিচয় অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
নিতে হল তুলে।
রচিয়া রাখে নি মোর প্রেয়সী কি বরণের ডালি
মরণের কূলে।
সেখানে কি পুষ্পবনে গীতহীনা রজনীর তারা
নব জন্ম লভি
এই নীরবের বক্ষে নব ছন্দে ছুটাবে ফোয়ারা
প্রভাতী ভৈরবী।

হারুনা-মারু জাহাজ
১ অক্টোবর ১৯২৪

ছবি

ক্ষুব্ধ চিহ্ন এঁকে দিয়ে শান্ত সিন্ধুবুকে
তরী চলে পশ্চিমের মুখে।
আলোকচুম্বনে নীল জল
করে ঝলমল।
দিগন্তে মেঘের জালে বিজড়িত দিনান্তের মোহ,
সূর্যাস্তের শেষ সমারোহ।
ঊর্ধ্বে যায় দেখা
তৃতীয়ার শীর্ণ শশিলেখা।
যেন কে উলঙ্গ শিশু কোথায় এসেছে জানে না সে,
নিঃসংকোচে হাসে।
বহে মন্দ মন্থর বাতাস
সঙ্গশূন্য সায়াহ্নের বৈরাগ্যনিশ্বাস।
স্বর্গসুখে ক্লান্ত কোন্ দেবতার বাঁশির পূরবী
শূন্যতলে ধরে এই ছবি।
ক্ষণকাল পরে যাবে ঘুচে,
উদাসীন রজনীর কালো কেশে সব দেবে মুছে।

এমনি রঙের খেলা নিত্য খেলে আলো আর ছায়া,
এমনি চঞ্চল মায়া
জীবন-অম্বরতলে—
দুঃখে সুখে বর্ণে বর্ণে লিখা
চিহ্নহীনপদচারী কালের প্রান্তরে মরীচিকা।
তার পরে দিন যায়, অস্তে যায় রবি ;
যুগে যুগে মুছে যায় লক্ষ লক্ষ রাগরক্ত ছবি।
তুই হেথা কবি,
এ বিশ্বের মৃত্যুর নিশ্বাস
আপন বাঁশিতে ভরি গানে তারে বাঁচাইতে চাস।

হারুনা-মারু জাহাজ
২ অক্টোবর ১৯২৪

লিপি

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড় ফিরে ফিরে ?
প্রত্যুষে গোপনে ধীরে ধীরে
আঁধারের খুলিয়া পেটিকা,
স্বর্ণবর্ণে লিখা

প্রভাতের মর্মবাণী
বক্ষে টেনে আনি
গুঞ্জরিয়া কত সুরে আবৃত্তি কর যে মুগ্ধমনে।

বহুযুগ হয়ে গেল কোন্ শুভক্ষণে
বাষ্পের গুণ্ঠনখানি প্রথম পড়িল যবে খুলে,
আকাশে চাহিলে মুখ তুলে।
অমর জ্যোতির মূর্তি দেখা দিল আঁখির সম্মুখে।
রোমাঞ্চিত বুকে
পরম বিস্ময় তব জাগিল তখনি।
নিঃশব্দ বরণ-মন্ত্রধ্বনি
উচ্ছ্বসিল পর্বতের শিখরে শিখরে।
কলোল্লাসে উদ্‌ঘোষিল নৃত্যমত্ত সাগরে সাগরে
'জয়, জয়, জয়।'
ঝঞ্ঝা তার বন্ধ টুটে ছুটে ছুটে কয়
'জাগো রে, জাগো রে'
বনে বনান্তরে।
প্রথম সে দর্শনের অসীম বিস্ময়
এখনো যে কাঁপে বক্ষোময়।
তলে তলে আন্দোলিয়া উঠে তব ধূলি,
তৃণে তৃণে কণ্ঠ তুলি
ঊর্ধ্বে চেয়ে কয়—
'জয়, জয়, জয়।'
সে বিস্ময় পুষ্পে পর্ণে গন্ধে বর্ণে ফেটে ফেটে পড়ে ;
প্রাণের দুরন্ত ঝড়ে,
রূপের উন্মত্ত নৃত্যে, বিশ্বময়
ছড়ায় দক্ষিণে বামে সৃজন প্রলয় ;
সে বিস্ময় সুখে দুঃখে গর্জি উঠি কয়—
'জয়, জয়, জয়।'

তোমাদের মাঝখানে আকাশ অনন্ত ব্যবধান ;
ঊর্ধ্ব হতে তাই নামে গান।
চিরবিরহের নীল পত্রখানি-'পরে
তাই লিপি লেখা হয় অগ্নির অক্ষরে।
বক্ষে তারে রাখো,
শ্যাম আচ্ছাদনে ঢাকো ;
বাক্যগুলি
পুষ্পদলে রেখে দাও তুলি—
মধুবিন্দু হয়ে থাকে নিভৃত গোপনে ;
পদ্মের রেণুর মাঝে গন্ধের স্বপনে

বন্দী কর তারে ;
তরুণীর প্রেমাবিষ্ট আঁখির ঘনিষ্ঠ অন্ধকারে
রাখ তারে ভরি ;
সিন্ধুর কল্লোলে মিলি, নারিকেলপল্লবে মর্মরি,
সে বাণী ধ্বনিতে থাকে তোমার অন্তরে ;
মধ্যাহ্নে শোনো সে বাণী অরণ্যের নির্জন নির্ঝরে।

বিরহিণী, সে লিপির যে উত্তর লিখিতে উন্মনা
আজও তাহা সাঙ্গ হইল না।
যুগে যুগে বারংবার লিখে লিখে
বারংবার মুছে ফেল ; তাই দিকে দিকে
সে ছিন্ন কথার চিহ্ন পুঞ্জ হয়ে থাকে ;
অবশেষে একদিন জ্বলজ্জটা ভীষণ বৈশাখে
উন্মত্ত ধূলির ঘূর্ণিপাকে
সব দাও ফেলে
অবহেলে,
আত্মবিদ্রোহের অসন্তোষে।
তার পরে আরবার বসে বসে
নূতন আগ্রহে লেখ নূতন ভাষায়।
যুগযুগান্তর চলে যায়।

কত শিল্পী, কত কবি তোমার সে লিপির লিখনে
বসে গেছে একমনে।
শিখিতে চাহিছে তব ভাষা,
বুঝিতে চাহিছে তব অন্তরের আশা।
তোমার মনের কথা আমারি মনের কথা টানে,
চাও মোর পানে।
চকিত ইঙ্গিত তব, বসনপ্রান্তের ভঙ্গিখানি
অঙ্কিত করুক মোর বাণী।
শরতে দিগন্ততলে
ছলছলে
তোমার যে অশ্রুর আভাস,
আমার সংগীতে তারি পড়ুক নিশ্বাস।
অকারণ চাঞ্চল্যের দোলা লেগে
ক্ষণে ক্ষণে ওঠে জেগে
কটিতটে যে কলকিঙ্কিণী,
মোর ছন্দে দাও ঢেলে তারি রিনিরিনি
ওগো বিরহিণী।
দূর হতে আলোকের বরমাল্য এসে
খসিয়া পড়িল তব কেশে,

স্পর্শে তারি কভু হাসি কভু অশ্রুজলে
উৎকণ্ঠিত আকাঙ্ক্ষায় বক্ষতলে
ওঠে যে ক্রন্দন,
মোর ছন্দে চিরদিন দোলে যেন তাহারি স্পন্দন।
স্বর্গ হতে মিলনের সুধা
মর্তের বিচ্ছেদপাত্রে সংগোপনে রেখেছ, বসুধা ;
তারি লাগি নিত্যক্ষুধা,
বিরহিণী অয়ি,
মোর সুরে হোক জ্বালাময়ী।

হারুনা-মারু জাহাজ
৪ অক্টোবর ১৯২৪

ক্ষণিকা

খোলো খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা—
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
কবে সে যে এসেছিল আমার হৃদয়ে যুগান্তরে
গোধূলিবেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে
লয়ে তার ভীরু দীপশিখা।
দিগন্তের কোন্ পারে চলে গেল আমার ক্ষণিকা।

ভেবেছিনু গেছি ভুলে ; ভেবেছিনু পদচিহ্নগুলি
পদে পদে মুছে নিল সর্বনাশী অবিশ্বাসী ধূলি।
আজ দেখি সেদিনের সেই ক্ষীণ পদধ্বনি তার
আমার গানের ছন্দ গোপনে করেছে অধিকার ;
দেখি তারি অদৃশ্য অঙ্গুলি
স্বপ্নে অশ্রুসরোবরে ক্ষণে ক্ষণে দেয় ঢেউ তুলি।

বিরহের দূতী এসে তার সে স্তিমিত দীপখানি
চিত্তের অজানা কক্ষে কখন্ রাখিয়া দিল আনি।
সেখানে যে বীণা আছে অকস্মাৎ একটি আঘাতে
মুহূর্ত বাজিয়াছিল ; তার পরে শব্দহীন রাতে
বেদনাপদ্মের বীণাপাণি
সন্ধান করিছে সেই অন্ধকারে-থেমে-যাওয়া বাণী।

সেদিন ঢেকেছে তারে কী-এক ছায়ার সংকোচন,
নিজের অধৈর্য দিয়ে পারে নি তা করিতে মোচন।
তার সেই ত্রস্ত আঁখি সুনিবিড় তিমিরের তলে
যে রহস্য নিয়ে চলে গেল, নিত্য তাই পলে পলে
মনে মনে করি যে লুণ্ঠন।
চিরকাল স্বপ্নে মোর খুলি তার সে অবগুণ্ঠন।

হে আত্মবিস্মৃত, যদি দ্রুত তুমি না যেতে চমকি,
বারেক ফিরায়ে মুখ পথমাঝে দাঁড়াতে থমকি,
তা হলে পড়িত ধরা রোমাঞ্চিত নিঃশব্দ নিশায়
দুজনের জীবনের ছিল যা চরম অভিপ্রায়।
তা হলে পরমলগ্নে, সখী,
সে ক্ষণকালের দীপে চিরকাল উঠিত আলোকি।

হে পান্থ, সে পথে তব ধূলি আজ করি যে সন্ধান—
বঞ্চিত মুহূর্তখানি পড়ে আছে, সেই তব দান।
অপূর্ণের লেখাগুলি তুলে দেখি, বুঝিতে না পারি—
চিহ্ন কোনো রেখে যাবে, মনে তাই ছিল কি তোমারি।
ছিন্ন ফুল, এ কি মিছে ভান।
কথা ছিল শুধাবার, সময় হল যে অবসান।

গেল না ছায়ার বাধা ; না-বোঝার প্রদোষ-আলোকে
স্বপ্নের চঞ্চল মূর্তি জাগায় আমার দীপ্ত চোখে
সংশয়মোহের নেশা— সে মূর্তি ফিরিছে কাছে কাছে
আলোতে আঁধারে মেশা, তবু সে অনন্ত দূরে আছে
মায়াচ্ছন্ন লোকে।
অচেনার মরীচিকা আকুলিছে ক্ষণিকার শোকে।

খোলো খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা।
খুঁজিব তারার মাঝে চঞ্চলের মালার মণিকা।
খুঁজিব সেথায় আমি যেথা হতে আসে ক্ষণতরে
আশ্বিনে গোধূলি-আলো, যেথা হতে নামে পৃথ্বী-'পরে
শ্রাবণের সায়াহ্নযূথিকা,
যেথা হতে পরে ঝড় বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্ত টিকা।

হারুনা-মারু জাহাজ
৬ অক্টোবর ১৯২৪

খেলা

সন্ধ্যাবেলায় এ কোন্ খেলায় করলে নিমন্ত্রণ
ওগো খেলার সাথি !
হঠাৎ কেন চমকে তোলে শূন্য এ প্রাঙ্গণ
রঙিন শিখার বাতি।
কোন্ সে ভোরের রঙের খেয়াল কোন্ আলোতে ঢেকে
সমস্ত দিন বুকের তলায় লুকিয়ে দিলে রেখে,
অরুণ-আভাস ছানিয়ে নিয়ে পদ্মবনের থেকে
রাঙিয়ে দিলে রাতি ?
উদয়-ছবি শেষ হবে কি অস্ত-সোনায় এঁকে
জ্বালিয়ে সাঁঝের বাতি।

হারিয়ে-ফেলা বাঁশি আমার পালিয়েছিল বুঝি
লুকোচুরির ছলে ?
বনের পারে আবার তারে কোথায় পেলে খুঁজি
শুকনো পাতার তলে ?
যে সুর তুমি শিখিয়েছিলে বসে আমার পাশে
সকালবেলায় বটের তলায় শিশির-ভেজা ঘাসে,
সে আজ ওঠে হঠাৎ বেজে বুকের দীর্ঘশ্বাসে,
উছল চোখের জলে—
কাঁপত যে সুর ক্ষণে ক্ষণে দুরন্ত বাতাসে
শুকনো পাতার তলে ।

মোর প্রভাতের খেলার সাথি আনত ভরে সাজি
সোনার চাঁপাফুলে ।
অন্ধকারে গন্ধ তারি ওই যে আসে আজি
এ কি পথের ভুলে ।
বকুলবীথির তলে তলে আজ কি নতুন বেশে
সেই খেলাতেই ডাকতে এল আবার ফিরে এসে ।
সেই সাজি তার দখিন হাতে, তেমনি আকুল কেশে
চাঁপার গুচ্ছ দুলে ।
সেই অজানা হতে আসে এই অজানার দেশে,
এ কি পথের ভুলে ।

আমার কাছে কী চাও, তুমি, ওগো খেলার গুরু,
কেমন খেলার ধারা ।
চাও কি তুমি যেমন করে হল দিনের শুরু
তেমনি হবে সারা ।
সেদিন ভোরে দেখেছিলাম প্রথম জেগে উঠে
নিরুদ্দেশের পাগল হাওয়ায় আগল গেছে টুটে,
কাজ-ভোলা সব খ্যাপার দলে তেমনি আবার জুটে
করবে দিশেহারা ।
স্বপন-মৃগ ছুটিয়ে দিয়ে পিছনে তার ছুটে
তেমনি হব সারা ।

বাঁধা পথের বাঁধন মেনে চলতি কাজের স্রোতে
চলতে দেবে নাকো ?
সন্ধ্যাবেলায় জোনাক-জ্বালা বনের আঁধার হতে
তাই কি আমায় ডাকো ?
সকল চিন্তা উধাও করে অকারণের টানে
অবুঝ ব্যথার চঞ্চলতা জাগিয়ে দিয়ে প্রাণে
থর্‌থরিয়ে কাঁপিয়ে বাতাস ছুটির গানে গানে
দাঁড়িয়ে কোথায় থাকো ।
না জেনে পথ পড়ব তোমার বুকেরই মাঝখানে,
তাই আমারে ডাকো ।

জানি জানি, তুমি আমার চাও না পূজার মালা
ওগো খেলার সাথি ।
এই জনহীন অঙ্গনেতে গন্ধপ্রদীপ জ্বালা,
নয় আরতির বাতি ।
তোমার খেলায় আমার খেলা মিলিয়ে দেব তবে
নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায় তারার মহোৎসবে,
তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশির রবে
পূর্ণ হবে রাতি ।
তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে খেলা হবে,
নয় আরতির বাতি ।

হারুনা-মারু জাহাজ
৭ অক্টোবর ১৯২৪

অপরিচিতা

পথ বাকি আর নাই তো আমার, চলে এলাম একা,
তোমার সাথে কই হল গো দেখা ?
কুয়াশাতে ঘন আকাশ, ম্লান শীতের ক্ষণে
ফুল ঝরাবার বাতাস বেড়ায় কাঁপন-লাগা বনে ।
সকল শেষের শিউলিটি যেই ধুলায় হবে ধূলি,
সঙ্গিনীহীন পাখি যখন গান যাবে তার ভুলি,
হয়তো তুমি আপন-মনে আসবে সোনার রথে
শুকনো-পাতা ঝরা-ফুলের পথে ।

পুলক লেগেছিল মনে পথের নূতন বাঁকে
হঠাৎ সেদিন কোন্ মধুরের ডাকে ।
দূরের থেকে ক্ষণে-ক্ষণে রঙের আভাস এসে
গগন-কোণে চমক হেনে গেছে কোথায় ভেসে ।
মনের ভুলে ভেবেছিলাম তুমিই বুঝি এলে
গন্ধরাজের গন্ধে তোমার গোপন মায়া মেলে—
হয়তো তুমি এসেছিলে, যায় নি আড়ালখানা,
চোখের দেখায় হয় নি প্রাণের জানা ।

হয়তো সেদিন তোমার আঁখির ঘন তিমির ব্যেপে
অশ্রুজলের আবেশ গেছে কেঁপে ।
হয়তো আমায় দেখেছিলে বাঁকিয়ে বাঁকা ভুরু,
বক্ষ তোমার করেছিল ক্ষণেক দুরু দুরু,
সেদিন হতে স্বপ্ন তোমার ভোরের আধো-ঘুমে
রঙিয়েছিল হয়তো ব্যথার রক্তিমকুঙ্কুমে—
আধেক-চাওয়ায় ভুলে-যাওয়ায় হয়েছে জাল বোনা
তোমায় আমায় হয় নি জানাশোনা ।

তোমার পথের ধারে ধারে তাই এবারের মতো
রেখে গেলাম গান গাঁথিলাম যত।
মনের মাঝে বাজল যেদিন দূর চরণের ধ্বনি
সেদিন আমি গেয়েছিলাম তোমার আগমনী ;
দখিন বাতাস ফেলেছে শ্বাস রাতের আকাশ ঘেরি,
সেদিন আমি গেয়েছি গান তোমার বিরহেরি ;
ভোরের বেলায় অশ্রুভরা অধীর অভিমান
ভৈরবীতে জাগিয়েছিল গান।

এ গানগুলি তোমার বলে চিনবে কখনো কি ?
ক্ষতি কী তায়, নাই চিনিলে সখী !
তবু তোমায় গাইতে হবে নাই তাহে সংশয়,
তোমার কণ্ঠে বাজবে তখন আমার পরিচয়—
যারে তুমি বাসবে ভালো, আমার গানের সুরে
বরণ করে নিতে হবে সেই তব বন্ধুরে।
রোদন খুঁজে ফিরবে তোমার প্রাণের বেদনখানি,
আমার গানে মিলবে তাহার বাণী।

তোমার ফাগুন উঠবে জেগে, ভরবে আমের বোলে,
তখন আমি কোথায় যাব চলে।
পূর্ণ চাঁদের আসবে আসর, মুগ্ধ বসুন্ধরা,
বকুলবীথির ছায়াখানি মধুর মূর্ছাভরা—
হয়তো সেদিন বক্ষে তোমার মিলন-মালা গাঁথা,
হয়তো সেদিন ব্যর্থ আশায় সিক্ত চোখের পাতা—
সেদিন আমি আসব না তো নিয়ে আমার দান,
তোমার লাগি রেখে গেলেম গান।

আন্ডেস জাহাজ
১৮ অক্টোবর ১৯২৪

আন্‌মনা

আন্‌মনা গো, আন্‌মনা,
তোমার কাছে আমার বাণীর মালাখানি আনব না।
বার্তা আমার ব্যর্থ হবে,
সত্য আমার বুঝবে কবে ?
তোমারো মন জানব না,
আন্‌মনা গো, আন্‌মনা।
লগ্ন যদি হয় অনুকূল মৌন মধুর সাঁঝে,
নয়ন তোমার মগ্ন যখন ম্লান আলোর মাঝে,
দেব তোমায় শান্ত সুরের সান্ত্বনা,
আন্‌মনা গো, আন্‌মনা।

জনশূন্য তটের পানে ফিরবে হাঁসের দল ;
স্বচ্ছ নদীর জল
আকাশ-পানে রইবে পেতে কান
বুকের তলে শুনবে ব'লে গ্রহতারার গান ;
কুলায়-ফেরা পাখি
নীল আকাশের বিরামখানি রাখবে ডানায় ঢাকি ;
বেণুশাখার অন্তরালে অস্তপারের রবি
আঁকবে মেঘে মুছবে আবার শেষ-বিদায়ের ছবি ;
স্তব্ধ হবে দিনের বেলার ক্ষুব্ধ হাওয়ার দোলা,
তখন তোমার মন যদি রয় খোলা—
তখন সন্ধ্যাতারা
পায় যদি তার সাড়া
তোমার উদার আঁখিতারার পারে,
কনকচাঁপার গন্ধ-ছোঁওয়া বনের অন্ধকারে
ক্লান্তি-অলস ভাব্‌না যদি ফুল-বিছানো ভুঁয়ে
মেলিয়ে ছায়া এলিয়ে থাকে শুয়ে ;
ছন্দে গাঁথা বাণী তখন পড়ব তোমার কানে
মন্দ মৃদুল তানে—
ঝিল্লি যেমন শালের বনে নিদ্রানীরব রাতে
অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সুর গাঁথে ।
একলা তোমার বিজন প্রাণের প্রাঙ্গণে
প্রান্তে বসে একমনে
এঁকে যাব আমার গানের আল্‌পনা
আন্‌মনা গো, আন্‌মনা ।

আন্ডেস জাহাজ
১৮ অক্টোবর ১৯২৪

বিস্মরণ

মনে আছে কার দেওয়া সেই ফুল ?
সে ফুল যদি শুকিয়ে গিয়ে থাকে
তবে তারে সাজিয়ে রাখাই ভুল—
মিথ্যে কেন কাঁদিয়ে রাখ তাকে ।
ধুলায় তারি শান্তি তারি গতি,
এই সমাদর কোরো তাহার প্রতি—
সময় যখন গেছে তখন তারে
ভুলো একেবারে ।

মাঘের শেষে নাগকেশরের ফুলে
আকাশে বয় মন-হারানো হাওয়া ;
বনের বক্ষ উঠেছে আজ দুলে,
চামেলি ওই কার যেন পথ-চাওয়া ।

ছায়ায় ছায়ায় কাদের কানাকানি,
চোখে-চোখে নীরব জানাজানি—
এ উৎসবে শুকনো ফুলের লাজ
ঘুচিয়ে দিয়ো আজ।

যদি-বা তার ফুরিয়ে থাকে বেলা,
মনে জেনো দুঃখ তাহে নাই ;
করেছিল ক্ষণকালের খেলা,
পেয়েছিল ক্ষণকালের ঠাঁই।
অলকে সে কানের কাছে দুলি
বলেছিল নীরব কথাগুলি,
গন্ধ তাহার ফিরেছে পথ ভুলে
তোমার এলোচুলে।

সেই মাধুরী আজ কি হবে ফাঁকি।
লুকিয়ে সে কি রয় নি কোনোখানে।
কাহিনী তার থাকবে না আর বাকি
কোনো স্বপ্নে, কোনো গন্ধে গানে ?
আরেক দিনের বনচ্ছায়ায় লিখা
ফিরবে না কি তাহার মরীচিকা।
অশ্রুতে তার আভাস দিবে নাকি
আরেক দিনের আঁখি।

নাহয় তাও লুপ্ত যদিই হয়,
তার লাগি শোক সেও তো সেই পথে।
এ জগতে সদাই ঘটে ক্ষয়,
ক্ষতি তবু হয় না কোনোমতে।
শুকিয়ে-পড়া পুষ্পদলের ধূলি
এ ধরণী যায় যদি বা ভুলি—
সেই ধুলারই বিস্মরণের কোলে
নতুন কুসুম দোলে।

আণ্ডেস জাহাজ
১৯ অক্টোবর ১৯২৪

আশা

মস্ত যে-সব কাণ্ড করি, শক্ত তেমন নয় ;
জগৎ-হিতের তরে ফিরি বিশ্বজগৎময়।
সঙ্গীর ভিড় বেড়ে চলে ; অনেক লেখাপড়া,
অনেক ভাষায় বকাবকি, অনেক ভাঙাগড়া।
ক্রমে ক্রমে জাল গেঁথে যায়, গিঁঠের পরে গিঁঠ,
মহল-'পরে মহল ওঠে, ইটের 'পরে ইঁট।

বহু দিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোণে
রহিব আপন মনে;—
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।
গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা,
ঘরে-আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা,
চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে,
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা;—
ধন নয়, মান নয়, এইটুকু বাসা
করেছিনু আশা।

বহু দিন মনে ছিল আশা
অন্তরের ধ্যানখানি
লভিবে সম্পূর্ণ বাণী;—
ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা
করেছিনু আশা।

'আশা' কবিতার পাণ্ডুলিপি

কীর্তিরে কেউ ভালো বলে, মন্দ বলে কেহ ;
বিশ্বাসে কেউ কাছে আসে, কেউ করে সন্দেহ।
কিছু খাঁটি, কিছু ভেজাল, মসলা যেমন জোটে,
মোটের 'পরে একটা কিছু হয়ে ওঠেই ওঠে।

কিন্তু যে-সব ছোটো আশা করুণ অতিশয়,
সহজ বটে শুনতে লাগে, মোটেই সহজ নয়।
একটুকু সুখ গানের সুরে ফুলের গন্ধে মেশা
গাছের-ছায়ায়-স্বপ্ন-দেখা অবকাশের নেশা,
মনে ভাবি, চাইলে পাব ; যখন তারে চাহি,
তখন দেখি চঞ্চলা সে কোনোখানেই নাহি।
অরূপ অকূল বাষ্পমাঝে বিধি কোমর বেঁধে
আকাশটারে কাঁপিয়ে যখন সৃষ্টি দিলেন ফেঁদে
আদ্যযুগের খাটুনিতে পাহাড় হল উচ্চ
লক্ষযুগের স্বপ্নে পেলেন প্রথম ফুলের গুচ্ছ।

বহুদিন মনে ছিল আশা—
ধরণীর এক কোণে
রহিব আপন-মনে ;
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।
গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা,
ঘরে-আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা,
চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে,
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা।
ধন নয়, মান নয়, এইটুকু বাসা
করেছিনু আশা।

বহুদিন মনে ছিল আশা—
অন্তরের ধ্যানখানি
লভিবে সম্পূর্ণ বাণী ;
ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা
করেছিনু আশা।
মেঘে মেঘে এঁকে যায় অস্তগামী রবি
কল্পনার শেষ রঙে সমাপ্তির ছবি,
আপন স্বপনলোক আলোকে ছায়ায়
রঙে রসে রচি দিব তেমনি মায়ায়।

তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা ;
ধন নয়, মান নয়, ধেয়ানের ভাষা
করেছিনু আশা ।

বহুদিন মনে ছিল আশা—
প্রাণের গভীর ক্ষুধা
পাবে তার শেষ সুধা ;
ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা
করেছিনু আশা ।
হৃদয়ের সুর দিয়ে নামটুকু ডাকা,
অকারণে কাছে এসে হাতে হাত রাখা,
দূরে গেলে একা বসে মনে মনে ভাবা,
কাছে এলে দুই চোখে কথা-ভরা আভা ।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা ;
ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা
করেছিনু আশা ।

আন্ডেস জাহাজ
১৯ অক্টোবর ১৯২৪

বাতাস

গোলাপ বলে, ওগো বাতাস, প্রলাপ তোমার বুঝতে কে বা পারে,
কেন এসে ঘা দিলে মোর দ্বারে ?
বাতাস বলে, ওগো গোলাপ, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
আমি জানি কাহার পরশ খোঁজ ;
সেই প্রভাতের আলো এল, আমি কেবল ভাঙিয়ে দিলাম ঘুম,
হে মোর কুসুম ।
পাখি বলে, ওগো বাতাস, কী তুমি চাও বুঝিয়ে বলো মোরে,
কুলায় আমার দুলাও কেন ভোরে ?
বাতাস বলে, ওগো পাখি, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
আমি জানি তুমি কারে খোঁজ ;
সেই আকাশে জাগল আলো, আমি কেবল দিনু তোমায় আনি
সীমাহীনের বাণী ।

নদী বলে, ওগো বাতাস, বুঝতে নারি কী যে তোমার কথা,
কিসের লাগি এতই চঞ্চলতা ।

বাতাস বলে, ওগো নদী, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
জানি তোমার বিলয় যেথা খোঁজ ;
সেই সাগরের ছন্দ আমি এনে দিলাম তোমার বুকের কাছে,
তোমার ঢেউয়ের নাচে ।

অরণ্য কয়, ওগো বাতাস, নাহি জানি বুঝি কি নাই বুঝি
তোমার ভাষায় কাহার চরণ পূজি ।
বাতাস বলে, হে অরণ্য, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
আমি জানি কাহার মিলন খোঁজ ;
সেই বসন্ত এল পথে, আমি কেবল সুর জাগাতে পারি
তাহার পূর্ণতারই ।

শুধায় সবে, ওগো বাতাস, তবে তোমার আপন কথা কী যে—
বলো মোদের কী চাও তুমি নিজে ।
বাতাস বলে, আমি পথিক, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
আমি বুঝি তোমরা কারে খোঁজ ;
আমি শুধু যাই চলে আর সেই অজানার আভাস করি দান,
আমার শুধু গান ।

লিসবন বন্দর । আন্ডেস জাহাজ
২০ অক্টোবর ১৯২৪

স্বপ্ন

তোমায় আমি দেখি নাকো, শুধু তোমার স্বপ্ন দেখি—
তুমি আমায় বারে বারে শুধাও, 'ওগো, সত্য সে কি ?'
কী জানি গো, হয়তো বুঝি
তোমার মাঝে কেবল খুঁজি
এই জনমের রূপের তলে আর-জনমের ভাবের স্মৃতি ।
হয়তো হেরি তোমার চোখে
আদিযুগের ইন্দ্রলোকে
শিশুচাঁদের পথ-ভোলানো পারিজাতের ছায়াবীথি ।
এই কূলেতে ডাকি যখন সাড়া যে দাও সেই ওপারে,
পরশ তোমার ছাড়িয়ে কায়া বাজে মায়ার বীণার তারে ।
হয়তো হবে সত্য তাই,
হয়তো তোমার স্বপন, আমার আপন মনের মত্ততাই ।

আমি বলি স্বপ্ন যাহা তার চেয়ে কি সত্য আছে ।
যে তুমি মোর দূরের মানুষ সেই তুমি মোর কাছের কাছে ।
সেই তুমি আর নও তো বাঁধন,
স্বপ্নরূপে মুক্তিসাধন,

ফুলের সাথে তারার সাথে তোমার সাথে সেথায় মেলা।
নিত্যকালের বিদেশিনী,
তোমায় চিনি, নাই বা চিনি,
তোমার লীলায় ঢেউ তুলে যায় কভু সোহাগ, কভু হেলা।
চিত্তে তোমার মূর্তি নিয়ে ভাবসাগরের খেয়ায় চড়ি।
বিধির মনের কল্পনারে আপন মনে নতুন গড়ি।
আমার কাছে সত্য তাই,
মন-ভরানো পাওয়ায় ভরা বাইরে-পাওয়ার ব্যর্থতাই।

আপনি তুমি দেখেছ কি আপন-মাঝে সত্য কী যে।
দিতে যদি চাও তা কারে, দিতে কি তাই পার নিজে।
হয়তো তারে দুঃখদিনে
অগ্নি-আলোয় পাবে চিনে,
তখন তোমার নিবিড় বেদন নিবেদনের জ্বালবে শিখা।
অমৃত যে হয় নি মথন,
তাই তোমাতে এই অযতন ;
তাই তোমারে ঘিরে আছে ছলন-ছায়ার কুহেলিকা।
নিত্যকালের আপন তোমায় লুকিয়ে বেড়ায় মিথ্যা সাজে,
ক্ষণে ক্ষণে ধরা পড়ে শুধু আমার স্বপন-মাঝে।
আমি জানি সত্য তাই—
মরণ-দুঃখে অমর জাগে, অমৃতেরই তত্ত্ব তাই।

পুষ্পমালার গ্রন্থিখানা অনাদরে পড়ুক ছিঁড়ে,
ফুরাক বেলা, জীর্ণ খেলা হারাক হেলাফেলার ভিড়ে।
ছল করে যা পিছু ডাকে
পিছন ফিরে চাস নে তাকে,
ডাকে না যে যাবার বেলায় যাস নে তাহার পিছে পিছে।
যাওয়া-আসা-পথের ধুলায়
চপল পায়ের চিহ্নগুলায়
গ'নে গ'নে আপন মনে কাটাস নে দিন মিছে মিছে।
কী হবে তোর বোঝাই করে ব্যর্থ দিনের আবর্জনা ;
স্বপ্ন শুধুই মর্তে অমর, আর সকলই বিড়ম্বনা।
নিত্য প্রাণের সত্য তাই—
প্রাণ দিয়ে তুই রচিস যারে, অসীম পথের পথ্য তাই।

লিস্‌বন বন্দর। আন্ডেস জাহাজ
২০ অক্টোবর ১৯২৪

সমুদ্র

হে সমুদ্র, স্তব্ধচিত্তে শুনেছিনু গর্জন তোমার
রাত্রিবেলা ; মনে হল গাঢ় নীল নিঃসীম নিদ্রার
স্বপ্ন ওঠে কেঁদে কেঁদে । নাই, নাই তোমার সান্ত্বনা ;
যুগ যুগান্তর ধরি নিরন্তর সৃষ্টির যন্ত্রণা
তোমার রহস্য-গর্ভে ছিন্ন করি কৃষ্ণ আবরণ
প্রকাশ সন্ধান করে । কত মহাদ্বীপ মহাবন
এ তরল রঙ্গশালে রূপে প্রাণে কত নৃত্যে গানে
দেখা দিয়ে কিছুকাল, ডুবে গেছে নেপথ্যের পানে
নিঃশব্দ গভীরে । হারানো সে চিহ্নহারা যুগগুলি
মূর্তিহীন ব্যর্থতায় নিত্য অন্ধ আন্দোলন তুলি
হানিছে তরঙ্গ তব । সব রূপ সব নৃত্য তার
ফেনিল তোমার নীলে বিলীন দুলিছে একাকার ।
স্থলে তুমি নানা গান উৎক্ষেপে করেছ আবর্জন,
জলে তব এক গান— অব্যক্তের অস্থির গর্জন ।

২

হে সমুদ্র, একা আমি মধ্যরাতে নিদ্রাহীন চোখে
কল্লোলমন্দ্রর মধ্যে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ ঊর্ধ্বলোকে
চাহিলাম ; শুনিলাম নক্ষত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজে
আকাশের বিপুল ক্রন্দন ; দেখিলাম শূন্যমাঝে
আঁধারের আলোকব্যগ্রতা । কত শত মন্বন্তরে
কত জ্যোতির্লোক গূঢ় বহ্নিময় বেদনার ভরে
অস্ফুটের আচ্ছাদন দীর্ণ করি তীক্ষ্ণ রশ্মিঘাতে
কালের বক্ষের মাঝে পেল স্থান প্রোজ্জ্বল প্রভাতে
প্রকাশ-উৎসব-দিনে । যুগসন্ধ্যা কবে এল তার,
ডুবে গেল অলক্ষ্যে অতলে । রূপনিঃস্ব হাহাকার
অদৃশ্য বুভুক্ষু ভিক্ষু ফিরিছে বিশ্বের তীরে তীরে,
ধূলায় ধূলায় তার আঘাত লাগিছে ফিরে ফিরে ।
ছিল যা প্রদীপ্তরূপে নানা ছন্দে বিচিত্র চঞ্চল
আজ অন্ধ তরঙ্গের কম্পনে হানিছে শূন্যতল ।

৩

হে সমুদ্র, চাহিলাম আপন গহন চিত্তপানে ;
কোথায় সঞ্চয় তার, অন্ত তার কোথায় কে জানে ।
ওই শোনো সংখ্যাহীন সংজ্ঞাহীন অজানা ক্রন্দন
অমূর্ত আঁধারে ফিরে, অকারণে জাগায় স্পন্দন
বক্ষতলে । এক কালে ছিল রূপ, ছিল বুঝি ভাষা ;
বিশ্বগীতিনির্ঝরের তীরে তীরে বুঝি কত বাসা

বেঁধেছিল কোন্ জন্মে— দুঃখে সুখে নানা বর্ণে রাঙি
তাহাদের রঙ্গমঞ্চ হঠাৎ পড়িল কবে ভাঙি
অতৃপ্ত আশার ধূলিস্তূপে। আকার হারালো তারা,
আবাস তাদের নাহি। খ্যাতিহারা সেই স্মৃতিহারা
সৃষ্টিছাড়া ব্যর্থ ব্যথা প্রাণের নিভৃত লীলাঘরে
কোণে কোণে ঘোরে শুধু মূর্তি-তরে, আশ্রয়ের তরে।
রাগে অনুরাগে যারা বিচিত্র আছিল কত রূপে,
আজ শূন্য দীর্ঘশ্বাস আঁধারে ফিরিছে চুপে চুপে।

আণ্ডেস জাহাজ
২১ অক্টোবর ১৯২৪

মুক্তি

মুক্তি নানা মূর্তি ধরি দেখা দিতে আসে নানা জনে—
এক পন্থা নহে।
পরিপূর্ণতার সুধা নানা স্বাদে ভুবনে ভুবনে
নানা স্রোতে বহে।
সৃষ্টি মোর সৃষ্টি-সাথে মেলে যেথা, সেথা পাই ছাড়া,
মুক্তি যে আমারে তাই সংগীতের মাঝে দেয় সাড়া,
সেথা আমি খেলা-খ্যাপা বালকের মতো লক্ষ্মীছাড়া
লক্ষ্যহীন নগ্ন নিরুদ্দেশ।
সেথা মোর চির নব, সেথা মোর চিরন্তন শেষ।

মাঝে মাঝে গানে মোর সুর আসে যে সুরে, হে গুণী,
তোমারে চিনায়।
বেঁধে দিয়ো নিজহাতে সেই নিত্য সুরের ফাল্গুনী
আমার বীণায়।
তা হলে বুঝিব আমি ধূলি কোন্ ছন্দে হয় ফুল
বসন্তের ইন্দ্রজালে অরণ্যেরে করিয়া ব্যাকুল,
নব নব মায়াচ্ছায়া কোন্ নৃত্যে নিয়ত দোদুল
বর্ণ বর্ণ ঋতুর দোলায়।
তোমারি আপন সুর কোন্ তালে তোমারে ভোলায়।

যেদিন আমার গান মিলে যাবে তোমার গানের
সুরের ভঙ্গিতে
মুক্তির সংগমতীর্থ পাব আমি আমারি প্রাণের
আপন সংগীতে।
সেদিন বুঝিব মনে নাই নাই বস্তুর বন্ধন,
শূন্যে শূন্যে রূপ ধরে তোমারই এ বীণার স্পন্দন—
নেমে যাবে সব বোঝা, থেমে যাবে সকল ক্রন্দন,

ছন্দে তালে ভুলিব আপনা,
বিশ্বগীতপদ্মদলে স্তব্ধ হবে অশান্ত ভাবনা।

সঁপি দিব সুখ দুঃখ আশা ও নৈরাশ্য যত-কিছু
তব বীণাতারে—
ধরিবে গানের মূর্তি, একান্তে করিয়া মাথা নিচু
শুনিব তাহারে।
দেখিব তাদের যেথা ইন্দ্রধনু অকস্মাৎ ফুটে,
দিগন্তে বনের প্রান্তে উষার উত্তরী যেথা লুটে,
বিবাগী ফুলের গন্ধ মধ্যাহ্নে যেথায় যায় ছুটে—
নীড়ে-ধাওয়া পাখির ডানায়
সায়াহ্নগগন যেথা দিবসেরে বিদায় জানায়।

সেদিন আমার রক্তে শুনা যাবে দিবসরাত্রির
নৃত্যের নূপুর।
নক্ষত্র বাজাবে বক্ষে বংশীধ্বনি আকাশযাত্রীর
আলোকবেণুর।
সেদিন বিশ্বের তৃণ মোর অঙ্গে হবে রোমাঞ্চিত,
আমার হৃদয় হবে কিংশুকের রক্তিমালাঞ্ছিত;
সেদিন আমার মুক্তি, যবে হবে, হে চিরবাঞ্ছিত,
তোমার লীলায় মোর লীলা—
যেদিন তোমার সঙ্গে গীতরঙ্গে তালে তালে মিলা।

অ্যান্ডেস জাহাজ
২২ অক্টোবর ১৯২৪

ঝড়

অন্ধ কেবিন আলোয় আঁধার গোলা,
বন্ধ বাতাস কিসের গন্ধে ঘোলা।
মুখ ধোবার ওই ব্যাপারখানা দাঁড়িয়ে আছে সোজা,
ক্লান্ত চোখের বোঝা।
দুলছে কাপড় pegএ
বিজলি-পাখার হাওয়ার ঝাপট লেগে।
গায়ে গায়ে ঘেঁষে
জিনিসপত্র আছে কায়ক্লেশে।
বিছানাটা কৃপণ-গতিকের
অনিচ্ছাতে ক্ষণকালের সহায় পথিকের।
ঘরে আছে যে-কটা আসবাব
নিত্য যতই দেখি, ভাবি ওদের মুখের ভাব
নারাজ ভৃত্যসম—
পাশেই থাকে মম,

কোনোমতে করে কেবল কাজ-চলা-গোছ সেবা।
এমন ঘরে আঠারো দিন থাকতে পারে কেবা।
কষ্ট ব'লে একটা দানব ছোট্ট খাঁচায় পুরে
নিয়ে চলে আমায় কত দূরে।
নীল আকাশে নীল সাগরে অসীম আছে বসে,
কী জানি কোন্ দোষে
ঠেলেঠুলে চেপেচুপে মোরে
সেখান হতে করেছে একঘরে।

হেনকালে ক্ষুদ্র দুখের ক্ষুদ্র ফাটল বেয়ে
কেমন করে এল হঠাৎ ধেয়ে
বিশ্বধরার বক্ষ হতে বিপুল দুখের প্রবল বন্যাধারা।
এক নিমেষে আমারে সে করলে আত্মহারা,
আনলে আপন বৃহৎ সান্ত্বনারে,
আনলে আপন গর্জনেতে ইন্দ্রলোকের অভয়-ঘোষণারে।
মহাদেবের তপের জটা হতে
মুক্তিমন্দাকিনী এল কূল-ডোবানো স্রোতে;
বললে আমার চিত্ত ঘিরে ঘিরে—
ভস্ম আবার ফিরে পাবে জীবন-অগ্নিরে।
বললে— আমি সুরলোকের অশ্রুজলের দান,
মরুর পাথর গলিয়ে ফেলে ফলাই অমর প্রাণ,
মৃত্যুঞ্জয়ের ডমরুরব শোনাই কলস্বরে,
মহাকালের তাণ্ডবতাল সদাই বাজাই উদ্দাম নির্ঝরে।
স্বপ্নসম টুটে
এই কেবিনের দেওয়াল গেল ছুটে।
রোগশয্যা মম
হল উদার কৈলাসেরই শৈলশিখর-সম।
আমার মনপ্রাণ
উঠল গেয়ে রুদ্রেরই জয়গান।

সুপ্তির জড়িমাঘোরে
তীরে থেকে তোরা ওরে
করেছিস ভয়
যে ঝড় সহসা কানে
বজ্রের গর্জন আনে—
'নয়, নয়, নয়।'

তোরা বলেছিলি তাকে,
'বাঁধিয়াছি ঘর।
মিলেছে পাখির ডাকে
তরুর মর্মর।

পেয়েছি তৃষ্ণার জল,
ফলেছে ক্ষুধার ফল,
ভাণ্ডারে হয়েছে ভরা লক্ষ্মীর সঞ্চয়।'
ঝড়, বিদ্যুতের ছন্দে
ডেকে ওঠে মেঘমন্দ্রে—
'নয়, নয়, নয়।'

সমুদ্রে আমার তরী ;
আসিয়াছি ছিন্ন করি
তীরের আশ্রয়।
ঝড় বন্ধু তাই কানে
মাঙ্গল্যের মন্ত্র আনে—
'জয়, জয়, জয়।'

আমি যে-সে প্রচণ্ডেরে
করেছি বিশ্বাস—
তরীর পালে সে যে রে
রুদ্রেরই নিশ্বাস।
বলে সে বক্ষের কাছে,
'আছে আছে, পার আছে,
সন্দেহবন্ধন ছিঁড়ি লহো পরিচয়।'
বলে ঝড় অবিশ্রান্ত,
'তুমি পান্থ, আমি পান্থ—
জয়, জয়, জয়।'

যায় ছিঁড়ে, যায় উড়ে—
বলেছিলি মাথা খুঁড়ে,
'এ দেখি প্রলয়।'
ঝড় বলে, 'ভয় নাই,
যাহা দিতে পারো তাই
রয়, রয়, রয়।'

চলেছি সম্মুখ-পানে
চাহিব না পিছু।
ভাসিল বন্যার টানে
ছিল যত কিছু।
রাখি যাহা তাই বোঝা—
তারে খোওয়া, তারে খোঁজা,
নিত্যই গণনা তারে, তারি নিত্য ক্ষয়।
ঝড় বলে, 'এ তরঙ্গে
যাহা ফেলে দাও রঙ্গে
রয়, রয়, রয়।'

এ মোর যাত্রীর বাঁশি
ঝঞ্ঝার উদ্দাম হাসি
নিয়ে গাঁথে সুর—
বলে, সে, 'বাসনা-অন্ধ,
নিশ্চল শৃঙ্খলবন্ধ
দূর, দূর, দূর।'

গাহে, 'পশ্চাতের কীর্তি,
সম্মুখের আশা
তার মধ্যে ফেঁদে ভিত্তি
বাঁধিস নে বাসা।
নে তোর মৃদঙ্গে শিখে
তরঙ্গের ছন্দটিকে,
বৈরাগীর নৃত্যভঙ্গি চঞ্চল সিন্ধুর।
যত লোভ— যত শঙ্কা
দাসত্বের জয়ডঙ্কা
দূর, দূর, দূর।'

এসো গো ধ্বংসের নাড়া,
পথভোলা, ঘরছাড়া,
এসো গো দুর্জয়।
ঝাপটি মৃত্যুর ডানা
শূন্যে দিয়ে যাও হানা—
'নয়, নয়, নয়।'

আবেশের রসে মত্ত
আরামশয্যায়
বিজড়িত যে জড়ত্ব
মজ্জায় মজ্জায়—
কার্পণ্যের বন্ধ দ্বারে
সংগ্রহের অন্ধকারে
যে আত্মসংকোচ নিত্য গুপ্ত হয়ে রয়
হানো তারে হে নিঃশঙ্ক,
ঘোষুক তোমার শঙ্খ—
'নয়, নয়, নয়।'

অ্যান্ডেস জাহাজ
২৪ অক্টোবর ১৯২৪

পদধ্বনি

আঁধারে প্রচ্ছন্ন ঘন বনে
আশঙ্কার পরশনে
হরিণের থরথর হৃৎপিণ্ড যেমন—
সেইমত রাত্রি দ্বিপ্রহরে
শয্যা মোর ক্ষণতরে
সহসা কাঁপিল অকারণ।

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি
শুনিনু তখনি।
মোর জন্মনক্ষত্রের অদৃশ্য জগতে
মোর ভাগ্য মোর তরে বার্তা লয়ে ফিরিছে কি পথে।

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি।
অজানার যাত্রী কে গো। ভয়ে কেঁপে উঠিল ধরণী।
এই কি নির্মম সেই যে আপন চরণের তলে
পদে পদে চিরদিন
উদাসীন
পিছনের পথ মুছে চলে।
এ কি সেই নিত্যশিশু, কিছু নাহি চাহে—
নিজের খেলেনা চূর্ণ
ভাসাইছে অসম্পূর্ণ
খেলার প্রবাহে ?
ভাঙিয়া স্বপ্নের ঘোর,
ছিঁড়ি মোর
শয্যায় বন্ধনমোহ, এ রাত্রিবেলায়
মোরে কি করিবে সঙ্গী প্রলয়ের ভাসান-খেলায়।

হোক তাই—
ভয় নাই, ভয় নাই,
এ খেলা খেলেছি বারংবার
জীবনে আমার।
জানি জানি— ভাঙিয়া নূতন করে তোলা,
ভুলায়ে পূর্বের পথ অপূর্বের পথে দ্বার খোলা,
বাঁধন গিয়েছে যবে চুকে
তারি ছিন্ন রশিগুলি কুড়ায়ে কৌতুকে
বার বার গাঁথা হল দোলা।
নিয়ে যত মুহূর্তের ভোলা
চিরস্মরণের ধন
গোপনে হয়েছে আয়োজন।

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি
চিরদিন শুনেছি এমনি
বারে বারে।
একি বাজে মৃত্যুসিন্ধুপারে।
একি মোর আপন বক্ষেতে।
ডাকে মোরে ক্ষণে ক্ষণে কিসের সংকেতে।
তবে কি হবেই যেতে।
সব বন্ধ করিব ছেদন ?
ওগো কোন্ বন্ধু তুমি, কোন্ সঙ্গী দিতেছ বেদন
বিচ্ছেদের তীর হতে।
তরী কি ভাসাব স্রোতে
হে বিরহী,
আমার অন্তরে দাও কহি
ডাকো মোরে কী খেলা খেলাতে
আতঙ্কিত নিশীথবেলাতে ?

বারে বারে দিয়েছ নিঃসঙ্গ করি—
এ শূন্য প্রাণের পাত্র কোন্ সঙ্গসুধা দিয়ে ভরি
তুলে নেবে মিলন-উৎসবে।
সূর্যাস্তের পথ দিয়ে যবে
সন্ধ্যাতারা উঠে আসে নক্ষত্রসভায়,
প্রহর না যেতে যেতে
কী সংকেতে
সব সঙ্গ ফেলে রেখে অস্তপথে ফিরে চলে যায়।
সেও কি এমনি
শোনে পদধ্বনি।
তারে কি বিরহী
বলে কিছু দিগন্তের অন্তরালে রহি।

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি।
দিনশেষে
কম্পিত বক্ষের মাঝে এসে
কী শব্দে ডাকিছে কোন্ অজানা রজনী।

অ্যান্ডেস জাহাজ
২৪ অক্টোবর ১৯২৪

প্রকাশ

খুঁজতে যখন এলাম সেদিন কোথায় তোমার গোপন অশ্রুজল,
সে পথ আমায় দাও নি তুমি বলে।
বাহির-দ্বারে অধীর খেলা, ভিড়ের মাঝে হাসির কোলাহল,
দেখে এলেম চলে।
এই ছবি মোর ছিল মনে—
নির্জনমন্দিরের কোণে
দিনের অবসানে
সন্ধ্যাপ্রদীপ আছে চেয়ে ধ্যানের চোখে সন্ধ্যাতারার পানে।
নিভৃত ঘর কাহার লাগি
নিশীথ-রাতে রইল জাগি,
খুলল না তার দ্বার।
হে চঞ্চলা, তুমি বুঝি
আপনিও পথ পাও নি খুঁজি,
তোমার কাছে সে ঘর অন্ধকার।

জানি তোমার নিকুঞ্জে আজ পলাশ-শাখায় রঙের নেশা লাগে,
আপন গন্ধে বকুল মাতোয়ারা।
কাঙাল সুরে দখিন বাতাস বনে বনে গুপ্ত কী ধন মাগে,
বেড়ায় নিদ্রাহারা।
হায় গো তুমি জান না যে
তোমার মনের তীর্থমাঝে
পূজা হয় নি আজও।
দেব্‌তা তোমার বুভুক্ষিত, মিথ্যা-ভূষায় কী সাজ তুমি সাজো।
হল সুখের শয়ন পাতা,
কণ্ঠহারের মানিক গাঁথা,
প্রমোদ-রাতের গান,
হয় নি কেবল চোখের জলে
লুটিয়ে মাথা ধুলার তলে
আপন-ভোলা সকল-শেষের দান।

ভোলাও যখন তখন সে কোন্‌ মায়ার ঢাকা পড়ে তোমার 'পরে—
ভুলবে যখন তখন প্রকাশ পাবে;
উষার মতো অমল হাসি জাগবে তোমার আঁখির নীলাম্বরে
গভীর অনুভাবে।
ভোগ সে নহে, নয় বাসনা,
নয় আপনার উপাসনা,
নয়কো অভিমান—
সরল প্রেমের সহজ প্রকাশ, বাইরে যে তার নাই রে পরিমাণ।

আপন প্রাণের চরম কথা
বুঝবে যখন, চঞ্চলতা
তখন হবে চুপ।
তখন দুঃখসাগর-তীরে।
লক্ষ্মী উঠে আসবে ধীরে
রূপের কোলে পরম অপরূপ।

অ্যান্ডেস জাহাজ
২৬ অক্টোবর ১৯২৪

শেষ

হে অশেষ, তব হাতে শেষ
ধরে কী অপূর্ব বেশ,
কী মহিমা।
জ্যোতির্হীন সীমা
মৃত্যুর অগ্নিতে জ্বলি
যায় গলি,
গড়ে তোলে অসীমের অলংকার।
হয় সে অমৃতপাত্র, সীমার ফুরালে অহংকার।
শেষের দীপালিরাত্রে, হে অশেষ,
অমা-অন্ধকার-রন্ধ্রে দেখা যায় তোমার উদ্দেশ।

ভোরের বাতাসে
শেফালি ঝরিয়া পড়ে ঘাসে,
তারাহারা রাত্রির বীণার
চরম ঝংকার।
যামিনীর তন্দ্রাহীন দীর্ঘ পথ ঘুরি
প্রভাত-আকাশে চন্দ্র, করুণ মাধুরী
শেষ করে যায় তার
উদয়সূর্যের পানে শান্ত নমস্কার।
যখন কর্মের দিন
ম্লান ক্ষীণ
গোষ্ঠে-চলা ধেনু-সম সন্ধ্যার সমীরে
চলে ধীরে আঁধারের তীরে—
তখন সোনার পাত্র হতে
কী অজস্র স্রোতে
তাহারে করাও স্নান অন্তিমের সৌন্দর্যধারায়।
যখন বর্ষার মেঘ নিঃশেষে হারায়
বর্ষণের সকল সম্বল,
শরতে শিশুর জন্ম দাও তারে শুভ্র সমুজ্জ্বল।

হে অশেষ, তোমার অঙ্গনে
ভারমুক্ত তার সাথে ক্ষণে ক্ষণে
খেলায়ে রঙের খেলা,
ভাসায়ে আলোর ভেলা,
বিচিত্র করিয়া তোল তার শেষ বেলা।
ক্লান্ত আমি তারি লাগি, অন্তর তৃষিত—
কত দূরে আছে সেই খেলাভরা মুক্তির অমৃত।
বধূ যথা গোধূলিতে শেষ ঘট ভরে
বেণুচ্ছায়াঘন পথে অন্ধকারে ফিরে যায় ঘরে,
সেই মতো, হে সুন্দর, মোর অবসান
তোমার মাধুরী হতে
সুধাস্রোতে
ভরে নিতে চায় তার দিনান্তের গান।
হে ভীষণ, তব স্পর্শঘাত
অকস্মাৎ
মোর গূঢ় চিত্ত হতে কবে
চরম বেদনা-উৎস মুক্ত করি অগ্নিমহোৎসবে
অপূর্ণের যত দুঃখ যত অসম্মান
উচ্ছ্বসিত রুদ্র হাস্যে করি দিবে শেষ দীপ্যমান।

অ্যান্ডেস জাহাজ
২৯ অক্টোবর ১৯২৪
Equator পার হয়ে আজ দক্ষিণমেরুর মুখে

দোসর

দোসর আমার, দোসর ওগো, কোথা থেকে
কোন্ শিশুকাল হতে আমায় গেলে ডেকে।
তাই তো আমি চিরজনম একলা থাকি,
সকল বাঁধন টুটল আমার, একটি কেবল রইল বাকি—
সেই তো তোমার ডাকার বাঁধন, অলখ ডোরে
দিনে দিনে বাঁধল মোরে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, সে ডাক তব
কত ভাষায় কয় যে কথা নব নব।
চমকে উঠে ছুটি যে তাই বাতায়নে,
সকল কাজে বাধা পড়ে, বসে থাকি আপন-মনে—
পারের পাখি আকাশে ধায় উধাও গানে,
চেয়ে থাকি তাহার পানে।

দোসর আমার, দোসর ওগো, যে বাতাসে
বসন্ত তার পুলক জাগায় ঘাসে ঘাসে,
ফুল-ফোটানো তোমার লিপি সেই কি আনে।
গুঞ্জরিয়া মর্মরিয়া কী বলে যায় কানে কানে,
কে যেন তা বোঝে আমার বক্ষতলে,
ভাসে নয়ন অশ্রুজলে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, কোন্ সুদূরে।
ঘরছাড়া মোর ভাব্না-বাউল বেড়ায় ঘুরে।
তারে যখন শুধাই, সে তো কয় না কথা,
নিয়ে আসে স্তব্ধ গভীর নীলাম্বরের নীরবতা।
একতারা তার বাজায় কভু গুন্‌গুনিয়ে,
রাত কেটে যায় তাই শুনিয়ে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, উঠল হাওয়া—
এবার তবে হোক আমাদের তরী বাওয়া।
দিনে দিনে পূর্ণ হল ব্যথার বোঝা,
তীরে তীরে ভাঙন লাগে, মিথ্যে কিসের বাসা খোঁজা।
একে একে সকল রশি গেছে খুলে,
ভাসিয়ে এবার দাও অকূলে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, দাও-না দেখা—
সময় হল, একার সাথে মিলুক একা।
নিবিড় নীরব অন্ধকারে রাতের বেলায়
অনেক দিনের দূরের ডাকা পূর্ণ করো কাছের খেলায়—
তোমায় আমায় নতুন পালা হোক-না এবার
হাতে হাতে দেবার নেবার।

অ্যান্ডেস জাহাজ
২৮ অক্টোবর ১৯২৪

অবসান

পারের ঘাটা পাঠালো তরী ছায়ার পাল তুলে,
আজি আমার প্রাণের উপকূলে।
মনের মাঝে কে কয় ফিরে ফিরে—
বাঁশির সুরে ভরিয়া দাও গোধূলি-আলোটিরে।
সাঁঝের হাওয়া করুণ হোক দিনের অবসানে
পাড়ি দেবার গানে।

সময় যদি এসেছে তবে সময় যেন পাই,
নিভৃত খনে আপন-মনে গাই।

আভাস যত বেড়ায় ঘুরে মনে—
অশ্রুঘন কুহেলিকায় লুকায় কোণে কোণে—
আজিকে তারা পড়ুক ধরা, মিলুক পূরবীতে
একটি সংগীতে।

সন্ধ্যা মম, কোন্ কথাটি প্রাণের কথা তব—
আমার গানে, বলো, কী আমি কব।
দিনের শেষে যে ফুল পড়ে ঝরে
তাহারি শেষ নিশ্বাসে কি বাঁশিটি নেব ভরে?
অথবা বসে বাঁধিব সুর যে তারা ওঠে রাতে
তাহারি মহিমাতে।

সন্ধ্যা মম, যে পার হতে ভাসিল মোর তরী
গাব কি আজি বিদায়গান ওরই।
অথবা সেই অদেখা দূর পারে
প্রাণের চিরদিনের আশা পাঠাব অজানারে?
বলিব— যত হারানো বাণী তোমার রজনীতে
চলিনু খুঁজে নিতে।

অ্যান্ডেস জাহাজ
৩০ অক্টোবর ১৯২৪

তারা

আকাশ-ভরা তারার মাঝে আমার তারা কই।
ওই হবে কি ওই।
রাঙা আভার আভাস-মাঝে, সন্ধ্যারবির রাগে
সিন্ধুপারের ঢেউয়ের ছিটে ওই যাহারে লাগে,
ওই যে লাজুক আলোখানি, ওই যে গো নামহারা,
ওই কি আমার হবে আপন তারা।

জোয়ার-ভাঁটার স্রোতের টানে আমার বেলা কাটে
কেবল ঘাটে ঘাটে।
এমনি করে পথে পথে অনেক হল খোঁজা,
এমনি করে হাটে হাটে জমল অনেক বোঝা—
ইমনে আজ বাঁশি বাজে, মন যে কেমন করে
আকাশে মোর আপন তারার তরে।

দূরে এসে তার ভাষা কি ভুলেছি কোন্ খনে?
পড়বে না কি মনে?

ঘরে ফেরার প্রদীপ আমার রাখল কোথায় জ্বেলে
পথে-চাওয়া করুণ চোখের কিরণখানি মেলে।
কোন্ রাতে যে মেটাবে মোর তপ্ত দিনের তৃষা,
খুঁজে খুঁজে পাব না তার দিশা ?

ক্ষণে ক্ষণে কাজের মাঝে দেয় নি কি দ্বার নাড়া—
পাই নি কি তার সাড়া।
বাতায়নের মুক্তপথে স্বচ্ছ শরৎ-রাতে
তার আলোটি মেশে নি কি মোর স্বপনের সাথে।
হঠাৎ তারি সুরখানি কি ফাগুন-হাওয়া বেয়ে
আসে নি মোর গানের 'পরে ধেয়ে।

কানে কানে কথাটি তার অনেক সুখে দুখে
বেজেছে মোর বুকে।
মাঝে মাঝে তারি বাতাস আমার পালে এসে
নিয়ে গেছে হঠাৎ আমায় আন্‌মনাদের দেশে—
পথ-হারানো বনের ছায়ায় কোন্ মায়াতে ভুলে
গেঁথেছি হার নাম-না-জানা ফুলে।

আমার তারার মন্ত্র নিয়ে এলেম ধরাতলে
লক্ষ্যহারার দলে।
বাসায় এল পথের হাওয়া, কাজের মাঝে খেলা,
ভাসল ভিড়ের মুখর স্রোতে একলা প্রাণের ভেলা,
বিচ্ছেদেরই লাগল বাদল মিলন-ঘন রাতে
বাঁধনহারা শ্রাবণ-ধারা পাতে।

ফিরে যাবার সময় হল তাই তো চেয়ে রই—
আমার তারা কই ?
গভীর রাতে প্রদীপগুলি নিবেছে এই পারে,
বাসাহারা গন্ধ বেড়ায় বনের অন্ধকারে,
সুর ঘুমালো নীরব নীড়ে, গান হল মোর সারা—
কোন্ আকাশে আমার আপন তারা।

অ্যান্ডেস জাহাজ
১ নভেম্বর ১৯২৪

কৃতজ্ঞ

বলেছিনু 'ভুলিব না' যবে তব ছলছল আঁখি
নীরবে চাহিল মুখে। ক্ষমা কোরো যদি ভুলে থাকি।
সে যে বহুদিন হল। সেদিনের চুম্বনের 'পরে
কত নববসন্তের মাধবীমঞ্জরী থরে থরে

শুকায়ে পড়িয়া গেছে ; মধ্যাহ্নের কপোতকাকলি
তারি 'পরে ক্লান্ত ঘুম চাপা দিয়ে এল গেল চলি
কতদিন ফিরে ফিরে। তব কালো নয়নের দিঠি
মোর প্রাণে লিখেছিল প্রথম প্রেমের সেই চিঠি
লজ্জাভয়ে ; তোমার সে হৃদয়ের স্বাক্ষরের 'পরে
চঞ্চল আলোকছায়া কত কাল প্রহরে প্রহরে
বুলায়ে গিয়েছে তুলি, কত সন্ধ্যা দিয়ে গেছে এঁকে
তারি 'পরে সোনার বিস্মৃতি, কত রাত্রি গেছে রেখে
অস্পষ্ট রেখার জালে আপনার স্বপনলিখন
তাহারে আচ্ছন্ন করি। প্রতিমুহূর্তটি প্রতিক্ষণ
বাঁকাচোরা নানা চিত্রে চিন্তাহীন বালকের প্রায়
আপনার স্মৃতিলিপি চিত্তপটে এঁকে এঁকে যায়,
লুপ্ত করি পরস্পরে বিস্মৃতির জাল দেয় বুনে।
সেদিনের ফাল্গুনের বাণী যদি আজি এ ফাল্গুনে
ভুলে থাকি, বেদনার দীপ হতে কখন নীরবে
অগ্নিশিখা নিবে গিয়ে থাকে যদি, ক্ষমা কোরো তবে।

তবু জানি, একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে বলে
গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিল ফলে,
আজও নাই শেষ ; রবির আলোক হতে একদিন
ধ্বনিয়া তুলেছে তার মর্মবাণী, বাজায়েছে বীন
তোমার আঁখির আলো। তোমার পরশ নাহি আর,
কিন্তু কী পরশমণি রেখে গেছ অন্তরে আমার—
বিশ্বের অমৃতছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে
ক্ষণে ক্ষণে— অকারণ আনন্দের সুধাপাত্র ভ'রে
আমারে করায় পান। ক্ষমা কোরো যদি ভুলে থাকি।
তবু জানি একদিন তুমি মোরে নিয়েছিলে ডাকি
হৃদি-মাঝে ; আমি তাই আমার ভাগ্যেরে ক্ষমা করি—
যত দুঃখে যত শোকে দিন মোর দিয়েছে সে ভরি
সব ভুলে গিয়ে। পিপাসার জলপাত্র নিয়েছে সে
মুখ হতে, কতবার ছলনা করেছে হেসে হেসে,
ভেঙেছে বিশ্বাস, অকস্মাৎ ডুবায়েছে ভরা তরী
তীরের সম্মুখে নিয়ে এসে— সব তার ক্ষমা করি।
আজ তুমি আর নাই, দূর হতে গেছ তুমি দূরে,
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে-যাওয়া তোমার সিন্দূরে,
সঙ্গীহীন এ জীবন শূন্যঘরে হয়েছে শ্রীহীন,
সব মানি— সব চেয়ে মানি, তুমি ছিলে একদিন।

অ্যান্ডেস জাহাজ
২ নভেম্বর ১৯২৪

দুঃখসম্পদ

দুঃখ, তব যন্ত্রণায় যে দুর্দিনে চিত্ত উঠে ভরি,
দেহে মনে চতুর্দিকে তোমার প্রহরী
রোধ করে বাহিরের সান্ত্বনার দ্বার,
সেই ক্ষণে প্রাণ আপনার
নিগূঢ় ভাণ্ডার হতে গভীর সান্ত্বনা
বাহির করিয়া আনে ; অমৃতের কণা
গলে আসে অশ্রুজলে ;
সে আনন্দ দেখা দেয় অন্তরের তলে
যে আপন পরিপূর্ণতায়
আপন করিয়া লয় দুঃখবেদনায় ।
তখন সে মহা-অন্ধকারে
অনির্বাণ আলোকের পাই দেখা অন্তর-মাঝারে ।
তখন বুঝিতে পারি, আপনার মাঝে
আপন অমরাবতী চিরদিন গোপনে বিরাজে ।

আণ্ডেস জাহাজ
৪ নভেম্বর ১৯২৪

মৃত্যুর আহ্বান

জন্ম হয়েছিল তোর সকলের কোলে
আনন্দকল্লোলে ।
নীলাকাশ, আলো, ফুল, পাখি,
জননীর আঁখি,
শ্রাবণের বৃষ্টিধারা, শরতের শিশিরের কণা,
প্রাণের প্রথম অভ্যর্থনা ।
জন্ম সেই
এক নিমেষেই
অন্তহীন দান,
জন্ম সে যে গৃহমাঝে গৃহীরে আহ্বান ।

মৃত্যু তোর হোক দূরে নিশীথে নির্জনে,
হোক সেই পথে যেথা সমুদ্রের তরঙ্গগর্জনে
গৃহহীন পথিকেরই
নৃত্যছন্দে নিত্যকাল বাজিতেছে ভেরী ;
অজানা অরণ্যে যেথা উঠিতেছে উদাস মর্মর,
বিদেশের বিবাগী নির্ঝর
বিদায়-গানের তালে হাসিয়া বাজায় করতালি ;
যেথায় অপরিচিত নক্ষত্রের আরতির থালি

চলিয়াছে অনন্তের মন্দির-সন্ধানে,
পিছু ফিরে চাহিবার কিছু যেথা নাই কোনোখানে।
দুয়ার রহিবে খোলা ; ধরিত্রীর সমুদ্র-পর্বত
কেহ ডাকিবে না কাছে, সকলেই দেখাইবে পথ।
শিয়রে নিশীথরাত্রি রহিবে নির্বাক,
মৃত্যু সে যে পথিকের ডাক।

আ্যান্ডেস জাহাজ
৩ নভেম্বর ১৯২৪

দান

কাঁকনজোড়া এনে দিলেম যবে
ভেবেছিলেম হয়তো খুশি হবে।
তুলে তুমি নিলে হাতের 'পরে,
ঘুরিয়ে তুমি দেখলে ক্ষণেক-তরে,
পরেছিলে হয়তো গিয়ে ঘরে,
হয়তো বা তা রেখেছিলে খুলে।
এলে যেদিন বিদায় নেবার রাতে
কাঁকন-দুটি দেখি নাই তো হাতে,
হয়তো এলে ভুলে।

দেয় যে জনা কী দশা পায় তাকে।
দেওয়ার কথা কেনই মনে রাখে।
পাকা যে ফল পড়ল মাটির টানে
শাখা আবার চায় কি তাহার পানে।
বাতাসেতে উড়িয়ে-দেওয়া গানে
তারে কি আর স্মরণ করে পাখি।
দিতে যারা জানে এ সংসারে
এমন করেই তারা দিতে পারে
কিছু না রয় বাকি।

নিতে যারা জানে তারাই জানে,
বোঝে তারা মূল্যটি কোন্‌খানে।
তারাই জানে বুকের রত্নহারে
সেই মণিটি কজন দিতে পারে
হৃদয় দিয়ে দেখিতে হয় যারে—
যে পায় তারে পায় সে অবহেলে।
পাওয়ার মতন পাওয়া যারে কহে
সহজ বলেই সহজ তাহা নহে,
দৈবে তারে মেলে।

ভাবি যখন ভেবে না পাই, তবে
দেবার মতো কী আছে এই ভবে।

কোন্ খনিতে কোন্ ধনভাণ্ডারে
সাগরতলে কিংবা সাগরপারে
যক্ষরাজের লক্ষমণির হারে
যা আছে তা কিছুই তো নয় প্রিয়ে !
তাই তো বলি যা-কিছু মোর দান
গ্রহণ করেই করবে মূল্যবান
আপন হৃদয় দিয়ে ।

অ্যান্ডেস জাহাজ
৩ নভেম্বর ১৯২৪

সমাপন

এবারের মতো করো শেষ
প্রাণে যদি পেয়ে থাকো চরমের পরম উদ্দেশ ;
যদি অবসান সুমধুর
আপন বীণার তারে সকল বেসুর
সুরে বেঁধে তুলে থাকে ;
অস্তরবি যদি তোরে ডাকে
দিনেরে মাভৈঃ বলে যেমন সে ডেকে নিয়ে যায়
অন্ধকার অজানায় ;
সুন্দরের শেষ অর্চনায়
আপনার রশ্মিচ্ছটা সম্পূর্ণ করিয়া দেয় সারা ;
যদি সন্ধ্যাতারা
অসীমের বাতায়নতলে
শান্তির প্রদীপশিখা দেখায় কেমন করে জ্বলে ;
যদি রাত্রি তার
খুলে দেয় নীরবের দ্বার,
নিয়ে যায় নিঃশব্দ সংকেতে ধীরে ধীরে
সকল বাণীর শেষ সাগরসংগম-তীর্থ-তীরে ;
সেই শতদল হতে যদি গন্ধ পেয়ে থাকো তার
মানসসরসে যাহা শেষ অর্ঘ্য, শেষ নমস্কার ।

অ্যান্ডেস জাহাজ
৫ নভেম্বর ১৯২৪

ভাবী কাল

ক্ষমা কোরো, যদি গর্বভরে
মনে মনে ছবি দেখি— মোর কাব্যখানি লয়ে করে
দূর ভাবী শতাব্দীর অয়ি সপ্তদশী,
একেলা পড়িছ তব বাতায়নে বসি ।

আকাশেতে শশী
ছন্দের ভরিয়া রন্ধ্র ঢালিছে গভীর নীরবতা
কথার অতীত সুরে পূর্ণ করি কথা ;
হয়তো উঠিছে বক্ষ নেচে—
হয়তো ভাবিছ, 'যদি থাকিত সে বেঁচে,
আমারে বাসিত বুঝি ভালো ।'
হয়তো বলিছ মনে, 'সে নাহি আসিবে আর কভু,
তারি লাগি তবু
মোর বাতায়নতলে আজ রাত্রে জ্বালিলাম আলো ।'

অ্যান্ডেস জাহাজ
৬ নভেম্বর ১৯২৪

অতীত কাল

সেই ভালো, প্রতি যুগ আনে না আপন অবসান,
সম্পূর্ণ করে না তার গান ;
অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস রেখে দিয়ে যায় সে বাতাসে ।
তাই যবে পরযুগে বাঁশির উচ্ছ্বাসে ।
বেজে ওঠে গানখানি
তার মাঝে সুদূরের বাণী
কোথায় লুকায়ে থাকে, কী বলে সে বুঝিতে কে পারে ;
যুগান্তরের ব্যথা প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে
মিলায় অশ্রুর বাষ্পজাল ;
অতীতের সূর্যাস্তের কাল
আপনার সকরুণ বর্ণচ্ছটা মেলে
মৃত্যুর ঐশ্বর্য দেয় ঢেলে,
নিমেষের বেদনারে করে সুবিপুল ।
তাই বসন্তের ফুল
নাম-ভুলে-যাওয়া
প্রেয়সীর নিশ্বাসের হাওয়া
যুগান্তর-সাগরের দ্বীপান্তর হতে বহি আনে ।
যেন কী অজানা ভাষা মিশে যায় প্রণয়ীর কানে
পরিচিত ভাষাটির সাথে,
মিলনের রাতে ।

অ্যান্ডেস জাহাজ
৭ নভেম্বর ১৯২৪

বেদনার লীলা

গানগুলি বেদনার খেলা যে আমার,
কিছুতে ফুরায় না সে আর ।
যেখানে স্রোতের জল পীড়নের পাকে
আবর্তে ঘুরিতে থাকে,
সূর্যের কিরণ সেথা নৃত্য করে,
ফেনপুঞ্জ স্তরে স্তরে
দিবারাতি
রঙের খেলায় ওঠে মাতি ।
শিশু রুদ্র হাসে খলখল,
দোলে টলমল
লীলাভরে ।
প্রচণ্ডের সৃষ্টিগুলি প্রহরে প্রহরে
ওঠে পড়ে, আসে যায় একান্ত হেলায়.
নিরর্থ খেলায় ।
গানগুলি সেইমত বেদনার খেলা যে আমার,
কিছুতে ফুরায় না সে আর ।

অ্যান্ডেস জাহাজ
৭ নভেম্বর ১৯২৪

শীত

শীতের হাওয়া হঠাৎ ছুটে এল
গানের বেলা শেষ না হতে হতে ?
মনের কথা ছড়িয়ে এলোমেলো
ভাসিয়ে দিল শুকনো পাতার স্রোতে ।
মনের কথা যত
উজান তরীর মতো ;
পালে যখন হাওয়ার বলে
মরণ-পারে নিয়ে চলে,
চোখের জলের স্রোত যে তাদের টানে
পিছু ঘাটের পানে—
যেথায় তুমি, প্রিয়ে
একলা বসে আপন-মনে
আঁচল মাথায় দিয়ে ।

ঘোরে তারা শুকনো পাতার পাকে
কাঁপন-ভরা হিমের বায়ুভরে ।
ঝরা ফুলের পাপড়ি তাদের ঢাকে—
লুটায় কেন মরা ঘাসের 'পরে ।

হল কি দিন সারা।
বিদায় নেবে তারা ?
এবার বুঝি কুয়াশাতে
লুকিয়ে তারা পৌউষ-রাতে
ধুলার ডাকে সাড়া দিতে চলে—
যেথায় ভূমিতলে
একলা তুমি, প্রিয়ে,
বসে আছ আপন-মনে
আঁচল মাথায় দিয়ে ?

মন যে বলে, নয় কখনোই নয়—
ফুরায় নি তো, ফুরাবার এই ভান।
মন যে বলে— শুনি আকাশ-ময়
যাবার মুখে ফিরে আসার গান।
শীর্ণ শীতের লতা
আমার মনের কথা
হিমের রাতে লুকিয়ে রাখে
নগ্ন শাখার ফাঁকে ফাঁকে,
ফাল্গুনেতে ফিরিয়ে দেবে ফুলে
তোমার চরণ-মূলে—
যেথায় তুমি, প্রিয়ে,
একলা বসে আপন মনে
আঁচল মাথায় দিয়ে।

বুয়েনোস এয়ারিস
১০ নভেম্বর ১৯২৪

কিশোর প্রেম

অনেক দিনের কথা সে যে অনেক দিনের কথা ;
পুরানো এই ঘাটের ধারে
ফিরে এল কোন্ জোয়ারে
পুরানো সেই কিশোর প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা ?
সে যে অনেক দিনের কথা।

আজকে মনে পড়েছে সেই নির্জন অঙ্গন।
সেই প্রদোষের অন্ধকারে
এল আমার অধর-পারে
ক্লান্ত ভীরু পাখির মতো কম্পিত চুম্বন।
সেদিন নির্জন অঙ্গন।

তখন জানা ছিল না তো ভালোবাসার ভাষা—
যেন প্রথম দখিন বায়ে
শিহর লেগেছিল গায়ে,
চাঁপাকুঁড়ির বুকের মাঝে অস্ফুট কোন্ আশা,
সে যে অজানা কোন্ ভাষা।

সেই সেদিনের আসা-যাওয়া, আধেক জানাজানি,
হঠাৎ হাতে হাতে ঠেকা,
বোবা চোখের চেয়ে দেখা,
মনে পড়ে ভীরু হিয়ার না-বলা সেই বাণী—
সেই আধেক জানাজানি।

এই জীবনে সেই তো আমার প্রথম ফাগুন মাস।
ফুটল না তার মুকুলগুলি,
শুধু তারা হাওয়ায় দুলি
অবেলাতে ফেলে গেছে চরম দীর্ঘশ্বাস—
আমার প্রথম ফাগুন মাস।

ঝরে-পড়া সেই মুকুলের শেষ-না-করা কথা
আজকে আমার সুরে গানে
পায় খুঁজে তার গোপন মানে,
আজ বেদনায় উঠল ফুটে তার সেদিনের ব্যথা—
সেই শেষ-না-করা কথা।

পারে যাওয়ার উধাও পাখি সেই কিশোরের ভাষা,
প্রাণের পারের কুলায় ছাড়ি
শূন্য আকাশ দিল পাড়ি,
আজ এসে মোর স্বপন-মাঝে পেয়েছে তার বাসা—
আমার সেই কিশোরের ভাষা।

বুয়েনোস এয়ারিস
১১ নভেম্বর ১৯২৪

প্রভাত

স্বর্ণসুধা-ঢালা এই প্রভাতের বুকে
যাপিলাম সুখে,
পরিপূর্ণ অবকাশ করিলাম পান।
মুদিল অলস পাখা মুগ্ধ মোর গান।
যেন আমি নিস্তব্ধ মৌমাছি
আকাশপদ্মের মাঝে একান্ত একেলা বসে আছি।

যেন আমি আলোকের নিঃশব্দ নির্ঝরে
মন্থর মুহূর্তগুলি ভাসায়ে দিতেছি লীলাভরে।
ধরণীর বক্ষ ভেদি যেথা হতে উঠিতেছে ধারা
পুষ্পের ফোয়ারা,
তৃণের লহরী,
সেখানে হৃদয় মোর রাখিয়াছি ধরি ;
ধীরে চিত্ত উঠিতেছে ভরি
সৌরভের স্রোতে।
ধূলি-উৎস হতে
প্রকাশের অক্লান্ত উৎসাহ,
জন্মমৃত্যুতরঙ্গিত রূপের প্রবাহ
স্পন্দিত করিছে মোর বক্ষস্থল আজি।
রক্তে মোর উঠে বাজি
তরঙ্গের অরণ্যের সম্মিলিত স্বর,
নিখিল মর্মর।
এ বিশ্বের স্পর্শের সাগর
আজ মোর সর্ব অঙ্গ করেছে মগন।
এই স্বচ্ছ উদার গগন
বাজায় অদৃশ্য শঙ্খ, শব্দহীন সুর।
আমার নয়নে মনে ঢেলে দেয় সুনীল সুদূর।

বুয়েনোস এয়ারিস
১ নভেম্বর ১৯২৪

বিদেশী ফুল

হে বিদেশী ফুল, যবে আমি পুছিলাম—
'কী তোমার নাম',
হাসিয়া দুলালে মাথা, বুঝিলাম তবে
নামেতে কী হবে।
আর কিছু নয়,
হাসিতে তোমার পরিচয়।

হে বিদেশী ফুল, যবে তোমারে বুকের কাছে ধরে
শুধালেম 'বলো বলো মোরে
কোথা তুমি থাকো',
হাসিয়া দুলালে মাথা, কহিলে 'জানি না, জানি নাকো'।
বুঝিলাম তবে
শুনিয়া কী হবে
থাকো কোন্ দেশে।
যে তোমারে বোঝে ভালোবেসে
তাহার হৃদয়ে তব ঠাঁই,
আর কোথা নাই।

হে বিদেশী ফুল, আমি কানে কানে শুধানু আবার,
'ভাষা কী তোমার।'
হাসিয়া দুলালে শুধু মাথা,
চারি দিকে মর্মরিল পাতা।
আমি কহিলাম, 'জানি, জানি,
সৌরভের বাণী
নীরবে জানায় তব আশা।
নিশ্বাসে ভরেছে মোর সেই তব নিশ্বাসের ভাষা।'

হে বিদেশী ফুল, আমি যেদিন প্রথম এনু ভোরে
শুধালেম, 'চেন তুমি মোরে?'
হাসিয়া দুলালে মাথা, ভাবিলাম তাহে একরতি
নাহি কারো ক্ষতি।
কহিলাম, 'বোঝ নি কি তোমার পরশে
হৃদয় ভরেছে মোর রসে।
কেউ বা আমারে চেনে এর চেয়ে বেশি,
হে ফুল বিদেশী।'

হে বিদেশী ফুল, যবে তোমারে শুধাই 'বলো দেখি
মোরে ভুলিবে কি',
হাসিয়া দুলাও মাথা ; জানি জানি, মোরে ক্ষণে ক্ষণে
পড়িবে যে মনে।
দুই দিন পরে
চলে যাব দেশান্তরে,
তখন দূরের টানে স্বপ্নে আমি হব তব চেনা—
মোরে ভুলিবে না।

বুয়েনোস এয়ারিস
১২ নভেম্বর ১৯২৪

অতিথি

প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে, নারী,
মাধুর্যসুধায় ; কত সহজে করিলে আপনারই
দূরদেশী পথিকেরে ; যেমন সহজে সন্ধ্যাকাশে
আমার অজানা তারা স্বর্গ হতে স্থির স্নিগ্ধ হাসে
আমারে করিল অভ্যর্থনা ; নির্জন এ বাতায়নে
একেলা দাঁড়ায়ে যবে চাহিলাম দক্ষিণ-গগনে
ঊর্ধ্ব হতে একতানে এল প্রাণে আলোকেরই বাণী—
শুনিনু গম্ভীর স্বর, 'তোমারে যে জানি মোরা জানি ;

রবীন্দ্রনাথ ও 'বিজয়া' ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো

আঁধারের কোল হতে যেদিন কোলেতে নিল ক্ষিতি
মোদের অতিথি তুমি, চিরদিন আলোর অতিথি।'
তেমনি তারার মতো মুখে মোর চাহিলে, কল্যাণী—
কহিলে তেমনি স্বরে, 'তোমারে যে জানি আমি জানি।'
জানি না তো ভাষা তব, হে নারী, শুনেছি তব গীতি—
'প্রেমের অতিথি কবি, চিরদিন আমারই অতিথি।'

বুয়েনোস এয়ারিস
১৫ নভেম্বর ১৯২৪

অন্তর্হিতা

প্রদীপ যখন নিবেছিল,
আঁধার যখন রাতি,
দুয়ার যখন বন্ধ ছিল,
ছিল না কেউ সাথি—
মনে হল, অন্ধকারে
কে এসেছে বাহির-দ্বারে,
মনে হল, শুনি যেন
পায়ের ধ্বনি কার,
রাতের হাওয়ায় বাজল বুঝি
কঙ্কণঝংকার।

বারেক শুধু মনে হল
খুলি, দুয়ার খুলি।
ক্ষণেক পরে ঘুমের ঘোরে
কখন গেনু ভুলি।
'কোন্ অতিথি দ্বারের কাছে
একলা রাতে বসে আছে?'
ক্ষণে ক্ষণে তন্দ্রা ভেঙে
মন শুধাল যবে,
বলেছিলেম, 'আর কিছু নয়,
স্বপ্ন আমার হবে।'

মাঝ-গগনে সপ্ত-ঋষি
স্তব্ধ গভীর রাতে
জানলা হতে আমায় যেন
ডাকল ইশারাতে।
মনে হল 'শয়ন ফেলে,
দিই-না কেন আলো জ্বেলে'—

আলসভরে রইনু শুয়ে
হল না দীপ জ্বালা ।
প্রহর পরে কাটল প্রহর,
বন্ধ রইল তালা ।

জাগল কখন দখিন-হাওয়া
কাঁপল বনের হিয়া,
স্বপ্নে কথা-কওয়ার মতো
উঠল মর্মরিয়া ।
যূথীর গন্ধ ক্ষণে ক্ষণে
মূর্ছিল মোর বাতায়নে,
শিহর দিয়ে গেল আমার
সকল অঙ্গ চুমে ।
জেগে উঠে আবার কখন
ভরল নয়ন ঘুমে ।

ভোরের তারা পুব-গগনে
যখন হল গত
বিদায়রাতির একটি ফোঁটা
চোখের জলের মতো,
হঠাৎ মনে হল তবে—
যেন কাহার করুণ রবে
শিরীষ ফুলের গন্ধে আকুল
বনের বীথি ব্যেপে
শিশির-ভেজা তৃণগুলি
উঠল কেঁপে কেঁপে ।

শয়ন ছেড়ে উঠে তখন
খুলে দিলেম দ্বার—
হায় রে, ধুলায় বিছিয়ে গেছে
যূথীর মালা কার ।
ওই যে দূরে, নয়ন নত,
বনের ছায়ায় ছায়ার মতো
মায়ার মতো মিলিয়ে গেল
অরুণ-আলোয় মিশে,
ওই বুঝি মোর বাহির-দ্বারের
রাতের অতিথি সে ।

আজ হতে মোর ঘরের দুয়ার
রাখব খুলে রাতে ।
প্রদীপখানি রইবে জ্বালা
বাহির-জানালাতে ।

আজ হতে কার পরশ লাগি
পথ তাকিয়ে রইব জাগি—
আর কোনোদিন আসবে না কি
আমার পরান ছেয়ে
যূথীর মালার গন্ধখানি
রাতের বাতাস বেয়ে।

বুয়েনোস এয়ারিস
১৬ নভেম্বর ১৯২৪

আশঙ্কা

ভালোবাসার মূল্য আমায় দু হাত ভরে
যতই দেবে বেশি করে,
ততই আমার অন্তরের এই গভীর ফাঁকি
আপনি ধরা পড়বে না কি।
তাহার চেয়ে ঋণের রাশি রিক্ত করি
যাই-না নিয়ে শূন্য তরী।
বরং রব ক্ষুধায় কাতর ভালো সেও,
সুধায় ভরা হৃদয় তোমার
ফিরিয়ে নিয়ে চলে যেয়ো।

পাছে আমার আপন ব্যথা মিটাইতে
ব্যথা জাগাই তোমার চিতে,
পাছে আমার আপন বোঝা লাঘব-তরে
চাপাই বোঝা তোমার 'পরে,
পাছে আমার একলা প্রাণের ক্ষুব্ধ ডাকে
রাত্রে তোমায় জাগিয়ে রাখে,
সেই ভয়েতেই মনের কথা কই নে খুলে।
ভুলতে যদি পারো তবে
সেই ভালো গো, যেয়ো ভুলে।

বিজন পথে চলেছিলেম, তুমি এলে
মুখে আমার নয়ন মেলে।
ভেবেছিলেম বলি তোমায়, 'সঙ্গে চলো,
আমায় কিছু কথা বলো।'
হঠাৎ তোমার মুখে চেয়ে কী কারণে
ভয় হল যে আমার মনে।
দেখেছিলেম সুপ্ত আগুন লুকিয়ে জ্বলে
তোমার প্রাণের নিশীথ রাতের
অন্ধকারের গভীর তলে।

তপস্বিনী, তোমার তপের শিখাগুলি
হঠাৎ যদি জাগিয়ে তুলি,
তবে যে সেই দীপ্ত আলোয় আড়াল টুটে
দৈন্য আমার উঠবে ফুটে।
হবি হবে তোমার প্রেমের হোমাগ্নিতে
এমন কী মোর আছে দিতে।
তাই তো আমি বলি তোমায় নতশিরে—
তোমার দেখার স্মৃতি নিয়ে
একলা আমি যাব ফিরে।

বুয়েনোস এয়ারিস
১৭ নভেম্বর ১৯২৪

শেষ বসন্ত

আজিকার দিন না ফুরাতে
হবে মোর এ আশা পুরাতে—
শুধু এবারের মতো
বসন্তের ফুল যত
যাব মোরা দুজনে কুড়াতে।
তোমার কাননতলে ফাল্গুন আসিবে বারংবার,
তাহারি একটি শুধু মাগি আমি দুয়ারে তোমার।

বেলা কবে গিয়াছে বৃথাই
এতকাল ভুলে ছিনু তাই।
হঠাৎ তোমার চোখে
দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে
আমার সময় আর নাই।
তাই আমি একে একে গনিতেছি কৃপণের সম
ব্যাকুল সংকোচভরে বসন্তশেষের দিন মম।

ভয় রাখিয়ো না তুমি মনে!
তোমার বিকচ ফুলবনে
দেরি করিব না মিছে,
ফিরে চাহিব না পিছে
দিনশেষে বিদায়ের ক্ষণে।
চাব না তোমার চোখে আঁখিজল পাব আশা করি
রাখিবারে চিরদিন স্মৃতিরে করুণারসে ভরি।

ফিরিয়া যেয়ো না, শোনো, শোনো,
সূর্য অস্ত যায় নি এখনো!

‘পূরবী’র পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার কবিকৃত লিপিচিত্রণ

সময় রয়েছে বাকি ;
সময়েরে দিতে ফাঁকি
ভাবনা রেখো না মনে কোনো ।
পাতার আড়াল হতে বিকালের আলোটুকু এসে
আরো কিছুখন ধরে ঝলুক তোমার কালো কেশে ।

হাসিয়ো মধুর উচ্চহাসে
অকারণ নির্মম উল্লাসে,
বনসরসীর তীরে
ভীরু কাঠবিড়ালিরে
সহসা চকিত কোরো ত্রাসে ।
ভুলে-যাওয়া কথাগুলি কানে কানে করায়ে স্মরণ
দিব না মন্থর করি ওই তব চঞ্চল চরণ ।

তার পরে যেয়ো তুমি চলে
ঝরা পাতা দ্রুতপদে দলে,
নীড়ে-ফেরা পাখি যবে
অস্ফুট কাকলিরবে
দিনান্তেরে ক্ষুব্ধ করি তোলে ।
বেণুবনচ্ছায়াঘন সন্ধ্যায় তোমার ছবি দূরে
মিলাইবে গোধূলির বাঁশরির সর্বশেষ সুরে ।

রাত্রি যবে হবে অন্ধকার
বাতায়নে বসিয়ো তোমার ।
সব ছেড়ে যাব, প্রিয়ে,
সমুখের পথ দিয়ে,
ফিরে দেখা হবে না তো আর ।
ফেলে দিয়ো ভোরে-গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি ।
সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী ।

বুয়েনোস এয়ারিস
২১ নভেম্বর ১৯২৪

বিপাশা

মায়ামৃগী, নাই বা তুমি
পড়লে প্রেমের ফাঁদে ।
ফাগুন-রাতে চোরা মেঘে
নাই হরিল চাঁদে ।
বাঁধন-কাটা ভাব্না তোমার
হাওয়ায় পাখা মেলে,
দেহমনে চঞ্চলতার
নিত্য যে ঢেউ খেলে ।

ঝর্না-ধারা মতো সদাই
মুক্ত তোমার গতি,
নাই বা নিলে তটের শরণ
তায় বা কিসের ক্ষতি।
শরৎপ্রাতের মেঘ যে তুমি
শুভ্র আলোয় ধোওয়া,
একটুখানি অরুণ-আভার
সোনার-হাসি-ছোঁওয়া।
শূন্যপথে মনোরথে
ফেরো আকাশ-পার,
বুকের মাঝে নাই বহিলে
অশ্রুজলের ভার।
এমনি করেই যাও খেলে যাও
অকারণের খেলা,
ছুটির স্রোতে যাক-না ভেসে
হালকা খুশির ভেলা।
পথে চাওয়ার ক্লান্তি কেন
নামবে আঁখির পাতে,
কাছের সোহাগ ছাড়বে কেন
দূরের দুরাশাতে
তোমার পায়ের নূপুরখানি
বাজাক নিত্যকাল
অশোকবনের চিকন পাতার
চমক-আলোর তাল।
রাতের গায়ে পুলক দিয়ে
জোনাক যেমন জ্বলে
তেমনি তোমার খেয়ালগুলি
উড়ুক স্বপন-তলে।
যারা তোমার সঙ্গ-কাঙাল
বাইরে বেড়ায় ঘুরে—
ভিড় যেন না করে তোমার
মনের অন্তঃপুরে।
সরোবরের পদ্ম তুমি,
আপন চারি দিকে
মেলে রেখো তরল জলের
সরল বিঘ্নটিকে।
গন্ধ তোমার হোক-না সবার,
মনে রেখো তবু
বৃন্ত যেন চুরির ছুরি
নাগাল না পায় কভু।
আমার কথা শুধাও যদি—

চাবার তরেই চাই,
পাবার তরে চিত্তে আমার
ভাব্‌না কিছুই নাই।
তোমার পানে নিবিড় টানের
বেদন-ভরা সুখ
মনকে আমার রাখে যেন
নিয়ত উৎসুক।
চাই না তোমায় ধরতে আমি
মোর বাসনায় ঢেকে,
আকাশ থেকেই গান গেয়ে যাও—
নয় খাঁচাটার থেকে।

বুয়েনোস এয়ারিস
২২ নভেম্বর ১৯২৪

চাবি

বিধাতা যেদিন মোর মন
করিলা সৃজন
বহু-কক্ষে-ভাগ-করা হর্ম্যের মতন,
শুধু তার বাহিরের ঘরে
প্রস্তুত রহিল সজ্জা নানামত অতিথির তরে ;
নীরব নির্জন অন্তঃপুরে
তালা তার বন্ধ করি চাবিখানি ফেলি দিলা দূরে।
মাঝে মাঝে পান্থ এসে দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
বলিয়াছে 'খুলে দাও'— উপায় জানি না খুলিবারে।
বাহিরে আকাশ তাই ধুলায় আকুল করে হাওয়া ;
সেখানেই যত খেলা, যত মেলা, যত আসা-যাওয়া।

অন্তরের জনহীন পথে
হিমে-ভেজা ঘাসে ঘাসে শেফালিকা লুটায় শরতে।
আষাঢ়ের আর্দ্রবায়ুভরে
কদম্বকেশরে
চিহ্ন তার পড়ে ঢাকা।
চৈত্রে সে বিচিত্র বর্ণে কুসুমের আলিম্পনে আঁকা।
সেথায় লাজুক পাখি ছায়াঘন শাখে
মধ্যাহ্নে করুণ কণ্ঠে উদাসীন প্রেয়সীরে ডাকে।
সন্ধ্যাতারা দিগন্তের কোণে
শিরীষ পাতার ফাঁকে কান পেতে শোনে
যেন কার পদধ্বনি দক্ষিণ-বাতাসে।
ঝরাপাতা-বিছানো সে ঘাসে
বাঁশরি বাজাই আমি কুসুমসুগন্ধি অবকাশে।

দূরে চেয়ে থাকি একা—
মনে করি যদি কভু পাই তার দেখা
যে পথিক একদিন অজানা সমুদ্র উপকূলে
কুড়ায়ে পেয়েছে চাবি, বক্ষে নিয়ে তুলে
শুনিতে পেয়েছে যেন অনাদি কালের কোন্ বাণী,
সেই হতে ফিরিতেছে বিরাম না জানি।
অবশেষে
মৌমাছির পরিচিত এ নিভৃত পথপ্রান্তে এসে
যাত্রা তার হবে অবসান ;
খুলিবে সে গুপ্তদ্বার কেহ যার পায় নি সন্ধান।

বুয়েনোস এয়ারিস
২৬ নভেম্বর ১৯২৪

বৈতরণী

ওগো বৈতরণী,
তরল খড়্গের মতো ধারা তব, নাই তার ধ্বনি,
নাই তার তরঙ্গভঙ্গিমা ;
নাই রূপ, নাই স্পর্শ, ছন্দে তার নাই কোনো সীমা ;
অমাবস্যা রজনীর
সুপ্তি সুগম্ভীর
মৌনী প্রহরের মতো
নিরাকার পদচারে শূন্যে শূন্যে ধায় অবিরত।
প্রাণের অরণ্যতট হতে
দণ্ড পল খসে খসে পড়ে তব অন্ধকারস্রোতে।
রূপের না থাকে চিহ্ন, নাহি থাকে বর্ণের বর্ণনা,
বাণীর না থাকে এক কণা।

ওগো বৈতরণী,
কতবার খেয়ার তরণী
এসেছিল এই ঘাটে আমার এ বিশ্বের আলোতে।
নিয়ে গেল কালহীন তোমার কালোতে
কত মোর উৎসবের বাতি,
আমার প্রাণের আশা, আমার গানের কত সাথি,
দিবসেরে রিক্ত করি, তিক্ত করি, আমার রাত্রিরে।
সেই হতে চিত্ত মোর নিয়েছে আশ্রয় তব তীরে।

ওগো বৈতরণী,
অদৃশ্যের উপকূলে থেমে গেছে যেথায় ধরণী

সেথায় নির্জনে
দেখি আমি আপনার মনে
তোমার অরূপতলে সব রূপ পূর্ণ হয়ে ফুটে,
সব গান দীপ্ত হয়ে উঠে
শ্রবণের পরপারে
তব নিঃশব্দের কণ্ঠহারে ।
যে সুন্দর বসেছিল মোর পাশে এসে
ক্ষণিকের ক্ষীণ ছদ্মবেশে,
যে চিরমধুর
দ্রুতপদে চলে গেল নিমেষের বাজায়ে নূপুর
প্রলয়ের অন্তরালে গাহে তারা অনন্তের সুর ।
চোখের জলের মতো
একটি বর্ষণে যারা হয়ে গেছে গত,
চিত্তের নিশীথ রাত্রে গাঁথে তারা নক্ষত্রমালিকা—
অনির্বাণ আলোকেতে সাজায় অক্ষয় দীপালিকা ।

বুয়েনোস এয়ারিস
২৭ নভেম্বর ১৯২৪

প্রভাতী

চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি,
খনে খনে এসে চলে যাও থাকি থাকি ।
হৃদয়কমল টুটিয়া সকল বন্ধ
বাতাসে বাতাসে মেলি দেয় তার গন্ধ,
তোমারে পাঠায় ডাকি
হে কালো কাজল আঁখি ।

যেথায় তাহার গোপন সোনার রেণু
সেথা বাজে তার বেণু ;
বলে— এসো, এসো, লও খুঁজে লও মোরে,
মধুসঞ্চয় দিয়ো না ব্যর্থ করে,
এসো এ বক্ষোমাঝে,
কবে হবে দিন আঁধারে বিলীন সাঁঝে ।

দেখো চেয়ে কোন্ উতলা পবনবেগে
সুরের আঘাত লেগে
মোর সরোবরে জলতল ছলছলি
এপারে ওপারে করে কী যে বলাবলি,
তরঙ্গ উঠে জেগে ।

গিয়েছে আঁধার গোপনে-কাঁদার রাতি,
নিখিল ভুবন হেরো কী আশায় মাতি
আছে অঞ্জলি পাতি ।

হেরো গগনের নীল শতদলখানি
মেলিল নীরব বাণী ।
অরুণপক্ষ প্রসারি সকৌতুকে
সোনার ভ্রমর আসিল তাহার বুকে
কোথা হতে নাহি জানি ।
চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি,
এখনো তোমার সময় আসিল না কি ।
মোর রজনীর ভেঙেছে তিমিরবাঁধ,
পাও নি কি সংবাদ ।
জেগে-ওঠা প্রাণে উথলিছে ব্যাকুলতা,
দিকে দিকে আজি রটে নি কি সে বারতা ।
শোন নি কী গাহে পাখি,
হে কালো কাজল আঁখি ।

শিশিরশিহরা পল্লব-ঝলমল্
বেণুশাখাগুলি খনে খনে টলমল্,
অকৃপণ বনে ছেয়ে গেল ফুলদল—
কিছু না রহিল বাকি ।
এল যে আমার মন-বিলাবার বেলা,
খেলিব এবার সব-হারাবার খেলা,
যা-কিছু দেবার রাখিব না আর ঢাকি
হে কালো কাজল আঁখি ।

বুয়েনোস এয়ারিস
১ ডিসেম্বর ১৯২৪

মধু

মৌমাছির মতো আমি চাহি না ভাণ্ডার ভরিবারে
বসন্তেরে ব্যর্থ করিবারে ।
সে তো কভু পায় না সন্ধান
কোথা আছে প্রভাতের পরিপূর্ণ দান ।
তাহার শ্রবণ ভরে
আপন গুঞ্জনস্বরে,
হারায় সে নিখিলের গান ।

জানে না ফুলের গন্ধে আছে কোন্ করুণ বিষাদ,
সে জানে তা সংগ্রহের পথের সংবাদ ।

চাহে নি সে অরণ্যের পানে,
লতার লাবণ্য নাহি জানে,
পড়ে নি ফুলের বর্ণে বসন্তের মর্মবাণী লেখা।
মধুকণা লক্ষ্য তার, তারি কক্ষ আছে শুধু শেখা।

পাখির মতন মন শুধু উড়িবার সুখ চাহে
উধাও উৎসাহে;
আকাশের বক্ষ হতে ডানা ভরি তার
স্বর্ণ-আলোকের মধু নিতে চায়, নাহি যার ভার,
নাহি যার ক্ষয়,
নাহি যার নিরুদ্ধ সঞ্চয়,
যার বাধা নাই,
যারে পাই তবু নাহি পাই—
যার তরে নহে লোভ, নহে ক্ষোভ, নহে তীক্ষ্ণ রিষ,
নহে শূল, নহে গুপ্ত বিষ।

বুয়েনোস এয়ারিস
৪ ডিসেম্বর ১৯২৪

তৃতীয়া

কাছের থেকে দেয় না ধরা, দূরের থেকে ডাকে
তিন বছরের প্রিয়া আমার— দুঃখ জানাই কাকে।
কণ্ঠেতে ওর দিয়ে গেছে দখিন-হাওয়ার দান
তিন বসন্তে দোয়েল শ্যামার তিন বছরের গান।
তবু কেন আমারে ওর এতই কৃপণতা—
বারেক ডেকে দৌড়ে পালায়, কইতে না চায় কথা।
তবু ভাবি, যাই কেন হোক, অদৃষ্ট মোর ভালো,
অমন সুরে ডাকে আমার মানিক, আমার আলো।
কপাল মন্দ হলে টানে আরো নীচের তলায়—
হৃদয়টি ওর হোক-না কঠোর, মিষ্টি তো ওর গলায়।

আলো যেমন চমকে বেড়ায় আমলকীর ওই গাছে,
তিন বছরের প্রিয়া আমার দূরের থেকে নাচে।
লুকিয়ে কখন বিলিয়ে গেছে বনের হিল্লোল
অঙ্গে উহার বেণুশাখার তিন ফাগুনের দোল।
তবু ক্ষণিক হেলাভরে হৃদয় করি লুট
শেষ না হতেই নাচের পালা কোন্‌খানে দেয় ছুট।
আমি ভাবি এই বা কী কম, প্রাণে তো ঢেউ তোলে—
ওর মনেতে যা হয় তা হোক, আমার তো মন দোলে।
হৃদয় নাহয় নাই বা পেলাম, মাধুরী পাই নাচে—
ভাবের অভাব রইল নাহয়, ছন্দটা তো আছে।

বন্দী হতে চাই যে কোমল ওই বাহুবন্ধনে,
তিন বছরের প্রিয়ার আমার নাই সে খেয়াল মনে।
সোনার প্রভাত দিয়েছে ওর সর্বদেহ ছুঁয়ে
শিউলি ফুলের তিন শরতের পরশ দিয়ে ধুয়ে।
বুঝতে নারি আমার বেলায় কেন টানাটানি।
ক্ষয় নাহি যার সেই সুধা নয় দিত একটুখানি।
তবু ভাবি বিধি আমায় নিতান্ত নয় বাম,
মাঝে মাঝে দেয় সে দেখা তারি কি কম দাম?
পরশ না পাই, হরয পাব চোখের চাওয়া চেয়ে—
রূপের ঝোরা বইবে আমার বুকের পাহাড় বেয়ে।

কবি ব'লে লোকসমাজে আছে তো মোর ঠাঁই,
তিন বছরের প্রিয়ার কাছে কবির আদর নাই।
জানে না যে, ছন্দে আমার পাতি নাচের ফাঁদ,
দোলার টানে বাঁধন মানে দূর আকাশের চাঁদ।
পলাতকার দল যত-সব দখিন-হাওয়ার চেলা
আপনি তারা বশ মেনে যায় আমার গানের বেলা।
ছোট্টো ওরই হৃদয়খানি দেয় না শুধু ধরা,
ঝগড়ু বোকার বরণমালা গাঁথে স্বয়ম্বরা।
যখন দেখি এমন বুদ্ধি, এমন তাহার রুচি,
আমারে ওর পছন্দ নয় যায় সে লজ্জা ঘুচি।

এমন দিনও আসবে আমার, আছি সে পথ চেয়ে,
তিন বছরের প্রিয়া হবেন বিশ বছরের মেয়ে।
স্বর্গ-ভোলা পারিজাতের গন্ধখানি এসে
খ্যাপা হাওয়ায় বুকের ভিতর ফিরবে ভেসে ভেসে।
কথায় যারে যায় না ধরা এমন আভাস যত
মর্মরিবে বাদল-রাতের রিমিঝিমির মতো।
সৃষ্টিছাড়া ব্যথা যত, নাই যাহাদের বাসা,
ঘুরে ঘুরে গানের সুরে খুঁজবে আপন ভাষা।
দেখবে তখন ঝগড়ু বোকা কী করতে বা পারে,
শেষকালে সেই আসতে হবেই এই কবিটির দ্বারে।

বুয়েনোস এয়ারিস
৪ ডিসেম্বর ১৯২৪

অদেখা

আসিবে সে, আছি সেই আশাতে।
শোন নি কি, দুজনাকে
নাম ধরে ওই ডাকে
নিশিদিন আকাশের ভাষাতে।
সুর বুকে আসে ভাসি,
পথ চেনাবার বাঁশি
বাজে কোন্ ওপারের বাসাতে।
ফুল ফোটে বনতলে,
ইশারায় মোরে বলে
'আসিবে সে' ; আছি সেই আশাতে।

এল না তো, এখনো সে এল না।
আলো-আঁধারের ঘোরে
যে ডাক শুনিনু ভোরে
সে শুধু স্বপন, সে কি ছলনা ?
হায়, বেড়ে যায় বেলা,
কবে শুরু হবে খেলা,
সাজায়ে বসিয়া আছি খেলনা—
কিছু ভালো, কিছু ভাঙা,
কিছু কালো, কিছু রাঙা ;
যারে নিয়ে খেলা সে তো এল না।

আসে নি তো এখনো সে আসে নি।
ভেবেছিনু আসে যদি,
পাড়ি দেব ভরা নদী—
বসে আছি, আজও তরী ভাসে নি।
মিলায় সিঁদুর-আলো,
গোধূলি সে হয় কালো,
কোথা সে স্বপনবনবাসিনী ?
মালতীর মালাগাছি
কোলে নিয়ে বসে আছি—
যারে দেব এখনো সে আসে নি।

এসেছে সে, মন বলে, এসেছে।
সুবাস-আভাসখানি
মনে হয় যেন জানি
রাতের বাতাসে আজ ভেসেছে।

বুঝিয়াছি অনুভবে
বনমর্মররবে
সে তার গোপন হাসি হেসেছে।
অদেখার পরশেতে
আঁধার উঠেছে মেতে—
মন জানে এসেছে সে এসেছে।

বুয়েনোস এয়ারিস
৭ ডিসেম্বর ১৯২৪

চঞ্চল

হায় রে তোরে রাখব ধরে,
ভালোবাসা,
মনে ছিল এই দুরাশা।
পাথর দিয়ে ভিত্তি ফেঁদে
বাসা যে তোর দিলেম বেঁধে,
এল তুফান সর্বনাশা।
মনে আমার ছিল যে রে
ঘিরব তোরে হাসির ঘেরে—
চোখের জলে হল ভাসা।
অনেক দুঃখে গেছে বোঝা
বেঁধে রাখা নয় তো সোজা,
সুখের ভিতে নহে তোমার
অচল বাসা।

এবার আমি সব-ফুরানো
পথের শেষে
বাঁধব বাসা মেঘের দেশে।
ক্ষণে ক্ষণে নিত্যনব
বদল কোরো মূর্তি তব
রঙ-ফেরানো মায়ার বেশে।
কখনো বা জ্যোৎস্না-ভরা
কখনো বা বাদল-ঝরা
খেয়াল তোমার কেঁদে হেসে।
যেই হাওয়াতে হেলাভরে
মিলিয়ে যাবে দিগন্তরে
সেই হাওয়াতেই ফিরে ফিরে
আসবে ভেসে।

কঠিন মাটি বানের জলে
যায় যে বয়ে,
শৈলপাষাণ যায় তো ক্ষ'য়ে।

কালের ঘায়ে সেই তো মরে
অটল বলের গর্বভরে
থাকতে যে চায় অচল হয়ে ।
জানে যারা চলার ধারা
নিত্য থাকে নূতন তারা,
হারায় যারা রয়ে রয়ে ।
ভালোবাসা, তোমারে তাই
মরণ দিয়ে বরিতে চাই,
চঞ্চলতার লীলা তোমার
রইব সয়ে ।

বুয়েনোস এয়ারিস
১০ ডিসেম্বর ১৯২৪

প্রবাহিণী

দুর্গম দূর শৈলশিরের
স্তব্ধ তুষার নই তো আমি,
আপনহারা ঝরনা-ধারা
ধূলির ধরায় যাই যে নামি ।
সরোবরের গম্ভীরতায়
ফেনিল নাচের মাতন ঢালি,
অচল শিলার ভ্রূভঙ্গিমায়
বাজাই চপল করতালি ।
মন্দ্রসুরের মন্ত্র শুনাই
গভীর গুহার আঁধার-তলে,
গহন বনের ভাঙাই ধেয়ান
উচ্চহাসির কোলাহলে ।
শুভ্র ফেনের কুন্দমালায়
বিন্ধ্যগিরির বক্ষ সাজাই,
যোগীশ্বরের জটার মধ্যে
তরঙ্গিণীর নূপুর বাজাই ।
বৃদ্ধ বটের লুব্ধ শিকড়
আমার বেণী ধরিতে চায়,
সূর্যকিরণ শিশুর মতন
অঙ্ক আমার ভরিতে চায় ।
নাই কোনো মোর ভয় ভাবনা,
নাই কোনো মোর অচল রীতি ।
গতি আমার সকল দিকেই,
শুভ আমার সকল তিথি ।

বক্ষে আমার কালোর ধারা,
আলোর ধারা আমার চোখে—
স্বর্গে আমার সুর চলে যায়,
নৃত্য আমার মর্তলোকে।
অশ্রুহাসির যুগল ধারা
ছোটে আমার ডাইনে বামে।
অচল গানের সাগরমাঝে
চপল গানের যাত্রা থামে।

বুয়েনোস এয়ারিস
১১ ডিসেম্বর ১৯২৪

আকন্দ

সন্ধ্যা-আলোর সোনার খেয়া পাড়ি যখন দিল গগন-পারে
অকূল অন্ধকারে,
ছমছমিয়ে এল রাতি ভুবনডাঙার মাঠে
একলা আমি গোয়ালপাড়ার বাটে।
নতুন-ফোটা গানের কুঁড়ি দেব বলে দিনুর হাতে আনি
মনে নিয়ে সুরের গুন্‌গুনানি
চলেছিলেম, এমন সময় যেন সে কোন্ পরীর কণ্ঠখানি
বাতাসেতে বাজিয়ে দিল বিনা ভাষার বাণী ;
বললে আমায়, "দাঁড়াও ক্ষণেক-তরে,
ওগো পথিক, তোমার লাগি চেয়ে আছি যুগে যুগান্তরে।
আমায় নেবে চিনে
সেই সুলগন এল এতদিনে।
পথের ধারে দাঁড়িয়ে আমি, মনে গোপন আশা
কবির ছন্দে বাঁধব আমার বাসা।"
দেখা হল, চেনা হল সাঁঝের আঁধারেতে ;
বলে এলেম, "তোমার আসন কাব্যে দেব পেতে।"

সেই কথা আজ পড়ল মনে হঠাৎ হেথায় এসে
সাগরপারের দেশে ;
মন-কেমনের হাওয়ার পাকে অনেক স্মৃতি বেড়ায় মনে ঘুরে
তারি মধ্যে বাজল করুণ সুরে—
'ভুলো না গো ভুলো না এই পথ-বাসিনীর কথা,
আজও আমি দাঁড়িয়ে আছি, বাসা আমার কোথা ?'
শপথ আমার, তোমরা বোলো তারে
তার কথাটি দাঁড়িয়েছিল মনের পথের ধারে,
বোলো তারে চোখের দেখা ফুটেছে আজ গানে—
লিখনখানি রাখিনু এইখানে।

আকন্দবল্লভ রবি

যেদিন প্রথম কবিগান
বসন্তের জাগালো আহ্বান
ছন্দের উৎসবসভাতলে,
সেদিন মালতী যূথী জাতি
কৌতূহলে উঠেছিল মাতি,
ছুটে এসেছিল দলে দলে।
আসিল মল্লিকা চম্পা কুরুবক কাঞ্চন করবী,
সুরের বরণমাল্যে সবারে বরিয়া নিল কবি।
কী সংকোচে এলে না যে, সভার দুয়ার হল বন্ধ।
সব পিছে রহিলে আকন্দ।

মোরে তুমি লজ্জা কর নাই
আমার সম্মান মানি তাই,
আমারে সহজে নিলে ডাকি।
আপনারে আপনি জানালে,
উপেক্ষার ছায়ার আড়ালে
পরিচয় রাখিলে না ঢাকি।
মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা চলেছিনু একা
তুমি বুঝি ভেবেছিলে কী জানি না পাই পাছে দেখা,
অদৃশ্য লিখনখানি তোমার করুণ ভীরু গন্ধ
বায়ুভরে পাঠালে আকন্দ।

হিয়া মোর উঠিল চমকি,
পথমাঝে দাঁড়ানু থমকি,
তোমারে খুঁজিনু চারি ধারে।
পল্লবের আবরণ টানি
আছিলে কাব্যের দুয়োরানী
পথপ্রান্তে গোপন আঁধারে।
সঙ্গী যারা ছিল ঘিরে তারা সবে নামগোত্রহীন,
কাড়িতে জানে না তারা পথিকের আঁখি উদাসীন।
ভরিল আমার চিত্ত বিস্ময়ের গভীর আনন্দ,
চিনিলাম তোমারে আকন্দ।

দেখা হয় নাই তোমা সনে
প্রাসাদের কুসুমকাননে,
জনতার প্রগল্‌ভ আদরে।
নিদ্রাহীন প্রদীপ-আলোকে
পড় নি অশান্ত মোর চোখে
প্রমোদের মুখর বাসরে।
অবজ্ঞার নির্জনতা তোমারে দিয়েছে কাছে আনি
সন্ধ্যার প্রথম তারা জানে তাহা, আর আমি জানি।
নিভৃতে লেগেছে প্রাণে তোমার নিশ্বাস মৃদু মন্দ
নম্রহাসি উদাসী আকন্দ!

আকাশের একবিন্দু নীলে
তোমার পরান ডুবাইলে,
শিখে নিলে আনন্দের ভাষা।
বক্ষে তব শুভ্র রেখা এঁকে
আপন স্বাক্ষর গেছে রেখে
রবির সুদূর ভালোবাসা।
দেবতার প্রিয় তুমি, গুপ্ত রাখ গৌরব তোমার—
শান্ত তুমি, তৃপ্ত তুমি, অনাদরে তোমার বিহার।
জেনেছি তোমারে, তাই জানাতে রচিনু এই ছন্দ
মৌমাছির বন্ধু হে আকন্দ!

চাপাড মালাল
১৬ ডিসেম্বর ১৯২৪

কঙ্কাল

পশুর কঙ্কাল ওই মাঠের পথের এক পাশে
পড়ে আছে ঘাসে—
যে ঘাস একদা তারে দিয়েছিল বল,
দিয়েছিল বিশ্রাম কোমল।

পড়ে আছে পাণ্ডু অস্থিরাশি
কালের নীরস অট্টহাসি।
সে যেন রে মরণের অঙ্গুলিনির্দেশ—
ইঙ্গিতে কহিছে মোরে, 'একদা পশুর যেথা শেষ,
সেথায় তোমারও অন্ত, ভেদ নাহি লেশ।
তোমারও প্রাণের সুরা ফুরাইলে পরে
ভাঙা পাত্র পড়ে রবে অমনি ধুলায় অনাদরে।'

আমি বলিলাম 'মৃত্যু, করি না বিশ্বাস
তব শূন্যতার উপহাস।
মোর নহে শুধুমাত্র প্রাণ
সর্ব বিত্ত রিক্ত করি যার হয় যাত্রা অবসান;
যাহা ফুরাইলে দিন
শূন্য অস্থি দিয়ে শোধে আহারনিদ্রার শেষ ঋণ।'

ভেবেছি জেনেছি যাহা, বলেছি শুনেছি যাহা কানে,
সহসা গেয়েছি যাহা গানে,
ধরে নি তা মরণের বেড়া-ঘেরা প্রাণে।
যা পেয়েছি, যা করেছি দান
মর্তে তার কোথা পরিমাণ।

আমার মনের নৃত্য, কতবার জীবন-মৃত্যুরে
লঙ্ঘিয়া চলিয়া গেছে চিরসুন্দরের সুরপুরে।
চিরকাল-তরে সে কি থেমে যাবে শেষে
কঙ্কালের সীমানায় এসে।
যে আমার সত্য পরিচয়
মাংসে তার পরিমাপ নয়;
পদাঘাতে জীর্ণ তারে নাহি করে দণ্ডপলগুলি—
সর্বস্বান্ত নাহি করে পথপ্রান্তে ধূলি।

আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপমধু পান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,
অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে,
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধারপ্রান্তরে;
নহি আমি বিধির বৃহৎ পরিহাস,
অসীম ঐশ্বর্য দিয়ে রচিত মহৎ সর্বনাশ।

চাপাড মালাল
১৭ ডিসেম্বর ১৯২৪

চিঠি

শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কল্যাণীয়েষু,

দূর প্রবাসে সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে এনু,
হঠাৎ যেন বাজল কোথায় ফুলের বুকের বেণু।
আঁতি-পাঁতি খুঁজে শেষে বুঝি ব্যাপারখানা,
বাগানে সেই জুঁই ফুটেছে চিরদিনের জানা।
গন্ধটি তার পুরোপুরি বাংলাদেশের বাণী,
একটুও তো দেয় না আভাস এই দেশী ইস্পানি।
প্রকাশ্যে তার থাক্‌-না যতই সাদা মুখের ঢঙ,
কোমলতায় লুকিয়ে রাখে শ্যামল বুকের রঙ।
হেথায় মুখর ফুলের হাটে আছে কি তার দাম।
চারুকণ্ঠে ঠাঁই নাহি তার ধুলায় পরিণাম।

যূথী বলে, 'আতিথ্য লও, একটুখানি বোসো।'
আমি বলি চমকে উঠে, 'আরে রোসো, রোসো।
জিতবে গন্ধ হারবে কি গান? নৈব কদাচিৎ।'
তাড়াতাড়ি গান রচিলাম; জানি নে কার জিত।
তিনটে সাগর পাড়ি দিয়ে একদা এই গান
অবশেষে বোলপুরে সে হবে বিদ্যমান।
এই বিরহীর কথা স্মরি গেয়ো সেদিন, দিনু,
জুঁইবাগানের আরেক দিনের গান যা রচেছিনু।

ঘরের খবর পাই নে কিছুই, গুজব শুনি নাকি
কুলিশপাণি পুলিস সেথায় লাগায় হাঁকাহাঁকি।
শুনছি নাকি বাংলাদেশের গান হাসি সব ঠেলে
কুলুপ দিয়ে করছে আটক আলিপুরের জেলে।
হিমালয়ে যোগীশ্বরের রোষের কথা জানি,
অনঙ্গেরে জ্বালিয়েছিলেন চোখের আগুন হানি।
এবার নাকি সেই ভূধরে কলির ভূদেব যারা
বাংলাদেশের যৌবনেরে জ্বালিয়ে করবে সারা।
সিমলে নাকি দারুণ গরম, শুনছি দার্জিলিঙে
নকল শিবের তাণ্ডবে আজ পুলিস বাজায় শিঙে।
জানি তুমি বলবে আমায়, 'থামো একটুখানি,
বেণুবীণার লগ্ন এ নয়, শিকল ঝম্‌ঝমানি!
শুনে আমি রাগব মনে, কোরো না সেই ভয়—
সময় আমার আছে বলেই এখন সময় নয়।
যাদের নিয়ে কাণ্ড আমার তারা তো নয় ফাঁকি,
গিলটি-করা তকমা-ঝোলা নয় তাহাদের খাকি।
কপাল জুড়ে নেই তো তাদের পালোয়ানের টিকা,
তাদের তিলক নিত্যকালের সোনার রঙে লিখা।
যেদিন ভবে সাঙ্গ হবে পালোয়ানির পালা,
সেদিনও তো সাজাবে জুঁই দেবার্চনার থালা।
সেই থালাতে আপন ভাইয়ের রক্ত ছিটোয় যারা,
লড়বে তারাই চিরটা কাল? গড়বে পাষাণ-কারা?
রাজ-প্রতাপের দম্ভ সে তো এক দমকের বায়ু,
সবুর করতে পারে এমন নাই তো তাহার আয়ু।
ধৈর্য বীর্য ক্ষমা দয়া ন্যায়ের বেড়া টুটে
লোভের ক্ষোভের ক্রোধের তাড়ায় বেড়ায় ছুটে ছুটে।
আজ আছে কাল নাই ব'লে তাই তাড়াতাড়ির তালে
কড়া মেজাজ দাপিয়ে বেড়ায় বাড়াবাড়ির চালে।
পাকা রাস্তা বানিয়ে বসে দুঃখীর বুক জুড়ি,
ভগবানের ব্যথার 'পরে হাঁকায় সে চার-ঘুড়ি।
তাই তো প্রেমের মাল্য গাঁথার নাইকো অবকাশ,
হাতকড়ারই কড়াক্কড়ি, দড়াদড়ির ফাঁস।
শান্ত হবার সাধনা কই, চলে কলের রথে—
সংক্ষেপে তাই শান্তি খোঁজে উলটো দিকের পথে।
জানে সেথায় বিধির নিষেধ, তর সহে না তবু—
ধর্মেরে যায় ঠেলা মেরে গায়ের জোরের প্রভু।
রক্ত-রঙের ফসল ফলে তাড়াতাড়ির বীজে,
বিনাশ তারে আপন গোলায় বোঝাই করে নিজে।
বাহুর দম্ভ, রাহুর মতো, একটু সময় পেলে
নিত্যকালের সূর্যকে সে এক-গরাসে গেলে।

নিমেষ-'পরেই উগরে দিয়ে মেলায়-ছায়ার মতো,
সূর্যদেবের গায়ে কোথাও রয় না কোনো ক্ষত।
বারে বারে সহস্রবার হয়েছে এই খেলা,
নতুন রাহু ভাবে তবু হবে না মোর বেলা।
কাণ্ড দেখে পশুপক্ষী ফুকরে ওঠে ভয়ে,
অনন্তদেব শান্ত থাকেন ক্ষণিক অপচয়ে।

টুটল কত বিজয়-তোরণ, লুটল প্রাসাদ-চুড়ো,
কত রাজার কত গারদ ধুলোয় হল গুঁড়ো।
আলিপুরের জেলখানাও মিলিয়ে যাবে যবে
তখনো এই বিশ্বদুলাল ফুলের সবুর সবে।
রঙিন-কুর্তি সঙিন-মূর্তি, রইবে না কিচ্ছুই,
তখনো এই বনের কোণে ফুটবে লাজুক জুঁই।
ভাঙবে শিকল টুকরো হয়ে, ছিঁড়বে রাঙা পাগ—
চূর্ণ-করা দর্পে মরণ খেলবে হোলির ফাগ।
পাগলা আইন লোক হাসাবে কালের প্রহসনে,
মধুর আমার বঁধু রবেন কাব্যসিংহাসনে।
সময়েরে ছিনিয়ে নিলেই হয় সে অসময়,
ক্রুদ্ধ প্রভুর সয় না সবুর, প্রেমের সবুর সয়।
প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে দুঃখ দেবার বড়াই,
জেনো মনে, তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই।
দুঃখ সহার তপস্যাতেই হোক বাঙালির জয়,
ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।
পালোয়ানের চেলারা সব ওঠে যেদিন খেপে,
ফোঁসে সর্প হিংসাদর্প সকল পৃথ্বী ব্যেপে,
বীভৎস তার ক্ষুধার জ্বালায় জাগে দানব ভায়া,
গর্জি বলে 'আমিই সত্য— দেব্‌তা মিথ্যা মায়া',
সেদিন যেন কৃপা আমায় করেন ভগবান—
মেশিন-গানের সম্মুখে গাই জুঁই ফুলের এই গান।—

স্বপ্নসম পরবাসে এলি পাশে কোথা হতে তুই
ও আমার জুঁই!
অজানা ভাষার দেশে
সহসা বলিলি এসে,
'আমারে চেন কি।'

তোর পানে চেয়ে চেয়ে
হৃদয় উঠিল গেয়ে,
'চিনি, চিনি সখী!'
কত প্রাতে জানায়েছে চিরপরিচিত তোর হাসি,
'আমি ভালোবাসি।'

বিরহব্যথার মতো এলি প্রাণে কোথা হতে তুই
ও আমার জুঁই !
আজ তাই পড়ে মনে
বাদল-সাঁঝের বনে
ঝর ঝর ধারা,
মাঠে মাঠে ভিজে হাওয়া
যেন কী-স্বপনে-পাওয়া,
ঘুরে ঘুরে সারা ।
সজল তিমিরতলে তোর গন্ধ বলেছে নিশ্বাসি,
'আমি ভালোবাসি ।'

মিলনসুখের মতো কোথা হতে এসেছিস তুই
ও আমার জুঁই !
মনে পড়ে কত রাতে
দীপ জ্বলে জানালাতে
বাতাসে চঞ্চল ।
মাধুরী ধরে না প্রাণে,
কী বেদনা বক্ষে আনে,
চক্ষে আনে জল ।
সে রাতে তোমার মালা বলেছে মর্মের কাছে আসি,
'আমি ভালোবাসি ।'

অসীম কালের যেন দীর্ঘশ্বাস বহেছিস তুই
ও আমার জুঁই !
বক্ষে এনেছিস কার
যুগ-যুগান্তের ভার,
ব্যর্থ পথ-চাওয়া—
বারে বারে দ্বারে এসে
কোন্ নীরবের দেশে
ফিরে ফিরে যাওয়া ।
তোর মাঝে কেঁদে বাজে চিরপ্রত্যাশার কোন্ বাঁশি,
'আমি ভালোবাসি ।'

বুয়েনোস এয়ারিস
২০ ডিসেম্বর ১৯২৪

বিরহিণী

তিন বছরের বিরহিণী জানলাখানি ধরে
কোন্ অলক্ষ্য তারার পানে তাকাও অমন করে।
অতীত কালের বোঝার তলায় আমরা চাপা থাকি,
ভাবী কালের প্রদোষ-আলোয় মগ্ন তোমার আঁখি।
তাই তোমার ওই কাঁদন-হাসির সবটা বুঝি না যে,
স্বপন দেখে অনাগত তোমার প্রাণের মাঝে।
কোন্ সাগরের তীর দেখেছ জানে না তো কেউ,
হাসির আভায় নাচে সে কোন্ সুদূর অশ্রু-ঢেউ।
সেখানে কোন্ রাজপুত্তুর চিরদিনের দেশে
তোমার লাগি সাজতে গেছে প্রতিদিনের বেশে।
সেখানে সে বাজায় বাঁশি রূপকথারই ছায়ে,
সেই রাগিণীর তালে তোমার নাচন লাগে গায়ে।
আপনি তুমি জান না তো আছ কাহার আশায়,
অনামারে ডাক দিয়েছ চোখের নীরব ভাষায়।
হয়তো সে কোন্ সকালবেলা শিশির-ঝলা পথে
জাগরণের কেতন তুলে আসবে সোনার রথে,
কিংবা পূর্ণ চাঁদের লগ্নে বৃহস্পতির দশায়—
দুঃখ আমার, আর সে যে হোক, নয় সে দাদামশায়।

বুয়েনোস এয়ারিস
২০ ডিসেম্বর ১৯২৪

না-পাওয়া

ওগো মোর না-পাওয়া গো, ভোরের অরুণ-আভাসনে
ঘুমে ছুঁয়ে যাও মোর পাওয়ার পাখিরে ক্ষণে ক্ষণে।
সহসা স্বপন টুটে
তাই সে যে গেয়ে উঠে
কিছু তার বুঝি নাহি বুঝি।
তাই সে যে পাখা মেলে
উড়ে যায় ঘর ফেলে,
ফিরে আসে কারে খুঁজি খুঁজি।

ওগো মোর না-পাওয়া গো, সায়াহ্নের করুণ কিরণে
পূরবীতে ডাক দাও আমার পাওয়ারে ক্ষণে ক্ষণে।
হিয়া তাই ওঠে কেঁদে,
রাখিতে পারি না বেঁধে,
অকারণে দূরে থাকে চেয়ে—
মলিন আকাশতলে
যেন কোন্ খেয়া চলে,
কে যে যায় সারিগান গেয়ে।

ওগো মোর না-পাওয়া গো, বসন্তনিশীথসমীরণে
অভিসারে আসিতেছ আমার পাওয়ার কুঞ্জবনে।
কে জানালো সে কথা যে
গোপন হৃদয়মাঝে
আজও তাহা বুঝিতে পারি নি।
মনে হয় পলে পলে
দূর পথে বেজে চলে
ঝিল্লিরবে তাহার কিঙ্কিণী।

ওগো মোর না-পাওয়া গো, কখন আসিয়া সংগোপনে
আমার পাওয়ার বীণা কাঁপাও অঙ্গুলিপরশনে।
কার গানে কার সুর
মিলে গেছে সুমধুর
ভাগ করে কে লইবে চিনে।
ওরা এসে বলে, 'এ কী,
বুঝাইয়া বলো দেখি।'
আমি বলি বুঝাতে পারি নে।

ওগো মোর না-পাওয়া গো, শ্রাবণের অশান্ত পবনে
কদম্ববনের গন্ধে জড়িত বৃষ্টির বরিষনে
আমার পাওয়ার কানে
জানি নে তো মোর গানে
কার কথা বলি আমি কারে।
'কী কহ' সে যবে পুছে
তখন সন্দেহ ঘুচে—
আমার বন্দনা না-পাওয়ারে।

বুয়েনোস এয়ারিস
২৪ ডিসেম্বর ১৯২৪

সৃষ্টিকর্তা

জানি আমি মোর কাব্য ভালোবেসেছেন মোর বিধি,
ফিরে যে পেলেন তিনি দ্বিগুণ আপন-দেওয়া নিধি।
তাঁর বসন্তের ফুল বাতাসে কেমন বলে বাণী
সে যে তিনি মোর গানে বারংবার নিয়েছেন জানি।
আমি শুনায়েছি তাঁরে শ্রাবণরাত্রির বৃষ্টিধারা
কী অনাদি বিচ্ছেদের জাগায় বেদন সঙ্গীহারা।
যেদিন পূর্ণিমা-রাতে পুষ্পিত শালের বনে বনে
শরীরী ছায়ার মতো একা ফিরি আপনার মনে
গুঞ্জরিয়া অসমাপ্ত সুর, শালের মঞ্জরী যত
কী যেন শুনিতে চাহে ব্যগ্রতায় করি শির নত,

ছায়াতে তিনিও সাথে ফেরেন নিঃশব্দ পদচারে
বাঁশির উত্তর তাঁর আমার বাঁশিতে শুনিবারে।
যেদিন প্রিয়ার কালো চক্ষুর সজল করুণায়
রাত্রির প্রহর-মাঝে অন্ধকারে নিবিড় ঘনায়
নিঃশব্দ বেদনা, তার দুটি হাতে মোর হাত রাখি
স্তিমিত প্রদীপালোকে মুখে তার স্তব্ধ চেয়ে থাকি,
তখন আঁধারে বসি আকাশের তারকার মাঝে
অপেক্ষা করেন তিনি, শুনিতে কখন বীণা বাজে
যে সুরে আপনি তিনি উন্মাদিনী অভিসারিণীরে
ডাকিছেন সর্বহারা মিলনের প্রলয়তিমিরে।

বুয়েনোস এয়ারিস
২৫ ডিসেম্বর ১৯২৪

বীণাহারা

যবে এসে নাড়া দিলে দ্বার
চমকি উঠিনু লাজে,
খুঁজে দেখি গৃহমাঝে
বীণা ফেলে এসেছি আমার,
ওগো বীনকার।
সেদিন মেঘের ভারে
নদীর পশ্চিম পারে
ঘন হল দিগন্তের ভুরু,
বৃষ্টির নাচনে মাতা
বনে মর্মরিল পাতা,
দেয়া গরজিল গুরু গুরু।
ভরা হল আয়োজন,
ভাবিনু ভরিবে মন
বক্ষে জেগে উঠিবে মল্লার—
হায়, লাগিল না সুর
কোথায় সে বহুদূর
বীণা ফেলে এসেছি আমার।

কণ্ঠে নিয়ে এলে পুষ্পহার।
পুরস্কার পাব আশে
খুঁজে দেখি চারি পাশে
বীণা ফেলে এসেছি আমার,
ওগো বীনকার।
প্রবাসে বনের ছায়ে
সহসা আমার গায়ে
ফাল্গুনের ছোঁয়া লাগে একি?

এ পারের যত পাখি
সবাই কহিল ডাকি,
'ও পারের গান গাও দেখি।'
ভাবিলাম মোর ছন্দে
মিলাব ফুলের গন্ধে
আনন্দের বসন্তবাহার।
খুঁজিয়া দেখিনু বুকে,
কহিলাম নতমুখে,
'বীণা ফেলে এসেছি আমার।'

এল বুঝি মিলনের বার।
আকাশ ভরিল ওই,
শুধাইলে 'সুর কই ?'—
বীণা ফেলে এসেছি আমার,
ওগো বীনকার।
অস্তরবি গোধূলিতে
বলে গেল পূরবীতে
আর তো অধিক নাই দেরি।
রাঙা আলোকের জবা
সাজিয়ে তুলেছে সভা,
সিংহদ্বারে বাজিয়াছে ভেরি।
সুদূর আকাশতলে
ধ্রুবতারা ডেকে বলে,
'তারে তারে লাগাও ঝংকার।'
কানাড়াতে সাহানাতে
জাগিতে হবে যে রাতে—
বীণা ফেলে এসেছি আমার।

এলে নিয়ে শিখা বেদনার।
গানে যে বরিব তারে,
চাহিলাম চারি ধারে—
বীণা ফেলে এসেছি আমার,
ওগো বীনকার।
কাজ হয়ে গেছে সারা,
নিশীথে উঠেছে তারা,
মিলে গেছে বাটে আর মাঠে।
দীপহীন বাঁধা তরী
সারা দীর্ঘ রাত ধরি
দুলিয়া দুলিয়া ওঠে ঘাটে।
যে শিখা গিয়েছে নিবে
অগ্নি দিয়ে জ্বেলে দিবে,
সে আলোতে হতে হবে পার।

শুনেছি গানের তালে
সুবাতাস লাগে পালে—
বীণা ফেলে এসেছি আমার।

সান ইসিড্রো
২৭ ডিসেম্বর ১৯২৪

বনস্পতি

পূর্ণতার সাধনায় বনস্পতি চাহে ঊর্ধ্বপানে ;
পুঞ্জ পুঞ্জ পল্লবে পল্লবে
নিত্য তার সারা জাগে বিরাটের নিঃশব্দ আহ্বানে,
মন্ত্র জপে মর্মরিত রবে।
ধ্রুবত্বের মূর্তি সে যে, দৃঢ়তা শাখায় প্রশাখায়
বিপুল প্রাণের বহে ভার।
তবু তার শ্যামলতা কম্পমান ভীরু বেদনায়
আন্দোলিয়া উঠে বারংবার।

দয়া কোরো, দয়া কোরো আরণ্যক এই তপস্বীরে—
ধৈর্য ধরো ওগো দিগঙ্গনা,
ব্যর্থ করিবারে তার অশান্ত আবেগে ফিরে ফিরে
বনের অঙ্গনে মাতিয়ো না।
এ কী তীব্র প্রেম, এ যে শিলাবৃষ্টি নির্মম দুঃসহ—
দুরন্ত চুম্বনবেগে তব
ছিঁড়িতে ঝরাতে চাও অন্ধ সুখে কহো মোরে কহো
কিশোর কোরক নব নব ?

অকস্মাৎ দস্যুতায় তারে রিক্ত করি নিতে চাও
সর্বস্ব তাহার তব সাথে ?
ছিন্ন করি লবে যাহা চিহ্ন তার রবে না কোথাও,
হবে তারে মুহূর্তে হারাতে।
যে লুব্ধ ধূলির তলে লুকাতে চাহিবে তব লাভ
সে তোমারে ফাঁকি দেবে শেষে।
লুণ্ঠনের ধন লুঠি সর্বগ্রাসী দারুণ অভাব
উঠিবে কঠিন হাসি হেসে।

আসুক তোমার প্রেম দীপ্তিরূপে নীলাম্বরতলে,
শান্তিরূপে এসো দিগঙ্গনা !
উঠুক স্পন্দিত হয়ে শাখে শাখে পল্লবে বল্কলে
সুগম্ভীর তোমার বন্দনা।

দাও তারে সেই তেজ মহত্ত্বে যাহার সমাধান,
সার্থক হোক সে বনস্পতি।
বিশ্বের অঞ্জলি যেন ভরিয়া করিতে পারে দান
তপস্যার পূর্ণ পরিণতি।

উঠুক তোমার প্রেম রূপ ধরি তার সর্বমাঝে
নিত্য নব পত্রে ফলে ফুলে।
গোপনে আঁধারে তার যে অনন্ত নিয়ত বিরাজে
আবরণ দাও তার খুলে।
তাহার গৌরবে লহো তোমারি স্পর্শের পরিচয়,
আপনার চরম বারতা—
তারি লাভে লাভ করো বিনা লোভে সম্পদ অক্ষয়,
তারি ফলে, তব সফলতা।

সান ইসিড্রো
২৮ ডিসেম্বর ১৯২৪

পথ

আমি পথ, দূরে দূরে দেশে দেশে ফিরে ফিরে শেষে
দুয়ার-বাহিরে থামি এসে।
ভিতরেতে গাঁথা চলে নানা সূত্রে রচনার ধারা,
আমি পাই ক্ষণে ক্ষণে তারি ছিন্ন অংশ অর্থহারা,
সেথা হতে লেখে মোর ধূলিপটে দীপরশ্মিরেখা
অসম্পূর্ণ লেখা।

জীবনের সৌধমাঝে কত কক্ষ কত না মহলা,
তলার উপরে কত তলা।
আজন্মবিধবা তারি এক প্রান্তে রয়েছি একাকী,
সবার নিকটে থেকে তবুও অসীম দূরে থাকি,
লক্ষ্য নহি উপলক্ষ, দেশ নহি আমি যে উদ্দেশ—
মোর নাহি শেষ।

উৎসবসভায় যেতে যে পায় আহ্বান-পত্রখানি
তাহারে বহন করে আনি।
সে লিপির খণ্ডগুলি মোর বক্ষে উড়ে এসে পড়ে,
ধুলায় করিয়া লুপ্ত তাদের উড়ায়ে দিই ঝড়ে,
আমি মালা গেঁথে চলি শত শত জীর্ণ শতাব্দীর
বহু বিস্মৃতির।

কেহ যারে নাহি শোনে, সবাই যাহারে বলে 'জানি',
আমি সেই পুরাতন বাণী।

বণিকের পণ্যযান হে তুমি রাজার জয়রথ,
আমি চলিবার পথ, সেই আমি ভুলিবার পথ,
তীব্রদুঃখ মহাদম্ভ চিহ্ন মুছে গিয়েছে সবাই—
কিছু নাই, নাই।

কভু সুখে কভু দুঃখে নিয়ে চলি ; সুদিন দুর্দিন
নাহি বুঝি আমি উদাসীন।
বার বার কচি ঘাস কোথা হতে আসে মোর কোলে,
চলে যায়— সেও যায় যে যায় তাহারে দ'লে দ'লে ;
বিচিত্রের প্রয়োজনে অবিচিত্র আমি শূন্যময়—
কিছু নাহি রয়।

বসিতে না চাহে কেহ, কাহারো কিছু না সহে দেরি—
কারো নই, তাই সকলেরই।
বামে মোর শস্যক্ষেত্র, দক্ষিণে আমার লোকালয়—
প্রাণ সেথা দুই হস্তে বর্তমান আঁকড়িয়া রয়।
আমি সর্ববন্ধহীন নিত্য চলি তারি মধ্যখানে
ভবিষ্যের পানে।

তাই আমি চিররিক্ত, কিছু নাহি থাকে মোর পুঁজি—
কিছু নাহি পাই, নাহি খুঁজি।
আমারে ভুলিবে ব'লে যাত্রীদল গান গাহে সুরে—
পারি নে রাখিতে তাহা, সে গান চলিয়া যায় দূরে।
বসন্ত আমার বুকে আসে যবে ধুলায় আকুল
নাহি দেয় ফুল।

পৌঁছিয়া ক্ষতির প্রান্তে বিত্তহীন একদিন শেষে
শয্যা পাতে মোর পাশে এসে।
পান্থের পাথেয় হতে খসে পড়ে যাহা ভাঙাচোরা
ধূলিরে বঞ্চনা করি কাড়িয়া তুলিয়া লয় ওরা ;
আমি রিক্ত, ওরা রিক্ত, মোর 'পরে নাই প্রীতিলেশ—
মোরে করে দ্বেষ।

শুধু শিশু বোঝে মোরে, আমারে সে জানে ছুটি ব'লে—
ঘর ছেড়ে আসে তাই চলে।
নিষেধ বা অনুমতি মোর মাঝে না দেয় পাহারা,
আবশ্যকে নাহি রচে বিবিধের বস্তুময় কারা,
বিধাতার মতো শিশু লীলা দিয়ে শূন্য দেয় ভরে—
শিশু বোঝে মোরে।

বিলুপ্তির ধূলি দিয়ে যাহা খুশি সৃষ্টি করে তাই,
এই আছে এই তাহা নাই।
ভিত্তিহীন ঘর বেঁধে আনন্দে কাটায়ে দেয় বেলা,
মূল্য যার কিছু নাই তাই দিয়ে মূল্যহীন খেলা,
ভাঙাগড়া দুই নিয়ে নৃত্য তার অখণ্ড উল্লাসে—
মোরে ভালোবাসে।

সান ইসিড্রো
২৯ ডিসেম্বর ১৯২৪

মিলন

জীবন-মরণের স্রোতের ধারা
যেখানে এসে গেছে থামি
সেখানে মিলেছিনু সময়হারা
একদা তুমি আর আমি।
চলেছি আজ একা ভেসে
কোথা যে কত দূর দেশে,
তরণী দুলিতেছে ঝড়ে—
এখন কেন মনে পড়ে
যেখানে ধরণীর সীমার শেষে
স্বর্গ আসিয়াছে নামি
সেখানে একদিন মিলেছি এসে
কেবল তুমি আর আমি।

সেখানে বসেছিনু আপন-ভোলা
আমরা দোঁহে পাশে পাশে।
সেদিন বুঝেছিনু কিসের দোলা
দুলিয়া উঠে ঘাসে ঘাসে।
কিসের খুশি উঠে কেঁপে
নিখিল চরাচর ব্যেপে,
কেমনে আলোকের জয়
আঁধারে হল তারাময়,
প্রাণের নিশ্বাস কী মহাবেগে
ছুটেছে দশদিক্‌গামী—
সেদিন বুঝেছিনু যেদিন জেগে
চাহিনু তুমি আর আমি।

বিজনে বসেছিনু আকাশে চাহি
তোমার হাত নিয়ে হাতে।
দোঁহার কারো মুখে কথাটি নাহি,
নিমেষ নাহি আঁখিপাতে।

সেদিন বুঝেছিনু প্রাণে
ভাষার সীমা কোন্‌খানে,
বিশ্বহৃদয়ের মাঝে
বাণীর বীণা কোথা বাজে,
কিসের বেদনা সে বনের বুকে
কুসুমে ফোটে দিনযামী—
বুঝিনু যবে দোঁহে ব্যাকুল সুখে
কাঁদিনু তুমি আর আমি ।

বুঝিনু কী আগুনে ফাগুন-হাওয়া
গোপনে আপনারে দাহে,
কেন-যে অরুণের করুণ চাওয়া
নিজেরে মিলাইতে চাহে,
অকূলে হারাইতে নদী
কেন যে ধায় নিরবধি,
বিজুলি আপনার বাণে
কেন যে আপনারে হানে,
রজনী কী খেলা যে প্রভাত-সনে
খেলিছে পরাজয়কামী—
বুঝিনু যবে দোঁহে পরান-পণে
খেলিনু তুমি আর আমি ।

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ
৯ জানুয়ারি ১৯২৫

অন্ধকার

উদয়াস্ত দুই তটে অবিচ্ছিন্ন আসন তোমার,
নিগূঢ় সুন্দর অন্ধকার ।
প্রভাত-আলোকচ্ছটা শুভ্র তব আদিশঙ্খধ্বনি
চিত্তের কন্দরে মোর বেজেছিল, একদা যেমনি
নূতন চেয়েছি আঁখি তুলি ;
সে তব সংকেতমন্ত্র ধ্বনিয়াছে, হে মৌনী মহান,
কর্মের তরঙ্গে মোর ; স্বপ্ন-উৎস হতে মোর গান
উঠেছে ব্যাকুলি ।

নিস্তব্ধের সে আহ্বানে বাহিয়া জীবনযাত্রা মম
সিন্ধুগামী তরঙ্গিণীসম
এতকাল চলেছিনু তোমারি সুদূর অভিসারে
বঙ্কিম জটিল পথে সুখে দুঃখে বন্ধুর সংসারে
অনির্দেশ অলক্ষ্যের পানে ।

কভু পথতরুচ্ছায়ে খেলাঘর করেছি রচনা,
শেষ না হইতে খেলা চলিয়া এসেছি অন্যমনা
অশেষের টানে।

আজি মোর ক্লান্তি ঘেরি দিবসের অন্তিম প্রহর
গোধূলির ছায়ায় ধূসর।
হে গম্ভীর, আসিয়াছি তোমার সোনার সিংহদ্বারে
যেখানে দিনান্তরবি আপন চরম নমস্কারে
তোমার চরণে নত হল।
যেথা রিক্ত নিঃস্ব দিবা প্রাচীন ভিক্ষুর জীর্ণবেশে
নূতন প্রাণের লাগি তোমার প্রাঙ্গণতলে এসে
বলে 'দ্বার খোলো'।

দিনের আড়ালে থেকে কী চেয়েছি পাই নি উদ্দেশ,
আজ সে সন্ধান হোক শেষ।
হে চিরনির্মল, তব শান্তি দিয়ে স্পর্শ করো চোখ,
দৃষ্টির সম্মুখে মম এইবার নির্বারিত হোক
আঁধারের আলোকভাণ্ডার।
নিয়ে যাও সেইখানে নিঃশব্দের গূঢ় গুহা হতে
যেখানে বিশ্বের কণ্ঠে নিঃসরিছে চিরন্তন স্রোতে
সংগীত তোমার।

দিনের সংগ্রহ হতে আজি কোন্ অর্ঘ্য নিয়ে যাই
তোমার মন্দিরে, ভাবি তাই।
কত-না শ্রেষ্ঠীর হাতে পেয়েছি কীর্তির পুরস্কার,
সযত্নে এসেছি বহে সেই-সব রত্ন-অলংকার,
ফিরিয়াছি দেশ হতে দেশে।
শেষে আজ চেয়ে দেখি, যবে মোর যাত্রা হল সারা,
দিনের আলোর সাথে ম্লান হয়ে এসেছে তাহারা
তব দ্বারে এসে।

রাত্রির নিকষে হায় কত সোনা হয়ে যায় মিছে,
সে বোঝা ফেলিয়া যাব পিছে।
কিছু বাকি আছে তবু, প্রাতে মোর যাত্রাসহচরী
অকারণে দিয়েছিল মোর হাতে মাধবীমঞ্জরী,
আজও তাহা অম্লান বিরাজে।
শিশিরের ছোঁওয়া যেন এখনো রয়েছে তার গায়,
এ জন্মের সেই দান রেখে দেব তোমার থালায়
নক্ষত্রের মাঝে।

হে নিত্য নবীন, কবে তোমারি গোপন কক্ষ হতে
পাড়ি দিল এ ফুল আলোতে।
সুপ্তি হতে জেগে দেখি বসন্তে একদা রাত্রিশেষে
অরুণকিরণ সাথে এ মাধুরী আসিয়াছে ভেসে
হৃদয়ের বিজন পুলিনে।
দিবসের ধুলা এরে কিছুতে পারে নি কাড়িবারে,
সেই তব নিজ দান বহিয়া আনিনু তব দ্বারে,
তুমি লও চিনে।

হে চরম, এরই গন্ধে তোমারি আনন্দ এল মিশে,
বুঝেও তখন বুঝি নি সে।
তব লিপি বর্ণে বর্ণে লেখা ছিল এরই পাতে পাতে,
তাই নিয়ে গোপনে সে এসেছিল তোমারে চিনাতে,
কিছু যেন জেনেছি আভাসে।
আজিকে সন্ধ্যায় যবে সব শব্দ হল অবসান
আমার ধেয়ান হতে জাগিয়া উঠিছে এরই গান
তোমার আকাশে।

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ
১০ জানুয়ারি ১৯২৫

প্রাণগঙ্গা

প্রতিদিন নদীস্রোতে পুষ্পপত্র করি অর্ঘ্য দান
পূজারির পূজা-অবসান।
আমিও তেমনি যত্নে মোর ডালি ভবি
গানের অঞ্জলি দান করি
প্রাণের জাহ্নবীজলধারে,
পূজি আমি তারে।

বিগলিত প্রেমের আনন্দবারি সে যে,
এসেছে বৈকুণ্ঠধাম ত্যেজে।
মৃত্যুঞ্জয় শিবের অসীম জটাজালে
ঘুরে ঘুরে কালে কালে
তপস্যার তাপ লেগে প্রবাহ পবিত্র হল তার।
কত-না যুগের পাপভার
নিঃশেষে ভাসায়ে দিল অতলের মাঝে।
তরঙ্গে তরঙ্গে তার বাজে
ভবিষ্যের মঙ্গলসংগীত।
তটে তটে বাঁকে বাঁকে অনন্তের চলেছে ইঙ্গিত।

দৈবস্পর্শে তার
আমারে সে ধূলি হতে করিল উদ্ধার ;
অঙ্গে অঙ্গে দিল তার তরঙ্গের দোল ;
কণ্ঠে দিল আপন কল্লোল ।
আলোকের নৃত্যে মোর চক্ষু দিল ভরি
বর্ণের লহরী ।
খুলে গেল অনন্তের কালো উত্তরীয় ;
কত রূপে দেখা দিল প্রিয়,
অনির্বচনীয় ।

তাই মোর গান
কুসুম-অঞ্জলি-অর্ঘ্যদান ।
প্রাণজাহ্নবীরে ।
তাহারি আবর্তে ফিরে ফিরে
এ পূজার কোনো ফুল নাও যদি ভাসে চিরদিন,
বিস্মৃতির তলে হয় লীন,
তবে তার লাগি, কহো,
কার সাথে আমার কলহ ।
এই নীলাম্বরতলে তৃণরোমাঞ্চিত ধরণীতে
বসন্তে বর্ষায় গ্রীষ্মে শীতে
প্রতিদিবসের পূজা প্রতিদিন করি অবসান
ধন্য হয়ে ভেসে যাক গান ।

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ
১৬ জানুয়ারি ১৯২৫

বদল

হাসির কুসুম আনিল সে ডালি ভরি,
আমি আনিলাম দুখবাদলের ফল ।
শুধালেম তারে, 'যদি এ বদল করি
হার হবে কার বল্ ।'
হাসি কৌতুকে কহিল সে সুন্দরী,
'এসো-না, বদল করি ।
দিয়ে মোর হার লব ফলভার
অশ্রুর রসে ভরা ।'
চাহিয়া দেখিনু মুখপানে তার
নিদয়া সে মনোহরা ।

সে লইল তুলে আমার ফলের ডালা,
করতালি দিল হাসিয়া সকৌতুকে ।

আমি লইলাম তাহার ফুলের মালা,
তুলিয়া ধরিনু বুকে।
'মোর হল জয়' হেসে হেসে কয়,
দূরে চলে গেল ত্বরা।
উঠিল তপন মধ্যগগনদেশে,
আসিল দারুণ খরা—
সন্ধ্যায় দেখি তপ্ত দিনের শেষে
ফুলগুলি সব ঝরা।

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ
১৭ জানুয়ারি ১৯২৫

ইটালিয়া

কহিলাম, 'ওগো রানী,
কত কবি এল, চরণে তোমার উপহার দিল আনি।
এসেছি শুনিয়া তাই,
উষার দুয়ারে পাখির মতন গান গেয়ে চলে যাই।'
শুনিয়া দাঁড়ালে তব বাতায়ন-'পরে;
ঘোমটা আড়ালে কহিলে করুণ স্বরে,
'এখন শীতের দিন
কুয়াশায় ঢাকা আকাশ আমার, কানন কুসুমহীন।'

কহিলাম, 'ওগো রানী,
সাগরপারের নিকুঞ্জ হতে এনেছি বাঁশরিখানি।
উতারো ঘোমটা তব,
বারেক তোমার কালো নয়নের আলোখানি দেখে লব।'
কহিলে, 'আমার হয় নি রঙিন সাজ;
হে অধীর কবি, ফিরে যাও তুমি আজ;
মধুর ফাগুন মাসে
কুসুম-আসনে বসিব যখন ডেকে লব মোর পাশে।'

কহিলাম, 'ওগো রানী,
সফল হয়েছে যাত্রা আমার, শুনেছি আশার বাণী।
বসন্তসমীরণে
তব আহ্বানমন্ত্র ফুটিবে কুসুমে আমার বনে।
মধুপমুখর গন্ধমাতাল দিনে
ওই জানালার পথখানি লব চিনে,
আসিবে সে সুসময়।
আজিকে বিদায় নেবার বেলায় গাহিব তোমার জয়।'

মিলান
২৪ জানুয়ারি ১৯২৫

লেখক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বুডাপেস্ট

২৬ কার্তিক

১৩৩৩

ভূমিকা

এই লেখাগুলি শুরু হয়েছিল চীনে জাপানে। পাখায় কাগজে রুমালে কিছু লিখে দেবার জন্যে লোকের অনুরোধেই এর উৎপত্তি। তার পরে স্বদেশে ও অন্য দেশেও তাগিদ পেয়েছি। এমনি করে এই টুকরো লেখাগুলি জমে উঠল। এর প্রধান মূল্য হাতের অক্ষরে ব্যক্তিগত পরিচয়ের। সে পরিচয় কেবল অক্ষরে নয়, দ্রুতলিখিত ভাবের মধ্যেও ধরা পড়ে। ছাপার অক্ষরে সেই ব্যক্তিগত সংস্পর্শ নষ্ট হয়—সে অবস্থায় এই সব লেখা বাতি-নেবা চীনলণ্ঠনের মতো হাল্কা ও ব্যর্থ হতে পারে। সেই জর্মানিতে হাতের অক্ষর ছাপবার উপায় আছে খবর পেয়ে লেখাগুলি ছাপিয়ে নেওয়া গেল। অসাবধানতায় কাটাকুটি ভুলচুক ঘটেছে। সে সব ত্রুটিতেও ব্যক্তিগত পরিচয়েরই আভাস রয়ে গেল॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

The lines in the following pages had their origin in China and Japan where the author was asked for his writings on fans or pieces of silk.

Rabindranath Tagore

Nov. 7. 1926
Balatonfüred. Hungary.

লেখন

স্বপ্ন আমার জোনাকি,
দীপ্ত প্রাণের মণিকা,
স্তব্ধ আঁধার নিশীথে
উড়িছে আলোর কণিকা॥

My fancies are fireflies
specks of living light—
twinkling in the dark.

আমার লিখন ফুটে পথধারে
ক্ষণিক কালের ফুলে,
চলিতে চলিতে দেখে যারা তারে
চলিতে চলিতে ভুলে॥

The same voice murmurs
in these desultory lines
which is born in wayside pansies
letting hasty glances pass by.

প্রজাপতি সেত বরষ না গণে,
নিমেষ গণিয়া বাঁচে,
সময় তাহার যথেষ্ট তাই আছে॥

The butterfly does not count years
but moments
and therefore has enough time.

তোমার বনে ফুটেছে শ্বেত করবী,
আমার বনে রাঙা।
দোঁহার আঁখি চিনিল দোঁহে নীরবে
ফাগুনে ঘুম-ভাঙা ॥ ১৫

আকাশ ধরারে বাহুতে বেড়িয়া রাখে,
তবুও আপনি অসীম সুদূরে থাকে ॥ ১৬

দূর এসেছিল কাছে—
ফুরাইলে দিন, দূরে চলে গিয়ে আরো সে নিকটে আছে ॥ ১৭

ওগো অনন্ত কালো,
ভীরু এ দীপের আলো,
তারি ছোটো ভয় করিবারে জয় অগণ্য তারা জ্বালো ॥ ১৮

আমার বাণীর পতঙ্গ গুহাচর
আয় গহ্বর ছেড়ে—
গোধূলিতে এল শেষ যাত্রার অবসর,
হারিয়ে যা পাখা নেড়ে ॥ ১৯

দাঁড়ায়ে গিরি শির
মেঘে তুলে,
দেখে না সরসীর
বিনতি।
অচল উদাসীর
পদমূলে
ব্যাকুল রূপসীর
মিনতি ॥ ২০

ভাসিয়ে দিয়ে মেঘের ভেলা
খেলেন আলো-ছায়ার খেলা,
শিশুর মতো শিশুর সাথে
কাটান হেসে প্রভাত বেলা ॥ ২১

মেঘ সে বাষ্পগিরি,
গিরি সে বাষ্পমেঘ,
কালের স্বপ্নে যুগে যুগে ফিরি ফিরি
এ কিসের ভাবাবেগ ॥ ২২

চান ভগবান প্রেম দিয়ে তাঁর
গড়া হবে দেবালয়,
মানুষ আকাশে উঁচু করে তোলে
ইঁট পাথরের জয় ॥ ২৩

কীটেরে দয়া করিয়ো, ফুল,
সে নহে মধুকর ।
প্রেম যে তার বিষম ভুল
করিল জর্জর ।। ৩৫

মাটির প্রদীপ সারা দিবসের অবহেলা লয় মেনে,
রাত্রে শিখার চুম্বন পাবে জেনে ।। ৩৬

দিনের রৌদ্রে আবৃত বেদনা বচনহারা,
আঁধারে যে তাহা জ্বলে রজনীর দীপ্ত তারা ।। ৩৭

গানের কাঙাল এ বীণার তার বেসুরে মরিছে কেঁদে ।
দাও তার সুর বেঁধে ।। ৩৮

নিভৃত প্রাণের নিবিড় ছায়ায় নীরব নীড়ের-'পরে
কথাহীন ব্যথা একা একা বাস করে ।। ৩৯

আলো যবে ভালোবেসে মালা দেয় আঁধারের গলে,
সৃষ্টি তারে বলে ।। ৪০

আলোকের স্মৃতি ছায়া বুকে করে রাখে,
ছবি বলি তাকে ।। ৪১

ফুলে ফুলে যবে ফাগুন আত্মহারা
প্রেম যে তখন মোহন মদের ধারা ।
কুসুম ফোটার দিন হলে অবসান
তখন সে প্রেম প্রাণের অন্নপান ।। ৪২

দিন হয়ে গেল গত ।
শুনিতেছি বসে নীরব আঁধারে
আঘাত করিছে হৃদয়দুয়ারে
দূর প্রভাতের ঘরে-ফিরে-আসা
পথিক দুরাশা যত ।। ৪৩

জীর্ণ জয়তোরণ-ধূলি-'পর
ছেলেরা রচে ধূলির খেলাঘর ।। ৪৪

রঙের খেয়ালে আপনা খোয়ালে,
হে মেঘ, করিলে খেলা ।
চাঁদের আসরে যবে ডাকে তোরে
ফুরালো যে তোর বেলা ।। ৪৫

চাহিয়া প্রভাতরবির নয়নে
গোলাপ উঠিল ফুটে ।
'রাখিব তোমায় চিরকাল মনে'
বলিয়া পড়িল টুটে ॥ ৫৫

আকাশে তো আমি রাখি নাই মোর
উড়িবার ইতিহাস ।
তবু, উড়েছিনু এই মোর উল্লাস ॥ ৫৬

লাজুক ছায়া বনের তলে
আলোরে ভালোবাসে ।
পাতা সে কথা ফুলেরে বলে,
ফুল তা শুনে হাসে ॥ ৫৭

আকাশের তারায় তারায়
বিধাতার যে হাসিটি জ্বলে
ক্ষণজীবী জোনাকি এনেছে
সেই হাসি এ ধরণীতলে ॥ ৫৮

কুয়াশা যদি বা ফেলে পরাভবে ঘিরি
তবু নিজমহিমায় অবিচল গিরি ॥ ৫৯

পর্বতমালা আকাশের পানে চাহিয়া না কহে কথা,
অগমের লাগি ওরা ধরণীর স্তম্ভিত ব্যাকুলতা ॥ ৬০

একদিন ফুল দিয়েছিলে, হায়
কাঁটা বিঁধে গেছে তার ।
তবু, সুন্দর, হাসিয়া তোমায়
করিনু নমস্কার ॥ ৬১

হে বন্ধু, জেনো মোর ভালোবাসা,
কোনো দায় নাহি তার—
আপনি সে পায় আপন পুরস্কার ॥ ৬২

স্বল্প সেও স্বল্প নয়, বড়োকে ফেলে ছেয়ে ।
দু-চারি-জন অনেক বেশি বহুজনের চেয়ে ॥ ৬৩

সংগীতে যখন সত্য শোনে নিজবাণী
সৌন্দর্যে তখন ফোটে তার হাসিখানি ॥ ৬৪

আমি জানি মোর ফুলগুলি ফুটে হরষে
না-জানা সে কোন্ শুভচুম্বনপরশে ॥ ৬৫

বুদ্‌বুদ সে তো বদ্ধ আপন ঘেরে—
শূন্যে মিলায়, জানে না সমুদ্রেরে ॥ ৬৬

বিরহপ্রদীপে জ্বলুক দিবসরাতি
মিলনস্মৃতির নির্বাণহীন বাতি ॥ ৬৭

মেঘের দল বিলাপ করে
আঁধার হল দেখে,
ভুলেছে বুঝি নিজেই তারা
সূর্য দিল ঢেকে ॥ ৬৮

ভিক্ষুবেশে দ্বারে তার 'দাও' বলি দাঁড়ালে দেবতা
মানুষ সহসা পায় আপনার ঐশ্বর্যবারতা ॥ ৬৯

গুণীর লাগিয়া বাঁশি চাহে পথপানে,
বাঁশির লাগিয়া গুণী ফিরিছে সন্ধানে ॥ ৭০

অসীম আকাশ শূন্য প্রসারি রাখে,
হোথায় পৃথিবী মনে মনে তার
অমরার ছবি আঁকে ॥ ৭১

কুন্দকলি ক্ষুদ্র বলি নাই দুঃখ, নাই তার লাজ,
পূর্ণতা অন্তরে তার অগোচরে করিছে বিরাজ।
বসন্তের বাণীখানি আবরণে পড়িয়াছে বাঁধা,
সুন্দর হাসিয়া বহে প্রকাশের সুন্দর এ বাধা ॥ ৭২

ফুলগুলি যেন কথা,
পাতাগুলি যেন চারি দিকে তার
পুঞ্জিত নীরবতা ॥ ৭৩

দিবসের অপরাধ সন্ধ্যা যদি ক্ষমা করে তবে
তাহে তার শান্তিলাভ হবে ॥ ৭৪

আকর্ষণগুণে প্রেম এক করে তোলে।
শক্তি শুধু বেঁধে রাখে শিকলে শিকলে ॥ ৭৫

মহাতরু বহে বহু বরষের ভার।
যেন সে বিরাট এক মুহূর্ত তার ॥ ৭৬

পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়,
পথের দুধারে আছে মোর দেবালয় ॥ ৭৭

ধরায় যেদিন প্রথম জাগিল
কুসুমবন
সেদিন এসেছে আমার গানের
নিমন্ত্রণ ।। ৭৮

হিতৈষীর স্বার্থহীন অত্যাচার যত
ধরণীরে সব চেয়ে করেছে বিক্ষত ।। ৭৯

স্তব্ধ অতল শব্দবিহীন মহাসমুদ্রতলে
বিশ্বফেনার পুঞ্জ সদাই ভাঙিয়া জুড়িয়া চলে ।। ৮০

নরজনমের পুরা দাম দিব যেই
তখনি মুক্তি পাওয়া যাবে সহজেই ।। ৮১

গোঁয়ার কেবল গায়ের জোরেই বাঁকাইয়া দেয় চাবি,
শেষকালে তার কুড়াল ধরিয়া করে মহা দাবাদাবি ।। ৮২

জন্ম মোদের রাতের আঁধার রহস্য হতে
দিনের আলোর সুমহত্তর রহস্যস্রোতে ।। ৮৩

আমার প্রাণের গানের পাখির দল
তোমার কণ্ঠে বাসা খুঁজিবারে
হল আজি চঞ্চল ।। ৮৪

নিমেষকালের খেয়ালের লীলাভরে
অনাদরে যাহা দান কর অকাতরে
শরৎ-রাতের খসে-পড়া তারা-সম
উজ্জ্বলি উঠে প্রাণের আঁধারে মম ।। ৮৫

মোর কাগজের খেলার নৌকা ভেসে চলে যায় সোজা
বহিয়া আমার অকাজ দিনের অলস বেলার বোঝা ।। ৮৬

অকালে যখন বসন্ত আসে শীতের আঙিনা-'পরে
ফিরে যায় দ্বিধাভরে ।
আমের মুকুল ছুটে বাহিরায়, কিছু না বিচার করে—
ফেরে না সে, শুধু মরে ।। ৮৭

হে প্রেম, যখন ক্ষমা কর তুমি সব অভিমান ত্যেজে
কঠিন শাস্তি সে যে ।
হে মাধুরী, তুমি কঠোর আঘাতে যখন নীরব রহ
সেই বড়ো দুঃসহ ।। ৮৮

দেবতার সৃষ্টি বিশ্ব মরণে নূতন হয়ে উঠে।
অসুরের অনাসৃষ্টি আপন অস্তিত্বভারে টুটে ॥ ৮৯

বৃক্ষ সে তো আধুনিক, পুষ্প সেই অতি পুরাতন—
আদিম বীজের বার্তা সেই আনে করিয়া বহন ॥ ৯০

নূতন প্রেম সে ঘুরে ঘুরে মরে শূন্য আকাশমাঝে,
পুরানো প্রেমের রিক্ত বাসায় বাসা তার মেলে না যে ॥ ৯১

সকল চাঁপাই দেয় মোর প্রাণে আনি
চিরপুরাতন একটি চাঁপার বাণী ॥ ৯২

দুঃখের আগুন কোন্ জ্যোতির্ময় পথরেখা টানে
বেদনার পরপার-পানে ॥ ৯৩

ফেলে যবে যাও একা থুয়ে
আকাশের নীলিমায় কার ছোঁওয়া যায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে।
বনে বনে বাতাসে বাতাসে
চলার আভাস কার শিহরিয়া উঠে ঘাসে ঘাসে ॥ ৯৪

উষা একা একা আঁধারের দ্বারে ঝংকারে বীণাখানি,
যেমনি সূর্য বাহিরিয়া আসে মিলায় ঘোমটা টানি ॥ ৯৫

শিশির রবিরে শুধু জানে
বিন্দুরূপে আপন বুকের মাঝখানে ॥ ৯৬

আপন অসীম নিষ্ফলতার পাকে
মরু চিরদিন বন্দী হইয়া থাকে ॥ ৯৭

ধরণীর যজ্ঞ-অগ্নি বৃক্ষরূপে শিখা তার তুলে,
স্ফুলিঙ্গ ছড়ায় ফুলে ফুলে ॥ ৯৮

ফুরাইলে দিবসের পালা
আকাশ সূর্যেরে জপে লয়ে তারকার জপমালা ॥ ৯৯

দিনে দিনে মোর কর্ম আপন দিনের মজুরি পায়।
প্রেম সে আমার চিরদিবসের চরম মূল্য চায় ॥ ১০০

কর্ম আপন দিনের মজুরি রাখিতে চাহে না বাকি।
যে প্রেমে আমার চরম মূল্য তারি তরে চেয়ে থাকি ॥ ১০১

আলোকের সাথে মেলে আঁধারের ভাষা,
মেলে না কুয়াশা ।। ১০২

বিদেশে অচেনা ফুল পথিক কবিরে ডেকে কহে—
'যে দেশ আমার, কবি, সেই দেশ তোমারো কি নহে ?' ১০৩

পুঁথি-কাটা ওই পোকা মানুষকে জানে বোকা ।
বই কেন সে যে চিবিয়ে খায় না
এই লাগে তার ধোঁকা ।। ১০৪

আকাশে মন কেন তাকায় ফলের আশা পুষি ?
কুসুম যদি ফোটে শাখায় তা নিয়ে থাক্ খুশি ।। ১০৫

অনন্তকালের ভালে মহেন্দ্রের বেদনার ছায়া,
মেঘান্ধ অম্বরে আজি তারি যেন মূর্তিমতী মায়া ।। ১০৬

সূর্যাস্তের রঙে রাঙা ধরা যেন পরিণত ফল,
আঁধার রজনী তারে ছিঁড়িতে বাড়ায় করতল ।। ১০৭

প্রজাপতি পায় অবকাশ
ভালোবাসিবারে কমলেরে ।
মধুকর সদা বারোমাস
মধু খুঁজে খুঁজে শুধু ফেরে ।। ১০৮

মায়াজাল দিয়া কুয়াশা জড়ায় প্রভাতেরে চারি ধারে,
অন্ধ করিয়া বন্দী করে যে তারে ।। ১০৯

শুকতারা মনে করে
শুধু একা মোর তরে
অরুণের আলো ।
উষা বলে, 'ভালো, সেই ভালো ।' ১১০

অজানা ফুলের গন্ধের মতো তোমার হাসিটি, প্রিয়,
সরল, মধুর, কী অনির্বচনীয় ।। ১১১

মৃতের যতই বাড়াই মিথ্যা মূল্য,
মরণেরই শুধু ঘটে ততই বাহুল্য ।। ১১২

পারের তরীর পালের হাওয়ার পিছে
তীরের হৃদয় কান্না পাঠায় মিছে ।। ১১৩

সত্য তার সীমা ভালোবাসে,
সেথায় সে মেলে আসি সুন্দরের পাশে ॥ ১১৪

নটরাজ নৃত্য করে নব নব সুন্দরের নাটে,
বসন্তের পুষ্পরঙ্গে শস্যের তরঙ্গে মাঠে মাঠে।
তাঁহারি অক্ষয় নৃত্য, হে গৌরী, তোমার অঙ্গে মনে,
চিত্তের মাধুর্যে তব, ধ্যানে তব, তোমার লিখনে ॥ ১১৫

দিন দেয় তার সোনার বীণা নীরব তারার করে—
চিরদিবসের সুর বাঁধিবার তরে ॥ ১১৬

ভক্তি ভোরের পাখি
রাতের আঁধার শেষ না হতেই 'আলো' ব'লে ওঠে ডাকি ॥ ১১৭

সন্ধ্যায় দিনের পাত্র রিক্ত হলে ফেলে দেয় তারে
নক্ষত্রের প্রাঙ্গণমাঝারে।
রাত্রি তারে অন্ধকারে ধৌত করে পুন ভরি দিতে
প্রভাতের নবীন অমৃতে ॥ ১১৮

দিনের কর্মে মোর প্রেম যেন
শক্তি লভে,
রাতের মিলনে পরম শান্তি
মিলিবে তবে। ১১৯

ভোরের ফুল গিয়েছে যারা
দিনের আলো ত্যেজে
আঁধারে তারা ফিরিয়া আসে
সাঁঝের তারা সেজে ॥ ১২০

যাবার যা সে যাবেই, তারে
না দিলে খুলে দ্বার
ক্ষতির সাথে মিলায়ে বাধা
করিবে একাকার ॥ ১২১

সাগরের কানে জোয়ার-বেলায়
ধীরে কয় তটভূমি,
'তরঙ্গ তব যা বলিতে চায়
তাই লিখে দাও তুমি।'
সাগর ব্যাকুল ফেন-অক্ষরে
যতবার লেখে লেখা
চিরচঞ্চল অতৃপ্তি-ভরে
ততবার মোছে রেখা ॥ ১২২

পুরানো-মাঝে যা-কিছু ছিল চিরকালের ধন,
নূতন, তুমি এনেছ তাই করিয়া আহরণ ॥ ১২৩

মিলননিশীথে ধরণী ভাবিছে চাঁদের কেমন ভাষা—
কোনো কথা নেই, শুধু মুখ চেয়ে হাসা ॥ ১২৪

স্তব্ধ হয়ে কেন্দ্র আছে, না দেখা যায় তারে—
চক্র যত নৃত্য করি ফিরিছে চারি ধারে ॥ ১২৫

দিবসের দীপে শুধু থাকে তেল,
রাতে দীপ আলো দেয় ।
দোঁহার তুলনা করা শুধু অন্যায় ॥ ১২৬

গিরি যে তুষার নিজে রাখে, তার
ভার তারে চেপে রহে ।
গলায়ে যা দেয় ঝরনাধারায়
চরাচর তারে বহে ॥ ১২৭

কাছে থাকার আড়ালখানা ভেদ ক'রে
তোমার প্রেম দেখিতে যেন পায় মোরে ॥ ১২৮

ওই শুন বনে বনে কুঁড়ি বলে তপনেরে ডাকি—
'খুলে দাও আঁখি' ॥ ১২৯

ধরার মাটির তলে বন্দী হয়ে যে-আনন্দ আছে
কচিপাতা হয়ে এল দলে দলে অশথের গাছে ।
বাতাসে মুক্তির দোলে ছুটি পেল ক্ষণিক বাঁচিতে,
নিস্তব্ধ অন্ধের স্বপ্ন দেহ নিল আলোয় নাচিতে ॥ ১৩০

খেলার খেয়ালবশে কাগজের তরী
স্মৃতির খেলেনা দিয়ে দিয়েছিনু ভরি—
যদি ঘাটে গিয়ে ঠেকে প্রভাতবেলায়
তুলে নিয়ো তোমাদের প্রাণের খেলায় ॥ ১৩১

দিনের আলোক যবে রাত্রির অতলে
হয়ে যায় হারা
আঁধারের ধ্যাননেত্রে দীপ্ত হয়ে জ্বলে
শত লক্ষ তারা ।
আলোহীন বাহিরের আশাহীন দয়াহীন ক্ষতি
পূর্ণ করে দেয় যেন অন্তরের অন্তহীন জ্যোতি ॥ ১৩২

অস্তরবির আলো-শতদল
মুদিল অন্ধকারে।
ফুটিয়া উঠুক নবীন ভাষায়
শ্রান্তিবিহীন নবীন আশায়
নব উদয়ের পারে ॥ ১৩৩

জীবন-খাতার অনেক পাতাই এমনিতরো শূন্য থাকে ;
আপন মনের ধেয়ান দিয়ে পূর্ণ করে লও-না তাকে।
সেথায় তোমার গোপন কবি
রচুক আপন স্বর্গছবি,
পরশ করুক দৈববাণী সেথায় তোমার কল্পনাকে ॥ ১৩৪

দেবতা যে চায় পরিতে গলায়
মানুষের গাঁথা মালা,
মাটির কোলেতে তাই রেখে যায়
আপন ফুলের ডালা ॥ ১৩৫

সূর্যপানে চেয়ে ভাবে মল্লিকামুকুল—
'কখন ফুটিবে মোর অত বড়ো ফুল' ॥ ১৩৬

সোনার মুকুট ভাসাইয়া দাও
সন্ধ্যামেঘের তরীতে।
যাও চলে রবি বেশভূষা খুলে
মরণমহেশ্বরের দেউলে
নীরবে প্রণাম করিতে ॥ ১৩৭

সন্ধ্যার প্রদীপ মোর রাত্রির তারারে
বন্দে নমস্কারে ॥ ১৩৮

শিশিরের মালা গাঁথা শরতের তৃণাগ্রসূচিতে
নিমিষে মিলায়, তবু নিখিলের মাধুর্যরুচিতে
স্থান তার চিরস্থির ; মণিমালা রাজেন্দ্রের গলে
আছে, তবু নাই সে যে— নিত্য নষ্ট প্রতি পলে পলে ॥ ১৩৯

দিবসে যাহারে করিয়াছিলাম হেলা
সেই তো আমার প্রদীপ রাতের বেলা ॥ ১৪০

ঝরে-পড়া ফুল আপনার মনে বলে—
'বসন্ত আর নাই এ ধরণীতলে' ॥ ১৪১

বসন্তবায়ু, কুসুমকেশর গেছ কি ভুলি ?
নগরের পথে ঘুরিয়া বেড়াও উড়ায়ে ধূলি ॥ ১৪২

হে অচেনা, তব আঁখিতে আমার
আঁখি কারে পায় খুঁজি—
যুগান্তরের চেনা চাহনিটি
আঁধারে লুকানো বুঝি ।। ১৪৩

দখিন হতে আনিলে, বায়ু, ফুলের জাগরণ—
দখিন মুখে ফিরিবে যবে উজাড় হবে বন ।। ১৪৪

ওগো হংসের পাঁতি,
শীতপবনের সাথি,
ওড়ার মদিরা পাখায় করিছ পান ।
দূরের স্বপনে মেশা
নভোনীলিমার নেশা,
বলো, সেই রসে কেমনে ভরিব গান ।। ১৪৫

শিশিরসিক্ত বনমর্মর
ব্যাকুল করিল কেন ।
ভোরের স্বপনে অনামা প্রিয়ার
কানে-কানে-কথা যেন ।। ১৪৬

দিনান্তের ললাট লেপি
রক্ত-আলো-চন্দনে
দিগ্‌বধূরা ঢাকিল আঁখি
শব্দহীন ক্রন্দনে ।। ১৪৭

নীরব যিনি তাঁহার বাণী নামিলে মোর বাণীতে
তখন আমি তাঁরেও জানি, মোরেও পাই জানিতে ।। ১৪৮

কাঁটাতে আমার অপরাধ আছে,
দোষ নাহি মোর ফুলে ।
কাটা, ওগো প্রিয়, থাক্ মোর কাছে,
ফুল তুমি নিয়ো তুলে ।। ১৪৯

চেয়ে দেখি হোথা তব জানালায়
স্তিমিত প্রদীপখানি
নিবিড় রাতের নিভৃত বীণায়
কী বাজায় কী বা জানি ।। ১৫০

পৌরপথের বিরহী তরুর কানে
বাতাস কেন বা বনের বারতা আনে ।। ১৫১

ও যে চেরিফুল তব বনবিহারিণী,
আমার বকুল বলিছে 'তোমারে চিনি' ॥ ১৫২

ধনীর প্রাসাদ বিকট ক্ষুধিত রাহু
বস্তুপিণ্ড-বোঝায় বদ্ধ বাহু।
মনে পড়ে সেই দীনের রিক্ত ঘরে
বাহু বিমুক্ত আলিঙ্গনের তরে ॥ ১৫৩

গিরির দুরাশা উড়িবারে
ঘুরে মরে মেঘের আকারে ॥ ১৫৪

দূর হতে যারে পেয়েছি পাশে
কাছের চেয়ে সে কাছেতে আসে ॥ ১৫৫

উতল সাগরের অধীর ক্রন্দন
নীরব আকাশের মাগিছে চুম্বন ॥ ১৫৬

চাঁদ কহে 'শোন্
শুকতারা,
রজনী যখন
হল সারা
যাবার বেলায়
কেন শেষে
দেখা দিতে হায়
এলি হেসে,
আলো আঁধারের
মাঝে এসে
করিলি আমায়
দিশেহারা।' ১৫৭

হতভাগা মেঘ পায় প্রভাতের সোনা—
সন্ধ্যা না হতে ফুরায়ে ফেলিয়া
ভেসে যায় আনমনা ॥ ১৫৮

ভেবেছিনু গনি গনি লব সব তারা—
গনিতে গনিতে রাত হয়ে যায় সারা,
বাছিতে বাছিতে কিছু না পাইনু বেছে।
আজ বুঝিলাম যদি না চাহিয়া চাই
তবেই তো একসাথে সব-কিছু পাই—
সিন্ধুরে তাকায়ে দেখো, মরিয়ো না সেঁচে ॥ ১৫৯

তোমারে, প্রিয়ে, হৃদয় দিয়ে
জানি তবুও জানি নি ।
সকল কথা বল নি অভিমানিনী ।। ১৬০

লিলি, তোমারে গেঁথেছি হারে, আপন বলে চিনি—
তবুও তুমি রবে কি বিদেশিনী ।। ১৬১

ফুলের লাগি তাকায়ে ছিলি শীতে
ফলের আশা ওরে !
ফুটিল ফুল ফাগুন-রজনীতে,
বিফলে গেল ঝরে ।। ১৬২

নিমেষকালের অতিথি যাহারা পথে আনাগোনা করে,
আমার গাছের ছায়া তাহাদেরই তরে ।
যে জনার লাগি চিরদিন মোর আঁখি পথ চেয়ে থাকে
আমার গাছের ফল তারি তরে পাকে ।। ১৬৩

বহ্নি যবে বাঁধা থাকে তরুর মর্মের মাঝখানে
ফলে ফুলে পল্লবে বিরাজে ।
যখন উদ্দাম শিখা লজ্জাহীনা বন্ধন না মানে
মরে যায় ব্যর্থ ভস্মমাঝে ।। ১৬৪

কানন কুসুম-উপহার দেয় চাঁদে,
সাগর আপন শূন্যতা নিয়ে কাঁদে ।। ১৬৫

লেখনী জানে না কোন্ অঙ্গুলি লিখিছে,
লেখে যাহা তাও তার কাছে সবই মিছে ।। ১৬৬

মন্দ যাহা নিন্দা তার রাখ না বটে বাকি,
ভালো যেটুকু মূল্য তার কেন বা দাও ফাঁকি ।। ১৬৭

আকাশ কভু পাতে না ফাঁদ
কাড়িয়া নিতে চাঁদে,
বিনা বাঁধনে তাই তো চাঁদ,
নিজেরে নিজে বাঁধে ।। ১৬৮

সমস্ত-আকাশ-ভরা আলোর মহিমা
তৃণের শিশিরমাঝে খোঁজে নিজসীমা ।। ১৬৯

প্রভাত-আলোরে বিদ্রূপ করে ও কি
ক্ষুরের ফলার নিষ্ঠুর ঝকমকি ॥ ১৭০

একা এক শূন্যমাত্র, নাই অবলম্ব—
দুই দেখা দিলে হয় একের আরম্ভ ॥ ১৭১

প্রভেদেরে মানো যদি ঐক্য পাবে তবে,
প্রভেদ ভাঙিতে গেলে ভেদবৃদ্ধি হবে ॥ ১৭২

মৃত্যুর ধর্মই এক, প্রাণধর্ম নানা—
দেবতা মরিলে হবে ধর্ম একখানা ॥ ১৭৩

আঁধার একেরে দেখে একাকার ক'রে,
আলোক একেরে দেখে নানা দিক ধ'রে ॥ ১৭৪

ফুল দেখিবার যোগ্য চক্ষু যার রহে
সেই যেন কাঁটা দেখে, অন্যে নহে নহে ॥ ১৭৫

ধুলায় মারিলে লাথি ঢোকে চোখে মুখে।
জল ঢালো, বালাই নিমেষে যাবে চুকে ॥ ১৭৬

ভালো করিবারে যার বিষম ব্যস্ততা
ভালো হইবারে তার অবসর কোথা ॥ ১৭৭

ভালো যে করিতে পারে ফেরে দ্বারে এসে,
ভালো যে বাসিতে পারে সর্বত্র প্রবেশে ॥ ১৭৮

আগে খোঁড়া করে দিয়ে পরে লও পিঠে,
তারে যদি দয়া বলো শোনায় না মিঠে ॥ ১৭৯

হয় কাজ আছে তব নয় কাজ নাই,
কিন্তু 'কাজ করা যাক' বলিয়ো না ভাই ॥ ১৮০

কাজ সে তো মানুষের, এই কথা ঠিক।
কাজের মানুষ, কিন্তু, ধিক্ তারে ধিক্ ॥ ১৮১

অবকাশ ঘোষে খেলে আপনারি সাথে,
সিন্ধুর স্তব্ধতা দেখে সিন্ধুর তরঙ্গে॥

প্রাণেরে মৃত্যুর ছাপ মূল্য করে দান,
প্রাণ দিয়া লভি তাই যাহা মূল্যবান॥

রস যেথা নাই সেথা যত কিছু খোঁচা,
মরুভূমে জন্মে শুধু কাঁটাগাছ বোঁচা॥

দর্পণে যাহারে দেখি সেই আমি ছায়া,
তারে লয়ে গর্ব করি অপূর্ব এ মায়া॥

আপনি আপনা চেয়ে বড়ো যদি হবে
নিজেকে নিজের কাছে নত করো তবে॥

প্রেমেরে যে করিয়াছে ব্যবসার অঙ্গ
প্রেম দূরে বসে বসে দেখে তার রঙ্গ॥

দুঃখেরে যখন প্রেম করে শিরোমণি
তাহারে আনন্দ বলে চিনি তো তখনি॥

অমৃত যে সত্য, তার নাহি পরিমাণ,
মৃত্যু তারে নিত্য নিত্য করিছে প্রমাণ॥

নাটক ও প্রহসন

গুরু

সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে অচলায়তন নাটকটি "গুরু" নামে এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত এবং লঘুতর আকারে প্রকাশ করা হইল।

শান্তিনিকেতন
১লা ফাল্গুন
১৩২৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গুরু

১

অচলায়তন

একদল বালক

প্রথম। ওরে ভাই শুনেছিস ?
দ্বিতীয়। শুনেছি— কিন্তু চুপ কর।
তৃতীয়। কেন বল দেখি ?
দ্বিতীয়। কী জানি বললে যদি অপরাধ হয় ?
প্রথম। কিন্তু উপাধ্যায়মশায় নিজে যে আমাকে বলেছেন।
তৃতীয়। কী বলেছেন বল-না।
প্রথম। গুরু আসছেন।
সকলে। গুরু আসছেন !
তৃতীয়। ভয় করছে না ভাই ?
দ্বিতীয়। ভয় করছে।
প্রথম। আমার ভয় করছে না, মনে হচ্ছে মজা।
তৃতীয়। কিন্তু ভাই গুরু কী ?
দ্বিতীয়। তা জানি নে।
তৃতীয়। কে জানে ?
দ্বিতীয়। এখানে কেউ জানে না।
প্রথম। শুনেছি গুরু খুব বড়ো, খুব মস্ত বড়ো।
তৃতীয়। তা হলে এখানে কোথায় ধরবে ?
প্রথম। পঞ্চকদাদা বলেন অচলায়তনে তাঁকে কোথাও ধরবে না।
তৃতীয়। কোথাও না ?
প্রথম। কোথাও না।
তৃতীয়। তা হলে কী হবে ?
প্রথম। ভারি মজা হবে।

[প্রস্থান

পঞ্চকের প্রবেশ

পঞ্চক। গান

তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে কেউ তা জানে না।
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে কেউ তা মানে না ।।

ওরে ভাই, কে আছিস ভাই। কাকে ডেকে বলব, গুরু আসছেন।

সঞ্জীবের প্রবেশ

সঞ্জীব। তাই তো শুনেছি। কিন্তু কে এসে খবর দিলে বলো তো।

পঞ্চক। কে দিলে তা তো কেউ বলে না।

সঞ্জীব। কিন্তু গুরু আসছেন বলে তুমি তো তৈরি হচ্ছ না পঞ্চক ?

পঞ্চক। বাঃ, সেইজন্যেই তো পুঁথিপত্র সব ফেলে দিয়েছি।

সঞ্জীব। সেই বুঝি তোমার তৈরি হওয়া ?

পঞ্চক। আরে, গুরু যখন না থাকেন তখনই পুঁথিপত্র। গুরু যখন আসবেন তখন ঐ-সব জঞ্জাল সরিয়ে দিয়ে সময় খোলসা করতে হবে। আমি সেই পুঁথি বন্ধ করবার কাজে ভয়ানক ব্যস্ত।

সঞ্জীব। তাই তো দেখছি।

[প্রস্থান

পঞ্চক। গান

ফিরি আমি উদাস প্রাণে, তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মতো এমন টানে কেউ তো টানে না।

ওহে জয়োত্তম, তুমি কাঁধে কিসের বোঝা নিয়ে চলেছ ? বোঝা ফেলো। গুরু আসছেন যে।

জয়োত্তম। আরে ছুঁয়ো না ; এ-সব মাঙ্গল্য। গুরুর জন্যে সিংহদ্বার সাজাতে চলেছি।

পঞ্চক। গুরু কোন্ দ্বার দিয়ে ঢুকবেন তা জানবে কী করে ?

জয়োত্তম। তা তো বটেই। অচলায়তনে জানবার লোক কেবল তুমিই আছ।

পঞ্চক। তোমরাও জান না, আমিও জানি নে— তফাতটা এই যে, তোমরা বোঝা বয়ে মর, আমি হালকা হয়ে বসে আছি।

জয়োত্তম। আচ্ছা, এখন পথ ছাড়ো, আমার সময় নেই।

[প্রস্থান

পঞ্চক। গান

বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর, কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হতে দুয়ারে কর কেউ তো হানে না।

মহাপঞ্চকের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। গান ! অচলায়তনে গান ! মতিভ্রম হয়েছে !

পঞ্চক। এবার দাদা, স্বয়ং তোমাকেও গান ধরতে হবে। একধার থেকে মতিভ্রমের পালা আরম্ভ হল।

মহাপঞ্চক। আমি মহাপঞ্চক, গান ধরব ! ঠাট্টা আমার সঙ্গে !

পঞ্চক। ঠাট্টা নয়। অচলায়তনে এবার মন্ত্র ঘুচে গান আরম্ভ হবে। এই বোবা পাথরগুলো থেকে সুর বেরোবে।

মহাপঞ্চক। কেন বলো তো ?

পঞ্চক। গুরু আসছেন যে ! তাই আমার কেবলই মন্তরে ভুল হচ্ছে।

মহাপঞ্চক। গুরু এলে তোমার জন্যে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।

পঞ্চক। তার জন্যে ভাবনা কী ? নির্লজ্জ হয়ে একলা আমিই মুখ দেখাব।

মহাপঞ্চক। মন্তরে ভুল হলে গুরু তোমাকে আয়তন থেকে দূর করে দেবেন।

পঞ্চক। সেই ভরসাতেই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

মহাপঞ্চক। অমিতায়ুর্ধারণী মন্ত্রটা—

পঞ্চক। সেই মন্ত্রটা স্বয়ং গুরুর কাছ থেকে শিখব বলেই তো আগাগোড়া ভোলবার চেষ্টায় আছি। সেইজন্যেই গান ধরেছি দাদা।

মহাপঞ্চক। ঐ শঙ্খ বাজল। এখন আমার সপ্তকুমারিকা গাথা পাঠের সময়। কিন্তু বলে যাচ্ছি, সময় নষ্ট কোরো না। গুরু আসছেন।

পঞ্চক। গান

আকাশে কার ব্যাকুলতা, বাতাস বহে কার বারতা,
এ পথে সেই গোপন কথা কেউ তো আনে না ॥

ও কী ও! কান্না শুনি যে! এ নিশ্চয়ই সুভদ্র। আমাদের এই অচলায়তনে ঐ বালকের চোখের জল আর শুকোল না। ওর কান্না আমি সইতে পারি নে।

প্রস্থান ও বালক সুভদ্রকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ

পঞ্চক। তোর কোনো ভয় নেই ভাই, কোনো ভয় নেই। তুই আমার কাছে বল— কী হয়েছে বল।

সুভদ্র। আমি পাপ করেছি।

পঞ্চক। পাপ করেছিস! কী পাপ?

সুভদ্র। সে আমি বলতে পারব না। ভয়ানক পাপ। আমার কী হবে?

পঞ্চক। তোর সব পাপ আমি কেড়ে নেব, তুই বল।

সুভদ্র। আমি আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের—

পঞ্চক। উত্তর দিকের?

সুভদ্র। হাঁ, উত্তর দিকের জানলা খুলে—

পঞ্চক। জানলা খুলে কী করলি?

সুভদ্র। বাইরেটা দেখে ফেলেছি।

পঞ্চক। দেখে ফেলেছিস? শুনে লোভ হচ্ছে যে।

সুভদ্র। হাঁ পঞ্চকদাদা। কিন্তু বেশিক্ষণ না— একবার দেখেই তখনই বন্ধ করে ফেলেছি। কোন্ প্রায়শ্চিত্ত করলে আমার পাপ যাবে?

পঞ্চক। ভুলে গেছি ভাই। প্রায়শ্চিত্ত বিশ-পঁচিশ হাজার রকম আছে; আমি যদি এই আয়তনে না আসতুম তা হলে তার বারো-আনাই কেবল পুঁথিতে লেখা থাকত— আমি আসার পর প্রায় তার সব-কটাই ব্যবহারে লাগাতে পেরেছি, কিন্তু মনে রাখতে পারি নি।

বালকদলের প্রবেশ

প্রথম। অ্যাঁ, সুভদ্র! তুমি বুঝি এখানে!

দ্বিতীয়। জান পঞ্চকদাদা, সুভদ্র কী ভয়ানক পাপ করেছে?

পঞ্চক। চুপ চুপ! ভয় নেই, সুভদ্র, কাঁদছিস কেন ভাই? প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তো করবি। প্রায়শ্চিত্ত করতে ভারি মজা। এখানে রোজই একঘেয়ে রকমের দিন কাটে, প্রায়শ্চিত্ত না থাকলে তো মানুষ টিকতেই পারত না।

প্রথম। (চুপিচুপি) জান পঞ্চকদাদা, সুভদ্র উত্তর দিকের জানলা—

পঞ্চক। আচ্ছা, আচ্ছা, সুভদ্রের মতো তোদের অত সাহস আছে?

দ্বিতীয়। আমাদের আয়তনের উত্তর দিকটা যে একজটা দেবীর!

তৃতীয়। সেদিক থেকে আমাদের আয়তনে যদি একটুও হাওয়া ঢোকে তা হলে যে সে—

পঞ্চক। তা হলে কী?

তৃতীয়। সে যে ভয়ানক।

পঞ্চক। কী ভয়ানক শুনিই-না।

তৃতীয়। জানি নে, কিন্তু সে ভয়ানক।

সুভদ্র। পঞ্চকদাদা, আমি আর কখনো খুলব না পঞ্চকদাদা। আমার কী হবে?

পঞ্চক। শোন্ বলি সুভদ্র, কিসে কী হয় আমি ভাই কিছুই জানি নে— কিন্তু যাই হোক-না, আমি তাতে একটুও ভয় করি নে।

সুভদ্র। ভয় কর না?

সকল ছেলে। ভয় কর না?

পঞ্চক। না। আমি তো বলি, দেখিই-না কী হয়।

সকলে। (কাছে ঘেঁষিয়া) আচ্ছা দাদা, তুমি বুঝি অনেক দেখেছ?

পঞ্চক। দেখেছি বৈকি। ও মাসে শনিবারে যেদিন মহাময়ূরী দেবীর পূজা পড়ল, সেদিন আমি কাঁসার থালায় ইঁদুরের গর্তের মাটি রেখে, তার উপর পাঁচটা শেয়ালকাঁটার পাতা আর তিনটে মাষকলাই সাজিয়ে নিজে আঠারো বার ফুঁ দিয়েছি।

সকলে। অ্যাঁ! কী ভয়ানক! আঠারো বার!

সুভদ্র। পঞ্চকদাদা, তোমার কী হল?

পঞ্চক। তিনদিনের দিন যে সাপটা এসে আমাকে নিশ্চয় কামড়াবে কথা ছিল, সে আজ পর্যন্ত আমাকে খুঁজে বের করতে পারে নি।

প্রথম। কিন্তু ভয়ানক পাপ করেছ তুমি।

দ্বিতীয়। মহাময়ূরী দেবী ভয়ানক রাগ করেছেন।

পঞ্চক। তার রাগটা কী রকম সেইটে দেখবার জন্যেই তো এ কাজ করেছি!

সুভদ্র। কিন্তু পঞ্চকদাদা, যদি তোমাকে সাপে কামড়াত!

পঞ্চক। তা হলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও কোনো সন্দেহ থাকত না— ভাই সুভদ্র, জানলা খুলে তুই কী দেখলি বল দেখি।

দ্বিতীয়। না না, বলিস নে।

তৃতীয়। না, সে আমরা শুনতে পারব না— কী ভয়ানক!

প্রথম। আচ্ছা, একটু— খুব একটুখানি বল ভাই।

সুভদ্র। আমি দেখলুম সেখানে পাহাড়, গোরু চরছে—

বালকগণ। (কানে আঙুল দিয়া) ও বাবা, না না, আর শুনব না। আর বোলো না সুভদ্র। ঐ-যে উপাধ্যায়মশায় আসছেন। চল চল— আর না।

পঞ্চক। কেন? এখন তোমাদের কী?

প্রথম। বেশ, তাও জান না বুঝি? আজ যে পূর্বফল্গুনী নক্ষত্র—

পঞ্চক। তাতে কী?

দ্বিতীয়। আজ কাকিনী সরোবরের নৈর্ঋত কোণে ঢোঁড়া সাপের খোলস খুঁজতে হবে না?

পঞ্চক। কেন রে?

প্রথম। তুমি কিছু জান না পঞ্চকদাদা। সেই খোলস কালো রঙের ঘোড়ার লেজের সাতগাছি চুল দিয়ে বেঁধে পুড়িয়ে ধোঁয়া করতে হবে যে।

দ্বিতীয়। আজ যে পিতৃপুরুষেরা সেই ধোঁয়া ঘ্রাণ করতে আসবেন।

পঞ্চক। তাতে তাঁদের কষ্ট হবে না?

প্রথম। পুণ্য হবে যে, ভয়ানক পুণ্য।

[সুভদ্র ব্যতীত বালকগণের প্রস্থান

উপাধ্যায়ের প্রবেশ

সুভদ্র। উপাধ্যায়মশায়!

পঞ্চক। আরে পালা পালা। উপাধ্যায়মশায়ের কাছ থেকে একটু পরমার্থতত্ত্ব শুনতে হবে, এখন বিরক্তি করিস নে, একেবারে দৌড়ে পালা।

উপাধ্যায়। কী সুভদ্র, তোমার বক্তব্য কী শীঘ্র বলে যাও।
সুভদ্র। আমি ভয়ানক পাপ করেছি।
পঞ্চক। ভারি পণ্ডিত কিনা। পাপ করেছি! পালা বলছি।
উপাধ্যায়। (উৎসাহিত হইয়া) পাপ করেছ? ওকে তাড়া দিচ্ছ কেন? সুভদ্র, শুনে যাও।
পঞ্চক। আর রক্ষা নেই, পাপের এতটুকু গন্ধ পেলে একেবারে মাছির মতো ছোটে।
উপাধ্যায়। কী বলছিলে?
সুভদ্র। আমি পাপ করেছি।
উপাধ্যায়। পাপ করেছ? আচ্ছা বেশ। তা হলে বোসো। শোনা যাক।
সুভদ্র। আমি আয়তনের উত্তর দিকের—
উপাধ্যায়। বলো, বলো, উত্তর দিকের দেয়ালে আঁক কেটেছ?
সুভদ্র। না, আমি উত্তর দিকের জানলায়—
উপাধ্যায়। বুঝেছি, কুনুই ঠেকিয়েছ। তা হলে তো সেদিকে আমাদের যতগুলি যজ্ঞের পাত্র আছে সমস্তই ফেলা যাবে। সাত মাসের বাছুরকে দিয়ে ঐ জানলা না চাটাতে পারলে শোধন হবে না।
পঞ্চক। এটা আপনি ভুল বলছেন। ক্রিয়াসংগ্রহে আছে, ভূমিকুষ্মাণ্ডের বোঁটা দিয়ে একবার—
উপাধ্যায়। তোমার তো স্পর্ধা কম দেখি নে। কুলদত্তের ক্রিয়াসংগ্রহের অষ্টাদশ অধ্যায়টি কি কোনোদিন খুলে দেখা হয়েছে?
পঞ্চক। (জনান্তিকে) সুভদ্র, যাও তুমি।— কিন্তু কুলদত্তকে তো আমি—
উপাধ্যায়। কুলদত্তকে মান না? আচ্ছা, ভরদ্বাজ মিশ্রের প্রয়োগপ্রজ্ঞপ্তি তো মানতেই হবে—তাতে—
সুভদ্র। উপাধ্যায়মশায়, আমি ভয়ানক পাপ করেছি।
পঞ্চক। আবার! সেই কথাই তো হচ্ছে। তুই চুপ কর।
উপাধ্যায়। সুভদ্র, উত্তরের দেয়ালে যে আঁক কেটেছ সে চতুষ্কোণ, না গোলাকার?
সুভদ্র। আঁক কাটি নি। আমি জানলা খুলে বাইরে চেয়েছিলুম।
উপাধ্যায়। (বসিয়া পড়িয়া) আঃ সর্বনাশ! করেছিস কী? আজ তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছর ঐ জানলা কেউ খোলে নি তা জানিস?
সুভদ্র। আমার কী হবে?
পঞ্চক। (সুভদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া) তোমার জয়জয়কার হবে সুভদ্র। তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছরের আগল তুমি ঘুচিয়েছ। তোমার এই অসামান্য সাহস দেখে উপাধ্যায়মশায়ের মুখে আর কথা নেই। গুরু আসার পথ তুমিই প্রথম খোলসা করে দিলে।

[সুভদ্রকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

উপাধ্যায়। জানি নে কী সর্বনাশ হবে। উত্তরের অধিষ্ঠাত্রী যে একজটা দেবী! বালকের দুই চক্ষু মুহূর্তেই পাথর হয়ে গেল না কেন তাই ভাবছি। যাই আচার্যদেবকে জানাই গে।

[প্রস্থান

আচার্য ও উপাচার্যের প্রবেশ

আচার্য। এতকাল পরে আমাদের গুরু আসছেন।
উপাচার্য। তিনি প্রসন্ন হয়েছেন।
আচার্য। প্রসন্ন হয়েছেন? তা হবে। হয়তো প্রসন্নই হয়েছেন। কিন্তু কেমন করে জানব?
উপাচার্য। নইলে তিনি আসবেন কেন?
আচার্য। এক-এক সময়ে মনে ভয় হয় যে, হয়তো অপরাধের মাত্রা পূর্ণ হয়েছে বলেই তিনি আসছেন।

উপাচার্য। না, আচার্যদেব, এমন কথা বলবেন না। আমরা কঠোর নিয়ম সমস্তই নিঃশেষে পালন করেছি— কোনো ত্রুটি ঘটে নি।

আচার্য। কঠোর নিয়ম ? হাঁ, সমস্তই পালিত হয়েছে।

উপাচার্য। বজ্রশুদ্ধিব্রত আমাদের আয়তনে এইবার নিয়ে ঠিক সাতাত্তর বার পূর্ণ হয়েছে। আর কোনো আয়তনে এ কি সম্ভবপর হয় !

আচার্য। না, আর কোথাও হতে পারে না।

উপাচার্য। কিন্তু তবু আপনার মনে এমন দ্বিধা হচ্ছে কেন ?

আচার্য। সূতসোম, তোমার মনে কি তুমি শান্তি পেয়েছ ?

উপাচার্য। আমার তো একমুহূর্তের জন্যে অশান্তি নেই।

আচার্য। অশান্তি নেই ?

উপাচার্য। কিছুমাত্র না। আমার অহোরাত্র একেবারে নিয়মে বাঁধা। এর চেয়ে আর শান্তি কী হতে পারে ?

আচার্য। ঠিক, ঠিক— ঠিক বলেছ সূতসোম। অচেনার মধ্যে গিয়ে কোথায় তার অন্ত পাব ? এখানে সমস্তই জানা, সমস্তই অভ্যস্ত— এখানকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখানকারই সমস্ত শাস্ত্রের ভিতর থেকে পাওয়া যায়— তার জন্যে একটুও বাইরে যাবার দরকার হয় না। এই তো নিশ্চল শান্তি !

উপাচার্য। আচার্যদেব, আপনাকে এমন বিচলিত হতে কখনো দেখি নি।

আচার্য। কী জানি, আমার কেমন মনে হচ্ছে, কেবল একলা আমিই না, চারি দিকে সমস্তই বিচলিত হয়ে উঠছে। আমার মনে হচ্ছে, আমাদের এখানকার দেয়ালের প্রত্যেক পাথরটা পর্যন্ত বিচলিত। তুমি এটা অনুভব করতে পারছ না সূতসোম ?

উপাচার্য। কিছুমাত্র না। এখানকার অটল স্তব্ধতার লেশমাত্র বিচ্যুতি দেখতে পাচ্ছি নে। আমাদের তো বিচলিত হবার কথাও না। আমাদের সমস্ত শিক্ষা কোন্ কালে সমাধা হয়ে গেছে। আমাদের সমস্ত লাভ সমাপ্ত, সমস্ত সঞ্চয় পর্যাপ্ত। ঐ-যে পঞ্চক আসছে। পাথরের মধ্যে কি ঘাস বেরোয় ? এমন ছেলে আমাদের আয়তনে কী করে সম্ভব হল ! ঐ আমাদের দুর্লক্ষণ। এই আয়তনের মধ্যে ও কেবল আপনাকেই মানে। আপনি ওকে একটু ভর্ৎসনা করে দেবেন।

আচার্য। আচ্ছা তুমি যাও। আমি ওর সঙ্গে একটু নিভৃতে কথা কয়ে দেখি।

[উপাচার্যের প্রস্থান

পঞ্চকের প্রবেশ

আচার্য। (পঞ্চকের গায়ে হাত দিয়া) বৎস পঞ্চক !

পঞ্চক। করলেন কী ! আমাকে ছুঁলেন ?

আচার্য। কেন, বাধা কী আছে ?

পঞ্চক। আমি যে আচার রক্ষা করতে পারি নি।

আচার্য। কেন পার নি বৎস ?

পঞ্চক। প্রভু, কেন, তা আমি বলতে পারি নে। আমার পারবার উপায় নেই।

আচার্য। সৌম্য, তুমি তো জান, এখানকার যে নিয়ম সেই নিয়মকে আশ্রয় করে হাজার বছর হাজার হাজার লোক নিশ্চিন্ত আছে। আমরা যে খুশি তাকে কি ভাঙতে পারি ?

পঞ্চক। আচার্যদেব, যে-নিয়ম সত্য তাকে ভাঙতে না দিলে তার যে পরীক্ষা হয় না। তাই কি ঠিক নয় ?

আচার্য। যাও বৎস, তোমার পথে তুমি যাও। আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোরো না।

পঞ্চক। আচার্যদেব, আপনি জানেন না কিন্তু আপনিই আমাকে নিয়মের চাকার নীচে থেকে টেনে নিয়েছেন।

আচার্য। কেমন করে বৎস ?

পঞ্চক। তা জানি নে, কিন্তু আপনি আমাকে এমন একটা-কিছু দিয়েছেন যা আচারের চেয়ে, নিয়মের চেয়ে অনেক বেশি।

আচার্য। তুমি কী কর না-কর আমি কোনোদিন জিজ্ঞাসা করি নে, কিন্তু আজ একটি কথা জিজ্ঞাসা করব। তুমি কি অচলায়তনের বাইরে গিয়ে যূনক জাতির সঙ্গে মেশ ?

পঞ্চক। আপনি কি এর উত্তর শুনতে চান ?

আচার্য। না না থাক্, বোলো না। কিন্তু যূনকেরা যে অত্যন্ত ম্লেচ্ছ। তাদের সহবাস কি—

পঞ্চক। তাদের সম্বন্ধে আপনার কি কোনো বিশেষ আদেশ আছে ?

আচার্য। না না, আদেশ আমার কিছুই নেই। যদি ভুল করতে হয় তবে ভুল করো গে— তুমি ভুল করো গে— আমাদের কথা শুনো না।

পঞ্চক। ঐ উপাচার্য আসছেন— বোধ করি কাজের কথা আছে— বিদায় হই।

[প্রস্থান

উপাধ্যায় ও উপাচার্যের প্রবেশ

উপাচার্য। (উপাধ্যায়ের প্রতি) আচার্যদেবকে তো বলতেই হবে। উনি নিতান্ত উদ্‌বিগ্ন হবেন— কিন্তু দায়িত্ব যে ওঁরই।

আচার্য। উপাধ্যায়, কোনো সংবাদ আছে নাকি ?

উপাধ্যায়। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ।

আচার্য। অতএব সেটা সত্বর বলা উচিত।

উপাধ্যায়। আচার্যদেব, সুভদ্র আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের জানলা খুলে বাইরে দৃষ্টিপাত করেছে।

আচার্য। উত্তর দিকটা তো একজটা দেবীর।

উপাধ্যায়। সেই তো ভাবনা। আমাদের আয়তনের মন্ত্রপূত রুদ্ধ বাতাসকে সেখানকার হাওয়া কতটা দূর পর্যন্ত আক্রমণ করেছে বলা তো যায় না।

উপাচার্য। এখন কথা হচ্ছে, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কী।

আচার্য। আমার তো স্মরণ হয় না। উপাধ্যায় বোধ করি—

উপাধ্যায়। না, আমিও তো মনে আনতে পারি নে। আজ তিনশো বছর এ প্রায়শ্চিত্তটার প্রয়োজন হয় নি— সবাই ভুলেই গেছে। ঐ-যে মহাপঞ্চক আসছে— যদি কারও জানা থাকে তো সে ওর।

মহাপঞ্চকের প্রবেশ

উপাধ্যায়। মহাপঞ্চক, সব শুনেছ বোধ করি।

মহাপঞ্চক। সেইজন্যেই তো এলুম ; আমরা এখন সকলেই অশুচি, বাহিরের হাওয়া আমাদের আয়তনে প্রবেশ করেছে।

উপাচার্য। এর প্রায়শ্চিত্ত কী, আমাদের কারও স্মরণ নেই। তুমিই হয়তো বলতে পার।

মহাপঞ্চক। ক্রিয়াকল্পতরুতে এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না— একমাত্র ভগবান জ্বলনানন্তকৃত আধিকর্মিক বর্ষায়ণে লিখছে, অপরাধীকে ছয়মাস মহাতামস সাধন করতে হবে।

উপাচার্য। মহাতামস ?

মহাপঞ্চক। হাঁ, ওকে অন্ধকারে রেখে দিতে হবে, আলোকের এক রশ্মিমাত্রও দেখতে পাবে না। কেননা, আলোকের দ্বারা যে-অপরাধ অন্ধকারের দ্বারাই তার ক্ষালন।

উপাচার্য। তা হলে, মহাপঞ্চক, সমস্ত ভার তোমার উপর রইল।

উপাধ্যায়। চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাই। ততক্ষণ সুভদ্রকে হিঙ্গুমর্দনকুণ্ডে স্নান করিয়ে আনি গে।

[সকলের গমনোদ্যম

আচার্য। শোনো, প্রয়োজন নেই।

উপাধ্যায়। কিসের প্রয়োজন নেই?

আচার্য। প্রায়শ্চিত্তের।

মহাপঞ্চক। প্রয়োজন নেই বলছেন! আধিকর্মিক বর্ষায়ণ খুলে আমি এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি—

আচার্য। দরকার নেই— সুভদ্রকে কোনো প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না, আমি আশীর্বাদ করে তার—

মহাপঞ্চক। এও কি কখনো সম্ভব হয়? যা কোনো শাস্ত্রে নেই আপনি কি তাই—

আচার্য। না, হতে দেব না, যদি কোনো অপরাধ ঘটে সে আমার। তোমাদের ভয় নেই।

উপাধ্যায়। এরকম দুর্বলতা তো আপনার কোনোদিন দেখি নি! এই তো সেবার অষ্টাঙ্গশুদ্ধি উপবাসে তৃতীয় রাত্রে বালক কুশলশীল জল জল করে পিপাসায় প্রাণত্যাগ করলে কিন্তু তবু তার মুখে যখন এক বিন্দু জল দেওয়া গেল না, তখন তো আপনি নীরব হয়ে ছিলেন। তুচ্ছ মানুষের প্রাণ আজ আছে কাল নেই, কিন্তু সনাতন ধর্মবিধি তো চিরকালের।

সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের প্রবেশ

পঞ্চক। ভয় নেই সুভদ্র, তোর কোনো ভয় নেই— এই শিশুটিকে অভয় দাও প্রভু।

আচার্য। বৎস, তুমি কোনো পাপ কর নি। যারা বিনা অপরাধে তোমাকে হাজার হাজার বৎসর ধরে মুখ বিকৃত করে ভয় দেখাচ্ছে, পাপ তাদেরই। এসো পঞ্চক।

[সুভদ্রকে কোলে লইয়া পঞ্চকের সঙ্গে প্রস্থান

উপাধ্যায়। এ কী হল উপাচার্যমশায়?

[উপাচার্যের প্রস্থান

মহাপঞ্চক। আমরা অশুচি হয়ে রইলুম, আমাদের যাগযজ্ঞ ব্রত-উপবাসে সকলই পণ্ড হতে থাকল, এ তো সহ্য করা শক্ত।

উপাধ্যায়। এ সহ্য করা চলবেই না। আচার্য কি শেষে আমাদের ম্লেচ্ছের সঙ্গে সমান করে দিতে চান?

মহাপঞ্চক। উনি আজ সুভদ্রকে বাঁচাতে গিয়ে সনাতন ধর্মকে বিনাশ করবেন! এ কী রকম বুদ্ধিবিকার ওঁর ঘটল! এ অবস্থায় ওঁকে আচার্য বলে গণ্য করাই চলবে না।

সঞ্জীব, বিশ্বম্ভর, জয়োত্তমের প্রবেশ

সঞ্জীব। এতদিন এখানে সব ঠিক চলছিল। যেই গুরু আসবেন রব উঠল অমনি কেন এই-সব অনাচার ঘটতে লাগল?

বিশ্বম্ভর। আচার্য অদীনপুণ্য যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করেন, তবে তিনি যেমন আছেন থাকুন কিন্তু আমরা তাঁর কোনো অনুশাসন মানব না।

জয়োত্তম। তিনি বলেন, তাঁর গুরু তাঁকে যে আসনে বসিয়েছেন তাঁর গুরুই তাঁকে সেই আসন থেকে নামিয়ে দেবেন, সেইজন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন।

অধ্যেতার প্রবেশ

উপাধ্যায়। কী গো অধ্যেতা, ব্যাপার কী?

অধ্যেতা। সুভদ্রকে মহাতামসে বসায় কার সাধ্য?

মহাপঞ্চক। কেন কী বিঘ্ন ঘটেছে?

অধ্যেতা। মূর্তিমান বিঘ্ন রয়েছে তোমার ভাই।

মহাপঞ্চক। পঞ্চক?

অধ্যেতা। হাঁ। আমি ডাকতেই সুভদ্র ছুটে এল, কিন্তু পঞ্চক তাকে কেড়ে নিয়ে গেল।

মহাপঞ্চক। না, এই নরাধমকে নিয়ে আর চলল না। অনেক সহ্য করেছি। এবার ওকে নির্বাসন দেওয়াই স্থির। কিন্তু অধ্যেতা, তুমি এটা সহ্য করলে ?

অধ্যেতা। আমি কি তোমার পঞ্চককে ভয় করি ? স্বয়ং আচার্য অদীনপুণ্য এসে তাকে আদেশ করলেন, তাই তো সে সাহস পেলে।

সঞ্জীব। স্বয়ং আমাদের আচার্য !

বিশ্বম্ভর। ক্রমে এ-সব হচ্ছে কী ! এতদিন এই আয়তনে আছি, কখনো তো এমন অনাচারের কথা শুনি নি। আর স্বয়ং আমাদের আচার্যের এই কীর্তি !

জয়োত্তম। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেই দেখা যাক-না।

বিশ্বম্ভর। না না, আচার্যকে আমরা—

মহাপঞ্চক। কী করবে আচার্যকে, বলেই ফেলো।

বিশ্বম্ভর। তাই তো ভাবছি কী করা যায়। তাঁকে নাহয়— আপনি বলে দিন-না কী করতে হবে।

মহাপঞ্চক। আমি বলছি তাঁকে সংযত করে রাখতে হবে।

সঞ্জীব। কেমন করে ?

মহাপঞ্চক। কেমন করে আবার কী ? মত্ত হস্তীকে যেমন করে সংযত করতে হয় তেমনি করে।

জয়োত্তম। আমাদের আচার্যদেবকে কি তা হলে—

মহাপঞ্চক। হাঁ, তাঁকে বন্ধ করে রাখতে হবে। চুপ করে রইলে যে ! পারবে না ?

আচার্যের প্রবেশ

আচার্য। বৎস, এতদিন তোমরা আমাকে আচার্য বলে মেনেছ, আজ তোমাদের সামনে আমার বিচারের দিন এসেছে। আমি স্বীকার করছি অপরাধের অন্ত নেই, অন্ত নেই, তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে।

সঞ্জীব। তবে আর দেরি করেন কেন ? এ দিকে যে আমাদের সর্বনাশ হয়।

আচার্য। গুরু চলে গেলেন, আমরা তাঁর জায়গায় পুঁথি নিয়ে বসলুম ; সেই জীর্ণ পুঁথির ভাণ্ডারে প্রতিদিন তোমরা দলে দলে আমার কাছে তোমাদের তরুণ হৃদয়টি মেলে ধরে কী চাইতে এসেছিলে ? অমৃতবাণী ? কিন্তু আমার তালু যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। রসনায় যে রসের লেশমাত্র নেই। এবার নিয়ে এসো সেই বাণী, গুরু, নিয়ে এসো হৃদয়ের বাণী। প্রাণকে প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যাও।

পঞ্চক। (ছুটিয়া প্রবেশ করিয়া) তোমার নববর্ষার সজল হাওয়ায় উড়ে যাক সব শুকনো পাতা— আয় রে নবীন কিশলয়— তোরা ছুটে আয়, তোরা ফুটে বেরো। ভাই জয়োত্তম, শুনছ না, আকাশের ঘননীল মেঘের মধ্যে মুক্তির ডাক উঠেছে— আজ নৃত্য করো রে নৃত্য করো।

গান

ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে,
তারে আজ থামায় কে রে।
সে যে আকাশ পানে হাত পেতেছে,
তারে আজ নামায় কে রে।

প্রথমে জয়োত্তমের, পরে বিশ্বম্ভরের, পরে সঞ্জীবের নৃত্যগীতে যোগ

মহাপঞ্চক। পঞ্চক, নির্লজ্জ বানর কোথাকার, থাম বলছি থাম !

পঞ্চক। গান

ওরে আমার মন মেতেছে,
আমারে থামায় কে রে।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, আমি তোমাকে বলি নি একাজটা দেবীর শাপ আরম্ভ হয়েছে ? দেখছ, কী

করে তিনি আমাদের সকলের বুদ্ধিকে বিচলিত করে তুলছেন— ক্রমে দেখবে অচলায়তনের একটি পাথরও আর থাকবে না।

পঞ্চক। না, থাকবে না, থাকবে না, পাথরগুলো সব পাগল হয়ে যাবে ; তারা কে কোথায় ছুটে বেরিয়ে পড়বে, তারা গান ধরবে—

ওরে ভাই, নাচ রে, ও ভাই, নাচ রে,—
আজ ছাড়া পেয়ে বাঁচ রে,—
লাজভয় ঘুচিয়ে দে রে ;
তোরে আজ থামায় কে রে !

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী। সর্বনাশ শুরু হয়েছে, বুঝতে পারছ না। ওরে সব ছন্নমতি মূর্খ, অভিশপ্ত বর্বর, আজ তোদের নাচবার দিন ?

পঞ্চক। সর্বনাশের বাজনা বাজলেই নাচ শুরু হয় দাদা।

মহাপঞ্চক। চুপ কর লক্ষ্মীছাড়া ! ছাত্রগণ, তোমরা আত্মবিস্মৃত হোয়ো না। ঘোর বিপদ আসন্ন, সে কথা স্মরণ রেখো।

বিশ্বম্ভর। আচার্যদেব, পায়ে ধরি, সুভদ্রকে আমাদের হাতে দিন, তাকে তার প্রায়শ্চিত্ত থেকে নিরস্ত করবেন না।

আচার্য। না বৎস, এমন অনুরোধ কোরো না।

সঞ্জীব। ভেবে দেখুন, সুভদ্রের কতবড়ো ভাগ্য। মহাতামস ক-জন লোকে পারে। ও-যে ধরাতলে দেবত্ব লাভ করবে !

আচার্য। গায়ের জোরে দেবতা গড়বার পাপে আমাকে লিপ্ত কোরো না। সে মানুষ, সে শিশু, সেইজন্যেই সে দেবতাদের প্রিয়।

জয়োত্তম। দেখুন, আপনি আমাদের আচার্য, আমাদের প্রণম্য, কিন্তু যে অন্যায় কাজ করছেন, তাতে আমরা বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হব।

আচার্য। করো, বলপ্রয়োগ করো, আমাকে মেনো না, আমাকে মারো, আমি অপমানেরই যোগ্য, তোমাদের হাত দিয়ে আমার যে শাস্তি আরম্ভ হল, তাতেই বুঝতে পারছি গুরুর আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু সেইজন্যেই বলছি শাস্তির কারণ আর বাড়তে দেব না। সুভদ্রকে তোমাদের হাতে দিতে পারব না।

বিশ্বম্ভর। পারবেন না ?

আচার্য। না।

মহাপঞ্চক। তা হলে আর দ্বিধা করা নয়। বিশ্বম্ভর, এখন তোমাদের উচিত ওঁকে জোর করে ধরে নিয়ে ঘরে বন্ধ করা। ভীরু, কেউ সাহস করছ না ? আমাকেই তবে এ কাজ করতে হবে ?

জয়োত্তম। খবরদার— আচার্যদেবের গায়ে হাত দিতে পারবে না।

বিশ্বম্ভর। না না, মহাপঞ্চক, ওঁকে অপমান করলে আমরা সইতে পারব না।

সঞ্জীব। আমরা সকলে মিলে পায়ে ধরে ওঁকে রাজি করাব। একা সুভদ্রের প্রতি দয়া করে উনি কি আমাদের সকলের অমঙ্গল ঘটাবেন ?

বিশ্বম্ভর। এই অচলায়তনের এমন কত শিশু উপবাসে প্রাণত্যাগ করেছে— তাতে ক্ষতি কী হয়েছে ?

সুভদ্রের প্রবেশ

সুভদ্র। আমাকে মহাতামস ব্রত করাও।

পঞ্চক। সর্বনাশ করলে ! ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে আমি এখানে এসেছিলুম কখন জেগে উঠে চলে এসেছে।

আচার্য। বৎস সুভদ্র, এসো আমার কোলে। যাকে পাপ বলে ভয় করছ সে পাপ আমার— আমিই প্রায়শ্চিত্ত করব।

বিশ্বম্ভর। না না, আয় রে আয় সুভদ্র, তুই মানুষ না, তুই দেবতা।

সঞ্জীব। তুই ধন্য।

বিশ্বম্ভর। তোর বয়সে মহাতামস করা আর কারও ভাগ্যে ঘটে নি। সার্থক তোর মা তোকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন।

উপাধ্যায়। আহা সুভদ্র, তুই আমাদের অচলায়তনেরই বালক বটে।

মহাপঞ্চক। আচার্য, এখনো কি তুমি জোর করে এই বালককে এই মহাপুণ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছ?

আচার্য। হায় হায়, এই দেখেই তো আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তোমরা যদি ওকে কাঁদিয়ে আমার হাত থেকে ছিঁড়ে কেড়ে নিয়ে যেতে তা হলেও আমার এত বেদনা হত না। কিন্তু দেখছি হাজার বছরের নিষ্ঠুর মুষ্টি অতটুকু শিশুর মনকেও চেপে ধরেছে, একেবারে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে দিয়েছে রে! কখন সময় পেল সে? সে কি গর্ভের মধ্যেও কাজ করে?

পঞ্চক। সুভদ্র, আয় ভাই, প্রায়শ্চিত্ত করতে যাই— আমিও যাব তোর সঙ্গে।

আচার্য। বৎস, আমিও যাব।

সুভদ্র। না না, আমাকে যে একলা থাকতে হবে— লোক থাকলে যে পাপ হবে।

মহাপঞ্চক। ধন্য শিশু, তুমি তোমার ঐ প্রাচীন আচার্যকে আজ শিক্ষা দিলে! এসো তুমি আমার সঙ্গে।

আচার্য। না, আমি যতক্ষণ তোমাদের আচার্য আছি ততক্ষণ আমার আদেশ ব্যতীত কোনো ব্রত আরম্ভ বা শেষ হতেই পারে না। আমি নিষেধ করছি। সুভদ্র, আচার্যের কথা অমান্য কোরো না— এসো পঞ্চক, ওকে কোলে করে নিয়ে এসো।

[সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের ও আচার্যের এবং উপাধ্যায়ের প্রস্থান

মহাপঞ্চক। ধিক! তোমাদের মতো ভীরুদের দুর্গতি হতে রক্ষা করে এমন সাধ্য কারও নেই। তোমরা নিজেও মরবে, অন্য সকলকেও মারবে।

পদাতিকের প্রবেশ

পদাতিক। স্থবিরপত্তনের রাজা আসছেন।

মহাপঞ্চক। ব্যাপারখানা কী! এ-যে আমাদের রাজা মন্থরগুপ্ত!

রাজার প্রবেশ

রাজা। নরদেবগণ, তোমাদের সকলকে নমস্কার।

সকলে। জয়োস্তু রাজন্।

মহাপঞ্চক। কুশল তো?

রাজা। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ। প্রত্যন্তদেশের দূতেরা এসে খবর দিল যে, দাদাঠাকুরের দল এসে আমাদের রাজ্যসীমার কাছে বাসা বেঁধেছে।

মহাপঞ্চক। দাদাঠাকুরের দল কারা?

রাজা। ঐ-যে যূনকরা।

মহাপঞ্চক। যূনকরা যদি একবার আমাদের প্রাচীর ভাঙে তা হলে যে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দেবে!

রাজা। সেইজন্যেই তো ছুটে এলুম। চণ্ডক বলে একজন যূনক আমাদের স্থবিরক সম্প্রদায়ের মন্ত্র পাবার জন্যে গোপনে তপস্যা করছিল। আমি সংবাদ পেয়েই তার শিরশ্ছেদ করেছি।

মহাপঞ্চক। ভালোই করেছেন। কিন্তু এ দিকে আমাদের অচলায়তনের মধ্যেই যে পাপ প্রবেশ করেছে তার কী করলেন? আমাদের পরাভবের আর দেরি কী?

রাজা। সে কী কথা!

সঞ্জীব। আয়তনে একজটা দেবীর শাপ লেগেছে।

রাজা। একজটা দেবীর শাপ! সর্বনাশ! কেন তাঁর শাপ?

মহাপঞ্চক। যে উত্তর দিকে তাঁর অধিষ্ঠান এখানে একদিন সেই দিককার জানালা খোলা হয়েছে।

রাজা। (বসিয়া পড়িয়া) তবে তো আর আশা নেই।

মহাপঞ্চক। আচার্য অদীনপুণ্য এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিচ্ছেন না।

বিশ্বম্ভর। তিনি জোর করে আমাদের ঠেকিয়ে রেখেছেন।

রাজা। দাও, দাও, অদীনপুণ্যকে এখনই নির্বাসিত করে দাও!

মহাপঞ্চক। আগামী অমাবস্যায়—

রাজা। না না, এখন তিথিনক্ষত্র দেখবার সময় নেই। বিপদ আসন্ন। সংকটের সময় আমি আমার রাজ-অধিকার খাটাতে পারি— শাস্ত্রে তার বিধান আছে।

মহাপঞ্চক। হাঁ আছে। কিন্তু আচার্য কে হবে?

রাজা। তুমি, তুমি। এখনই আমি তোমাকে আচার্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করে দিলুম। দিক্‌পালগণ সাক্ষী, এই ব্রহ্মচারীগণ সাক্ষী।

মহাপঞ্চক। অদীনপুণ্যকে কোথায় নির্বাসিত করতে চান?

রাজা। আয়তনের বাইরে নয়। কী জানি যদি যূনকদের সঙ্গে যোগ দেন। আয়তনের প্রান্তে যে দর্ভকপাড়া আছে সেইখানে তাঁকে বন্ধ করে রেখো।

জয়োত্তম। আচার্য অদীনপুণ্যকে দর্ভকদের পাড়ায়! তারা যে অন্ত্যজজাতি— অশুচি পতিত!

মহাপঞ্চক। যিনি স্পর্ধাপূর্বক আচার লঙ্ঘন করেন, অনাচারীদের মধ্যে নির্বাসনই তাঁর উচিত দণ্ড। মনে কোরো না আমার ভাই বলে পঞ্চককে ক্ষমা করব। তারও সেই দর্ভকপাড়ায় গতি।

দূতের প্রবেশ

দূত। শুনলুম গুরু খুব কাছে এসেছেন।

রাজা। কে বললে?

দূত। চারি দিকেই কথা উঠেছে।

রাজা। তা হলে তো তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন করতে হবে। মহাপঞ্চক, অচলায়তনের সমস্ত জানলা বন্ধ করে শুদ্ধিমন্ত্র পাঠ করাতে থাকো।

মহাপঞ্চক। জানলা বন্ধ সম্বন্ধে ভাববেন না। মন্ত্রের ভার আমি নিচ্ছি।

[রাজার প্রস্থান

পঞ্চক কোথায়?

জয়োত্তম। শুনলুম সে প্রাচীর ডিঙিয়ে যূনকদের কাছে গেছে।

মহাপঞ্চক। পাষণ্ড! আর যেন সে আয়তনে ফিরে না আসে। গুরু আসবার আগেই এখানকার সমস্ত উপদ্রব দূর করা চাই। ওহে ব্রহ্মচারীগণ, মন্ত্র পড়বার জন্যে স্নান করে প্রস্তুত হয়ে এসো।

২

পাহাড় মাঠ

পঞ্চকের গান

এ পথ গেছে কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে—
তা কে জানে তা কে জানে।
কোন্ পাহাড়ের পারে, কোন্ সাগরের ধারে,
কোন্ দুরাশার দিকপানে—
তা কে জানে তা কে জানে।

এ পথ দিয়ে কে আসে যায় কোন্‌খানে
তা কে জানে তা কে জানে।
কেমন যে তার বাণী, কেমন হাসিখানি,
যায় সে কাহার সন্ধানে
তা কে জানে তা কে জানে।

পশ্চাতে আসিয়া যূনকদলের নৃত্য

পঞ্চক। ও কী রে! তোরা কখন পিছনে এসে নাচতে লেগেছিলি?

প্রথম যূনক। আমরা নাচবার সুযোগ পেলেই নাচি, পা দুটোকে স্থির রাখতে পারি নে।

দ্বিতীয় যূনক। আয় ভাই, ওকে সুদ্ধ কাঁধে করে নিয়ে একবার নাচি।

পঞ্চক। আরে না না, আমাকে ছুঁস নে রে, ছুঁস নে।

তৃতীয় যূনক। ঐ রে! ওকে অচলায়তনের ভূতে পেয়েছে। যূনককে ও ছোঁবে না।

পঞ্চক। জানিস, আমাদের গুরু আসবেন?

প্রথম যূনক। সত্যি নাকি? তিনি মানুষটি কী রকম? তাঁর মধ্যে নতুন কিছু আছে?

পঞ্চক। নতুনও আছে, পুরোনোও আছে।

দ্বিতীয় যূনক। আচ্ছা, এলে খবর দিয়ো— একবার দেখব তাঁকে।

পঞ্চক। তোরা দেখবি কী রে! সর্বনাশ! তিনি তো যূনকদের গুরু নন। তাঁর কথা তোদের কানে পাছে এক অক্ষরও যায় সেজন্যে তোদের দিকের প্রাচীরের বাইরে সাত সার রাজার সৈন্য পাহারা দেবে। তোদেরও তো গুরু আছে— তাকে নিয়েই—

তৃতীয় যূনক। গুরু! আমাদের আবার গুরু কোথায়? আমরা তো হলুম দাদাঠাকুরের দল। এ পর্যন্ত আমরা তো কোনো গুরুকে মানি নি।

প্রথম যূনক। সেইজন্যেই তো ও জিনিসটা কী রকম দেখতে ইচ্ছা করে।

দ্বিতীয় যূনক। আমাদের মধ্যে একজন, তার নাম চণ্ডক— তার কী জানি ভারি লোভ হয়েছে; সে ভেবেছে তোমাদের কোনো গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে আশ্চর্য কী-একটা ফল পাবে— তাই সে লুকিয়ে চলে গেছে।

তৃতীয় যূনক। কিন্তু যূনক বলে কেউ তাকে মন্ত্র দিতে চায় না। সেও ছাড়বার ছেলে নয়, সে লেগেই রয়েছে। তোমরা মন্ত্র দাও না বলেই মন্ত্র আদায় করবার জন্যে তার এত জেদ।

প্রথম যূনক। কিন্তু পঞ্চকদাদা, আমাদের ছুঁলে কি তোমার গুরু রাগ করবেন?

পঞ্চক। বলতে পারি নে— কী জানি যদি অপরাধ নেন। ওরে, তোরা যে সবাই সব রকম কাজই করিস— সেইটে যে বড়ো দোষ। তোরা চাষ করিস তো?

প্রথম যূনক। চাষ করি বৈকি, খুব করি। পৃথিবীতে জন্মেছি, পৃথিবীকে সেটা খুব কষে বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ি।

গান

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে।
সবুজ প্রাণের গানের লেখা, রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা,
মাতে রে কোন্‌ তরুণ কবি নৃত্যদোদুল ছন্দে।
ধানের শিষে পুলক ছোটে, সকল ধরা হেসে ওঠে,
অঘ্রানেরি সোনার রোদে পূর্ণিমারি চন্দ্রে ॥

পঞ্চক। আচ্ছা, নাহয় তোরা চাষই করিস, সেও কোনোমতে সহ্য হয়— কিন্তু কে বলছিল তোরা কাঁকুড়ের চাষ করিস ?

প্রথম যূনক। করি বৈকি।

পঞ্চক। কাঁকুড়! ছি ছি! খেঁসারিডালেরও চাষ করিস বুঝি ?

তৃতীয় যূনক। কেন করব না ? এখান থেকেই তো কাঁকুড় খেঁসারিডাল তোমাদের বাজারে যায়।

পঞ্চক। তা তো যায়, কিন্তু জানিস নে কাঁকুড় আর খেঁসারিডাল যারা চাষ করে তাদের আমরা ঘরে ঢুকতে দিই নে।

প্রথম যূনক। কেন ?

পঞ্চক। কেন কী রে! ওটা যে নিষেধ।

প্রথম যূনক। কেন নিষেধ ?

পঞ্চক। শোনো একবার! নিষেধ, তার আবার কেন! সাধে তোদের মুখদর্শন পাপ। এই সহজ কথাটা বুঝিস নে যে, কাঁকুড় আর খেঁসারিডালের চাষটা ভয়ানক খারাপ।

দ্বিতীয় যূনক। কেন ? ওটা কি তোমরা খাও না।

পঞ্চক। খাই বৈকি, খুব আদর করে খাই— কিন্তু ওটা যারা চাষ করে তাদের ছায়া মাড়াই নে।

দ্বিতীয় যূনক। কেন ?

পঞ্চক। ফের কেন ? তোরা যে এতবড়ো নিরেট মূর্খ তা জানতুম না। আমাদের পিতামহ বিষ্কম্ভী কাঁকুড়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে খবর রাখিস নে বুঝি ?

দ্বিতীয় যূনক। কাঁকুড়ের মধ্যে কেন ?

পঞ্চক। আবার কেন ? তোরা যে ঐ এক কেনর জ্বালায় আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললি।

তৃতীয় যূনক। আর খেঁসারির ডাল ?

পঞ্চক। একবার কোন্‌ যুগে একটা খেঁসারিডালের গুঁড়ো উপবাসের দিন কোন্‌-এক মস্ত বুড়োর ঠিক গোঁফের উপর উড়ে পড়েছিল ; তাতে তাঁর উপবাসের পুণ্যফল থেকে ষষ্টিসহস্র ভাগের এক ভাগ কম পড়ে গিয়েছিল ; তাই তখনই সেইখানে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি জগতের সমস্ত খেঁসারিডালের খেতের উপর অভিশাপ দিয়ে গেছেন। এতবড়ো তেজ! তোরা হলে কি করতিস বল দেখি!

প্রথম যূনক। আমাদের কথা বল কেন ? উপবাসের দিনে খেঁসারিডাল যদি গোঁফের উপর পর্যন্ত এগিয়ে আসে তা হলে তাকে আরো একটু এগিয়ে নিই।

পঞ্চক। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে বলিস— তোরা কি লোহার কাজ করে থাকিস ?

প্রথম যূনক। লোহার কাজ করি বৈকি, খুব করি।

পঞ্চক। রাম রাম! আমরা সনাতন কাল থেকে কেবল তামা-পিতলের কাজ করে আসছি। লোহা গলাতে পারি কিন্তু সব দিন নয়। ষষ্ঠীর দিনে যদি মঙ্গলবার পড়ে তবেই স্নান করে আমরা হাপর ছুঁতে পারি কিন্তু তাই বলে লোহা পিটোনো সে তো হতেই পারে না।

প্রথম যূনক। কেন, লোহা কী অপরাধটা করেছে ?

পঞ্চক। আরে ওটা যে লোহা সে তো তোকে মানতেই হবে।

প্রথম যূনক। তা তো হবে।

পঞ্চক। তবে আর কী— এই বুঝে নে না।

দ্বিতীয় যূনক। তবু একটা তো কারণ আছে।

পঞ্চক। কারণ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু কেবল সেটা পুঁথির মধ্যে। আচ্ছা, তোদের মন্ত্র কেউ পড়ায় নি ?

দ্বিতীয় যূনক। মন্ত্র! কিসের মন্ত্র ?

পঞ্চক। এই মনে কর, যেমন বজ্রবিদারণ মন্ত্র— তট তট তোতয় তোতয়—

তৃতীয় যূনক। ওর মানে কী?

পঞ্চক। আবার! মানে! তোর আস্পর্ধা তো কম নয়। সব কথাতেই মানে! কেয়ূরী মন্ত্রটা জানিস?

প্রথম যূনক। না।

পঞ্চক। মরীচী?

প্রথম যূনক। না।

পঞ্চক। মহাশীতবতী?

প্রথম যূনক। না।

পঞ্চক। উষ্ণীষবিজয়?

প্রথম যূনক। না।

পঞ্চক। নাপিত ক্ষৌর করতে করতে যেদিন তোদের বাঁ গালে রক্ত পাড়িয়ে দেয় সেদিন করিস কী?

তৃতীয় যূনক। সেদিন নাপিতের দুই গালে চড় কষিয়ে দিই।

পঞ্চক। না রে না, আমি বলছি সেদিন নদী পার হবার দরকার হলে তোরা খেয়া নৌকোয় উঠতে পারিস?

তৃতীয় যূনক। খুব পারি।

পঞ্চক। ওরে, তোরা আমাকে মাটি করলি রে। আমি আর থাকতে পারছি নে। তোদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আর সাহস হচ্ছে না। এমন জবাব যদি আর-একটা শুনতে পাই তা হলে তোদের বুকে করে পাগলের মতো নাচব, আমার জাতমান কিছু থাকবে না। ভাই, তোরা সব কাজই করতে পাস? তোদের দাদাঠাকুর কিছুতেই তোদের মানা করে না?

যূনকগণের গান

সব কাজে হাত লাগাই মোরা, সব কাজেই।
বাধাবাঁধন নেই গো নেই।
দেখি, খুঁজি, বুঝি,
কেবল ভাঙি, গড়ি, যুঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই।
পারি, নাই বা পারি,
নাহয় জিতি কিংবা হারি,
যদি অমনিতে হাল ছাড়ি, মরি সেই লাজেই।
আপন হাতের জোরে
আমরা তুলি সৃজন করে,
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই।

পঞ্চক। সর্বনাশ করলে রে— আমার সর্বনাশ করলে! আমার আর ভদ্রতা রাখলে না। এদের তালে তালে আমারও পা দুটো নেচে উঠছে। আমাকে সুদ্ধ এরা টানবে দেখছি। কোন্‌দিন আমিও লোহা পিটোব রে লোহা পিটোব— কিন্তু খেঁসারির ডাল— না না, পালা ভাই, পালা তোরা। দেখছিস না, পড়ব বলে পুঁথি সংগ্রহ করে এনেছি।

আর-একদল যূনকের প্রবেশ

প্রথম যূনক। ও ভাই পঞ্চক, দাদাঠাকুর আসছে।

দ্বিতীয় যূনক। এখন রাখো তোমার পুঁথি, রাখো— দাদাঠাকুর আসছে।

দাদাঠাকুরের প্রবেশ

প্রথম যূনক। দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর। কী রে?

দ্বিতীয় যূনক। দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর। কী চাই রে?

তৃতীয় যূনক। কিছু চাই নে— একবার তোমাকে ডেকে নিচ্ছি।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর। কী ভাই, পঞ্চক যে!

পঞ্চক। ওরা সবাই তোমায় ডাকছে, আমারও কেমন ডাকতে ইচ্ছে হল। যতই ভাবছি ওদের দলে মিশব না ততই আরো জড়িয়ে পড়ছি।

প্রথম যূনক। আমাদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে আবার দল কিসের? উনি আমাদের সব দলের শতদল পদ্ম।

পঞ্চক। ও ভাই, তোদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে তোরা তো দিনরাত মাতামাতি করছিস, একবার আমাকে ছেড়ে দে, আমি একটু নিরালায় বসে কথা কই। ভয় নেই, ওঁকে আমাদের অচলায়তনে নিয়ে গিয়ে কপাট দিয়ে রাখব না।

প্রথম যূনক। নিয়ে যাও-না। সে তো ভালোই হয়। তা হলে কপাটের বাপের সাধ্য নেই বন্ধ থাকে। উনি গেলে তোমাদের অচলায়তনের পাথরগুলো সুদ্ধ নাচতে আরম্ভ করবে, পুঁথিগুলোর মধ্যে বাঁশি বাজবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, শুনছি আমাদের গুরু আসছেন।

দাদাঠাকুর। গুরু! কী বিপদ! ভারি উৎপাত করবে তা হলে তো।

পঞ্চক। একটু উৎপাত হলে যে বাঁচি। চুপচাপ থেকে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে।

দাদাঠাকুর। আচ্ছা বেশ, তোমার গুরু এলে তাকে দেখে নেওয়া যাবে। এখন তুমি আছ কেমন বলো তো?

পঞ্চক। ভয়ানক টানাটানির মধ্যে আছি ঠাকুর। মনে মনে প্রার্থনা করছি গুরু এসে যে দিকে হোক এক দিকে আমাকে ঠিক করে রাখুন— হয় এখানকার খোলা হাওয়ার মধ্যে অভয় দিয়ে ছাড়া দিন, নয় তো খুব কষে পুঁথি চাপা দিয়ে রাখুন; মাথা থেকে পা পর্যন্ত আগাগোড়া একেবারে সমান চ্যাপ্টা হয়ে যাই।

একদল যূনকের প্রবেশ

দাদাঠাকুর। কী রে, এত ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলি কেন?

প্রথম যূনক। চণ্ডককে মেরে ফেলেছে।

দাদাঠাকুর। কে মেরেছে?

দ্বিতীয় যূনক। স্থবিরপত্তনের রাজা।

পঞ্চক। আমাদের রাজা? কেন, মারতে গেল কেন?

দ্বিতীয় যূনক। স্থবিরক হয়ে ওঠবার জন্যে চণ্ডক বনের মধ্যে এক পোড়ো মন্দিরে তপস্যা করছিল। ওদের রাজা মন্থরগুপ্ত সেই খবর পেয়ে তাকে কেটে ফেলেছে।

তৃতীয় যূনক। আগে ওদের দেশের প্রাচীর পঁয়ত্রিশ হাত উঁচু ছিল, এবার আশি হাত উঁচু করবার জন্যে লোক লাগিয়ে দিয়েছে, পাছে পৃথিবীর সব লোক লাফ দিয়ে গিয়ে হঠাৎ স্থবিরক হয়ে ওঠে।

চতুর্থ যূনক। আমাদের দেশ থেকে দশজন যূনক ধরে নিয়ে গেছে, হয়তো ওদের কালঝণ্টি দেবীর কাছে বলি দেবে।

দাদাঠাকুর। চলো তবে।

প্রথম যূনক। কোথায় ?

দাদাঠাকুর। স্থবিরপত্তনে।

দ্বিতীয় যূনক। এখনই ?

দাদাঠাকুর। হাঁ এখনই।

সকলে। ওরে, চল্ রে চল্।

দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার আদেশ আছে ওদের পাপ যখন প্রাচীরের আকার ধরে আকাশের জ্যোতি আচ্ছন্ন করতে উঠবে তখন সেই প্রাচীর ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে।

প্রথম যূনক। দেব ধুলোয় লুটিয়ে।

সকলে। দেব লুটিয়ে।

দাদাঠাকুর। ওদের সেই ভাঙা প্রাচীরের উপর দিয়ে রাজপথ তৈরি করে দেব।

সকলে। হাঁ, রাজপথ তৈরি করে দেব।

দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার বিজয়রথ তার উপর দিয়ে চলবে।

সকলে। হাঁ, চলবে, চলবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, এ কী ব্যাপার ?

প্রথম যূনক। চলো, পঞ্চক, তুমি চলো।

দাদাঠাকুর। না না, পঞ্চক না। যাও ভাই, তুমি তোমার অচলায়তনে ফিরে যাও। যখন সময় হবে দেখা হবে।

পঞ্চক। কী জানি ঠাকুর, যদিও আমি কোনো কর্মের না, তবুও ইচ্ছে করছে তোমাদের সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে পড়ি।

দাদাঠাকুর। না পঞ্চক, তোমার গুরু আসবেন, তুমি অপেক্ষা করো গে।

[প্রস্থান

৩

দর্ভকপল্লী

পঞ্চক ও দর্ভকদল

পঞ্চক। নির্বাসন, আমার নির্বাসন রে! বেঁচে গেছি, বেঁচে গেছি!

প্রথম দর্ভক। তোমাদের কী খেতে দেব ঠাকুর ?

পঞ্চক। তোদের যা আছে তাই আমরা খাব।

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের খাবার ? সে কি হয় ? সে যে সব ছোঁওয়া হয়ে গেছে।

পঞ্চক। সেজন্য ভাবিস নে ভাই। পেটের খিদে যে আগুন, সে কারও ছোঁয়া মানে না, সবই পবিত্র করে। ওরে, তোরা সকালবেলায় করিস কী বল তো। ষড়ক্ষরিত দিয়ে একবার ঘটশুদ্ধি করে নিবি নে ?

তৃতীয় দর্ভক। ঠাকুর, আমরা নীচ দর্ভক জাত— আমরা ও-সব কিছুই জানি নে। আজ কত পুরুষ ধরে এখানে বাস করে আসছি, কোনোদিন তো তোমাদের পায়ের ধুলো পড়ে নি। আজ তোমাদের মন্ত্র পড়ে আমাদের বাপ-পিতামহকে উদ্ধার করে দাও ঠাকুর।

পঞ্চক। সর্বনাশ! বলিস কী ? এখানেও মন্ত্র পড়তে হবে! তা হলে নির্বাসনের দরকার কী ছিল ? তা, সকালবেলা তোরা কী করিস বল তো ?

প্রথম দর্ভক। আমরা শাস্ত্র জানি নে, আমরা নাম গান করি।

পঞ্চক। সে কী রকম ব্যাপার ? শোনা দেখি একটা।

দ্বিতীয় দর্ভক। ঠাকুর, সে তুমি শুনে হাসবে।

পঞ্চক। আমিই তো ভাই, এতদিন লোক হাসিয়ে আসছি— তোরা আমাকেও হাসাবি— শুনেও মন খুশি হয়। কিছু ভাবিস নে— নির্ভয়ে শুনিয়ে দে।

প্রথম দর্ভক। আচ্ছা ভাই, আয় তবে— গান ধর।

গান

ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি,
ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি।
ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,
ও রতনের হার, ও পরানের বঁধু।
ও অপরূপ রূপ, ও মনোহর কথা,
ও চরমের সুখ, ও মরমের ব্যথা।
ও ভিখারির ধন, ও অবোলার বোল—
ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল।

পঞ্চক। দে ভাই, আমার মন্ত্রতন্ত্র সব ভুলিয়ে দে, আমার বিদ্যাসাধ্যি সব কেড়ে নে, দে আমাকে তোদের ঐ গান শিখিয়ে দে।

আচার্যের প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, আমাদের সমস্ত পাড়া আজ ত্রাণ পেয়ে গেল। এতদিন তোমার চরণধুলো তো এখানে পড়ে নি।

আচার্য। সে আমার অভাগ্য, সে আমারই অভাগ্য।

দ্বিতীয় দর্ভক। বাবা, তোমার স্নানের জল কাকে দিয়ে তোলাব ? এখানে তো—

আচার্য। বাবা, তোরাই তুলে আনবি।

প্রথম দর্ভক। আমরা তুলে আনব— সে কি হয় !

আচার্য। হাঁ বাবা, তোদের তোলা জলে আজ আমার অভিষেক হবে।

দ্বিতীয় দর্ভক। ওরে চল্ তবে ভাই চল্। আমাদের পাটলা নদী থেকে জল আনি গে।

[দর্ভকদলের প্রস্থান

পঞ্চক। মনে হচ্ছে যেন ভিজে মাটির গন্ধ পাচ্ছি, কোথায় যেন বর্ষা নেমেছে।

আচার্য। ঐ, পঞ্চক শুনতে পাচ্ছ কি ?

পঞ্চক। কী বলুন দেখি ?

আচার্য। আমার মনে হচ্ছে যেন সুভদ্র কাঁদছে।

পঞ্চক। এখান থেকে কি শোনা যাবে ? এ বোধ হয় আর কোনো শব্দ।

আচার্য। তা হবে পঞ্চক, আমি তার কান্না আমার বুকের মধ্যে করে এনেছি। তার কান্নাটা এমন করে আমাকে বেজেছে কেন জান ? সে যে কান্না রাখতে পারে না তবু কিছুতে মানতে চায় না সে কাঁদছে।

পঞ্চক। এতক্ষণে ওরা তাকে মহাতামসে বসিয়েছে— আর সকলে মিলে খুব দূরে থেকে বাহবা দিয়ে বলছে, সুভদ্র দেবশিশু। আর কিছু না, আমি যদি রাজা হতুম তা হলে ওদের সবাইকে কানে ধরে দেবতা করে দিতুম— কিছুতে ছাড়তুম না।

আচার্য। ওরা ওদের দেবতাকে কাঁদাচ্ছে পঞ্চক। সেই দেবতারই কান্নায় এ রাজ্যের সকল আকাশ আকুল হয়ে উঠেছে। তবু ওদের পাষাণের বেড়া এখনো শতধা বিদীর্ণ হয়ে গেল না।

দর্ভকদলের প্রবেশ

পঞ্চক। কী ভাই, তোরা এত ব্যস্ত কিসের ?

প্রথম দর্ভক। শুনছি অচলায়তনে কারা সব লড়াই করতে এসেছে।
আচার্য। লড়াই কিসের ? আজ তো গুরু আসবার কথা।
দ্বিতীয় দর্ভক। না না, লড়াই হচ্ছে, খবর পেয়েছি। সমস্ত ভেঙেচুরে একাকার করে দিলে যে।
তৃতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তোমরা যদি হুকুম কর আমরা যাই ঠেকাই গিয়ে।
আচার্য। ওখানে তো লোক ঢের আছে, তোমাদের ভয় নেই বাবা।
প্রথম দর্ভক। লোক তো আছে, কিন্তু তারা লড়াই করতে পারবে কেন ?
দ্বিতীয় দর্ভক। শুনেছি কতরকম মন্ত্রলেখা তাগাতাবিজ দিয়ে তারা দুখানা হাত আগাগোড়া কষে বেঁধে রেখেছে। খোলে না, পাছে কাজ করতে গেলেই তাদের হাতের গুণ নষ্ট হয়।
পঞ্চক। আচার্যদেব, এদের সংবাদটা সত্যই হবে। কাল সমস্ত রাত মনে হচ্ছিল, চার দিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ভেঙেচুরে পড়ছে। ঘুমের ঘোরে ভাবছিলুম, স্বপ্ন বুঝি।
আচার্য। তবে কি গুরু আসেন নি ?
পঞ্চক। হয়তো বা দাদা ভুল করে আমার গুরুরই সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে বসেছেন। আটক নেই। রাত্রে তাঁকে হঠাৎ দেখে হয়তো যমদূত বলে ভুল করেছিলেন।
প্রথম দর্ভক। আমরা শুনেছি, কে বলছিল গুরুও এসেছেন।
আচার্য। গুরুও এসেছেন ! সে কী রকম হল ?
পঞ্চক। তবে লড়াই করতে কারা এসেছে বলো তো।
প্রথম দর্ভক। লোকের মুখে শুনি তাদের নাকি বলে দাদাঠাকুরের দল।
পঞ্চক। দাদাঠাকুরের দল ! বল্ বল্ শুনি, ঠিক বলছিস তো রে ?
প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, হুকুম করো, একবার ওদের সঙ্গে লড়ে আসি— দেখিয়ে দিই, এখানে মানুষ আছে।
পঞ্চক। আয়-না ভাই, আমিও তোদের সঙ্গে চলব রে।
দ্বিতীয় দর্ভক। তুমিও লড়বে নাকি ঠাকুর ?
পঞ্চক। হাঁ লড়ব।
আচার্য। কী বলছ পঞ্চক ! তোমাকে লড়তে কে ডাকছে ?

মালীর প্রবেশ

মালী। আচার্যদেব, আমাদের গুরু আসছেন।
আচার্য। বলিস কী ? গুরু ? তিনি এখানে আসছেন ? আমাকে আহ্বান করলেই তো আমি যেতুম।
প্রথম দর্ভক। এখানে তোমাদের গুরু এলে তাঁকে বসাব কোথায় ?
দ্বিতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তুমি এখানে তাঁর বসবার জায়গাটাকে একটু শোধন করে নাও— আমরা তফাতে সরে যাই।

আর-একদল দর্ভকের প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, এ তোমাদের গুরু নয়— সে এ পাড়ায় আসবে কেন ? এ-যে আমাদের গোঁসাই।
দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের গোঁসাই ?
প্রথম দর্ভক। হাঁ রে হাঁ, আমাদের গোঁসাই ! এমন সাজ তার আর কখনো দেখি নি। একেবারে চোখ ঝলসে যায়।
তৃতীয় দর্ভক। ঘরে কী আছে রে ভাই, সব বের কর।
দ্বিতীয় দর্ভক। বনের জাম আছে রে।
চতুর্থ দর্ভক। আমার ঘরে খেজুর আছে।

প্রথম দর্ভক। কালো গোরুর দুধ শিগগির দুয়ে আন দাদা।

দাদাঠাকুরের প্রবেশ

আচার্য। (প্রণাম করিয়া) জয় গুরুজির জয়!

পঞ্চক। এ কি! এ যে দাদাঠাকুর! গুরু কোথায়?

দর্ভকদল। গোঁসাই ঠাকুর! প্রণাম হই। খবর দিয়ে এলে না কেন? তোমার ভোগ যে তৈরি হয় নি।

দাদাঠাকুর। কেন ভাই, তোদের ঘরে আজ রান্না চড়ে নি নাকি? তোরাও মন্ত্র নিয়ে উপোস করতে আরম্ভ করেছিস না কি রে?

প্রথম দর্ভক। আমরা আজ শুধু মাষকলাই আর ভাত চড়িয়েছি। ঘরে আর-কিছু ছিল না।

দাদাঠাকুর। আমারও তাতেই হয়ে যাবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, আমার ভারি গর্ব ছিল এ রাজ্যে একলা আমিই কেবল চিনি তোমাকে। কারও যে চিনতে আর বাকি নেই!

প্রথম দর্ভক। ঐ তো আমাদের গোঁসাই— পূর্ণিমার দিনে এসে আমাদের পিঠে খেয়ে গেছে, তার পর এই কতদিন পরে দেখা। চল ভাই, আমাদের যা আছে সব সংগ্রহ করে আনি।

[প্রস্থান

দাদাঠাকুর। আচার্য, তুমি এ কী করেছ!

আচার্য। কী যে করেছি তা বোঝবারও শক্তি আমার নেই। তবে এইটুকু বুঝি— আমি সব নষ্ট করেছি।

দাদাঠাকুর। যিনি তোমাকে মুক্তি দেবেন তাঁকেই তুমি কেবল বাঁধবার চেষ্টা করেছ।

আচার্য। কিন্তু বাঁধতে তো পারি নি ঠাকুর। তাঁকে বাঁধছি মনে করে যতগুলো পাক দিয়েছি সব পাক কেবল নিজের চার দিকেই জড়িয়েছি। যে হাত দিয়ে সেই বাঁধন খোলা যেতে পারত সেই হাতটা সুদ্ধ বেঁধে ফেলেছি।

দাদাঠাকুর। যিনি সব জায়গায় আপনি ধরা দিয়ে বসে আছেন তাঁকে একটা জায়গায় ধরতে গেলেই তাঁকে হারাতে হয়।

আচার্য। আদেশ করো প্রভু। ভুল করেছিলুম জেনেও সে ভুল ভাঙতে পারি নি। পথ হারিয়েছি তা জানতুম, যতই চলছি ততই পথ হতে কেবল বেশি দূরে গিয়ে পড়ছি তাও বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু ভয়ে থামতে পারছিলুম না। এই চক্রে হাজার বার ঘুরে বেড়ানোকেই পথ খুঁজে পাবার উপায় বলে মনে করেছিলুম।

দাদাঠাকুর। যে চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোনো জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যেই ঘুরিয়ে মারে, তার থেকেই বের করে সোজা রাস্তায় বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যেই আমি আজ এসেছি।

আচার্য। ধন্য করেছ!— কিন্তু এতদিন আস নি কেন প্রভু? আমাদের আয়তনের পাশেই এই দর্ভকপাড়ায় তুমি আনাগোনা করছ, আর কত বৎসর হয়ে গেল আমাদের আর দেখা দিলে না!

দাদাঠাকুর। এদের দেখা দেওয়ার রাস্তা যে সোজা। তোমাদের সঙ্গে দেখা করা তো সহজ করে রাখ নি।

পঞ্চক। ভালোই করেছি, তোমার শক্তি পরীক্ষা করে নিয়েছি। তুমি আমাদের পথ সহজ করে দেবে, কিন্তু তোমার পথ সহজ নয়। এখন, আমি ভাবছি তোমাকে ডাকব কী বলে? দাদাঠাকুর, না গুরু।

দাদাঠাকুর। যে জানতে চায় না যে, আমি তাকে চালাচ্ছি আমি তার দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চলতে চায় আমি তার গুরু।

পঞ্চক। প্রভু, তুমি তা হলে আমার দুইই। আমাকে আমিই চালাচ্ছি আর আমাকে তুমিই চালাচ্ছ, এই দুটোই আমি মিশিয়ে জানতে চাই। আমি তো যূনক নই, তোমাকে মেনে চলতে ভয় নেই। তোমার মুখের আদেশকেই আনন্দে আমার মনের ইচ্ছা করে তুলতে পারব। এবার তবে তোমার সঙ্গে তোমারই বোঝা মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি ঠাকুর।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার জায়গা ঠিক করে রেখেছি।

পঞ্চক। কোথায় ঠাকুর ?

দাদাঠাকুর। ঐ অচলায়তনে।

পঞ্চক। আবার অচলায়তনে ? আমার কারাদণ্ডের মেয়াদ ফুরোয় নি ?

দাদাঠাকুর। কারাগার যা ছিল সে তো আমি ভেঙে ফেলেছি, এখন সেই উপকরণ দিয়ে সেইখানেই তোমাকে মন্দির গেঁথে তুলতে হবে।

পঞ্চক। কিন্তু অচলায়তনের লোকে যে আমাকে আপন বলে গ্রহণ করবে না প্রভু।

দাদাঠাকুর। ওরা তোমাকে গ্রহণ করতে চাচ্ছে না, সেইজন্যেই ওখানে তোমার সব চেয়ে দরকার। ওরা তোমাকে ঠেলে দিচ্ছে বলেই তুমি ওদের ঠেলতে পারবে না।

পঞ্চক। আমাকে কী করতে হবে ?

দাদাঠাকুর। যে যেখানে ছড়িয়ে আছে সবাইকে ডাক দিয়ে আনতে হবে।

পঞ্চক। সবাইকে কি কুলোবে ?

দাদাঠাকুর। না যদি কুলোয় তা হলে দেয়াল আবার আর-একদিন ভাঙতেই হবে। আমি এখন চললুম অচলায়তনের দ্বার খুলতে।

[প্রস্থান

৪

অচলায়তন

মহাপঞ্চক, সঞ্জীব, বিশ্বম্ভর, জয়োত্তম

মহাপঞ্চক। তোমরা অত ব্যস্ত হয়ে পড়ছ কেন ? কোনো ভয় নেই।

বিশ্বম্ভর। তুমি তো বলছ ভয় নেই, এই-যে খবর এল, শত্রুসৈন্য অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দিয়েছে।

মহাপঞ্চক। এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। শিলা জলে ভাসে ! ম্লেচ্ছরা অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দেবে ! পাগল হয়েছ ?

সঞ্জীব। কে যে বললে দেখে এসেছে।

মহাপঞ্চক। সে স্বপ্ন দেখেছে।

জয়োত্তম। আজই তো আমাদের গুরুর আসবার কথা।

মহাপঞ্চক। তাঁর জন্যে সমস্ত আয়োজন ঠিক হয়ে গেছে; কেবল যে ছেলের মা-বাপ ভাই-বোন কেউ মরে নি এমন নবম গর্ভের সন্তান এখনো জুটিয়ে আনতে পারলে না— দ্বারে দাঁড়িয়ে কে যে মহারক্ষা পড়বে ঠিক করতে পারছি নে।

সঞ্জীব। গুরু এলে তাঁকে চিনে নেবে কে ? আচার্য অদীনপুণ্য তাঁকে জানতেন। আমরা তো কেউ তাঁকে দেখি নি।

মহাপঞ্চক। আমাদের আয়তনে যে শাঁখ বাজায় সেই বৃদ্ধ তাঁকে দেখেছে। আমাদের পূজার ফুল যে জোগায় সেও তাঁকে জানে।

বিশ্বম্ভর। ঐ যে উপাধ্যায় ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসছেন।

মহাপঞ্চক। নিশ্চয় গুরু আসার সংবাদ পেয়েছেন। কিন্তু মহারক্ষা পাঠের কী করা যায়। ঠিক লক্ষণসম্পন্ন ছেলে তো পাওয়া গেল না।

উপাধ্যায়ের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। কত দূর?

উপাধ্যায়। কত দূর কী? এসে পড়েছে যে।

মহাপঞ্চক। কই দ্বারে তো এখনো শাঁখ বাজালে না?

উপাধ্যায়। বিশেষ দরকার দেখি নে— কারণ দ্বারের চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি নে— ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

মহাপঞ্চক। বল কী, দ্বার ভেঙেছে?

উপাধ্যায়। শুধু দ্বার নয়, প্রাচীরগুলোকে এমনি সমান করে শুইয়ে দিয়েছে যে তাদের সম্বন্ধে আর কোনো চিন্তা করবার দরকার নেই। ঐ দেখছ না আলো।

মহাপঞ্চক। কিন্তু আমাদের দৈবজ্ঞ যে গণনা করে স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়ে গেল যে—

উপাধ্যায়। তার চেয়ে ঢের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শত্রুসৈন্যদের রক্তবর্ণ টুপিগুলো। এই যে সব ফাঁক হয়ে গেছে।

ছাত্রগণ। কী সর্বনাশ!

সঞ্জীব। কিসের মন্ত্র তোমার মহাপঞ্চক?

বিশ্বম্ভর। আমি তো তখনই বলেছিলুম, এ-সব কাজ এই কাঁচা বয়সের পুঁথিপড়া অকালপক্কদের দিয়ে হবার নয়।

সঞ্জীব। কিন্তু এখন করা যায় কী?

জয়োত্তম। আমাদের আচার্যদেবকে এখনই ফিরিয়ে আনি গে। তিনি থাকলে এ বিপত্তি ঘটতেই পারত না। হাজার হোক লোকটা পাকা।

সঞ্জীব। কিন্তু দেখো মহাপঞ্চক, আমাদের আয়তনের যদি কোনো বিপত্তি ঘটে তা হলে তোমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব।

উপাধ্যায়। সে পরিশ্রমটা তোমাদের করতে হবে না, উপযুক্ত লোক আসছে।

মহাপঞ্চক। তোমরা মিথ্যা বিচলিত হচ্ছ। বাইরের প্রাচীর ভাঙতে পারে, কিন্তু ভিতরের লোহার দরজা বন্ধ আছে। সে যখন ভাঙবে তখন চন্দ্রসূর্য নিবে যাবে। আমি অভয় দিচ্ছি তোমরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অচলায়তনের রক্ষক-দেবতার আশ্চর্য শক্তি দেখে নাও।

উপাধ্যায়। তার চেয়ে দেখি কোন্ দিক দিয়ে বেরোবার রাস্তা।

বিশ্বম্ভর। আমাদেরও তো সেই ইচ্ছা। কিন্তু এখান থেকে বেরোবার পথ যে জানিই নে। কোনোদিন বেরোতে হবে বলে স্বপ্নেও মনে করি নি।

সঞ্জীব। শুনছ— ঐ শুনছ, ভেঙে পড়ল সব।

ছাত্রগণ। কী হবে আমাদের। নিশ্চয় দরজা ভেঙেছে। এই যে একেবারে নীল আকাশ।

বালকদলের প্রবেশ

উপাধ্যায়। কী রে তোরা সব নৃত্য করছিস কেন?

প্রথম বালক। আজ এ কী মজা হল।

উপাধ্যায়। মজাটা কী রকম শুনি?

দ্বিতীয় বালক। আজ চার দিক থেকেই আলো আসছে— সব যেন ফাঁক হয়ে গেছে।

তৃতীয় বালক। এত আলো তো আমরা কোনোদিন দেখি নি।

প্রথম বালক। কোথাকার পাখির ডাক এখান থেকেই শোনা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় বালক। এ-সব পাখির ডাক আমরা তো কোনোদিন শুনি নি। এ তো আমাদের খাঁচার ময়নার মতো একেবারেই নয়।

প্রথম বালক। আজ আমাদের খুব ছুটতে ইচ্ছে করছে। তাতে কি দোষ হবে মহাপঞ্চকদাদা?

মহাপঞ্চক। আজকের কথা ঠিক বলতে পারছি নে। আজ কোনো নিয়ম রক্ষা করা চলবে বলে বোধ হচ্ছে না।

প্রথম বালক। আজ তা হলে আমাদের ষড়াসন বন্ধ?

মহাপঞ্চক। হাঁ, বন্ধ।

সকলে। ওরে কী মজা রে কী মজা।

দ্বিতীয় বালক। আজ পঙ্‌ক্তিধৌতির দরকার নেই?

মহাপঞ্চক। না।

সকলে। ওরে কী মজা। আঃ আজ চার দিকে কী আলো।

জয়োত্তম। আমারও মনটা নেচে উঠেছে বিশ্বম্ভর! এ কি ভয়, না আনন্দ, কিছুই বুঝতে পারছি নে।

বিশ্বম্ভর। আজ একটা অদ্ভুত কাণ্ড হচ্ছে জয়োত্তম।

সঞ্জীব। কিন্তু ব্যাপারটা যে কী, ভেবে উঠতে পারছি নে। ওরে ছেলেগুলো, তোরা হঠাৎ এত খুশি হয়ে উঠলি কেন বল দেখি।

প্রথম বালক। দেখছ না, সমস্ত আকাশটা যেন ঘরের মধ্যে দৌড়ে এসেছে।

দ্বিতীয় বালক। মনে হচ্ছে ছুটি— আমাদের ছুটি।

[বালকদের প্রস্থান

জয়োত্তম। দেখো মহাপঞ্চকদাদা, আমার মনে হচ্ছে ভয় কিছুই নেই— নইলে ছেলেদের মন এমন অকারণে খুশি হয়ে উঠল কেন?

মহাপঞ্চক। ভয় নেই সে তো আমি বরাবর বলে আসছি।

শঙ্খবাদক ও মালীর প্রবেশ

উভয়ে। গুরু আসছেন।

সকলে। গুরু!

মহাপঞ্চক। শুনলে তো। আমি নিশ্চয় জানতুম তোমাদের আশঙ্কা বৃথা।

সকলে। ভয় নেই আর ভয় নেই।

বিশ্বম্ভর। মহাপঞ্চক যখন আছেন তখন কি আমাদের ভয় থাকতে পারে।

সকলে। জয় আচার্য মহাপঞ্চকের।

যোদ্ধৃবেশে দাদাঠাকুরের প্রবেশ

শঙ্খবাদক ও মালী। (প্রণাম করিয়া) জয় গুরুজির জয়!

সকলে স্তম্ভিত

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, এই কি গুরু?

উপাধ্যায়। তাই তো শুনছি।

মহাপঞ্চক। তুমি কি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর। হাঁ! তুমি আমাকে চিনবে না কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্ পথ দিয়ে এলে? তোমাকে কে মানবে?

দাদাঠাকুর। আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তবে এই শত্রুবেশে কেন?

দাদাঠাকুর। এই তো আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে— সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।

মহাপঞ্চক। কেন তুমি আমাদের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে এলে?

দাদাঠাকুর। তুমি কোথাও তোমার গুরুর প্রবেশের পথ রাখ নি।

মহাপঞ্চক। তুমি কি মনে করেছ তুমি অস্ত্র হাতে করে এসেছ বলে আমি তোমার কাছে হার মানব?

দাদাঠাকুর। না, এখনই না। কিন্তু দিনে দিনে হার মানতে হবে, পদে পদে।

মহাপঞ্চক। আমাকে নিরস্ত্র দেখে ভাবছ আমি তোমাকে আঘাত করতে পারি নে?

দাদাঠাকুর। আঘাত করতে পার কিন্তু আহত করতে পার না— আমি যে তোমার গুরু।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, তোমরা এঁকে প্রণাম করবে নাকি?

উপাধ্যায়। দয়া করে উনি যদি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করেন তা হলে প্রণাম করব বৈকি— নইলে যে—

মহাপঞ্চক। না, আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না— আমি তোমাকে প্রণত করব।

মহাপঞ্চক। তুমি আমাদের পূজা নিতে আস নি?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের পূজা নিতে আসি নি, অপমান নিতে এসেছি।

মহাপঞ্চক। তোমার পশ্চাতে অস্ত্রধারী এ কারা?

দাদাঠাকুর। এরা আমার অনুবর্তী— এরা যূনক।

সকলে। যূনক!

মহাপঞ্চক। এরাই তোমার অনুবর্তী?

দাদাঠাকুর। হাঁ।

মহাপঞ্চক। এই মন্ত্রহীন কর্মকাণ্ডহীন ম্লেচ্ছদল! আমি এই আয়তনের আচার্য— আমি তোমাকে আদেশ করছি তুমি এখনই ঐ ম্লেচ্ছদলকে সঙ্গে নিয়ে বাহির হয়ে যাও।

দাদাঠাকুর। আমি যাকে আচার্য নিযুক্ত করব সেই আচার্য; আমি যা আদেশ করব সেই আদেশ।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, আমরা এমন করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। এসো আমরা এদের এখান থেকে বাহির করে দিয়ে আমাদের আয়তনের সমস্ত দরজাগুলো আবার একবার দ্বিগুণ দৃঢ় করে বন্ধ করি।

উপাধ্যায়। এরাই আমাদের বাহির করে দেবে, সেই সম্ভাবনাটাই প্রবল বলে বোধ হচ্ছে।

প্রথম যূনক। অচলায়তনের দরজার কথা বলছ— সে আরো আকাশের সঙ্গে দিব্যি সমান করে দিয়েছি।

উপাধ্যায়। বেশ করেছ ভাই। আমাদের ভারি অসুবিধা হচ্ছিল। এত তালাচাবির ভাবনাও ভাবতে হত।

মহাপঞ্চক। পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পার, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পার, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ করে এই বসলুম— যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।

প্রথম যূনক। এ পাগলটা কোথাকার রে। এই তলোয়ারের ডগা দিয়ে ওর মাথার খুলিটা ফাঁক করে দিলে ওর বুদ্ধিতে একটু হাওয়া লাগতে পারে।

মহাপঞ্চক। কিসের ভয় দেখাও আমায়। তোমরা মেরে ফেলতে পার, তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই।

প্রথম যূনক। ঠাকুর, এই লোকটাকে বন্দী করে নিয়ে যাই— আমাদের দেশের লোকের ভারি মজা লাগবে।

দাদাঠাকুর। ওকে বন্দী করবে তোমরা? এমন কী বন্ধন তোমাদের হাতে আছে।

দ্বিতীয় যূনক। ওকে কি কোনো শাস্তিই দেব না?

দাদাঠাকুর। শাস্তি দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছোয় না।

বালকদলের প্রবেশ

সকলে। তুমি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর। হাঁ, আমি তোমাদের গুরু।

সকলে। আমরা প্রণাম করি।

দাদাঠাকুর। বৎস, তোমরা মহাজীবন লাভ করো।

প্রথম বালক। ঠাকুর, তুমি আমাদের কী করবে?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের সঙ্গে খেলব।

সকলে। খেলবে?

দাদাঠাকুর। নইলে তোমাদের গুরু হয়ে সুখ কিসের?

সকলে। কোথায় খেলবে?

দাদাঠাকুর। আমার খেলার মস্ত মাঠ আছে।

প্রথম বালক। মস্ত! এই ঘরের মতো মস্ত?

দাদাঠাকুর। এর চেয়ে অনেক বড়ো।

দ্বিতীয় বালক। এর চেয়েও বড়ো? ঐ আঙিনাটার মতো?

দাদাঠাকুর। তার চেয়ে বড়ো।

দ্বিতীয় বালক। তার চেয়ে বড়ো! উঃ কী ভয়ানক!

প্রথম বালক। সেখানে খেলতে গেলে পাপ হবে না?

দাদাঠাকুর। কিসের পাপ?

দ্বিতীয় বালক। খোলা জায়গায় গেলে পাপ হয় না?

দাদাঠাকুর। খোলা জায়গাতেই সব পাপ পালিয়ে যায়।

সকলে। কখন নিয়ে যাবে?

দাদাঠাকুর। এখানকার কাজ শেষ হলেই।

জয়োত্তম। (প্রণাম করিয়া) প্রভু, আমিও যাব।

বিশ্বম্ভর। সঞ্জীব, আর দ্বিধা করলে কেবল সময় নষ্ট হবে। প্রভু, ঐ বালকের সঙ্গে আমাদেরও ডেকে নাও।

সঞ্জীব। মহাপঞ্চকদাদা, তুমিও এসো-না।

মহাপঞ্চক। না, আমি না।

সুভদ্রের প্রবেশ

সুভদ্র। গুরু!

দাদাঠাকুর। কী বাবা।

সুভদ্র। আমি যে পাপ করেছি তার তো প্রায়শ্চিত্ত শেষ হল না।

দাদাঠাকুর। তার আর কিছু বাকি নেই।

সুভদ্র। বাকি নেই?

দাদাঠাকুর। না। আমি সমস্ত চুরমার করে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছি।

সুভদ্র। একজটা দেবী—

দাদাঠাকুর। একজটা দেবী! উত্তরের দিকের দেয়ালটা ভাঙবামাত্রই একজটা দেবীর সঙ্গে আমাদের এমনি মিল হয়ে গেল যে সে আর কোনো দিন জটা দুলিয়ে কাউকে ভয় দেখাবে না। এখন তাকে দেখলে মনে হবে সে আকাশের আলো— তার সমস্ত জটা আষাঢ়ের নবীন মেঘের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছে।

সুভদ্র। এখন আমি কী করব?

পঞ্চক। এখন তুমি আছ ভাই, আর আমি আছি। দুজনে মিলে কেবলই উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিমের সমস্ত দরজাজানালাগুলো খুলে খুলে বেড়াব।

যূনক ও দর্ভকদলের প্রবেশ ও গুরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া গান

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক ক্ষয়।
তোমারি হউক জয়।
এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়,
তোমারি হউক জয়।
এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়,
তোমারি হউক জয়।
প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে
মৃত্যুর হোক লয়।
তোমারি হউক জয়।

অরূপরতন

ভূমিকা

সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। সেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধনজন খ্যাতি, সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না ;— নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ কথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারি দিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল, সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে-প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, সকল রূপে, আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়— এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

এই নাট্য-রূপকটি 'রাজা' নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ— নূতন করিয়া পুনর্লিখিত।

মাঘ ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রস্তাবনা

গান

চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো—
ধনের বাটে মানের বাটে রূপের হাটে
দলে দলে গো ॥
দেখবে বলে করেছে পণ,
দেখবে কারে জানে না মন,
প্রেমের দেখা দেখে যখন
চোখ ভেসে যায় চোখের জলে গো ॥
আমায় তোরা ডাকিস না রে,
আমি যাব খেয়ার ঘাটে অরূপ রসের পারাবারে
উদাস হাওয়া লাগে পালে,
পারের পানে যাবার কালে
চোখ দুটোরে ডুবিয়ে যাব
অকূল সুধা-সাগর তলে গো ॥

অরূপরতন

১

প্রাসাদকুঞ্জ

সুরঙ্গমা। প্রভু, একটা কথা আছে।

নেপথ্যে। কী বলো।

সুরঙ্গমা। রাজকন্যা সুদর্শনা যে তোমাকেই বরণ করতে চায়, তাকে কি দয়া করবে না?

নেপথ্যে। সে কি আমাকে চেনে?

সুরঙ্গমা। না প্রভু, সে তোমাকে চিনতে চায়। তুমি তাকে নিজেই চিনিয়ে দেবে, নইলে তার সাধ্য কী।

নেপথ্যে। অনেক বাধা আছে।

সুরঙ্গমা। তাই তো তাকে কৃপা করতে হবে।

নেপথ্যে। বহু দুঃখে যে আবরণ দূর হয়।

সুরঙ্গমা। সেই দুঃখই তাকে দিয়ো, তাকে দিয়ো।

নেপথ্যে। আমার নাম নিয়ে সকলের চেয়ে বড়ো হবে, এই অহংকারে সে আমাকে চায়।

সুরঙ্গমা। এই সুযোগে তার অহংকার দাও ভেঙে। সকলের নীচে নামিয়ে তোমার পায়ের কাছে নিয়ে এসো তাকে।

নেপথ্যে। সুদর্শনাকে বোলো, আমি তাকে গ্রহণ করব অন্ধকারে।

সুরঙ্গমা। বাঁশি বাজবে না? আলো জ্বলবে না? সমারোহ হবে না?

নেপথ্যে। না।

সুরঙ্গমা। বরণডালায় সে কি ফুলের মালা তোমাকে দেবে না?

নেপথ্যে। সে ফুল এখনো ফোটে নি।

সুরঙ্গমা। সেই ভালো মহারাজ। অন্ধকারেই বীজ থাকে, অঙ্কুরিত হলে আপনিই আসে আলোয়।

বাহির হতে আহ্বান। 'সুরঙ্গমা'!

সুরঙ্গমা। ঐ আসছেন রাজকুমারী সুদর্শনা।

সুদর্শনার প্রবেশ

সুদর্শনা। তোমার এখানে আকাশে যেন অর্ঘ্য সাজানো, যেন শিশির-ধোওয়া সকালবেলার স্পর্শ। তুমি এখানকার বাতাসে কী ছিটিয়ে দিয়েছ বলো দেখি।

সুরঙ্গমা। সুর ছিটিয়েছি।

সুদর্শনা। আমাকে সেই রাজাধিরাজের কথা বলো সুরঙ্গমা, আমি শুনি।

সুরঙ্গমা। মুখের কথায় বলে উঠতে পারি নে।

সুদর্শনা। বলো, তিনি কি খুব সুন্দর?

সুরঙ্গমা। সুন্দর? একদিন সুন্দরকে নিয়ে খেলতে গিয়েছিলুম, খেলা ভাঙল যেদিন, বুক ফেটে গেল, সেইদিন বুঝলুম সুন্দর কাকে বলে। একদিন তাকে ভয়ংকর বলে ভয় পেয়েছি, আজ তাকে

ভয়ংকর বলে আনন্দ করি— তাকে বলি তুমি ঝড়, তাকে বলি তুমি দুঃখ, তাকে বলি তুমি মরণ, সব শেষে বলি— তুমি আনন্দ।

গান

আমি যখন ছিলেম অন্ধ,
সুখের খেলায় বেলা গেছে পাই নি তো আনন্দ ॥
খেলাঘরের দেয়াল গেঁথে
খেয়াল নিয়ে ছিলেম মেতে,
ভিত ভেঙে যেই আসলে ঘরে
ঘুচল আমার বন্ধ,
সুখের খেলা আর রোচে না
পেয়েছি আনন্দ ॥
ভীষণ আমার, রুদ্র আমার,
নিদ্রা গেল ক্ষুদ্র আমার,
উগ্র ব্যথায় নূতন করে
বাঁধলে আমার ছন্দ।
যেদিন তুমি অগ্নিবেশে
সব-কিছু মোর নিলে এসে,
সেদিন আমি পূর্ণ হলেম ঘুচল আমার দ্বন্দ্ব,
দুঃখ সুখের পারে তোমায় পেয়েছি আনন্দ ॥

সুদর্শনা। প্রথমটা তুমি তাঁকে চিনতে পার নি?

সুরঙ্গমা। না।

সুদর্শনা। কিন্তু দেখো তাঁকে চিনতে আমার একটুও দেরি হবে না। আমার কাছে তিনি সুন্দর হয়ে দেখা দেবেন।

সুরঙ্গমা। তার আগে একটা কথা তোমাকে মেনে নিতে হবে।

সুদর্শনা। নেব, আমার কিছুতে দ্বিধা নেই।

সুরঙ্গমা। তিনি বলেছেন, অন্ধকারেই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

সুদর্শনা। চিরদিন?

সুরঙ্গমা। সে-কথা বলতে পারি নে।

সুদর্শনা। আচ্ছা আমি সবই মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আমার কাছে তিনি লুকিয়ে থাকতে পারবেন না। দিন যদি স্থির হয়ে থাকে সবাইকে তো জানাতে হবে।

সুরঙ্গমা। জানিয়ে কী করবে। সে অন্ধকারে সকলের তো স্থান নেই।

সুদর্শনা। আমি রাজাধিরাজকে লাভ করেছি সে-কথা কাউকে জানাতে পারব না?

সুরঙ্গমা। জানাতে পার কিন্তু কেউ বিশ্বাস করবে না।

সুদর্শনা। এতবড়ো কথাটা বিশ্বাস করবে না, সে কি হয়?

সুরঙ্গমা। লোক ডেকে প্রমাণ দিতে পারবে না যে।

সুদর্শনা। পারবই, নিশ্চয় পারব।

সুরঙ্গমা। আচ্ছা, চেষ্টা দেখো।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, তোমার মতো আমি অত বেশি নম্র নই, আমি শক্ত আছি। সকলের কাছে তিনি আমাকে স্বীকার করে নেবেন— এ তিনি এড়াতে পারবেন না।

সুরঙ্গমা। সে-কথা আজকে ভাববার দরকার নেই রাজকুমারী, তুমি নিজে তাঁকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়ো, তা হলেই সব সহজ হবে।

সুদর্শনা। ও-কথা কেন বলছ? আমি তো সেইজন্যেই প্রস্তুত হয়ে রয়েছি। আর কিন্তু বিলম্ব কোরো না।

সুরঙ্গমা। তাঁর দিকে সমস্তই প্রস্তুত হয়েই আছে। আজ আমরা তবে বিদায় হই।

সুদর্শনা। কোথায় যাচ্ছ?

সুরঙ্গমা। বসন্ত-উৎসব কাছে এল, তার আয়োজন করতে হবে।

সুদর্শনা। কী রকমের আয়োজনটা হওয়া চাই।

সুরঙ্গমা। মাধবীকুঞ্জকে তো তাড়া দিতে হয় না। আমের বনের মুকুল আপনি ধরে। আমাদের মানুষের শক্তিতে যার যেটা দেবার সেটা সহজে প্রকাশ হতে চায় না। কিন্তু সেদিন সেটা আবৃত থাকলে চলবে না। কেউ দেবে গান, কেউ দেবে নাচ।

সুদর্শনা। আমি সেদিন কী দেব সুরঙ্গমা।

সুরঙ্গমা। সে-কথা তুমিই বলতে পার।

সুদর্শনা। আমি নিজ হাতে মালা গেঁথে সুন্দরকে অর্ঘ্য পাঠাব।

সুরঙ্গমা। সে-ই ভালো।

সুদর্শনা। তাঁকে দেখব কী করে।

সুরঙ্গমা। সে তিনিই জানেন।

সুদর্শনা। আমাকে কোথায় যেতে হবে?

সুরঙ্গমা। কোথাও না, এইখানেই।

সুদর্শনা। কী বল সুরঙ্গমা, অন্ধকারের সভা এইখানেই? যেখানে চিরদিন আছি এইখানেই? সাজতে হবে না?

সুরঙ্গমা। নাই-বা সাজলে। একদিন তিনিই সাজাবেন যে-সাজে তোমাকে মানায়।

গান

প্রভু, বলো বলো কবে
তোমার পথের ধুলার রঙে রঙে
আঁচল রঙিন হবে।
তোমার বনের রাঙা ধূলি
ফুটায় পূজার কুসুমগুলি,
সেই ধূলি হায় কখন আমায়
আপন করি লবে॥
প্রণাম দিতে চরণতলে
ধুলার কাঙাল যাত্রিদলে
চলে যারা, আপন ব'লে
চিনবে আমায় সবে॥

সুদর্শনা। আমার তো আর একটুও দেরি করতে ইচ্ছে করছে না।

সুরঙ্গমা। কোরো না দেরি— তাঁকে ডাকো, এইখানেই দয়া করবেন।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, আমি তো মনে করি যে ডাকছি, সাড়া পাই নে। বোধ হয় ডাকতে জানি নে। তুমি আমার হয়ে ডাকো-না— তোমার কণ্ঠ তিনি চেনেন।

সুরঙ্গমার গান

খোলো খোলো দ্বার, রাখিয়ো না আর
বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।
দাও সাড়া দাও, এই দিকে চাও
এসো দুই বাহু বাড়ায়ে ॥
কাজ হয়ে গেছে সারা,
উঠেছে সন্ধ্যাতারা,
আলোকের খেয়া হয়ে গেল দেয়া
অস্তসাগর পারায়ে ॥
ভরি লয়ে ঝারি এনেছি তো বারি
সেজেছি তো শুচি দুকূলে,
বেঁধেছি তো চুল, তুলেছি তো ফুল
গেঁথেছি তো মালা মুকুলে।
ধেনু এল গোঠে ফিরে
পাখিরা এসেছে নীড়ে,
পথ ছিল যত জুড়িয়া জগত
আঁধারে গিয়েছে হারায়ে ॥

ধীরে ধীরে আলো নিবে গিয়ে অন্ধকার হয়ে গেল

সুদর্শনা। অন্ধকারে আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে। তুমি এর মধ্যে আছ?

নেপথ্যে। এই তো আমি আছি।

সুদর্শনা। আমি তোমাকে বরণ করব, সে কি না দেখেই?

নেপথ্যে। চোখে দেখতে গেলে ভুল দেখবে— অন্তরে দেখো মন শুদ্ধ করে।

সুদর্শনা। ভয়ে যে আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠছে।

নেপথ্যে। প্রেমের মধ্যে ভয় না থাকলে রস নিবিড় হয় না।

সুদর্শনা। এই অন্ধকারে তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ?

নেপথ্যে। হাঁ পাচ্ছি।

সুদর্শনা। কী রকম দেখছ?

নেপথ্যে। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার মধ্যে দেহ নিয়েছে যুগযুগান্তরের ধ্যান, লোকলোকান্তরের আলোক, বহু শত শরৎ-বসন্তের ফুল ফল। তুমি বহুপুরাতনের নূতন রূপ।

সুদর্শনা। বলো বলো এমনি করে বলো। মনে হচ্ছে যেন অনাদিকালের গান জন্মজন্মান্তর থেকে শুনে আসছি। কিন্তু প্রভু, এ যে কঠিন কালো লোহার মতো অন্ধকার, এ যে আমার উপর চেপে আছে ঘুমের মতো, মূর্ছার মতো, মৃত্যুর মতো। এ জায়গায় তোমাতে আমাতে মিল হবে কেমন করে? না না, হবে না মিলন, হবে না। এখানে নয়, চোখের দেখার জগতেই তোমাকে দেখব— সেইখানেই যে আমি আছি।

নেপথ্যে। আচ্ছা দেখো। তোমাকে নিজে চিনে নিতে হবে।

সুদর্শনা। চিনে নেব, লক্ষ লোকের মধ্যে চিনে নেব, ভুল হবে না।

নেপথ্যে। বসন্ত-পূর্ণিমার উৎসবে সকল লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা কোরো। সুরঙ্গমা

সুরঙ্গমা। কী প্রভু।

নেপথ্যে। বসন্ত-পূর্ণিমার উৎসব তো এল।

সুরঙ্গমা। আমাকে কী কাজ করতে হবে ?

নেপথ্যে। আজ তোমার কাজের দিন নয়, সাজের দিন। পুষ্পবনের আনন্দে মিলিয়ে দিয়ো প্রাণের আনন্দ।

সুরঙ্গমা। তাই হবে প্রভু।

নেপথ্যে। সুদর্শনা আমাকে চোখে দেখতে চান।

সুরঙ্গমা। কোথায় দেখবেন ?

নেপথ্যে। যেখানে পঞ্চমে বাঁশি বাজবে, পুষ্পকেশরের ফাগ উড়বে, আলোয় ছায়ায় হবে গলাগলি সেই দক্ষিণের কুঞ্জবনে।

সুরঙ্গমা। চোখে ধাঁধা লাগবে না ?

নেপথ্যে। সুদর্শনার কৌতূহল হয়েছে।

সুরঙ্গমা। কৌতূহলের জিনিস তো পথে ঘাটে ছড়াছড়ি। তুমি যে কৌতূহলের অতীত।

গান

কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে, হায় রে হায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায় ॥
ওগো হৃদয়ে যবে মোহন রবে বাজবে বাঁশি,
তখন আপনি সেধে ফিরবে কেঁদে পরবে ফাঁসি,
তখন ঘুচবে ত্বরা ঘুরিয়া মরা হেথা হোথায়—
আহা আজি সে আঁখি বনের পাখি বনে পালায় ॥
চেয়ে দেখিস না রে হৃদয়-দ্বারে কে আসে যায়,
তোরা শুনিস কানে বারতা আনে দখিন বায়।
আজি ফুলের বাসে সুখের হাসে আকুল গানে
চির বসন্ত যে তোমারি খোঁজে এসেছে প্রাণে,
তারে বাহিরে খুঁজি ফিরিছ বুঝি পাগল প্রায়,
আহা আজি সে আঁখি বনের পাখি বনে পালায় ॥

[উভয়ের প্রস্থান

২

উৎসব-ক্ষেত্র

বিদেশী পথিকদল ও প্রহরীর প্রবেশ

বিরাজদত্ত। ওগো মশায়।

প্রহরী। কেন গো ?

ভদ্রসেন। রাস্তা কোথায় ? এখানে রাজাও দেখি নে রাস্তাও দেখি নে। আমরা বিদেশী, আমাদের রাস্তা বলে দাও।

প্রহরী। কিসের রাস্তা ?

মাধব। ঐ যে শুনেছি আজ অধরা-রাজার দেশে উৎসব হবে। কোন্ দিক দিয়ে যাওয়া যাবে ?

প্রহরী। এখানে সব রাস্তাই রাস্তা। যেদিক দিয়ে যাবে ঠিক পৌঁছোবে। সামনে চলে যাও।

বিরাজদত্ত। শোনো একবার কথা শোনো। বলে, সবই এক রাস্তা। তাই যদি হবে তবে এতগুলোর দরকার ছিল কী ?

মাধব। তা ভাই রাগ করিস কেন ? যে দেশের যেমন ব্যবস্থা। আমাদের দেশে তো রাস্তা নেই বললেই হয়— বাঁকাচোরা গলি, সে তো গোলকধাঁধা। আমাদের রাজা বলে, খোলা রাস্তা না থাকাই ভালো— রাস্তা পেলেই প্রজারা বেরিয়ে চলে যাবে। এদেশে উলটো, যেতেও কেউ ঠেকায় না, আসতেও কেউ মানা করে না— তবু মানুষও তো ঢের দেখছি— এমন খোলা পেলে আমাদের রাজ্য উজাড় হয়ে যেত।

বিরাজদত্ত। ওহে মাধব, তোমার ঐ একটা বড়ো দোষ।

মাধব। কী দোষ দেখলে ?

বিরাজদত্ত। নিজের দেশের তুমি বড়ো নিন্দে কর। খোলা রাস্তাটাই বুঝি ভালো হল ? বলো তো ভাই ভদ্রসেন, খোলা রাস্তাটাকে বলে কিনা ভালো।

ভদ্রসেন। ভাই বিরাজদত্ত, বরাবরই তো দেখে আসছ মাধবের ঐ একরকম ত্যাড়া বুদ্ধি। কোন্‌দিন বিপদে পড়বেন— রাজার কানে যদি যায় তাহলে ম'লে ওকে শ্মশানে ফেলবার লোক পাবেন না।

বিরাজদত্ত। আমাদের তো ভাই এই খোলা রাস্তার দেশে এসে অবধি খেয়ে শুয়ে সুখ নেই— দিনরাত গা-ঘিনঘিন করছে। কে আসছে কে যাচ্ছে তার কোনো ঠিক-ঠিকানাই নেই— রাম রাম।

ভদ্রসেন। সেও তো ঐ মাধবের পরামর্শ শুনেই এসেছি। আমাদের গুষ্টিতে এমন কখনো হয় নি। আমার বাবাকে তো জান— কতবড়ো মহাত্মা লোক ছিল— শাস্ত্রমতে ঠিক উনপঞ্চাশ হাত মেপে গণ্ডি কেটে তার মধ্যেই সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দিলে— এক দিনের জন্যে তার বাইরে পা ফেলে নি। মৃত্যুর পর কথা উঠল ঐ উনপঞ্চাশ হাতের মধ্যেই তো দাহ করতে হয়— সে এক বিষম মুশকিল— শেষকালে শাস্ত্রী বিধান দিলে উনপঞ্চাশে যে দুটো অঙ্ক আছে তার বাইরে যাবার জো নেই ; অতএব ওই চার নয় উনপঞ্চাশকে উলটে নিয়ে নয় চার চুরানব্বই করে দাও— তবেই তো তাকে বাড়ির বাইরে পোড়াতে পারি, নইলে ঘরেই দাহ করতে হত। বাবা, এত আঁটাআঁটি ! এ কি যে-সে দেশ পেয়েছ !

বিরাজদত্ত। বটেই তো, মরতে গেলেও ভাবতে হবে এ কি কম কথা।

ভদ্রসেন। সেই দেশের মাটিতে শরীর, তবু মাধব বলে কিনা, খোলা রাস্তাই ভালো।

[সকলের প্রস্থান

সদলে ঠাকুরদার প্রবেশ

ঠাকুরদা। ওরে দক্ষিনে হাওয়ার সঙ্গে সমান পাল্লা দিতে হবে— হার মানলে চলবে না— আজ সব রাস্তাই গানে ভাসিয়ে দিয়ে চলব।

মেয়ের দলের প্রবেশ

প্রথমা। ঠাকুরদা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, উৎসবটা হচ্ছে কোথায় ?

ঠাকুরদা। যেদিকে চাইবে সেইদিকেই।

প্রথমা। একেই বলে তোমাদের রাজাধিরাজের উৎসব !

ঠাকুরদা। আমরা তো তাই বলি।

দ্বিতীয়া। আমাদের দেশের সব চেয়ে খুদে সামন্তরাজও এর চেয়ে ঘটা করে পথে বেরোয়।

ঠাকুরদা। নিজেকে না চেনাতে পারলে তারা যে বঞ্চিত।

তৃতীয়া। আর তোমরা যে কোন্‌ না-দেখা রাজার কথা বলছ ?

ঠাকুরদা। তাঁকে না চিনতে পারলে আমরাই বঞ্চিত।

প্রথমা। চেনবার উপায়টা কী করেছ ?

ঠাকুরদা। তাঁর সঙ্গে সুর মেলাচ্ছি। এই যে দখিন হাওয়া দিয়েছে, আমের বোল ধরেছে, সমান সুরে সাড়া দিতে পারলে ভিতরে ভিতরে জানাজানি হয়।

দ্বিতীয়া। তোমাদের কর্তারা ঢাকঢোলের বায়না দেন নি বুঝি ? তোমাদের উপরেই সব বরাত ?

ঠাকুরদা। তা নয় তো কী। ভাড়া করে সমারোহ ? তোমরা আমরা আছি কী করতে ? ওরে তোরা ধর-না ভাই গান।

গান

আজি দখিন দুয়ার খোলা—
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।
দিব হৃদয়-দোলায় দোলা,
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।
নব শ্যামল শোভন রথে
এসো বকুল-বিছানো পথে,
এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেণু,
মেখে পিয়াল ফুলের রেণু,
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।
এসো ঘনপল্লবপুঞ্জে
এসো হে, এসো হে, এসো হে।
এসো বনমল্লিকাকুঞ্জে
এসো হে, এসো হে, এসো হে।
মৃদু মধুর মদির হেসে
এসো পাগল হাওয়ার দেশে,
তোমার উতলা উত্তরীয়
তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো,
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো॥

[মেয়েদের প্রস্থান

পুব দুয়ারটা হল। এবার চলো পশ্চিম দুয়ারটার দিকে।

দেশী পথিকদলের প্রবেশ

কৌণ্ডিল্য। ঠাকুরদা, এই প্রাচীন বয়সে ছেলের দলকে নিয়ে মেতে বেড়াচ্ছ যে ?
ঠাকুরদা। নবীনকে ডাক দিতে বেরিয়েছি।
জনার্দন। সেটা কি তোমাকে শোভা পায় ?
ঠাকুরদা। ওরে পাকা পাতাই তো ঝরবার সময় নতুন পাতাকে জাগিয়ে দিয়ে যায়।

গান

আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে
ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে।

কৌণ্ডিল্য। ডাক দিয়েছ সে তো দেখতে পাচ্ছি, পাড়া অস্থির করে তুলেছ। কিন্তু এর দরকার ছিল কি।
ঠাকুরদা। আমারই নবীন বয়সকে ওদের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি— বুড়োটা ঢাকা পড়ে গেল।

গান

তাই তো আমার এই জীবনের বনচ্ছায়ে
ফাগুন আসে ফিরে ফিরে দখিন বায়ে,
নতুন সুরে গান উড়ে যায় আকাশ পারে,
নতুন রঙে ফুল ফোটে তাই ভারে ভারে ॥

কৌণ্ডিল্য। তা তুমি নতুন হয়েই রইলে সে-কথা সত্যি, বুড়ো হবার সময় পেলে না।

ঠাকুরদা। নিজে নতুন না হলে সেই নতুনকে যে পাই নে।

গান

ওগো আমার নিত্য নতুন, দাঁড়াও হেসে
চলব তোমার নিমন্ত্রণে নবীন বেশে।
দিনের শেষে নিবল যখন পথের আলো,
সাগরতীরে যাত্রা আমার যেই ফুরাল,
তোমার বাঁশি বাজে সাঁঝের অন্ধকারে
শূন্যে আমার উঠল তারা সারে সারে ॥

কৌণ্ডিল্য। রাখো দাদা, তোমার গান রাখো। আজকের দিনে একটা কথা মনে বড়ো লাগছে।

ঠাকুরদা। কী বলো দেখি।

কৌণ্ডিল্য। এবার দেশবিদেশের লোক এসেছে, সবাই বলছে সবই দেখেছি ভালো কিন্তু রাজা দেখি নে কেন— কাউকে জবাব দিতে পারি নে। এখানে ঐটে বড়ো একটা ফাঁকা রয়ে গেছে।

ঠাকুরদা। ফাঁকা! আমাদের এই দেশে রাজা এক জায়গায় দেখা দেয় না বলেই তো সমস্ত রাজ্য একেবারে রাজায় ঠাসা হয়ে রয়েছে— তাকে বল ফাঁকা! সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা করে দিয়েছে।

গান

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই
রাজার রাজত্বে।
নইলে মোদের রাজার সনে
মিলব কী স্বত্বে ॥
আমরা যা খুশি তাই করি
তবু তাঁর খুশিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার
ত্রাসের দাসত্বে।
নইলে মোদের রাজার সনে
মিলব কী স্বত্বে।
রাজা সবারে দেন মান
সে মান আপনি ফিরে পান,
মোদের খাটো করে রাখে নি কেউ
কোনো অসত্যে,
নইলে মোদের রাজার সনে
মিলব কী স্বত্বে।

আমরা চলব আপন মতে
শেষে মিলব তাঁরি পথে,
মোরা মরব না কেউ বিফলতার
বিষম আবর্তে।
নইলে মোদের রাজার সনে
মিলব কী স্বত্বে?

কুম্ভ। কিন্তু দাদা, যা বল তাঁকে দেখতে পায় না বলে লোকে অনায়াসে তাঁর নামে যা খুশি বলে, সেইটে অসহ্য হয়।

জনার্দন। এই দেখো-না, আমাকে গাল দিলে শাস্তি আছে কিন্তু রাজাকে গাল দিলে কেউ তার মুখ বন্ধ করবার নেই।

ঠাকুরদা। ওর মানে আছে; প্রজার মধ্যে যে-রাজাটুকু মিশিয়ে আছে তারই গায়ে আঘাত লাগে, তাকে ছাড়িয়ে যিনি তাঁর গায়ে কিছুই বাজে না। সূর্যের যে তেজ প্রদীপে আছে তাতে ফুঁটুকু সয় না, কিন্তু হাজার লোকে মিলে সূর্যে ফুঁ দিলে সূর্য অম্লান হয়েই থাকেন।

[সকলের প্রস্থান

বিদেশীদলের পুনঃপ্রবেশ

বিরাজদত্ত। দেখো ভাই ভদ্রসেন, আসল কথাটা হচ্ছে, এদের মূলেই রাজা নেই। সকলে মিলে একটা গুজব রটিয়ে রেখেছে।

ভদ্রসেন। আমারও তো তাই মনে হয়েছে। সকল দেশেই রাজাকে দেখে দেশসুদ্ধ লোকের আত্মাপুরুষ বাঁশপাতার মতো হীহী করে কাঁপতে থাকে, আর এখানে রাজাকে খুঁজেও মেলে না! কিছু না হোক, মাঝে মাঝে বিনা কারণে এক-একবার যদি চোখ পাকিয়ে বলে, বেটার শির লেও, তা হলেও বুঝি রাজার মতো রাজা আছে বটে।

মাধব। কিন্তু এ-রাজ্যে আগাগোড়া যেমন নিয়ম দেখছি, রাজা না থাকলে তো এমন হয় না।

বিরাজদত্ত। এতকাল রাজার দেশে বাস করে এই বুদ্ধি হল তোমার? নিয়মই যদি থাকবে তা হলে রাজা থাকবার দরকার কী?

মাধব। এই দেখো-না, আজ এত লোক মিলে আনন্দ করছে— রাজা না থাকলে এরা এমন করে মিলতেই পারত না।

বিরাজদত্ত। ওহে মাধব, আসল কথাটাই যে তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ। একটা নিয়ম আছে— সেটা তো দেখছি, উৎসব হচ্ছে সেটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেখানে তো কোনো গোল বাধছে না— কিন্তু রাজা কোথায়, তাকে দেখলে কোথায়, সেইটে বলো।

মাধব। আমার কথাটা হচ্ছে এই যে, তোমরা তো এমন রাজ্য জান যেখানে রাজা কেবল চোখেই দেখা যায় কিন্তু রাজ্যের মধ্যে তার কোনো পরিচয় নেই, সেখানে কেবল ভূতের কীর্তন— কিন্তু এখানে দেখো—

ভদ্রসেন। আবার ঘুরে ফিরে সেই একই কথা! তুমি বিরাজদত্তর আসল কথাটার উত্তর দাও-না হে— হাঁ, কি, না? রাজাকে দেখেছ, কি, দেখ নি?

বিরাজদত্ত। রেখে দাও ভাই ভদ্রসেন, ওর ন্যায়শাস্ত্রটা পর্যন্ত এ-দেশী রকমের হয়ে উঠছে। বিনা চক্ষে ও যখন দেখতে শুরু করেছে তখন আর ভরসা নেই। বিনা অন্নে কিছুদিন ওকে আহার করতে দিলে আবার বুদ্ধিটা সাধারণ লোকের মতো পরিষ্কার হয়ে আসতে পারে।

[সকলের প্রস্থান

বাউলের প্রবেশ

গান

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে।
আছে সে নয়নতারায় আলোকধারায়,
তাই না হারায়,
ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যেদিক পানে ॥
আমি তার মুখের কথা
শুনব বলে গেলাম কোথা,
শোনা হল না, হল না,
আজ ফিরে এসে নিজের দেশে
এই যে শুনি,
শুনি তাহার বাণী আপন গানে ॥
কে তোরা খুঁজিস তারে
কাঙাল-বেশে দ্বারে দ্বারে,
দেখা মেলে না, মেলে না—
ও তোরা আয় রে ধেয়ে দেখ রে চেয়ে
আমার বুকে—
ওরে দেখ্ রে আমার দুই নয়ানে ॥

[প্রস্থান

একদল পদাতিক ও দেশী পথিকের প্রবেশ

প্রথম পদাতিক। সরে যাও সব, সরে যাও। তফাত যাও।

কৌণ্ডিল্য। ইস, তাই তো। মস্ত লোক বটে। লম্বা পা ফেলে চলছেন। কেন রে বাপু, সরব কেন? আমরা সব পথের কুকুর নাকি?

দ্বিতীয় পদাতিক। আমাদের রাজা আসছেন।

জনার্দন। রাজা? কোথাকার রাজা?

প্রথম পদাতিক। আমাদের এই দেশের রাজা।

কুম্ভ। লোকটা পাগল হল নাকি? আমাদের এই অবাক দেশের রাজা পাইক নিয়ে হাঁকতে হাঁকতে আবার রাস্তায় কবে বেরোয়?

দ্বিতীয় পদাতিক। মহারাজ আজ আর গোপন থাকবেন না, তিনি স্বয়ং আজ উৎসব করবেন।

জনার্দন। সত্যি না কি ভাই?

দ্বিতীয় পদাতিক। ঐ দেখো-না নিশেন উড়ছে।

কৌণ্ডিল্য। তাই তো রে, ওটা নিশেনই তো বটে।

দ্বিতীয় পদাতিক। নিশেনে কিংশুক ফুল আঁকা আছে, দেখছ না?

কুম্ভ। ওরে কিংশুক ফুলই তো বটে, মিথ্যে বলে নি— একেবারে টকটক করছে।

প্রথম পদাতিক। তবে! কথাটা যে বড়ো বিশ্বাস হল না!

জনার্দন। না দাদা, আমি তো অবিশ্বাস করি নি। ঐ কুম্ভই গোলমাল করেছিল। আমি একটি কথাও বলি নি।

প্রথম পদাতিক। ওটা বোধ হয় শূন্যকুম্ভ, তাই আওয়াজ বেশি।

দ্বিতীয় পদাতিক। লোকটা কে হে? তোমাদের কে হয়?

কৌণ্ডিল্য। কেউ না, কেউ না। আমাদের গ্রামের যে মোড়ল, ও তার খুড়শ্বশুর— অন্য পাড়ায় বাড়ি।

দ্বিতীয় পদাতিক। হাঁ হাঁ, খুড়শ্বশুর গোছের চেহারা বটে, বুদ্ধিটাও নেহাত খুড়শ্বশুরে ধাঁচার।

কুম্ভ। অনেক দুঃখে বুদ্ধিটা এইরকম হয়েছে। এই যে সেদিন কোথা থেকে এক রাজা বেরোল, নামের গোড়ায় তিনশো পঁয়তাল্লিশটা শ্রী লাগিয়ে ঢাক পিটোতে পিটোতে শহর ঘুরে বেড়াল— আমি তার পিছনে কি কম ফিরেছি? কত ভোগ দিলেম, কত সেবা করলেম, ভিটেমাটি বিকিয়ে যাবার জো হল। শেষকালে তার রাজাগিরি রইল কোথায়? লোকে যখন তার কাছে তালুক চায়, মুলুক চায় সে তখন পাঁজিপুঁথি খুলে শুভদিন কিছুতেই খুঁজে পায় না। কিন্তু আমাদের কাছে খাজনা নেবার বেলায় মঘা অশ্লেষা ত্র্য’স্পর্শ কিছুই তো বাধত না।

দ্বিতীয় পদাতিক। হাঁ হে কুম্ভ, আমাদের রাজাকে তুমি সেই রকম মেকি রাজা বলতে চাও।

কুম্ভ। না বাবা, রাগ কোরো না। আমি নাকে খত দিচ্ছি— যতদূর সরতে বল ততদূরই সরে দাঁড়াব।

দ্বিতীয় পদাতিক। আচ্ছা, বেশ এইখানে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকো। রাজা এলেন বলে— আমরা এগিয়ে গিয়ে রাস্তা ঠিক করে রাখি।

[পদাতিকদের প্রস্থান

জনার্দন। কুম্ভ, তোমার ঐ মুখের দোষেই তুমি মরবে!

কুম্ভ। না ভাই জনার্দন, ও মুখের দোষ নয়, ও কপালের দোষ। যেবারে মিছে রাজা বেরোল একটি কথাও কই নি— অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো নিজের সর্বনাশ করেছি— আর এবার হয়তো-বা সত্যি রাজা বেরিয়েছে, তাই বেফাঁস কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ওটা কপাল।

জনার্দন। আমি এই বুঝি, রাজা সত্যি হোক মিথ্যে হোক, মেনে চলতেই হবে। আমরা কি রাজা চিনি যে বিচার করব। অন্ধকারে ঢেলা মারা— যত বেশি মারবে একটা না একটা লেগে যাবে। আমি তাই একধার থেকে গড় করে যাই— সত্যি হলে লাভ, মিথ্যে হলেই বা লোকসান কী।

কুম্ভ। ঢেলাগুলো নেহাত ঢেলা হলে ভাবনা ছিল না— দামি জিনিস— বাজে খরচ করতে গিয়ে ফতুর হতে হয়।

কৌণ্ডিল্য। ঐ যে আসছেন রাজা। আহা রাজার মতন রাজা বটে। কী চেহারা। যেন ননির পুতুল। কেমন হে কুম্ভ, এখন কী মনে হচ্ছে।

কুম্ভ। দেখাচ্ছে ভালো— কী জানি ভাই, হতে পারে।

কৌণ্ডিল্য। ঠিক যেন রাজাটি গড়ে রেখেছে। ভয় হয়, পাছে রোদ্দুর লাগলে গলে যায়।

রাজবেশধারীর প্রবেশ

সকলে। জয় মহারাজের জয়।

জনার্দন। দর্শনের জন্য সকাল থেকে দাঁড়িয়ে। দয়া রাখবেন।

কুম্ভ। বড়ো ধাঁধা ঠেকছে, ঠাকুরদাকে ডেকে আনি।

[সকলের প্রস্থান

বিদেশী পথিকদলের প্রবেশ

মাধব। ওরে রাজা রে রাজা। দেখবি আয়।

বিরাজদত্ত। মনে রেখো রাজা, আমি কুশলীবস্তুর উদয়দত্তর নাতি। আমার নাম বিরাজদত্ত। রাজা বেরিয়েছে শুনেই ছুটেছি, লোকের কারো কথায় কান দিই নি— আমি সক্কলের আগে তোমাকে মেনেছি।

ভদ্রসেন। শোনো একবার, আমি যে ভোর থেকে এখানে দাঁড়িয়ে— তখনো কাক ডাকে নি— এতক্ষণ ছিলে কোথায়? রাজা, আমি বিক্রমস্থলীর ভদ্রসেন— ভক্তকে স্মরণ রেখো।

রাজবেশী। তোমাদের ভক্তিতে বড়ো প্রীত হলেম।

বিরাজদত্ত। মহারাজ, আমাদের অভাব বিস্তর— এতদিন দর্শন পাই নি, জানাব কাকে?

রাজবেশী। তোমাদের সমস্ত অভাব মিটিয়ে দেব।

[রাজবেশীর প্রস্থান

দেশী পথিকদের প্রবেশ

কৌণ্ডিল্য। ওরে পিছিয়ে থাকলে চলবে না— ভিড়ে মিশে গেলে রাজার চোখে পড়ব না।

বিরাজদত্ত। দেখ্ দেখ্ একবার নরোত্তমের কাণ্ডখানা দেখ্! আমরা এত লোক আছি, সবাইকে ঠেলেঠুলে কোথা থেকে এক তালপাতার পাখা নিয়ে রাজাকে বাতাস করতে লেগে গেছে।

কৌণ্ডিল্য। তাই তো হে, লোকটার আস্পর্ধা তো কম নয়।

মাধব। ওকে জোর করে ধরে সরিয়ে দিতে হচ্ছে— ও কি রাজার পাশে দাঁড়াবার যুগ্যি!

কৌণ্ডিল্য। ওহে রাজা কি আর এটুকু বুঝবে না? এ যে অতিভক্তি।

বিরাজদত্ত। না হে না— রাজাদের যদি মগজই থাকবে তা হলে মুকুট থাকবার দরকার কী! ঐ তালপাখার হাওয়া খেয়েই ভুলবে।

[সকলের প্রস্থান

ঠাকুরদাকে লইয়া কুম্ভের প্রবেশ

কুম্ভ। এখনই এই রাস্তা দিয়েই যে গেল।

ঠাকুরদা। রাস্তা দিয়ে গেলেই রাজা হয় নাকি রে।

কুম্ভ। দাদা, একেবারে স্পষ্ট চোখে দেখা গেল— একজন না দুজন না, রাস্তার দুধারের লোক তাকে দেখে নিয়েছে।

ঠাকুরদা। সেইজন্যেই তো সন্দেহ। কবে আমার রাজা রাস্তার লোকের চোখ ধাঁধিয়ে বেড়ায়!

কুম্ভ। তা আজকে যদি মর্জি হয়ে থাকে, বলা যায় কী।

ঠাকুরদা। বলা যায় রে বলা যায়— আমার রাজার মর্জি বরাবর ঠিক আছে— ঘড়ি-ঘড়ি বদলায় না।

কুম্ভ। কিন্তু কী বলব দাদা— একেবারে ননির পুতুলটি। ইচ্ছে করে সর্বাঙ্গ দিয়ে তাকে ছায়া ক'রে রাখি।

ঠাকুরদা। তোর এমন বুদ্ধি কবে হল? আমার রাজা ননির পুতুল, আর তুই তাকে ছায়া করে রাখবি।

কুম্ভ। যা বল দাদা, দেখতে বড়ো সুন্দর— আজ তো এত লোক জুটেছে অমনটি কাউকে দেখলুম না।

ঠাকুরদা। আমার রাজা তোদের চোখেই পড়ত না।

কুম্ভ। ধ্বজা দেখতে পেলুম যে গা। লোকে যে বলে, এই উৎসবে রাজা বেরিয়েছে।

ঠাকুরদা। বেরিয়েছে বৈকি। কিন্তু সঙ্গে পাইক নেই, বাদ্যি নেই।

কুম্ভ। কেউ বুঝি ধরতেই পারে না?

ঠাকুরদা। হয়তো কেউ কেউ পারে।

কুম্ভ। যে পারে সে বোধ হয় যা চায় তাই পায়?

ঠাকুরদা। সে কিচ্ছু চায় না। ভিক্ষুকের কর্ম নয় রাজাকে চেনা। ছোটো ভিক্ষুক বড়ো ভিক্ষুককেই রাজা বলে মনে করে বসে।

[সকলের প্রস্থান

রাজা বিজয়বর্মা, বিক্রমবাহু ও বসুসেনের প্রবেশ

বসুসেন। এই উৎসবের রাজা কি আমাদেরও দেখা দেবে না?

বিক্রম। এর রাজত্ব করবার প্রণালী কী রকম? রাজার বনে উৎসব, সেখানেও সাধারণ লোকের কারো কোনো বাধা নেই?

বিজয়। আমাদের জন্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জায়গা তৈরি করে রাখা উচিত ছিল।

বিক্রম। জোর করে নিজেরা তৈরি করে নেব।

বিজয়। এই-সব দেখেই সন্দেহ হয়, এখানে রাজা নেই, একটা ফাঁকি চলে আসছে।

বিক্রম। কিন্তু কান্তিকরাজকন্যা সুদর্শনা তো দৃষ্টিগোচর।

বিজয়। তাঁকে দেখা চাই। যিনি দেখা দেন না তাঁর জন্যে আমার ঔৎসুক্য নেই, কিন্তু যিনি দেখবার যোগ্য তাঁকে না দেখে ফিরে গেলে ঠকতে হবে।

বিক্রম। একটা ফন্দি দেখাই যাক-না।

বসুসেন। ফন্দি জিনিসটা খুব ভালো, যদি তার মধ্যে নিজে আটকা না পড়া যায়।

বিক্রম। এদিকে এরা কারা আসছে? সঙ না কি? রাজা সেজেছে!

বিজয়। এ তামাশা এখানকার রাজা সইতে পারে কিন্তু আমরা সইব না তো।

বসুসেন। কোথাকার গ্রাম্যরাজা হতেও পারে।

পদাতিকগণের প্রবেশ

বিক্রম। তোমাদের রাজা কোথাকার?

প্রথম পদাতিক। এই দেশের। তিনি আজ উৎসব করতে বেরিয়েছেন।

[পদাতিকগণের প্রস্থান

বিজয়। এ কী কথা! এখানকার রাজা বেরিয়েছে!

বসুসেন। তাই তো। তা হলে এঁকেই দেখে ফিরতে হবে! অন্য দর্শনীয়টা?

বিক্রম। শোনো কেন? এখানে রাজা নেই বলেই যে-খুশি নির্ভাবনায় আপনাকে রাজা বলে পরিচয় দেয়। দেখছ-না যেন সেজে এসেছে— অত্যন্ত বেশি সাজ।

বসুসেন। কিন্তু লোকটাকে দেখাচ্ছে ভালো, চোখ ভোলাবার মতো চেহারাটা আছে।

বিক্রম। চোখ ভুলতে পারে কিন্তু ভালো করে তাকালেই ভুল থাকে না। আমি তোমাদের সামনেই ওর ফাঁকি ধরে দিচ্ছি।

রাজবেশী সুবর্ণের প্রবেশ

সুবর্ণ। রাজগণ, স্বাগত। এখানে তোমাদের অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি হয় নি তো?

রাজগণ। (কপট বিনয়ে নমস্কার করিয়া) কিছু না।

বিক্রম। যে অভাব ছিল তা মহারাজের দর্শনেই পূর্ণ হয়েছে।

সুবর্ণ। আমি সাধারণের দর্শনীয় নই কিন্তু তোমরা আমার অনুগত, এইজন্যই একবার দেখা দিতে এলুম।

বিক্রম। অনুগ্রহের এত আতিশয্য সহ্য করা কঠিন।

সুবর্ণ। আমি অধিকক্ষণ থাকব না।

বিক্রম। সেটা অনুভবেই বুঝেছি— বেশিক্ষণ স্থায়ী হবার ভাব দেখছি নে।

সুবর্ণ। ইতিমধ্যে যদি কোনো প্রার্থনা থাকে—

বিক্রম। আছে বৈকি। কিন্তু অনুচরদের সামনে জানাতে লজ্জা বোধ করি।

সুবর্ণ। (অনুবর্তীদের প্রতি) ক্ষণকালের জন্য তোমরা দূরে যাও— (রাজগণের প্রতি) এইবার তোমাদের প্রার্থনা অসংকোচে জানাতে পারো।

বিক্রম। অসংকোচেই জানাব— তোমারও যেন লেশমাত্র সংকোচ না হয়।

সুবর্ণ। না, সে আশঙ্কা কোরো না।

বিক্রম। এসো তবে— মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আমাদের প্রত্যেককে প্রণাম করো।

সুবর্ণ। বোধ হচ্ছে আমার ভৃত্যগণ বারুণী মদ্যটা রাজশিবিরে কিছু মুক্তহস্তেই বিতরণ করেছে।

বিক্রম। ভণ্ডরাজ, মদ যাকে বলে সেটা তোমার ভাগ্যেই অতিমাত্রায় পড়েছে, সেইজন্যেই এখন ধুলোয় লোটাবার অবস্থা হয়েছে।

সুবর্ণ। রাজগণ, পরিহাসটা রাজোচিত নয়।

বিক্রম। পরিহাসের অধিকার যাদের আছে তারা নিকটেই প্রস্তুত। সেনাপতি!

সুবর্ণ। আর প্রয়োজন নেই। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি আপনারা আমার প্রণম্য। মাথা আপনি নত হচ্ছে, কোনো তীক্ষ্ণ উপায়ে তাকে ধুলায় টানবার দরকার হবে না। আপনারা যখন আমাকে চিনেছেন তখন আমিও আপনাদের চিনে নিলুম। অতএব এই আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। যদি দয়া করে পালাতে অনুমতি দেন তা হলে বিলম্ব করব না।

বিক্রম। পালাবে কেন? তোমাকেই আমরা এখানকার রাজা করে দিচ্ছি— পরিহাসটা শেষ করেই যাওয়া যাক। দলবল কিছু আছে?

সুবর্ণ। আছে। আরম্ভে যখন আমার দল বেশি ছিল না, তখন সবাই সন্দেহ করছিল— লোক যত বেড়ে গেল, সন্দেহ ততই দূর হল। এখন ভিড়ের লোক নিজেদের ভিড় দেখেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, আমাকে কোনো কষ্ট পেতে হচ্ছে না।

বিক্রম। বেশ কথা। এখন থেকে আমরা তোমায় সাহায্য করব। কিন্তু তোমাকে আমাদেরও একটা কাজ করে দিতে হবে।

সুবর্ণ। আপনাদের দত্ত আদেশ এবং মুকুট আমি মাথায় করে রাখব।

বিক্রম। আর কিছু চাই নে, রাজকুমারী সুদর্শনাকে দেখতে চাই— সেইটে তোমাকে করে দিতে হবে।

সুবর্ণ। যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

বিক্রম। তোমার সাধ্যের উপর ভরসা নেই, আমাদের বুদ্ধিমত চলতে হবে। আমার পরামর্শ শোনো, ভুল কোরো না।

সুবর্ণ। ভুল হবে না।

বিক্রম। করভোদ্যানের মধ্যেই রাজকুমারী সুদর্শনার প্রাসাদ।

সুবর্ণ। হাঁ মহারাজ।

বিক্রম। সেই উদ্যানে আগুন লাগাবে। তার পর অগ্নিদাহের গোলমালে কাজ সিদ্ধ করব।

সুবর্ণ। অন্যথা হবে না।

বিক্রম। দেখো হে ভণ্ডরাজ, আমরা মিথ্যা সাবধান হচ্ছি, এদেশে রাজা নেই।

সুবর্ণ। আমি সেই অরাজকতা দূর করতে বেরিয়েছি, সাধারণের জন্যে সত্য হোক মিথ্যা হোক, একটা রাজা খাড়া করা চাই; নইলে অনিষ্ট ঘটে। একটা কথা বুঝতে পারছি নে মহারাজ।

বিক্রম। আমার অনেক কথাই তুমি বুঝতে পারবে না। তবু বলো, শুনি।

সুবর্ণ। রাজকুমারীর পিতা-মহারাজের কাছে দূত পাঠিয়ে কন্যাকে যথারীতি প্রার্থনা করুন-না।

বিক্রম। সে তো সকলেই করে থাকে। আমি তো সকলের দলে নই। আগুন করবে আমার ঘটকালি, আমি বিপদ ঘটিয়ে বিপদের পারে যাব।

সুবর্ণ। আপনি তো পারে যাবেন মহারাজ, আমি সামান্য লোক, পার পর্যন্ত না পৌঁছোতেও পারি।

বিক্রম। অসম্ভব নয়। কিন্তু তাতে কী আসে যায়। সামান্য লোক কাজে লাগবে এই যথেষ্ট, তার পরে থাকবে কি না-থাকবে সেটা ভাববার কথাই নয়।— চলো আর বিলম্ব কোরো না।

বিজয়। দেখো দেখো, সেই লোকটা আবার একদল লোক নিয়ে আসছে।

বসুসেন। ও যেন উৎসবের খেয়া পার করছে ; নতুন নতুন দলকে দ্বারের কাছ পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছে।

সদলে ঠাকুরদার প্রবেশ

বিজয়। কী হে, তুমি যে কখন কোথা দিয়ে ঘুরে আসছ, তার ঠিকানা পাবার জো নেই।

ঠাকুরদা। আমরা নটরাজের চেলা, তিনি ঘুরছেন আর ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছেন। কোথাও দাঁড়িয়ে থাকবার জো কী— শিঙা যে বেজে উঠছে।

নৃত্য ও গীত

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ ॥
হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ,
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ ॥

[প্রস্থান

বসুসেন। লোকটার মধ্যে কিছু কৌতুক আছে।

বিক্রম। কিন্তু এ-সব লোকের কৌতুকে যোগ দেওয়া কিছু নয়— প্রশ্রয় দেওয়া হয়— চলো সরে যাই।

[রাজাদের প্রস্থান

৩

কুঞ্জ-বাতায়ন

সুরঙ্গমার গান

বাহিরে ভুল হানবে যখন
অন্তরে ভুল ভাঙবে কি ?
বিষাদ-বিষে জ্বলে শেষে
তোমার প্রসাদ মাঙবে কি ?
রৌদ্রদাহ হলে সারা
নামবে কি ওর বর্ষাধারা ?
লাজের রাঙা মিটলে, হৃদয়
প্রেমের রঙে রাঙবে কি ?

যতই যাবে দূরের পানে
বাঁধন ততই কঠিন হয়ে
টানবে না কি ব্যথার টানে ?
অভিমানের কালো মেঘে
বাদল হাওয়া লাগবে বেগে,
নয়নজলের আবেগ তখন
কোনোই বাধা মানবে কি ?

সুদর্শনার প্রবেশ

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, ভুল তোরা করতে পারিস, কিন্তু আমার কখনোই ভুল হতে পারে না— আমি হব রানী। ঐ তো আমার রাজাই বটে।

সুরঙ্গমা। কাকে তুমি রাজা বলছ ?

সুদর্শনা। ঐ যার মাথায় ফুলের ছাতা ধরে আছে।

সুরঙ্গমা। ঐ যাঁর পতাকায় কিংশুক আঁকা ?

সুদর্শনা। আমি তো দেখবামাত্রই চিনেছি, তোর মনে কেন সন্দেহ আসছে।

সুরঙ্গমা। ও তোমার রাজা নয়। আমি যে ওকে চিনি।

সুদর্শনা। ও কে ?

সুরঙ্গমা। ও সুবর্ণ। ও জুয়ো খেলে বেড়ায়।

সুদর্শনা। মিথ্যে কথা বলিস নে। সবাই ওকে রাজা বলছে। তুই বুঝি সকলের চেয়ে বেশি জানিস।

সুরঙ্গমা। ও যে সবাইকে মিথ্যে লোভ দেখাচ্ছে, সেইজন্যে সবাই ওর বশ হয়েছে। যখন ভুল ভাঙবে তখন হায় হায় করে মরবে।

সুদর্শনা। তোর বড়ো অহংকার হয়েছে। তুই আমার চেয়ে চিনিস ?

সুরঙ্গমা। যদি আমার অহংকার থাকত, তা হলে আমি চিনতে পারতুম না।

সুদর্শনা। আমি ওকেই মালা পাঠিয়ে দিয়েছি।

সুরঙ্গমা। সে মালা সাপ হয়ে তোমাকে এসে দংশন করবে।

সুদর্শনা। আমাকে অভিসম্পাত ? তোর তো আস্পর্ধা কম নয় ! যা এখান থেকে চলে, আমি তোর মুখ দেখব না।

[সুরঙ্গমার প্রস্থান

আমার মন আজ এমনই চঞ্চল হয়েছে ! এমন তো কোনোদিন হয় না। সুরঙ্গমা !

সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুদর্শনা। আমার মালা কি ভুল পথেই গেছে ?

সুরঙ্গমা। হাঁ।

সুদর্শনা। আবার সেই একই কথা ? আচ্ছা বেশ, ভুল করেছি, বেশ করেছি। তিনি কেন নিজে দেখা দিয়ে ভুল ভাঙিয়ে দেন না ? কিন্তু তোর কথা মানব না। যা আমার কাছ থেকে— মিছিমিছি আমার মনে ধাঁধা লাগিয়ে দিস নে।

[সুরঙ্গমার প্রস্থান

ভগবান চন্দ্রমা, আজ আমার চঞ্চলতার উপরে তুমি কেবলই কটাক্ষপাত করছ। স্মিত কৌতুকে সমস্ত আকাশ ভরে গেল যে ! প্রতিহারী !

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। কী রাজকুমারী ?

সুদর্শনা। ঐ যে আম্রবনবীথিকায় উৎসববালকেরা গান গেয়ে যাচ্ছে, ডাক্ ডাক্, ওদের ডেকে নিয়ে আয়। একটু গান শুনি।

[প্রতিহারীর প্রস্থান

বালকগণের প্রবেশ

এসো এসো সব মূর্তিমান কিশোর বসন্ত, ধরো তোমাদের গান। আমার সমস্ত দেহমন গান গাইছে, কণ্ঠে আসছে না। আমার হয়ে তোমরা গাও।

বালকগণের গান

কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে
আজ ফাগুনদিনের সকালে।
তার বর্ণে তোমার নামের রেখা,
গন্ধে তোমার ছন্দ লেখা,
সেই মালাটি বেঁধেছি মোর কপালে
আজ ফাগুনদিনের সকালে ॥
গানটি তোমার চলে এল আকাশে
আজ ফাগুন দিনের বাতাসে।
ওগো আমার নামটি তোমার সুরে
কেমন করে দিলে জুড়ে,
লুকিয়ে তুমি ওই গানেরি আড়ালে,
আজ ফাগুনদিনের সকালে ॥

সুদর্শনা। হয়েছে, হয়েছে, আর না। তোমাদের এই গান শুনে চোখে জল ভরে আসছে— আমার মনে হচ্ছে যা পাবার জিনিস তাকে হাতে পাবার জো নেই— তাকে হাতে পাবার দরকার নেই।

[প্রণাম করিয়া বালকগণের প্রস্থান

কুঞ্জদ্বার

ঠাকুরদা ও দেশী পথিকদের প্রবেশ

ঠাকুরদা। কী ভাই, হল তোমাদের ?

কৌণ্ডিল্য। খুব হল ঠাকুরদা। এই দেখো-না একেবারে লালে লাল করে দিয়েছে। কেউ বাকি নেই।

ঠাকুরদা। বলিস কী ? রাজাগুলোকে সুদ্ধ রাঙিয়েছে না কি ?

জনার্দন। ওরে বাস রে ! কাছে ঘেঁষে কে ! তারা সব বেড়ার মধ্যে খাড়া হয়ে রইল।

ঠাকুরদা। হায় হায়, বড়ো ফাঁকিতে পড়েছে। একটুও রঙ ধরাতে পারলি নে ? জোর করে ঢুকে পড়তে হয়।

কুম্ভ। ও দাদা, তাদের রাঙা, সে আর-এক রঙের। তাদের চক্ষু রাঙা, তাদের পাইকগুলোর পাগড়ি রাঙা, তার উপরে খোলা তলোয়ারের যে রকম দেখলুম একটু কাছে ঘেঁষলেই একেবারে চরম রাঙা রাঙিয়ে দিত।

ঠাকুরদা। বেশ করেছিস ঘেঁষিস নি। পৃথিবীতে ওদের নির্বাসনদণ্ড— ওদের তফাতে রেখে চলতেই হবে।

বাউলের প্রবেশ ও গান

যা ছিল কালো ধলো
তোমার রঙে রঙে রাঙা হল।
যেমন রাঙাবরন তোমার চরণ
তার সনে আর ভেদ না র'ল।
রাঙা হল বসন ভূষণ,
রাঙা হল শয়ন স্বপন,
মন হল কেমন দেখ্ রে, যেমন
রাঙা কমল টলোমলো!

ঠাকুরদা। বেশ ভাই, বেশ— খুব খেলা জমেছিল?

বাউল। খুব খুব। সব লালে লাল। কেবল আকাশের চাঁদটাই ফাঁকি দিয়েছে— সাদাই রয়ে গেল।

ঠাকুরদা। বাইরে থেকে দেখাচ্ছে যেন বড়ো ভালোমানুষ। ওর সাদা চাদরটা খুলে দেখতিস যদি তা হলে ওর বিদ্যে ধরা পড়ত। চুপি চুপি ও যে আজ কত রঙ ছড়িয়েছে এখানে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। অথচ ও নিজে কি এমনি সাদাই থেকে যাবে?

গান

আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা
প্রিয় আমার ওগো প্রিয়।
বড়ো উতলা আজ পরান আমার
খেলাতে হার মানবে কি ও?
কেবল তুমিই কি গো এমনি ভাবে
রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে?
তুমি সাধ করে নাথ ধরা দিয়ে
আমারও রঙ বক্ষে নিয়ো—
এই হৃৎকমলের রাঙা রেণু
রাঙাবে ওই উত্তরীয়।

[সকলের প্রস্থান

সুবর্ণ ও রাজা বিক্রমবাহুর প্রবেশ

সুবর্ণ। এ কী কাণ্ড করেছ রাজা বিক্রমবাহু?

বিক্রম। আমি কেবল এই প্রাসাদের কাছটাতেই আগুন ধরাতে চেয়েছিলুম, সে আগুন যে এত শীঘ্র এমন চারি দিক ধরে উঠবে সে আমি মনেও করি নি। এ বাগান থেকে বেরোবার পথ কোথায় শীঘ্র বলে দাও।

সুবর্ণ। পথ কোথায় আমি তো কিছুই জানি নে। যারা আমাদের এখানে এনেছিল তাদের একজনকেও দেখছি নে।

বিক্রম। তুমি তো এদেশেরই লোক— পথ নিশ্চয় জান।

সুবর্ণ। অন্তঃপুরের বাগানে কোনোদিনই প্রবেশ করি নি।

বিক্রম। সে আমি বুঝি নে, তোমাকে পথ বলতেই হবে, নইলে তোমাকে দু-টুকরো করে কেটে ফেলব।

সুবর্ণ। তাতে প্রাণ বেরোবে, পথ বেরোবার কোনো উপায় হবে না।

বিক্রম। তবে কেন বলে বেড়াচ্ছিলে তুমিই এখানকার রাজা ?

সুবর্ণ। আমি রাজা না, রাজা না। (মাটিতে পড়িয়া জোড়করে) কোথায় আমার রাজা, রক্ষা করো। আমি পাপিষ্ঠ, আমাকে রক্ষা করো। আমি বিদ্রোহী, আমাকে দণ্ড দাও, কিন্তু রক্ষা করো।

বিক্রম। অমন শূন্যতার কাছে চীৎকার করে লাভ কী ? ততক্ষণ পথ বের করবার চেষ্টা করা যাক।

সুবর্ণ। আমি এইখানেই পড়ে রইলুম— আমার যা হবার তাই হবে।

বিক্রম। সে হবে না। পুড়ে মরি তো একলা মরব না— তোমাকে সঙ্গী নেব।

নেপথ্য হইতে। রক্ষা করো, রক্ষা করো ! চারি দিকে আগুন !

বিক্রম। মূঢ়, ওঠো, আর দেরি না।

সুদর্শনার প্রবেশ

সুদর্শনা। রাজা, রক্ষা করো ; আগুনে ঘিরেছে।

সুবর্ণ। কোথায় রাজা ? আমি রাজা নই।

সুদর্শনা। তুমি রাজা নও ?

সুবর্ণ। আমি ভণ্ড, আমি পাষণ্ড ! (মুকুট মাটিতে ফেলিয়া) আমার ছলনা ধূলিসাৎ হোক।

[রাজা বিক্রমের সহিত প্রস্থান

সুদর্শনা। রাজা নয় ? এ রাজা নয় ? তবে ভগবান হুতাশন, দগ্ধ করো আমাকে ; আমি তোমারই হাতে আত্মসমর্পণ করব।

নেপথ্যে। ও দিকে কোথায় যাও। তোমার অন্তঃপুরের চারি দিকে আগুন ধরে গেছে, ওর মধ্যে প্রবেশ কোরো না।

সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুরঙ্গমা। এসো।

সুদর্শনা। কোথায় যাব ?

সুরঙ্গমা। ঐ আগুনের ভিতর দিয়েই চলো।

সুদর্শনা। সে কী কথা ?

সুরঙ্গমা। আগুনকে বিশ্বাস করো, যাকে বিশ্বাস করেছিলে, এ তার চেয়ে ভালো।

সুদর্শনা। রাজা কোথায় ?

সুরঙ্গমা। রাজাই আছেন ঐ আগুনের মধ্যে। তিনি সোনাকে পুড়িয়ে নেবেন।

সুদর্শনা। সত্যি বলছিস ?

সুরঙ্গমা। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, আগুনের ভিতরকার রাস্তা জানি।

[উভয়ের প্রস্থান

গানের দলের প্রবেশ

গান

আগুনে হল আগুনময়।
জয় আগুনের জয়।
মিথ্যা যত হৃদয় জুড়ে
এইবেলা সব যাক-না পুড়ে,
মরণ-মাঝে তোর জীবনের হোক রে পরিচয় ॥

আগুন এবার চলল রে সন্ধানে
কলঙ্ক তোর লুকিয়ে কোথায় প্রাণে।
আড়াল তোমার যাক-না ঘুচে,
লজ্জা তোমার যাক রে মুছে,
চিরদিনের মতো তোমার ছাই হয়ে যাক ভয় ॥

[গানের দলের প্রস্থান

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার পুনঃপ্রবেশ

সুরঙ্গমা। ভয় নেই, তোমার ভয় নেই।

সুদর্শনা। ভয় আমার নেই— কিন্তু লজ্জা! লজ্জা যে আগুনের মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। আমার মুখ চোখ, আমার সমস্ত হৃদয়টাকে রাঙা করে রেখেছে।

সুরঙ্গমা। এ দাহ মিটতে সময় লাগবে।

সুদর্শনা। কোনোদিন মিটবে না, কোনোদিন মিটবে না।

সুরঙ্গমা। হতাশ হোয়ো না। তোমার সাধ তো মিটেছে, আগুনের মধ্যেই তো আজ দেখে নিলে।

সুদর্শনা। আমি কি এমন সর্বনাশের মধ্যে দেখতে চেয়েছিলুম? কী দেখলুম জানি নে, কিন্তু বুকের মধ্যে এখনো কাঁপছে।

সুরঙ্গমা। কেমন দেখলে?

সুদর্শনা। ভয়ানক, সে ভয়ানক। সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়। কালো, কালো। আমার মনে হল ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো কালো— ঝড়ের মেঘের মতো কালো— কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো।

[প্রস্থান

সুরঙ্গমা। যে কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে সেই কালোতেই এক দিন তোমার হৃদয় স্নিগ্ধ হয়ে যাবে। নইলে ভালোবাসা কিসের?

গান

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না,
ভালোবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো
গান দিয়ে দ্বার খোলাব ॥
ভরাব না ভূষণভারে,
সাজাব না ফুলের হারে,
প্রেমকে আমার মালা করে
গলায় তোমার দোলাব ॥
জানবে না কেউ কোন্ তুফানে
তরঙ্গদল নাচবে প্রাণে,
চাঁদের মতো অলখ টানে
জোয়ারে ঢেউ তোলাব ॥

সুদর্শনার পুনঃপ্রবেশ

সুদর্শনা। কিন্তু কেন সে আমাকে জোর করে পথ আটকায় না? কেশের গুচ্ছ ধরে কেন সে আমাকে টেনে রেখে দেয় না? আমাকে কিছু সে বলছে না, সেইজন্যেই আরো অসহ্য বোধ হচ্ছে।

সুরঙ্গমা। রাজা কিছু বলছে না, কে তোমাকে বললে?

সুদর্শনা। অমন করে নয়, চীৎকার করে বজ্রগর্জনে— আমার কান থেকে অন্য সকল কথা ডুবিয়ে দিয়ে। রাজা আমাকে এত সহজে ছেড়ে দিয়ো না, যেতে দিয়ো না।

সুরঙ্গমা। ছেড়ে দেবেন, কিন্তু যেতে দেবেন কেন ?

সুদর্শনা। যেতে দেবেন না ? আমি যাবই।

সুরঙ্গমা। আচ্ছা যাও।

সুদর্শনা। আমার দোষ নেই। আমাকে জোর করে তিনি ধরে রাখতে পারতেন কিন্তু রাখলেন না। আমাকে বাঁধলেন না— আমি চললুম। এইবার তাঁর প্রহরীদের হুকুম দিন, আমাকে ঠেকাক।

সুরঙ্গমা। কেউ ঠেকাবে না। ঝড়ের মুখে ছিন্ন মেঘ যেমন অবাধে চলে তেমনি তুমি অবাধে চলে যাও।

সুদর্শনা। ক্রমেই বেগ বেড়ে উঠছে— এবার নোঙর ছিঁড়ল। হয়তো ডুবব কিন্তু আর ফিরব না।

[দ্রুত প্রস্থান

৪

রাজপথ

নাগরিকদলের প্রবেশ

প্রথম। এটি ঘটালেন আমাদের রাজকন্যা সুদর্শনা।

দ্বিতীয়। সকল সর্বনাশের মূলেই স্ত্রীলোক আছে। বেদেই তো আছে— কী আছে বলো-না হে বটুকেশ্বর— তুমি বামুনের ছেলে।

তৃতীয়। আছে, আছে বৈকি। বেদে যা খুঁজবে তাই পাওয়া যাবে— অষ্টাবক্র বলেছেন, নারীণাঞ্চ নখিনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণিনাং— অর্থাৎ কিনা—

দ্বিতীয়। আরে, বুঝেছি বুঝেছি— আমি থাকি তর্করত্নপাড়ায়— অনুস্বার-বিসর্গের একটা ফোঁটা আমার কাছে এড়াবার জো নেই।

প্রথম। আমাদের এ হল যেন কলির রামায়ণ। কোথা থেকে ঘরে ঢুকে পড়ল দশমুণ্ড রাবণ, আচমকা লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিল।

তৃতীয়। যুদ্ধের হাওয়া তো চলছে, এ দিকে রাজকন্যা যে কোথায় অদর্শন হয়েছেন কেউ খোঁজ পায় না। মহারাজ তো বন্দী, এ দিকে কে যে লড়াই চালাচ্ছে তারও কোনো ঠিকানা নেই।

দ্বিতীয়। কিন্তু আমি ভাবছি, এখন আমাদের উপায় কী ? আমাদের ছিল এক রাজা, এখন সাতটা হতে চলল, বেদে পুরাণে কোথাও তো এর তুলনা মেলে না।

প্রথম। মেলে বৈকি— পঞ্চপাণ্ডবের কথা ভেবে দেখো।

তৃতীয়। আরে সে হল পঞ্চপতি—

প্রথম। একই কথা। তারা হল পতি, এরা হল নৃপতি। কোনোটারই বাড়াবাড়ি সুবিধে নয়।

তৃতীয়। আমাদের পাঁচকড়ি একেবারে বেদব্যাস হয়ে উঠল হে— রামায়ণ মহাভারত ছাড়া কথাই কয় না।

দ্বিতীয়। তোরা তো রামায়ণ মহাভারত নিয়ে পথের মধ্যে আসর জমিয়েছিস, এ দিকে আমাদের নিজের কুরুক্ষেত্রে কী ঘটছে খবর কেউ রাখিস নে।

প্রথম। ওরে বাবা— সেখানে যাবে কে ? খবর যখন আসবে তখন ঘাড়ের উপর এসে আপনি পড়বে— জানতে বাকি থাকবে না।

দ্বিতীয়। ভয় কিসের রে ?

প্রথম। তা তো সত্যি। তুমি যাও-না।

তৃতীয়। আচ্ছা, চলো-না ধনঞ্জয়ের ওখানে। সে সব খবর জানে।

দ্বিতীয়। না জানলেও বানিয়ে দিতে জানে। [সকলের প্রস্থান

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুদর্শনা। একদিন আমাকে সকলে সৌভাগ্যবতী বলত, আমি যেখানে যেতুম সেখানেই ঐশ্বর্যের আলো জ্বলে উঠত। আজ আমি এ কী অকল্যাণ সঙ্গে করে এনেছি। তাই আমি ঘর ছেড়ে পথে এলুম।

সুরঙ্গমা। মা, যতক্ষণ না সেই রাজার ঘরে পৌঁছোবে ততক্ষণ তো পথই বন্ধু।

সুদর্শনা। চুপ কর, চুপ কর, তার কথা আর বলিস নে।

সুরঙ্গমা। তুমি যে তাঁর কাছেই ফিরে যাচ্ছ।

সুদর্শনা। কখনোই না।

সুরঙ্গমা। কার উপরে রাগ করছ মা!

সুদর্শনা। আমি তার নাম করতেও চাই নে।

সুরঙ্গমা। আচ্ছা, নাম কোরো না, তাঁর সবুর সইবে।

সুদর্শনা। আমি পথে বেরোলুম, সঙ্গে সে এল না!

সুরঙ্গমা। সমস্ত পথ জুড়ে আছেন তিনি।

সুদর্শনা। একবার বারণও করলে না? চুপ করে রইলি যে? বল্-না, তোর রাজার এ কী রকম ব্যবহার!

সুরঙ্গমা। সে তো সবাই জানে, আমার রাজা নিষ্ঠুর। তাঁকে কি কেউ কোনোদিন টলাতে পারে?

সুদর্শনা। তবে তুই এমন দিনরাত ডাকিস কেন?

সুরঙ্গমা। সে যেন এমনি পর্বতের মতোই চিরদিন কঠিন থাকে। আমার দুঃখ আমার থাক, সেই কঠিনেরই জয় হোক।

[সুদর্শনার প্রস্থান

সুরঙ্গমার গান

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর
তোমার প্রেম তোমারে এমন করে
করেছে নিষ্ঠুর।
তুমি বসে থাকতে দেবে না যে,
দিবানিশি তাই তো বাজে
পরান মাঝে এমন কঠিন সুর॥
ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার লাগি দুঃখ আমার
হয় যেন মধুর।
তোমার খোঁজা খোঁজায় মোরে,
তোমার বেদন কাঁদায় ওরে,
আরাম যত করে কোথায় দূর॥

[সুরঙ্গমার প্রস্থান

রাজা বিক্রম ও সুবর্ণের প্রবেশ

বিক্রম। কে যে বললে সুদর্শনা এই পথ দিয়ে পালিয়েছে। যুদ্ধে তার বাপকে বন্দী করা মিথ্যে হবে যদি সে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়।

সুবর্ণ। পালিয়ে যদি গিয়ে থাকে, তা হলে তো বিপদ কেটে গেছে। এখন ক্ষান্ত হোন।

বিক্রম। কেন বলো তো?

সুবর্ণ। দুঃসাহসিকতা হচ্ছে।

বিক্রম। তাই যদি না হবে, তবে কাজে প্রবৃত্ত হয়ে সুখ কী?

সুবর্ণ। কান্তিকরাজকে ভয় না করলেও চলে কিন্তু—

বিক্রম। ঐ কিন্তুটাকে ভয় করতে শুরু করলে জগতে টেকা দায় হয়।

সুবর্ণ। মহারাজ, ঐ কিন্তুটাকে নাহয় মন থেকে উড়িয়ে দিলেন, কিন্তু ও যে বাইরে থেকেই হঠাৎ উড়ে এসে দেখা দেয়। ভেবে দেখুন-না, বাগানে কী কাণ্ডটা হল। খুব করেই আটঘাট বেঁধেছিলেন, তার মধ্যে কোথা থেকে অগ্নিমূর্তি ধরে ঢুকে পড়ল একটা কিন্তু।

বসুসেন ও বিজয়বর্মার প্রবেশ

বসুসেন। অন্তঃপুর ঘুরে এলুম, কোথাও তো তাকে পাওয়া গেল না। দৈবজ্ঞ যে বলেছিল, আমাদের যাত্রা শুভ, সেটা বুঝি মিথ্যা হল।

বিজয়। পাওয়ার চেয়ে না পাওয়াতেই হয়তো শুভ, কে বলতে পারে?

বিক্রম। এ কী উদাসীনের মতো কথা বলছ।

বসুসেন। এ কী! ভূমিকম্প না কি!

বিক্রম। ভূমিই কাঁপছে বটে, কিন্তু তাই বলে পা কাঁপতে দেওয়া হবে না।

বসুসেন। এটা দুর্লক্ষণ।

বিক্রম। কোনো লক্ষণই দুর্লক্ষণ নয়, যদি সঙ্গে ভয় না থাকে।

বসুসেন। দৃষ্ট কিছুকে ভয় করি নে কিন্তু অদৃষ্ট পুরুষের সঙ্গে লড়াই চলে না।

বিক্রম। অদৃষ্ট দৃষ্ট হয়েই আছেন, তখন তাঁর সঙ্গে খুবই লড়াই চলে।

দূতের প্রবেশ

দূত। মহারাজ, সৈন্যরা প্রায় সকলে পালিয়েছে।

বিক্রম। কেন?

দূত। তাদের মধ্যে অকারণে কেমন একটা আতঙ্ক ঢুকে গেল— কাউকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

বিক্রম। আচ্ছা, তাদের ফিরিয়ে আনছি। যুদ্ধের পর হারা চলে কিন্তু যুদ্ধের আগে হার মানতে পারব না।

[বিক্রমবাহু ও দূতের প্রস্থান

বিজয়। যার জন্য যুদ্ধ সেও পালায়, যাদের নিয়ে যুদ্ধ তারাও পালায়, এখন আমাদেরই কি পালানো দোষের।

বসুসেন। মনে ধাঁধা লেগেছে, কিছু স্থির করতে পারছি নে।

[উভয়ের প্রস্থান

সুরঙ্গমার প্রবেশ

গান

বসন্ত, তোর শেষ করে দে রঙ্গ,
ফুল ফোটাবার খ্যাপামি, তার
উদ্দাম তরঙ্গ॥
উড়িয়ে দেবার, ছড়িয়ে দেবার
মাতন তোমার থামুক এবার,
নীড়ে ফিরে আসুক তোমার
পথহারা বিহঙ্গ॥

সাধের মুকুল কতই পড়ল ঝরে
তারা ধুলা হল, ধুলা দিল ভরে।
প্রখর তাপে জরো-জরো
ফল ফলাবার শাসন ধরো,
হেলাফেলার পালা তোমার
এই বেলা হোক ভঙ্গ ॥

সুদর্শনার প্রবেশ

সুদর্শনা। এ কী হল ? ঘুরে ফিরে সেই একই জায়গায় এসে পড়ছি। ঐ-যে গোলমাল শোনা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে আমার চারি দিকেই যুদ্ধ চলছে। ঐ-যে আকাশ ধুলোয় অন্ধকার। আমি কি এই ঘূর্ণি ধুলোর সঙ্গে সঙ্গেই অনন্তকাল ঘুরে বেড়াব ? এর থেকে বেরোই কেমন করে ?

সুরঙ্গমা। তুমি যে কেবল চলে যেতেই চাচ্ছ, ফিরতে চাচ্ছ না, সেইজন্য কোথাও পৌঁছোতে পাচ্ছ না।

সুদর্শনা। কোথায় ফেরবার কথা তুই বলছিস ?

সুরঙ্গমা। আমাদের রাজার কাছে। আমি বলে রাখছি, যে-পথ তাঁর কাছে না নিয়ে যাবে সে-পথের অন্ত পাবে না কোথাও।

সৈনিকের প্রবেশ

সুদর্শনা। কে তুমি ?
সৈনিক। আমি নগরের রাজপ্রাসাদের দ্বারী।
সুদর্শনা। শীঘ্র বলো সেখানকার খবর কী।
সৈনিক। মহারাজ বন্দী হয়েছেন।
সুদর্শনা। কে বন্দী হয়েছেন ?
সৈনিক। আপনার পিতা।
সুদর্শনা। আমার পিতা ! কার বন্দী হয়েছেন ?
সৈনিক। রাজা বিক্রমবাহুর।

[সৈনিকের প্রস্থান

সুদর্শনা। রাজা, রাজা, দুঃখ তো আমি সইতে প্রস্তুত হয়েই বেরিয়েছিলেম, কিন্তু আমার দুঃখ চার দিকে ছড়িয়ে দিলে কেন ? যে আগুন আমার বাগানে লেগেছিল সেই আগুন কি আমি সঙ্গে করে নিয়ে চলেছি। আমার পিতা তোমার কাছে কী দোষ করেছেন ?

সুরঙ্গমা। আমরা যে কেউ একলা নই। ভালোমন্দ সবাইকেই ভাগ করে নিতে হয়। সেইজন্যেই তো ভয়, একলার জন্যে ভয় কিসের ?

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা !

সুরঙ্গমা। কী রাজকুমারী !

সুদর্শনা। তোর রাজার যদি রক্ষা করবার শক্তি থাকত, তা হলে আজ তিনি কি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারতেন ?

সুরঙ্গমা। আমাকে কেন বলছ ? আমার রাজার হয়ে উত্তর দেবার শক্তি কি আমার আছে ? উত্তর যদি দেন তো নিজেই এমনি করে দেবেন যে কারও কিছু বুঝতে বাকি থাকবে না।

সুদর্শনা। রাজা, আমার পিতাকে রক্ষা করবার জন্যে যদি তুমি আসতে, তা হলে তোমার যশ বাড়ত বই কমত না।

প্রস্থানোদ্যম

সুরঙ্গমা। কোথায় যাচ্ছ ?

সুদর্শনা। রাজা বিক্রমের শিবিরে। আমাকে বন্দী করুন তিনি, আমার পিতাকে ছেড়ে দিন। আমি নিজেকে যতদূর নত করতে পারি করব, দেখি কোথায় এসে ঠেকলে তোর রাজার সিংহাসন নড়ে।

[উভয়ের প্রস্থান

বসুসেন ও বিজয়বর্মার প্রবেশ

বসুসেন। যুদ্ধের আরম্ভেই যুদ্ধ শেষ হয়ে আছে, ভাঙা সৈন্য কুড়িয়ে এনে কখনো লড়াই চলে ?

বিজয়। বিক্রমবাহুকে কিছুতেই ফেরাতে পারলুম না।

বসুসেন। সে আত্মবিনাশের নেশায় উন্মত্ত।

বিজয়। কিন্তু কে আমাকে বললে, রণক্ষেত্রে সে যেমনি গিয়ে পৌঁচেছে অমনি তার বুকে লেগেছে ঘা। এতক্ষণে তার কী হল কিছুই বলা যায় না।

বসুসেন। আমার কাছে এইটেই সব চেয়ে অদ্ভুত ঠেকছে যে, আমরা আয়োজন করলুম কতদিন থেকে, সমারোহ হল ঢের, কিন্তু শেষ হবার বেলায় এক পলকেই কী যে হয়ে গেল ভালো বুঝতে পারা গেল না।

বিজয়। রাত্রির সমস্ত তারা যেমন প্রভাতসূর্যের এক কটাক্ষেই নিবে যায়।

বসুসেন। এখন চলো।

বিজয়। কোথায় ?

বসুসেন। ধরা দিতে।

বিজয়। ধরা দিতে, না পালাতে ?

বসুসেন। পালানোর চেয়ে ধরা দেওয়া সহজ হবে।

[উভয়ের প্রস্থান

সুরঙ্গমার প্রবেশ

গান

এখনো গেল না আঁধার,
    এখনো রহিল বাধা।
এখনো মরণ-ব্রত
    জীবনে হল না সাধা।
কবে যে দুঃখজ্বালা
হবে রে বিজয়মালা,
ঝলিবে অরুণরাগে
    নিশীথরাতের কাঁদা।
এখনো নিজেরি ছায়া
    রচিছে কত যে মায়া।
এখনো কেন যে মিছে
চাহিছে কেবলই পিছে,
চকিতে বিজলি আলো
    চোখেতে লাগাল ধাঁধা॥

সুদর্শনার প্রবেশ

সুরঙ্গমা। এ লজ্জা কাটবে!

সুদর্শনা। কাটবে বৈকি সুরঙ্গমা— সমস্ত পৃথিবীর কাছে আমার নিচু হবার দিন এসেছে। কিন্তু কই, রাজা এখনো কেন আমাকে নিতে আসছেন না? আরো কিসের জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন?

সুরঙ্গমা। আমি তো বলেছি, আমার রাজা নিষ্ঠুর— বড়ো নিষ্ঠুর।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, তুই যা একবার তাঁর খবর নিয়ে আয় গে।

সুরঙ্গমা। কোথায় তাঁর খবর নেব তা তো কিছুই জানি নে। ঠাকুরদাকে ডাকতে পাঠিয়েছি— তিনি এলে হয়তো তাঁর কাছ থেকে সংবাদ পাওয়া যাবে।

সুদর্শনা। হায় কপাল, লোককে ডেকে ডেকে তাঁর খবর নিতে হবে আমার এমন দশা হয়েছে! না না, দুঃখ করব না। যা হওয়া উচিত ছিল তাই হয়েছে, ভালোই হয়েছে, কিছু অন্যায় হয় নি।

ঠাকুরদার প্রবেশ

সুদর্শনা। শুনেছি তুমি আমার রাজার বন্ধু— আমার প্রণাম গ্রহণ করো, আমাকে আশীর্বাদ করো।

ঠাকুরদা। করো কী, করো কী। আমি কারও প্রণাম গ্রহণ করি নে। আমার সঙ্গে সকলের হাসির সম্বন্ধ।

সুদর্শনা। তোমার সেই হাসি দেখিয়ে দাও— আমাকে সুসংবাদ দিয়ে যাও। বলো আমার রাজা কখন আমাকে নিতে আসবেন?

ঠাকুরদা। ঐ তো বড় শক্ত কথা জিজ্ঞাসা করলে। আমার বন্ধুর ভাবগতিক কিছুই বুঝি নে, তার আর বলব কী। যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেল, তিনি যে কোথায় তার কোনো সন্ধান নেই।

সুদর্শনা। চলে গিয়েছেন?

ঠাকুরদা। সাড়াশব্দ তো কিছুই পাই নে।

সুদর্শনা। চলে গিয়েছেন! তোমার বন্ধু এমনি বন্ধু!

ঠাকুরদা। সেইজন্যে লোকে তাকে নিন্দেও করে সন্দেহও করে। কিন্তু আমার রাজা তাতে খেয়ালও করে না।

সুদর্শনা। চলে গেলেন? ওরে, ওরে, কী কঠিন, কী কঠিন! একেবারে পাথর একেবারে বজ্র! সমস্ত বুক দিয়ে ঠেলেছি— বুক ফেটে গেল— কিন্তু নড়ল না! ঠাকুরদা, এমন বন্ধুকে নিয়ে তোমার চলে কী করে?

ঠাকুরদা। চিনে নিয়েছি যে— সুখে দুঃখে তাকে চিনে নিয়েছি— এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।

সুদর্শনা। আমাকেও কি সে চিনতে দেবে না?

ঠাকুরদা। দেবে বৈকি। নইলে এত দুঃখ দিচ্ছে কেন? ভালো করে চিনিয়ে তবে ছাড়বে, সে তো সহজ লোক নয়।

সুদর্শনা। আচ্ছা আচ্ছা, দেখব তার কতবড়ো নিষ্ঠুরতা। পথের ধারে আমি চুপ করে পড়ে থাকব— এক পা-ও নড়ব না— দেখি সে কেমন না আসে।

ঠাকুরদা। দিদি, তোমার বয়স অল্প— জেদ করে অনেকদিন পড়ে থাকতে পারো— কিন্তু আমার যে এক মুহূর্ত গেলেও লোকসান হয়। পাই না-পাই একবার খুঁজতে বেরোব।

[প্রস্থান

সুদর্শনা। চাই নে, তাকে চাই নে! সুরঙ্গমা, তোর রাজাকে আমি চাই নে। কিসের জন্যে সে যুদ্ধ করতে এল? আমার জন্যে একেবারেই না? কেবল বীরত্ব দেখাবার জন্যে?

সুরঙ্গমা। দেখাবার ইচ্ছে তাঁর যদি থাকত তা হলে এমন করে দেখাতেন কারও আর সন্দেহ থাকত না। দেখান আর কই?

সুদর্শনা। যা যা চলে যা— তোর কথা অসহ্য বোধ হচ্ছে। এত নত করলে তবু সাধ মিটল না? বিশ্বসুদ্ধ লোকের সামনে এইখানে ফেলে রেখে দিয়ে চলে গেল?

[উভয়ের প্রস্থান

নাগরিক দলের প্রবেশ

প্রথম। ওহে, এতগুলো রাজা একত্র হয়ে লড়াই বাধিয়ে দিলে, ভাবলুম, খুব তামাশা হবে— কিন্তু দেখতে দেখতে কী যে হয়ে গেল, বোঝাই গেল না।

দ্বিতীয়। দেখলে না, ওদের নিজেদের মধ্যে গোলমাল লেগে গেল, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না।

তৃতীয়। পরামর্শ ঠিক রইল না যে। কেউ এগোতে চায় কেউ পিছোতে চায়— কেউ এদিকে যায় কেউ ওদিকে যায়, একে কি আর যুদ্ধ বলে? কিন্তু লড়েছিল রাজা বিক্রমবাহু, সে কথা বলতেই হবে।

প্রথম। সে যে হেরেও হারতে চায় না।

দ্বিতীয়। শেষকালে অস্ত্রটা তার বুকে এসে লাগল।

তৃতীয়। সে যে পদে পদেই হারছিল, তা যেন টেরও পাচ্ছিল না।

প্রথম। অন্য রাজারা তো তাকে ফেলে কে কোথায় পালাল, তার ঠিক নেই।

[সকলের প্রস্থান

অন্য দলের প্রবেশ

প্রথম। শুনেছি বিক্রমবাহু মরে নি।

তৃতীয়। না, কিন্তু বিক্রমবাহুর বিচারটা কিরকম হল?

দ্বিতীয়। শুনেছি বিচারকর্তা স্বহস্তে রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছে।

তৃতীয়। এটা কিন্তু একেবারেই বোঝা গেল না।

দ্বিতীয়। বিচারটা যেন কেমন বেখাপ রকম শোনাচ্ছে।

প্রথম। তা তো বটেই। অপরাধ যা কিছু করেছে, সে তো ঐ বিক্রমবাহুই।

দ্বিতীয়। আমি যদি বিচারক হতুম, তা হলে কি আর আস্ত রাখতুম? ওর আর চিহ্ন দেখাই যেত না!

তৃতীয়। কী জানি, বিচারকর্তাকে দেখি নে, তার বুদ্ধিটাও দেখা যায় না।

প্রথম। ওদের বুদ্ধি ব'লে কিছু আছে কি! এর মধ্যে সবই মর্জি। কেউ তো বলবার লোক নেই।

দ্বিতীয়। যা বলিস ভাই, আমাদের হাতে শাসনের ভার যদি পড়ত, তা হলে এর চেয়ে ঢের ভালো করে চালাতে পারতুম।

তৃতীয়। সে কি একবার করে বলতে!

[সকলের প্রস্থান

ঠাকুরদাদা ও বিক্রমবাহুর প্রবেশ

ঠাকুরদাদা। একি বিক্রমরাজ, তুমি পথে যে।

বিক্রম। তোমার রাজা আমাকে পথেই বের করেছে।

ঠাকুরদাদা। ঐ তো তার স্বভাব।

বিক্রম। তার পরে আর নিজের দেখা নেই।

ঠাকুরদাদা। সেও তার এক কৌতুক।

বিক্রম। কিন্তু আমাকে এমন করে আর কতদিন এড়াবে? যখন কিছুতেই তাকে রাজা বলে মানতেই চাই নি তখন কোথা থেকে কালবৈশাখীর মতো এসে এক মুহূর্তে আমার ধ্বজা পতাকা ভেঙে উড়িয়ে ছারখার করে দিলে, আর আজ তার কাছে হার মানবার জন্যে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তার আর দেখাই নেই।

ঠাকুরদাদা। তা হোক, সে যতবড়ো রাজাই হোক, হার-মানার কাছে তাকে হার মানতেই হবে কিন্তু রাজন্, রাত্রে বেরিয়েছ যে।

বিক্রম। ঐ লজ্জাটুকু এখনো ছাড়তে পারি নি। রাজা বিক্রম থালায় মুকুট সাজিয়ে তোমার রাজার মন্দির খুঁজে বেড়াচ্ছে, এই যদি দিনের আলোয় লোকে দেখে তা হলে যে তারা হাসবে।

ঠাকুরদাদা। লোকের ঐ দশা বটে। যা দেখে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায় তাই দেখেই বাঁদররা হাসে।

বিক্রম। কিন্তু ঠাকুরদা, তুমিও পথে যে?

ঠাকুরদাদা। আমিও সর্বনাশের পথ চেয়ে আছি।

গান

আমার সকল নিয়ে বসে আছি
সর্বনাশের আশায়।
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি।
পথে যে জন ভাসায়॥

বিক্রম। কিন্তু ঠাকুরদা, যে ধরা দেবে না তার কাছে ধরা দিয়ে লাভ কী বলো।

ঠাকুরদাদা। তার কাছে রা দিলে এক সঙ্গেই ধরাও দেওয়া হয় ছাড়াও পাওয়া যায়

যে জন দেয় না দেখা— যায় যে দেখে,
ভালোবাসে আড়াল থেকে,
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন ভালোবাসায়॥

[উভয়ের প্রস্থান

সুরঙ্গমার প্রবেশ

গান

পথের সাথি, নমি বারংবার।
পথিক জনের লহো নমস্কার॥
ওগো বিদায়, ওগো ক্ষতি
ওগো দিনশেষের পতি,
ভাঙা-বাসার লহো নমস্কার॥
ওগো নব প্রভাতজ্যোতি,
ওগো চিরদিনের গতি,
নব আশার লহো নমস্কার॥
জীবনরথের হে সারথি,
আমি নিত্য পথের পথী,
পথে চলার লহো নমস্কার॥

সুদর্শনার প্রবেশ

সুদর্শনা। বেঁচেছি, বেঁচেছি সুরঙ্গমা! হার মেনে তবে বেঁচেছি। ওরে বাস রে। কী কঠিন অভিমান! কিছুতেই গলতে চায় না। আমার রাজা কেন আমার কাছে আসতে যাবে— আমিই তার কাছে যাব, এই কথাটা কোনোমতেই মনকে বলাতে পারছিলুম না। সমস্ত রাতটা পথে পড়ে ধুলোয় লুটিয়ে কেঁদেছি— দক্ষিনে হাওয়া বুকের বেদনার মতো হুহু করে বয়েছে, আর কৃষ্ণচতুর্দশীর অন্ধকারে বউ-কথা-কও চার পহর রাত কেবলই ডেকেছে— সে যেন অন্ধকারের কান্না!

সুরঙ্গমা। আহা কালকের রাতটা মনে হয়েছিল যেন কিছুতেই আর পোহাতে চায় না।

সুদর্শনা। কিন্তু বললে বিশ্বাস করবি নে, তারই মধ্যে বার বার আমার মনে হচ্ছিল কোথায় যেন তার বীণা বাজছে। যে নিষ্ঠুর, তার কঠিন হাতে কি অমন মিনতির সুর বাজে? বাইরের লোক আমার অসম্মানটাই দেখে গেল— কিন্তু গোপন রাত্রের সেই সুরটা কেবল আমার হৃদয় ছাড়া আর তো কেউ শুনল না। সে বীণা তুই কি শুনেছিলি সুরঙ্গমা। না, সে আমার স্বপ্ন?

সুরঙ্গমা। সেই বীণা শুনব বলেই তো তোমার কাছে কাছে আছি। অভিমান-গলানো সুর বাজবে জেনেই কান পেতে পড়ে ছিলুম।

[উভয়ের প্রস্থান

গানের দলের প্রবেশ

গান

আমার অভিমানের বদলে আজ
নেব তোমার মালা।
আজ নিশিশেষে শেষ করে দিই
চোখের জলের পালা॥
আমার কঠিন হৃদয়টারে
ফেলে দিলেম পথের ধারে,
তোমার চরণ দেবে তারে মধুর
পরশ পাষাণ-গালা॥
ছিল আমার আঁধারখানি,
তারে তুমিই নিলে টানি,
তোমার প্রেম এল যে আগুন হয়ে
করল তারে আলা।
সেই যে আমার কাছে আমি
ছিল সবার চেয়ে দামি
তারে উজাড় করে সাজিয়ে দিলেম
তোমার বরণডালা॥

[প্রস্থান

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার পুনঃপ্রবেশ

সুদর্শনা। তার পণটাই রইল— পথে বের করলে তবে ছাড়লে! মিলন হলে এই কথাটাই তাকে বলব যে, আমিই এসেছি, তোমার আসার অপেক্ষা করি নি। বলব চোখের জল ফেলতে ফেলতে এসেছি— কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে এসেছি। এ গর্ব আমি ছাড়ব না।

সুরঙ্গমা। কিন্তু সে গর্বও তোমার টিকবে না। সে যে তোমারও আগে এসেছিল নইলে তোমাকে বার করে কার সাধ্য।

সুদর্শনা। তা হয়তো এসেছিল— আভাস পেয়েছিলুম কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি নি। যতক্ষণ অভিমান করে বসেছিলুম ততক্ষণ মনে হয়েছিল সেও আমাকে ছেড়ে গিয়েছে— অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে যখনই রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম তখনই মনে হল সেও বেরিয়ে এসেছে, রাস্তা থেকেই তাকে পাওয়া শুরু করেছি। এখন আমার মনে আর কোনো ভাবনা নেই। তার জন্যে এত যে দুঃখ এই দুঃখই আমাকে তার সঙ্গ দিচ্ছে; এত কষ্টের রাস্তা আমার পায়ের তলায় যেন সুরে সুরে বেজে উঠছে। এ যেন আমার বীণা, আমার দুঃখের বীণা; এরই বেদনার গানে তিনি এই কঠিন পাথরে, এই

শুকনো ধুলোয়, আপনি বেরিয়ে এসেছেন। আমার হাত ধরেছেন। সেই আমার অন্ধকারের মধ্যে যেমন করে হাত ধরতেন, হঠাৎ চমকে উঠে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত, এও সেইরকম। কে বললে তিনি নেই! সুরঙ্গমা, তুই কি বুঝতে পারছিস নে তিনি লুকিয়ে এসেছেন?

সুরঙ্গমার গান

আমার আর হবে না দেরি,
আমি শুনেছি ওই বাজে তোমার ভেরী ॥
তুমি কি নাথ দাঁড়িয়ে আছ
আমার যাবার পথে,
মনে হয় যে ক্ষণে ক্ষণে
মোর বাতায়ন হতে
তোমায় যেন হেরি ॥
আমার স্বপন হল সারা
এখন প্রাণে বীণা বাজায় ভোরের তারা।
দেবার মতো যা ছিল মোর
নাই কিছু আর হাতে,
তোমার আশীর্বাদের মালা
নেব কেবল মাথে
আমার ললাট ঘেরি ॥

সুদর্শনা। ও কে ও! চেয়ে দেখ্ সুরঙ্গমা, এত রাত্রে এই আঁধারে পথে আরো একজন পথিক বেরিয়েছে যে!

সুরঙ্গমা। মা, এ যে বিক্রম রাজা দেখছি!

সুদর্শনা। বিক্রম রাজা?

সুরঙ্গমা। ভয় কোরো না।

সুদর্শনা। ভয়! ভয় কেন করব। ভয়ের দিন আমার আর নেই।

রাজা বিক্রমবাহুর প্রবেশ

বিক্রম। তুমিও চলেছ বুঝি। আমিও এই এক পথেরই পথিক। আমাকে কিছুমাত্র ভয় কোরো না।

সুদর্শনা। ভালোই হয়েছে বিক্রমরাজ— আমরা দুজনে তাঁর কাছে পাশাপাশি চলেছি এ ঠিক হয়েছে। ঘর ছেড়ে বেরোবার মুখেই তোমার সঙ্গে আমার যোগ হয়েছিল— আজ ঘরে ফেরবার পথে সেই যোগই যে এমন শুভযোগ হয়ে উঠবে তা আগে কে মনে করতে পারত!

বিক্রম। কিন্তু তুমি যে হেঁটে চলেছ এ তো তোমাকে শোভা পায় না। যদি অনুমতি কর তা হলে এখনই রথ আনিয়ে দিতে পারি।

সুদর্শনা। না না, অমন কথা বোলো না— যে-পথ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে দূরে এসেছি, সেই পথের সমস্ত ধুলোটা পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে ফিরব তবেই আমার বেরিয়ে আসা সার্থক হবে। রথে করে নিয়ে গেলে আমাকে ফাঁকি দেওয়া হবে।

সুরঙ্গমা। মহারাজ, তুমিও তো আজ ধুলোয়। এ পথে তো হাতি ঘোড়া রথ কারও দেখি নি।

সুদর্শনা। যখন প্রাসাদে ছিলুম তখন কেবল সোনারুপোর মধ্যেই পা ফেলেছি— আজ তাঁর ধুলোর মধ্যে চলে আমার সেই ভাগ্যদোষ খণ্ডিয়ে নেব। আজ আমার সেই ধুলোমাটির রাজার সঙ্গে পদে পদে এই ধুলোমাটিতে মিলন হচ্ছে, এ সুখের খবর কে জানত।

সুরঙ্গমা। ঐ দেখো, পূর্বদিকে চেয়ে দেখো ভোর হয়ে আসছে। আর দেরি নেই— তাঁর প্রাসাদের সোনার চূড়ার শিখর দেখা যাচ্ছে।

ঠাকুরদার প্রবেশ

ঠাকুরদা। ভোর হল, দিদি ভোর হল।

সুদর্শনা। তোমাদের আশীর্বাদে পৌঁচেছি।

ঠাকুরদা। কিন্তু আমাদের রাজার রকম দেখেছ? রথ নেই, বাদ্য নেই, সমারোহ নেই।

সুদর্শনা। বল কী, সমারোহ নেই? ঐ যে আকাশ একেবারে রাঙা, ফুলগন্ধের অভ্যর্থনায় বাতাস একেবারে পরিপূর্ণ।

ঠাকুরদা। তা হোক, আমাদের রাজা যত নিষ্ঠুর হোক আমরা তো তেমন কঠিন হতে পারি নে— আমাদের যে ব্যথা লাগে। এই দীনবেশে তুমি রাজভবনে যাচ্ছ, এ কি আমরা সহ্য করতে পারি? একটু দাঁড়াও, আমি ছুটে গিয়ে তোমার জন্যে রানীর বেশ নিয়ে আসি।

সুদর্শনা। না না না। সে বেশ তিনি আমাকে চির দিনের মতো ছাড়িয়েছেন— সবার সামনে আমাকে দাসীর বেশ পরিয়েছেন— বেঁচেছি বেঁচেছি— আমি আজ তাঁর দাসী— যে-কেউ তাঁর আছে, আমি আজ সকলের নীচে।

ঠাকুরদা। শত্রুপক্ষ তোমার এ দশা দেখে পরিহাস করবে, সেইটে আমাদের অসহ্য হয়।

সুদর্শনা। শত্রুপক্ষের পরিহাস অক্ষয় হোক— তারা আমার গায়ে ধুলো দিক! আজকের দিনের অভিসারে সেই ধুলোই আমার অঙ্গরাগ।

ঠাকুরদা। এর উপরে আর কথা নেই। এখন আমাদের বসন্ত-উৎসবের শেষ খেলাটাই চলুক— ফুলের রেণু এখন থাক্‌, দক্ষিনে হাওয়ায় এবার ধুলো উড়িয়ে দিক। সকলে মিলে আজ ধূসর হয়ে প্রভুর কাছে যাব। গিয়ে দেখব তাঁর গায়েও ধুলো মাখা। তাঁকে বুঝি কেউ ছাড়ে, মনে করছ? যে পায় তাঁর গায়ে মুঠো মুঠো ধুলো দেয় যে।

বিক্রম। ঠাকুরদা, তোমাদের এই ধুলোর খেলায় আমাকেও ভুলো না। আমার এই রাজবেশটাকে এমনি মাটি করে নিয়ে যেতে হবে যাতে একে আর চেনা না যায়।

ঠাকুরদা। সে আর দেরি হবে না ভাই। যেখানে নেবে এসেছ এখানে যত তোমার মিথ্যে মান সব ঘুচে গেছে— এখন দেখতে দেখতে রঙ ফিরে যাবে। আর এই আমাদের রানীকে দেখো, ও নিজের উপর ভারি রাগ করেছিল। মনে করেছিল গয়না ফেলে দিয়ে নিজের ভুবনমোহন রূপকে লাঞ্ছনা দেবে! কিন্তু সে রূপ অপমানের আঘাতে আরো ফুটে পড়েছে— সে যেন কোথাও আর কিছু ঢাকা নেই। আমাদের রাজাটির নিজের নাকি রূপের সম্পর্ক নেই তাই তো বিচিত্র রূপ সে এত ভালোবাসে, এই রূপই তো তার বক্ষের অলংকার। সেই রূপ আপন গর্বের আবরণ ঘুচিয়ে দিয়েছে— আজ আমার রাজার ঘরে কী সুরে যে এতক্ষণে বীণা বেজে উঠেছে, তাই শোনবার জন্যে প্রাণটা ছটফট করছে।

সুরঙ্গমা। ঐ-যে সূর্য উঠল।

[সকলের প্রস্থান

গান

ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান।
শুন ওই লোকে লোকে উঠে আলোকেরই গান॥
ধন্য হলি ওরে পান্থ
রজনীজাগরক্লান্ত,
ধন্য হল মরি মরি ধুলায় ধূসর প্রাণ॥
বনের কোলের কাছে
সমীরণ জাগিয়াছে;

মধুভিক্ষু সারে সারে
আগত কুঞ্জের দ্বারে।
হল তব যাত্রা সারা,
মোছো মোছো অশ্রুধারা,
লজ্জা ভয় গেল ঝরি,
ঘুচিল রে অভিমান॥

অন্ধকার ঘর

সুদর্শনা। প্রভু, যে আদর কেড়ে নিয়েছ সে আদর আর ফিরিয়ে দিয়ো না। আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও।

রাজা। আমাকে সইতে পারবে?

সুদর্শনা। পারব রাজা, পারব। আমার প্রমোদবনে আমার রানীর ঘরে তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম— সেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে। তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে— তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও, তুমি অনুপম।

রাজা। তোমারই মধ্যে আমার উপমা আছে।

সুদর্শনা। যদি থাকে তো সেও অনুপম।

রাজা। আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম— এখানকার লীলা শেষ হল। এসো, এবার আমার সঙ্গে এসো, বাইরে চলে এসো— আলোয়।

সুদর্শনা। যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে আমার নিষ্ঠুরকে আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।

[প্রস্থান

—

গান

অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে,
সে বীণা আজি উঠিল বাজি হৃদয়-মাঝে॥
ভুবন আমার ভরিল সুরে,
ভেদ ঘুচে যায় নিকটে দূরে,
সেই রাগিণী লেগেছে আমার সকল কাজে॥
হাতে পাওয়ার চোখে চাওয়ার সকল বাঁধন,
গেল কেটে আজ সফল হল সকল কাঁদন।
সুরের রসে হারিয়ে যাওয়া
সেই তো দেখা সেই তো পাওয়া,
বিরহ মিলন মিলে গেল আজ সমান সাজে॥

—

ঋণশোধ

গান

হৃদয়ে ছিলে জেগে ;
দেখি আজ শরৎ মেঘে
কেমনে আজকে ভোরে
গেল গো গেল সরে
তোমার ওই আঁচলখানি
শিশিরের ছোঁওয়া লেগে ॥
কী যে গান গাহিতে চাই,
বাণী মোর খুঁজে না পাই ।
সে যে ওই শিউলিদলে
ছড়াল কাননতলে,
সে যে ওই ক্ষণিক ধারায়
উড়ে যায় বায়ুবেগে ॥

পাত্রগণ

সম্রাট বিজয়াদিত্য

শেখর কবি

ঠাকুরদাদা

লক্ষেশ্বর

উপনন্দ

রাজা সোমপাল

রাজদূত

অমাত্য

বালকগণ

ভূমিকা

রাজসভা

সম্রাট বিজয়াদিত্য ও মন্ত্রী

মন্ত্রী। মহারাজ, এই হচ্ছে রাজনীতি।

বিজয়াদিত্য। কী তোমার রাজনীতি?

মন্ত্রী। রাজ্য রাখতে গেলে রাজ্য বাড়াতে হবে। ও যেন মানুষের দেহের মতো, বৃদ্ধি যেমনি বন্ধ হয় ক্ষয়ও তেমনি শুরু হতে থাকে।

বিজয়াদিত্য। রাজ্য যতই বাড়বে তাকে রক্ষা করবার দায়ও তো ততই বাড়বে— তা হলে থামবে কোথায়?

মন্ত্রী। কোথাও না। কেবলই জয় করতে হবে, কেননা প্রতাপ জিনিসটা যেখানে থামে সেইখানে নিবে যায়।

বিজয়াদিত্য। তা হলে তোমার পরামর্শ কী?

মন্ত্রী। আমাদের উত্তর-পশ্চিম সীমানায় যে মানিকপুর আছে সেইটে জয় করে নেবার এই অবসর উপস্থিত হয়েছে।

বিজয়াদিত্য। সেই অবসর আমি দিলুম উড়িয়ে। আমার রাজনীতির কথা আমি তোমাকে বলব?

মন্ত্রী। বলুন।

বিজয়াদিত্য। রাজ্যের লোভ মিটবে বলেই আমি রাজত্ব করি, বাড়বে বলে নয়। রাজা হয়েছি বলেই দেখতে পেয়েছি রাজ্যটা কিছুই নয়।

মন্ত্রী। বলেন কী মহারাজ? ওর মধ্যে কোনো সত্যই কি—

বিজয়াদিত্য। ওর মধ্যে একমাত্র সত্য হচ্ছে রাজা হওয়া। আমি রাজা হতে চাই।

মন্ত্রী। সেইজন্যেই তো—

বিজয়াদিত্য। সেইজন্যেই তো আমি রাজ্যে লোভ করতে চাই নে। কোনো সাম্রাজ্যই তো আজ পর্যন্ত টেঁকে নি— যে সাম্রাজ্য যতই বড়োই হোক। কিন্তু একবারের মতো যে সত্যকার রাজা হতে পেরেছে চিরকালের মতো সে বেঁচে রইল।

মন্ত্রী। কিন্তু সৈন্যদল প্রস্তুত আছে।

বিজয়াদিত্য। ভালোই হয়েছে।

মন্ত্রী। তবে কি—

বিজয়াদিত্য। তাদের লাগিয়ে দাও শারদোৎসবের কাজে।

সেনাপতির প্রবেশ

সেনাপতি। মহারাজ, শরৎকালে জয়যাত্রায় বেরোবার নিয়ম— মহারাজের পূর্বপুরুষেরা—

বিজয়াদিত্য। আমিও বেরোব ঠিক করেছি।

সেনাপতি। তা হলে আদেশ করুন কী ভাবে প্রস্তুত হতে হবে।

বিজয়াদিত্য। তোমাদের কাউকে সঙ্গে আসতে হবে না।

সেনাপতি। বলেন কী মহারাজ?

বিজয়াদিত্য। আমি একলা যাব।

সেনাপতি। সে কী কথা?

বিজয়াদিত্য। সে তোমরা বুঝবে না। কবি কোথায়?

মন্ত্রী। তাঁকে আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি। [উভয়ের প্রস্থান

শেখরের প্রবেশ

বিজয়াদিত্য। কবি!

শেখর। কী মহারাজ।

বিজয়াদিত্য। আমার পিতার সিংহাসনে এক বছর মাত্র আমি বসেছি— কিন্তু মনে হচ্ছে আমাদের বংশে যতদিন যত রাজা হয়েছে সকলের বয়স একত্র হয়ে আমার ঘাড়ে চেপে বসেছে। রাজাকে নবীন করবার কী উপায় আমাকে বলে দাও তো।

শেখর। সিংহাসন থেকে একবার মাটিতে পা ফেলেন দিকি! ঐ মাটির মধ্যে জীবন-যৌবনের জাদুমন্ত্র রয়েছে।

বিজয়াদিত্য। আমার সিংহাসনের খাঁচার দরজা আমি চিরদিনের মতো খুলে রাখতে চাই— যাতে মাটির সঙ্গে আমার সহজ আনাগোনা চলে।

শেখর। যাতে শিউলির মালার সঙ্গে আপনার মুক্তোর মালার অদল-বদল হয়। তা হলে এই শরৎকালে আপনার ঐ রাজবেশটা একবার খোলেন— আপন বলে চিনতে কারও ভুল হবে না।

বিজয়াদিত্য। আছে আমার সন্ন্যাসীর বেশ— ধুলোর সঙ্গে তার সুর মেলে। কবি তোমাকেও কিন্তু আমার সঙ্গে যেতে হবে।

শেখর। না মহারাজ, আমাকে যদি সঙ্গে নেন তা হলে আপনার 'পরে মন্ত্রী আর সেনাপতির বিষম অশ্রদ্ধা হবে, আর আমার 'পরে হবে রাগ।

বিজয়াদিত্য। ঠিক বটে। মন্ত্রীর মনে এই বড়ো ক্ষোভ যে, রাজত্ব পাবার যে পিতৃঋণ, সে শোধ করবার জন্যে আমার মন নেই।

শেখর। আমার মস্ত দোষ এই যে, আমি কেবল স্মরণ করাই, এই-যে বিশ্ব আমাদের চিত্তে অমৃত ঢেলে দিচ্ছে তার ঋণ আমাদের শোধ করতে হবে।

বিজয়াদিত্য। অমৃতের বদলে অমৃত দিয়ে তবে তো সেই ঋণ শোধ করতে হয়। তোমার হাতে সেই শক্তি আছে। তোমার কবিতার ভিতর দিয়ে তুমি বিশ্বকে অমৃত ফিরিয়ে দিচ্ছ। কিন্তু আমার কী ক্ষমতা আছে বলো। আমি তো কেবলমাত্র রাজত্ব করি।

শেখর। প্রেমও যে অমৃত, মহারাজ। আজ সকালের সোনার আলোয় পাতায় পাতায় শিশির যখন বীণার ঝংকারের মতো ঝলমল করে উঠল তখন সেই সুরের জবাবটি ভালোবাসার আনন্দ ছাড়া আর কিছুতে নেই। আমার কথা যদি বলেন সেই আনন্দ আজ আমার চিত্তে অসীম বিরহ-বেদনায় উপচে পড়ছে—

গান

আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে
কী জানি পরান কী যে চায়—
ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে
বিহগ বিহগী কী যে গায়।

বিজয়াদিত্য। তুমি আমাকে ঘরে টিকতে দিলে না দেখছি। চললেম আমি অমৃতের ঋণ শোধ করতে।

শেখর।

গান

আজ মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে
রহে না আবাসে মন হায়!
কোন্ কুসুমের আশে কোন্ ফুলবাসে
সুনীল আকাশে মন ধায়।

বিজয়াদিত্য। কবি, ভালোবাসা তো দেব, কিন্তু কোথায় দেব ?

শেখর। মহারাজ, যেদিন সময় আসে, যেদিন ডাক পড়ে, সেদিন বাজে-খরচের দিন, একেবারে ঢেলে দিতে হয়, পথে পথে বনে বনে। আজ সেই দিন এসেছে— আমার মন দিশেহারা হয়েছে।

গান

আমি যদি রচি গান অথির পরান
সে গান শোনাব কারে আর।
আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুলডালা
কাহারে পরাব ফুলহার !
আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান
দিব প্রাণ তবে কার পায় ?
সদা ভয় হয় মনে, পাছে অযতনে
মনে মনে কেহ ব্যথা পায়।

বিজয়াদিত্য। বুঝেছি, কবি, আজ আর কথা নেই, আজ অমৃতের ঋণ শোধ করতে বেরোব। তুমি একবার মন্ত্রীকে ডেকে দাও।

[শেখরের প্রস্থান

মন্ত্রীর প্রবেশ

বিজয়াদিত্য। মন্ত্রী, আমি আজই বাহির হব।

মন্ত্রী। তার আয়োজন—

বিজয়াদিত্য। বিনা আয়োজনে।

মন্ত্রী। মহারাজ, কী এমন বিশেষ কর্তব্য আছে যে—

বিজয়াদিত্য। আছে কর্তব্য। আমি সেই বীনকারকে ডাকতে যাব।

মন্ত্রী। বীনকার ? সেই সুরসেন ? আমি এখনই লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বিজয়াদিত্য। না না, রাজার ডাকে বীণার ঠিক সুরটি বাজে না। আমি তার দরজার বাইরে মাটিতে বসে শুনব, তার পরে যদি ডাক পড়ে তবে ঘরের ভিতরে গিয়ে বসে শুনব।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ কী কথা বলছেন ?

বিজয়াদিত্য। সিংহাসনে সুর পৌঁছোয় না। শ্রোতার আসন থেকে আমাকে চিরদিন বঞ্চিত করতে পারবে না। আমি মাটিতে বসব মেঠো ফুলের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে। কবিকে ডেকে দাও তো মন্ত্রী।

মন্ত্রী। দিচ্ছি, এখনই দিচ্ছি।

[মন্ত্রীর প্রস্থান

শেখরের প্রবেশ

বিজয়াদিত্য। কবি, আমার বেরোবার সময় হল। যাবার আগে সেই মেঠো ফুলের গানটা শুনিয়ে দাও।

গান

শেখর।

যখন সারা নিশি ছিলেম শুয়ে
বিজন ভুঁয়ে
মেঠো ফুলের পাশাপাশি ;
তখন শুনেছিলেম তারার বাঁশি।

যখন সকাল বেলা খুঁজে দেখি স্বপ্নে শোনা সে সুর এ কি
আমার মেঠো ফুলের চোখের জলে উঠে ভাসি।
এ সুর আমি খুঁজেছিলেম রাজার ঘরে
শেষে ধরা দিল ধরার ধূলির 'পরে।
এ যে ঘাসের কোলে আলোর ভাষা
আকাশ থেকে ভেসে-আসা,
এ যে মাটির কোলে মানিক-খসা হাসিরাশি।

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ, বেতসিনীতীরে পিঞ্জরীতে বীনকার সুরসেনের বাস। যখন আপনি সেখানে যাওয়াই স্থির করেছেন তখন সেইসঙ্গে একটা রাজকার্যও সম্পন্ন করতে পারেন।

বিজয়াদিত্য। সেখানে রাজকার্য আছে না কি?

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ। পিঞ্জরীর রাজা সোমপাল প্রকাশ্য সভায় সর্বদাই মহারাজের নামে স্পর্ধাবাক্য ব্যবহার করে থাকেন। তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

বিজয়াদিত্য। বড়ো কৌতূহল হচ্ছে, মন্ত্রী। স্তুতিবাক্য অনেক শুনেছি, কিন্তু কোনোদিন নিজের কানে স্পর্ধাবাক্য শুনি নি।

মন্ত্রী। ভগবানের কৃপায় কোনোদিন যেন না শুনতে হয়।

বিজয়াদিত্য। রাজা হবার ঐ তো বিড়ম্বনা। পরিহাস করে তোমরা আমাদের বল পৃথিবীপতি কিন্তু পৃথিবীকে সিংহাসনের মাপে ছোটো করে তোমরা আমাদের খেলনা বানিয়ে দিয়েছ— সব দেখা দেখতে পাই নে, সব শোনা শোনবার জো নেই।

মন্ত্রী। যাদের সব দেখাই দেখতে হয়, সব শোনাই শুনতে হয় তারাই তো হতভাগ্য।

বিজয়াদিত্য। সেই হতভাগ্যদের দশাই আমি পরীক্ষা করে দেখব। সোমপালের স্পর্ধাবাক্য আমি নিজের কানে শুনব।

মন্ত্রী। তা হলে শেখরই মহারাজের সঙ্গে যাবেন, আর কেউ না?

শেখর। না মন্ত্রী, এ-যাত্রায় আমার প্রয়োজন নেই। জানলার দরকার হয় যেখানে প্রাচীর আছে— যেখানে খোলা আকাশ সেখানে জানলায় কী হবে— রাজসভায় কবিকে না হলে চলে না।

মন্ত্রী। তোমার কথা বুঝলেম না।

[প্রস্থান

শেখর। মহারাজ, চার দিকের ভ্রূভঙ্গি দেখে বুঝতে পারছি আপনি চলে গেলে কবির পক্ষে এখানে অরাজক হবে। আমিও আপনারই পথ ধরলেম।

বিজয়াদিত্য। ভালো হল কবি, আজ শরতের নিমন্ত্রণ রাখতে চলেছি— তুমি সঙ্গে না থাকলে তার প্রতিসম্ভাষণের বাণী পেতেম কোথায়?

রবীন্দ্রনাথ

প্রায় : ১৯২১

ঋণশোধ

বেতসিনী নদীর তীর

বালকগণ

গান

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।
কী করি আজ ভেবে না পাই,
পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই,
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই,
সকল ছেলে জুটি।
কেয়াপাতার নৌকো গড়ে
সাজিয়ে দেব ফুলে,
তালদিঘিতে ভাসিয়ে দেব,
চলবে দুলে দুলে।
রাখাল-ছেলের সঙ্গে ধেনু
চরাব আজ বাজিয়ে বেণু,
মাখব গায়ে ফুলের রেণু
চাঁপার বনে লুটি।
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।

লক্ষেশ্বর। (ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া) ছেলেগুলো তো জ্বালালে। ওরে চোবে। ওরে গির্‌ধারিলাল। ধর্ তো ছোঁড়াগুলোকে ধর্ তো।

ছেলেরা। (দূরে ছুটিয়া গিয়া হাততালি দিয়া) ওরে লক্ষ্মীপেঁচা বেরিয়েছে রে, লক্ষ্মীপেঁচা বেরিয়েছে।

লক্ষেশ্বর। হনুমন্ত সিং, ওদের কান পাকড়ে আন্ তো; একটাকেও ছাড়িস নে।

ঠাকুরদাদার প্রবেশ

ঠাকুরদাদা। কী হয়েছে লখাদাদা? মার-মূর্তি কেন?

লক্ষেশ্বর। আরে দেখো-না! সক্কাল বেলা কানের কাছে চেঁচাতে আরম্ভ করেছে।

ঠাকুরদাদা। আজ যে শরতে ওদের ছুটি, একটু আমোদ করবে না? গান গাইলেও তোমার কানে খোঁচা মারে! হায় রে হায়, ভগবান তোমাকে এত শাস্তিও দিচ্ছেন!

লক্ষেশ্বর। গান গাবার বুঝি সময় নেই ? আমার হিসাব লিখতে ভুল হয়ে যায় যে। আজ আমার সমস্ত দিনটাই মাটি করলে।

ঠাকুরদাদা। তা ঠিক ! হিসেব ভুলিয়ে দেবার ওস্তাদ ওরা। ওদের সাড়া পেলে আমার বয়সের হিসাবে প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছরের গরমিল হয়ে যায়। ওরে বাঁদরগুলো, আয় তো রে ! চল্ তোদের পঞ্চাননতলার মাঠটা ঘুরিয়ে আনি। যাও দাদা, তোমার দপ্তর নিয়ে বোসো গে ! আর হিসেবে ভুল হবে না।

[লক্ষেশ্বরের প্রস্থান

ঠাকুরদাদাকে ঘিরিয়া ছেলেদের নৃত্য

প্রথম। হাঁ ঠাকুরদা চলো।

দ্বিতীয়। আমাদের আজ গল্প বলতে হবে।

তৃতীয়। না গল্প না, বটতলায় বসে আজ ঠাকুরদার পাঁচালি হবে।

চতুর্থ। বটতলায় না, ঠাকুরদা আজ পারুলডাঙায় চলো।

ঠাকুরদাদা। চুপ, চুপ, চুপ। অমন গোলমাল লাগাস যদি তো লখাদাদা আবার ছুটে আসবে।

লক্ষেশ্বরের পুনঃপ্রবেশ

লক্ষেশ্বর। কোন্ পোড়ারমুখো আমার কলম নিয়েছে রে।

[ছেলেদের লইয়া ঠাকুরদাদার প্রস্থান

উপনন্দের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। কী রে তোর প্রভু কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলে ? অনেক পাওনা বাকি।

উপনন্দ। কাল রাত্রে আমার প্রভুর মৃত্যু হয়েছে।

লক্ষেশ্বর। মৃত্যু ! মৃত্যু হলে চলবে কেন ? আমার টাকাগুলোর কী হবে ?

উপনন্দ। তাঁর তো কিছুই নেই। যে বীণা বাজিয়ে উপার্জন করে তোমার ঋণ শোধ করতেন সেই বীণাটি আছে মাত্র !

লক্ষেশ্বর। বীণাটি আছে মাত্র ! কী শুভ সংবাদটাই দিলে।

উপনন্দ। আমি শুভ সংবাদ দিতে আসি নি। আমি একদিন পথের ভিক্ষুক ছিলেম, তিনিই আমাকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর বহুদুঃখের অন্নের ভাগে আমাকে মানুষ করেছেন। তোমার কাছে দাসত্ব করে আমি সেই মহাত্মার ঋণ শোধ করব।

লক্ষেশ্বর। বটে ! তাই বুঝি তাঁর অভাবে আমার বহুদুঃখের অন্নে ভাগ বসাবার মতলব করেছ ! আমি তত বড়ো গর্দভ নই। আচ্ছা, তুই কী করতে পারিস বল্ দেখি !

উপনন্দ। আমি চিত্রবিচিত্র করে পুঁথি নকল করতে পারি। তোমার অন্ন আমি চাই নে। আমি নিজে উপার্জন করে যা পারি খাব— তোমার ঋণও শোধ করব।

লক্ষেশ্বর। আমাদের বীনকারটিও যেমন নির্বোধ ছিল ছেলেটাকেও দেখছি ঠিক তেমনি করেই বানিয়ে গেছে। হতভাগা ছোঁড়াটা পরের দায় ঘাড়ে নিয়েই মরবে। এক-একজনের ঐ রকম মরাই স্বভাব।— আচ্ছা বেশ, মাসের ঠিক তিন তারিখের মধ্যেই নিয়মমত টাকা দিতে হবে। নইলে—

উপনন্দ। নইলে আবার কী ! আমাকে ভয় দেখাচ্ছ মিছে। আমার কী আছে যে তুমি আমার কিছু করবে। আমি আমার প্রভুকে স্মরণ করে ইচ্ছা করেই তোমার কাছে বন্ধন স্বীকার করেছি। আমাকে ভয় দেখিয়ো না বলছি।

লক্ষেশ্বর। না না, ভয় দেখাব না। তুমি লক্ষ্মীছেলে, সোনার চাঁদ ছেলে। টাকাটা ঠিকমত দিয়ো বাবা। নইলে আমার ঘরে দেবতা আছে তার ভোগ কমিয়ে দিতে হবে— সেটাতে তোমারই পাপ হবে।

[উপনন্দের প্রস্থান

ঐ-যে আমার ছেলেটা এইখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে! আমি কোন্‌খানে টাকা পুঁতে রাখি ও নিশ্চয় সেই খোঁজে ফেরে। ওদেরই ভয়েই তো আমাকে এক সুরঙ্গ হতে আর-এক সুরঙ্গে টাকা বদল করে বেড়াতে হয়। ধনপতি, এখানে কেন রে! তোর মতলবটা কী বল্‌ দেখি!

ধনপতি। ছেলেরা আজ সকলেই এই বেতসিনীর ধারে আমোদ করবে বলে আসছে— আমাকে ছুটি দিলে আমিও তাদের সঙ্গে খেলি।

লক্ষেশ্বর। বেতসিনীর ধারে! ঐ রে খবর পেয়েছে বুঝি। বেতসিনীর ধারেই তো আমি সেই গজমোতির কৌটো পুঁতে রেখেছি। (ধনপতির প্রতি) না না, খবরদার বলছি, সে-সব না। চল শীঘ্র চল, নামতা মুখস্থ করতে হবে।

ধনপতি। (নিশ্বাস ফেলিয়া) আজ এমন সুন্দর দিনটা!

লক্ষেশ্বর। দিন আবার সুন্দর কী রে। এইরকম বুদ্ধি মাথায় ঢুকলেই ছোঁড়াটা মরবে আর কি। যা বলছি, ঘরে যা। (ধনপতির প্রস্থান) ভারি বিশ্রী দিন। আশ্বিনের এই রোদ্দুর দেখলে আমার সুদ্ধ মাথা খারাপ করে দেয়, কিছুতে কাজে মন দিতে পারি নে। মনে করছি মলয়দ্বীপে গিয়ে কিছু চন্দন জোগাড় করবার জন্যে বেরিয়ে পড়লে হয়।

শেখর কবির প্রবেশ

এ লোকটা আবার এখানে কে আসে? কে হে তুমি? এখানে তুমি কী করতে ঘুরে বেড়াচ্ছ?

শেখর। আমি সন্ধান করতে বেরিয়েছি।

লক্ষেশ্বর। ভাব দেখে তাই বুঝেছি। কিন্তু কিসের সন্ধানে বলো দেখি?

শেখর। সেইটে এখনো ঠিক করতে পারি নি।

লক্ষেশ্বর। বয়স তো কম নয়, তবু এখনো ঠিক হয় নি? তবে কী উপায়ে ঠিক হবে।

শেখর। ঠিক জিনিসে যেমনি চোখ পড়বে।

লক্ষেশ্বর। ঠিক জিনিস কি এইরকম মাঠে-ঘাটে ছড়ানো থাকে।

শেখর। তাই তো শুনেছি। ঘরের মধ্যে সন্ধান করে তো পেলেম না।

লক্ষেশ্বর। লোকটা বলে কী? তুমি ঘরে বাইরে সন্ধান করবার ব্যাবসা ধরেছ— রাজা খবর পেলে যে তোমাকে আর ঘরের বার হতে দেবে না। পাহারা বসিয়ে দেবে।

শেখর। আমি রাজাকে সুদ্ধ এই ব্যাবসা ধরাব— যা মাঠে-ঘাটে ছড়ানো আছে তাই সংগ্রহ করবার বিদ্যে তাঁকে শেখাতে চাই।

লক্ষেশ্বর। কথাটা আর-একটু স্পষ্ট করে বলো তো।

শেখর। তা হলে একেবারেই বুঝতে পারবে না।

লক্ষেশ্বর। ওহে বাপু, তোমার ঐ সন্ধানের কাজটা ঠিক আমার এই ঘরের কাছটাতে না হয়ে কিছু তফাতে হলে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।

শেখর। আমাকে দেখে তোমার ভয় হচ্ছে কেন বলো তো।

লক্ষেশ্বর। সত্যি কথা বলব? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি রাজার চর। কোথা থেকে কী আদায় করা যেতে পারে রাজাকে সেই সন্ধান দেওয়াই তোমার মতলব।

শেখর। আদায় করবার জায়গা তো আমি খুঁজি বটে! তোমার বুদ্ধি আছে হে।

লক্ষেশ্বর। আছে বৈকি। সেইজন্যেই হাত জোড় করে বলছি আমার ঘরটার দিকে উঁকি দিয়ো না— আমি তোমাকে খুশি করে দেব।

শেখর। তোমার চেহারা দেখেই বুঝেছি সন্ধান করবার মতো ঘর তোমার নয়।

লক্ষেশ্বর। আশ্চর্য তোমার বুদ্ধি বটে। এ নইলে রাজকর্মচারী হবে কোন্‌ গুণে? রাজা বেছে বেছে লোক রাখে বটে। অকিঞ্চনের মুখ দেখলেই চিনতে পার?

শেখর। তা পারি। অতএব তোমার ঘরে আমার আনাগোনা চলবে না।

লক্ষেশ্বর। তোমার উপরে ভক্তি হচ্ছে। তা হলে আর বিলম্ব কোরো না— এইখান থেকে একটুখানি—

শেখর। আমি তফাতেই যাচ্ছি— তফাতে যাব বলেই বেরিয়েছি।

[প্রস্থান

লক্ষেশ্বর। "তফাতে যাব বলেই বেরিয়েছি!" লোকটা যখন কথা কয় সব ঝাপসা ঠেকে। রাজারা স্পষ্ট কথা সহ্য করতে পারে না, তাই বোধ হয় দায়ে পড়ে এইরকম অভ্যেস করেছে।

[প্রস্থান

পুঁথি প্রভৃতি লইয়া উপনন্দের প্রবেশ ও একটি কোণে লিখিতে বসা

ঠাকুরদাদা ও বালকগণের প্রবেশ

গান

আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা।

একজন বালক। ঠাকুরদা, তুমি আমাদের দলে।

দ্বিতীয় বালক। না ঠাকুরদা, সে হবে না, তুমি আমাদের দলে।

ঠাকুরদাদা। না ভাই, আমি ভাগাভাগির খেলায় নেই; সে সব হয়ে বয়ে গেছে। আমি সকল দলের মাঝখানে থাকব, কাউকে বাদ দিতে পারব না। এবার গানটা ধর্।

গান

আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে
উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে,
আজ কিসের তরে নদীর চরে
চখাচখীর মেলা।

অন্য দল আসিয়া। ঠাকুরদা, এই বুঝি! আমাদের তুমি ডেকে আনলে না কেন। তোমার সঙ্গে আড়ি। জন্মের মতো আড়ি।

ঠাকুরদাদা। এত বড়ো দণ্ড! নিজেরা দোষ করে আমাকে শাস্তি! আমি তোদের ডেকে বের করব, না তোরা আমাকে ডেকে বাইরে টেনে আনবি। না ভাই, আজ ঝগড়া না, গান ধর্।

গান

ওরে যাব না, আজ ঘরে রে ভাই
যাব না আজ ঘরে।
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
নেব রে লুঠ করে।
যেন জোয়ার জলে ফেনার রাশি
বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি
কাটবে সকল বেলা।

প্রথম বালক। ঠাকুরদা, ঐ দেখো কে আসছে, ওকে তো কখনো দেখি নি।

ঠাকুরদাদা। পাগড়ি দেখে মনে হচ্ছে লোকটা পরদেশী।

প্রথম বালক। পরদেশী। ভারি মজা!

দ্বিতীয় বালক। আমি পরদেশী হব ঠাকুরদা।

তৃতীয় বালক। আমিও হব পরদেশী— কী মজা!

সকলে। আমরা সবাই পরদেশী হব।

প্রথম বালক। আমাদের ঐরকম পাগড়ি বানিয়ে দাও ঠাকুরদা, তোমার পায়ে পড়ি।

শেখরের প্রবেশ

প্রথম বালক। তুমি পরদেশী?

শেখর। ঠিক বলেছ।

দ্বিতীয় বালক। তুমি কী কর?

শেখর। আমি সব জায়গায়ই দেশ খুঁজে বেড়াই।

তৃতীয় বালক। তার মানে কী, পরদেশী?

শেখর। দেখো-না, শরৎকালে রাজারা দেশ জয় করতে বেরোয়— তার আসল কারণ পৃথিবীর অধীশ্বর হলেও এখনো তারা দেশ খুঁজে পায় নি, কোনো কালে পাবেও না।

প্রথম বালক। কেন পাবে না?

শেখর। তারা নির্বোধ, মনে করে লড়াই করে দেশ পাওয়া যায়। বিনা লড়াইয়ে যারা জয় করতে জানে তারাই আপন দেশ খুঁজে পায়।

দ্বিতীয় বালক। তুমি খুঁজে পেয়েছ?

শেখর। বড়ো শক্ত। কেননা, মানুষে লুকিয়ে রাখে। ঐ বাড়িটার কাছে সন্ধানে গিয়েছিলেম, একটা মানুষ ছুটে এসে বললে, এ তোমার জায়গা নয়, এ আমার।

সকলে। ও বুঝেছি। লক্ষ্মীপেঁচা।

প্রথম বালক। তার কোটরের কাছে গেলেই সে ঠোকর দিতে আসে।

দ্বিতীয় বালক। কিন্তু পরদেশী, আমাদের কাছে তোমার কোনো ভয় নেই।

শেখর। বাবা, তা হলে তোমাদের মধ্যেই আমার দেশ খুঁজে পাব।

গান

আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে—
ওরা যে ডাকতে জানে।
আশ্বিনে ওই শিউলি শাখে
মৌমাছিরে যেমন ডাকে
প্রভাতে সৌরভের গানে।
ঘর-ছাড়া আজ ঘর পেল যে,
আপন মনে রইল মজে।
হাওয়ায় হাওয়ায় কেমন করে
খবর যে তার পৌঁছোল রে,
ঘর-ছাড়া ওই মেঘের কানে।

ঠাকুরদাদা। ও ভাই, আমার জায়গা তোমাকে ছেড়ে দিলেম।

শেখর। ছাড়তে হবে কেন? দুজনেরই জায়গা আছে।

ঠাকুরদাদা। তোমাকে চিনে নিয়েছি। তুমি মন ভোলাতে জান।

শেখর। আমার নিজের মন ভুলেছে বলেই আমি মন ভুলিয়ে বেড়াই।

প্রথম বালক। তার মানে কী পরদেশী? কেমন করে মন ভোলে?

শেখর। গান

কেন যে মন ভোলে আমার মন জানে না।
তারে মানা করে কে, আমার মন মানে না।
কেউ বোঝে না তারে,
সে যে বোঝে না আপনারে,
সবাই লজ্জা দিয়ে যায়, সে তো কানে আনে না।
তার খেয়া গেল পারে
সে যে রইল নদীর ধারে।
কাজ করে সব সারা (ওই) এগিয়ে গেল কারা
আনমনা মন সেদিকপানে দৃষ্টি হানে না।

ঠাকুরদাদা। তোমাকে ছাড়ছি নে ভাই, নিজের মনের কথা তোমার মুখ থেকে শুনে নেব

ছেলেরা। আমরা তোমাকে ছাড়ব না।

শেখর। তোমরা ছাড়লে আমিই বুঝি তোমাদের ছাড়ব মনে করছ? একবার চার দিকটা ঘুরে আসছি— কোথায় এলুম একবার বুঝে নিই।

প্রস্থান

প্রথম বালক। ঠাকুরদা, ঐ দেখো, ঐ দেখো সন্ন্যাসী আসছে।

দ্বিতীয় বালক। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, আমরা সন্ন্যাসীকে নিয়ে খেলব। আমরা সব চেলা সাজব।

তৃতীয় বালক। আমরা ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে যাব, কোন্‌ দেশে চলে যাব কেউ খুঁজেও পাবে না

ঠাকুরদাদা। আরে চুপ, চুপ।

সকলে। সন্ন্যাসী ঠাকুর, সন্ন্যাসী ঠাকুর।

ঠাকুরদাদা। আরে থাম্‌ থাম্‌। ঠাকুর রাগ করবে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

বালকগণ। সন্ন্যাসী ঠাকুর, তুমি কি আমাদের উপর রাগ করবে? আজ আমরা সব তোমার চেলা হব।

সন্ন্যাসী। হা হা হা হা! এ তো খুব ভালো কথা। তার পরে আবার তোমরা সব শিশু-সন্ন্যাসী সেজো, আমি তোমাদের বুড়ো চেলা সাজব। এ বেশ খেলা, এ চমৎকার খেলা।

ঠাকুরদাদা। প্রণাম হই। আপনি কে?

সন্ন্যাসী। আমি ছাত্র।

ঠাকুরদাদা। আপনি ছাত্র!

সন্ন্যাসী। হাঁ, পুঁথিপত্র সব পোড়াবার জন্যে বের হয়েছি।

ঠাকুরদাদা। ও ঠাকুর, বুঝেছি। বিদ্যের বোঝা সমস্ত ঝেড়ে ফেলে দিব্যি একেবারে হালকা হয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেবেন।

সন্ন্যাসী। চোখের পাতার উপরে পুঁথির পাতাগুলো আড়াল করে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে— সেইগুলো খসিয়ে ফেলতে চাই।

ঠাকুরদাদা। বেশ, বেশ, আমাকেও একটু পায়ের ধুলো দেবেন। প্রভু, আপনার নাম বোধ করি শুনেছি— আপনি তো স্বামী অপূর্বানন্দ?

ছেলেরা। সন্ন্যাসী ঠাকুর, ঠাকুরদা কী মিথ্যে বকছেন। এমনি করে আমাদের ছুটি বয়ে যাবে

সন্ন্যাসী। ঠিক বলেছ, বৎস, আমারও ছুটি ফুরিয়ে আসছে।

ছেলেরা। তোমার কতদিনের ছুটি?

সন্ন্যাসী। খুব অল্পদিনের। আমার গুরুমশায় তাড়া করে বেরিয়েছেন, তিনি বেশি দূরে নেই, এলেন বলে।

ছেলেরা। ও বাবা, তোমারও গুরুমশায়!

প্রথম বালক। সন্ন্যাসী ঠাকুর, চলো আমাদের যেখানে হয় নিয়ে চলো। তোমার যেখানে খুশি।

ঠাকুরদাদা। আমিও পিছনে আছি, ঠাকুর, আমাকেও ভুলো না।

সন্ন্যাসী। আহা, ও ছেলেটি কে? গাছের তলায় এমন দিনে পুঁথির মধ্যে ডুবে রয়েছে!

বালকগণ। উপনন্দ।

প্রথম বালক। ভাই উপনন্দ, এসো ভাই। আমরা আজ সন্ন্যাসী ঠাকুরের চেলা সেজেছি, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। তুমি হবে সর্দার চেলা।

উপনন্দ। না ভাই, আমার কাজ আছে।

ছেলেরা। কিচ্ছু কাজ নেই, তুমি এসো।

উপনন্দ। আমার পুঁথি নকল করতে অনেকখানি বাকি আছে।

ছেলেরা। সে বুঝি কাজ! ভারি তো কাজ! ঠাকুর, তুমি ওকে বলো-না। ও আমাদের কথা শুনবে না। কিন্তু উপনন্দকে না হলে মজা হবে না।

সন্ন্যাসী। (পাশে বসিয়া) বাছা, তুমি কী কাজ করছ। আজ তো কাজের দিন না।

উপনন্দ। (সন্ন্যাসীর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া, পায়ের ধুলা লইয়া) আজ ছুটির দিন— কিন্তু আমার ঋণ আছে, শোধ করতে হবে, তাই আজ কাজ করছি।

ঠাকুরদাদা। উপনন্দ, জগতে তোমার আবার ঋণ কিসের ভাই!

উপনন্দ। ঠাকুরদা, আমার প্রভু মারা গিয়েছেন; তিনি লক্ষেশ্বরের কাছে ঋণী; সেই ঋণ আমি পুঁথি লিখে শোধ দেব।

ঠাকুরদাদা। হায় হায়, তোমার মতো কাঁচা বয়সের ছেলেকেও ঋণ শোধ করতে হয়! আর এমন দিনেও ঋণশোধ! ঠাকুর, আজ নতুন উত্তরে হাওয়ায় ওপারে কাশের বনে ঢেউ দিয়েছে, এপারে ধানের খেতের সবুজে চোখ একেবারে ডুবিয়ে দিলে, শিউলি বন থেকে আকাশে আজ পুজোর গন্ধ ভরে উঠেছে, এরই মাঝখানে ঐ ছেলেটি আজ ঋণশোধের আয়োজনে বসে গেছে— এও কি চক্ষে দেখা যায়?

সন্ন্যাসী। বল কী, এর চেয়ে সুন্দর কি আর কিছু আছে। ঐ ছেলেটিই তো আজ শারদার বরপুত্র হয়ে তাঁর কোল উজ্জ্বল করে বসেছে। তিনি তাঁর আকাশের সমস্ত সোনার আলো দিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরেছেন। আহা, আজ এই বালকের ঋণশোধের মতো এমন শুভ্র ফুলটি কি কোথাও ফুটেছে, চেয়ে দেখো তো। লেখো, লেখো, বাবা, তুমি লেখো, আমি দেখি। তুমি পঙক্তির পর পঙক্তি লিখছ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ— তোমার এত ছুটির আয়োজন আমরা তো পণ্ড করতে পারব না। দাও বাবা, একটা পুঁথি আমাকে দাও, আমিও লিখি। এমন দিনটা সার্থক হোক।

ঠাকুরদাদা। আছে আছে, চশমাটা ট্যাঁকে আছে, আমিও বসে যাই-না।

প্রথম বালক। ঠাকুর, আমরাও লিখব। সে বেশ মজা হবে।

দ্বিতীয় বালক। হাঁ হাঁ, সে বেশ মজা হবে।

উপনন্দ। বল কী ঠাকুর, তোমাদের যে ভারি কষ্ট হবে।

সন্ন্যাসী। সেইজন্যেই বসে গেছি। আজ আমরা সব মজা করে কষ্ট করব। কী বল, বাবাসকল। আজ একটা কিছু কষ্ট না করলে আনন্দ হচ্ছে না।

সকলে। (হাততালি দিয়া) হাঁ, হাঁ, নইলে মজা কিসের।

প্রথম বালক। দাও, দাও, আমাকে একটা পুঁথি দাও।

দ্বিতীয় বালক। আমাকেও একটা দাও-না।

উপনন্দ। তোমরা পারবে তো ভাই?
প্রথম বালক। খুব পারব। কেন পারব না।
উপনন্দ। শ্রান্ত হবে না তো?
দ্বিতীয় বালক। কক্‌খনো না।
উপনন্দ। খুব ধরে ধরে লিখতে হবে কিন্তু।
প্রথম বালক। তা বুঝি পারি নে? আচ্ছা তুমি দেখো।
উপনন্দ। ভুল থাকলে চলবে না।
দ্বিতীয় বালক। কিচ্ছু ভুল থাকবে না!
প্রথম বালক। এ বেশ মজা হচ্ছে। পুঁথি শেষ করব তবে ছাড়ব।
দ্বিতীয় বালক। নইলে ওঠা হবে না।
তৃতীয় বালক। কী বল ঠাকুরদা, আজ লেখা শেষ করে দিয়ে তবে উপনন্দকে নিয়ে নৌকো বাচ করতে যাব। বেশ মজা!
ছেলেরা। এই-যে পরদেশী, আমাদের পরদেশী।

শেখরের প্রবেশ

সন্ন্যাসী। একি! তুমি পরদেশী না কি?
শেখর। পরদেশী আমার সাজমাত্র, আসলে আমি সবদেশী।
সন্ন্যাসী। সাজের দরকার কী ছিল?
শেখর। রাজাকে সাজতে হয় সন্ন্যাসী, রাজা যে কী জিনিস সেই বোঝবার জন্যে। যে-মানুষ সব দেশেই দেশকে খুঁজতে চায় তাকে পরদেশী সাজতে হয়। এই আমাদের ঠাকুরদা বুড়ো হয়ে বসে আছেন ওটাও ওঁর সাজমাত্র— উনি যে বালক সেটা উনি বার্ধক্যের ভিতর দিয়ে খুব ভালো করে চিনে নিচ্ছেন।
ঠাকুরদাদা। ভাই, এ খবর তুমি পেলে কোথা থেকে।
শেখর। সাজের ভিতর থেকে মানুষকে খুঁজে বের করা, সেই তো আমার কাজ। ঠাকুরদা, আমি আগে থাকতে তোমাকে বলে রাখছি এই যে মানুষটিকে দেখছ, উনি বড়ো যে-সে লোক নন— একদিন হয়তো চিনতে পারবে।
ঠাকুরদাদা। সে আমি কিছু কিছু চিনেছি— নিজের বুদ্ধির গুণে নয় ওঁরই দীপ্তির গুণে।
সন্ন্যাসী। আর এই পরদেশীকে কিরকম ঠেকছে ঠাকুরদা।
ঠাকুরদাদা। সে আর কী বলব, যেন একেবারে চিরদিনের চেনা।
সন্ন্যাসী। ঠিক বলেছ, আমার পক্ষেও তাই। কিন্তু আবার ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় যেন ওঁকে চেনবার জো নেই। উনি যে কিসের খোঁজে কখন কোথায় ফেরেন তা বোঝা শক্ত।

গান

শেখর। আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে, আমার মনে।
ও সে আছে বলে
আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে, প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে।
সে আছে বলে চোখের তারার আলোয়
এত রূপের খেলা রঙের মেলা অসীম সাদায় কালোয়,
ও সে সঙ্গে থাকে বলে
আমার অঙ্গে অঙ্গে পুলক লাগায় দখিন সমীরণে।
তারি বাণী হঠাৎ উঠে পুরে
আন্‌মনা কোন্ তানের মাঝে আমার গানের সুরে।

দুখের দোলে হঠাৎ মোরে দোলায়
কাজের মাঝে লুকিয়ে থেকে
আমারে কাজ ভোলায়।
সে মোর চিরদিনের বলে
তারি পুলকে মোর পলকগুলি ভরে ক্ষণে ক্ষণে।

প্রথম বালক। কিন্তু আর লিখতে ভালো লাগছে না।

দ্বিতীয় বালক। না, আর নয়।

সকলে। আজ এই পর্যন্ত থাক্‌।

উপনন্দ। আমাকে বাঁচালে। এখন পুঁথিগুলি ফিরে দাও।

প্রথম বালক। আচ্ছা পরদেশী, তুমি এত গান গাও কেন?

শেখর। আর কোনো গুণ যদি থাকত তা হলে গাইতেম না। ঐ দেখো-না কেন, তোমাদের সেই লক্ষ্মীপেঁচা তো গান গায় না।

সকলে। না, সে চেঁচায়।

শেখর। তার মানে, সার বস্তুর দ্বারা ভরতি হয়ে ও একেবারে নিরেট।

দ্বিতীয় বালক। পরদেশী, তোমার দেশের গল্প তুমি আমাদের শোনাবে?

শেখর। আমার দেশের গল্প ভারি অদ্ভুত!

সকলে। আমরা অদ্ভুত গল্প শুনব।

শেখর। আচ্ছা, তা হলে চলো, কোপাই নদীর ধার দিয়ে একবার পারুলডাঙায় তোমাদের ঘুরিয়ে নিয়ে আসি গে। চলতে চলতে গল্প হবে।

সন্ন্যাসী। এই দেখো, ওর সঙ্গে আমরা পারব না— আমাদের সব চেলা ভাঙিয়ে নিলে।

শেখর। ভাঙিয়ে নেওয়া সহজ, কিন্তু টিকিয়ে রাখা শক্ত। এখনই ফিরে আসবে!

[বালকদলের সঙ্গে শেখরের প্রস্থান

সন্ন্যাসী। বাবা উপনন্দ, তোমার প্রভুর কী নাম ছিল।

উপনন্দ। সুরসেন।

সন্ন্যাসী। সুরসেন! বীণাচার্য!

উপনন্দ। হাঁ ঠাকুর, তুমি তাঁকে জানতে?

সন্ন্যাসী। আমি তাঁর বীণা শুনব আশা করেই এখানে এসেছিলেম।

উপনন্দ। তাঁর কি এত খ্যাতি ছিল!

ঠাকুরদাদা। তিনি কি এত বড়ো গুণী! তুমি তাঁর বাজনা শোনবার জন্যেই এদেশে এসেছ? তবে তো আমরা তাঁকে চিনি নি।

সন্ন্যাসী। এখানকার রাজা?

ঠাকুরদাদা। এখানকার রাজা তো কোনোদিন তাঁকে জানেন নি, চক্ষেও দেখেন নি। তুমি তাঁর বীণা কোথায় শুনলে!

সন্ন্যাসী। তোমরা হয়তো জান না বিজয়াদিত্য বলে একজন রাজা—

ঠাকুরদাদা। বল কী ঠাকুর! আমরা অত্যন্ত মূর্খ, গ্রাম্য, তাই বলে বিজয়াদিত্যের নাম জানব না সে কি হয়? তিনি যে আমাদের চক্রবর্তী সম্রাট।

সন্ন্যাসী। তা হবে। তা সেই লোকটির সভায় একদিন সুরসেন বীণা বাজিয়েছিলেন তখন শুনেছিলেম। রাজা তাঁকে রাজধানীতে রাখবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই পারেন নি।

ঠাকুরদাদা। হায় হায়, এত বড়ো লোকের আমরা কোনো আদর করতে পারি নি!

সন্ন্যাসী। বাবা উপনন্দ, তোমার সঙ্গে তাঁর কিরকমে সম্বন্ধ হল?

উপনন্দ। ছোটো বয়সে আমার বাপ মারা গেলে আমি অন্য দেশ থেকে এই নগরে আশ্রয়ের জন্যে এসেছিলেম। সেদিন শ্রাবণমাসের সকাল বেলায় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছিল, আমি লোকনাথের মন্দিরের এককোণে দাঁড়াব বলে প্রবেশ করছিলেম। পুরোহিত আমাকে বোধ হয় নীচ জাত মনে করে তাড়িয়ে দিলেন। সেদিন সকালে সেইখানে বসে আমার প্রভু বীণা বাজাচ্ছিলেন। তিনি তখনই মন্দির ছেড়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন— বললেন, এসো বাবা, আমার ঘরে এসো। সেইদিন থেকে ছেলের মতো তিনি আমাকে কাছে রেখে মানুষ করেছেন— লোকে তাঁকে কত কথা বলেছে তিনি কান দেন নি। আমি তাঁকে বলেছিলেম, প্রভু, আমাকে বীণা বাজাতে শেখান, আমি তা হলে কিছু কিছু উপার্জন করে আপনার হাতে দিতে পারব ; তিনি বললেন, বাবা, এ বিদ্যা পেট ভরাবার নয় ; আমার আর-এক বিদ্যা জানা আছে তাই তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে আমাকে রঙ দিয়ে চিত্র করে পুঁথি লিখতে শিখিয়েছেন। যখন অত্যন্ত অচল হয়ে উঠত তখন তিনি মাঝে মাঝে বিদেশে গিয়ে বীণা বাজিয়ে টাকা নিয়ে আসতেন। এখানে তাঁকে সকলে পাগল বলেই জানত।

সন্ন্যাসী। সুরসেনের বীণা শুনতে পেলেম না, কিন্তু বাবা উপনন্দ, তোমার কল্যাণে তাঁর আর-এক বীণা শুনে নিলুম, এর সুর কোনোদিন ভুলব না। বাবা, লেখো, লেখো। আমরা ততক্ষণ আমাদের দলবলের খবর নিয়ে আসি গে।

[প্রস্থান

শেখর ও রাজা সোমপালের প্রবেশ

শেখর। বিজয়াদিত্যকে তুমি হার মানাতে চাও, তা হলে আগে ঐ অপূর্বানন্দ সন্ন্যাসীকে বশ করো। রাজা সোমপাল, তিনিও নিশ্চয় তোমার মনের কথা জানেন।

সোমপাল। কোথায় তাঁকে পাব।

শেখর। তিনি এখানেই এসেছেন আমি জানি। কাছাকাছি কোথাও আছেন।

সোমপাল। দেখো আমি লোক চিনি। তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে তোমার দ্বারা আমার কাজ উদ্ধার হবে।

শেখর। তা হতেও পারে, অসম্ভব নয়। বিজয়াদিত্যকে বশ করবার ফন্দি আমি হয়তো তোমাকে কিছু কিছু বলে দিতে পারব।

সোমপাল। দেখো, তোমাকে আমি রাজমন্ত্রী করে দেব।

শেখর। আমার যদি মন্ত্রণা চাও তা হলে আমাকে মন্ত্রী কোরো না। মন্ত্রণা দেওয়াই যার কাজ তার মন্ত্রণা কোনো রাজার ভালো লাগে না। বিজয়াদিত্যের সভায় যে একজন কবি আছে, আমি দেখেছি—

সোমপাল। আরে ছি ছি, সে-ও আবার কবি হল! ঐ তো রায়শেখরের কথা বলছ?

শেখর। হাঁ, সেই বটে।

সোমপাল। সে আমার বিদূষকেরও যোগ্য নয়।

শেখর। একেবারেই নয়।

সোমপাল। বিজয়াদিত্য যেমন রাজা তার কবিটিও তেমনি।

শেখর। তাই তো অনেকে বলে। তোমার সভায় তাকে—

সোমপাল। আমার সভায় যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ কিছুতেই—

শেখর। নিশ্চয়ই। ততক্ষণ সে—

সোমপাল। সে-কথা পরে হবে। এখন সন্ন্যাসীকে তুমি খুঁজে বের করো ; দেখা হলেই তাকে আমার রাজসভায় পাঠিয়ে দিয়ো, বিলম্ব কোরো না। আমি বরঞ্চ আমার দূতকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান

সন্ন্যাসী ও ঠাকুরদাদার প্রবেশ

সন্ন্যাসী। উপনন্দ, ঐ যে পরদেশী এসেছে— ওকে দেখে তোমার মনে হয় না কি, তোমার আচার্য সুরসেনেরই ও জুড়ি?

উপনন্দ। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন তাঁরই বীণা শুনছি।

সন্ন্যাসী। তুমি যেমন তাঁকে পেয়েছিলে তেমনি করেই এই মানুষটিকে পাবে।

উপনন্দ। উনি কি আমাকে নেবেন?

সন্ন্যাসী। ওর মুখ দেখেই কি বুঝতে পার নি?

উপনন্দ। পেরেছি। আমার প্রভুই বুঝি ওঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। আ সর্বনাশ! যেখানটিতে আমি কৌটো পুঁতে রেখেছিলুম ঠিক সেই জায়গাটিতেই যে উপনন্দ বসে গেছে! আমি ভেবেছিলেম ছোঁড়াটা বোকা বুঝি তাই পরের ঋণ শুধতে এসেছে। তা তো নয় দেখছি! পরের ঘাড় ভাঙাই ওর ব্যাবসা। আমার গজমোতির খবর পেয়েছে। একটা সন্ন্যাসীকেও কোথা থেকে জুটিয়ে এনেছে দেখছি। সন্ন্যাসী হাত চেলে জায়গাটা বের করে দেবে। উপনন্দ!

উপনন্দ। কী।

লক্ষেশ্বর। ওঠ্ ওঠ্ ঐ জায়গা থেকে। এখানে কী করতে এসেছিস?

উপনন্দ। অমন করে চোখ রাঙাও কেন? এ কি তোমার জায়গা নাকি?

লক্ষেশ্বর। এটা আমার জায়গা কি না সে খোঁজে তোমার দরকার কী হে বাপু! ভারি সেয়ানা দেখছি! তুমি বড়ো ভালোমানুষটি সেজে আমার কাছে এসেছিলে। আমি বলি সত্যিই বুঝি প্রভুর ঋণশোধ করবার জন্যেই ছোঁড়াটা আমার কাছে এসেছে— কেননা, সেটা রাজার আইনেও আছে—

উপনন্দ। আমি তো সেইজন্যেই এখানে পুঁথি লিখতে এসেছি।

লক্ষেশ্বর। সেইজন্যেই এসেছ বটে! আমার বয়স কত আন্দাজ করছ বাপু। আমি কি শিশু।

সন্ন্যাসী। কেন বাবা, তুমি কী সন্দেহ করছ?

লক্ষেশ্বর। কী সন্দেহ করছি! তুমি তা কিছু জান না! বড়ো সাধু! ভণ্ড সন্ন্যাসী কোথাকার!

ঠাকুরদাদা। আরে কী বলিস লখা। আমার ঠাকুরকে অপমান!

উপনন্দ। এই রঙ-বাটা নোড়া দিয়ে তোমার মুখ গুঁড়িয়ে দেব-না? টাকা হয়েছে বলে অহংকার! কাকে কী বলতে হয় জান না!

[সন্ন্যাসীর পশ্চাতে লক্ষেশ্বরের লুক্কায়ন

সন্ন্যাসী। আরে কর কী ঠাকুরদা, কর কী বাবা! লক্ষেশ্বর তোমাদের চেয়ে ঢের বেশি মানুষ চেনে। যেমনি দেখেছে অমনি ধরা পড়ে গেছে। ভণ্ড সন্ন্যাসী যাকে বলে! বাবা লক্ষেশ্বর, এত দেশের এত মানুষ ভুলিয়ে এলেম, তোমাকে ভোলাতে পারলেম না।

লক্ষেশ্বর। না, ঠিক ঠাওরাতে পারছি নে। হয়তো ভালো করি নি। আবার শাপ দেবে কি কী করবে! তিনখানা জাহাজ এখনো সমুদ্রে আছে। (পায়ের ধুলা লইয়া) প্রণাম হই ঠাকুর! হঠাৎ চিনতে পারি নি। বিরূপাক্ষের মন্দিরে আমাদের ঐ বিকটানন্দ বলে একটা সন্ন্যাসী আছে আমি বলি সেই ভণ্ডটাই বুঝি! ঠাকুরদা, তুমি এক কাজ করো। সন্ন্যাসী ঠাকুরকে আমার ঘরে নিয়ে যাও, আমি ওঁকে কিছু ভিক্ষে দিয়ে দেব। আমি চললেম বলে। তোমরা এগোও।

ঠাকুরদাদা। তোমার বড়ো দয়া! তোমার ঘরের এক মুঠো চাল নেবার জন্যে ঠাকুর সাত সিন্ধু পেরিয়ে এসেছেন!

সন্ন্যাসী। বল কী ঠাকুরদা! এক মুঠো চাল যেখানে দুর্লভ সেখান থেকে সেটি নিতে হবে বৈকি! বাবা লক্ষেশ্বর, চলো তোমার ঘরে।

লক্ষেশ্বর। আমি পরে যাচ্ছি, তোমরা এগোও। উপনন্দ, তুমি আগে ওঠো। ওঠো, শীঘ্র ওঠো বলছি, তোলো তোমার পুঁথিপত্র।

উপনন্দ। আচ্ছা তবে উঠলেম, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ রইল না।

লক্ষেশ্বর। না থাকলেই যে বাঁচি বাবা! আমার সম্বন্ধে কাজ কী। এতদিন তো আমার বেশ চলে যাচ্ছিল।

উপনন্দ। আমি যে ঋণ স্বীকার করেছিলেম তোমার কাছে এই অপমান সহ্য করেই তার থেকে মুক্তি গ্রহণ করলেম। বাস, চুকে গেল।

[প্রস্থান

লক্ষেশ্বর। ওরে! সব ঘোড়সওয়ার আসে কোথা থেকে! রাজা আমার গজমোতির খবর পেলে নাকি! এর চেয়ে উপনন্দ যে ছিল ভালো। এখন কী করি। (সন্ন্যাসীকে ধরিয়া) ঠাকুর, তোমার পায়ে ধরি, তুমি ঠিক এইখানটিতে বোসো— এই যে এইখানে— আর-একটু বাঁ দিকে সরে এসো— এই হয়েছে। খুব চেপে বোসো। রাজাই আসুক আর সম্রাটই আসুক তুমি কোনোমতেই এখান থেকে উঠো না। তা হলে আমি তোমাকে খুশি করে দেব।

ঠাকুরদাদা। আরে লখা করে কী। হঠাৎ খেপে গেল নাকি।

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, আমি তবে একটু আড়ালে যাই। আমাকে দেখলেই রাজার টাকার কথা মনে পড়ে যায়। শত্রুরা লাগিয়েছে আমি সব টাকা পুঁতে রেখেছি— শুনে অবধি রাজা যে কত জায়গায় কূপ খুঁড়তে আরম্ভ করেছেন তার ঠিকানা নেই। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, প্রজাদের জলদান করছেন। কোন্‌দিন আমার ভিটেবাড়ির ভিত কেটে জলদানের হুকুম হবে, সেই ভয়ে রাত্রে ঘুমোতে পারি নে।

[প্রস্থান

রাজদূতের প্রবেশ

রাজদূত। সন্ন্যাসীঠাকুর, প্রণাম হই। আপনিই তো অপূর্বানন্দ?

সন্ন্যাসী। কেউ কেউ আমাকে তাই বলেই তো জানে।

রাজদূত। আপনার অসামান্য ক্ষমতার কথা চারি দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। আমাদের মহারাজ সোমপাল আপনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করেন।

সন্ন্যাসী। যখনই আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন তখনই আমাকে দেখতে পাবেন।

রাজদূত। আপনি তা হলে যদি একবার—

সন্ন্যাসী। আমি একজনের কাছে প্রতিশ্রুত আছি এইখানেই আমি অচল হয়ে বসে থাকব। অতএব আমার মতো অকিঞ্চন অকর্মণ্যকেও তোমার রাজার যদি বিশেষ প্রয়োজন থাকে তা হলে তাঁকে এইখানেই আসতে হবে।

রাজদূত। রাজোদ্যান অতি নিকটেই— ঐখানেই তিনি অপেক্ষা করছেন।

সন্ন্যাসী। যদি নিকটেই হয় তবে তো তাঁর আসতে কোনো কষ্ট হবে না।

রাজদূত। যে আজ্ঞা, তবে ঠাকুরের ইচ্ছা তাঁকে জানাই গে। [প্রস্থান

ঠাকুরদাদা। প্রভু, এখানে রাজসমাগমের সম্ভাবনা হয়ে এল, আমি তবে বিদায় হই।

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, তুমি আমার শিশু বন্ধুগুলিকে নিয়ে ততক্ষণ আসর জমিয়ে রাখো, আমি বেশি বিলম্ব করব না।

ঠাকুরদাদা। রাজার উৎপাতই ঘটুক আর অরাজকতাই হোক আমি প্রভুর চরণ ছাড়ছি নে।

[প্রস্থান

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, তুমিই অপূর্বানন্দ! তবে তো বড়ো অপরাধ হয়ে গেছে। আমাকে মাপ করতে হবে।

সন্ন্যাসী। তুমি আমাকে ভণ্ডতপস্বী বলেছ এই যদি তোমার অপরাধ হয় আমি তোমাকে মাপ করলেম।

লক্ষেশ্বর। বাবাঠাকুর, শুধু মাপ করতে তো সকলেই পারে— সে ফাঁকিতে আমার কী হবে। আমাকে একটা-কিছু ভালো রকম বর দিতে হচ্ছে। যখন দেখা পেয়েছি তখন শুধু হাতে ফিরছি নে।

সন্ন্যাসী। কী বর চাই।

লক্ষেশ্বর। লোকে যতটা মনে করে ততটা নয়, তবে কিনা আমার অল্পস্বল্প কিছু জমেছে— সে অতি যৎসামান্য— তাতে আমার মনের আকাঙ্ক্ষা তো মিটছে না। শরৎকাল এসেছে, আর ঘরে বসে থাকতে পারছি নে— এখন বাণিজ্যে বেরোতে হবে। কোথায় গেলে সুবিধা হতে পারে আমাকে সেই সন্ধানটি বলে দিতে হবে— আমাকে আর যেন ঘুরে বেড়াতে না হয়।

সন্ন্যাসী। আমিও সেই সন্ধানেই আছি, আর যেন ঘুরতে না হয়।

লক্ষেশ্বর। বল কী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী। আমি সত্যই বলছি।

লক্ষেশ্বর। ওঃ, তবে সেই কথাটাই বলো। বাবা, তোমরা আমাদের চেয়েও সেয়ানা।

সন্ন্যাসী। তার সন্দেহ আছে?

লক্ষেশ্বর। (কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া মৃদুস্বরে) সন্ধান কিছু পেয়েছ?

সন্ন্যাসী। কিছু পেয়েছি বৈকি। নইলে এমন করে ঘুরে বেড়াব কেন?

লক্ষেশ্বর। (সন্ন্যাসীর পা চাপিয়া ধরিয়া) বাবাঠাকুর, আর-একটু খোলসা করে বলো। তোমার পা ছুঁয়ে বলছি আমিও তোমাকে একেবারে ফাঁকি দেব না। কী খুঁজছ বলো তো, আমি কাউকে বলব না।

সন্ন্যাসী। তবে শোনো। লক্ষ্মী যে সোনার পদ্মটির উপরে পা দুখানি রাখেন আমি সেই পদ্মটির খোঁজে আছি।

লক্ষেশ্বর। ও বাবা! সে তো কম কথা নয়। তা হলে যে একেবারে সকল ল্যাঠাই চোকে। ঠাকুর, ভেবে ভেবে এ তো তুমি আচ্ছা বুদ্ধি ঠাওরেছ। কোনোগতিকে পদ্মটি যদি জোগাড় করে আনো তা হলে লক্ষ্মীকে আর তোমার খুঁজতে হবে না, লক্ষ্মীই তোমাকে খুঁজে বেড়াবেন; এ নইলে আমাদের চঞ্চলা ঠাকরুনটিকে তো জব্দ করবার জো নেই। তোমার কাছে তাঁর পা দুখানিই বাঁধা থাকবে। তা তুমি সন্ন্যাসী মানুষ, একলা পেরে উঠবে? এতে তো খরচপত্র আছে। এক কাজ করো-না বাবা, আমরা ভাগে ব্যাবসা করি।

সন্ন্যাসী। তা হলে তোমাকে যে সন্ন্যাসী হতে হবে। বহুকাল সোনা ছুঁতেই পাবে না।

লক্ষেশ্বর। সে যে শক্ত কথা।

সন্ন্যাসী। সব ব্যাবসা যদি ছাড়তে পার তবেই এ ব্যাবসা চলবে।

লক্ষেশ্বর। শেষকালে দু কূল যাবে না তো? যদি একেবারে ফাঁকিতে না পড়ি তা হলে তোমার তল্পি বয়ে তোমার পিছন পিছন চলতে রাজি আছি। সত্যি বলছি ঠাকুর, কারও কথায় বড়ো সহজে বিশ্বাস করি নে— কিন্তু তোমার কথাটা কেমন মনে লাগছে। আচ্ছা! আচ্ছা রাজি! তোমার চেলাই হব ঐ রে রাজা আসছে! আমি তবে একটু আড়ালে দাঁড়াই গে।

বন্দিগণের গান

রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে!
ব্যাপ্ত পরতাপ তব বিশ্বময় হে!
দুষ্টদলদলন তব দণ্ড ভয়কারী,
শত্রুজনদর্পহর দীপ্ত তরবারি,
সংকট শরণ্য তুমি দৈন্যদুখহারী,
মুক্ত অবরোধ তব অভ্যুদয় হে!

রাজা সোমপালের প্রবেশ

সোমপাল। প্রণাম হই ঠাকুর।

সন্ন্যাসী। জয় হোক। কী বাসনা তোমার।

সোমপাল। সে-কথা নিশ্চয় তোমার অগোচর নেই। আমি অখণ্ড রাজ্যের অধীশ্বর হতে চাই প্রভু!

সন্ন্যাসী। তা হলে গোড়া থেকে শুরু করো। তোমার খণ্ডরাজ্যটি ছেড়ে দাও।

সোমপাল। পরিহাস নয় ঠাকুর! বিজয়াদিত্যের প্রতাপ আমার অসহ্য বোধ হয়, আমি তার সামন্ত হয়ে থাকতে পারব না।

সন্ন্যাসী। রাজন্, তবে সত্য কথা বলি, আমার পক্ষেও সে ব্যক্তি অসহ্য হয়ে উঠেছে।

সোমপাল। বল কী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী। এক বর্ণও মিথ্যা বলছি নে। তাকে বশ করবার জন্যেই আমি মন্ত্রসাধনা করছি।

সোমপাল। তাই তুমি সন্ন্যাসী হয়েছ?

সন্ন্যাসী। তাই বটে।

সোমপাল। মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ হবে?

সন্ন্যাসী। অসম্ভব নেই।

সোমপাল। তা হলে ঠাকুর, আমার কথা মনে রেখো। তুমি যা চাও আমি তোমাকে দেব। যদি সে বশ মানে তা হলে আমার কাছে যদি—

সন্ন্যাসী। তা বেশ, সেই চক্রবর্তী সম্রাটকে আমি তোমার সভায় ধরে আনব।

সোমপাল। কিন্তু বিলম্ব করতে ইচ্ছা করছে না। শরৎকাল এসেছে— সকাল বেলা উঠে বেতসিনীর জলের উপর যখন আশ্বিনের রৌদ্র পড়ে তখন আমার সৈন্যসামন্ত নিয়ে দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। যদি আশীর্বাদ কর তা হলে—

সন্ন্যাসী। কোনো প্রয়োজন নেই; শরৎকালেই আমি তাকে তোমার কাছে সমর্পণ করব, এই তো উপযুক্ত কাল। তুমি তাকে নিয়ে কী করবে।

সোমপাল। আমার একটা কোনো কাজে লাগিয়ে দেব— তার অহংকার দূর করতে হবে।

সন্ন্যাসী। এ তো খুব ভালো কথা। যদি তার অহংকার চূর্ণ করতে পার তা হলে ভারি খুশি হব।

সোমপাল। ঠাকুর, চলো আমার রাজভবনে।

সন্ন্যাসী। সেটি পারছি নে। আমার দলের লোকদের অপেক্ষায় আছি। তুমি যাও বাবা। আমার জন্যে কিছু ভেবো না। তোমার মনের বাসনা যে আমাকে ব্যক্ত করে বলেছ এতে আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে। বিজয়াদিত্যের যে এত শত্রু জমে উঠেছে তা তো আমি জানতেম না!

সোমপাল। তবে বিদায় হই। প্রণাম! [প্রস্থান

(পুনশ্চ ফিরিয়া আসিয়া) আচ্ছা ঠাকুর, তুমি তো বিজয়াদিত্যকে জান, সত্য করে বলো দেখি, লোকে তার সম্বন্ধে যতটা রটনা করে ততটা কি সত্য?

সন্ন্যাসী। কিছুমাত্র না। লোকে তাকে একটা মস্ত রাজা বলে মনে করে কিন্তু সে নিতান্তই সাধারণ মানুষের মতো। তার সাজসজ্জা দেখেই লোকে ভুলে গেছে।

সোমপাল। বলো কী ঠাকুর! হা হা হা হা! আমিও তাই ঠাউরেছিলেম। অ্যাঁ! নিতান্তই সাধারণ মানুষ!

সন্ন্যাসী। আমার ইচ্ছে আছে, আমি তাকে সেইটে আচ্ছা করে বুঝিয়ে দেব। সে যে রাজার পোশাক পরে ফাঁকি দিয়ে অন্য পাঁচ জনের চেয়ে নিজেকে মস্ত একটা কিছু বলে মনে করে আমি তার সেই ভুলটা একেবারে ঘুচিয়ে দেব।

সোমপাল। ঠাকুর, তুমি সব ফাঁস করে দাও। ও যে মিথ্যে রাজা, ভুয়ো রাজা, সে যেন আর ছাপা না থাকে। ওর বড়ো অহংকার হয়েছে।

সন্ন্যাসী। আমি তো সেই চেষ্টাতেই আছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, যতক্ষণ না আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় আমি সহজে ছাড়ব না।

সোমপাল। প্রণাম!

[প্রস্থান

উপনন্দের প্রবেশ

উপনন্দ। ঠাকুর, আমার মনের ভার তো গেল না।

সন্ন্যাসী। কী হল বাবা!

উপনন্দ। মনে করেছিলেম লক্ষেশ্বর যখন আমাকে অপমান করেছে তখন ওর কাছে আমি আর ঋণ স্বীকার করব না। তাই পুঁথিপত্র নিয়ে ঘরে ফিরে গিয়েছিলেম। সেখানে আমার প্রভুর বীণাটি নিয়ে তার ধুলো ঝাড়তে গিয়ে তারগুলি বেজে উঠল— অমনি আমার মনটার ভিতর যে কেমন হল সে আমি বলতে পারি নে। সেই বীণার কাছে লুটিয়ে পড়ে বুক ফেটে আমার চোখের জল পড়তে লাগল। মনে হল আমার প্রভুর কাছে আমি অপরাধ করেছি। লক্ষেশ্বরের কাছে আমার প্রভু ঋণী হয়ে রইলেন আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আছি! ঠাকুর, এ তো আমার কোনোমতেই সহ্য হচ্ছে না। ইচ্ছে করছে আমার প্রভুর জন্যে আজ আমি অসাধ্য কিছু একটা করি। আমি তোমাকে মিথ্যা বলছি নে, তাঁর ঋণ শোধ করতে যদি আজ প্রাণ দিতে পারি তা হলে আমার খুব আনন্দ হবে— মনে হবে আজকের এই সুন্দর শরতের দিন আমার পক্ষে সার্থক হল।

সন্ন্যাসী। বাবা, তুমি যা বলছ সত্যই বলছ।

উপনন্দ। ঠাকুর, তুমি তো অনেক দেশ ঘুরেছ, আমার মতো অকর্মণ্যকেও হাজার কার্ষাপণ দিয়ে কিনতে পারেন এমন মহাত্মা কেউ আছেন? তা হলেই ঋণটা শোধ হয়ে যায়। এ নগরে যদি চেষ্টা করি তা হলে বালক বলে ছোটো জাত বলে সকলে আমাকে খুব কম দাম দেবে।

সন্ন্যাসী। না বাবা, তোমার মূল্য এখানে কেউ বুঝবে না। আমি ভাবছি কী, যিনি তোমার প্রভুকে অত্যন্ত আদর করতেন সেই বিজয়াদিত্য বলে রাজাটার কাছে গেলে কেমন হয়?

উপনন্দ। বিজয়াদিত্য? তিনি যে আমাদের সম্রাট!

সন্ন্যাসী। তাই নাকি?

উপনন্দ। তুমি জান না বুঝি?

সন্ন্যাসী। তা হবে। নাহয় তাই হল।

উপনন্দ। আমার মতো ছেলেকে তিনি কি দাম দিয়ে কিনবেন?

সন্ন্যাসী। বাবা, বিনামূল্যে কেনবার মতো ক্ষমতা তাঁর যদি থাকে তা হলে বিনামূল্যেই কিনবেন। কিন্তু তোমার ঋণটুকু শোধ করে না দিতে পারলে তাঁর এত ঋণ জমবে যে তাঁর রাজভাণ্ডার লজ্জিত হবে, এ আমি তোমাকে সত্যই বলছি।

উপনন্দ। ঠাকুর, এও কি সম্ভব?

সন্ন্যাসী। বাবা, জগতে কেবল কি এক লক্ষেশ্বরই সম্ভব, তার চেয়ে বড়ো সম্ভাবনা কি আর কিছুই নেই?

উপনন্দ। আচ্ছা, যদি সে সম্ভব হয় তো হবে, কিন্তু আমি ততদিন পুঁথিগুলি নকল করে কিছু কিছু শোধ করতে থাকি— নইলে আমার মনে বড়ো গ্লানি হচ্ছে।

সন্ন্যাসী। ঠিক কথা বলেছ বাবা! বোঝা মাথায় তুলে নাও, কারও প্রত্যাশায় ফেলে রেখে সময় বইয়ে দিয়ো না।

উপনন্দ। তা হলে চললেম ঠাকুর। তোমার কথা শুনে আমি মনে কত যে বল পেয়েছি সে আমি বলে উঠতে পারি নে।

[প্রস্থান

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, অনেক ভেবে দেখলেম— পারব না। তোমার চেলা হওয়া আমার কর্ম নয়। যা পেয়েছি তা অনেক দুঃখে পেয়েছি, তোমার এক কথায় সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে শেষকালে হায়-হায় করে মরব ! আমার বেশি আশায় কাজ নেই।

সন্ন্যাসী। সে কথাটা বুঝলেই হল।

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, এবার একটুখানি উঠতে হচ্ছে।

সন্ন্যাসী। (উঠিয়া) তা হলে তোমার কাছ থেকে ছুটি পাওয়া গেল।

লক্ষেশ্বর। (মাটি ও শুষ্কপত্র সরাইয়া কৌটা বাহির করিয়া) ঠাকুর, এইটুকুর জন্যে আজ সকাল থেকে সমস্ত হিসাব কিতাব ফেলে রেখে এই জায়গাটার চার দিকে ভূতের মতো ঘুরে বেড়িয়েছি। এই-যে গজমোতি, এ আমি তোমাকে আজ প্রথম দেখালেম। আজ পর্যন্ত কেবলই এটাকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়িয়েছি ; তোমাকে দেখাতে পেরে মনটা তবু একটু হালকা হল। (সন্ন্যাসীর হাতের কাছে অগ্রসর করিয়াই তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া লইয়া) না, হল না ! তোমাকে যে এত বিশ্বাস করলেম, তবু এ জিনিস একটিবার তোমার হাতে তুলে দিই এমন শক্তি আমার নেই। এই-যে আলোতে এটাকে তুলে ধরেছি আমার বুকের ভিতরে যেন গুর্‌গুর্ করছে। আচ্ছা ঠাকুর, বিজয়াদিত্য কেমন লোক বলো তো। তাকে বিক্রি করতে গেলে সে তো দাম না দিয়ে এটা আমার কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নেবে না ? আমার ঐ এক মুশকিল হয়েছে। আমি এটা বেচতেও পারছি নে, রাখতেও পারছি নে, এর জন্যে আমার রাত্রে ঘুম হয় না। বিজয়াদিত্যকে তুমি বিশ্বাস কর ?

সন্ন্যাসী। সব সময়েই কি তাকে বিশ্বাস করা যায় ?

লক্ষেশ্বর। সেই তো মুশকিলের কথা। আমি দেখছি, এটা মাটিতেই পোঁতা থাকবে, হঠাৎ কোন্‌দিন মরে যাব, কেউ সন্ধানও পাবে না।

সন্ন্যাসী। রাজাও না, সম্রাটও না, ঐ মাটিই সব ফাঁকি দিয়ে নেবে। তোমাকেও নেবে, আমাকেও নেবে।

লক্ষেশ্বর। তা নিক গে, কিন্তু আমার কেবলই ভাবনা হয়, আমি মরে গেলে কোথা থেকে কে এসে হঠাৎ হয়তো খুঁড়তে খুঁড়তে ওটা পেয়ে যাবে। যাই হোক ঠাকুর, কিন্তু তোমার মুখে ঐ সোনার পদ্মর কথাটা আমার কাছে বড়ো ভালো লাগে। আমার কেমন মনে হচ্ছে, ওটা তুমি হয়তো খুঁজে বের করতে পারবে। কিন্তু তা হোক গে, আমি তোমার চেলা হতে পারব না। প্রণাম।

[প্রস্থান

ঠাকুরদাদা ও শেখরের প্রবেশ

সন্ন্যাসী। ওহে পরদেশী, তুমি তো মানুষের ভিতরকার মতলব সব দেখতে পাও। তুমি জান আমি বেরিয়েছিলুম বিশ্বের ঋণশোধ করতে।

ঠাকুরদাদা। কী ঋণ প্রভু, আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন না ?

সন্ন্যাসী। আনন্দের ঋণ ঠাকুরদা। শরতে যে সোনার আলোয় সুধা ঢেলে দিয়েছে— তার শোধ করতে চাই যদি তো হৃদয় ঢেলে দিতে হবে। ওহে উদাসী, তুমি বল কী ?

শেখর। গান

দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া
তোমায় আমায়
জনম জনম এই চলেছে
মরণ কভু তারে থামায় ?
যখন তোমার গানে আমি জাগি
আকাশে চাই তোমার লাগি,

আবার একতারাতে আমার গানে
মাটির পানে তোমায় নামায়।
ওগো তোমার সোনার আলোর ধারা
তার ধারি ধার,
আমার কালো মাটির ফুল ফুটিয়ে
শোধ করি তার।
আমার শরৎ-রাতের শেফালি বন
সৌরভেতে মাতে যখন,
তখন পালটা সে তান লাগে তব
শ্রাবণ-রাতের প্রেম-বরিষায়।

সন্ন্যাসী। এই ঋণশোধের ছবি আমি দেখে নিলেম ঐ উপনন্দের মধ্যে। ওই তো প্রেমের ঋণ প্রেম দিয়ে শুধছে। উপনন্দকে তুমি দেখেছ?

শেখর। হাঁ তাঁকে দেখে নিয়েছি, বুঝেও নিয়েছি। ছেলেদের মুখে উপনন্দ আর ঠাকুরদা এই দুই নাম বাজছে। তাদের কাছে থেকে ওর সব খবর পেলুম।

সন্ন্যাসী। ওকে সবাই ভালোবাসে, কেননা ও যে দুঃখের শোভায় সুন্দর।

শেখর। ঠাকুর, যদি তাকিয়ে দেখ তবে দেখবে সব সুন্দরই দুঃখের শোভায় সুন্দর। এই যে ধানের খেত আজ সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে এর শিকড়ে শিকড়ে পাতায় পাতায় ত্যাগ। মাটি থেকে জল থেকে হাওয়া থেকে যা-কিছু ও পেয়েছে সমস্তই আপন প্রাণের ভিতর দিয়ে একেবারে নিংড়ে নিয়ে মঞ্জরীতে মঞ্জরীতে উৎসর্গ করে দিলে। তাই তো চোখ জুড়িয়ে গেল।

সন্ন্যাসী। ঠিক বলেছ উদাসী, প্রেমের আনন্দে উপনন্দ দুঃখের ভিতর দিয়ে জীবনের ভরা খেতের ফসল ফলিয়ে তুললে।

শেখর। ঐ দুঃখের রতনমালা বিশ্বের কণ্ঠে ঝলমল করছে।

গান

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ
দুখের অশ্রুধার।
জননী গো, গাঁথব তোমার
গলার মুক্তাহার।
চন্দ্রসূর্য পায়ের কাছে
মালা হয়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার
দুখের অলংকার।
ধনধান্য তোমারি ধন
কী করবে তা কও,
দিতে চাও তো দিয়ো আমায়,
নিতে চাও তো লও।
দুঃখ আমার ঘরের জিনিস,
খাঁটি রতন তুই তো চিনিস,
তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস,
এ মোর অহংকার॥

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। এই যে, এ লোকটি এখানে এসে জুটেছে। (চোখ টিপিয়া) ঠাকুরদা, এঁকে চিনতে পেরেছ কি, ইনি একজন সন্ধানী লোক।

শেখর। সেইজন্যেই তো তোমাকে ছেড়ে এখন এঁকে ধরেছি।

লক্ষেশ্বর। এঁকে দেখে ঠাউরেছ ওঁর সঞ্চয় কিছু আছে, আমার মতো অকিঞ্চন না।

শেখর। ঠিক বটে। সেইজন্যে লেগে আছি, আদায় না করে ছাড়ছি নে।

লক্ষেশ্বর। কিন্তু এতক্ষণ তোমরা তিনজনে মিলে চুপিচুপি কী পরামর্শ করছিলে বলো দেখি ?

সন্ন্যাসী। আমাদের সেই সোনার পদ্মের পরামর্শ।

লক্ষেশ্বর। অ্যাঁ ! এরই মধ্যে সমস্ত ফাঁস করে বসে আছ ? বাবা, তুমি এই ব্যাবসাবুদ্ধি নিয়ে সোনার পদ্মর আমদানি করবে ? তবেই হয়েছে। তুমি যেই মনে করলে আমি রাজি হলেম না অমনি তাড়াতাড়ি অংশীদার খুঁজতে লেগে গেছ ! কিন্তু এ-সব কি ঠাকুরদার কর্ম। ওঁর পুঁজিই বা কী।

সন্ন্যাসী। তুমি খবর পাও নি। কিন্তু একেবারে পুঁজি নেই তা নয়। ভিতরে ভিতরে জমিয়েছে।

লক্ষেশ্বর। (ঠাকুরদাদার পিঠ চাপড়াইয়া) সত্যি না কি ঠাকুরদা ? বড়ো তো ফাঁকি দিয়ে আসছ ! তোমাকে তো চিনতেম না। লোকে আমাকেই সন্দেহ করে, তোমাকে তো স্বয়ং রাজাও সন্দেহ করে না। তা হলে এতদিনে খানাতল্লাশি পড়ে যেত। আমি তো, দাদা, গুপ্তচরের ভয়ে ঘরে চাকরবাকর রাখি নে।

ঠাকুরদাদা। তবে যে আজ সকালে ছেলে তাড়াবার বেলায় উর্ধ্বস্বরে চোবে, তেওয়ারি, গিরধারিলালকে হাঁক পাড়ছিলে !

লক্ষেশ্বর। যখন নিশ্চয় জানি হাঁক পাড়লেও কেউ আসবে না, তখন উর্ধ্বস্বরের জোরেই আসর গরম করে তুলতে হয়। কিন্তু বলে তো ভালো করলেম না। মানুষের সঙ্গে কথা কবার তো বিপদই ঐ। সেইজন্যেই কারও কাছে ঘেঁষি নে। দেখো দাদা, ফাঁস করে দিয়ো না !

ঠাকুরদাদা। ভয় নেই তোমার।

লক্ষেশ্বর। ভয় না থাকলেও তবু ভয় ঘোচে কই। ঐ যে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ আসছে। ঐ দেখছ না দূরে— আকাশে যে ধুলো উড়িয়ে দিয়েছে ! সবাই খবর পেয়েছে স্বামী অপূর্বানন্দ এসেছেন। এবার পায়ের ধুলো নিয়ে তোমার পায়ের তেলো হাঁটু পর্যন্ত খইয়ে দেবে। যাই হোক তুমি যে-রকম আলগা মানুষ দেখছি, সেই কথাটা আর কারও কাছে ফাঁস কোরো না— অংশীদার আর বাড়িয়ো না।

[প্রস্থান

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, আর তো দেরি করলে চলবে না। লোকজন জুটতে আরম্ভ করেছে, 'পুত্র দাও' 'ধন দাও' করে আমাকে একেবারে মাটি করে দেবে। ছেলেগুলিকে এইবেলা ডাকো। তারা ধন চায় না, পুত্র চায় না, তাদের সঙ্গে খেলা জুড়ে দিলেই পুত্রধনের কাঙালরা আমাকে ত্যাগ করবে।

ঠাকুরদাদা। ছেলেদের আর ডাকতে হবে না। ঐ যে আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এল বলে।

[দ্রুত প্রস্থান

শেখরকে সঙ্গে লইয়া ছেলেদের প্রবেশ

ছেলেরা। সন্ন্যাসী ঠাকুর ! সন্ন্যাসী ঠাকুর !

সন্ন্যাসী। কী বাবা।

ছেলেরা। তুমি আমাদের নিয়ে খেলো।

সন্ন্যাসী। সে কি হয় বাবা ! আমার কি সে ক্ষমতা আছে ? তোমরা আমাকে নিয়ে খেলাও !

ছেলেরা। কী খেলা খেলবে ?

সন্ন্যাসী। আমরা আজ শারদোৎসব খেলব।

প্রথম বালক। সে বেশ হবে।

দ্বিতীয় বালক। সে বেশ মজা হবে।
তৃতীয় বালক। সে কী খেলা ঠাকুর?
চতুর্থ বালক। সে কেমন করে খেলতে হয়?
সন্ন্যাসী। এই পরদেশীকে তোমাদের সহায় করো, এ মানুষটি সকল খেলাই খেলতে জানে।
প্রথম বালক। সে বেশ মজা হবে।
দ্বিতীয় বালক। পরদেশী, তুমি বলে দাও আমাদের কী করতে হবে।
শেখর। আচ্ছা, তা হলে চলো তোমাদের সাজিয়ে নিয়ে আসি গে।

[বালকগণকে লইয়া কবির প্রস্থান

একদল লোকের প্রবেশ

প্রথম ব্যক্তি। ওরে সন্ন্যাসী কোথায় গেল রে।
দ্বিতীয় ব্যক্তি। কই বাবা, সন্ন্যাসী কই।
ঠাকুরদাদা। এই যে আমাদের সন্ন্যাসী।
প্রথম ব্যক্তি। ও যেন খেলার সন্ন্যাসী। সত্যিকার সন্ন্যাসী কোথায় গেলেন।
সন্ন্যাসী। সত্যিকার সন্ন্যাসী কি সহজে মেলে। আমি একদল ছেলেকে নিয়ে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী খেলছি।
প্রথম ব্যক্তি। ও তোমার কী রকম খেলা গা!
দ্বিতীয় ব্যক্তি। ওতে যে অপরাধ হবে।
তৃতীয় ব্যক্তি। ফেলো, ফেলো, তোমার জটা ফেলো!
চতুর্থ ব্যক্তি। ওরে দেখ্-না গেরুয়া পরেছে! কিন্তু এটা দামি জিনিস রে।
প্রথম ব্যক্তি। বাবা, তোমার এই শখের সন্ন্যাসীর সাজ কেন।
সন্ন্যাসী। আমি যে কবির কাছে দীক্ষা নিয়েছিলুম।
দ্বিতীয় ব্যক্তি। কবির কাছে? এ যে শুনি নতুন কথা। আমাদের গাঁয়ে আছে ভূষণ কবি, কৈবর্তের পো, লেখে ভালো, কিন্তু দীক্ষা দিতে এলে তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতুম-না!
প্রথম ব্যক্তি। তবে যে আমাদের কে একজন বললে কোথাকার কোন্ একজন স্বামী এসেছে।
সন্ন্যাসী। যদি-বা এসে থাকে তাকে দিয়ে তোমাদের কোনো কাজ হবে না।
দ্বিতীয় ব্যক্তি। কেন? সে ভণ্ড না কি?
সন্ন্যাসী। তা নয় তো কী?
তৃতীয় ব্যক্তি। বাবা, তোমার চেহারাটি কিন্তু ভালো। তুমি মন্ত্রতন্ত্র কিছু শিখেছ?
সন্ন্যাসী। শেখবার ইচ্ছা তো আছে কিন্তু শেখায় কে?
তৃতীয় ব্যক্তি। একটি লোক আছে বাবা— সে থাকে ভৈরবপুরে, লোকটা বেতালসিদ্ধ। একটি লোকের ছেলে মারা যাচ্ছিল, তার বাপ এসে ধরে পড়তেই লোকটা করলে কী, সেই ছেলেটার প্রাণপুরুষকে একটা নেকড়ে বাঘের মধ্যে চালান করে দিলে। বললে বিশ্বাস করবে না, ছেলেটা মোলো বটে কিন্তু নেকড়েটা আজও দিব্যি বেঁচে আছে। না, হাসছ কী, আমার সম্বন্ধী স্বচক্ষে দেখে এসেছে। সেই নেকড়েটাকে মারতে গেলে বাপ লাঠি হাতে ছুটে আসে। তাকে দুবেলা ছাগল খাইয়ে লোকটা ফতুর হয়ে গেল। বিদ্যে যদি শিখতে চাও তো সেই সন্ন্যাসীর কাছে যাও।
প্রথম ব্যক্তি। ওরে, চল্ রে, বেলা হয়ে গেল। সন্ন্যাসী ফন্নাসী সব মিথ্যে। সে-কথা আমি তো তখনই বলেছিলেম। আজকালকার দিনে কি আর সে-রকম যোগবল আছে।
দ্বিতীয় ব্যক্তি। সে তো সত্যি। কিন্তু আমাকে যে কালুর মা বললে তার ভাগনে নিজের চক্ষে দেখে এসেছে সন্ন্যাসী একটান গাঁজা টেনে কলকেটা যেমনি উপুড় করলে অমনি তার মধ্যে থেকে এক ভাঁড় মদ আর একটা আস্ত মড়ার মাথার খুলি বেরিয়ে পড়ল!

তৃতীয় ব্যক্তি। বল কী, নিজের চক্ষে দেখেছে!

দ্বিতীয় ব্যক্তি। হাঁ রে, নিজের চক্ষে বৈকি।

তৃতীয় ব্যক্তি। আছে রে আছে, সিদ্ধপুরুষ আছে ; ভাগ্যে যদি থাকে তবে তো দর্শন পাব। তা চল্‌-না ভাই, কোন্‌ দিকে গেল একবার দেখে আসি গে।

[প্রস্থান

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। দেখো ঠাকুর, তোমার মন্তর যদি ফিরিয়ে না নাও তো ভালো হবে না বলছি। কী মুশকিলেই ফেলেছ, আমার হিসাবের খাতা মাটি হয়ে গেল। একবার মনটা বলে যাই সোনার পদ্মর খোঁজে, আবার বলি থাক গে ও-সব বাজে কথা। একবার মনে ভাবি, এবার বুঝি তবে ঠাকুরদাই জিতলে-বা, আবার ভাবি মরুক গে ঠাকুরদা! ঠাকুর, এ তো ভালো কথা নয়। চেলা-ধরা ব্যাবসা দেখছি তোমার! কিন্তু সে হবে না, কোনোমতেই হবে না। চুপ করে হাসছ কী। আমি বলছি আমাকে পারবে না— আমার শক্ত হাড়। লক্ষেশ্বর কোনোদিন তোমার চেলাগিরিতে ভিড়বে না।

[প্রস্থান

ফুল লইয়া ছেলেদের সঙ্গে শেখরের প্রবেশ

সন্ন্যাসী। এবার অর্ঘ্য সাজানো যাক। এ যে টগর, এই বুঝি মালতী, শেফালিকাও অনেক এনেছ দেখছি। সমস্তই শুভ্র, শুভ্র, শুভ্র! এবারে সকলে মিলে শারদোৎসবের আবাহন গানটি ধরো। কবি, তুমি ধরিয়ে দাও। ঠাকুরদা, তুমিও যোগ দিয়ো।

গান

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা
গেঁথেছি শেফালি মালা।
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে
সাজিয়ে এনেছি ডালা।
এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার
শুভ্র মেঘের রথে,
এসো নির্মল নীল পথে,
এসো ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল
বনগিরি-পর্বতে।
এসো মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল
শীতল শিশির-ঢালা ॥
ঝরা মালতীর ফুলে
আসন-বিছানো নিভৃত কুঞ্জে
ভরা গঙ্গার কূলে,
ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে
তোমার চরণমূলে।
গুঞ্জর তান তুলিয়ো তোমার
সোনার বীণার তারে
মৃদু মধু ঝংকারে,
হাসিঢালা সুর গলিয়া পড়িবে
ক্ষণিক অশ্রুধারে।

রহিয়া রহিয়া যে পরশমণি
ঝলকে অলককোণে,
পলকের তরে সকরুণ করে
বুলায়ো বুলায়ো মনে।
সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা,
আঁধার হইবে আলা ॥

শেখর। পৌঁচেছে, গান আকাশের পারে গিয়ে পৌঁচেছে। দ্বার খুলেছে তাঁর। দেখতে পাচ্ছ কি, শারদা বেরিয়েছেন। দেখতে পাচ্ছ না? আচ্ছা তা হলে আগে ধ্যানের গানটি গেয়ে নিই।

গান

লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া।
দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া।
কোন্ সাগরের পার হতে আনে
কোন্ সুদূরের ধন!
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া।
পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল
গুরু গুরু দেয়া ডাকে,
মুখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।
ওগো কাণ্ডারী, কে গো তুমি, কার
হাসিকান্নার ধন!
ভেবে মরে মোর মন
কোন্ সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র
কী মন্ত্র হবে গাওয়া ॥

এবারে আর দেখতে পাই নি বলবার জো নেই।

প্রথম বালক। কই দেখিয়ে দাও-না।

শেখর। ঐ-যে সাদা মেঘ ভেসে আসছে।

দ্বিতীয় বালক। হাঁ হাঁ, ভেসে আসছে।

তৃতীয় বালক। হাঁ, আমিও দেখেছি।

শেখর। ঐ-যে আকাশ ভরে গেল।

প্রথম বালক। কিসে?

শেখর। কিসে! এই তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আলোতে, আনন্দে। বাতাসে শিশিরের পরশ পাচ্ছ না?

দ্বিতীয় বালক। হাঁ, পাচ্ছি।

শেখর। তবে আর-কি! চক্ষু সার্থক হয়েছে, শরীর পবিত্র হয়েছে, মন প্রশান্ত হয়েছে। এসেছেন, এসেছেন, আমাদের মাঝখানেই এসেছেন। দেখছ না বেতসিনী নদীর ভাবটা! আর ধানের খেত কী রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এবার বরণের গানটা ধরিয়ে দিই। গাও।

গান

আমার নয়ন-ভুলানো এলে !
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে !

শেখর। সমস্ত বনে বনে নদীর ধারে ধারে গেয়ে আসি গে।

[ছেলেদের লইয়া গাহিতে গাহিতে শেখরের প্রস্থান

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

ঠাকুরদাদা। এ কী হল ! লখা গেরুয়া ধরেছে যে !

লক্ষেশ্বর। সন্ন্যাসী ঠাকুর, এবার আর কথা নেই। আমি তোমারই চেলা। এই নাও আমার গজমোতির কৌটো— এই আমার মণিমাণিক্যের পেটিকা তোমারই কাছে রইল। দেখো ঠাকুর, সাবধানে রেখো।

সন্ন্যাসী। তোমার এমন মতি কেন হল লক্ষেশ্বর ?

লক্ষেশ্বর। সহজে হয় নি প্রভু ! সম্রাট বিজয়াদিত্যের সৈন্য আসছে। এবার আমার ঘরে কি আর কিছু থাকবে ? তোমার গায়ে তো কেউ হাত দিতে পারবে না, এ-সমস্ত তোমার কাছেই রাখলেম। তোমার চেলাকে তুমি রক্ষা করো বাবা, আমি তোমার শরণাগত।

সোমপালের প্রবেশ

সোমপাল। সন্ন্যাসী ঠাকুর !

সন্ন্যাসী। বোসো, বোসো, তুমি যে হাঁপিয়ে পড়েছ। একটু বিশ্রাম করো।

সোমপাল। বিশ্রাম করবার সময় নেই। ঠাকুর, চরের মুখে সংবাদ পাওয়া গেল যে, বিজয়াদিত্যের পতাকা দেখা দিয়েছে— তাঁর সৈন্যদল আসছে।

সন্ন্যাসী। বল কী। বোধ হয় শরৎকালের আনন্দে তাঁকে আর ঘরে টিকতে দেয় নি। তিনি রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েছেন।

সোমপাল। কী সর্বনাশ ! রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েছেন !

সন্ন্যাসী। বাবা, এতে দুঃখিত হলে চলবে কেন ? তুমিও তো রাজ্যবিস্তার করবার উদ্‌যোগে ছিলে।

সোমপাল। না, সে হল স্বতন্ত্র কথা। তাই বলে আমার এই রাজ্যটুকুতে— তা সে যাই হোক, আমি তোমার শরণাগত। এই বিপদ হতে আমাকে বাঁচাতেই হবে, বোধ হয় কোনো দুষ্টলোক তাঁর কাছে লাগিয়েছে যে আমি তাকে লঙ্ঘন করতে ইচ্ছা করেছি ; তুমি তাঁকে বোলো সে-কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সর্বৈব মিথ্যা। আমি কি এমনি উন্মত্ত ? আমার রাজচক্রবর্তী হবার দরকার কী ? আমার শক্তিই বা এমন কী আছে ?

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা !

ঠাকুরদাদা। কী প্রভু !

সন্ন্যাসী। দেখো, আমি গেরুয়া পরে এবং গুটিকতক ছেলেকে মাত্র নিয়ে শারদোৎসব কেমন জমিয়ে তুলেছিলেম আর ঐ চক্রবর্তী সম্রাটটা তার সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে এমন দুর্লভ উৎসব কেবল নষ্টই করতে পারে। লোকটা কী রকম দুর্ভাগা দেখেছ !

সোমপাল। চুপ করো, চুপ করো ঠাকুর ! কে আবার কোন্ দিক থেকে শুনতে পাবে।

সন্ন্যাসী। ঐ বিজয়াদিত্যের পরে আমার—

সোমপাল। আরে, চুপ চুপ ! তুমি সর্বনাশ করবে দেখছি। তাঁর প্রতি তোমার মনের ভাব যাই থাক্ সে তুমি মনেই রেখে দাও !

সন্ন্যাসী। তোমার সঙ্গে পূর্বেও তো সে-বিষয়ে কিছু আলোচনা হয়ে গেছে।

সোমপাল। কী মুশকিলেই পড়লেম! সে-সব কথা কেন ঠাকুর, সে এখন থাক্-না! ওহে লক্ষেশ্বর, তুমি এখানে বসে বসে কী শুনছ! এখান থেকে যাও-না!

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, যাই এমন আমার সাধ্য কী আছে! একেবারে পাথর দিয়ে চেপে রেখেছে। যমে না নড়ালে আমার আর নড়চড় নেই। নইলে মহারাজের সামনে আমি যে ইচ্ছাসুখে বসে থাকি এমন আমার স্বভাবই নয়।

বিজয়াদিত্যের অমাত্যগণের প্রবেশ

মন্ত্রী। জয় হোক মহারাজাধিরাজচক্রবর্তী বিজয়াদিত্য!

[ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

সোমপাল। আরে করেন কী, করেন কী! আমাকে পরিহাস করছেন নাকি! আমি বিজয়াদিত্য নই। আমি তাঁর চরণাশ্রিত সামন্ত সোমপাল।

মন্ত্রী। মহারাজ, সময় তো অতীত হয়েছে, এক্ষণে রাজধানীতে ফিরে চলুন।

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, পূর্বেই তো বলেছিলেম পাঠশালা ছেড়ে পালিয়েছি কিন্তু গুরুমশায় পিছন পিছন তাড়া করেছেন।

ঠাকুরদাদা। প্রভু এ কী কাণ্ড! আমি তো স্বপ্ন দেখছি নে!

সন্ন্যাসী। স্বপ্ন তুমিই দেখছ কি এঁরাই দেখছেন তা নিশ্চয় করে কে বলবে?

ঠাকুরদাদা। তবে কি—

সন্ন্যাসী। হাঁ, এঁরা কয়জনে আমাকে বিজয়াদিত্য বলেই তো জানেন।

ঠাকুরদাদা। প্রভু, আমিই তো তবে জিতেছি। এই কয় দণ্ডে আমি তোমার যে পরিচয়টি পেয়েছি তা এঁরা পর্যন্ত পান নি! কিন্তু বড়ো সংকটে ফেললে তো ঠাকুর।

লক্ষেশ্বর। আমিও বড়ো সংকটে পড়েছি মহারাজ। আমি সম্রাটের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সন্ন্যাসীর হাতে ধরা দিয়েছি, এখন আমি যে কার হাতে আছি সেটা ভেবেই পাচ্ছি নে।

সোমপাল। মহারাজ দাসকে কি পরীক্ষা করতে বেরিয়েছিলেন?

সন্ন্যাসী। না সোমপাল, আমি নিজের পরীক্ষাতেই বেরিয়েছিলেম।

সোমপাল। মহারাজ, আপনি যে শরতের বিজয়যাত্রায় বেরিয়েছেন আজ তার পরিচয় পাওয়া গেল। আজ আমার হার মেনে আনন্দ।

উপনন্দের প্রবেশ

উপনন্দ। ঠাকুর! এ কী, রাজা যে! এরা সব কারা!

পলায়নোদ্যম

সন্ন্যাসী। এসো এসো, বাবা, এসো। কী বলছিলে বলো। (উপনন্দ নিরুত্তর) এঁদের সামনে বলতে লজ্জা করছ? আচ্ছা, তবে সোমপাল একটু অবসর নাও। তোমরাও—

উপনন্দ। সে কী কথা। ইনি যে আমাদের রাজা, এঁর কাছে আমাকে অপরাধী কোরো না। আমি তোমাকে বলতে এসেছিলেম এই কদিন পুঁথি লিখে আজ তার পারিশ্রমিক তিন কাহন পেয়েছি। এই দেখো।

সন্ন্যাসী। আমার হাতে দাও বাবা! তুমি ভাবছ এই তোমার বহুমূল্য তিন কার্যাপণ আমি লক্ষেশ্বরের হাতে ঋণশোধের জন্য দেব? এ আমি নিজে নিলেম। আমি এখানে শারদার উৎসব করেছি, এ আমার তারই দক্ষিণা। কী বলো বাবা!

উপনন্দ। ঠাকুর, তুমি নেবে!

সন্ন্যাসী। নেব বৈকি। তুমি ভাবছ সন্ন্যাসী হয়েছি বলেই আমার কিছুতে লোভ নেই? এ-সব জিনিসে আমার ভারি লোভ।

লক্ষেশ্বর। সর্বনাশ! তবেই হয়েছে। ডাইনের হাতে পুত্র সমর্পণ করে বসে আছি দেখছি।

সন্ন্যাসী। ওগো শ্রেষ্ঠী!

শ্রেষ্ঠী। আদেশ করুন।

সন্ন্যাসী। এই লোকটিকে হাজার কার্যাপণ গুণে দাও।

শ্রেষ্ঠী। যে আদেশ।

উপনন্দ। তবে ইনিই কি আমাকে কিনে নিলেন।

সন্ন্যাসী। উনি তোমাকে কিনে নেন ওঁর এমন সাধ্য কী। তুমি আমার।

উপনন্দ। (পা জড়াইয়া ধরিয়া) আমি কোন্ পুণ্য করেছিলেম যে আমার এমন ভাগ্য হল!

সন্ন্যাসী। ওগো সুভূতি!

মন্ত্রী। আজ্ঞা!

সন্ন্যাসী। আমার পুত্র নেই বলে তোমরা সর্বদা আক্ষেপ করতে। এবারে সন্ন্যাসধর্মের জোরে এই পুত্রটি লাভ করেছি।

লক্ষেশ্বর। হায় হায়, আমার বয়স বেশি হয়ে গেছে ব'লে কী সুযোগটাই পেরিয়ে গেল!

মন্ত্রী। বড়ো আনন্দ! তা ইনি কোন্ রাজগৃহে—

সন্ন্যাসী। ইনি যে-গৃহে জন্মেছেন সে-গৃহে জগতের অনেক বড়ো বড়ো বীর জন্মগ্রহণ করেছেন— পুরাণ ইতিহাস খুঁজে সে আমি তোমাকে পরে দেখিয়ে দেব। লক্ষেশ্বর!

লক্ষেশ্বর। কী আদেশ।

সন্ন্যাসী। বিজয়াদিত্যের হাত থেকে তোমার মণিমাণিক্য আমি রক্ষা করেছি, এই তোমাকে ফিরে দিলেম।

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, যদি গোপনে ফিরিয়ে দিতেন তা হলেই যথার্থ রক্ষা করতেন, এখন রক্ষা করে কে!

সন্ন্যাসী। এখন বিজয়াদিত্য স্বয়ং রক্ষা করবেন, তোমার ভয় নেই। কিন্তু, তোমার কাছে আমার কিছু প্রাপ্য আছে।

লক্ষেশ্বর। সর্বনাশ করলে!

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা সাক্ষী আছেন।

লক্ষেশ্বর। এখন সকলেই মিথ্যে সাক্ষ্য দেবে।

সন্ন্যাসী। আমাকে ভিক্ষা দিতে চেয়েছিলে। তোমার কাছে এক মুঠো চাল পাওনা আছে। রাজার মুষ্টি কি ভরাতে পারবে?

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, আমি সন্ন্যাসীর মুষ্টি দেখেই কথাটা পেড়েছিলেম।

সন্ন্যাসী। তবে তোমার ভয় নেই, যাও।

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, ইচ্ছে করেন যদি তবে এইবার কিছু উপদেশ দিতে পারেন।

সন্ন্যাসী। এখনো দেরি আছে।

লক্ষেশ্বর। তবে প্রণাম হই। চার দিকে সকলেই কৌটোটার দিকে বড্ড তাকাচ্ছে।

[প্রস্থান

সন্ন্যাসী। রাজা সোমপাল, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

সোমপাল। সে কী কথা! সমস্তই মহারাজের, যে আদেশ করবেন—

সন্ন্যাসী। তোমার রাজ্য থেকে আমি একটি বন্দী নিয়ে যেতে চাই।

সোমপাল। যাকে ইচ্ছা নাম করুন, সৈন্য পাঠিয়ে দিচ্ছি। নাহয় আমি নিজেই যাব।

সন্ন্যাসী। বেশি দূরে পাঠাতে হবে না। (ঠাকুরদাদাকে দেখাইয়া) তোমার এই প্রজাটিকে চাই।

সোমপাল। কেবল মাত্র এঁকে! মহারাজ যদি ইচ্ছা করেন তবে আমার রাজ্যে যে শ্রুতিধর

স্মৃতিভূষণ আছেন তাঁকে আপনার সভায় নিয়ে যেতে পারেন।

সন্ন্যাসী। না, অত বড়ো লোককে নিয়ে আমার সুবিধা হবে না, আমি এঁকেই চাই। আমার প্রাসাদে অনেক জিনিস আছে, কেবল বয়স্য নেই।

ঠাকুরদাদা। বয়সে মিলবে না প্রভু, গুণেও না ; তবে কিনা ভক্তি দিয়ে সমস্ত অমিল ভরিয়ে তুলতে পারব এই ভরসা আছে।

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, সময় খারাপ হলে বন্ধুরা পালায়, তাই তো দেখছি। আমার উৎসবের বন্ধুরা এখন সব কোথায় ? রাজদ্বারের গন্ধ পেয়েই দৌড় দিয়েছে নাকি !

ঠাকুরদাদা। কারও পালাবার পথ কি রেখেছ ? আটঘাট ঘিরে ফেলেছ যে। ঐ আসছে।

শেখরের সঙ্গে বালকগণের প্রবেশ

সকলে। সন্ন্যাসী ঠাকুর, সন্ন্যাসী ঠাকুর !

সন্ন্যাসী। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) এসো বাবা, সব এসো।

সকলে। একী ! এ যে রাজা ! আরে পালা, পালা !

পলায়নোদ্যম

ঠাকুরদাদা। আরে পালাস নে ! পালাস নে !

সন্ন্যাসী। তোমরা পালাবে কী, উনিই পালাচ্ছেন। যাও সোমপাল, সভা প্রস্তুত করো গে, আমি যাচ্ছি।

সোমপাল। যে আদেশ।

[প্রস্থান

বালকেরা। আমরা বনে পথে সব জায়গায় গেয়ে গেয়ে এসেছি, এইবার এখানে গান শেষ করি।

শেখর। হাঁ ভাই, তোরা ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করে করে গান গা।

সকলের গান

আমার নয়ন-ভুলানো এলে !
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে !
শিউলিতলার পাশে পাশে,
ঝরা ফুলের রাশে রাশে,
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণরাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে !
আলোছায়ার আঁচলখানি
লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,
ফুলগুলি ওই মুখে চেয়ে
কী কথা কয় মনে মনে।
তোমায় মোরা করব বরণ,
মুখের ঢাকা করো হরণ,
ওইটুকু ওই মেঘাবরণ
দু-হাত দিয়ে ফেলো ঠেলে !
নয়ন-ভুলানো এলে !

বনদেবীর দ্বারে দ্বারে
  শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি,
আকাশবীণার তারে তারে
  জাগে তোমার আগমনী।
কোথায় সোনার নূপুর বাজে—
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে,
সকল ভাবে, সকল কাজে
  পাষাণ-গালা সুধা ঢেলে
  নয়ন-ভুলানো এলে!

মুক্তধারা

মুক্তধারা

উত্তরকূট পার্বত্য প্রদেশ। সেখানকার উত্তরভৈরব-মন্দিরে যাইবার পথ। দূরে আকাশে একটা অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের মাথাটা দেখা যাইতেছে এবং তাহার অপর দিকে ভৈরবমন্দিরচূড়ার ত্রিশূল। পথের পার্শ্বে আমবাগানে রাজা রণজিতের শিবির। আজ অমাবস্যায় ভৈরবের মন্দিরে আরতি, সেখানে রাজা পদব্রজে যাইবেন, পথে শিবিরে বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহার সভার যন্ত্ররাজ বিভূতি বহু বৎসরের চেষ্টায় লৌহযন্ত্রের বাঁধ তুলিয়া মুক্তধারা ঝরনাকে বাঁধিয়াছেন। এই অসামান্য কীর্তিকে পুরস্কৃত করিবার উপলক্ষে উত্তরকূটের সমস্ত লোক ভৈরবমন্দির-প্রাঙ্গণে উৎসব করিতে চলিয়াছে। ভৈরব-মন্ত্রে দীক্ষিত সন্ন্যাসীদল সমস্ত দিন স্তবগান করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের কাহারও হাতে ধূপাধারে ধূপ জ্বলিতেছে, কাহারও হাতে শঙ্খ, কাহারও ঘণ্টা। গানের মাঝে মাঝে তালে তালে ঘণ্টা বাজিতেছে।

গান

জয় ভৈরব, জয় শংকর,
জয় জয় জয় প্রলয়ংকর,
শংকর শংকর।
জয় সংশয়ভেদন,
জয় বন্ধনছেদন,
জয় সংকটসংহর
শংকর শংকর।

[সন্ন্যাসীদল গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল

পূজার নৈবেদ্য লইয়া একজন বিদেশী পথিকের প্রবেশ

উত্তরকূটের নাগরিককে সে প্রশ্ন করিল

পথিক। আকাশে ওটা কী গড়ে তুলেছে? দেখতে ভয় লাগে।

নাগরিক। জান না? বিদেশী বুঝি? ওটা যন্ত্র।

পথিক। কিসের যন্ত্র?

নাগরিক। আমাদের যন্ত্ররাজ বিভূতি পঁচিশ বছর ধরে যেটা তৈরি করছিল, সেটা ঐ তো শেষ হয়েছে, তাই আজ উৎসব।

পথিক। যন্ত্রের কাজটা কী?

নাগরিক। মুক্তধারা ঝরনাকে বেঁধেছে।

পথিক। বাবা রে! ওটাকে অসুরের মাথার মতো দেখাচ্ছে, মাংস নেই, চোয়াল ঝোলা। তোমাদের উত্তরকূটের শিয়রের কাছে অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে; দিনরাত্তির দেখতে দেখতে তোমাদের প্রাণপুরুষ যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

নাগরিক। আমাদের প্রাণপুরুষ মজবুত আছে, ভাবনা কোরো না।

পথিক। তা হতে পারে, কিন্তু ওটা অমনতরো সূর্যতারার সামনে মেলে রাখবার জিনিস নয়, ঢাকা দিতে পারলেই ভালো হত। দেখতে পাচ্ছ না যেন দিনরাত্তির সমস্ত আকাশকে রাগিয়ে দিচ্ছে?

নাগরিক। আজ ভৈরবের আরতি দেখতে যাবে না?

পথিক। দেখব বলেই বেরিয়েছিলুম। প্রতিবৎসরই তো এই সময় আসি, কিন্তু মন্দিরের উপরের আকাশে কখনো এমনতরো বাধা দেখি নি। হঠাৎ ঐটের দিকে তাকিয়ে আজ আমার গা শিউরে উঠল— ও যে অমন করে মন্দিরের মাথা ছাড়িয়ে গেল এটা যেন স্পর্ধার মতো দেখাচ্ছে। দিয়ে আসি নৈবেদ্য, কিন্তু মন প্রসন্ন হচ্ছে না। [প্রস্থান

একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

একখানি শুভ্র চাদর তাহার মাথা ঘিরিয়া সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেছে

স্ত্রীলোক। সুমন! আমার সুমন! (নাগরিকের প্রতি) বাবা, আমার সুমন এখনো ফিরল না। তোমরা তো সবাই ফিরেছ।

নাগরিক। কে তুমি?

স্ত্রীলোক। আমি জনাই গাঁয়ের অম্বা। সে যে আমার চোখের আলো, আমার প্রাণের নিশ্বাস, আমার সুমন।

নাগরিক। তার কী হয়েছে বাছা?

অম্বা। তাকে যে কোথায় নিয়ে গেল। আমি ভৈরবের মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলুম— ফিরে এসে দেখি তাকে নিয়ে গেছে।

পথিক। তা হলে মুক্তধারার বাঁধ বাঁধতে তাকে নিয়ে গিয়েছিল।

অম্বা। আমি শুনেছি এই পথ দিয়ে তাকে নিয়ে গেল, ঐ গৌরীশিখরের পশ্চিমে— সেখানে আমার দৃষ্টি পৌঁছয় না, তার পরে আর পথ দেখতে পাই নে।

পথিক। কেঁদে কী হবে? আমরা চলেছি ভৈরবের মন্দিরে আরতি দেখতে। আজ আমাদের বড়ো দিন, তুমিও চলো।

অম্বা। না বাবা, সেদিনও তো ভৈরবের আরতিতে গিয়েছিলুম। তখন থেকে পুজো দিতে যেতে আমার ভয় হয়। দেখো, আমি বলি তোমাকে, আমাদের পুজো বাবার কাছে পৌঁচচ্ছে না— পথের থেকে কেড়ে নিচ্ছে।

নাগরিক। কে নিচ্ছে?

অম্বা। যে আমার বুকের থেকে সুমনকে নিয়ে গেল সে। সে যে কে এখনো তো বুঝলুম না। সুমন, আমার সুমন, বাবা সুমন!

[উভয়ের প্রস্থান

উত্তরকূটের যুবরাজ অভিজিৎ যন্ত্ররাজ বিভূতিব নিকট দূত পাঠাইয়াছেন। বিভূতি যখন মন্দিরের দিকে চলিয়াছে তখন দূতের সহিত তাহার সাক্ষাৎ

দূত। যন্ত্ররাজ বিভূতি, যুবরাজ আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

বিভূতি। কী তাঁর আদেশ?

দূত। এতকাল ধরে তুমি আমাদের মুক্তধারার ঝরনাকে বাঁধ দিয়ে বাঁধতে লেগেছ। বার বার ভেঙে গেল, কত লোক ধুলোবালি চাপা পড়ল, কত লোক বন্যায় ভেসে গেল। আজ শেষে—

বিভূতি। তাদের প্রাণ দেওয়া ব্যর্থ হয় নি। আমার বাঁধ সম্পূর্ণ হয়েছে।

দূত। শিবতরাইয়ের প্রজারা এখনো এ খবর জানে না। তারা বিশ্বাস করতেই পারে না যে, দেবতা তাদের যে জল দিয়েছেন কোনো মানুষ তা বন্ধ করতে পারে।

বিভূতি। দেবতা তাদের কেবল জলই দিয়েছেন, আমাকে দিয়েছেন জলকে বাঁধবার শক্তি।

দূত। তারা নিশ্চিন্ত আছে, জানে না আর সপ্তাহ পরেই তাদের চাষের খেত—

বিভূতি। চাষের খেতের কথা কী বলছ?

দূত। সেই খেত শুকিয়ে মারাই কি তোমার বাঁধ বাঁধার উদ্দেশ্য ছিল না?

বিভূতি। বালি-পাথর-জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে মানুষের বুদ্ধি হবে জয়ী এই ছিল উদ্দেশ্য। কোন্ চাষির কোন্ ভুট্টার খেত মারা যাবে সে কথা ভাববার সময় ছিল না।

দূত। যুবরাজ জিজ্ঞাসা করছেন এখনো কি ভাববার সময় হয় নি?

বিভূতি। না, আমি যন্ত্রশক্তির মহিমার কথা ভাবছি।

দূত। ক্ষুধিতের কান্না তোমার সে ভাবনা ভাঙাতে পারবে না?

বিভূতি। না। জলের বেগে আমার বাঁধ ভাঙে না, কান্নার জোরে আমার যন্ত্র টলে না।

দূত। অভিশাপের ভয় নেই তোমার?

বিভূতি। অভিশাপ! দেখো, উত্তরকূটে যখন মজুর পাওয়া যাচ্ছিল না তখন রাজার আদেশে চণ্ডপত্তনের প্রত্যেক ঘর থেকে আঠারো বছরের উপর বয়সের ছেলেকে আমরা আনিয়ে নিয়েছি। তারা তো অনেকেই ফেরে নি। সেখানকার কত মায়ের অভিশাপের উপর আমার যন্ত্র জয়ী হয়েছে। দৈবশক্তির সঙ্গে যার লড়াই, মানুষের অভিশাপকে সে গ্রাহ্য করে?

দূত। যুবরাজ বলছেন কীর্তি গড়ে তোলবার গৌরব তো লাভ হয়েছেই, এখন কীর্তি নিজে ভাঙবার যে আরো বড়ো গৌরব তাই লাভ করো।

বিভূতি। কীর্তি যখন গড়া শেষ হয় নি তখন সে আমার ছিল; এখন সে উত্তরকূটের সকলের। ভাঙবার অধিকার আর আমার নেই।

দূত। যুবরাজ বলছেন ভাঙবার অধিকার তিনিই গ্রহণ করবেন।

বিভূতি। স্বয়ং উত্তরকূটের যুবরাজ এমন কথা বলেন? তিনি কি আমাদেরই নন? তিনি কি শিবতরাইয়ের?

দূত। তিনি বলেন— উত্তরকূটে কেবল যন্ত্রের রাজত্ব নয়, সেখানে দেবতাও আছেন, এই কথা প্রমাণ করা চাই।

বিভূতি। যন্ত্রের জোরে দেবতার পদ নিজেই নেব এই কথা প্রমাণ করবার ভার আমার উপর। যুবরাজকে বোলো আমার এই বাঁধযন্ত্রের মুঠো একটুও আলগা করতে পারা যায় এমন পথ খোলা রাখি নি।

দূত। ভাঙনের যিনি দেবতা তিনি সব সময় বড়ো পথ দিয়ে চলাচল করেন না। তাঁর জন্যে যে-সব ছিদ্রপথ থাকে সে কারও চোখে পড়ে না।

বিভূতি। (চমকিয়া) ছিদ্র? সে আবার কী? ছিদ্রের কথা তুমি কী জান?

দূত। অমি কি জানি? যাঁর জানবার দরকার তিনি জেনে নেবেন।

[দূতের প্রস্থান

উত্তরকূটের নাগরিকগণ উৎসব করিতে মন্দিরে চলিয়াছে। বিভূতিকে দেখিয়া

১। বাঃ যন্ত্ররাজ, তুমি তো বেশ লোক! কখন্ ফাঁকি দিয়ে আগে চলে এসেছ টেরও পাই নি।

২। সে তো ওর চিরকালের অভ্যেস। ও কখন্ ভিতরে ভিতরে এগিয়ে সবাইকে ছাড়িয়ে চলে যায় বোঝাই যায় না। সেই তো আমাদের চবুয়াগাঁয়ের নেড়া বিভূতি, আমাদের একসঙ্গেই কৈলেস-গুরুর কানমলা খেলে, আর কখন্ সে আমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে এসে এতবড়ো কাণ্ডটা করে বসল।

৩। ওরে গবরু, ঝুড়িটা নিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বিভূতিকে আর কখনো চক্ষে দেখিস নি কি? মালাগুলো বের কর, পরিয়ে দিই।

বিভূতি। থাক্ থাক্, আর নয়।

৩। আর নয় তো কী? যেমন তুমি হঠাৎ মস্ত হয়ে উঠেছ তেমনি তোমার গলাটা যদি উটের মতো হঠাৎ লম্বা হয়ে উঠত আর উত্তরকূটের সব মানুষে মিলে তার উপর তোমার গলায় মালার বোঝা চাপিয়ে দিত তা হলেই ঠিক মানাত।

২। ভাই, হরিশ ঢাকি তো এখনো এসে পৌঁছোল না।

১। বেটা কুঁড়ের সদ্দার, ওর পিঠের চামড়ায় ঢাকের চাঁটি লাগালে তবে—

৩। সেটা কাজের কথা নয়। চাঁটি লাগাতে ওর হাত আমাদের চেয়ে মজবুত।

৪। মনে করেছিলুম বিশাই সামন্তের রথটা চেয়ে এনে আজ বিভূতিদাদার রথযাত্রা করাব। কিন্তু রাজাই নাকি আজ পায়ে হেঁটে মন্দিরে যাবেন।

৫। ভালোই হয়েছে। সামন্তের রথের যে দশা, একেবারে দশরথ। পথের মধ্যে কথায় কথায় দশখানা হয়ে পড়ে।

৩। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। দশরথ। আমাদের লম্বু এক-একটা কথা বলে ভালো। দশরথ।

৫। সাধে বলি। ছেলের বিয়েতে ঐ রথটা চেয়ে নিয়েছিলুম। যত চড়েছি তার চেয়ে টেনেছি অনেক বেশি।

৪। এক কাজ করো। বিভূতিকে কাঁধে করে নিয়ে যাই।

বিভূতি। আরে করো কী। করো কী।

৫। না, না, এই তো চাই। উত্তরকূটের কোলে তোমার জন্ম, কিন্তু তুমি আজ তার ঘাড়ে চেপেছ। তোমার মাথা সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

কাঁধের উপর লাঠি সাজাইয়া তাহার উপর বিভূতিকে তুলিয়া লইল

সকলে। জয় যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়!

গান

নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র।
তুমি চক্রমুখরমন্দ্রিত,
তুমি বজ্রবহ্নিবন্দিত,
তব বস্তুবিশ্ববক্ষোদংশ
ধ্বংসবিকট দন্ত।
তব দীপ্ত অগ্নি শত শতঘ্নী
বিঘ্নবিজয় পন্থ।
তব লৌহগলন শৈলদলন
অচলচলন মন্ত্র।
কভু কাষ্ঠলোষ্ট্রইষ্টকদৃঢ়
ঘনপিনদ্ধ কায়া,
কভু ভূতলজল-অন্তরীক্ষ-
লঙ্ঘন লঘুমায়া,
তব খনিখনিত্রনখবিদীর্ণ
ক্ষিতি বিকীর্ণ-অন্ত্র,
তব পঞ্চভূতবন্ধনকর
ইন্দ্রজালতন্ত্র।

উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ ও তাঁহার মন্ত্রী শিবিরের দিক হইতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন

রণজিৎ। শিবতরাইয়ের প্রজাদের কিছুতেই তো বাধ্য করতে পারলে না। এতদিন পরে মুক্তধারার জলকে আয়ত্ত করে বিভূতি ওদের বশ মানাবার উপায় করে দিলে। কিন্তু, মন্ত্রী, তোমার তো তেমন উৎসাহ দেখছি নে। ঈর্ষা?

মন্ত্রী। ক্ষমা করবেন, মহারাজ। খন্তা-কোদাল হাতে মাটি-পাথরের সঙ্গে পালোয়ানি আমাদের কাজ নয়। রাষ্ট্রনীতি আমাদের অস্ত্র, মানুষের মন নিয়ে আমাদের কারবার। যুবরাজকে শিবতরাইয়ের শাসনভার দেবার মন্ত্রণা আমিই দিয়েছিলুম তাতে যে বাঁধ বাঁধা হতে পারত সে কম নয়।

রণজিৎ। তাতে ফল হল কী ? দুবছর খাজনা বাকি। এমনতরো দুর্ভিক্ষ তো সেখানে বারে বারেই ঘটে, তাই বলে রাজার প্রাপ্য তো বন্ধ হয় না।

মন্ত্রী। খাজনার চেয়ে দুর্মূল্য জিনিস আদায় হচ্ছিল, এমন সময় তাঁকে ফিরে আসতে আদেশ করলেন। রাজকার্যে ছোটোদের অবজ্ঞা করতে নেই। মনে রাখবেন, যখন অসহ্য হয় তখন দুঃখের জোরে ছোটোরা বড়োদের ছাড়িয়ে বড়ো হয়ে ওঠে।

রণজিৎ। তোমার মন্ত্রণার সুর ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। কতবার বলেছ উপরে চড়ে বসে নীচে চাপ দেওয়া সহজ, আর বিদেশী প্রজাদের সেই চাপে রাখাই রাজনীতি। এ কথা বল নি ?

মন্ত্রী। বলেছিলুম। তখন অবস্থা অন্যরকম ছিল, আমার মন্ত্রণা সময়োচিত হয়েছিল। কিন্তু এখন—

রণজিৎ। যুবরাজকে শিবতরাইয়ে পাঠাবার ইচ্ছে আমার একেবারেই ছিল না।

মন্ত্রী। কেন মহারাজ ?

রণজিৎ। যে প্রজারা দূরের লোক, তাদের কাছে গিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করলে তাদের ভয় ভেঙে যায়। প্রীতি দিয়ে পাওয়া যায় আপন লোককে, পরকে পাওয়া যায় ভয় জাগিয়ে রেখে।

মন্ত্রী। মহারাজ, যুবরাজকে শিবতরাইয়ে পাঠাবার আসল কারণটা ভুলছেন। কিছুদিন থেকে তাঁর মন অত্যন্ত উতলা দেখা গিয়েছিল। আমাদের সন্দেহ হল যে তিনি হয়তো কোনো সূত্রে জানতে পেরেছেন যে তাঁর জন্ম রাজবাড়িতে নয়, তাঁকে মুক্তধারার ঝরনাতলা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া গেছে। তাই তাঁকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে—

রণজিৎ। তা তো জানি— ইদানীং ও যে প্রায় রাত্রে একলা ঝরনাতলায় গিয়ে শুয়ে থাকত। খবর পেয়ে একদিন রাত্রে সেখানে গেলুম, ওকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী হয়েছে অভিজিৎ, এখানে কেন ?' ও বললে, 'এই জলের শব্দে আমি আমার মাতৃভাষা শুনতে পাই।'

মন্ত্রী। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 'তোমার কী হয়েছে যুবরাজ ? রাজবাড়িতে আজকাল তোমাকে প্রায় দেখতে পাই নে কেন ?' তিনি বললেন, 'আমি পৃথিবীতে এসেছি পথ কাটবার জন্যে, এই খবর আমার কাছে এসে পৌঁচেছে।'

রণজিৎ। ঐ ছেলের যে রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ আছে এ বিশ্বাস আমার ভেঙে যাচ্ছে।

মন্ত্রী। যিনি এই দৈবলক্ষণের কথা বলেছিলেন তিনি যে মহারাজের গুরুর গুরু অভিরামস্বামী।

রণজিৎ। ভুল করেছেন তিনি। ওকে নিয়ে কেবলই আমার ক্ষতি হচ্ছে। শিবতরাইয়ের পশম যাতে বিদেশের হাটে বেরিয়ে না যায় এইজন্যে পিতামহদের আমল থেকে নন্দিসংকটের পথ আটক করা আছে। সেই পথটাই অভিজিৎ কেটে দিলে। উত্তরকূটের অন্নবস্ত্র দুর্মূল্য হয়ে উঠবে যে।

মন্ত্রী। অল্প বয়স কিনা। যুবরাজ কেবল শিবতরাইয়ের দিক থেকেই—

রণজিৎ। কিন্তু এ যে নিজের লোকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। শিবতরাইয়ের ঐ যে ধনঞ্জয় বৈরাগীটা প্রজাদের খেপিয়ে বেড়ায়, এর মধ্যে নিশ্চয় সেও আছে। এবার কণ্ঠিসুদ্ধ তার কণ্ঠটা চেপে ধরতে হবে। তাকে বন্দী করা চাই।

মন্ত্রী। মহারাজের ইচ্ছার প্রতিবাদ করতে সাহস করি নে। কিন্তু জানেন তো, এমন-সব দুর্যোগ আছে যাকে আটকে রাখার চেয়ে ছাড়া রাখাই নিরাপদ।

রণজিৎ। আচ্ছা, সেজন্যে চিন্তা কোরো না।

মন্ত্রী। আমি চিন্তা করি না, মহারাজকেই চিন্তা করতে বলি।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। মোহনগড়ের খুড়া মহারাজ বিশ্বজিৎ অদূরে। [প্রস্থান

রণজিৎ। ঐ আর-একজন। অভিজিৎকে নষ্ট করার দলে উনি অগ্রগণ্য। আত্মীয়রূপী পর হচ্ছে কুঁজো মানুষের কুঁজ, পিছনে লেগেই থাকে; কেটেও ফেলা যায় না, বহন করাও দুঃখ। ও কিসের শব্দ?

মন্ত্রী। ভৈরবপন্থীর দল মন্দিরপ্রদক্ষিণে বেরিয়েছে।

ভৈরবপন্থীদের প্রবেশ ও গান

তিমিরহৃদ্‌বিদারণ
জ্বলদগ্নিনিদারুণ
মরুশ্মশানসঞ্চর
শংকর শংকর।
বজ্রঘোষবাণী
রুদ্র শূলপাণি
মৃত্যুসিন্ধুসন্তর
শংকর শংকর। [প্রস্থান

রণজিতের খুড়া মোহনগড়ের রাজা বিশ্বজিৎ প্রবেশ করিলেন

তাঁর শুভ্র কেশ, শুভ্র বস্ত্র, শুভ্র উষ্ণীষ

রণজিৎ। প্রণাম। খুড়া মহারাজ, তুমি আজ উত্তরভৈরবের মন্দিরে পূজায় যোগ দিতে আসবে এ সৌভাগ্য প্রত্যাশা করি নি।

বিশ্বজিৎ। উত্তরভৈরব আজকের পূজা গ্রহণ করবেন না এই কথা জানাতে এসেছি।

রণজিৎ। তোমার এই দুর্বাক্য আমাদের মহোৎসবকে আজ—

বিশ্বজিৎ। কী নিয়ে মহোৎসব? বিশ্বের সকল তৃষিতের জন্যে দেবদেবের কমণ্ডলু যে জলধারা ঢেলে দিচ্ছেন সেই মুক্ত জলকে তোমরা বন্ধ করলে কেন?

রণজিৎ। শত্রুদমনের জন্যে।

বিশ্বজিৎ। মহাদেবকে শত্রু করতে ভয় নেই?

রণজিৎ। যিনি উত্তরকূটের পুরদেবতা, আমাদের জয়ে তাঁরই জয়। সেইজন্যেই আমাদের পক্ষ নিয়ে তিনি তাঁর নিজের দান ফিরিয়ে নিয়েছেন। তৃষ্ণার শূলে শিবতরাইকে বিদ্ধ করে তাকে তিনি উত্তরকূটের সিংহাসনের তলায় ফেলে দিয়ে যাবেন।

বিশ্বজিৎ। তবে তোমাদের পূজা পূজাই নয়, বেতন।

রণজিৎ। খুড়া মহারাজ, তুমি পরের পক্ষপাতী, আত্মীয়ের বিরোধী। তোমার শিক্ষাতেই অভিজিৎ নিজের রাজ্যকে নিজের বলে গ্রহণ করতে পারছে না।

বিশ্বজিৎ। আমার শিক্ষায়? একদিন আমি তোমাদেরই দলে ছিলেম না? চণ্ডপত্তনে যখন তুমি বিদ্রোহ সৃষ্টি করেছিলে সেখানকার প্রজার সর্বনাশ করে সে বিদ্রোহ আমি দমন করি নি? শেষে কখন ঐ বালক অভিজিৎ আমার হৃদয়ের মধ্যে এল— আলোর মতো এল। অন্ধকারে না দেখতে পেয়ে যাদের আঘাত করেছিলুম তাদের আপন বলে দেখতে পেলুম। রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ দেখে যাকে গ্রহণ করলে তাকে তোমার ঐ উত্তরকূটের সিংহাসনটুকুর মধ্যেই আটকে রাখতে চাও?

রণজিৎ। মুক্তধারার ঝরনাতলায় অভিজিৎকে কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল এ কথা তুমিই ওর কাছে প্রকাশ করেছ বুঝি?

বিশ্বজিৎ। হাঁ, আমিই। সেদিন আমাদের প্রাসাদে ওর দেওয়ালির নিমন্ত্রণ ছিল। গোধূলির সময় দেখি অলিন্দে ও একলা দাঁড়িয়ে গৌরীশিখরের দিকে তাকিয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী দেখছ

ভাই ?' সে বললে, 'যে-সব পথ এখনো কাটা হয় নি ঐ দুর্গম পাহাড়ের উপর দিয়ে সেই ভাবীকালের পথ দেখতে পাচ্ছি— দূরকে নিকট করবার পথ।' শুনে তখনই মনে হল, মুক্তধারার উৎসের কাছে কোন্ ঘরছাড়া মা ওকে জন্ম দিয়ে গেছে, ওকে ধরে রাখবে কে ? আর থাকতে পারলুম না, ওকে বললুম, 'ভাই, তোমার জন্মক্ষণে গিরিরাজ তোমাকে পথে অভ্যর্থনা করেছেন, ঘরের শঙ্খ তোমাকে ঘরে ডাকে নি।'

রণজিৎ। এতক্ষণে বুঝলুম।

বিশ্বজিৎ। কী বুঝলে ?

রণজিৎ। এই কথা শুনেই উত্তরকূটের রাজগৃহ থেকে অভিজিতের মমতা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সেইটেই স্পর্ধা করে দেখাবার জন্যে নন্দিসংকটের পথ সে খুলে দিয়েছে।

বিশ্বজিৎ। ক্ষতি কী হয়েছে ? যে পথ খুলে যায় সে পথ সকলেরই— যেমন উত্তরকূটের তেমনি শিবতরাইয়ের।

রণজিৎ। খুড়া মহারাজ, তুমি আত্মীয়, গুরুজন, তাই এতকাল ধৈর্য রেখেছি। কিন্তু আর নয়, স্বজনবিদ্রোহী তুমি, এ রাজ্য ত্যাগ করে যাও।

বিশ্বজিৎ। আমি ত্যাগ করতে পারব না। তোমরা আমাকে ত্যাগ যদি কর তবে সহ্য করব।

[প্রস্থান

অম্বার প্রবেশ

অম্বা। (রাজার প্রতি) ওগো তোমরা কে ? সূর্য তো অস্ত যায়— আমার সুমন তো এখনো ফিরল না।

রণজিৎ। তুমি কে ?

অম্বা। আমি কেউ না। যে আমার সব ছিল তাকে এই পথ দিয়ে নিয়ে গেল। এ পথের শেষ কি নেই ? সুমন কি তবে এখনো চলেছে, কেবলই চলেছে, পশ্চিমে গৌরীশিখর পেরিয়ে যেখানে সূর্য ডুবছে, আলো ডুবছে, সব ডুবছে ?

রণজিৎ। মন্ত্রী, এ বুঝি—

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ, সেই বাঁধ বাঁধার কাজেই—

রণজিৎ। (অম্বাকে) তুমি খেদ কোরো না। আমি জানি পৃথিবীতে সকলের চেয়ে চরম যে দান তোমার ছেলে আজ তাই পেয়েছে।

অম্বা। তাই যদি সত্যি হবে তা হলে সে-দান সন্ধেবেলায় সে আমার হাতে এনে দিত, আমি যে তার মা।

রণজিৎ। দেবে এনে। সেই সন্ধে এখনো আসে নি।

অম্বা। তোমার কথা সত্যি হোক বাবা। ভৈরবমন্দিরের পথে পথে আমি তার জন্যে অপেক্ষা করব। সুমন !

[প্রস্থান

একদল ছাত্র লইয়া অদূরে গাছের তলায় উত্তরকূটের গুরুমশায় প্রবেশ করিল

গুরু। খেলে, খেলে, বেত খেলে দেখছি। খুব গলা ছেড়ে বল্, জয় রাজরাজেশ্বর।

ছাত্রগণ। জয় রাজরা—

গুরু। (হাতের কাছে দুই-একটা ছেলেকে থাবড়া মারিয়া)— জেশ্বর।

ছাত্রগণ। জেশ্বর।

গুরু। শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

ছাত্রগণ। শ্রী শ্রী শ্রী—

গুরু। (ঠেলা মারিয়া) পাঁচবার।

ছাত্রগণ। পাঁচবার।

গুরু। লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর! বল্ শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

ছাত্রগণ। শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

গুরু। উত্তরকূটাধিপতির জয়—

ছাত্রগণ। উত্তরকূটা—

গুরু। ধিপতির

ছাত্রগণ। ধিপতির

গুরু। জয়।

ছাত্রগণ। জয়।

রণজিৎ। তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

গুরু। আমাদের যন্ত্ররাজ বিভূতিকে মহারাজ শিরোপা দেবেন তাই ছেলেদের নিয়ে যাচ্ছি আনন্দ করতে। যাতে উত্তরকূটের গৌরবে এরা শিশুকাল হতেই গৌরব করতে শেখে তার কোনো উপলক্ষই বাদ দিতে চাই নে।

রণজিৎ। বিভূতি কী করেছে এরা সবাই জানে তো?

ছেলেরা। (লাফাইয়া হাততালি দিয়া) জানি, শিবতরাইয়ের খাবার জল বন্ধ করে দিয়েছেন।

রণজিৎ। কেন দিয়েছেন?

ছেলেরা। (উৎসাহে) ওদের জব্দ করার জন্যে।

রণজিৎ। কেন জব্দ করা?

ছেলেরা। ওরা যে খারাপ লোক।

রণজিৎ। কেন খারাপ?

ছেলেরা। ওরা খুব খারাপ, ভয়ানক খারাপ, সবাই জানে।

রণজিৎ। কেন খারাপ তা জান না?

গুরু। জানে বৈকি, মহারাজ। কী রে, তোরা পড়িস নি— বইয়ে পড়িস নি— ওদের ধর্ম খুব খারাপ—

ছেলেরা। হাঁ, হাঁ, ওদের ধর্ম খুব খারাপ।

গুরু। আর ওরা আমাদের মতো— কী বল্-না— (নাক দেখাইয়া)

ছেলেরা। নাক উঁচু নয়।

গুরু। আচ্ছা, আমাদের গণাচার্য কী প্রমাণ করে দিয়েছেন— নাক উঁচু থাকলে কী হয়?

ছেলেরা। খুব বড়ো জাত হয়।

গুরু। তারা কী করে? বল্-না— পৃথিবীতে— বল্— তারাই সকলের উপর জয়ী হয়, না?

ছেলেরা। হাঁ, জয়ী হয়।

গুরু। উত্তরকূটের মানুষ কোনোদিন যুদ্ধে হেরেছে জানিস?

ছেলেরা। কোনোদিনই না।

গুরু। আমাদের পিতামহ-মহারাজ প্রাগ্‌জিৎ দুশো তিরেনব্বই জন সৈন্য নিয়ে একত্রিশ হাজার সাড়ে সাতশো দক্ষিণী বর্বরদের হটিয়ে দিয়েছিলেন না?

ছেলেরা। হাঁ, দিয়েছিলেন।

গুরু। নিশ্চয়ই জানবেন, মহারাজ, উত্তরকূটের বাইরে যে হতভাগারা মাতৃগর্ভে জন্মায়, একদিন এই-সব ছেলেরাই তাদের বিভীষিকা হয়ে উঠবে। এ যদি না হয় তবে আমি মিথ্যে গুরু। কতবড়ো দায়িত্ব যে আমাদের সে আমি একদণ্ডও ভুলি নে। আমরাই তো মানুষ তৈরি করে দিই, আপনার অমাত্যরা তাঁদের নিয়ে ব্যবহার করেন। অথচ তাঁরাই বা কী পান আর আমরাই বা কী পাই তুলনা করে দেখবেন।

মন্ত্রী। কিন্তু ঐ ছাত্ররাই যে তোমাদের পুরস্কার।

গুরু। বড়ো সুন্দর বলেছেন, মন্ত্রীমশায়, ছাত্ররাই আমাদের পুরস্কার। আহা, কিন্তু খাদ্যসামগ্রী বড়ো দুর্মূল্য— এই দেখেন-না কেন, গব্যঘৃত, যেটা ছিল—

মন্ত্রী। আচ্ছা বেশ, তোমার এই গব্যঘৃতের কথাটা চিন্তা করব। এখন যাও, পূজার সময় নিকট হল।

[জয়ধ্বনি করাইয়া ছাত্রদের লইয়া গুরুমহাশয় প্রস্থান করিল

রণজিৎ। তোমার এই গুরুর মাথার খুলির মধ্যে অন্য কোনো ঘৃত নেই, গব্যঘৃতই আছে।

মন্ত্রী। পঞ্চগব্যের একটা-কিছু আছেই। কিন্তু, মহারাজ, এই-সব মানুষই কাজে লাগে। ওকে যেমনটি বলে দেওয়া গেছে, দিনের পর দিন ও ঠিক তেমনটি করে চলেছে। বুদ্ধি বেশি থাকলে কাজ কলের মতো চলে না।

রণজিৎ। মন্ত্রী, ওটা কী আকাশে?

মন্ত্রী। মহারাজ, ভুলে যাচ্ছেন, ওটাই তো বিভূতির সেই যন্ত্রের চূড়া।

রণজিৎ। এমন স্পষ্ট তো কোনোদিন দেখা যায় না।

মন্ত্রী। আজ সকালে ঝড় হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, তাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

রণজিৎ। দেখেছ ওর পিছন থেকে সূর্য যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন? আর, ওটাকে দানবের উদ্যত মুষ্টির মতো দেখাচ্ছে। অতটা বেশি উঁচু করে তোলা ভালো হয় নি।

মন্ত্রী। আমাদের আকাশের বুকে যেন শেল বিঁধে রয়েছে মনে হচ্ছে।

রণজিৎ। এখন মন্দিরে যাবার সময় হল।

[উভয়ের প্রস্থান

উত্তরকূটের দ্বিতীয়দল নাগরিকের প্রবেশ

১। দেখলি তো, আজকাল বিভূতি আমাদের কী রকম এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। ও যে আমাদের মধ্যেই মানুষ সে কথাটাকে চামড়ার থেকে ঘষে ফেলতে চায়। একদিন বুঝতে পারবেন খাপের চেয়ে তলোয়ার বড়ো হয়ে উঠলে ভালো হয় না।

২। তা যা বলিস, ভাই, বিভূতি উত্তরকূটের নাম রেখেছে বটে।

১। আরে রেখে দে, তোরা ওকে নিয়ে বড়ো বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিস। ঐ যে বাঁধটি বাঁধতে ওর জিব বেরিয়ে পড়েছে, ওটা কিছু না হবে তো দশবার ভেঙেছে।

৩। আবার যে ভাঙবে না তাই বা কে জানে?

১। দেখেছিস তো বাঁধের উত্তর দিকের সেই ঢিবিটা?

২। কেন, কেন, কী হয়েছে?

১। কী হয়েছে? এটা জানিস নে? যে দেখছে সেই তো বলছে—

২। কী বলছে ভাই?

১। কী বলছে? ন্যাকা নাকি রে? এও আবার জিগ্‌গেস করতে হয় নাকি? আগাগোড়াই— সে আর কী বলব।

২। তবু ব্যাপারটা কী একটু বুঝিয়ে বল্‌-না—

১। রঞ্জন, তুই অবাক করলি। একটু সবুর কর্‌-না, পষ্ট বুঝবি হঠাৎ যখন একেবারে—

২। সর্বনাশ! বলিস কী দাদা? হঠাৎ একেবারে?

১। হাঁ ভাই, ঝগড়ুর কাছে শুনে নিস। সে নিজে মেপে জুখে দেখে এসেছে।

২। ঝগড়ুর ঐ গুণটি আছে, ওর মাথা ঠাণ্ডা। সবাই যখন বাহবা দিতে থাকে, ও তখন কোথা থেকে মাপকাটি বের করে বসে।

৩। আচ্ছা ভাই, কেউ কেউ যে বলে বিভূতির যা-কিছু বিদ্যে সব—

১। আমি নিজে জানি বেঙ্কটবর্মার কাছ থেকে চুরি। হাঁ, সে ছিল বটে গুণীর মতো গুণী— কত বড়ো মাথা— ওরে বাস রে! অথচ বিভূতি পায় শিরোপা, আর সে গরিব না খেতে পেয়েই মারা গেল।

৩। শুধুই কি না খেতে পেয়ে?

১। আরে, না খেতে পেয়ে কি কার হাতের দেওয়া কী খেতে পেয়ে সে কথায় কাজ কী? আবার কে কোন্ দিক থেকে— নিন্দুকের তো অভাব নেই। এ দেশের মানুষ যে কেউ কারও ভালো সইতে পারে না।

২। তা, তোরা যাই বলিস, লোকটা কিন্তু—

১। আহা, তা হবে না কেন? কোন্ মাটিতে ওর জন্ম, বুঝে দেখ্ ঐ চবুয়া গাঁয়ে আমার বুড়ো দাদা ছিল, তাঁর নাম শুনেছিস তো?

২। আরে বাস রে! তাঁর নাম উত্তরকূটের কে না জানে? তিনি তো সেই— ঐ যে কী বলে—

১। হাঁ, হাঁ, ভাস্কর। নস্যি তৈরি করার এত বড়ো ওস্তাদ এ মুল্লুকে হয় নি। তাঁর হাতের নস্যি না হলে রাজা শত্রুজিতের একদিনও চলত না।

৩। সে-সব কথা হবে, এখন মন্দিরে চল্। আমরা হলুম বিভূতির এক গাঁয়ের লোক— আমাদের হাতের মালা আগে নিয়ে তবে অন্য কথা। আর আমরাই তো বসব তার ডাইনে।

নেপথ্যে। যেয়ো না ভাই, যেয়ো না, ফিরে যাও।

২। ঐ শোনো বটুক বুড়ো বেরিয়েছে।

বটুকের প্রবেশ

গায়ে ছেঁড়া কম্বল, হাতে বাঁকা ডালের লাঠি, চুল উস্কোখুস্কো

১। কী বটু, যাচ্ছ কোথায়?

বটু। সাবধান, বাবা, সাবধান। যেয়ো না ও পথে, সময় থাকতে ফিরে যাও।

২। কেন বলো তো।

বটু। বলি দেবে, নরবলি। আমার দুই জোয়ান নাতিকে জোর করে নিয়ে গেল আর তারা ফিরল না।

৩। বলি কার কাছে দেবে খুড়ো?

বটু। তৃষ্ণা, তৃষ্ণাদানবীর কাছে।

২। সে আবার কে?

বটু। সে যত খায় তত চায়— তার শুষ্ক রসনা ঘি-খাওয়া আগুনের শিখার মতো কেবলই বেড়ে চলে।

১। পাগলা! আমরা তো যাচ্ছি উত্তরভৈরবের মন্দিরে, সেখানে তৃষ্ণাদানবী কোথায়?

বটু। খবর পাও নি? ভৈরবকে যে আজ ওরা মন্দির থেকে বিদায় করতে চলেছে। তৃষ্ণা বসবে বেদীতে।

২। চুপ চুপ পাগলা। এ-সব কথা শুনলে উত্তরকূটের মানুষ তোকে কুটে ফেলবে।

বটু। তারা তো আমার গায়ে ধুলো দিচ্ছে, ছেলেরা মারছে ঢেলা। সবাই বলে তোর নাতি-দুটো প্রাণ দিয়েছে সে তাদের সৌভাগ্য।

১। তারা তো মিথ্যে বলে না।

বটু। বলে না মিথ্যে? প্রাণের বদলে প্রাণ যদি না মেলে, মৃত্যু দিয়ে যদি মৃত্যুকেই ডাকা হয়, তবে ভৈরব এত বড়ো ক্ষতি সইবেন কেন? সাবধান, বাবা, সাবধান, যেয়ো না ও পথে।

[প্রস্থান

২। দেখো, দাদা, আমার গায়ে কিন্তু কাঁটা দিয়ে উঠছে।

১। রঞ্জু, তুই বেজায় ভীতু। চল্ চল্।

[সকলের প্রস্থান

যুবরাজ অভিজিৎ ও রাজকুমার সঞ্জয়ের প্রবেশ

সঞ্জয়। বুঝতে পারছি নে, যুবরাজ, রাজবাড়ি ছেড়ে কেন বেরিয়ে যাচ্ছ?

অভিজিৎ। সব কথা তুমি বুঝবে না। আমার জীবনের স্রোত রাজবাড়ির পাথর ডিঙিয়ে চলে যাবে এই কথাটা কানে নিয়েই পৃথিবীতে এসেছি।

সঞ্জয়। কিছুদিন থেকেই তোমাকে উতলা দেখছি। আমাদের সঙ্গে তুমি যে বাঁধনে বাঁধা সেটা তোমার মনের মধ্যে আলগা হয়ে আসছিল। আজ কি সেটা ছিঁড়ল।

অভিজিৎ। ঐ দেখো সঞ্জয়, গৌরীশিখরের উপর সূর্যাস্তের মূর্তি। কোন্ আগুনের পাখি মেঘের ডানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেছে। আমার এই পথযাত্রার ছবি অস্তসূর্য আকাশে এঁকে দিলে।

সঞ্জয়। দেখছ না, যুবরাজ, ঐ যন্ত্রের চূড়াটা সূর্যাস্তমেঘের বুক ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে? যেন উড়ন্ত পাখির বুকে বাণ বিঁধেছে, সে তার ডানা ঝুলিয়ে রাত্রির গহ্বরের দিকে পড়ে যাচ্ছে। আমার এ ভালো লাগছে না। এখন বিশ্রামের সময় এল। চলো, যুবরাজ, রাজবাড়িতে।

অভিজিৎ। যেখানে বাধা সেখানে কি বিশ্রাম আছে?

সঞ্জয়। রাজবাড়িতে যে তোমার বাধা, এতদিন পরে সে কথা তুমি কী করে বুঝলে।

অভিজিৎ। বুঝলুম, যখন শোনা গেল মুক্তধারায় ওরা বাঁধ বেঁধেছে।

সঞ্জয়। তোমার এ কথার অর্থ আমি পাই নে।

অভিজিৎ। মানুষের ভিতরকার রহস্য বিধাতা বাইরের কোথাও না কোথাও লিখে রেখে দেন; আমার অন্তরের কথা আছে ঐ মুক্তধারার মধ্যে। তারই পায়ে ওরা যখন লোহার বেড়ি পরিয়ে দিলে তখন হঠাৎ যেন চমক ভেঙে বুঝতে পারলুম উত্তরকূটের সিংহাসনই আমার জীবনস্রোতের বাঁধ। পথে বেরিয়েছি তারই পথ খুলে দেবার জন্যে।

সঞ্জয়। যুবরাজ, আমাকেও তোমার সঙ্গী করে নাও।

অভিজিৎ। না ভাই, নিজের পথ তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে। আমার পিছনে যদি চল তা হলে আমিই তোমার পথকে আড়াল করব।

সঞ্জয়। তুমি অত কঠোর হোয়ো না, আমাকে বাজছে।

অভিজিৎ। তুমি আমার হৃদয় জান, সেইজন্যে আঘাত পেয়েও তুমি আমাকে বুঝবে।

সঞ্জয়। কোথায় তোমার ডাক পড়েছে তুমি চলেছ, তা নিয়ে আমি প্রশ্ন করতে চাই নে। কিন্তু যুবরাজ, এই যে সন্ধে হয়ে এসেছে, রাজবাড়িতে ঐ যে বন্দীরা দিনাবসানের গান ধরলে, এরও কি কোনো ডাক নেই? যা কঠিন তার গৌরব থাকতে পারে, কিন্তু যা মধুর তারও মূল্য আছে।

অভিজিৎ। ভাই, তারই মূল্য দেবার জন্যেই কঠিনের সাধনা।

সঞ্জয়। সকালে যে আসনে তুমি পূজায় বস, মনে আছে তো সেদিন তার সামনে একটি শ্বেত পদ্ম দেখে তুমি অবাক হয়েছিলে? তুমি জাগবার আগেই কোন্ ভোরে ঐ পদ্মটি লুকিয়ে কে তুলে এনেছে, জানতে দেয় নি সে কে— কিন্তু এইটুকুর মধ্যে কত সুধাই আছে সে কথা কি আজ মনে করবার নেই? সেই ভীরু যে আপনাকে গোপন করেছে, কিন্তু আপনার পূজা গোপন করতে পারে নি, তার মুখ তোমার মনে পড়ছে না?

অভিজিৎ। পড়ছে বৈকি। সেইজন্যেই সইতে পারছি নে ঐ বীভৎসটাকে যা এই ধরণীর সংগীত রোধ করে দিয়ে আকাশে লোহার দাঁত মেলে অট্টহাস্য করছে। স্বর্গকে ভালো লেগেছে বলেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে যেতে দ্বিধা করি নে।

সঞ্জয়। গোধূলির আলোটি ঐ নীল পাহাড়ের উপরে মূর্ছিত হয়ে রয়েছে, এর মধ্যে দিয়ে একটা কান্নার মূর্তি তোমার হৃদয়ে এসে পৌঁচচ্ছে না?

অভিজিৎ। হাঁ, পৌঁচচ্ছে। আমারও বুক কান্নায় ভরে রয়েছে। আমি কঠোরতর অভিমান রাখি নে। চেয়ে দেখো ঐ পাখি দেবদারু-গাছের চূড়ার ডালটির উপর একলা বসে আছে ; ও কি নীড়ে যাবে, না, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দূর প্রবাসের অরণ্যে যাত্রা করবে জানি নে— কিন্তু ও যে এই সূর্যাস্তের আকাশের দিকে চুপ করে চেয়ে আছে সেই চেয়ে থাকার সুরটি আমার হৃদয়ে এসে বাজছে। সুন্দর এই পৃথিবী। যা-কিছু আমার জীবনকে মধুময় করেছে সে সমস্তকেই আজ আমি নমস্কার করি।

বটুর প্রবেশ

বটু। যেতে দিলে না, মেরে ফিরিয়ে দিলে।

অভিজিৎ। কী হয়েছে, বটু— তোমার কপাল ফেটে রক্ত পড়ছে যে !

বটু। আমি সকলকে সাবধান করতে বেরিয়েছিলুম, বলছিলুম, 'যেয়ো না ও পথে, ফিরে যাও।'

অভিজিৎ। কেন, কী হয়েছে ?

বটু। জান না যুবরাজ ? ওরা যে আজ যন্ত্রবেদীর উপর তৃষ্ণারাক্ষসীর প্রতিষ্ঠা করবে। মানুষ-বলি চায়।

সঞ্জয়। সে কী কথা ?

বটু। সেই বেদী গাঁথবার সময় আমার দুই নাতির রক্ত ঢেলে দিয়েছে। মনে করেছিলুম পাপের বেদী আপনি ভেঙে পড়ে যাবে। কিন্তু এখনো তো ভাঙল না, ভৈরব তো জাগলেন না।

অভিজিৎ। ভাঙবে। সময় এসেছে।

বটু। (কাছে আসিয়া চুপে চুপে) তবে শুনেছ বুঝি ? ভৈরবের আহ্বান শুনেছ ?

অভিজিৎ। শুনেছি।

বটু। সর্বনাশ ! তবে তো তোমার নিষ্কৃতি নেই।

অভিজিৎ। না, নেই।

বটু। ঐ দেখছ না ? আমার মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে, সর্বাঙ্গে ধুলো। সইতে পারবে কি, যুবরাজ, যখন বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যাবে ?

অভিজিৎ। ভৈরবের প্রসাদে সইতে পারব।

বটু। চারি দিকে সবাই যখন শত্রু হবে ? আপন লোক যখন ধিক্কার দেবে ?

অভিজিৎ। সইতেই হবে।

বটু। তা হলে ভয় নেই ?

অভিজিৎ। না, ভয় নেই।

বটু। বেশ বেশ। তা হলে বটুকে মনে রেখো। আমিও ঐ পথে। ভৈরব আমার কপালে এই-যে রক্ততিলক এঁকে দিয়েছেন তার থেকে অন্ধকারেও আমাকে চিনতে পারবে।

[বটুর প্রস্থান

রাজপ্রহরী উদ্ধবের প্রবেশ

উদ্ধব। নন্দিসংকটের পথ কেন খুলে দিলে যুবরাজ ?

অভিজিৎ। শিবতরাইয়ের লোকেদের নিত্যদুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচাবার জন্যে।

উদ্ধব। মহারাজ তো তাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত, তাঁর তো দয়ামায়া আছে।

অভিজিৎ। ডান-হাতের কার্পণ্য দিয়ে পথ বন্ধ করে বাঁ-হাতের বদান্যতায় বাঁচানো যায় না। তাই ওদের অন্ন-চলাচলের পথ খুলে দিয়েছি। দয়ার উপর নির্ভর করার দীনতা আমি দেখতে পারি নে।

উদ্ধব। মহারাজ বলেন, নন্দিসংকটের গড় ভেঙে দিয়ে তুমি উত্তরকূটের ভোজনপাত্রের তলা খসিয়ে দিয়েছ।

অভিজিৎ। চিরদিন শিবতরাইয়ের অন্নজীবী হয়ে থাকবার দুর্গতি থেকে উত্তরকূটকে মুক্তি দিয়েছি।

উদ্ধব। দুঃসাহসের কাজ করেছ। মহারাজ খবর পেয়েছেন এর বেশি আর কিছু বলতে পারব না। যদি পার তো এখনই চলে যাও। পথে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে কথা কওয়াও নিরাপদ নয়।

[উদ্ধবের প্রস্থান

অম্বার প্রবেশ

অম্বা। সুমন! বাবা সুমন! যে পথ দিয়ে তাকে নিয়ে গেল সে পথ দিয়ে তোমরা কি কেউ যাও নি?

অভিজিৎ। তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে?

অম্বা। হাঁ, ঐ পশ্চিমে, যেখানে সুয্যি ডোবে, যেখানে দিন ফুরোয়।

অভিজিৎ। ঐ পথেই আমি যাব।

অম্বা। তা হলে দুঃখিনীর একটা কথা রেখো— যখন তার দেখা পাবে, বোলো, মা তার জন্যে পথ চেয়ে আছে।

অভিজিৎ। বলব।

অম্বা। বাবা, তুমি চিরজীবী হও। সুমন, আমার সুমন!

ভৈরবপন্থীদের প্রবেশ

গান

জয় ভৈরব, জয় শংকর,
জয় জয় জয় প্রলয়ংকর।
জয় সংশয়ভেদন, জয় বন্ধনছেদন,
জয় সংকটসংহর
শংকর শংকর।

সেনাপতি বিজয়পালের প্রবেশ

বিজয়পাল। যুবরাজ, রাজকুমার, আমার বিনীত অভিবাদন গ্রহণ করুন। মহারাজের কাছ থেকে আসছি।

অভিজিৎ। কী তাঁর আদেশ?

বিজয়পাল। গোপনে বলব।

সঞ্জয়। (অভিজিতের হাত চাপিয়া ধরিয়া) গোপন কেন? আমার কাছেও গোপন?

বিজয়পাল। সেই তো আদেশ। যুবরাজ একবার রাজশিবিরে পদার্পণ করুন।

সঞ্জয়। আমিও সঙ্গে যাব।

বিজয়পাল। মহারাজ তা ইচ্ছা করেন না।

সঞ্জয়। আমি তবে এই পথেই অপেক্ষা করব।

[অভিজিৎকে লইয়া বিজয়পাল শিবিরের দিকে প্রস্থান করিল

বাউলের প্রবেশ

গান

ও তো আর ফিরবে না রে, ফিরবে না আর, ফিরবে না রে।
ঝড়ের মুখে ভাসল তরী,
কূলে আর ভিড়বে না রে।
কোন্ পাগলে নিল ডেকে,
কাঁদন গেল পিছে রেখে,
ওকে তোর বাহুর বাঁধন ঘিরবে না রে।

[প্রস্থান

ফুলওয়ালীর প্রবেশ

ফুলওয়ালী। বাবা, উত্তরকূটের বিভূতি মানুষটি কে?

সঞ্জয়। কেন, তাকে তোমার কী প্রয়োজন?

ফুলওয়ালী। আমি বিদেশী, দেওতলি থেকে আসছি। শুনেছি উত্তরকূটের সবাই তাঁর পথে পথে পুষ্পবৃষ্টি করছে। সাধুপুরুষ বুঝি? বাবার দর্শন করব বলে নিজের মালঞ্চের ফুল এনেছি।

সঞ্জয়। সাধুপুরুষ না হোক, বুদ্ধিমান পুরুষ বটে।

ফুলওয়ালী। কী কাজ করেছেন তিনি?

সঞ্জয়। আমাদের ঝরনাটাকে বেঁধেছেন।

ফুলওয়ালী। তাই পুজো? বাঁধে কি দেবতার কাজ হবে?

সঞ্জয়। না, দেবতার হাতে বেড়ি পড়বে।

ফুলওয়ালী। তাই পুষ্পবৃষ্টি? বুঝলুম না।

সঞ্জয়। না বোঝাই ভালো। দেবতার ফুল অপাত্রে নষ্ট কোরো না, ফিরে যাও। শোনো, শোনো, আমাকে তোমার ঐ শ্বেতপদ্মটি বেচবে?

ফুলওয়ালী। সাধুকে দেব মনন করে যে ফুল এনেছিলুম সে তো বেচতে পারব না।

সঞ্জয়। আমি যে-সাধুকে সব চেয়ে ভক্তি করি তাঁকেই দেব।

ফুলওয়ালী। তবে এই নাও। না, মূল্য নেব না। বাবাকে আমার প্রণাম জানিয়ো। বোলো আমি দেওতলির দুখনী ফুলওয়ালী।

[প্রস্থান

বিজয়পালের প্রবেশ

সঞ্জয়। দাদা কোথায়?

বিজয়পাল। শিবিরে তিনি বন্দী।

সঞ্জয়। যুবরাজ বন্দী! এ কী স্পর্ধা!

বিজয়পাল। এই দেখো মহারাজের আদেশপত্র।

সঞ্জয়। এ কার ষড়যন্ত্র? তাঁর কাছে আমাকে একবার যেতে দাও।

বিজয়পাল। ক্ষমা করবেন।

সঞ্জয়। আমাকেও বন্দী করো, আমি বিদ্রোহী।

বিজয়পাল। আদেশ নেই।

সঞ্জয়। আচ্ছা, আদেশ নিতে এখনই চললুম। (কিছু দূরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) বিজয়পাল, এই পদ্মটি আমার নাম করে দাদাকে দিয়ো।

[উভয়ের প্রস্থান

শিবতরাইয়ের বৈরাগী ধনঞ্জয়ের প্রবেশ[১]

গান

আমি মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে
আমার ভয়-ভাঙা এই নায়ে।

১. এই নাটকের পাত্র ধনঞ্জয় ও তাহার কথোপকথনের অনেকটা অংশ "প্রায়শ্চিত্ত"-নামক আমার একটি নাটক হইতে লওয়া। সেই নাটক এখন হইতে পনেরো বছরেরও পূর্বে লিখিত।

মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে
ছেঁড়াপালে বুক ফুলিয়ে
তোমার ওই পারেতেই যাবে তরী
ছায়াবটের ছায়ে।
পথ আমারে সেই দেখাবে
যে আমারে চায়—
আমি অভয়মনে ছাড়ব তরী
এই শুধু মোর দায়।
দিন ফুরোলে জানি জানি
পৌঁছে ঘাটে দেব আনি
আমার দুঃখদিনের রক্তকমল
তোমার করুণ পায়ে।

শিবতরাইয়ের একদল প্রজার প্রবেশ

ধনঞ্জয়। একেবারে মুখ চুন যে! কেন রে, কী হয়েছে?

১। প্রভু, রাজশ্যালক চণ্ডপালের মার তো সহ্য হয় না। সে আমাদের যুবরাজকেই মানে না, সেইটেতেই আরো অসহ্য হয়।

ধনঞ্জয়। ওরে, আজও মারকে জিততে পারলি নে? আজও লাগে?

২। রাজার দেউড়িতে ধরে নিয়ে মার! বড়ো অপমান!

ধনঞ্জয়। তোদের মানকে নিজের কাছে রাখিস নে; ভিতরে যে ঠাকুরটি আছেন তাঁরই পায়ের কাছে রেখে আয়, সেখানে অপমান পৌঁছবে না।

গণেশ সর্দারের প্রবেশ

গণেশ। আর সহ্য হয় না, হাত দুটো নিশ্‌পিশ্‌ করছে।

ধনঞ্জয়। তা হলে হাত দুটো বেহাত হয়েছে বল্‌।

গণেশ। ঠাকুর, একবার হুকুম করো ঐ ষণ্ডামার্ক চণ্ডপালের দণ্ডটা খসিয়ে নিয়ে মার কাকে বলে একবার দেখিয়ে দিই।

ধনঞ্জয়। মার কাকে না বলে তা দেখাতে পারিস নে? জোর বেশি লাগে বুঝি? ঢেউকে বাড়ি মারলে ঢেউ থামে না, হালটাকে স্থির করে রাখলে ঢেউ জয় করা যায়।

৪। তা হলে কী করতে বল?

ধনঞ্জয়। মার জিনিসটাকেই একেবারে গোড়া ঘেঁষে কোপ লাগাও।

৩। সেটা কী করে হবে প্রভু?

ধনঞ্জয়। মাথা তুলে যেমনি বলতে পারবি লাগছে না, অমনি মারের শিকড় যাবে কাটা।

২। লাগছে না বলা যে শক্ত।

ধনঞ্জয়। আসল মানুষটি যে, তার লাগে না, সে যে আলোর শিখা। লাগে জন্তুটার, সে যে মাংস, মার খেয়ে কেঁই-কেঁই করে মরে। হাঁ করে রইলি যে? কথাটা বুঝলি নে?

২। তোমাকেই আমরা বুঝি, কথা তোমার নাই বা বুঝলুম।

ধনঞ্জয়। তা হলেই সর্বনাশ হয়েছে।

গণেশ। কথা বুঝতে সময় লাগে, সে তর সয় না; তোমাকে বুঝে নিয়েছি, তাতেই সকাল-সকাল তরে যাব।

ধনঞ্জয়। তার পরে বিকেল যখন হবে? তখন দেখবি কূলের কাছে তরী এসে ডুবেছে। যে কথাটা পাকা, সেটাকে ভিতর থেকে পাকা করে না যদি বুঝিস তো মজবি।

গণেশ। ও কথা বোলো না, ঠাকুর। তোমার চরণাশ্রয় যখন পেয়েছি তখন যে করে হোক বুঝেছি।

ধনঞ্জয়। বুঝিস নি যে তা আর বুঝতে বাকি নেই। তোদের চোখ রয়েছে রাঙিয়ে, তোদের গলা দিয়ে সুর বেরোল না। একটু সুর ধরিয়ে দেব ?

গান

আরো, আরো, প্রভু, আরো, আরো
এমনি করেই মারো, মারো।

ওরে ভীতু, মার এড়াবার জন্যই তোরা হয় মরতে নয় পালাতে থাকিস, দুটো একই কথা। দুটোতেই পশুর দলে ভেড়ায়, পশুপতির দেখা মেলে না।

লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই,
ভয়ে ভয়ে কেবল তোমায় এড়াই—
যা-কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো।

দেখ্ বাবা, আমি মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে চলেছি। বলতে চাই, 'মার আমায় বাজে কি না তুমি নিজে বাজিয়ে নাও।' যে ডরে কিংবা ডর দেখায় তার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এগোতে পারব না।

এবার যা করবার তা সারো, সারো—
আমিই হারি কিংবা তুমিই হারো।
হাটে ঘাটে বাটে করি খেলা
কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা—
দেখি কেমনে কাঁদাতে পারো।

সকলে। শাবাশ, ঠাকুর, তাই সই—
দেখি কেমনে কাঁদাতে পারো।

২। কিন্তু তুমি কোথায় চলেছ, বলো তো ?

ধনঞ্জয়। রাজার উৎসবে।

৩। ঠাকুর, রাজার পক্ষে যেটা উৎসব তোমার পক্ষে সে কী দাঁড়ায় বলা যায় কি ? সেখানে কী করতে যাবে ?

ধনঞ্জয়। রাজসভায় নাম রেখে আসব।

৪। রাজা তোমাকে একবার হাতের কাছে পেলে— না, না, সে হবে না।

ধনঞ্জয়। হবে না কী রে ? খুব হবে, পেট ভরে হবে।

১। রাজাকে ভয় কর না তুমি, কিন্তু আমাদের ভয় লাগে।

ধনঞ্জয়। তোরা যে মনে মনে মারতে চাস তাই ভয় করিস, আমি মারতে চাই নে তাই ভয় করি নে। যার হিংসা আছে ভয় তাকে কামড়ে লেগে থাকে।

২। আচ্ছা, আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।

৩। রাজার কাছে দরবার করব।

ধনঞ্জয়। কী চাইবি রে ?

৩। চাইবার তো আছে ঢের, দেয় তবে তো ?

ধনঞ্জয়। রাজত্ব চাইবি নে ?

৩। ঠাট্টা করছ ঠাকুর ?

ধনঞ্জয়। ঠাট্টা কেন করব ? এক পায়ে চলার মতো কি দুঃখ আছে ? রাজত্ব একলা যদি রাজারই হয়, প্রজার না হয়, তা হলে সেই খোঁড়া রাজত্বের লাফানি দেখে তোরা চমকে উঠতে পারিস কিন্তু

দেবতার চোখে জল আসে। ওরে রাজার খাতিরেই রাজত্ব দাবি করতে হবে।

২। যখন তাড়া লাগাবে?

ধনঞ্জয়। রাজদরবারের উপরতলার মানুষ যখন নালিশ মঞ্জুর করেন, তখন রাজার তাড়া রাজাকেই তেড়ে আসে।

গান

ভুলে যাই থেকে থেকে
তোমার আসন-'পরে বসাতে চাও
নাম আমাদের হেঁকে হেঁকে।

সত্যি কথা বলব বাবা? যতক্ষণ তাঁরই আসন বলে না চিনবি ততক্ষণ সিংহাসনে দাবি খাটবে না, রাজারও নয়, প্রজারও না। ও তো বুক-ফুলিয়ে বসবার জায়গা নয়, হাত জোড় করে বসা চাই।

দ্বারী মোদের চেনে না যে,
বাধা দেয় পথের মাঝে,
বাহিরে দাঁড়িয়ে আছি,
লও ভিতরে ডেকে ডেকে।

দ্বারী কি সাধে চেনে না? ধুলোয় ধুলোয় কপালের রাজটিকা যে মিলিয়ে এসেছে। ভিতরে বশ মানল না, বাইরে রাজত্ব করতে ছুটবি? রাজা হলেই রাজাসনে বসে, রাজাসনে বসলেই রাজা হয় না।

মোদের প্রাণ দিয়েছ আপন হাতে
মান দিয়েছ তারি সাথে;
থেকেও সে মান থাকে না যে
লোভে আর ভয়ে লাজে,
ম্লান হয় দিনে দিনে,
যায় ধুলোতে ঢেকে ঢেকে।

১। যাই বল, রাজদুয়ারে কেন যে চলেছ বুঝতে পারলুম না।

ধনঞ্জয়। কেন, বলব? মনে বড়ো ধোঁকা লেগেছে।

১। সেকি কথা?

ধনঞ্জয়। তোরা আমাকে যত জড়িয়ে ধরছিস তোদের সাঁতার শেখা ততই পিছিয়ে যাচ্ছে। আমারও পার হওয়া দায় হল। তাই ছুটি নেবার জন্যে চলেছি সেইখানে যেখানে আমাকে কেউ মানে না।

১। কিন্তু রাজা তোমাকে তো সহজে ছাড়বে না।

ধনঞ্জয়। ছাড়বে কেন রে। যদি আমাকে বাঁধতে পারে তা হলে আর ভাবনা রইল কী?

গান

আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন,
সে কি অমনি হবে?
আমার কাছে পড়লে বাঁধা সেই হবে মোর বাঁধন,
সে কি অমনি হবে?
কে আমারে ভরসা করে আনতে আপন বশে?
সে কি অমনি হবে?
আপনাকে সে করুক-না বশ, মজুক প্রেমের রসে,
সে কি অমনি হবে?
আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন,
সে কি অমনি হবে?

২। কিন্তু বাবাঠাকুর, তোমার গায়ে যদি হাত তোলে সইতে পারব না।

ধনঞ্জয়। আমার এই গা বিকিয়েছি যাঁর পায়ে তিনি যদি সন, তবে তোদেরও সইবে।

১। আচ্ছা, চলো ঠাকুর, শুনে আসি, শুনিয়ে আসি, তার পরে কপালে যা থাকে।

ধনঞ্জয়। তবে তোরা এইখানে বোস্, এ জায়গায় কখনো আসি নি, পথঘাটের খবরটা নিয়ে আসি।

[প্রস্থান

১। দেখেছিস ভাই, কী চেহারা ঐ উত্তরকূটের মানুষগুলোর ? যেন একতাল মাংস নিয়ে বিধাতা গড়তে শুরু করেছিলেন শেষ করে উঠতে ফুরসৎ পান নি।

২। আর দেখেছিস ওদের মালকোঁচা মেরে কাপড় পরবার ধরনটা ?

৩। যেন নিজেকে বস্তায় বেঁধেছে, একটুখানি পাছে লোকসান হয়।

১। ওরা মজুরি করবার জন্যেই জন্ম নিয়েছে, কেবল সাত ঘাটের জল পেরিয়ে সাত হাটেই ঘুরে বেড়ায়।

২। ওদের যে শিক্ষাই নেই, ওদের যা শাস্তর তার মধ্যে আছে কী ?

১। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, দেখিস নি তার অক্ষরগুলো উইপোকার মতো।

২। উইপোকাই তো বটে। ওদের বিদ্যে যেখানে লাগে সেখানে কেটে টুকরো টুকরো করে।

৩। আর গড়ে তোলে মাটির ঢিবি।

২। ওদের অস্তর দিয়ে মারে প্রাণটাকে, আর শাস্তর দিয়ে মারে মনটাকে।

১। পাপ, পাপ ! আমাদের গুরু বলে ওদের ছায়া মাড়ানো নৈব নৈবচ। কেন জানিস ?

৩। কেন বল্ তো ?

২। তা জানিস নে ? সমুদ্রমন্থনের পর দেবতার ভাঁড় থেকে অমৃত গড়িয়ে যে মাটিতে পড়েছিল আমাদের শিবতরাইয়ের পূর্বপুরুষ সেই মাটি দিয়ে গড়া। আর দৈত্যরা যখন দেবতার উচ্ছিষ্ট ভাঁড় চেটে চেটে নর্দমায় ফেলে দিলে তখন সেই ভাঁড়-ভাঙা পোড়া-মাটি দিয়ে উত্তরকূটের মানুষকে গড়া হয়। তাই ওরা শক্ত, কিন্তু থুঃ— অপবিত্র।

৩। এ তুই কোথায় পেলি ?

২। স্বয়ং গুরু বলে দিয়েছেন।

৩। (উদ্দেশে প্রণাম করিয়া) গুরু, তুমিই সত্য।

উত্তরকূটের একদল নাগরিকের প্রবেশ

উ ১। আর সব হল ভালো, কিন্তু কামারের ছেলে বিভূতিকে রাজা একেবারে ক্ষত্রিয় করে নিলে সেটা তো—

উ ২। ও সব হল ঘরের কথা, সে আমাদের গাঁয়ে ফিরে গিয়ে বুঝে পড়ে নেব। এখন বল্, জয় যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়।

উ ৩। ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রে বৈশ্যের যন্ত্রে যে মিলিয়েছে, জয় সেই যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়।

উ ১। ও ভাই, ঐ-যে দেখি শিবতরাইয়ের মানুষ।

উ ২। কী করে বুঝলি ?

উ ১। কান-ঢাকা টুপি দেখছিস নে ? কিরকম অদ্ভুত দেখতে ! যেন উপর থেকে থাবড়া মেরে হঠাৎ কে ওদের বাড় বন্ধ করে দিয়েছে।

উ ২। আচ্ছা, এত দেশ থাকতে ওরা কান-ঢাকা টুপি পরে কেন ? ওরা কি ভাবে কানটা বিধাতার মতিভ্রম ?

উ ১। কানের উপর বাঁধ বেঁধেছে, বুদ্ধি পাছে বেরিয়ে যায়।

সকলের হাস্য

উ ৩। তাই ? না, ভুলক্রমে বুদ্ধি পাছে ভিতরে ঢুকে পড়ে।

হাস্য

উ ১। পাছে উত্তরকূটের কানমলার ভূত ওদের কানদুটোকে পেয়ে বসে। (হাস্য) ওরে শিবতরাইয়ের অজবুগের দল, সাড়া নেই, শব্দ নেই— হয়েছে কী রে ?

উ ৩। জানিস নে আজ আমাদের বড়ো দিন ? বল্ যন্ত্ররাজ বিভূতির জয় !

উ ১। চুপ করে রইলি যে ? গলা বুজে গেছে ? টুঁটি চেপে না ধরলে আওয়াজ বেরোবে না বুঝি ? বল যন্ত্ররাজ বিভূতির জয় !

গণেশ। কেন বিভূতির জয় ? কী করেছে সে ?

উ ১। বলে কি ? কী করেছে ? এত বড়ো খবরটা এখনো পৌঁছয় নি ? কান-ঢাকা টুপির গুণ দেখলি তো ?

উ ৩। তোদের পিপাসার জল যে তার হাতে— সে দয়া না করলে অনাবৃষ্টির ব্যাঙগুলোর মতো শুকিয়ে মরে যাবি।

শি ২। পিপাসার জল বিভূতির হাতে ? হঠাৎ সে দেবতা হয়ে উঠল নাকি ?

উ ২। দেবতাকে ছুটি দিয়ে দেবতার কাজ নিজেই চালিয়ে নেবে।

শি ১। দেবতার কাজ ! তার একটা নমুনা দেখি তো।

উ ১। ঐ-যে মুক্তধারার বাঁধ।

শিবতরাইয়ের সকলের উচ্চহাস্য

উ ১। এটা কি তোরা ঠাট্টা ঠাউরেছিস ?

গণেশ। ঠাট্টা নয় ? মুক্তধারা বাঁধবে ? ভৈরব স্বহস্তে যা দিয়েছেন, তোমাদের কামারের ছেলে তাই কাড়বে ?

উ ১। স্বচক্ষে দেখ্-না ঐ আকাশে।

শি ১। বাপ রে ! ওটা কী রে ?

শি ২। যেন মস্ত একটা লোহার ফড়িং, আকাশে লাফ মারতে যাচ্ছে।

উ ১। ঐ ফড়িঙের ঠ্যাং দিয়ে তোমাদের জল আটকেছে।

গণেশ। রেখে দাও সব বাজে কথা। কোন্ দিন বলবে ঐ ফড়িঙের ডানায় বসে তোমাদের কামারের পো চাঁদ ধরতে বেরিয়েছে।

উ ১। ঐ দেখো কান ঢাকার গুণ ! ওরা শুনেও শুনবে না, তাই তো মরে।

শি ১। আমরা মরেও মরব না পণ করেছি।

উ ৩। বেশ করেছ, বাঁচাবে কে ?

গণেশ। আমাদের দেবতাকে দেখ নি— প্রত্যক্ষ দেবতা— আমাদের ধনঞ্জয় ঠাকুর ? তার একটা দেহ মন্দিরে, একটা দেহ বাইরে।

উ ৩। কান-ঢাকারা বলে কী ? ওদের মরণ কেউ ঠেকাতে পারবে না।

[উত্তরকূটের দলের প্রস্থান

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

ধনঞ্জয়। কী বলছিলি রে বোকা ? আমারই উপর তোদের বাঁচাবার ভার ? তা হলে তো সাতবার মরে ভূত হয়ে রয়েছিস।

গণেশ। উত্তরকূটের ওরা আমাদের শাসিয়ে গেল যে, বিভূতি মুক্তধারার বাঁধ বেঁধেছে।

ধনঞ্জয়। বাঁধ বেঁধেছে বললে ?

গণেশ। হাঁ ঠাকুর।

ধনঞ্জয়। সব কথাটা শুনলি নে বুঝি ?

গণেশ। ও কি শোনবার কথা? হেসে উড়িয়ে দিলুম।

ধনঞ্জয়। তোদের সব কানগুলো একা আমারই জিম্মায় রেখেছিস? তোদের সবার শোনা আমাকেই শুনতে হবে?

শি ৩। ওর মধ্যে শোনবার আছে কী ঠাকুর?

ধনঞ্জয়। বলিস কী রে? যে শক্তি দুরন্ত তাকে বেঁধে ফেলা কি কম কথা? তা সে অন্তরেই হোক আর বাইরেই হোক।

গণেশ। ঠাকুর, তাই বলে আমাদের পিপাসার জল আটকাবে?

ধনঞ্জয়। সে হল আর-এক কথা। ওটা ভৈরব সইবেন না। তোরা বোস্, আমি সন্ধান নিয়ে আসি গে। জগৎটা বাণীময় রে, তার যে দিকটাতে শোনা বন্ধ করবি সেই দিক থেকেই মৃত্যুবাণ আসে।

[ধনঞ্জয়ের প্রস্থান

শিবতরাইয়ের একজন নাগরিকের প্রবেশ

শি ৩। এ কী বিষণ যে! খবর কী?

বিষণ। যুবরাজকে রাজা শিবতরাই থেকে ডেকে নিয়ে এসেছে, তাকে সেখানে আর রাখবে না

সকলে। সে হবে না, কিছুতেই হবে না।

বিষণ। কী করবি?

সকলে। ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

বিষণ। কী করে?

সকলে। জোর করে।

বিষণ। রাজার সঙ্গে পারবি?

সকলে। রাজাকে মানি নে।

রণজিৎ ও মন্ত্রীর প্রবেশ

রণজিৎ। কাকে মানিস নে?

সকলে। প্রণাম!

গণেশ। তোমার কাছে দরবার করতে এসেছি।

রণজিৎ। কিসের দরবার?

সকলে। আমরা যুবরাজকে চাই!

রণজিৎ। বলিস্ কী!

১। হাঁ, যুবরাজকে শিবতরাইয়ে নিয়ে যাব।

রণজিৎ। আর মনের আনন্দে খাজনা দেবার কথাটা ভুলে যাবি?

সকলে। অন্ন বিনে মরছি যে।

রণজিৎ। তোদের সর্দার কোথায়?

২। (গণেশকে দেখাইয়া) এই-যে আমাদের গণেশ সর্দার।

রণজিৎ। ও নয়, তোদের বৈরাগী।

গণেশ। ঐ আসছেন।

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

রণজিৎ। তুমি এই-সমস্ত প্রজাদের খেপিয়েছ?

ধনঞ্জয়। খ্যাপাই বৈকি, নিজেও খেপি।

গান

আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় কোন্ খ্যাপা সে?
ওরে আকাশ জুড়ে মোহন সুরে
কী যে বাজায় কোন্ বাতাসে?

গেল রে গেল বেলা,
পাগলের কেমন খেলা ?
ডেকে সে আকুল করে, দেয় না ধরা—
তারে কানন গিরি খুঁজে ফিরি,
কেঁদে মরি কোন্‌ হুতাশে ।

রণজিৎ । পাগলামি করে কথা চাপা দিতে পারবে না । খাজনা দেবে কি না বলো ।

ধনঞ্জয় । না, মহারাজ, দেব না ।

রণজিৎ । দেবে না ? এত বড়ো আস্পর্ধা ?

ধনঞ্জয় । যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না ।

রণজিৎ । আমার নয় ?

ধনঞ্জয় । আমার উদ্‌বৃত্ত অন্ন তোমার, ক্ষুধার অন্ন তোমার নয় ।

রণজিৎ । তুমিই প্রজাদের বারণ কর খাজনা দিতে ?

ধনঞ্জয় । ওরা তো ভয়ে দিয়ে ফেলতে চায়, আমি বারণ করে বলি প্রাণ দিবি তাঁকেই প্রাণ দিয়েছেন যিনি ।

রণজিৎ । তোমার ভরসা চাপা দিয়ে ওদের ভয়টাকে ঢেকে রাখছ বৈ তো নয় । বাইরের ভরসা একটু ফুটো হলেই ভিতরের ভয় সাতগুণ জোরে বেরিয়ে পড়বে । তখন ওরা মরবে যে । দেখো, বৈরাগী, তোমার কপালে দুঃখ আছে ।

ধনঞ্জয় । যে দুঃখ কপালে ছিল সে দুঃখ বুকে তুলে নিয়েছি । দুঃখের উপরওআলা সেইখানে বাস করেন ।

রণজিৎ । (প্রজাদের প্রতি) আমি তোদের বলছি, তোরা শিবতরাইয়ে ফিরে যা । বৈরাগী, তুমি এইখানেই রইলে ।

সকলে । আমাদের প্রাণ থাকতে সে হবে না ।

ধনঞ্জয় । গান

রইল বলে রাখলে কারে ?
হুকুম তোমার ফলবে কবে ?
টানাটানি টিকবে না, ভাই,
রবার যেটা সেটাই রবে ।

রাজা, টেনে কিছুই রাখতে পারবে না । সহজে রাখবার শক্তি যদি থাকে তবেই রাখা চলবে ।

রণজিৎ । মানে কী হল ?

ধনঞ্জয় । যিনি সব দেন তিনিই সব রাখেন । লোভ করে যা রাখতে চাইবে সে হল চোরাই মাল, সে টিকবে না ।

গান

যা-খুশি তাই করতে পার,
গায়ের জোরে রাখ মার,
যাঁর গায়ে তার ব্যথা বাজে
তিনিই যা সন সেটাই সবে ।

রাজা, ভুল করছ এই যে, ভাবছ জগৎটাকে কেড়ে নিলেই জগৎ তোমার হল । ছেড়ে রাখলেই যাকে পাও, মুঠোর মধ্যে চাপতে গেলেই দেখবে সে ফসকে গেছে ।

গান

ভাবছ— হবে তুমি যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও,

দেখবে হঠাৎ নয়ন মেলে
হয় না যেটা সেটাও হবে।

রণজিৎ। মন্ত্রী, বৈরাগীকে এইখানেই ধরে রেখে দাও।

মন্ত্রী। মহারাজ—

রণজিৎ। আদেশটা তোমার মনের মতো হচ্ছে না?

মন্ত্রী। শাসনের ভীষণ যন্ত্র তো তৈরি হয়েছে, তার উপরে ভয় আরো চড়াতে গেলে সব যাবে ভেঙে।

প্রজারা। এ আমাদের সহ্য হবে না।

ধনঞ্জয়। যা বলছি, ফিরে যা।

১। ঠাকুর, যুবরাজকেও যে হারিয়েছি, শোন নি বুঝি?

২। তা হলে কাকে নিয়ে মনের জোর পাব?

ধনঞ্জয়। আমার জোরেই কি তোদের জোর? এ কথা যদি বলিস তা হলে যে আমাকে-সুদ্ধ দুর্বল করবি।

গণেশ। ও কথা বলে আজ ফাঁকি দিয়ো না। আমাদের সকলের জোর একা তোমারই মধ্যে।

ধনঞ্জয়। তবে আমার হার হয়েছে। আমাকে সরে দাঁড়াতে হল।

সকলে। কেন ঠাকুর?

ধনঞ্জয়। আমাকে পেয়ে আপনাকে হারাবি? এত বড়ো লোকসান মেটাতে পারি এমন সাধ্য কি আমার আছে? বড়ো লজ্জা পেলুম।

১। সে কি কথা ঠাকুর? আচ্ছা, যা করতে বল তাই করব।

ধনঞ্জয়। আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যা।

২। চলে গিয়ে কী করব? তুমি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারবে? আমাদের ভালোবাস না?

ধনঞ্জয়। ভালোবেসে তোদের চেপে মারার চেয়ে, ভালোবেসে তোদের ছেড়ে থাকাই ভালো। যা, আর কথা নয়, চলে যা।

সকলে। আচ্ছা ঠাকুর, চললুম, কিন্তু—

ধনঞ্জয়। কিন্তু কী রে। একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যা, উপরে মাথা তুলে।

সকলে। আচ্ছা, তবে চলি।

ধনঞ্জয়। ওকে চলা বলে? জোরে।

গণেশ। চললুম, কিন্তু আমাদের বলবুদ্ধি রইল এখানে পড়ে।

[প্রস্থান

রণজিৎ। কী বৈরাগী, চুপ করে রইলে যে।

ধনঞ্জয়। ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে রাজা।

রণজিৎ। কিসের ভাবনা?

ধনঞ্জয়। তোমার চণ্ডপালের দণ্ড লাগিয়েও যা করতে পার নি আমি দেখছি তাই করে বসে আছি। এতদিন ঠাউরেছিলুম আমি ওদের বলবুদ্ধি বাড়াচ্ছি; আজ মুখের উপর বলে গেল আমিই ওদের বলবুদ্ধি হরণ করেছি।

রণজিৎ। এমনটা হয় কী করে?

ধনঞ্জয়। ওদের যতই মাতিয়ে তুলেছি ততই পাকিয়ে তোলা হয় নি আর-কি। দেনা যাদের অনেক বাকি, শুধু কেবল দৌড় লাগিয়ে দিয়ে তাদের দেনা শোধ হয় না তো। ওরা ভাবে আমি বিধাতার চেয়ে বড়ো, তাঁর কাছে ওরা যা ধারে আমি যেন তা নামঞ্জুর করে দিতে পারি। তাই চক্ষু বুজে আমাকেই আঁকড়ে থাকে।

রণজিৎ। ওরা যে তোমাকেই দেবতা বলে জেনেছে।

ধনঞ্জয়। তাই আমাতেই এসে ঠেকে গেল, আসল দেবতা পর্যন্ত পৌঁছল না। ভিতরে থেকে যিনি ওদের চালাতে পারতেন বাইরে থেকে তাঁকে রেখেছি ঠেকিয়ে।

রণজিৎ। রাজার খাজনা যখন ওরা দিতে আসে তখন বাধা দাও, আর দেবতার পুজো যখন তোমার পায়ের কাছে এসে পড়ে তখন তোমার বাজে না ?

ধনঞ্জয়। ওরে বাপ রে ! বাজে না তো কী। দৌড় মেরে পালাতে পারলে বাঁচি। আমাকে পুজো দিয়ে ওরা অন্তরে অন্তরে দেউলে হতে চলল, সে দেনার দায় যে আমারও ঘাড়ে পড়বে, দেবতা ছাড়বেন না।

রণজিৎ। এখন তোমার কর্তব্য ?

ধনঞ্জয়। তফাতে থাকা। আমি যদি পাকা করে ওদের মনের বাঁধ বেঁধে থাকি, তা হলে তোমার বিভূতিকে আর আমাকে ভৈরব যেন একসঙ্গেই তাড়া লাগান।

রণজিৎ। তবে আর দেরি কেন ? সরো-না।

ধনঞ্জয়। আমি সরে দাঁড়ালেই ওরা একেবারে তোমার চণ্ডপালের ঘাড়ের উপর গিয়ে চড়াও হবে। তখন যে দণ্ড আমার পাওনা সেটা পড়বে ওদেরই মাথার খুলির উপরে। এই ভাবনায় সরতে পারি নে।

রণজিৎ। নিজে সরতে না পার আমিই সরিয়ে দিচ্ছি। উদ্ধব, বৈরাগীকে এখন শিবিরে বন্দী করে রাখো।

ধনঞ্জয়। গান

তোর শিকল আমায় বিকল করবে না।
তোর মারে মরম মরবে না।
তাঁর আপন হাতের ছাড়-চিঠি সেই-যে
আমার মনের ভিতর রয়েছে এই-যে,
তোদের ধরা আমায় ধরবে না।
যে পথ দিয়ে আমার চলাচল
তোর প্রহরী তার খোঁজ পাবে কী বল ?
আমি তাঁর দুয়ারে পৌঁছে গেছি রে,
মোরে তোর দুয়ারে ঠেকাবে কী রে ?
তোর ডরে পরান ডরবে না।

[ধনঞ্জয়কে লইয়া উদ্ধবের প্রস্থান

রণজিৎ। মন্ত্রী, বন্দিশালায় অভিজিৎকে দেখে এসো গে। যদি দেখ সে আপন কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত, তা হলে—

মন্ত্রী। মহারাজ, আপনি স্বয়ং গিয়ে একবার—

রণজিৎ। না, না, সে নিজরাজ্যবিদ্রোহী, যতক্ষণ অপরাধ স্বীকার না করে ততক্ষণ তার মুখদর্শন করব না। আমি রাজধানীতে যাচ্ছি, সেখানে আমাকে সংবাদ দিয়ো।

[রাজার প্রস্থান

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

তিমিরহৃদবিদারণ
জ্বলদগ্নিনিদারুণ
মরুশ্মশানসঞ্চর
শংকর শংকর।

বজ্রঘোষবাণী
রুদ্র শূলপাণি
মৃত্যুসিন্ধুসন্তর
শংকর শংকর।

[প্রস্থান

উদ্ধবের প্রবেশ

উদ্ধব। এ কী! যুবরাজের সঙ্গে দেখা না করেই মহারাজ চলে গেলেন?

মন্ত্রী। পাছে মুখ দেখে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় এই ভয়ে। এতক্ষণ ধরে বৈরাগীর সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন মনের মধ্যে এই দ্বিধা নিয়ে। শিবিরের মধ্যেও যেতে পারছিলেন না, শিবির ছেড়ে যেতেও পা উঠছিল না। যাই, যুবরাজকে দেখে আসি গে।

[প্রস্থান

দুইজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

১। মাসি, ওরা কেন সবাই এমন রেগে উঠেছে? কেন বলছে যুবরাজ অন্যায় করেছেন— আমি এ বুঝতেও পারি নে, সইতেও পারি নে।

২। বুঝতে পারিস নে উত্তরকূটের মেয়ে হয়ে? উনি নন্দিসংকটের রাস্তা খুলে দিয়েছেন।

১। আমি জানি নে তাতে অপরাধ কী হয়েছে। কিন্তু আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি নে যে যুবরাজ অন্যায় করেছেন।

২। তুই ছেলেমানুষ, অনেক দুঃখ পেয়ে তবে একদিন বুঝবি বাইরে থেকে যাদের ভালো বলে বোধ হয় তাদেরই বেশি সন্দেহ করতে হয়।

১। কিন্তু যুবরাজকে কী সন্দেহ করছ তোমরা।

২। সবাই বলছে যে শিবতরাইয়ের লোকদের বশ করে নিয়ে, উনি এখনই উত্তরকূটের সিংহাসন জয় করতে চান— ওঁর আর তর সইছে না।

১। সিংহাসনের কী দরকার ছিল ওঁর। উনি তো সবারই হৃদয় জয় করে নিয়েছেন। যারা ওঁর নিন্দে করছে তাদেরই বিশ্বাস করব আর যুবরাজকে বিশ্বাস করব না?

২। তুই চুপ কর্। একরত্তি মেয়ে, তোর মুখে এ-সব কথা সাজে না। দেশসুদ্ধ লোক যাকে অভিসম্পাত করছে তুই হঠাৎ তার—

১। আমি দেশসুদ্ধ লোকের সামনে দাঁড়িয়ে এ কথা বলতে পারি যে—

২। চুপ চুপ।

১। কেন চুপ? আমার চোখ ফেটে জল বেরোতে চায়। যুবরাজকে আমি সব চেয়ে বিশ্বাস করি এই কথাটা প্রকাশ করবার জন্যে আমার যা হয় একটা-কিছু করতে ইচ্ছা করছে। আমার এই লম্বা চুল আমি আজ ভৈরবের কাছে মানত করব— বলব, "বাবা, তুমি জানিয়ে দাও যে যুবরাজেরই জয়, যারা নিন্দুক তারা মিথ্যে।"

২। চুপ চুপ চুপ। কোথা থেকে কে শুনতে পাবে। মেয়েটা বিপদ ঘটাবে দেখছি।

[উভয়ের প্রস্থান

উত্তরকূটের একদল নাগরিকের প্রবেশ

১। কিছুতেই ছাড়ছি নে, চল্ রাজার কাছে যাই।

২। ফল কী হবে? যুবরাজ যে রাজার বক্ষের মানিক, তাঁর অপরাধের বিচার করতে পারবেন না, মাঝের থেকে রাগ করবেন আমাদের 'পরে।

১। করুন রাগ, পষ্ট কথা বলব কপালে যাই থাক্।

৩। এদিকে যুবরাজ আমাদের এত ভালোবাসা দেখান, ভাব করেন যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেড়ে দেবেন, আর তলে তলে তাঁরই এই কীর্তি ? হঠাৎ শিবতরাই তাঁর কাছে উত্তরকূটের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠল ?

২। এমন হলে পৃথিবীতে আর ধর্ম রইল কোথা ? বলো তো দাদা ?

৩। কাউকে চেনবার জো নেই।

১। রাজা ওঁকে শাস্তি না দেন তো আমরা দেব।

২। কী করবি ?

১। এ দেশে ওঁর ঠাঁই হচ্ছে না। যে পথ কেটেছেন সেই পথ দিয়ে ওঁকেই বেরিয়ে যেতে হবে।

৩। কিন্তু ঐ তো চবুয়া গাঁয়ের লোক বললে তিনি শিবতরাইয়ে নেই, এখানে রাজার বাড়িতেও তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না।

১। রাজা তাকে নিশ্চয়ই লুকিয়েছে।

৩। লুকিয়েছে ? ইস, দেয়াল ভেঙে বের করব।

১। ঘরে আগুন লাগিয়ে বের করব।

৩। আমাদের ফাঁকি দেবে ? মরি মরব, তবু—

উদ্ধবের সহিত মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। কী হয়েছে ?

১। লুকোচুরি চলবে না। বের করো যুবরাজকে।

মন্ত্রী। আরে বাপু, আমি বের করবার কে ?

২। তোমরাই তো মন্ত্রণা দিয়ে তাঁকে— পারবে না কিন্তু, আমরা টেনে বের করব।

মন্ত্রী। আচ্ছা, তবে নিজের হাতে রাজত্ব নাও, রাজার গারদ থেকে ছাড়িয়ে আনো।

৩। গারদ থেকে ?

মন্ত্রী। মহারাজ তাকে বন্দী করেছেন।

সকলে। জয় মহারাজের, জয় উত্তরকূটের।

২। চল রে, আমরা গারদে ঢুকব, সেখানে গিয়ে—

মন্ত্রী। গিয়ে কী করবি ?

২। বিভূতির গলার মালা থেকে ফুল খসিয়ে দড়িগাছটা ওঁর গলায় ঝুলিয়ে আসব।

৩। গলায় কেন, হাতে। বাঁধ বাঁধার সম্মানের উচ্ছিষ্ট দিয়ে পথ কাটার হাতে দড়ি পড়বে।

মন্ত্রী। যুবরাজ পথ ভেঙেছেন বলে অপরাধ, আর তোমরা ব্যবস্থা ভাঙবে তাতে অপরাধ নেই ?

২। আহা, ও যে সম্পূর্ণ আলাদা কথা। আচ্ছা বেশ, যদি ব্যবস্থা ভাঙি তো কী হবে ?

মন্ত্রী। পায়ের তলার মাটি পছন্দ হল না বলে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়া হবে। সেটাও পছন্দ হবে না বলে রাখছি। একটা ব্যবস্থা আগে করে তবে অন্য ব্যবস্থাটা ভাঙতে হয়।

৩। আচ্ছা, তবে গারদ থাক্, রাজবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মহারাজের জয়ধ্বনি করে আসি গে।

১। ও ভাই, ঐ দেখ্। সূর্য অস্ত গেছে, আকাশ অন্ধকার হয়ে এল, কিন্তু বিভূতির যন্ত্রের ঐ চূড়াটা এখনো জ্বলছে। রোদ্দুরের মদ খেয়ে যেন লাল হয়ে রয়েছে।

২। আর ভৈরবমন্দিরের ত্রিশূলটাকে অস্তসূর্যের আলো আঁকড়ে রয়েছে যেন ডোববার ভয়ে। কী রকম দেখাচ্ছে !

[নাগরিকদের প্রস্থান

মন্ত্রী। মহারাজ কেন যে যুবরাজকে এই শিবিরে বন্দী করতে বলেছিলেন এখন বুঝেছি।

উদ্ধব। কেন ?

মন্ত্রী। প্রজাদের হাত থেকে ওঁকে বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু ভালো ঠেকছে না। লোকের উত্তেজন কেবলই বেড়ে উঠছে।

সঞ্জয়ের প্রবেশ

সঞ্জয়। মহারাজকে বেশি আগ্রহ দেখাতে সাহস করলুম না, তাতে তাঁর সংকল্প আরো দৃঢ় হয়ে ওঠে।

মন্ত্রী। রাজকুমার, শান্ত থাকবেন, উৎপাতকে আরো জটিল করে তুলবেন না।

সঞ্জয়। বিদ্রোহ ঘটিয়ে আমিও বন্দী হতে চাই।

মন্ত্রী। তার চেয়ে মুক্ত থেকে বন্ধনমোচনের চিন্তা করুন।

সঞ্জয়। সেই চেষ্টাতেই প্রজাদের মধ্যে গিয়েছিলুম। জানতুম যুবরাজকে তারা প্রাণের অধিক ভালোবাসে, তাঁর বন্ধন ওরা সইবে না। গিয়ে দেখি নন্দিসংকটের খবর পেয়ে তারা আগুন হয়ে আছে।

মন্ত্রী। তবেই বুঝছেন বন্দিশালাতেই যুবরাজ নিরাপদ।

সঞ্জয়। আমি চিরদিন তাঁরই অনুবর্তী, বন্দিশালাতেও আমাকে তাঁর অনুসরণ করতে দাও।

মন্ত্রী। কী হবে?

সঞ্জয়। পৃথিবীতে কোনো একলা মানুষই এক নয়, সে অর্ধেক। আর-একজনের সঙ্গে মিল হলে তবেই সে ঐক্য পায়। যুবরাজের সঙ্গে আমার সেই মিল।

মন্ত্রী। রাজকুমার, সে কথা মানি। কিন্তু সেই সত্য মিল যেখানে, সেখানে কাছে কাছে থাকবার দরকার হয় না। আকাশের মেঘ আর সমুদ্রের জল অন্তরে একই, তাই বাইরে তারা পৃথক হয়ে ঐক্যটিকে সার্থক করে। যুবরাজ আজ যেখানে নেই, সেইখানেই তিনি তোমার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পান।

সঞ্জয়। মন্ত্রী, এ তো তোমার নিজের কথা বলে শোনাচ্ছে না, এ যেন যুবরাজের মুখের কথা।

মন্ত্রী। তাঁর কথা এখানকার হাওয়ায় ছড়িয়ে আছে, ব্যবহার করি, অথচ ভুলে যাই তাঁর কি আমার।

সঞ্জয়। কিন্তু কথাটি মনে করিয়ে দিয়ে ভালো করেছ, দূর থেকে তাঁরই কাজ করব। যাই মহারাজের কাছে।

মন্ত্রী। কী করতে?

সঞ্জয়। শিবতরাইয়ের শাসনভার প্রার্থনা করব।

মন্ত্রী। সময় যে বড়ো সংকটের, এখন কি—

সঞ্জয়। সেইজন্যেই এই তো উপযুক্ত সময়।

[উভয়ের প্রস্থান

বিশ্বজিতের প্রবেশ

বিশ্বজিৎ। ও কে ও? উদ্ধব বুঝি?

উদ্ধব। হাঁ, খুড়া মহারাজ।

বিশ্বজিৎ। অন্ধকারের জন্যে অপেক্ষা করছিলুম— আমার চিঠি পেয়েছ তো?

উদ্ধব। পেয়েছি।

বিশ্বজিৎ। সেই মতো কাজ হয়েছে?

উদ্ধব। অল্প পরেই জানতে পারবে। কিন্তু—

বিশ্বজিৎ। মনে সংশয় কোরো না। মহারাজ ওকে নিজে মুক্তি দিতে প্রস্তুত নন, কিন্তু তাঁকে না জানিয়ে কোনো উপায়ে আর কেউ যদি এ কাজ সাধন করে তা হলে তিনি বেঁচে যাবেন।

উদ্ধব। কিন্তু সেই আর-কেউকে কিছুতে ক্ষমা করবেন না।

বিশ্বজিৎ। আমার সৈন্য আছে, তারা তোমাকে আর তোমার প্রহরীদের বন্দী করে নিয়ে যাবে। দায় আমারই।

নেপথ্যে। আগুন আগুন!

উদ্ধব। ঐ হয়েছে! বন্দিশালার সংলগ্ন পাকশালার তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এই সুযোগে বন্দী-দুটিকে বের করে দিই।

কিছুক্ষণ পরে অভিজিতের প্রবেশ

অভিজিৎ। এ কী! দাদামশায় যে!

বিশ্বজিৎ। তোমাকে বন্দী করতে এসেছি। মোহনগড়ে যেতে হবে।

অভিজিৎ। আমাকে আজ কিছুতেই বন্দী করতে পারবে না— না ক্রোধে, না স্নেহে। তোমরা ভাবছ তোমরাই আগুন লাগিয়েছ? না, এ আগুন যেমন করেই হোক লাগত। আজ আমার বন্দী থাকবার অবকাশ নেই।

বিশ্বজিৎ। কেন, ভাই, কী তোমার কাজ?

অভিজিৎ। জন্মকালের ঋণ শোধ করতে হবে। স্রোতের পথ আমার ধাত্রী, তার বন্ধন মোচন করব।

বিশ্বজিৎ। তার অনেক সময় আছে, আজ নয়।

অভিজিৎ। সময় এখনই এসেছে এই কথাই জানি, কিন্তু সময় আবার আসবে কি না সে কথা কেউ জানি নে।

বিশ্বজিৎ। আমরাও তোমার সঙ্গে যোগ দেব।

অভিজিৎ। না, সকলের এক কাজ নয়, আমার উপর যে কাজ পড়েছে সে একলা আমারই।

বিশ্বজিৎ। তোমার শিবতরাইয়ের ভক্তদল যে তোমার কাজে হাত দেবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, তাদের ডাকবে না?

অভিজিৎ। যে ডাক আমি শুনেছি সেই ডাক যদি তারাও শুনত তবে আমার জন্যে অপেক্ষা করত না। আমার ডাকে তারা পথ ভুলবে।

বিশ্বজিৎ। ভাই, অন্ধকার হয়ে এসেছে যে।

অভিজিৎ। যেখান থেকে ডাক এসেছে সেইখান থেকে আলোও আসবে।

বিশ্বজিৎ। তোমাকে বাধা দিতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। অন্ধকারের মধ্যে একলা চলেছ, তবুও তোমাকে বিদায় দিয়ে ফিরতে হবে। কেবল একটি আশ্বাসের কথা বলে যাও যে, আবার মিলন ঘটবে।

অভিজিৎ। তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হবার নয় এই কথাটি মনে রেখো।

[দুইজনের দুই পথে প্রস্থান

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

গান

আগুন, আমার ভাই,
আমি তোমারি জয় গাই।
তোমার শিকল-ভাঙা এমন রাঙা
মূর্তি দেখি নাই।
দু-হাত তুলে আকাশ-পানে
মেতেছ আজ কিসের গানে?
এ কী আনন্দময় নৃত্য অভয়
বলিহারি যাই।
যেদিন ভবের মেয়াদ ফুরোবে, ভাই,
আগল যাবে সরে,

সেদিন হাতের দড়ি পায়ের দড়ি
দিবি রে ছাই করে।
সেদিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে
ওই নাচনে নাচবে রঙ্গে,
সকল দাহ মিটবে দাহে,
ঘুচবে সব বালাই।

বটুর প্রবেশ

বটু। ঠাকুর, দিন তো গেল, অন্ধকার হয়ে এল।

ধনঞ্জয়। বাবা, বাইরের আলোর উপর ভরসা রাখাই অভ্যাস, তাই অন্ধকার হলেই একেবারে অন্ধকার দেখি।

বটু। ভেবেছিলুম ভৈরবের নৃত্য আজই আরম্ভ হবে, কিন্তু যন্ত্ররাজ কি তাঁরও হাত পা যন্ত্র দিয়ে বেঁধে দিলে?

ধনঞ্জয়। ভৈরবের নৃত্য যখন সবে আরম্ভ হয় তখন চোখে পড়ে না। যখন শেষ হবার পালা আসে তখন প্রকাশ হয়ে পড়ে।

বটু। ভরসা দাও, প্রভু, বড়ো ভয় ধরিয়েছে। জাগো, ভৈরব, জাগো! আলো নিবেছে, পথ ডুবেছে, সাড়া পাই নে মৃত্যুঞ্জয়! ভয়কে মারো ভয় লাগিয়ে। জাগো, ভৈরব জাগো!

[প্রস্থান

উত্তরকূটের নাগরিকদলের প্রবেশ

১। মিথ্যে কথা। রাজধানীর গারদে সে নেই। ওকে লুকিয়ে রেখেছে।

২। দেখব কোথায় লুকিয়ে রাখে।

ধনঞ্জয়। না, বাবা, কোথাও পারবে না লুকিয়ে রাখতে। পড়বে দেয়াল, ভাঙবে দরজা, আলো ছুটে বের হয়ে আসবে— সমস্ত প্রকাশ হয়ে পড়বে।

১। এ আবার কে রে? বুকের ভিতরটায় হঠাৎ চমকিয়ে দিলে।

৩। তা, বেশ হয়েছে। একজন কাউকে চাই। তা, এই বৈরাগীটাকেই ধর্। ওকে বাঁধ।

ধনঞ্জয়। যে মানুষ ধরা দিয়ে বসে আছে তাকে ধরবে কী করে?

১। সাধুগিরি রাখো, আমরা ও-সব মানি নে।

ধনঞ্জয়। না মানাই তো ভালো। প্রভু স্বয়ং হাতে ধরে তোমাদের মানিয়ে নেবেন। তোমরা ভাগ্যবান। আমি যে-সব অভাগাদের জানি তারা কেবল মেনে মেনেই গুরুকে খোয়ালে। আমাকে সুদ্ধ তারা মানার তাড়ায় দেশছাড়া করেছে।

১। তাদের গুরু কে?

ধনঞ্জয়। যার হাতে তারা মার খায়।

১। তা হলে তোমার উপর গুরুগিরি আমরাই শুরু করি-না কেন?

ধনঞ্জয়। রাজি আছি বাবা। দেখে নিই ঠিকমত পাঠ দিতে পারি কি না। পরীক্ষা হোক।

২। সন্দেহ হচ্ছে তুমিই আমাদের যুবরাজকে নিয়ে কিছু চালাকি করেছ।

ধনঞ্জয়। তোমাদের যুবরাজ আমার চেয়েও চালাক, তাঁর চালাকি আমাকে নিয়ে।

২। দেখলি তো, কথাটার মানে আছে। দুজনে একটা কী ফন্দি চলছে।

১। নইলে এত রাত্রে এখানে ঘুরে বেড়ায় কেন? যুবরাজকে শিবতরাইয়ে সরাবার চেষ্টা। এইখানেই ওকে বেঁধে রেখে যাই। তার পরে যুবরাজের সন্ধান পেলে ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করব। ওহে, কুন্দন, বাঁধো-না। দড়িগাছটা তো তোমার কাছেই আছে।

কুন্দন। এই নাও-না দড়ি, তুমিই বাঁধো-না।

২। ওরে, তোরা কি উত্তরকূটের মানুষ ? দে, আমাকে দে। (বাঁধিতে বাঁধিতে) কেমন হে, গুরু কী বলছেন ?

ধনঞ্জয়। কষে চেপে ধরেছেন, সহজে ছাড়ছেন না।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

তিমিরহৃদবিদারণ
জ্বলদগ্নিনিদারুণ
মরুশ্মশানসঞ্চর
শংকর শংকর।
বজ্রঘোষবাণী
রুদ্র শূলপাণি
মৃত্যুসিন্ধুসন্তর
শংকর শংকর।

[প্রস্থান

কুন্দন। ঐ দেখো চেয়ে। গোধূলির আলো যতই নিবে আসছে আমাদের যন্ত্রের চূড়াটা ততই কালো হয়ে উঠছে।

১। দিনের বেলায় ও সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এসেছে, অন্ধকারে ও রাত্রিবেলাকার কালোর সঙ্গে টক্কর দিতে লেগেছে। ওকে ভূতের মতো দেখাচ্ছে।

কুন্দন। বিভূতি তার কীর্তিটাকে এমন করে গড়ল কেন ভাই ? উত্তরকূটের যে দিকেই ফিরি ওর দিকে না তাকিয়ে থাকবার জো নেই, ও যেন একটা বিকট চীৎকারের মতো।

চতুর্থ নাগরিকের প্রবেশ

৪। খবর পাওয়া গেল— ঐ আমবাগানের পিছনে রাজার শিবির পড়েছে, সেখানে যুবরাজকে রেখে দিয়েছে।

২। এতক্ষণে বোঝা গেল। তাই বটে। বৈরাগী এই পথেই ঘুরছে। ও থাক এইখানেই বাঁধা পড়ে। ততক্ষণ দেখে আসি।

[নাগরিকদের প্রস্থান

গান

ধনঞ্জয়।

শুধু কি তার বেঁধেই তোর কাজ ফুরাবে
গুণী মোর, ও গুণী ?
বাঁধাবীণা রইবে পড়ে এমনি ভাবে
গুণী মোর, ও গুণী ?
তা হলে হার হল যে হার হল,
শুধু বাঁধাবাঁধিই সার হল
গুণী মোর, ও গুণী !
বাঁধনে যদি তোমার হাত লাগে,
তা হলেই সুর জাগে
গুণী মোর, ও গুণী।
না হলে ধুলায় পড়ে লাজ কুড়াবে।

নাগরিকদের পুনঃপ্রবেশ

১। এ কী কাণ্ড!

২। খুড়ো মহারাজ যুবরাজকে সমস্ত প্রহরীসুদ্ধ মোহনগড়ে নিয়ে গেলেন। এর মানে কী হল?

কুন্দন। উত্তরকূটের রক্ত তো ওঁর শিরায় আছে। পাছে এখানে যুবরাজের উচিত বিচার না হয় সেইজন্যে তাঁকে জোর করে বন্দী করে নিয়ে গেছেন।

১। ভারি অন্যায়। একে অত্যাচার বলে। আমাদের যুবরাজকে আমরা শাস্তি দিতে পারব না?

২। এর উচিত বিধান হচ্ছে— বুঝলে দাদা—

১। হাঁ, হাঁ, ওঁদের সেই সোনার খনিটা—

কুন্দন। আর জানিস তো, ভাই, ওঁর গোষ্ঠে কিছু না হবে তো পঁচিশ হাজার গোরু আছে।

১। তার সব কটি গুনে নিয়ে তবে— কী অন্যায়! অসহ্য অন্যায়!

৩। আর ওঁদের সেই জাফরানের খেত, তার থেকে অন্তত পক্ষে বৎসরে—

২। হাঁ, হাঁ, সেটা দিতে হবে ওঁকে দণ্ড। কিন্তু এখন এই বৈরাগীকে নিয়ে কী করা যায়?

১। ও ঐখানেই থাক্-না পড়ে। [নাগরিকদের প্রস্থান

ধনঞ্জয়। গান

ফেলে রাখলেই কি পড়ে রবে? (ও অবোধ)
যে তার দাম জানে সে কুড়িয়ে লবে। (ও অবোধ)
ও-যে কোন রতন তা দেখ্-না ভাবি,
ওর 'পরে কি ধুলোর দাবি?
ও হারিয়ে গেলে তাঁরি গলার
হার গাঁথা যে ব্যর্থ হবে।
ওর খোঁজ পড়েছে জানিস নে তা?
তাই দূত বেরোল হেথা সেথা।
যারে করলি হেলা সবাই মিলি
আদর যে তার বাড়িয়ে দিলি,
যারে দরদ দিলি তার ব্যথা কি
সেই দরদির প্রাণে স'বে?

কুন্দনের পুনঃপ্রবেশ

কুন্দন। ঠাকুর, তোমার বাঁধনটা খুলে দি, অপরাধ নিয়ো না। তুমি এখনই বাড়ি পালাও। কী জানি আজ রাত্রে—

ধনঞ্জয়। কী জানি আজ রাত্রে যদি ডাক পড়ে সেইজন্যেই তো বাড়ি পালাবার জো নাই।

কুন্দন। এখানে তোমার ডাক কোথায়?

ধনঞ্জয়। উৎসবের শেষ পালাটায়।

কুন্দন। তুমি শিবতরাইয়ের মানুষ হয়ে উত্তরকূটের—

ধনঞ্জয়। ভৈরবের উৎসবে এখন শিবতরাইয়ের আরতিই কেবল বাকি আছে।

নেপথ্যে। জাগো, ভৈরব, জাগো!

কুন্দন। আমার ভালো বোধ হচ্ছে না, চললেম! [উভয়ের প্রস্থান

উত্তরকূটের দুইজন রাজদূতের প্রবেশ

১। এখন কোন্ দিকে যাই? নওসানুতে যারা ছাগল চরায় তারা তো বললে তারা দেখেছে যুবরাজ একলা এই পথ দিয়ে পশ্চিমের দিকে গেছেন।

২। আজ রাত্রে তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে মহারাজের হুকুম।

১। মোহনগড়ে তাঁকে নিয়ে গেছে বলে কথা উঠেছে। কিন্তু অম্বা পাগলির কথা শুনে স্পষ্ট বোধ হচ্ছে সে যাকে দেখেছে সে আমাদের যুবরাজ— আর তিনি এই পথ দিয়েই উঠেছেন।

২। কিন্তু এই অন্ধকারে তিনি একলা কোথায় যে যাবেন বোঝা যাচ্ছে না।

১। আলো না হলে আমরা তো এক পা এগোতে পারব না। কোটপালের কাছ থেকে আলো সংগ্রহ করে আনি গে।

[উভয়ের প্রস্থান

একজন পথিকের প্রবেশ

পথিক। (চীৎকার করিয়া) ওরে বুধ— ন! শম্ভু— উ! বিপদে ফেললে। আমাকে এগিয়ে দিলে, ফেলে চড়াই পথ বেয়ে সোজা এসে আমাকে ধরবে। কারও দেখা নেই। অন্ধকারে ঐ কালো যন্ত্রটা ইশারা করছে। ভয় লাগিয়ে দিলে। কে আসে? কে হে? জবাব দাও-না কেন? বুধন না কি?

২ পথিক। আমি নিমকু, বাতিওআলা। রাজধানীতে সমস্ত রাত আলো জ্বলবে, বাতির দরকার। তুমি কে?

১ পথিক। আমি হুব্বা, যাত্রার দলে গান করি। পথের মধ্যে দেখতে পেলে কি আন্দু অধিকারীর দল?

নিমকু। অনেক মানুষ আসছে, কাকে চিনব?

হুব্বা। অনেক মানুষের মধ্যে তাকে ধোরো না, আমাদের আন্দু। সে একেবারে আস্ত একখানি মানুষ— ভিড়ের মধ্যে তাকে খুঁটে বের করতে হয় না— সবাইকে ঠেলে দেখা দেয়। দাদা, তোমার ঐ ঝুড়িটার মধ্যে বোধ করি বাতি অনেকগুলো আছে, একখানা দাও-না। ঘরের লোকের চেয়ে রাস্তার লোকের আলোর দরকার বেশি।

নিমকু। দাম কত দেবে?

হুব্বা। দামই যদি দিতে পারতুম তবে তো তোমার সঙ্গে হেঁকে কথা কইতুম, মিঠে সুর বের করব কেন?

নিমকু। রসিক বট হে।

[প্রস্থান

হুব্বা। বাতি দিলে না, কিন্তু রসিক বলে চিনে নিলে। সেটা কম কথা নয়। রসিকের গুণ এই ঘোর অন্ধকারেও তাকে চেনা যায়। উঃ, ঝিঁঝির ডাকে আকাশটার গা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করছে। নাঃ বাতিওআলার সঙ্গে রসিকতা না করে ডাকাতি করলে কাজে লাগত।

আর-একজন পথিকের প্রবেশ

পথিক। হেইয়ো!

হুব্বা। বাবা রে, চমকিয়ে দাও কেন?

পথিক। এখন চলো!

হুব্বা। চলব বলেই তো বেরিয়েছিলুম। দলের লোককে ছাড়িয়ে চলতে গিয়ে কিরকম অচল হয়ে পড়তে হয় সেই তত্ত্বটা মনে মনে হজম করবার চেষ্টা করছি।

পথিক। দলের লোক তৈরি আছে, এখন তুমি গিয়ে জুটলেই হবে।

হুব্বা। কথাটা কী বললে? আমরা তিনমোহনার লোক, আমাদের একটা বদ অভ্যেস আছে পষ্ট কথা না হলে বুঝতেই পারি নে। দলের লোক বলছ কাকে?

পথিক। আমরা চবুয়া গাঁয়ের লোক, পষ্ট বোঝাবার বদ অভ্যেসে হাত পাকিয়েছি। (ধাক্কা দিয়া) এইবার বুঝলে তো?

হুব্বা। উঃ, বুঝেছি। ওর সোজা মানে হচ্ছে, আমাকে চলতেই হবে মর্জি থাক্‌ আর না থাক্‌।

কোথায় চলব ? এবার একটু মোলায়েম করে জবাব দিয়ো। তোমার আলাপের প্রথম ধাক্কাতেই আমার বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে এসেছে।

পথিক। শিবতরাইয়ে যেতে হবে।

হুব্বা। শিবতরাইয়ে ? এই অমাবস্যারাত্রে ? সেখানে পালাটা কিসের ?

পথিক। নন্দিসংকটের ভাঙা গড় ফিরে গাঁথবার পালা।

হুব্বা। ভাঙা গড় আমাকে দিয়ে গাঁথাবে ? দাদা, অন্ধকারে আমার চেহারাটা দেখতে পাচ্ছ না বলেই এত বড়ো শক্ত কথাটা বললে। আমি হচ্ছি—

পথিক। তুমি যেই হও-না কেন, দুখানা হাত আছে তো ?

হুব্বা। নেহাত না থাকলে নয় বলেই আছে, নইলে একে কি—

পথিক। হাতের পরিচয় মুখের কথায় হয় না, যথাস্থানেই হবে, এখন ওঠো।

দ্বিতীয় পথিকের প্রবেশ

২ পথিক। ঐ আর-একজন লোককে পেয়েছি কঙ্কর।

কঙ্কর। লোকটা কে ?

৩। আমি কেউ না, বাবা, আমি লছমন, উত্তরভৈরবের মন্দিরে ঘণ্টা বাজাই।

কঙ্কর। সে তো ভালো কথা, হাতে জোর আছে। চলো শিবতরাই।

লছমন। যাব তো, কিন্তু মন্দিরের ঘণ্টা—

কঙ্কর। বাবা ভৈরব নিজের ঘণ্টা নিজেই বাজাবেন।

লছমন। দোহাই তোমাদের, আমার স্ত্রী রোগে ভুগছে।

কঙ্কর। তুমি চলে গেলে তার রোগ হয় সারবে, নয় সে মরবে— তুমি থাকলেও ঠিক তাই হত।

হুব্বা। ভাই লছমন, চুপ করে মেনে যাও। কাজটাতে বিপদ আছে বটে, কিন্তু আপত্তিতেও বিপদ কম নেই— আমি একটু আভাস পেয়েছি।

কঙ্কর। ঐ-যে, নরসিঙের গলা শোনা যাচ্ছে। কী নরসিঙ, খবর ভালো তো ?

কয়েকজন লোককে লইয়া নরসিঙের প্রবেশ

নরসিঙ। এই দেখো, দল জুটিয়ে এনেছি। আরো কয়দল আগেই রওনা হয়েছে।

কঙ্কর। তা হলে চলো, পথের মধ্যে আরো কিছু কিছু জুটবে।

দলের একজন। আমি যাব না।

কঙ্কর। কেন যাবে না ? কী হয়েছে ?

উক্ত ব্যক্তি। কিচ্ছু হয় নি, আমি যাব না।

কঙ্কর। লোকটার নাম কী নরসিঙ ?

নরসিঙ। ওর নাম বনোয়ারি, পদ্মবীজের মালা তৈরি করে।

কঙ্কর। আচ্ছা, ওর সঙ্গে একটু বোঝাপড়া করে নিই— কেন যাবে না বলো তো।

বনোয়ারি। প্রবৃত্তি নেই। শিবতরাইয়ের লোকের সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই। ওরা আমাদের শত্রু নয়।

কঙ্কর। আচ্ছা, না-হয় আমরাই ওদের শত্রু হলুম, তারও তো একটা কর্তব্য আছে ?

বনোয়ারি। আমি অন্যায় করতে পারব না।

কঙ্কর। ন্যায় অন্যায় ভাববার স্বাতন্ত্র্য যেখানে সেইখানেই অন্যায় হচ্ছে অন্যায়। উত্তরকূট বিরাট, তার অংশরূপে যে কাজ তোমার দ্বারা হবে তার কোনো দায়িত্বই তোমার নেই।

বনোয়ারি। উত্তরকূটকে ছাড়িয়ে থাকেন এমন বিরাটও আছেন। উত্তরকূটও তাঁর যেমন অংশ, শিবতরাইও তেমনি।

কঙ্কর। ওহে নরসিঙ, লোকটা তর্ক করে যে। দেশের পক্ষে ওর বাড়া আপদ আর নেই।

নরসিঙ। শক্ত কাজে লাগিয়ে দিলেই তর্ক ঝাড়াই হয়ে যায়। তাই ওকে টেনে নিয়ে চলেছি।

বনোয়ারি। তাতে তোমাদের ভার হয়ে থাকব, কোনো কাজে লাগব না।

কঙ্কর। উত্তরকূটের ভার তুমি, তোমাকে বর্জন করবার উপায় খুঁজছি।

হুব্বা। বনোয়ারি খুড়ো, তুমি বিচার করে সব কথা বুঝতে চাও বলেই যারা বিনা বিচারে বুঝিয়ে থাকে তাদের সঙ্গে তোমার এত ঠোকাঠুকি বাধে। হয় তাদের প্রণালীটা কায়দা করে নাও, নয় নিজের প্রণালীটা ছেড়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাকো।

বনোয়ারি। তোমার প্রণালীটা কী।

হুব্বা। আমি গান গাই। সেটা এখানে খাটবে না বলেই সুর বের করছি নে— নইলে এতক্ষণে তান লাগিয়ে দিতুম।

কঙ্কর। (বনোয়ারির প্রতি) এখন তোমার অভিপ্রায় কী?

বনোয়ারি। আমি এক পা নড়ব না।

কঙ্কর। তা হলে আমরাই তোমাকে নড়াব। বাঁধো ওকে।

হুব্বা। একটা কথা বলি, কঙ্করদাদা, রাগ কোরো না। ওকে বয়ে নিয়ে যেতে যে জোরটা খরচ করবে সেইটে বাঁচাতে পারলে কাজে লাগত।

কঙ্কর। উত্তরকূটের সেবায় যারা অনিচ্ছুক তাদের দমন করা একটা কাজ, সময় থাকতে এই কথাটা বুঝে দেখো।

হুব্বা। এরই মধ্যে বুঝে নিয়েছি।

[নরসিঙ ও কঙ্কর ছাড়া আর সকলের প্রস্থান

নরসিঙ। ঐ-যে বিভূতি আসছে। যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়!

বিভূতির প্রবেশ

কঙ্কর। কাজ অনেকটা এগিয়েছে, লোকও কম জোটে নি। কিন্তু তুমি এখানে কেন? তোমাকে নিয়ে সবাই যে উৎসব করবে।

বিভূতি। উৎসবে আমার শখ নেই।

নরসিঙ। কেন বলো তো।

বিভূতি। আমার কীর্তি খর্ব করবার জন্যেই নন্দিসংকটের গড় ভাঙার খবর ঠিক আজ এসে পৌঁছল। আমার সঙ্গে একটা প্রতিযোগিতা চলছে।

কঙ্কর। কার প্রতিযোগিতা যন্ত্ররাজ?

বিভূতি। নাম করতে চাই নে, সবাই জান। উত্তরকূটে তাঁর বেশি আদর হবে না আমার, এই হয়ে দাঁড়াল সমস্যা। একটা কথা তোমাদের জানা নেই— এর মধ্যে আমার কাছে কোনো পক্ষ থেকে দূত এসেছিল আমার মন ভাঙাতে; আমার মুক্তধারার বাঁধ ভাঙবে এমন শাসনবাক্যেরও আভাস দিয়ে গেল।

নরসিঙ। এত বড়ো কথা!

কঙ্কর। তুমি সহ্য করলে বিভূতি?

বিভূতি। প্রলাপবাক্যের প্রতিবাদ চলে না।

কঙ্কর। কিন্তু, বিভূতি, এত বেশি নিঃসংশয় হওয়া কি ভালো? তুমিই তো বলেছিলে বাঁধের বন্ধন দুই-এক জায়গায় আলগা আছে, তার সন্ধান জানলে অল্প একটুখানিতেই—

বিভূতি। সন্ধান যে জানবে সে এও জানবে যে, সেই ছিদ্র খুলতে গেলে তার রক্ষা নেই, বন্যায় তখনই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

নরসিঙ। পাহারা রাখলে ভালো করতে না?

বিভূতি। সে ছিদ্রের কাছে যম স্বয়ং পাহারা দিচ্ছেন। বাঁধের জন্যে কিছুমাত্র আশঙ্কা নেই।

আপাতত ঐ নন্দিসংকটের পথটা আটকে দিতে পারলে আমার আর কোনো খেদ থাকে না।

কঙ্কর। তোমার পক্ষে এ তো কঠিন নয়।

বিভূতি। না, আমার যন্ত্র প্রস্তুত আছে। মুশকিল এই যে, ঐ গিরিপথটা সংকীর্ণ, অনায়াসেই অল্প কয়েকজনেই বাধা দিতে পারে।

নরসিঙ। বাধা কত দেবে? মরতে মরতে গেঁথে তুলব।

বিভূতি। মরবার লোক বিস্তর চাই।

কঙ্কর। মারবার লোক থাকলে মরবার লোকের অভাব ঘটে না।

নেপথ্যে। জাগো, ভৈরব, জাগো!

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

কঙ্কর। ঐ দেখো, যাবার মুখে অযাত্রা।

বিভূতি। বৈরাগী, তোমাদের মতো সাধুরা ভৈরবকে এ পর্যন্ত জাগাতে পারলে না, আর যাকে পাষণ্ড বল সেই আমি ভৈরবকে জাগাতে চলেছি।

ধনঞ্জয়। সে কথা মানি, জাগাবার ভার তোমাদের উপরেই।

বিভূতি। এ কিন্তু তোমাদের ঘণ্টা নেড়ে আরতির দীপ জ্বালিয়ে জাগানো নয়।

ধনঞ্জয়। না, তোমরা শিকল দিয়ে তাঁকে বাঁধবে, তিনি শিকল ছেঁড়বার জন্যে জাগবেন।

বিভূতি। সহজ শিকল আমাদের নয়, পাকের পর পাক, গ্রন্থির পর গ্রন্থি।

ধনঞ্জয়। সব চেয়ে দুঃসাধ্য যখন হয় তখনই তাঁর সময় আসে।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

জয় ভৈরব, জয় শংকর,
জয় জয় জয় প্রলয়ংকর।
জয় সংশয়ভেদন,
জয় বন্ধনছেদন,
জয় সংকটসংহর,
শংকর শংকর।

[প্রস্থান

রণজিৎ ও মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ, শিবির একেবারে শূন্য, অনেকখানি পুড়েছে। অল্প কয়জন প্রহরী ছিল, তারা তো—

রণজিৎ। তারা যেখানেই থাক-না, অভিজিৎ কোথায় জানা চাই।

কঙ্কর। মহারাজ, যুবরাজের শাস্তি আমরা দাবি করি।

রণজিৎ। শাস্তির যে যোগ্য তার শাস্তি দিতে আমি কি তোমাদের অপেক্ষা করে থাকি?

কঙ্কর। তাঁকে খুঁজে না পেয়ে লোকের মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছে।

রণজিৎ। কী! সংশয়! কার সম্বন্ধে?

কঙ্কর। ক্ষমা করবেন মহারাজ। প্রজাদের মনের ভাব আপনার জানা চাই। যুবরাজকে খুঁজে পেতে যতই বিলম্ব হচ্ছে ততই তাদের অধৈর্য এত বেড়ে উঠছে যে, যখন তাঁকে পাওয়া যাবে তখন তারা শাস্তির জন্যে মহারাজের অপেক্ষা করবে না।

বিভূতি। মহারাজের আদেশের অপেক্ষা না করেই নন্দিসংকটের ভাঙা দুর্গ গড়ে তোলবার ভার আমরা নিজের হাতে নিয়েছি।

রণজিৎ। আমার হাতে কেন রাখতে পারলে না?

বিভূতি। যেটা আপনারই বংশের অপকীর্তি, তাতে আপনারও গোপন সম্মতি আছে এরকম সন্দেহ হওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক।

মন্ত্রী। মহারাজ, আজ জনসাধারণের মন এক দিকে আত্মশ্লাঘায় অন্য দিকে ক্রোধে উত্তেজিত। আজ অধৈর্যের দ্বারা অধৈর্যকে উদ্দাম করে তুলবেন না।

রণজিৎ। ওখানে ও কে দাঁড়িয়ে? ধনঞ্জয় বৈরাগী?

ধনঞ্জয়। বৈরাগীটাকেও মহারাজের মনে আছে দেখছি।

রণজিৎ। যুবরাজ কোথায় তা তুমি নিশ্চিত জান।

ধনঞ্জয়। না, মহারাজ, যা আমি নিশ্চিত জানি তা চেপে রাখতে পারি নে— তাই বিপদে পড়ি।

রণজিৎ। তবে এখানে কী করছ?

ধনঞ্জয়। যুবরাজের প্রকাশের জন্যে অপেক্ষা করছি।

নেপথ্যে। সুমন, বাবা সুমন! অন্ধকার হয়ে এল, সব অন্ধকার হয়ে এল।

রাজা। ও কে ও?

মন্ত্রী। সেই অম্বা পাগলি।

অম্বার প্রবেশ

অম্বা। কই, সে তো ফিরল না।

রণজিৎ। কেন খুঁজছ তাকে? সময় হয়েছিল, ভৈরব তাকে ডেকে নিয়েছেন।

অম্বা। ভৈরব কি কেবল ডেকেই নেন? ভৈরব কি কখনো ফিরিয়ে দেন না? চুপিচুপি? গভীর রাত্রে? সুমন, সুমন!

[প্রস্থান

চরের প্রবেশ

চর। শিবতরাই থেকে হাজার হাজার লোক চলে আসছে।

বিভূতি। সেকি কথা! আমরা হঠাৎ গিয়ে তাদের নিরস্ত্র করব এই তো ঠিক ছিল। নিশ্চয় তোমাদের কোনো বিশ্বাসঘাতক তাদের খবর দিয়েছে। কঙ্কর, তোমরা কয়জন ছাড়া ভিতরের কথা কেউ তো জানে না। তা হলে কী করে—

কঙ্কর। কী বিভূতি! আমাদেরও সন্দেহ কর না কি?

বিভূতি। সন্দেহ করার সীমা কোথাও নেই।

কঙ্কর। তা হলে আমরাও তোমাকে সন্দেহ করি।

বিভূতি। সে অধিকার তোমাদের আছে। যাই হোক, সময় হলে এর একটা বোঝাপড়া করতে হবে।

রণজিৎ। (চরের প্রতি) তারা কী অভিপ্রায়ে আসছে তুমি জান?

চর। তারা শুনেছে— যুবরাজ বন্দী হয়েছেন, তাই পণ করেছে তাঁকে খুঁজে বের করবে। এখান থেকে মুক্ত করে তাঁকে ওরা শিবতরাইয়ের রাজা করতে চায়।

বিভূতি। আমরাও খুঁজছি যুবরাজকে আর ওরাও খুঁজছে, দেখি কার হাতে পড়েন।

ধনঞ্জয়। তোমাদের দুই দলেরই হাতে পড়বেন, তাঁর মনে পক্ষপাত নেই।

চর। ঐ-যে আসছে শিবতরাইয়ের গণেশ সর্দার।

গণেশের প্রবেশ

গণেশ। (ধনঞ্জয়ের প্রতি) ঠাকুর, পাব তো তাঁকে?

ধনঞ্জয়। হাঁ রে, পাবি।

গণেশ। নিশ্চয় করে বলো।

ধনঞ্জয়। পাবি রে।

রণজিৎ। কাকে খুঁজছিস ?

গণেশ। এই যে, রাজা, ছেড়ে দিতে হবে।

রণজিৎ। কাকে রে ?

গণেশ। আমাদের যুবরাজকে। তোমরা তাকে চাও না, আমরা তাকে চাই। আমাদের সবই তোমরা আটক করে রাখবে ? ওকেও ?

ধনঞ্জয়। মানুষ চিনলি নে বোকা ? ওকে আটক করে এমন সাধ্য আছে কার ?

গণেশ। ওকে আমাদের রাজা করে রাখব।

ধনঞ্জয়। রাখবি বৈকি। ও রাজবেশ পরে আসবে।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

তিমিরহৃদ্‌বিদারণ
জ্বলদগ্নিনিদারুণ
মরুশ্মশানসঞ্চর
শংকর শংকর।
বজ্রঘোষবাণী
রুদ্র শূলপাণি
মৃত্যুসিন্ধুসন্তর
শংকর শংকর।

[প্রস্থান

নেপথ্যে। মা ডাকে, মা ডাকে। ফিরে আয়, সুমন, ফিরে আয়।

বিভূতি। ও কী শুনি ? ও কিসের শব্দ ?

ধনঞ্জয়। অন্ধকারের বুকের ভিতর খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল যে।

বিভূতি। আঃ, থামো-না, শব্দটা কোন্ দিকে বলো তো।

নেপথ্যে। জয় হোক ভৈরব !

বিভূতি। এ তো স্পষ্টই জলস্রোতের শব্দ !

ধনঞ্জয়। নাচ-আরম্ভের প্রথম ডমরুধ্বনি।

বিভূতি। শব্দ বেড়ে উঠছে যে, বেড়ে উঠছে '

কঙ্কর। এ যেন—

নরসিঙ। বোধ হচ্ছে যেন—

বিভূতি। হাঁ, হাঁ, সন্দেহ নেই। মুক্তধারা ছুটেছে। বাঁধ কে ভাঙলে ? কে ভাঙলে ? তার নিস্তার নেই।

[কঙ্কর নরসিঙ ও বিভূতির দ্রুত প্রস্থান

রণজিৎ। মন্ত্রী, এ কী কাণ্ড ?

ধনঞ্জয়। বাঁধ-ভাঙার উৎসবে ডাক পড়েছে।

গান

বাজে রে বাজে ডমরু বাজে
হৃদয়মাঝে হৃদয়মাঝে।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ যেন—

রণজিৎ। হাঁ, এ যেন তারই—
মন্ত্রী। তিনি ছাড়া আর তো কারও—
রণজিৎ। এমন সাহস আর কার!
ধনঞ্জয়। গান

নাচে রে নাচে চরণ নাচে
প্রাণের কাছে, প্রাণের কাছে।

রণজিৎ। শাস্তি দিতে হয় আমি শাস্তি দেব। কিন্তু এই-সব উন্মত্ত প্রজাদের হাত থেকে— আমার অভিজিৎ দেবতার প্রিয়, দেবতারা তাকে রক্ষা করুন।
গণেশ। প্রভু, ব্যাপার কী হল কিছু তো বুঝতে পারছি নে।
ধনঞ্জয়। গান

প্রহর জাগে, প্রহরী জাগে—
তারায় তারায় কাঁপন লাগে।

রণজিৎ। ঐ পায়ের শব্দ শুনছি যেন। অভিজিৎ অভিজিৎ!
মন্ত্রী। ঐ যেন আসছেন।
ধনঞ্জয়। গান

মরমে মরমে বেদনা ফুটে—
বাঁধন টুটে, বাঁধন টুটে।

সঞ্জয়ের প্রবেশ

রণজিৎ। এ যে সঞ্জয়! অভিজিৎ কোথায়?
সঞ্জয়। মুক্তধারার স্রোত তাঁকে নিয়ে গেল, আমরা তাঁকে পেলুম না।
রণজিৎ। কী বলছ কুমার।
সঞ্জয়। যুবরাজ মুক্তধারার বাঁধ ভেঙেছেন।
রণজিৎ। বুঝেছি, সেই মুক্তিতে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। সঞ্জয়, তোমাকে কি তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন?
সঞ্জয়। না, কিন্তু আমি মনে বুঝেছিলুম তিনি ঐখানেই যাবেন, আমি গিয়ে অন্ধকারে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলুম, কিন্তু ঐ পর্যন্ত— বাধা দিলেন, আমাকে শেষ পর্যন্ত যেতে দিলেন না।
রণজিৎ। কী হল আর-একটু বলো।
সঞ্জয়। ঐ বাঁধের একটা ত্রুটির সন্ধান কী করে তিনি জেনেছিলেন। সেইখানে যন্ত্রাসুরকে তিনি আঘাত করলেন, যন্ত্রাসুর তাঁকে সেই আঘাত ফিরিয়ে দিলে। তখন মুক্তধারা তাঁর সেই আহত দেহকে মায়ের মতো কোলে তুলে নিয়ে চলে গেল।
গণেশ। যুবরাজকে আমরা যে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম, তা হলে তাঁকে কি আর পাব না।
ধনঞ্জয়। চিরকালের মতো পেয়ে গেলি।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

জয় ভৈরব, জয় শংকর,
জয় জয় জয় প্রলয়ংকর।

জয় সংশয়ভেদন,
জয় বন্ধনছেদন,
জয় সংকটসংহর
শংকর শংকর।
তিমিরহৃদ্‌বিদারণ
জ্বলদগ্নিনিদারুণ
মরুশ্মশানসঞ্চর
শংকর শংকর।
বজ্রঘোষবাণী
রুদ্র শূলপাণি
মৃত্যুসিন্ধুসন্তর
শংকর শংকর।

শান্তিনিকেতন
পৌষ সংক্রান্তি ১৩২৮

উপন্যাস ও গল্প

চার অধ্যায়

রচনা

কাণ্ডি । সিংহল

৫ জুন ১৯৩৪

চার অধ্যায়

ভূমিকা

এলার মনে পড়ে তার জীবনের প্রথম সূচনা বিদ্রোহের মধ্যে। তার মা মায়াময়ীর ছিল বাতিকের ধাত, তাঁর ব্যবহারটা বিচার-বিবেচনার প্রশস্ত পথ ধরে চলতে পারত না। বেহিসাবি মেজাজের অসংযত ঝাপটায় সংসারকে তিনি যখন-তখন ক্ষুব্ধ করে তুলতেন, শাসন করতেন অন্যায় করে, সন্দেহ করতেন অকারণে। মেয়ে যখন অপরাধ অস্বীকার করত, ফস করে বলতেন, মিথ্যে কথা বলছিস। অথচ অবিমিশ্র সত্যকথা বলা মেয়ের একটা ব্যসন বললেই হয়। এজন্যেই সে শাস্তি পেয়েছে সব-চেয়ে বেশি। সকল রকম অবিচারের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতা তার স্বভাবে প্রবল হয়ে উঠেছে। তার মার কাছে মনে হয়েছে, এইটেই স্ত্রীধর্মনীতির বিরুদ্ধ।

একটা কথা সে বাল্যকাল থেকে বুঝেছে যে, দুর্বলতা অত্যাচারের প্রধান বাহন। ওদের পরিবারে যে-সকল আশ্রিত অন্নজীবী ছিল, যারা পরের অনুগ্রহ-নিগ্রহের সংকীর্ণ বেড়া-দেওয়া ক্ষেত্রের মধ্যে নিঃসহায়ভাবে আবদ্ধ তারাই কলুষিত করেছে ওদের পরিবারের আবহাওয়াকে, তারাই ওর মায়ের অন্ধ প্রভুত্বচর্চাকে বাধাবিহীন করে তুলেছে। এই অস্বাস্থ্যকর অবস্থার প্রতিক্রিয়ারূপেই ওর মনে অল্পবয়স থেকেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এত দুর্দাম হয়ে উঠেছিল।

এলার বাপ নরেশ দাসগুপ্ত সাইকলজিতে বিলিতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন। তীক্ষ্ণ তাঁর বৈজ্ঞানিক বিচারশক্তি, অধ্যাপনায় তিনি বিশেষভাবে যশস্বী। প্রাদেশিক প্রাইভেট কলেজে তিনি স্থান নিয়েছেন যেহেতু সেই প্রদেশে তাঁর জন্ম, সাংসারিক উন্নতির দিকে তাঁর লোভ কম, সে-সম্বন্ধে দক্ষতাও সামান্য। ভুল করে লোককে বিশ্বাস করা ও বিশ্বাস করে নিজের ক্ষতি করা বার বারকার অভিজ্ঞতাতেও তাঁর শোধন হয় নি। ঠকিয়ে কিংবা অনায়াসে যারা উপকার আদায় করে তাদের কৃতঘ্নতা সব-চেয়ে অকরুণ। যখন সেটা প্রকাশ পেত সেটাকে মনস্তত্ত্বের বিশেষ তথ্য বলে মানুষটি অনায়াসে স্বীকার করে নিতেন, মনে বা মুখে নালিশ করতেন না। বিষয়বুদ্ধির ত্রুটি নিয়ে স্ত্রীর কাছে কখনো তিনি ক্ষমা পান নি, খোঁটা খেয়েছেন প্রতিদিন। নালিশের কারণ অতীতকালবর্তী হলেও তাঁর স্ত্রী কখনো ভুলতে পারতেন না, যখন-তখন তীক্ষ্ণ খোঁচায় উসকিয়ে দিয়ে তার দাহকে ঠাণ্ডা হতে দেওয়া অসাধ্য করে তুলতেন। বিশ্বাসপরায়ণ ঔদার্যগুণেই তার বাপকে কেবলই ঠকতে ও দুঃখ পেতে দেখে বাপের উপর এলার ছিল সদাব্যথিত স্নেহ— যেমন সকরুণ স্নেহ মায়ের থাকে অবুঝ বালকের 'পরে। সব-চেয়ে তাকে আঘাত করত যখন মায়ের কলহের ভাষায় তীব্র ইঙ্গিত থাকত যে, বুদ্ধিবিবেচনায় তিনি তাঁর স্বামীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এলা নানা উপলক্ষে মায়ের কাছে তার বাবার অসম্মান দেখতে পেয়েছে, তা নিয়ে নিষ্ফল আক্রোশে চোখের জলে রাত্রে তার বালিশ গেছে ভিজে। এরকম অতিমাত্র ধৈর্য অন্যায় বলে এলা অনেক সময় তার বাবাকে মনে মনে অপরাধী না করে থাকতে পারে নি।

অত্যন্ত পীড়িত হয়ে একদিন এলা বাবাকে বলেছিল, "এরকম অন্যায় চুপ করে সহ্য করাই অন্যায়।"

নরেশ বললেন, "স্বভাবের প্রতিবাদ করাও যা আর তপ্ত লোহায় হাত বুলিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করতে যাওয়াও তাই, তাতে বীরত্ব থাকতে পারে কিন্তু আরাম নেই।"

"চুপ করে থাকাতে আরাম আরো কম"— বলে এলা দ্রুত চলে গেল।

এদিকে সংসারে এলা দেখতে পায়, যারা মায়ের মন জুগিয়ে চলবার কৌশল জানে তাদের চক্রান্তে নিষ্ঠুর অন্যায় ঘটে অপরাধহীনের প্রতি। এলা সইতে পারে না, উত্তেজিত হয়ে সত্য প্রমাণ উপস্থিত করে বিচারকর্ত্রীর সামনে। কিন্তু কর্তৃত্বের অহমিকার কাছে অকাট্য যুক্তিই দুঃসহ স্পর্ধা। অনুকূল ঝোড়ো হাওয়ার মতো তাতে বিচারের নৌকো এগিয়ে দেয় না, নৌকো দেয় কাত করে।

এই পরিবারে আরো একটি উপসর্গ ছিল যা এলার মনকে নিয়ত আঘাত করেছে। সে তার মায়ের শুচিবায়ু। একদিন কোনো মুসলমান অভ্যাগতকে বসবার জন্যে এলা মাদুর পেতে দিয়েছিল— সে মাদুর মা ফেলে দিলেন, গালচে দিলে দোষ হত না। এলার তার্কিক মন, তর্ক না করে থাকতে পারে না। বাবাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা এই-সব ছোঁয়াছুঁয়ি নাওয়াখাওয়া নিয়ে কটকেনা মেয়েদেরই কেন এত পেয়ে বসে ? এতে হৃদয়ের তো স্থান নেই, বরং বিরুদ্ধতা আছে ; এ তো কেবল যন্ত্রের মতো অন্ধভাবে মেনে চলা।" সাইকলজিস্ট বাবা বললেন, "মেয়েদের হাজার বছরের হাতকড়ি-লাগানো মন ; তারা মানবে, প্রশ্ন করবে না— এইটেতেই সমাজ-মনিবের কাছে বকশিশ পেয়েছে, সেইজন্যে মানাটা যত বেশি অন্ধ হয় তার দাম তাদের কাছে তত বড়ো হয়ে ওঠে। মেয়েলি পুরুষদেরও এই দশা।" আচারের নিরর্থকতা সম্বন্ধে এলা বার বার মাকে প্রশ্ন না করে থাকতে পারে নি, বার বার তার উত্তর পেয়েছে ভর্ৎসনায়। নিয়ত এই ধাক্কায় এলার মন অবাধ্যতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

নরেশ দেখলেন পারিবারিক এই-সব দ্বন্দ্বে মেয়ের শরীর খারাপ হয়ে উঠছে, সেটা তাঁকে অত্যন্ত বাজল। এমন সময় একদিন এলা একটা বিশেষ অবিচারে কঠোরভাবে আহত হয়ে নরেশের কাছে এসে জানাল, "বাবা, আমাকে কলকাতায় বোর্ডিঙে পাঠাও।" প্রস্তাবটা তাদের দুইজনের পক্ষেই দুঃখকর, কিন্তু বাপ অবস্থা বুঝলেন, এবং মায়াময়ীর দিক থেকে প্রতিকূল ঝঞ্ঝাঘাতের মধ্যেও এলাকে পাঠিয়ে দিলেন দূরে। আপন নিষ্করুণ সংসারে নিমগ্ন হয়ে রইলেন অধ্যয়ন-অধ্যাপনায়।

মা বললেন, "শহরে পাঠিয়ে মেয়েকে মেমসাহেব বানাতে চাও তো বানাও কিন্তু ঐ তোমার আদুরে মেয়েকে প্রাণান্ত ভুগতে হবে শ্বশুরঘর করবার দিনে। তখন আমাকে দোষ দিয়ো না।" মেয়ের ব্যবহারে কলিকালোচিত স্বাতন্ত্র্যের দুর্লক্ষণ দেখে এই আশঙ্কা তার মা বার বার প্রকাশ করেছেন। এলা তার ভাবী শাশুড়ির হাড় জ্বালাতন করবে সেই সম্ভাবনা নিশ্চিত জেনে সেই কাল্পনিক গৃহিণীর প্রতি তাঁর অনুকম্পা মুখর হয়ে উঠত। এর থেকে মেয়ের মনে ধারণা দৃঢ় হয়েছিল যে, বিয়ের জন্যে মেয়েদের প্রস্তুত হতে হয় আত্মসম্মানকে পঙ্গু করে, ন্যায়-অন্যায়বোধকে অসাড় করে দিয়ে।

এলা যখন ম্যাট্রিক পার হয়ে কলেজে প্রবেশ করেছে তখন মায়ের মৃত্যু হল। নরেশ মাঝে মাঝে বিয়ের প্রস্তাবে মেয়েকে রাজি করতে চেষ্টা করেছেন। এলা অপূর্ব সুন্দরী, পাত্রের তরফে প্রার্থীর অভাব ছিল না, কিন্তু বিবাহের প্রতি বিমুখতা তার সংস্কারগত। মেয়ে পরীক্ষাগুলো পাস করলে, তাকে অবিবাহিত রেখেই বাপ গেলেন মারা।

সুরেশ ছিল তাঁর কনিষ্ঠ ভাই। নরেশ এই ভাইকে মানুষ করেছেন, শেষ পর্যন্ত পড়িয়েছেন খরচ দিয়ে। দু-বছরের মতো তাকে বিলেতে পাঠিয়ে স্ত্রীর কাছে লাঞ্ছিত এবং মহাজনের কাছে ঋণী হয়েছেন। সুরেশ এখন ডাকবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কর্ম উপলক্ষে ঘুরতে হয় নানা প্রদেশে। তাঁরই উপর পড়ল এলার ভার। একান্ত যত্ন করেই ভার নিলেন।

সুরেশের স্ত্রীর নাম মাধবী। তিনি যে-পরিবারের মেয়ে সে-পরিবারে স্ত্রীলোকদের পরিমিত পড়াশুনোই ছিল প্রচলিত ; তার পরিমাণ মাঝারি মাপের চেয়ে কম বৈ বেশি নয়। স্বামী বিলেত থেকে ফিরে এসে উচ্চপদ নিয়ে দূরে দূরে যখন ঘুরতেন তখন তাঁকে বাইরের নানা লোকের সঙ্গে সামাজিকতা করতে হত। কিছুদিন অভ্যাসের পরে মাধবী নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে বিজাতীয় লৌকিকতা পালন করতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। এমন-কি, গোরাদের ক্লাবেও পঙ্গু ইংরেজি ভাষাকে সকারণ ও অকারণ হাসির দ্বারা পূরণ করে কাজ চালিয়ে আসতে পারতেন।

এমন সময় সুরেশ কোনো প্রদেশের বড়ো শহরে যখন আছেন এলা এল তাঁর ঘরে ; রূপে গুণে বিদ্যায় কাকার মনে গর্ব জাগিয়ে তুললে। ওঁর উপরিওয়ালা বা সহকর্মী এবং দেশী ও বিলিতি আলাপী-পরিচিতদের কাছে নানা উপলক্ষে এলাকে প্রকাশিত করবার জন্যে তিনি ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। এলার স্ত্রীবুদ্ধিতে বুঝতে বাকি রইল না যে, এর ফল ভালো হচ্ছে না। মাধবী মিথ্যা আরামের ভান করে ক্ষণে ক্ষণে বলতে লাগলেন, "বাঁচা গেল— বিলিতি কায়দার সামাজিকতার দায় আমার ঘাড়ে চাপানো কেন বাপু। আমার না আছে বিদ্যে, না আছে বুদ্ধি।" ভাবগতিক দেখে এলা নিজের চারি দিকে প্রায় একটা জেনানা খাড়া করে তুললে। সুরেশের মেয়ে সুরমার পড়াবার ভার সে অতিরিক্ত উৎসাহের সঙ্গে নিলে। একটা থীসিস লিখতে লাগিয়ে দিলে তার বাকি সময়টুকু। বিষয়টা বাংলা মঙ্গলকাব্য ও চসারের কাব্যের তুলনা। এই নিয়ে সুরেশ মহা উৎসাহিত। এই সংবাদটা চার দিকে প্রচার করে দিলেন। মাধবী মুখ বাঁকা করে বললেন, "বাড়াবাড়ি।"

স্বামীকে বললেন, "এলার কাছে ফস করে মেয়েকে পড়তে দিলে ! কেন, অধর মাস্টার কী দোষ করেছে ? যাই বল না আমি কিন্তু—"

সুরেশ অবাক হয়ে বললেন, "কী বল তুমি ! এলার সঙ্গে অধরের তুলনা ?"

"দুটো নোট বই মুখস্থ করে পাস করলেই বিদ্যে হয় না"— বলে ঘাড় বেঁকিয়ে গৃহিণী ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন।

একটা কথা স্বামীকে বলতেও তাঁর মুখে বাধে— 'সুরমার বয়স তেরো পেরোতে চলল, আজ বাদে কাল পাত্র খুঁজতে দেশ ঝেঁটিয়ে বেড়াতে হবে, তখন এলা সুরমার কাছে থাকলে— ছেলেগুলোর চোখে যে ফ্যাকাশে কটা রঙের নেশা— ওরা কি জানে কাকে বলে সুন্দর ?' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন আর ভাবেন, এ-সব কথা কর্তাকে জানিয়ে ফল নেই, পুরুষরা যে সংসার-কানা।

যত শীঘ্র হয় এলার বিয়ে হয়ে যাক এই চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগলেন গৃহিণী। বেশি চেষ্টা করতে হয় না, ভালো ভালো পাত্র আপনি এসে জোটে— এমন সব পাত্র, সুরমার সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ ঘটাবার জন্য মাধবী লুব্ধ হয়ে ওঠেন। অথচ এলা তাদের বারে বারে নিরাশ করে ফিরিয়ে দেয়।

ভাইঝির একগুঁয়ে অবিবেচনায় উদবিগ্ন হলেন সুরেশ, কাকী হলেন অত্যন্ত অসহিষ্ণু। তিনি জানেন সৎপাত্রকে উপেক্ষা করা সমর্থবয়সের বাঙালি মেয়ের পক্ষে অপরাধ। নানারকম বয়সোচিত দুর্যোগের আশঙ্কা করতে লাগলেন, এবং দায়িত্ববোধে অভিভূত হল তাঁর অন্তঃকরণ। এলা স্পষ্টই বুঝতে পারলে যে, সে তার কাকার স্নেহের সঙ্গে কাকার সংসারের দ্বন্দ্ব ঘটাতে বসেছে।

এমন সময়ে ইন্দ্রনাথ এলেন সেই শহরে। দেশের ছাত্রেরা তাঁকে মানত রাজ-চক্রবর্তীর মতো। অসাধারণ তাঁর তেজ, আর বিদ্যার খ্যাতিও প্রভূত। একদিন সুরেশের ওখানে তাঁর নিমন্ত্রণ। সেদিন কোনো এক সুযোগে এলা অপরিচয়সত্ত্বেও অসংকোচে তাঁর কাছে এসে বললে, "আমাকে আপনার কোনো-একটা কাজ দিতে পারেন না ?"

আজকালকার দিনে এরকম আবেদন বিশেষ আশ্চর্যের নয় কিন্তু তবু মেয়েটির দীপ্তি দেখে চমক লাগল ইন্দ্রনাথের। তিনি বললেন, "কলকাতায় সম্প্রতি নারায়ণী হাই স্কুল মেয়েদের জন্যে খোলা হয়েছে। তোমাকে তার কর্ত্রীপদ দিতে পারি, প্রস্তুত আছ ?"

"প্রস্তুত আছি যদি আমাকে বিশ্বাস করেন।"

ইন্দ্রনাথ এলার মুখের দিকে তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টি রেখে বললেন, "আমি লোক চিনি। তোমাকে বিশ্বাস করতে আমার মুহূর্তকাল বিলম্ব হয় নি। তোমাকে দেখবামাত্রই মনে হয়েছে, তুমি নবযুগের দূতী, নবযুগের আহ্বান তোমার মধ্যে।"

হঠাৎ ইন্দ্রনাথের মুখে এমন কথা শুনে এলার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল।

সে বললে, "আপনার কথায় আমার ভয় হয়। ভুল করে আমাকে বাড়াবেন না। আপনার ধারণার যোগ্য হবার জন্যে দুঃসাধ্য চেষ্টা করতে গেলে ভেঙে পড়ব। আমার শক্তির সীমার মধ্যে যতটা পারি বাঁচিয়ে চলব আপনার আদর্শ, কিন্তু ভান করতে পারব না।"

ইন্দ্রনাথ বললেন, "সংসারের বন্ধনে কোনোদিন বদ্ধ হবে না এই প্রতিজ্ঞা তোমাকে স্বীকার করতে হবে। তুমি সমাজের নও, তুমি দেশের।"

এলা মাথা তুলে বললে, "এই প্রতিজ্ঞাই আমার।"

কাকা গমনোদ্যত এলাকে বললেন, "তোকে আর কোনোদিন বিয়ের কথা বলব না। তুই আমার কাছেই থাক্। এখানেই পাড়ার মেয়েদের পড়াবার ভার নিয়ে একটা ছোটোখাটো ক্লাস খুললে দোষ কী।"

কাকী স্নেহার্দ্র স্বামীর অবিবেচনায় বিরক্ত হয়ে বললেন, "ওর বয়স হয়েছে, ও নিজের দায় নিজেই নিতে চায়, সে ভালোই তো। তুমি কেন বাধা দিতে যাও মাঝের থেকে। তুমি যা-ই মনে কর-না কেন, আমি বলে রাখছি ওর ভাবনা আমি ভাবতে পারব না।"

এলা খুব জোর করেই বললে, "আমি কাজ পেয়েছি, কাজ করতেই যাব।"

এলা কাজ করতেই গেল।

এই ভূমিকার পরে পাঁচ বছর উত্তীর্ণ হল, এখন কাহিনী অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

দৃশ্য— চায়ের দোকান। তারই একপাশে একটি ছোটো ঘর। সেই ঘরে বিক্রির জন্যে সাজানো কিছু স্কুলকালেজপাঠ্য বই, অনেকগুলিই সেকেন্ডহ্যান্ড। কিছু আছে য়ুরোপীয় আধুনিক গল্প-নাটকের ইংরেজি তর্জমা। সেগুলো অল্পবিত্ত ছেলেরা পাত উলটিয়ে পড়ে চলে যায়, দোকানদার আপত্তি করে না। স্বত্বাধিকারী কানাই গুপ্ত, পুলিসের পেনশনভোগী সাবেক সাব-ইনস্পেক্টর।

সামনে সদর রাস্তা, বাঁ পাশ দিয়ে গেছে গলি। যারা নিভৃতে চা খেতে চায় তাদের জন্যে ঘরের এক অংশ ছিন্নপ্রায় চটের পর্দা দিয়ে ভাগ করা। আজ সেইদিকটাতে একটা বিশেষ আয়োজনের লক্ষণ। যথেষ্ট পরিমাণ টুলচৌকির অসদ্ভাব পূরণ করেছে দার্জিলিং চা কোম্পানির মার্কা-মারা প্যাকবাক্স। চায়ের পাত্রেও অগত্যা বৈসাদৃশ্য, তাদের কতকগুলি নীলরঙের এনামেলের, কতকগুলি সাদা চীনামাটির। টেবিলে হাতলভাঙা দুধের জগে ফুলের তোড়া। বেলা প্রায় তিনটে। ছেলেরা এলালতাকে নিমন্ত্রণের সময় নির্দেশ করে দিয়েছিল ঠিক আড়াইটায়। বলেছিল, এক মিনিট পিছিয়ে এলে চলবে না। অসময়ে নিমন্ত্রণ, যেহেতু ঐ সময়টাতেই দোকান শূন্য থাকে। চা-পিপাসুর ভিড় লাগে সাড়ে চারটার পর থেকে। এলা ঠিক সময়েই উপস্থিত। কোথাও ছেলেদের একজনেরও দেখা নেই। একলা বসে তাই ভাবছিল— তবে কি শুনতে তারিখের ভুল হয়েছে। এমন সময় ইন্দ্রনাথকে ঘরে ঢুকতে দেখে চমকে উঠল। এ-জায়গায় তাঁকে কোনোমতেই আশা করা যায় না।

ইন্দ্রনাথ য়ুরোপে কাটিয়েছেন অনেক দিন ; বিশেষ খ্যাতি পেয়েছেন সায়ান্সে। যথেষ্ট উঁচুপদে প্রবেশের অধিকার তাঁর ছিল ; য়ুরোপীয় অধ্যাপকদের প্রশংসাপত্র ছিল উদার ভাষায়। য়ুরোপে থাকতে ভারতীয় কোনো একজন পোলিটিক্যাল বদনামির সঙ্গে তাঁর কদাচিৎ দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল, দেশে ফিরে এলে তারই লাঞ্ছনা তাঁকে সকল কর্মে বাধা দিতে লাগল। অবশেষে ইংলন্ডের খ্যাতনামা কোনো বিজ্ঞান-আচার্যের বিশেষ সুপারিশে অধ্যাপনার কাজ পেয়েছিলেন, কিন্তু সে কাজ অযোগ্য অধিনায়কের অধীনে। অযোগ্যতার সঙ্গে ঈর্ষা থাকে প্রখর, তাই তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার চেষ্টা উপরওয়ালার হাত থেকে ব্যাঘাত পেতে লাগল পদে পদে। শেষে এমন জায়গায় তাঁকে বদলি হতে হল যেখানে ল্যাবরেটরি নেই। বুঝতে পারলেন এদেশে তাঁর জীবনে সর্বোচ্চ অধ্যবসায়ের পথ অবরুদ্ধ। একই প্রদক্ষিণপথে অধ্যাপনার চিরাভ্যস্ত চাকা ঘুরিয়ে অবশেষে কিঞ্চিৎ পেনশন ভোগ করে জীবলীলা সংবরণ করবেন, নিজের এই দুর্গতির আশঙ্কা তিনি কিছুতেই স্বীকার করতে পারলেন না। তিনি নিশ্চিত জানতেন অন্য যে-কোনো দেশে সম্মানলাভের শক্তি তাঁর প্রচুর ছিল।

একদা ইন্দ্রনাথ জার্মান ফরাসি ভাষা শেখাবার একটা প্রাইভেট ক্লাস খুললেন, সেই সঙ্গে ভার নিলেন বটানি ও জিয়লজিতে কালেজের ছাত্রদের সাহায্য করবার। ক্রমে এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের গোপন তলদেশ বেয়ে একটা অপ্রকাশ্য সাধনার জটিল শিকড় জেলখানার প্রাঙ্গণের মাঝখান দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল বহুদূরে।

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "এলা, তুমি যে এখানে ?"

এলা বললে, "আপনি আমার বাড়িতে ওদের যাওয়া নিষেধ করেছেন সেইজন্যে ছেলেরা এখানেই আমাকে ডেকেছে।"

"সে খবর আগেই পেয়েছি। পেয়েই জরুর তাদের অন্যত্র কাজে লাগিয়ে দিলুম। ওদের সকলের হয়ে অ্যাপলজি করতে এসেছি। বিলও শোধ করে দেব।"

"কেন আপনি আমার নিমন্ত্রণ ভেঙে দিলেন ?"

"ছেলেদের সঙ্গে তোমার সহৃদয়তার সম্পর্ক আছে সেই কথাটা চাপা দেবার জন্য। কাল দেখতে পাবে তোমার নাম করে একটা প্রবন্ধ কাগজে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"আপনি লিখেছেন ? আপনার কলমে বেনামি চলে না ; লোকে ওটাকে অকৃত্রিম বলে বিশ্বাস করবে না।"

"বাঁ হাত দিয়ে কাঁচা করে লেখা ; বুদ্ধির পরিচয় নেই, সদুপদেশ আছে।"

"কিরকম ?"

"তুমি লিখছ— ছেলেরা অকালবোধনে দেশকে মারতে বসেছে। বঙ্গনারীদের কাছে তোমার সকরুণ আপিল এই যে, তারা যেন লক্ষ্মীছাড়াদের মাথা ঠাণ্ডা করে। বলেছ— দূর থেকে ভর্ৎসনা করলে কানে পৌঁছোবে না। ওদের মাঝখানে গিয়ে পড়তে হবে, যেখানে ওদের নেশার আড্ডা ; শাসনকর্তাদের সন্দেহ হতে পারে, তা হোক। বলেছ— তোমরা মায়ের জাত ; ওদের শাস্তি নিজে নিয়েও যদি ওদের বাঁচাতে পার, মরণ সার্থক হবে। আজকাল সর্বদাই বলে থাক— তোমরা মায়ের জাত, ঐ কথাটাকে লবণাম্বুতে ভিজিয়ে লেখার মধ্যে বসিয়ে দিয়েছি। মাতৃবৎসল পাঠকের চোখে জল আসবে। যদি তুমি পুরুষ হতে, এর পরে রায়বাহাদুর পদবী পাওয়া অসম্ভব হত না।"

"আপনি যা লিখেছেন সেটা যে একেবারেই আমার কথা হতে পারে না তা আমি বলব না। এই সর্বনেশে ছেলেগুলোকে আমি ভালোবাসি— অমন ছেলে আছে কোথায় ! একদিন ওদের সঙ্গে কালেজে পড়েছি। প্রথম প্রথম ওরা আমার নামে বোর্ডে লিখেছে যা-তা— পিছন থেকে ছোটো এলাচ বলে চেঁচিয়ে ডেকেই ভালো-মানুষের মতো আকাশের দিকে তাকিয়েছে। ফোর্থ ইয়ারে পড়ত আমার বন্ধু ইন্দ্রাণী— তাকে বলত বড়ো এলাচ, সে-বেচারার বহরে কিছু বাহুল্য ছিল, রঙটাও উজ্জ্বল ছিল না। এই-সব ছোটোখাটো উৎপাত নিয়ে অনেক মেয়ে রাগারাগি করত, আমি কিন্তু ছেলেদের পক্ষ নিয়েছি। আমি জানতুম, আমরা ওদের চোখে অনভ্যস্ত তাই ওদের ব্যাপারটা হয়ে পড়ে এলোমেলো— কদর্যও হয় কখনো কখনো, কিন্তু সেটা ওদের স্বাভাবিক নয়। যখন অভ্যেস হয়ে গেল, সুর আপনি এল সহজ হয়ে। ছোটো এলাচ হল এলাদি। মাঝে মাঝে কারও সুরে মধুর রস লেগেছে— কেনই বা লাগবে না ? আমি কখনো ভয় করি নি তা নিয়ে। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি ছেলেদের সঙ্গে ব্যবহার করা খুবই সহজ, মেয়েরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যদি ওদের মৃগয়া করবার দিকে ঝোঁক না দেয়। তার পরে একে একে দেখলুম ওদের মধ্যে সব-চেয়ে ভালো যারা, যাদের ইতরতা নেই, মেয়েদের 'পরে সম্মান যাদের পুরুষের যোগ্য—"

"অর্থাৎ কলকাতার রসিক ছেলেদের মতো যাদের রস গাঁজিয়ে-ওঠা নয়—"

"হাঁ তারাই, ছুটল মৃত্যুদূতের পিছন পিছন মরিয়া হয়ে, তারা প্রায় সবাই আমারই মতো বাঙাল। ওরাই যদি মরতে ছোটে আমি চাই নে ঘরের কোণে বেঁচে থাকতে। কিন্তু দেখুন মাস্টারমশায়, সত্যি কথা বলব। যতই দিন যাচ্ছে, আমাদের উদ্দেশ্যটা উদ্দেশ্য না হয়ে নেশা হয়ে উঠছে। আমাদের কাজের পদ্ধতি চলেছে যেন নিজের বেতালা ঝোঁকে বিচারশক্তির বাইরে। ভালো লাগছে না। অমন সব ছেলেদের কোন অন্ধশক্তির কাছে বলি দেওয়া হচ্ছে ! আমার বুক ফেটে যায়।"

"বৎসে, এই যে ধিক্কার এটাই কুরুক্ষেত্রের উপক্রমণিকা। অর্জুনের মনেও ক্ষোভ লেগেছিল ডাক্তারি শেখবার গোড়ায় মড়া কাটবার সময় ঘৃণায় প্রায় মূর্ছা গিয়েছিলুম। ঐ ঘৃণাটাই ঘৃণ্য। শক্তির গোড়ায় নিষ্ঠুরের সাধনা, শেষে হয়তো ক্ষমা। তোমরা বলে থাক— মেয়েরা মায়ের জাত, কথাটা গৌরবের নয়। মা তো প্রকৃতির হাতে স্বতই বানানো। জন্তুজানোয়াররাও বাদ যায় না। তার চেয়ে বড়ো কথা তোমরা শক্তিরূপিণী, এইটেকেই প্রমাণ করতে হবে দয়ামায়ার জলাজমি পেরিয়ে গিয়ে শক্ত ডাঙায়। শক্তি দাও, পুরুষকে শক্তি দাও।"

"এ-সব মস্ত কথা বলে আপনি ভোলাচ্ছেন আমাদের। আমরা আসলে যা, তার চেয়ে দাবি করছেন অনেক বেশি। এতটা সইবে না।"

"দাবির জোরেই দাবি সত্য হয়। তোমাদের আমরা যা বিশ্বাস করতে থাকব তোমরা তাই হয়ে উঠবে। তোমরাও তেমনি করে আমাদের বিশ্বাস করো যাতে আমাদের সাধনা সত্য হয়।"

"আপনাকে কথা কওয়াতে ভালোবাসি কিন্তু এখন সে নয়। আমি নিজে কিছু বলতে ইচ্ছে করি।"

"আচ্ছা। তা হলে এখানে নয়, চলো ঐ পিছনের ঘরটাতে।"

পর্দাটানা আধা অন্ধকার ঘরে গেল ওরা। সেখানে একখানা পুরোনো টেবিল, তার দুধারে দুখানা

বেঞ্চ, দেয়ালে একটা বড়ো সাইজের ভারতবর্ষের ম্যাপ।

"আপনি একটা অন্যায় করছেন— এ কথা না বলে থাকতে পারলুম না।"

ইন্দ্রনাথকে এমন করে বলতে একমাত্র এলাই পারে। তবু তার পক্ষেও বলা সহজ নয়, তাই অস্বাভাবিক জোর লাগল গলায়।

ইন্দ্রনাথকে ভালো দেখতে বললে সবটা বলা হয় না। ওর চেহারায় আছে একটা কঠিন আকর্ষণশক্তি। যেন একটা বজ্র বাঁধা আছে সুদূরে ওর অন্তরে, তার গর্জন কানে আসে না, তার নিষ্ঠুর দীপ্তি মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে পড়ে। মুখের ভাবে মাজাঘষা ভদ্রতা, শান-দেওয়া ছুরির মতো। কড়া কথা বলতে বাধে না কিন্তু হেসে বলে; গলার সুর রাগের বেগেও চড়ে না, রাগ প্রকাশ পায় হাসিতে। যতটুকু পরিচ্ছন্নতায় মর্যাদা রক্ষা হয় ততটুকু কখনো ভোলে না এবং অতিক্রমও করে না। চুল অনতি-পরিমাণে ছাঁটা, যত্ন না করলেও এলোমেলো হবার আশঙ্কা নেই। মুখের রঙ বাদামি, লালের আভাস দেওয়া। ভুরুর উপর দুইপাশে প্রশস্ত টানা কপাল, দৃষ্টিতে কঠিন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, ঠোঁটে অবিচলিত সংকল্প এবং প্রভুত্বের গৌরব। অত্যন্ত দুঃসাধ্য রকমের দাবি সে অনায়াসে করতে পারে, জানে সেই দাবি সহজে অগ্রাহ্য হবে না। কেউ জানে তার বুদ্ধি অসামান্য, কেউ জানে তার শক্তি অলৌকিক। তার 'পরে কারও আছে সীমাহীন শ্রদ্ধা, কারও আছে অকারণ ভয়।

ইন্দ্রনাথ হাসিমুখে বললে, "কী অন্যায়?"

"আপনি উমাকে বিয়ে করতে হুকুম করেছেন, সে তো বিয়ে করতে চায় না।"

"কে বললে চায় না?"

"সে নিজেই বলে।"

"হয়তো সে নিজে ঠিক জানে না, কিংবা নিজে ঠিক বলে না।"

"সে আপনার সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিল বিয়ে করবে না।"

"তখন সেটা ছিল সত্য, এখন সেটা সত্য নেই। মুখের কথায় সত্য সৃষ্টি করা যায় না। প্রতিজ্ঞা উমা আপনিই ভাঙত, আমি ভাঙালুম, ওর অপরাধ বাঁচিয়ে দিলুম।"

"প্রতিজ্ঞা রাখা না-রাখার দায়িত্ব ওরই, না-হয় ভাঙত, না-হয় করত অপরাধ।"

"ভাঙতে ভাঙতে আশেপাশে ভাঙচুর করত বিস্তর, লোকসান হত আমাদের সকলেরই।"

"ও কিন্তু বড়ো কান্নাকাটি করছে।"

"তা হলে কান্নাকাটির দিন আর বাড়তে দেব না— কাল-পরশুর মধ্যেই বিয়ে চুকিয়ে দেওয়া যাবে।"

"কাল-পরশুর পরেও তো ওর সমস্ত জীবনটাই আছে।"

"মেয়েদের বিয়ের আগেকার কান্না প্রভাতে মেঘডম্বরং।"

"আপনি নিষ্ঠুর।"

"কেননা, মানুষকে যে-বিধাতা ভালোবাসেন, তিনি নিষ্ঠুর, জন্তুকেই তিনি প্রশ্রয় দেন।"

"আপনি জানেন উমা সুকুমারকে ভালোবাসে।"

"সেইজন্যেই ওকে তফাত করতে চাই।"

"ভালোবাসার শাস্তি?"

"ভালোবাসার শাস্তির কোনো মানে নেই। তা হলে বসন্ত রোগ হয়েছে বলেও শাস্তি দিতে হয়। কিন্তু গুটি বেরোলে ঘর থেকে বের করে রোগীকে হাঁসপাতালে পাঠানোই শ্রেয়।"

"সুকুমারের সঙ্গে বিয়ে দিলেই তো হয়।"

"সুকুমার তো কোনো অপরাধ করে নি। ওর মতো ছেলে আমাদের মধ্যে কজন আছে?"

"ও যদি নিজেই উমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়?"

"অসম্ভব নয়। সেইজন্যেই এত তাড়া। ওর মতো উঁচুদরের পুরুষের মনে বিভ্রম ঘটানো মেয়েদের পক্ষে সহজ; সৌজন্যকে প্রশ্রয় বলে সুকুমারের কাছে প্রমাণ করা দুই-এক ফোঁটা চোখের জলেই

সম্ভব হতে পারে। রাগ করছ শুনে?"

"রাগ করব কেন? মেয়েরা নিঃশব্দ নৈপুণ্যে প্রশ্রয় ঘটিয়েছে আর তার দায় মানতে হয়েছে পুরুষকে, আমার অভিজ্ঞতায় এমন ঘটনার অভাব নেই। সময় হয়েছে সত্যের অনুরোধে ন্যায়বিচার করবার। আমি সেটা করে থাকি বলেই মেয়েরা আমাকে দেখতে পারে না। যার সঙ্গে উমার বিয়ের হুকুম সেই ভোগীলালের মত কী?"

"সেই নিষ্কণ্টক ভালোমানুষের মতামত বলে কোনো উপসর্গ নেই। বাঙালির মেয়েমাত্রকেই সে বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি বলে জানে। ওরকম মুগ্ধ স্বভাবের ছেলেকে দলের বাইরের আঙিনায় সরিয়ে ফেলা দরকার। জঞ্জাল ফেলার সব-চেয়ে ভালো ঝুড়ি বিবাহ।"

"এই সমস্ত উৎপাতের আশঙ্কা সত্ত্বেও আপনি মেয়ে-পুরুষকে একত্র করেছেন কেন?"

"শরীরটাতে ছাই দিয়েছে যে সন্ন্যাসী, আর প্রবৃত্তিকে ছাই করেছে যে-ভস্মকুণ্ড সেই ক্লীবদের নিয়ে কাজ হবে না বলে। যখন দেখব আমাদের দলের কোনো অগ্নি-উপাসক অসাবধানে নিজের মধ্যেই অগ্নিকাণ্ড করতে বসেছে-- দেব তাদের সরিয়ে। আমাদের অগ্নিকাণ্ড দেশ জুড়ে, নেবানো মন দিয়ে তা হবে না, আর হবে না তাদের দিয়ে আগুন যারা চাপতে জানে না।"

গম্ভীর মুখে এলা বসে রইল। কিছুক্ষণ বাদে চোখ নামিয়ে বললে, "আমাকে আপনি তবে ছেড়ে দিন।"

"এতখানি ক্ষতি করতে বল কেন?"

"আপনি জানেন না।"

"জানি নে কে বললে? দেখা গেল একদিন তোমার খদ্দরে একটুখানি রঙ লেগেছে। জানা গেল অন্তরে অরুণোদয়। বুঝতে পারি একটা কোন পায়ের শব্দের প্রত্যাশায় তোমার কান পাতা থাকে। গেল শুক্রবারে যখন এলুম তোমার ঘরে, তুমি ভেবেছিলে আর-কেউ বা। দেখলুম মনটা ঠিক করে নিতে কিছু সময় লাগল। লজ্জা কোরো না তুমি, এতে অসংগত কিছুই নেই।"

কর্ণমূল লাল করে চুপ করে রইল এলা।

ইন্দ্রনাথ বললে, "তুমি একজনকে ভালোবেসেছ, এই তো? তোমার মন তো জড় পাষাণে গড়া নয়। যাকে ভালোবাস তাকেও জানি। অনুশোচনার কারণ কিছুই দেখছি নে।"

"আপনি বলেছিলেন একমনা হয়ে কাজ করতে হবে। সকল অবস্থায় তা সম্ভব না হতে পারে।"

"সকলের পক্ষে নয়। কিন্তু ভালোবাসার গুরুভারে তোমার ব্রত ডোবাতে পারে তুমি তেমন মেয়ে নও।"

"কিন্তু—"

"এর মধ্যে কিন্তু কিছুই নেই— তুমি কিছুতেই নিষ্কৃতি পাবে না।"

"আমি তো আপনাদের কোনো কাজে লাগি নে, সে আপনি জানেন।"

"তোমার কাছ থেকে কাজ চাই নে, কাজের কথা সব জানাইও নে তোমাকে। কেমন করে তুমি নিজে বুঝবে তোমার হাতের রক্তচন্দনের ফোঁটা ছেলেদের মনে কী আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সেটুকু বাদ দিয়ে কেবল শুখো মাইনেয় কাজ করাতে গেলে পুরো কাজ পাব না। আমরা কামিনীকাঞ্চনত্যাগী নই। যেখানে কাঞ্চনের প্রভাব সেখানে কাঞ্চনকে অবজ্ঞা করি নে, যেখানে কামিনীর প্রভাব সেখানে কামিনীকে বেদীতে বসিয়েছি।"

"আপনার কাছে মিথ্যে বলব না, বুঝতে পারছি আমার ভালোবাসা দিনে দিনেই আমার অন্য সকল ভালোবাসাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।"

"কোনো ভয় নেই, খুব ভালোবাসো। শুধু মা মা স্বরে দেশকে যারা ডাকাডাকি করে, তারা চিরশিশু। দেশ বৃদ্ধ শিশুদের মা নয়, দেশ অর্ধনারীশ্বর-- মেয়ে-পুরুষের মিলনে তার উপলব্ধি। এই মিলনকে নিস্তেজ কোরো না সংসার-পিঁজরেয় বেঁধে।"

"কিন্তু তবে আপনি যে ঐ উমা—"

"উমা ! কালু !— ভালোবাসার শুষ্ক রুদ্ররূপ ওরা সইতে পারবে কী করে ? যে দাম্পত্যের ঘাটে ওদের সকল সাধনার অন্ত্যেষ্টিসৎকার, সময় থাকতে সেখানেই দুজনকে গঙ্গাযাত্রায় পাঠাচ্ছি— । সে কথা থাক্। শোনা গেল তোমার ঘরে ডাকাত ঢুকেছিল পরশু রাত্রে।"

"হাঁ, ঢুকেছিল।"

"তোমার জুজুৎসু শিক্ষায় ফল পেয়েছিলে কি ?"

"আমার বিশ্বাস ডাকাতের কবজি দিয়েছি ভেঙে।"

"মনটার ভিতর আহা উহু করে ওঠে নি ?"

"করত কিন্তু ভয় ছিল ও আমাকে অপমান করবে। ও যদি যন্ত্রণায় হার মানত আমি শেষ পর্যন্ত মোচড় দিতে পারতুম না।"

"চিনতে পেরেছিলে সে কে ?"

"অন্ধকারে দেখতে পাই নি।"

"যদি পেতে তা হলে জানতে, সে অনাদি।"

"আহা সে কী কথা। আমাদের অনাদি ! সে যে ছেলেমানুষ।"

"আমিই তাকে পাঠিয়েছিলুম।"

"আপনিই ! কেন এমন কাজ করলেন ?"

"তোমারও পরীক্ষা হল, তারও।"

"কী নিষ্ঠুর।"

"ছিলুম নীচের ঘরে, তখনই হাড় ঠিক করে দিয়েছি। তুমি নিজেকে মনে কর ব্যথাকাতর। বোঝাতে চেয়েছিলুম বিপদের মুখে কাতরতা স্বাভাবিক নয়। সেদিন তোমাকে বললুম, ছাগলছানাটাকে পিস্তল করে মারতে। তুমি বললে, কিছুতেই পারবে না। তোমার পিসতুত বোন বাহাদুরি করে মারলে গুলি। যখন দেখলে জন্তুটা পা ভেঙে পড়ে গেল, কাঠিন্যের ভান করে হা হা করে হেসে উঠল। হিস্টিরিয়ার হাসি, সেদিন রাত্তিরে তার ঘুম হয় নি। কিন্তু তোমাকে যদি বাঘে খেতে আসত আর তুমি যদি ভীতু না হতে তা হলে তখনই তাকে মারতে, দ্বিধা করতে না। আমরা সেই বাঘটাকে মনের সামনে স্পষ্ট দেখছি, দয়ামায়া দিয়েছি বিসর্জন, নইলে নিজেকে সেন্টিমেন্টাল বলে ঘৃণা করতুম। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথাটাই বুঝিয়েছিলেন। নির্দয় হবে না কিন্তু কর্তব্যের বেলা নির্মম হতে হবে। বুঝতে পেরেছ ?"

"পেরেছি।"

"যদি বুঝে থাক একটা প্রশ্ন করব। তুমি অতীনকে ভালোবাস ?"

কোনো উত্তর না দিয়ে এলা চুপ করে রইল।

"যদি কখনো সে আমাদের সকলকে বিপদে ফেলে, তাকে নিজের হাতে মারতে পার না ?"

"তার পক্ষে এতই অসম্ভব যে হাঁ বলতে আমার মুখে বাধবে না।"

"যদিই সম্ভব হয় ?"

"মুখে যা-ই বলি না কেন, নিজেকে কি শেষ পর্যন্ত জানি ?"

"জানতেই হবে নিজেকে। সমস্ত নিদারুণ সম্ভাবনা প্রত্যহ কল্পনা করে নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে।"

"আমি নিশ্চিত বলছি, আপনি আমাকে ভুল করে বেছে নিয়েছেন।"

"আমি নিশ্চিত জানি আমি ভুল করি নি।"

"মাস্টারমশায়, আপনার পায়ে পড়ি, দিন অতীনকে নিষ্কৃতি।"

"আমি নিষ্কৃতি দেবার কে ? ও বাঁধা পড়েছে নিজেরই সংকল্পের বন্ধনে। ওর মন থেকে দ্বিধা কোনো কালেই মিটবে না, রুচিতে ঘা লাগবে প্রতিমুহূর্তে, তবু ওর আত্মসম্মান ওকে নিয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত।"

"লোক চিনতে আপনি কি কখনো ভুল করেন না ?"

"করি। অনেক মানুষ আছে যাদের স্বভাবে দু রকম বুনোনির কাজ। দুটোর মধ্যে মিল নেই; অথচ দুটোই সত্য। তারা নিজেকেও নিজে ভুল করে।"

ভারি গলায় আওয়াজ এল, "কী হে ভায়া।"

"কানাই বুঝি ? এসো এসো।"

কানাই গুপ্ত এল ঘরে। বেঁটে মোটা মানুষটি আধবুড়ো। সপ্তাহখানেক দাড়িগোঁফ কামাবার অবকাশ ছিল না, কণ্টকিত হয়ে উঠেছে মুখমণ্ডল। সামনের মাথায় টাক ; ধুতির উপর মোটা খদ্দরের চাদর, ধোবার প্রসাদ-বঞ্চিত, জামা নেই। হাত দুটো দেহের পরিমাণে খাটো, মনে হয়, সর্বদা কাজে উদ্যত, দলের লোকের যথাসম্ভব অন্নসংস্থানের জন্যই কানাইয়ের চায়ের দোকান।

কানাই তার স্বাভাবিক চাপা ভাঙা গলায় বললে, "ভায়া, তোমার খ্যাতি আছে বাক্‌সংযমে, তুমি মুনি বললেই হয়। এলাদি তোমার সেই খ্যাতি বুঝি দিলে মাটি করে।"

ইন্দ্রনাথ হেসে বললে, "কথা না বলারই সাধনা আমাদের। নিয়মটাকে রক্ষা করবার জন্যেই ব্যতিক্রমের দরকার। এই মেয়েটি নিজে কথা বলে না, অন্যকে কথা বলবার ফাঁক দেয়, বাক্যের পক্ষে এ একটি বহুমূল্য আতিথ্য।"

"কী বল তুমি ভায়া। এলাদি কথা বলে না ! তোমার কাছে চুপ, কিন্তু যেখানে মুখ খোলে সেখানে বাণীর বন্যা। আমি তো মাথাপাকা মানুষ, সাড়া পেলেই খাতাপত্র ফেলে আড়াল থেকে ওর কথা শুনতে আসি। এখন আমার প্রতি একটু মনোযোগ দিতে হবে। এলাদির মতো কণ্ঠ নয় আমার, কিন্তু সংক্ষেপে যেটুকু বলব তা মর্মে প্রবেশ করবে।"

এলা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। ইন্দ্রনাথ বললে, "যাবার আগে একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি। দলের লোকের কাছে আমি তোমাকে নিন্দে করে থাকি ; এমন-কি, এমন কথাও বলেছি, যে একদিন তোমাকে হয়তো একেবারে নিশ্চিহ্ন সরিয়ে দিতে হবে। বলেছি, অতীনকে তুমি ভাঙিয়ে নিচ্ছ, সেই ভাঙনে আরো কিছু ভাঙবে।"

"বলতে বলতে কথাটাকে সত্য করে তুলছেন কেন ? কী জানি, এখানকার সঙ্গে হয়তো আমার একটা অসামঞ্জস্য আছে।"

"থাকা সত্ত্বেও তোমাকে সন্দেহ করি নে। কিন্তু তবু ওদের কাছে তোমার নিন্দে করি। তোমার শত্রু কেউ নেই এই জনপ্রবাদ, কিন্তু দেখতে পাই তোমার বারো-আনা অনুরক্তের বাংলাদেশী মন নিন্দা বিশ্বাস করবার আগ্রহে লালায়িত হয়ে ওঠে। এই নিন্দাবিলাসীরা নিষ্ঠাহীন। এদের নাম খাতায় টুকে রাখি। অনেকগুলো পাতা ভরতি হল।"

"মাস্টারমশায়, ওরা নিন্দে ভালোবাসে বলেই নিন্দে করে, আমার উপর রাগ আছে বলে নয়।"

"অজাতশত্রু নাম শুনেছ এলা। এরা সবাই জাতশত্রু। জন্মকাল থেকেই এদের অহৈতুক শত্রুতা বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের সমস্ত চেষ্টাকে কেবলই ধূলিসাৎ করছে।"

"ভায়া, আজ এই পর্যন্ত, বিষয়টা আগামীবারে সমাপ্য। এলাদি, তোমার চায়ের নিমন্ত্রণ ভাঙবার মূলে যদি গোপনে আমি থাকি, কিছু মনে কোরো না। আমার চায়ের দোকানটাতে কুলুপ পড়বার সময় আসন্ন। বোধ হয় মাইল শ-তিন তফাতে গিয়ে এবার নাপিতের দোকান খুলতে হবে। ইতিমধ্যে অলকানন্দা তৈল পাঁচ পিপে তৈরি করে রেখেছি। মহাদেবের জটা নিংড়ে বের-করা। একটা সার্টিফিকেট দিয়ো বৎসে, বোলো, অলকা তেল মাখার পর থেকে চুল-বাঁধা একটা আপদ হয়েছে, দীর্ঘায়মানা বেণী সামলে তোলা স্বয়ং দশভুজা দেবীর দুঃসাধ্য।"

যাবার সময় এলা দরজার কাছে এসে মুখ ফিরিয়ে বললে, "মাস্টারমশায়, মনে রইল আপনার কথা। প্রস্তুত থাকব। আমাকে সরাবার দিন হয়তো আসবে, নিঃশব্দেই মিলিয়ে যাব।"

এলা চলে গেলে ইন্দ্রনাথ বললে, "তোমাকে চঞ্চল দেখছি কেন হে কানাই ?"

"সম্প্রতি রাস্তার ধারে আমার ঐ সামনের টেবিলেই বসে গোটাতিনেক গুণ্ডা ছেলে বীররস প্রচার

করছিল। আওয়াজে বোঝা যায় জন বৃষভেরই পুষ্যি বাছুর। আমি সিডিশনের নমুনা সুদ্ধ ওদের নামে পুলিসে রিপোর্ট করে দিয়েছি।"

"আন্দাজ করতে ভুল কর নি তো কানাই?"

"বরং ভুল করে সন্দেহ করা ভালো, কিন্তু সন্দেহ না করে ভুল করা সাংঘাতিক। খাঁটি বোকাই যদি হয় তা হলে কেউ ওদের বাঁচাতে পারবে না, আর যদি হয় খাঁটি দুশমন তা হলে ওদের মারবে কে? আমার রিপোর্টে উন্নতিই হবে। সেদিন চড়া গলায় শয়তানি শাসনপ্রণালীর উপর দিয়ে রক্তগঙ্গা বওয়াবার প্রস্তাব তুলেছিল। নিশ্চয়ই অভয়চরণ রক্ষিত এদের উপাধি। একদিন সন্ধ্যাবেলায় ক্যাশবাক্স নিয়ে হিসেব মেলাতে বসেছিলুম। হঠাৎ একটা ধুলোমাখা ছেঁড়া কাপড়-পরা ছেলে এসে চুপি চুপি বললে, টাকা চাই পঁচিশটা, যেতে হবে দিনাজপুরে। আমাদের মথুর মামার নাম করলে। আমি লাফ দিয়ে উঠে চীৎকার করে বলে উঠলুম, শয়তান, এতবড়ো আস্পর্ধা তোমার। এখনই ধরিয়ে দেব পুলিসের হাতে।— সময় হাতে একটুও ছিল না, নইলে প্রহসনটা শেষ করতুম, নিয়ে যেতুম থানায়। তোমার ছেলেরা যারা পাশের ঘরে বসে চা খাচ্ছিল তারা আমার উপর অগ্নিশর্মা; ওকে দেবে বলে চাঁদা তোলবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলে, সবার পকেট কুড়িয়ে তেরো আনার বেশি ফন্ড উঠল না। ছেলেটা আমার মূর্তি দেখে সরে পড়েছে।"

"তবে তো দেখছি তোমার ঢাকনির ফুটো দিয়ে গন্ধ বেরিয়ে পড়েছে— মাছির আমদানি শুরু হল।"

"সন্দেহ নেই। ভায়া, এখনই ছড়িয়ে ফেলো তোমার ছেলেগুলোকে দূরে দূরে— ওদের একজনও যেন বেকার না থাকে। Ostensible means of livelihood প্রত্যেকেরই থাকা চাই।"

"চাই নিশ্চয়ই। কিন্তু উপায় ঠাউরেছ?"

"অনেকদিন থেকে। হাত খোলসা ছিল না, নিজে করতে পারি নি। ভেবে রেখেছি, উপকরণও জমিয়েছি ধীরে ধীরে। মাধব কবিরাজ বিক্রি করে জ্বরাশনি বটিকা, তার বারো-আনা কুইনীন। সেগুলো তার কাছ থেকে নিয়ে লেবেল বদলে নাম দেব ম্যালেরিয়ারি গুটিকা, কুইনীনের পিছনে অনেকখানি মিথ্যে কথা জুড়তে হবে। প্রতুল সেনকে লাগানো যাবে ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে ঐ গুটিকা প্রচার করার কাজে। তোমার নিবারণ ফার্স্ট ক্লাস এম· এস্‌সি·, লজ্জা ত্যাগ করে পড়ুক ভৈরবী কবচ নিয়ে, এই কবচে সপ্তধাতুর উপরে নব্য রসায়নের আরো গোটাকতক নূতন ধাতুর নাম জড়িয়ে প্রাচীন ঋষিদের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সম্মিলন সাধনা করা যেতে পারে। জগবন্ধু সংস্কৃত শ্লোকের উপর ব্যাকরণের ভেলকি লাগিয়ে উচ্চস্বরে প্রমাণ করতে থাকুক যে, চাণক্য জন্মেছিলেন বাংলাদেশে নেত্রকোণায়, আমারও জন্মস্থান ঐ সাবডিবিশনে। এই নিয়ে সাংঘাতিক কথা-কাটাকাটি চলুক সাহিত্যে, অবশেষে চাণক্য-জয়ন্তী করা যাবে আমারই প্রপিতামহের পোড়ো ভিটের 'পরে। তোমাদের ক্যাম্বেলি ডাক্তার তারিণী সাণ্ডেল মা শীতলার মন্দির নির্মাণের জন্যে চাঁদা চেয়ে পাড়া অস্থির করে বেড়াক। আসল কথা হচ্ছে, তোমার সব-চেয়ে মাথা উঁচু গ্রেনেডিয়ার ছেলের দলকে কিছুদিন বাজে ব্যবসায়ে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে— কেউ-বা ওদের বোকা বলুক, কেউ-বা বলুক ওরা চতুর বিষয়ী লোক।"

ইন্দ্রনাথ হেসে বললে, "তোমার কথা শুনে আমার ইচ্ছে হচ্ছে একটা ব্যবসায়ে লাগি। আর-কিছুর জন্যে না, কেবল দেউলে হবার কার্যপ্রণালী এবং সাইকলজি অনুশীলন করবার জন্যে।"

কানাই বললে, "তুমি যে-ব্যবসায়ে লেগেছ ভায়া, সেটা আজ হোক বা কাল হোক নিশ্চিত দেউলে হবারই মুখে আছে। যারা দেউলে হয় তারা বোঝে না বলে হয় তা নয়, তারা লোকসানের রাস্তা কোনোমতে ছাড়তে পারে না বলেই হয়— দেউলে হওয়ার মরণটান একটা সাব্লাইম আকর্ষণ। ও-বিষয়টা বর্তমানে আলোচনা করে ফল নেই; একটা প্রশ্ন মনে আছে সেটা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে নিই। এলার মতো সুন্দরী সর্বদা দেখতে পাওয়া যায় না— এ-কথা মান কি না?"

"মানি বৈকি।"

"তা হলে ওকে তোমাদের মধ্যে রেখেছ কোন্ সাহসে ?"

"কানাই, এতদিনে আমাকে তোমার বোঝা উচিত ছিল। আগুনকে যে ভয় করে সে আগুনকে ব্যবহার করতে পারে না। আমার কাজে আমি আগুনকে বাদ দিতে চাই নে।"

"অর্থাৎ তাতে কাজ নষ্ট হোক বা না হোক, তুমি কেয়ার কর না।"

"সৃষ্টিকর্তা আগুন নিয়ে খেলা করে। নিশ্চিত ফলের হিসেব করে সৃষ্টির কাজ চলে না; অনিশ্চিতের প্রত্যাশাতেই তার বিরাট প্রবর্তনা। ঠাণ্ডা মালমসলা নিয়ে বুড়ো আঙুলে টিপে টিপে যে পুতুল গড়া হয় তার বাজারদর খতিয়ে লোভ করবার মন আমার নয়। ঐ যে অতীন ছেলেটা এসেছে এলার টানে, ওর মধ্যে বিপদ ঘটাবার ডাইনামাইট আছে— ওর প্রতি তাই আমার এত ঔৎসুক্য।"

"ভায়া, তোমার এই ভীষণ ল্যাবরেটরিতে আমরা ঝাড়ন কাঁধে বেহারার কাজ করি মাত্র। খেপে ওঠে যদি কোনো গ্যাস, যদি কোনো যন্ত্র ফেটে ফুটে ছিটকে পড়ে তা হলে আমাদের কপাল ভাঙবে সাতখানা হয়ে। সেটা নিয়ে গর্ব করবার মতো জোর আমাদের খুলির তলায় নেই।"

"জবাব দিয়ে বিদায় নেও না কেন ?"

"ফলের লোভ যে আছে আমাদের, তোমার না থাকতে পারে। তোমারই দালালদের মুখে একদা শুনেছিলুম Elixir of life হয়তো মিলতে পারে। তোমার এই সর্বনেশে রিসার্চের চক্রান্তে গরিব আমরা ধরা দিয়েছি নিশ্চিত আশারই টানে, অনিশ্চিতের কুহকে নয়। তুমি এটাকে দেখছ জুয়োখেলার দিক থেকে, আমরা দেখছি ব্যাবসার সাদা চোখে। অবশেষে খতেনের খাতায় আগুন লাগিয়ে আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা কোরো না ভায়া। ওর প্রত্যেক সিকি পয়সায় আছে আমাদের বুকের রক্ত।"

"আমার মনে কোনো অন্ধ বিশ্বাস নেই কানাই। হারজিতের কথা ভাবা একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। প্রকাণ্ড কর্মের ক্ষেত্রে আমি কর্তা, এইখানেই আমাকে মানায় বলেই আমি আছি— এখানে হারও বড়ো জিতও বড়ো। ওরা চার দিকের দরজা বন্ধ করে আমাকে ছোটো করতে চেয়েছিল, মরতে মরতে প্রমাণ করতে চাই আমি বড়ো। আমার ডাক শুনে কত মানুষের মতো মানুষ মৃত্যুকে অবজ্ঞা করে চারি দিকে এসে জুটল; সে তো তুমি দেখতে পাচ্ছ কানাই। কেন ? আমি ডাকতে পারি বলেই। সেই কথাটা ভালো করে জেনে এবং জানিয়ে যাব, তার পরে যা হয় হোক। তোমাকে তো বাইরে থেকে একদিন দেখতে ছিল সামান্য কিন্তু তোমার অসামান্যকে আমি প্রকাশিত করেছি। রসিয়ে তুললুম তোমাদের, মানুষ নিয়ে এই আমার রসায়নের সাধনা। আর বেশি কী চাই ? ঐতিহাসিক মহাকাব্যের সমাপ্তি হতে পারে পরাজয়ের মহাশ্মশানে। কিন্তু মহাকাব্য তো বটে। গোলামি-চাপা এই খর্ব মনুষ্যত্বের দেশে মরার মতো মরতে পারাও যে একটা সুযোগ।"

"ভায়া, আমার মতো অকাল্পনিক প্র্যাক্‌টিকাল লোককেও তুমি টান মেরে এনেছ ঘোরতর পাগলামির তাণ্ডব নৃত্যমঞ্চে। ভাবি যখন, এ রহস্যের অন্ত পাই নে আমি।"

"আমি কাঙালের মতো করে কিছুই চাই নে বলেই তোমাদের 'পরে আমার এত জোর। মায়া দিয়ে ভুলিয়ে লোভ দেখিয়ে ডাকি নে কাউকে। ডাক দিই অসাধ্যের মধ্যে, ফলের জন্যে নয়, বীর্য প্রমাণের জন্যে। আমার স্বভাবটা ইম্পার্সোন্যাল। যা অনিবার্য তাকে আমি অক্ষুব্ধমনে স্বীকার করে নিতে পারি। ইতিহাস তো পড়েছি, দেখেছি কত মহা মহা সাম্রাজ্য গৌরবের অভ্রভেদীশিখরে উঠেছিল আজ তারা ধুলোয় মিলিয়ে গেছে— তাদের হিসাবের খাতায় কোথায় মস্ত একটা দেনা জমে উঠেছিল যা তারা শোধ করে নি। আর এই দেশ যেহেতু এ আমারই দেশ, সৌভাগ্যের চিরস্বত্ব নিয়ে ইতিহাসের উঁচু গদিতে গদিয়ান হয়ে বসে থাকবে পরাভবের সমস্ত কারণগুলোর পায়ে সিঁদুরচন্দন মাখিয়ে ঘণ্টা নেড়ে পুজো করতে করতে, বোকার মতো এমন আবদার করব কার কাছে ? আমি তা কখনোই করি নে। বৈজ্ঞানিকের নির্মোহ মন নিয়ে মেনে নিই যার মরণদশা সে মরবেই।"

"তবে !"

"তবে ! দেশের চরম দুরবস্থা আমার মাথা হেঁট করতে পারবে না, আমি তারও অনেক ঊর্ধ্বে— আত্মার অবসাদ ঘটতে দেব না মরবার সমস্ত লক্ষণ দেখেও।"

"আর আমরা ?"

"তোমরা কি খোকা ! মাঝদরিয়ায় যে-জাহাজের তলা গিয়েছে সাত জায়গায় ফাঁক হয়ে, কেঁদে কেটে মন্ত্র পড়ে কর্তার দোহাই পেড়ে তাকে বাঁচাতে পারবে ?"

"না যদি পারি তবে ?"

"তবে কী। তোমরা কজনে জেনে শুনে সেই ডুবোজাহাজেই ঝড়ের মুখে সাংঘাতিক পাল তুলে দিয়েছ, তোমাদের পাঁজর কাঁপে নি। এমন যে-কজনকে পাই ডুবতে ডুবতে তাদের নিয়েই আমাদের জিত। রসাতলে যাবার জন্যে যে-দেশ অন্ধভাবে প্রস্তুত তারি মাস্তুলে তোমরা শেষ পর্যন্ত জয়ধ্বজা উড়িয়েছ, তোমরা না করেছ মিথ্যে আশা, না করেছ কাঙালপনা, না কেঁদেছ নৈরাশ্যে হাউ হাউ করে। তোমরা তবু হাল ছাড় নি যখন জলে ভরেছে জাহাজের খোল। হাল ছাড়াতেই কাপুরুষতা— বাস, আমার কাজ হয়ে গেছে তোমাদের যে-কজনকে পেয়েছি তাদেরই নিয়ে। তার পরে ? কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

"তুমি যা বলছ তার মধ্যে থেকে একটা প্রধান কথা বাদ গেছে বলে বোধ হয়।"

"কোন্ কথাটা ?"

"তোমার মনে কি রাগও নেই ? এত ইম্পার্সোন্যাল তুমি !"

"রাগ কার 'পরে ?"

"ইংরেজের 'পরে।"

"যে জোয়ান মদ খেয়ে চোখ লাল না করলে লড়তে পারেই না, সেই গ্রাম্যকে আমি অবজ্ঞা করি। রাগের মাথায় কর্তব্য করতে গেলে অকর্তব্য করার সম্ভাবনাই বেশি।"

"তা হোক, কিন্তু রাগের কারণ থাকলে রাগ না করাটা অমানবিক।"

"সমস্ত য়ুরোপের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, আমি ইংরেজকেও জানি। যত পশ্চিমী জাত আছে তার মধ্যে ওরা সব-চেয়ে বড়ো জাত। রিপুর তাড়ায় ওরা যে মারতে পারে না তা নয় কিন্তু পুরোপুরি পারে না— লজ্জা পায়। ওদের নিজেদের মধ্যে যারা বড়ো তাদেরই কাছে জবাবদিহি করতে ওদের সব-চেয়ে ভয় ; ওরা নিজেকে ভোলায় তাদেরও ভোলায়। ওদের উপরে যতটা রাগ করলে ফুল স্টীম বানিয়ে তোলা যায় ততটা রাগ করা আমার দ্বারা সম্ভব হয় না।"

"অদ্ভুত তুমি।"

"ষোলো-আনা মারের চোটে আমাদের মেরুদণ্ড ওরা চিরকালের মতো গুঁড়িয়ে দিতে পারত। সেটা ওরা পারলে না। আমি ওদের মনুষ্যত্বকে বাহাদুরি দিই। পরের দেশ শাসন করতে করতে সেই মনুষ্যত্ব ক্ষয় হয়ে আসছে তাতেই মরণদশা ধরছে ওদের ভিতর থেকে। এত বেশি বিদেশের বোঝা আর কোনো জাতের ঘাড়ে নেই, এতে ওদের স্বভাব যাচ্ছে নষ্ট হয়ে।"

"সে ওরা বুঝবে। কিন্তু তোমার এই অধ্যবসায়কে প্রায় অহৈতুক করে তুলেছ এটা আমার কাছে বাড়াবাড়ি ঠেকে।"

"অত্যন্ত ভুল। আমি অবিচার করব না, উন্মত্ত হব না, দেশকে দেবী বলে মা মা বলে অশ্রুপাত করব না, তবু কাজ করব, এতেই আমার জোর।"

"শত্রুকে যদি শত্রু ব'লে তাকে দ্বেষ না কর তবে তার বিরুদ্ধে হাত চালাবে কী করে ?"

"রাস্তায় পাথর পড়ে থাকলে তার বিরুদ্ধে হাতিয়ার চালাই যেমন ক'রে, অপ্রমত্ত বুদ্ধি নিয়ে। ওরা ভালো কি মন্দ সেটা তর্কের বিষয় নয়। ওদের রাজত্ব বিদেশী রাজত্ব, সেটাতে ভিতর থেকে আমাদের আত্মলোপ করছে— এই স্বভাববিরুদ্ধ অবস্থাকে নড়াতে চেষ্টা করে আমার মানবস্বভাবকে আমি স্বীকার করি।"

"কিন্তু সফলতা সম্বন্ধে তোমার নিশ্চিত আশা নেই।"

"নাই রইল, তবু নিজের স্বভাবের অপমান ঘটাব না— সামনে মৃত্যুই যদি সব চেয়ে নিশ্চিত হয় তবুও ; পরাভবের আশঙ্কা আছে বলেই স্পর্ধা করে তাকে উপেক্ষা করে আত্মমর্যাদা রাখতে হবে।

আমি তো মনে করি এইটেই আজ আমাদের শেষ কর্তব্য।"

"ঐ আসছেন রক্তগঙ্গা বওয়াবার মেকি ভগীরথ। ওঁকে চা খাইয়ে আসি গে। সেইসঙ্গে মিষ্টভাষায় খবরও দেব যে, পুলিসকে সব কথা রিপোর্ট করা হয়েছে। তোমার দলের লোকেরা আমাকে লিঞ্চ করে না বসে।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

এলা বসে আছে কেদারায়, পিঠে বালিশ গোঁজা। লিখছে একমনে। পায়ের উপর পা তোলা। দেশবন্ধুর মূর্তি-আঁকা খাতা কাঠের বোর্ডে কোলের উপর আড় করে ধরা। দিন ফুরোতে দেরি নেই, কিন্তু তখনো চুল রয়েছে অযত্নে। বেগনি রঙের খদ্দরের শাড়ি গায়ে, সেটাতে মলিনতা অব্যক্ত থাকে, তাই নিভৃতে ব্যবহারে তার অনাদৃত প্রয়োজন। এলার হাতে একজোড়া লালরঙ-করা শাঁখা, গলায় একছড়া সোনার হার। হাতির দাঁতের মতো গৌরবর্ণ শরীরটি আঁটসাঁট ; মনে হয় বয়স খুব কম কিন্তু মুখে পরিণত বুদ্ধির গাম্ভীর্য। খদ্দরের সবুজ রঙের চাদরে ঢাকা সংকীর্ণ লোহার খাট ঘরের প্রান্তে দেয়াল-ঘেঁষা। নারায়ণী স্কুলের তাঁতে-বোনা শতরঞ্চ মেঝের উপর পাতা। একধারে লেখবার ছোটো টেবিলে ব্লটিং প্যাড ; তার একপাশে কলম পেনসিল সাজানো দোয়াত-দান, অন্যধারে পিতলের ঘটিতে গন্ধরাজ ফুল। দেয়ালে ঝুলছে কোনো একটি দূরবর্তী কালের ফোটোগ্রাফের প্রেতাত্মা, ক্ষীণ হলদে রেখায় বিলীনপ্রায়। অন্ধকার হল, আলো জ্বালবার সময় এসেছে। উঠি-উঠি করছে এমন সময় খদ্দরের পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে অতীন্দ্র দমকা হাওয়ার মতো ঘরে ঢুকেই ডাক দিল, "এলী।"

এলা খুশিতে চমকে উঠে বললে, "অসভ্য, জানান না দিয়ে এ ঘরে আসতে সাহস কর।"

এলার পায়ের কাছে ধপ করে মেঝের উপর বসে অতীন বললে, "জীবনটা অতি ছোটো, কায়দাকানুন অতি দীর্ঘ, নিয়ম বাঁচিয়ে চলবার উপযুক্ত পরমায়ু ছিল সনাতন যুগে মান্ধাতার। কলিকালে তার টানাটানি পড়েছে।"

"আমার কাপড় ছাড়া হয় নি এখনো।"

"ভালোই। তা হলে আমার সঙ্গে মিশ খাবে। তুমি থাকবে রথে, আমি থাকব পদাতিক হয়ে— এ রকম দ্বন্দ্ব মনুর নিয়মে অধর্ম। এককালে আমি ছিলুম নিখুঁত ভদ্রলোক, খোলসটা তুমিই দিয়েছ ঘুচিয়ে। বর্তমান বেশভূষাটা দেখছ কী রকম ?"

"অভিধানে ওকে বেশভূষা বলে না।"

"কী বলে তবে ?"

"শব্দ পাচ্ছি নে খুঁজে। বোধ হয় ভাষায় নেই। জামার সামনেটাতেই ঐ-যে বাঁকাচোরা ছেঁড়ার দাগ, ও কি তোমার স্বকৃত সেলাইয়ের লম্বা বিজ্ঞাপন ?"

"ভাগ্যের আঘাত দারুণ হলেও বুক পেতেই নিয়ে থাকি— ওটা তারই পরিচয়। এ জামা দরজিকে দিতে সাহস হয় না, তার তো আত্মসম্মানবোধ আছে।"

"আমাকে দিলে না কেন ?"

"নব যুগের সংস্কারভার নিয়েছ, তার উপরে পুরোনো জামার সংস্কার ?"

"ওটাকে সহ্য করবার এমনই কী দরকার ছিল ?"

"যে দরকারে ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে সহ্য করে।"

"তার অর্থ ?"

"তার অর্থ, একটির বেশি নেই বলে।"

"কী বল তুমি অন্তু ! বিশ্বসংসারে তোমার ঐ একটি বৈ জামা আর নেই ?"

"বাড়িয়ে বলা অন্যায়, তাই কমিয়ে বললুম। পূর্ব আশ্রমে শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রবাবুর জামা ছিল বহুসংখ্যক ও বহুবিধ। এমন সময়ে দেশে এল বন্যা। তুমি বক্তৃতায় বললে, যে অশ্রুপ্লাবিত দুর্দিনে (মনে আছে অশ্রুপ্লাবিত বিশেষণটা ?) বহু নরনারীর লজ্জারক্ষার মতো কাপড় জুটছে না, সে সময়ে আবশ্যকের অতিরিক্ত কাপড় যার আছে লজ্জা তারই। বেশ গুছিয়ে বলেছিলে। তখনো তোমার সম্বন্ধে প্রকাশ্যে হাসতে সাহস ছিল না। মনে মনে হেসেছিলুম। নিশ্চিত জানতুম আবশ্যকের বেশি জামা ছিল তোমার বাক্সে। কিন্তু মেয়েদের পঞ্চাশ রঙের পঞ্চাশটা জামা থাকলেও পঞ্চাশটাই অত্যাবশ্যক। সেদিন দেশহিতৈষিণীদের মধ্যে রেষারেষি চলছিল— কে কত দান সংগ্রহ করতে

পারে। এনে দিলুম আমার কাপড়ের তোরঙ্গ তোমার চরণতলে। হাততালি দিয়ে উঠলে খুশিতে।"

"সে কী কথা! আমি কি জানি অমন নিঃশেষ করে দেবে?"

"আশ্চর্য হও কেন? দুঃসাধ্য ক্ষতিসাধনের শক্তি এই দেহে দুর্জয়বেগে সঞ্চার করলে কে? সংগ্রহের ভার যদি থাকত আমাদের গণেশ মজুমদারের 'পরে তা হলে তার পৌরুষ আমার কাপড়ের বাক্সে ক্ষতি করত অতি সামান্য।"

"ছি ছি অন্তু, কেন আমাকে বললে না?"

"দুঃখ কোরো না। একান্ত শোচনীয় নয়, দুটো জামা রাঙিয়ে রেখে দিলুম নিত্য আবশ্যকের গরজে, পালা করে কেচে পরা চলছে। আরো দুটো আছে আপদ্ধর্মের জন্যে ভাঁজ করা। যদি কোনোদিন সন্দিগ্ধ সংসারে ভদ্রবংশীয় বলে প্রমাণ দেবার প্রয়োজন ঘটে সেই জামা দুটোতে ধোবা-দরজির সার্টিফিকেট রইল।"

"সৃষ্টিকর্তার সার্টিফিকেট রয়েছে ঐ চেহারাতেই— সাক্ষী ডাকতে হবে না তোমার।"

"স্তুতি! নারীর দরবারে স্তবের অত্যুক্তি চিরদিন পুরুষদেরই অধিকারভুক্ত, তুমি উলটিয়ে দিতে চাও?"

"হাঁ চাই। প্রচার করতে চাই, আধুনিক কালে মেয়েদের অধিকার বেড়ে চলেছে। পুরুষের সম্বন্ধেও সত্য বলতে তাদের বাধা নেই। নব্য সাহিত্যে দেখি বাঙালি মেয়েরা নিজেদেরই প্রশংসায় মুখর। দেবীপ্রতিমা বানাবার কুমোরের কাজটা নিজেরাই নিয়েছে। স্বজাতির গুণগরিমার উপরে সাহিত্যিক রঙ চড়াচ্ছে। সেটা তাদের অঙ্গরাগেরই শামিল, স্বহস্তের বাঁটা, বিধাতার হাতের নয়। আমার এতে লজ্জা করে। এখন চলো বসবার ঘরে।"

"এ ঘরেও বসবার জায়গা আছে। আমি তো একাই একটা বিরাট সভা নই।"

"আচ্ছা তবে বলো জরুরি কথাটা কী?"

"হঠাৎ কবিতার একটা পদ মনে পড়ে গেছে অথচ কোথায় পড়েছি কিছুতেই মনে আসছে না। সকাল থেকে হাওয়া হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছি। তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এলুম।"

"অত্যন্ত জরুরি দেখছি। আচ্ছা বলো।"

"একটু ভেবে বলো কার রচনা—

তোমার চোখে দেখেছিলাম
আমার সর্বনাশ।"

"কোনো নামজাদা কবির তো নয়ই।"

"পূর্বশ্রুত বলে মনে হচ্ছে না তোমার?"

"চেনা গলার আভাস পাচ্ছি একটুখানি। অন্য লাইনটা গেছে কোথায়?"

"আমার বিশ্বাস ছিল, অন্য লাইনটা আপনি তোমার মনে আসবে।"

"তোমার মুখে যদি একবার শুনি তা হলে নিশ্চয় মনে আসবে।"

"তবে শোনো—

প্রহরশেষের আলোয় রাঙা
সেদিন চৈত্রমাস,
তোমার চোখে দেখেছিলাম
আমার সর্বনাশ।"

অতীনের মাথায় করাঘাত করে এলা বললে, "আজকাল কী পাগলামি শুরু করেছ তুমি?"

"সেই চৈত্রমাসের বারবেলা থেকেই আমার পাগলামি শুরু। যে-সব দিন চরমে না পৌঁছোতেই ফুরিয়ে যায় তারা ছায়ামূর্তি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় কল্পলোকের দিগন্তে। তোমার সঙ্গে আমার মিলন সেই মরীচিকার বাসরঘরে। আজ সেইখানে তোমাকে ডাক দিতে এলুম— কাজের ক্ষতি করব।"

কাঠের বোর্ড আর খাতাখানা মেজের উপর ফেলে দিয়ে এলা বলল, "থাক্ পড়ে আমার কাজ। আলোটা জ্বেলে দিই।"

"না থাক্— আলো প্রত্যক্ষকে প্রমাণ করে, চলো দীপহীন পথে অপ্রত্যক্ষের দিকে। চার বছরের কিছু কম হবে, স্টীমারে খেয়া পার হচ্ছি মোকামার ঘাটে। তখনো আঁকড়ে ছিলুম পৈতৃক সম্পত্তির ভাঙা কিনারটাকে, সেটা ছিল দেনার গর্তে ভরা। তখনো দেহে মনে শৌখিনতার রঙ লেগে ছিল দেউলে দিনান্তের মেঘের মতো। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, পাট-করা মুগার চাদর কাঁধে, একলা বসে আছি ফার্স্ট ক্লাস ডেক-এ বেতের কেদারায়। ফেলে দেওয়া খবরের কাগজের পাতাগুলো ফরফর করে এধারে ওধারে উড়ে বেড়াচ্ছিল, মজা লাগছিল দেখতে, মনে হচ্ছিল মূর্তিমতী জনশ্রুতির এলোমেলো নৃত্য। তুমি জনসাধারণের দলে, কোমর বেঁধে ডেক-প্যাসেঞ্জার। হঠাৎ আমার পশ্চাদবর্তী অগোচরতার মধ্যে থেকে দ্রুতবেগে এসে পড়লে আমার সামনে। আজও চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি তোমার সেই ব্রাউন রঙের শাড়ি ; খোঁপার সঙ্গে কাঁটায় বেঁধা তোমার মাথার কাপড় মুখের দুই ধারে হাওয়ায় ফুলে উঠেছে। চেষ্টাকৃত অসংকোচের ভান করেই প্রশ্ন করলে, আপনি খদ্দর পরেন না কেন ?— মনে পড়ছে ?"

"খুব স্পষ্ট। তোমার মনের ছবিকে তুমি কথা কওয়াতে পার, আমার ছবি বোবা।"

"আমি আজ সেদিনের পুনরুক্তি করে যাব, তোমাকে শুনতে হবে।"

"শুনব না তো কী। সেদিন যেখানে আমার নূতন জীবনের ধুয়ো, পুনঃপুনঃ সেখানে আমার মন ফিরে আসতে চায়।"

"তোমার গলার সুরটি শুনেই আমার সর্বশরীর চমকে উঠল, সেই সুর আমার মনের মধ্যে এসে লাগল হঠাৎ আলোর ছটার মতো ; যেন আকাশ থেকে কোন এক অপরূপ পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল আমার চিরদিনটাকে। অপরিচিতা মেয়েটির অভাবনীয় স্পর্ধায় যদি রাগ করতে পারতুম তা হলে সেদিনকার খেয়াতরী এতবড়ো আঘাটায় পৌঁছিয়ে দিত না— ভদ্রপাড়াতেই শেষ পর্যন্ত দিন কাটত চলতি রাস্তায়। মনটা আর্দ্র দেশলাইকাঠির মতো, রাগের আগুন জ্বলল না। অহংকার আমার স্বভাবের সর্বপ্রধান সদ্‌গুণ, তাই ধাঁ করে মনে হল, মেয়েটি যদি আমাকে বিশেষভাবে পছন্দ না করত তা হলে এমন বিশেষভাবে ধমক দিতে আসত না, খদ্দরপ্রচার— ও একটা ছুতো, সত্যি কি না বলো।"

"ওগো, কতবার বলেছি— অনেকক্ষণ ধরে ডেকের কোণে বসে তোমাকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলুম। ভুলে গিয়েছিলুম আর-কেউ সেটা লক্ষ্য করছে কি না। জীবনে সেই আমার সব-চেয়ে আশ্চর্য একচমকের চিরপরিচয়। মন বললে, কোথা থেকে এল এই অতিদূর জাতের মানুষটি, চার দিকের পরিমাপে তৈরি নয়, শেওলার মধ্যে শতদল পদ্ম। তখনই মনে মনে পণ করলুম, এই দুর্লভ মানুষটিকে টেনে আনতে হবে, কেবল আমার নিজের কাছে নয়, আমাদের সকলের কাছে।"

"আমার কপালে তোমার একবচনের চাওয়াটা চাপা পড়ল বহুবচনের চাওয়ার তলায়।"

"আমার উপায় ছিল না অন্তু। দ্রৌপদীকে দেখবার আগেই কুন্তী বলেছিলেন, তোমরা সবাই মিলে ভাগ করে নিয়ো। তুমি আসবার আগেই শপথ করে দেশের আদেশ স্বীকার করেছি, বলেছি আমার একলার জন্যে কিছুই রাখব না। দেশের কাছে আমি বাগ্‌দত্তা।"

"অধার্মিক তোমার পণগ্রহণ, এ পণকে রক্ষা করাও প্রতিদিন তোমার স্বধর্ম-বিদ্রোহ। পণ যদি ভাঙতে তবে সত্যরক্ষা হত। যে লোভ পবিত্র, যা অন্তর্যামীর আদেশবাণী, তাকে দলের পায়ে দলিত করেছ, এর শাস্তি তোমাকে পেতে হবে।"

"অন্তু, শাস্তির সীমা নেই, দিনরাত মারছে আমাকে। যে আশ্চর্য সৌভাগ্য সকল সাধনার অতীত, যা দৈবের অযাচিত দান তা এল আমার সামনে তবু নিতে পারলুম না। হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁঠ বাঁধা, তৎসত্ত্বেও এতবড়ো দুঃসহ বৈধব্য কোনো মেয়ের ভাগ্যে যেন না ঘটে। একটা মন্ত্রপড়া বেড়ার মধ্যে ছিলুম, কিন্তু তোমাকে দেখবামাত্র মন উৎসুক হয়ে উঠল, বললে, ভাঙুক সব বেড়া। এমন বিপ্লব

ঘটতে পারে সে-কথা কোনোদিন ভাবতে পারি নি। এর আগে কখনো মন বিচলিত হয় নি বললে মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু চঞ্চলতা জয় করে খুশি হয়েছি নিজের শক্তির গর্বে। জয় করবার সেই গর্ব আজ নেই, ইচ্ছে হারিয়েছি— বাহিরের কথা ছেড়ে দাও, অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখো, হেরেছি আমি। তুমি বীর, আমি তোমার বন্দিনী।"

"আমিও হেরেছি আমার সেই বন্দিনীর কাছে। হার শেষ হয় নি, প্রতি মুহূর্তের যুদ্ধে প্রতি মুহূর্তেই হারছি।"

"অন্তু, ফার্স্ট ক্লাস ডেক-এ যখন অপূর্ব আবির্ভাবের মতো আমাকে দূর থেকে দেখা দিয়েছিলে তখনো জানতুম থার্ড ক্লাসের টিকিটটা আমাদের আধুনিক আভিজাত্যের একটা উজ্জ্বল নিদর্শন। অবশেষে তুমি চড়লে রেলগাড়িতে সেকেন্ড ক্লাসে। আমার দেহমনকে প্রবল টান দিলে সেই ক্লাসের দিকে। এমন-কি, মনে একটা চাতুরীর কল্পনা এসেছিল, ভেবেছিলুম, ট্রেন ছাড়বার শেষমুহূর্তে উঠে পড়ব তোমার গাড়িতে, বলব, তাড়াতাড়িতে ভুলে উঠেছি। কাব্যশাস্ত্রে মেয়েরাই অভিসার করে এসেছে, সংসারবিধিতে বাধা আছে বলেই কবিদের এই করুণা। উসখুস-করা মনের যত সব এলোমেলো ইচ্ছে ভিতরের আঁধার কোঠায় ঘুর খেয়ে খেয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে বেড়ায়। এদের কথা মেয়েরা পর্দার বাইরে কিছুতে স্বীকার করতে চায় না। তুমি আমাকে স্বীকার করিয়েছ।"

"কেন স্বীকার করলে?"

"নারীজাতির গুমর ভেঙে কেবল ঐ স্বীকারটুকুই তোমাকে দিতে পেরেছি, আর তো কিছু পারি নি।"

হঠাৎ অতীন এলার হাত চেপে ধরে বলে উঠল, "কেন পারলে না? কিসের বাধা ছিল আমাকে গ্রহণ করতে? সমাজ? জাতিভেদ?"

"ছি, ছি, এমন কথা মনেও কোরো না। বাইরে বাধা নয়, বাধা অন্তরে।"

"যথেষ্ট ভালোবাস নি?"

"ঐ যথেষ্ট কথাটার কোনো মানে নেই অন্তু। যে শক্তি হাত দিয়ে পর্বতকে ঠেলতে পারে নি তাকে দুর্বল বলে অপবাদ দিয়ো না। শপথ করে সত্য গ্রহণ করেছিলুম, বিয়ে করব না। না করলেও হয়তো বিয়ে সম্ভব হত না।"

"কেন হত না?"

"রাগ কোরো না অন্তু, ভালোবাসি বলেই সংকোচ। আমি নিঃস্ব, কতটুকুই বা তোমাকে দিতে পারি!"

"স্পষ্ট করেই বলো।"

"অনেকবার বলেছি।"

"আবার বলো, আজ সব বলা-কওয়া শেষ করে নিতে চাই, এর পরে আর জিজ্ঞাসা করব না।"

বাইরে থেকে ডাক এল, "দিদিমণি।"

"কী রে অখিল, আয়-না ভিতরে।"

ছেলেটার বয়স ষোলো কিংবা আঠারো হবে। জেদালো দুষ্টুমি-ভরা প্রিয়দর্শন চেহারা। কোঁকড়া চুল ঝাঁকড়ামাকড়া, কচি শামলা রঙ, চঞ্চল চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। খাকি রঙের শর্টপরা, কোমর পর্যন্ত ছাঁটা সেই রঙেরই একটা বোতাম-খোলা জামা, বুক বের করা; শর্টের দুই দিককার পকেট নানা বাজে সম্পত্তিতে ফুলে-ওঠা, বুকের পকেটে বিচিত্র ফলাওয়ালা একটা হরিণের শিঙের ছুরি; কখনো বা সে খেলার নৌকো, কখনো এরোপ্লেনের নমুনা বানায়। সম্প্রতি মল্লিক কোম্পানির আয়ুর্বেদিক বাগানে দেখে এসেছে জলতোলা হাওয়া-যন্ত্র; বিস্কুটের টিন প্রভৃতি নানা ফালতো জিনিস জোড়াতাড়া দিয়ে তারই নকলের চেষ্টা চলছে। আঙুল কেটেছে, তার উপরে ন্যাকড়া জড়ানো, এলা জিজ্ঞাসা করলে কানেই আনে না। এলা এই বাপ-মা-মরা ছেলের দূরসম্পর্কের আত্মীয়, অনেক উৎপাত সহ্য করে। কার কাছ থেকে বেঁটে জাতের এক বাঁদর অখিল সস্তা দামে কিনেছে। জন্তুটা ভাঁড়ারে

চৌর্যবৃত্তিতে সুদক্ষ। এলার ছোটো পরিবারে এই জন্তুটা একটা মস্ত অত্যাচার।

ঘরে ঢুকেই অখিল সলজ্জ দ্রুতবেগে পা ছুঁয়ে এলাকে প্রণাম করলে। এলা বুঝলে প্রণামটা একটা কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের অন্তর্গত, কেননা ভক্তিবৃত্তিটা অখিলের স্বভাবসিদ্ধ নয়।

এলা বললে, "তোর অন্তুদাদাকে প্রণাম করবি নে?"

কোনো জবাব না দিয়ে অখিল অতীনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে রইল। অতীন উচ্চস্বরে হেসে উঠল। অখিলের পিঠ চাপড়িয়ে বললে, "শাবাশ, মাথা যদি হেঁট করতেই হয় তো এক-দেবতার পায়ে। সেই একেশ্বরীর কাছে আমারও মাথা হেঁট, এখন প্রসাদের ভাগ নিয়ে রাগারাগি কোরো না ভাই, উদ্‌বৃত্তই বেশি।"

এলা অখিলকে বললে, "তোর কী কথা আছে বলে যা।"

অখিল বললে, "কাল আমার মায়ের মৃত্যুদিন।"

"তাই তো। একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। কাউকে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ করতে চাস?"

"কাউকে না।"

"তবে কী চাস?"

"পড়ার ছুটি চাই তিন দিন।"

"কী করবি ছুটি নিয়ে?"

"খরগোশের খাঁচা বানাব।"

"খরগোশ তোর একটিও বাকি নেই, খাঁচা বানাবি কার জন্যে?"

অতীন হেসে বললে, "খরগোশ তো কল্পনা করলেই হয়, খাঁচাটা বানানোই আসল কথা। মানুষ অনিত্য, আসে আর যায় কিন্তু নিত্যকালের মতো পাকা করে তাদের খাঁচা বানাবার ভার নিয়েছেন ভগবান মনু থেকে আরম্ভ করে মনুর আধুনিক অবতার পর্যন্ত। এই কাজে তাদের ভীষণ শখ।"

"আচ্ছা অখিল, যা তোর ছুটি।"

দ্বিতীয় কথাটি না বলে অখিল দৌড়ে চলে গেল।

অতীন বললে, "ওকে পোষ মানাতে পারলুম না। আমার সাবেক সম্পত্তির ঝড়তিপড়তির মধ্যে ছিল একটা কব্‌জিঘড়ি, আধুনিক ছেলেদের পক্ষে সাত রাজার ধন। একদিন সেটা ওকে দিতে গিয়েছিলুম; মাথা ঝাঁকানি দিয়ে চলে গেল। এর থেকে বুঝবে ওতে আমাতে ব্যাপারটা কম্যুন্যাল হয়ে উঠেছে, অন্তু-অখিল রায়ট হবার লক্ষণ।"

"ছেলেদের সঙ্গে ভাব করতে তোমার জুড়ি কেউ নেই, তবু এই বাঁদরটার কাছে হার মানলে কেন?"

"মাঝখানে আছে তৃতীয় পক্ষ, নইলে ওতে আমাতে হরিহর বনে যেতুম। থাক্ সে-কথা; এখন বলো, তোমার কৈফিয়তটা কী? কেন আমাকে সরিয়ে রাখলে?"

"একটা সোজা কথা কেন তুমি মনে রাখ না যে, তোমার চেয়ে আমি বয়সে বড়ো?"

"কারণ এই সোজা কথাটা ভুলতে পারি নি যে, তোমার বয়স আটাশ, আমার বয়স আটাশ পেরিয়ে কয়েক মাস। প্রমাণ করা খুব সহজ, কারণ দলিলটা তাম্রশাসনে ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা নয়।"

"আমার আটাশ তোমার আটাশকে বহুদূরে পেরিয়ে গেছে। তোমার আটাশে যৌবনের সব সলতেই নির্ধূম জ্বলছে। এখনো তোমার জানলা খোলা যাদের দিকে, তারা অনাগত তারা অভাবিত।"

"এলী, আমার কথাটা কিছুতে বুঝতে চাচ্ছ না বলেই বুঝছ না। দলের কাছে ভগবানের সত্যের বিরুদ্ধে সত্য নিয়েছ, তাই নানা তর্ক বানিয়ে নিজেকে ভোলাচ্ছ, আমাকেও। ভোলাও কিন্তু এ-কথা বোলো না আমার জীবনে এখনো অনাগত অভাবিত দূরে রয়ে গেছে। এসেছে সে, সে তুমি। তবুও আজও সে অনাগত। চিরদিনই কি তবে জানলা খোলা থাকবে তার দিকে? সেই শূন্যের ভিতর দিয়ে কেবলই বাজবে আমার আর্ত সুর, চাই তোমাকে চাই, আর অন্য দিক দিয়ে ফিরে আসবে না কোনো উত্তর?"

"ফিরে আসছে না, এমন কথা বলছ কী করে অকৃতজ্ঞ ? চাই, চাই, চাই, তোমার চেয়ে বেশি কিছুই চাই নে এ জগতে। যে সময়ে দেখা হলে শুভদৃষ্টি সম্পূর্ণ হত সে সময়ে হয় নি যে দেখা। কিন্তু তবু বলছি ভাগ্যে হয় নি।"

"কেন ? কী ক্ষতি হত তাতে ?"

"আমার জীবন সার্থক হত, কতটুকুই বা তার দাম। কারও মতো নও যে তুমি ; মস্ত তুমি তফাতে আছি বলেই দেখতে পেলুম সেই তোমার অলোকসামান্য প্রকাশ। সামান্য আমাকে দিয়ে তোমাকে জড়িয়ে ফেলবার কথা কল্পনা করতে আমার ভয় করে। আমার ছোটো সংসারে প্রতিদিনের তুচ্ছতার মানুষ হবে তুমি ! আমি কত উপরে মুখ তুলে তোমার মাথা দেখতে পাই তোমাকে বোঝাব কেমন করে ? মেয়েদের সম্বল জীবনের যত সব খুঁটিনাটি, সেই বোঝা দিয়ে তোমাদের মতো পুরুষের জীবনকেও চাপা দিতে ভয় পায় না এমন মেয়ে হয়তো আছে ; তারা ট্রাজেডি ঘটিয়েছে কত আমি তা জানি। চোখের সামনে দেখছি লতার জালে বনস্পতিকে বাড়তে দিল না ; সেই মেয়েরা বুঝি মনে করে তাদের জড়িয়ে ধরাই যথেষ্ট।"

"এলা, যে পায় সেই জানে যথেষ্ট কাকে বলে।"

"নিজেকে ভোলাতে চাই নে, অন্তু। প্রকৃতি আমাদের আজন্ম অপমান করেছে। আমরা বায়োলজির সংকল্প বহন করে এসেছি জগতে। সঙ্গে সঙ্গে এনেছি জীবপ্রকৃতির নিজের জোগানো অস্ত্র ও মন্ত্র। সেগুলো ঠিকমত ব্যবহার করতে জানলেই সস্তায় আমরা জিতে নিতে পারি আমাদের সিংহাসন। সাধনার ক্ষেত্রে পুরুষকে প্রমাণ করতে হয় তার শ্রেষ্ঠতা। সেই শ্রেষ্ঠতা যে কী, ভাগ্যক্রমে আমি তা জানবার সুযোগ পেয়েছি। পুরুষরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো।"

"মাথায় বড়ো।"

"হাঁ মাথায় বড়োই তো। প্রকৃতিকে অতিক্রম করে বড়ো হবার তোরণদ্বার সেই মাথায়। আমার বুদ্ধিসুদ্ধি যথেষ্ট থাক্ না-থাক্, আমি নম্র হয়ে নিজেকে নিবেদন করতে পেরেছি সেই উপরের দিকে চেয়ে।"

"কোনো নীচ উৎপাত করে নি ?"

করেছে। আমাদের টানে যারা নেমে আসে বায়োলজির নীচের তলায়, তারা বিশ্রী হয়ে বিগড়ে যায়। ব্যক্তিগত বিশেষ ইচ্ছে বা প্রয়োজন না থাকলেও নীচে টেনে আনবার একটা সাধারণ ষড়যন্ত্রে আমরা সমস্ত মেয়ে এক হয়ে যোগ দিয়েছি, সাজে সজ্জায় হাবেভাবে বানানো কথায়।"

"বোকাদের ভোলাবার জন্যে ?"

"হাঁ গো, তোমরা বোকা ! অতি সহজ মন্ত্রেই ভোল, তাই আমাদের এত গুমর। আমরা বোকাদের ভালোবেসেছি, তবু তাদের স্থূল বোকামির সর্বোচ্চ শিখরে দেখেছি সূর্যোদয়, আলো এনেছে তারা, পূজা করেছি তখন। অনেক দেখেছি ইতর নোংরা নিন্দুক, অনেক দেখেছি কৃপণ কুৎসিত। সব বাদ দিয়ে সব মেনে নিয়ে তবু অনেক বাকি থাকে। সেই বাকিদেরই দেখেছি উজ্জ্বল আলোয়। তাদের অনেকের নাম থাকবে না কারও মনে, তবু তারা বড়ো।"

"এলী, তোমার কথা শুনে লজ্জা করছে, মনে হচ্ছে একটা প্রতিবাদ না করলে ভালো শোনাবে না। তবু ভালোও লাগছে। কিন্তু সত্য কথায় তোমার কাছে হার মানতে পারব না। আমাদের দেশের পুরুষদের যে কাপুরুষতার লক্ষণ ছেলেবেলা থেকে দেখেছি, যার কথা আমাকে বার বার ভাবিয়েছে, সে আমি আজ তোমার কাছে বলব। আমি দেখেছি আমার জানা পরিবারের মধ্যে এবং আমার নিজের পরিবারেরও শাশুড়ির অসহ্য অন্যায় আধিপত্য। শাশুড়ির অত্যাচারের কথা চিরকাল এদেশে প্রচলিত।"

"হাঁ সে তো জানি। নিজের ঘরে দেখেছি, যে-মানুষ হাড়ে দুর্বল, দুর্বলের যম সে— তার মতো নিষ্ঠুর কেউ হতে পারে না।"

"এলা, ও-কথা বলে তুমি তোমার ভাবী শাশুড়ির নিন্দার ভূমিকা করে রেখো না। নববধূর 'পরে

অমানুষিক অত্যাচারের খবর প্রায় শুনতে পাই, আর দেখি তার প্রধান নায়িকা শাশুড়ি। কিন্তু শাশুড়িকে অপ্রতিহত অন্যায় করবার অধিকার দিয়েছে কে? সে তো ঐ মায়ের খোকারা। অত্যাচারিণীর বিরুদ্ধে নিজের স্ত্রীর সম্ভ্রম রাখবার শক্তি নেই যাদের সেই নাবালকদের কখনোই কি বিয়ে করবার বয়স হয়? যখন হয় তখন তারা স্ত্রীর খোকা হয়ে ওঠে। যেখানে পুরুষের পৌরুষ দুর্বল সেখানেই মেয়েরা নেবে আসে আর নাবায় নীচতার দিকে। আজ দেখি আমাদের দেশে যারা বড়ো, কিছু করবার সংকল্প করে তারা মেয়েকে ত্যাগ করতে চায়— মেয়েকে ভয় করে সেই স্ত্রৈণ কাপুরুষেরা। সেইজন্যেই এই কাপুরুষের দেশে তুমি পণ করেছ বিয়ে করবে না, পাছে কোনো কচি মন বেঁকে যায় তোমার মেয়েলি প্রভাবে। যথার্থ পুরুষ যারা তারা যথার্থ মেয়ের জোরেই চরিতার্থ হবে— বিধাতার নিজের হাতের এই হুকুমনামা আছে আমাদের রক্তে। যে সেই বিধিলিপিকে ব্যর্থ করে সে পুরুষ নামের যোগ্য নয়। পরীক্ষার ভার ছিল তোমার হাতে, আমাকে পরীক্ষা করে দেখলে না কেন?"

"অন্তু, তর্ক করতে পারতুম কিন্তু তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। কেননা, জানি তুমি নিতান্ত ক্ষোভের মুখে এই-সব কুযুক্তি পেড়েছ। আমার পণের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছ না।"

"না ভুলতে পারব না। তুমি বললে কি না, পুরুষেরা মস্ত বড়ো, মেয়েরা তাদের ছোটো করবে এই তোমার ভয়! মেয়েদের বড়ো হবার দরকারই হয় না। তারা যতটুকু ততটুকুই সুসম্পূর্ণ। হতভাগা যে-পুরুষ বড়ো নয় সে অসম্পূর্ণ, তার জন্যে সৃষ্টিকর্তা লজ্জিত।"

"অন্তু, সেই অসম্পূর্ণের মধ্যেও আমরা বিধাতার ইচ্ছাটা দেখতে পাই— সেটা বড়ো ইচ্ছা।"

"এলী, বিধাতার ইচ্ছাটাই যে বড়ো তা বলতে পারি নে, তাঁর কল্পনাটাও কোনো অংশে ছোটো নয়। সেই কল্পনার তুলির ছোঁওয়ায় জাদু লেগেছে মেয়েদের প্রকৃতিতে, তারা সংসারের ক্ষেত্রে এনেছে আর্টিস্টের সাধনা, রঙে সুরে আপন দেহে মনে প্রাণে অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করছে। এটা সহজ শক্তির কর্ম, সেইজন্যেই এটা সহজ নয়। ঐ যে তোমার শাঁখের মতো চিকন রঙের কণ্ঠে সোনার হারটি দেখা দিয়েছে ওর জন্যে তোমাকে নোটবই মুখস্থ করতে হয় নি। আপনার জীবনলোকে রূপের সৃষ্টিতে রস জোগাতে পারল না এমন হতভাগিনী আছে, মোটা সোনার বালা পরে গিন্নীপনা করে সেই মুখরা; নয় তো দাসী হয়ে জীবন কাটায় উঠোন নিকিয়ে। সংসারে এইসব অকিঞ্চিৎকরের সীমাসংখ্যা নেই।"

"সৃষ্টিকর্তাকেই দোষ দেব অন্তু। লড়াই করবার শক্তি কেন দেন নি মেয়েদেব? বঞ্চনা করে কেন তাদের আপনাকে বাঁচাতে হয়? পৃথিবীতে সব-চেয়ে জঘন্য যে স্পাইয়ের ব্যাবসা সেই ব্যাবসাতে মেয়েদের নৈপুণ্য পুরুষের চেয়ে বেশি, এ-কথা যখন বইয়ে পড়লুম তখন বিধাতার পায়ে মাথা ঠুকে বলেছি, সাতজন্মে যেন মেয়ে হয়ে না জন্মাই। আমি মেয়ের চোখে দেখেছি পুরুষকে, তাই সব কাটিয়ে তাদের ভালোকে দেখতে পেয়েছি, তাদের বড়োকে। যখন দেশের কথা ভাবি তখন সেই-সব সোনার টুকরো ছেলেদের কথাই ভাবি, আমার দেশ তারাই। তারা ভুল যদি করে, খুব বড়ো করেই ভুল করে। আমার বুক ফেটে যায় যখন ভাবি আপন ঘরে এরা জায়গা পেল না। আমি ওদেরই মা, ওদেরই বোন, ওদেরই মেয়ে— এই কথা মনে করে বুক ভরে ওঠে আমার। নিজেকে সেবিকা বলতে ইংরেজি-পড়া মেয়েদের মুখে বাধে— কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয় বলে ওঠে আমি সেবিকা, তোমাদের সেবা করা আমার সার্থকতা। আমাদের ভালোবাসার চরম এই ভক্তিতে।"

"ভালোই তো; তোমার সেই ভক্তির জন্যে অনেক পুরুষ আছে, কিন্তু আমাকে কেন? ভক্তি না হলেও আমার চলবে। মেয়েদের সম্বন্ধের যে ফর্দটা তুমি দিলে, মা বোন মেয়ে, তার মধ্যে প্রধান একটা বাদ পড়ে গেল, আমারই কপালদোষে।"

"তোমার নিজের চেয়ে তোমাকে আমি বেশি জানি অন্তু। আমার আদরের ছোটো খাঁচায় দুদিনে তোমার ডানা উঠত ছটফটিয়ে। যে-তৃপ্তির সামান্য উপকরণ আমাদের হাতে, তার আয়োজন তোমার কাছে একদিন ঠেকত তলানিতে এসে। তখন জানতে পারতে আমি কতই গরিব। তাই আমার সমস্ত দাবি তুলে নিয়েছি, সম্পূর্ণমনে সঁপে দিয়েছি তোমাকে দেশের হাতে। সেখানে তোমার শক্তি

স্থান-সংকোচে দুঃখ পাবে না।"

অত্যন্ত ব্যথার জায়গায় যেন ঘা লাগল, জ্বলে উঠল অতীনের দুই চোখ। পায়চারি করে এল ঘরের এধার থেকে ওধারে। তার পরে এলার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে, "তোমাকে শক্ত কথা বলবার সময় এসেছে। জিজ্ঞাসা করি, দেশের কাছে হোক যার কাছেই হোক তুমি আমাকে সঁপে দেবার কে? তুমি সঁপে দিতে পারতে মাধুর্যের দান, যা তোমার যথার্থ আপন সামগ্রী। তাকে সেবা বলো তো তাই বলো, বরদান বলো যদি তাও বলতে পার ; অহংকার করতে যদি দাও তো করব অহংকার, নম্র হয়ে যদি আসতে বল দ্বারে তবে তাও আসতে পারি। কিন্তু তোমার আপন দানের অধিকারকে আজ দেখছ তুমি ছোটো করে। নারীর মহিমায় অন্তরের ঐশ্বর্য যা তুমি দিতে পারতে, তা সরিয়ে নিয়ে তুমি বলছ— দেশকে দিলে আমার হাতে। পার না দিতে, পার না, কেউ পারে না। দেশ নিয়ে এক হাত থেকে আর-এক হাতে নাড়ানাড়ি চলে না।"

বিবর্ণ হয়ে এল এলার মুখ। বললে, "কী বলছ, ভালো বুঝতে পারছি নে।"

"আমি বলছি নারীকে কেন্দ্র করে যে-মাধুর্যলোক বিস্তৃত, তার প্রসার যদি-বা দেখতে হয় ছোটো, অন্তরে তার গভীরতার সীমা নেই— সে খাঁচা নয়। কিন্তু দেশ উপাধি দিয়ে যার মধ্যে আমার বাসা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলে তোমাদের দলের বানানো দেশে— অন্যের পক্ষে যাই হোক আমার স্বভাবের পক্ষে সেই তো খাঁচা। আমার আপন শক্তি তার মধ্যে সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না বলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে, বিকৃতি ঘটে তার, যা তার যথার্থ আপন নয় তাকেই ব্যক্ত করতে গিয়ে পাগলামি করে, লজ্জা পাই, অথচ বেরোবার দরজা বন্ধ। জান না, আমার ডানা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, দুই পায়ে আঁট হয়ে লেগেছে বেড়ি। আপন দেশে আপন স্থান নেবার দায় ছিল আপন শক্তিতেই, সে শক্তি আমার ছিল। কেন তুমি আমাকে সে কথা ভুলিয়ে দিলে?"

ক্লিষ্টকণ্ঠে এলা বললে, "তুমি ভুললে কেন, অন্তু?"

"ভোলাবার শক্তি তোমাদের অমোঘ, নইলে ভুলেছি বলে লজ্জা করতুম। আমি হাজারবার করে মানব যে, তুমি আমাকে ভোলাতে পার, যদি না ভুলতুম, সন্দেহ করতুম আমার পৌরুষকে।"

"তাই যদি হয় তবে আমাকে ভর্ৎসনা করছ কেন?"

"কেন? সেই কথাটাই বলছি। ভুলিয়ে তুমি সেইখানেই নিয়ে যাও যেখানে তোমার আপন বিশ্ব, আপন অধিকার। দলের লোকের কথার প্রতিধ্বনি করে বললে, জগতে একটিমাত্র কর্তব্যের পথ বেঁধে দিয়েছ তোমরা কজনে। তোমাদের সেই শানবাঁধানো সরকারি কর্তব্যপথে ঘুর খেয়ে কেবলই ঘুলিয়ে উঠছে আমার জীবনস্রোত।"

"সরকারি কর্তব্য?"

"হাঁ, তোমাদের স্বদেশী কর্তব্যের জগন্নাথের রথ। মন্ত্রদাতা বললেন, সকলে মিলে একখানা মোটা দড়ি কাঁধে নিয়ে টানতে থাকো দুই চক্ষু বুজে— এই একমাত্র কাজ। হাজার হাজার ছেলে কোমর বেঁধে ধরল দড়ি। কত পড়ল চাকার তলায়, কত হল চিরজন্মের মতো পঙ্গু। এমন সময় লাগল মন্ত্র উল্‌টোরথের যাত্রায়। ফিরল রথ। যাদের হাড় ভেঙেছে তাদের হাড় জোড়া লাগবে না, পঙ্গুর দলকে ঝাঁটিয়ে ফেললে পথের ধুলোর গাদায়। আপন শক্তির 'পরে বিশ্বাসকে গোড়াতেই এমনি করে ঘুচিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, সবাই সরকারি পুতুলের ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করতে দিতে স্পর্ধা করেই রাজি হল। সর্দারের দড়ির টানে সবাই যখন একই নাচ নাচতে শুরু করলে, আশ্চর্য হয়ে ভাবলে— একেই বলে শক্তির নাচ। নাচনওয়ালা যেই একটু আলগা দেয়, বাতিল হয়ে যায় হাজার হাজার মানুষ-পুতুল।"

"অন্তু, ওদের অনেকেই যে পাগলামি করে পা ফেলতে লাগল, তাল রাখতে পারলে না।"

"গোড়াতেই জানা উচিত ছিল মানুষ বেশিক্ষণ পুতুল-নাচ নাচতে পারে না। মানুষের স্বভাবকে হয়তো সংস্কার করতে পার, তাতে সময় লাগে। স্বভাবকে মেরে ফেলে মানুষকে পুতুল বানালে কাজ সহজ হয় মনে করা ভুল। মানুষকে আত্মশক্তির বৈচিত্র্যবান জীব মনে করলেই সত্য মনে করা হয়।

আমাকে সেই জীব বলে শ্রদ্ধা যদি করতে তা হলে আমাকে দলে তোমার টানতে না, বুকে টানতে।"

"অন্তু, গোড়াতেই কেন আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে না ? কেন আমাকে অপরাধী করলে !"

"সে তো তোমাকে বার বার বলেছি। তোমার সঙ্গে মিলতে চেয়েছিলুম এইটে অত্যন্ত সহজ কথা। দুর্জয় সেই লোভ। প্রচলিত পথটা ছিল বন্ধ। মরিয়া হয়ে জীবন পণ করলুম বাঁকা পথে। তুমি মুগ্ধ হলে। আজ জেনেছি আমাকে মরতে হবে এই রাস্তায়। সেই মরাটা চুকে গেলে তুমি আমাকে দু-হাত বাড়িয়ে ফিরে ডাকবে— ডাকবে তোমার শূন্য বুকের কাছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত।"

"পায়ে পড়ি, অমন করে বোলো না।"

"বোকার মতো বলছি, রোমান্টিক শোনাচ্ছে। যেন দেহহীন বস্তুহীন পাওয়াকে পাওয়া বলে ! যেন তোমার সেদিনকার বিরহ আজকের দিনের প্রতিহত মিলনের এক কড়াও দাম শোধ করতে পারে !"

"আজ তোমাকে কথায় পেয়েছে, অন্তু।"

"কী বলছ ! আজ পেয়েছে ! চিরকাল পেয়েছে। যখন আমার বয়স অল্প, ভালো করে মুখ ফোটে নি, তখন সেই মৌনের অন্ধকারের ভিতর থেকে কথা ফুটে ফুটে উঠছিল, কত উপমা কত তুলনা কত অসংলগ্ন বাণী। বয়স হল, সাহিত্যালোকে প্রবেশ করলুম, দেখলুম ইতিহাসের পথে পথে রাজ্যসাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপ, দেখলুম বীরের রণসজ্জা পড়ে আছে ভেঙে, বিদীর্ণ জয়স্তম্ভের ফাটলে উঠেছে অশথগাছ ; বহু শতাব্দীর বহু প্রয়াস ধুলার স্তূপে স্তব্ধ। কালের সেই আবর্জনারাশির সর্বোচ্চে দেখলুম অটল বাণীর সিংহাসন। সেই সিংহাসনের পায়ের কাছে যুগযুগান্তরের তরঙ্গ পড়ছে লুটিয়ে লুটিয়ে। কতদিন কল্পনা করেছি সেই সিংহাসনের সোনার স্তম্ভে অলংকার রচনা করবার ভার নিয়ে এসেছি আমিও। তোমার অন্তু চিরদিন কথায়-পাওয়া মানুষ। তাকে কোনোদিন ঠিকমত চিনবে সে আশা আর রইল না— তাকে কি না ভরতি করে নিলে দলের শতরঞ্চ খেলায় বোড়ের মধ্যে !"

এলা চৌকি থেকে নেমে পড়ে অতীনের পায়ের উপর মাথা রাখলে। অতীন তাকে টেনে তুলে পাশে বসালে। বললে, "তোমার এই ছিপছিপে দেহখানিকে কথা দিয়ে দিয়েই মনে মনে সাজিয়েছি, তুমি আমার সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা, তুমি আমার সুখস্মিতি বা দুঃখস্মিতি বা। আমার চারি দিকে আছে অদৃশ্য আবরণ, বাণীর আবরণ, সাহিত্যের অমরাবতী থেকে নেমে এসে ভিড় ঠেকিয়ে রাখে তারা। আমি চিরস্বতন্ত্র, সে-কথা জানেন তোমাদের মাস্টারমশায়, তবু আমাকে বিশ্বাস করেন কেন ?"

"সেইজন্যেই বিশ্বাস করেন। সবার সঙ্গে মিলতে হলে সবার মধ্যে নাবতে হয় তোমাকে। তুমি কিছুতেই নাবতে পার না। তোমার 'পরে আমার বিশ্বাস সেইজন্যেই। কোনো মেয়ে কোনো পুরুষকে এত বিশ্বাস করতে পারে নি। তুমি যদি সাধারণ পুরুষ হতে তা হলে সাধারণ মেয়ের মতোই আমি তোমাকে ভয় করতুম। নির্ভয় তোমার সঙ্গ।"

"ধিক সেই নির্ভয়কে। ভয় করলেই পুরুষকে উপলব্ধি করতে। দেশের জন্যে দুঃসাহস দাবি কর, তোমার মতো মহীয়সীর জন্যে করবে না কেন ? কাপুরুষ আমি। অসম্মতির নিষেধ ভেদ করে কেন তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারি নি বহুপূর্বে যখন সময় হাতে ছিল ? ভদ্রতা ! ভালোবাসা তো বর্বর ! তার বর্বরতা পাথর ঠেলে পথ করবার জন্যে। পাগলাঝোরা সে, ভদ্রশহরের পোষ-মানা কলের জল নয়।"

এলা দ্রুত উঠে পড়ে বললে, "চলো অন্তু, ঘরে চলো।"

অতীন উঠে দাঁড়াল, বললে, "ভয় ! এতদিন পরে শুরু হল ভয় ! জিত হল আমার। যৌবন যখন প্রথম এসেছিল তখনো মেয়েদের চিনি নি। কল্পনায় তাদের দুর্গম দূরে রেখে দেখেছি ; প্রমাণ করবার সময় বলে গেল যে, তোমরা যা চাও তাই আমি। অন্তরে আমি পুরুষ, আমি বর্বর উদ্দাম। সময় যদি না হারাতুম এখনই তোমাকে বজ্রবন্ধনে চেপে ধরতুম, তোমার পাঁজরের হাড় টনটন করে উঠত ; তোমাকে ভাববার সময় দিতুম না, কাঁদবার মতো নিশ্বাস তোমার বাকি থাকত না, নিষ্ঠুরের মতো টেনে

নিয়ে যেতুম আপন কক্ষপথে। আজ যে-পথে এসে পড়েছি এ-পথ ক্ষুরধারার মতো সংকীর্ণ, এখানে দুজনে পাশাপাশি চলবার জায়গা নেই।"

"দস্যু আমার, কেড়ে নিতে হবে না গো, নাও, এই নাও, এই নাও।" এই বলে দু-হাত বাড়িয়ে গেল অতীনের কাছে, চোখ বুজে তার বুকের উপর পড়ে তার মুখের দিকে মুখ তুলে ধরলে।

জানালা থেকে এলা রাস্তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, "সর্বনাশ! ঐ দেখতে পাচ্ছ?"

"কী বলো দেখি?"

"ঐ যে রাস্তার মোড়ে। নিশ্চয় বটু— এখানেই আসছে।"

"আসবার যোগ্য জায়গা সে চেনে।"

"ওকে দেখলে আমার সমস্ত শরীর সংকুচিত হয়ে ওঠে। ওর স্বভাবে অনেকখানি মাংস, অনেকখানি ক্লেদ। যত চেষ্টা করি পাশ কাটিয়ে চলতে, ওকে দূরে ঠেকিয়ে রাখতে, ততই ও কাছে এসে পড়ে। অশুচি, অশুচি ঐ মানুষটা।"

"আমি ওকে সহ্য করতে পারি নে এলা।"

"ওর সম্বন্ধে অন্যায় কল্পনা করছি বলে নিজেকে শান্ত করবার অনেক চেষ্টা করি— কোনোমতেই পারি নে। ওর ড্যাবা ড্যাবা চোখ দুটো দূরের থেকে লালায়িত স্পর্শে যেন আমার অপমান করে।"

"ওর প্রতি ভ্রূক্ষেপ কোরো না এলা। মনে মনে ওর অস্তিত্বকে একেবারে উপেক্ষা করতে পার না?"

"ওকে ভয় করি বলেই মন থেকে সরাতে পারি নে। ওর একটা ভিতরকার চেহারা দেখতে পাই কুৎসিত অক্টোপাস জন্তুর মতো। মনে হয়, ও আপনার অন্তর থেকে আটটা চটচটে পা বের করে আমাকে একদিন অসম্মানে ঘিরে ফেলবে— কেবলই তারই চক্রান্ত করছে। একে তুমি আমার অবুঝ মেয়েলি আশঙ্কা বলে হেসে উড়িয়ে দিতে পার, কিন্তু এই ভয়টা ভূতে পাওয়ার মতো আমাকে পেয়েছে। শুধু আমার জন্যে নয়, তোমার জন্যে আমার আরো ভয় হয়, আমি জানি তোমার দিকে ওর ঈর্ষা সাপের ফণার মতো ফোঁস ফোঁস করছে।"

"এলা, ওর মতো জন্তুদের সাহস নেই, আছে দুর্গন্ধ, তাই কেউ ওদের ঘাঁটাতে চায় না। কিন্তু আমাকে ও সর্বান্তঃকরণে ভয় করে, আমি ভয়ংকর বলে যে তা নয়, আমি ওর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রজাতীয় বলে।"

"দেখো অন্তু, জীবনে অনেক দুঃখবিপদের সম্ভাবনা আমি ভেবেছি, তার জন্যে প্রস্তুতও আছি কিন্তু একদিন কোনো দুর্যোগে যেন ওর কবলে না পড়ি, তার চেয়ে মৃত্যু ভালো।" অন্তুর হাত চেপে ধরলে, যেন এখনই উদ্ধার করবার সময় হয়েছে।

"জানো অন্তু, হিংস্র জন্তুর হাতে অপমৃত্যুর কল্পনা কখনো কখনো মনে আসে, তখন দেবতাকে জানাই, বাঘে খায় ভালুকে খায় সেও ভালো, কিন্তু আমাকে পাঁকের মধ্যে টেনে নিয়ে কুমিরে খাবে— এ যেন কিছুতে না ঘটে।"

"আমি কি বাঘভালুকের কোঠায় না কি?"

"না গো, তুমি আমার নরসিংহ, তোমার হাতে মরণেই আমার মুক্তি। ঐ শোনো পায়ের শব্দ উপরে উঠে এল বলে।"

অতীন্দ্র ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে জোর গলায় বললে, "বটু, এখানে নয়, চলো নীচে বসবার ঘরে।"

বটু বললে, "এলাদি—"

"এলাদি এখন কাপড় ছাড়তে গেলেন, চলো নীচে।"

"কাপড় ছাড়তে? এত দেরিতে? সাড়ে আটটা—"

"হাঁ হাঁ, আমিই দেরি করিয়ে দিয়েছি।"

"কেবল একটা কথা। পাঁচ মিনিট।"

"তিনি স্নানের ঘরে গেছেন। বলে গেছেন, এ ঘরে কেউ আসে তাঁর ইচ্ছে নয়।"

"আপনি ?"

"আমি ছাড়া।"

বটু খুব স্পষ্ট একটা ঠোঁটবাঁকা হাসি হাসলে। বললে, "আমরা চিরকাল রইলুম ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মে, আর আপনি দুদিন এসেই উঠে পড়েছেন, আর্ষপ্রয়োগে। এক্‌সেপশন পিছল পথের আশ্রয়, বেশিকাল সয় না বলে রেখে দিলুম।" বলে তর তর করে নেবে চলে গেল।

ছোটো একটা করাত হাতে দোলাতে দোলাতে অখিল এসে বললে, "চিঠি।" ওর অসমাপ্ত সৃষ্টিকাজের মাঝখান থেকে উঠে এসেছে।

"তোমার দিদিমণির ?"

"না আপনার। আপনারই হাতে দিতে বললে।"

"কে ?"

"চিনি নে।" বলেই চিঠিখানা দিয়ে চলে গেল। চিঠির কাগজের লাল রঙ দেখেই অতীন বুঝলে, এটা ডেন্‌জর সিগ্‌ন্যাল। গোপন ভাষায় লেখা চিঠি পড়ে দেখলে— "এলার বাড়িতে আর নয়, তাকে কিছু না জানিয়ে এই মুহূর্তে চলে এসো।"

কর্মের যে শাসন স্বীকার করে নিয়েছে তাকে অসম্মান করাকে অতীন আত্মসম্মানের বিরুদ্ধ বলেই জানে। চিঠিখানা যথারীতি কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেললে। মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল রুদ্ধ নাবার ঘরের বাইরে। পরক্ষণে দ্রুতবেগে গেল বেরিয়ে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে একবার দোতলার দিকে তাকালে। জানলা খোলা, বাইরে থেকে দেখা যায় আরামকেদারার একটা অংশ, আর তার সঙ্গে সংলগ্ন লালেতে হলদেতে ডোরা-কাটা চৌকো বালিশের এক কোণা। লাফ দিয়ে অতীন চলতি ট্রামগাড়িতে চড়ে গেল।

তৃতীয় অধ্যায়

গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি ফিকে-সবুজ গাঢ়-সবুজ হলদে-সবুজ ব্রাউন-সবুজ রঙের গুল্মে বনস্পতিতে জড়িত নিবিড়তা, বাঁশপাতা-পচা পাঁকের স্তরে ভরে ওঠা ডোবা ; তারই পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা গলি গোরুরগাড়ির চাকায় বিক্ষত। ওল, কচু, ঘেঁটু, মনসা, মাঝে মাঝে আস্‌শেওড়ার বেড়া। ক্বচিৎ ফাঁকের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় আল দিয়ে বাঁধা কচি ধানের খেতে জল দাঁড়িয়েছে। গলি শেষ হয়েছে গঙ্গার ঘাটে। সেকালের ছোটো ছোটো ইঁট দিয়ে গাঁথা ভাঙা ফাটা ঘাট কাত হয়ে পড়েছে, তলায় চর পড়ে গঙ্গা গেছে সরে, কিছুদূরে তীরে ঘাট পেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে একটা পুরোনো ভাঙা বাড়ির অভিশপ্ত ছায়ায় দেড়শ বছর আগেকার মাতৃহত্যাপাতকীর ভূত আশ্রয় নিয়েছে বলে জনপ্রবাদ। অনেককাল কোনো সজীব স্বত্বাধিকারী সেই অশরীরীর বিরুদ্ধে আপন দাবি স্থাপনের চেষ্টামাত্র করে নি। দৃশ্যটা এইখানকার পরিত্যক্ত পুরোনো পুজোর দালান, তার সামনে শেওলা-পড়া এবড়োখেবড়ো প্রশস্ত আঙিনা। কিছুদূরে নদীর ধারে ভেঙে-পড়া দেউল, ভাঙা রাসমঞ্চ, প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ, ডাঙায় তোলা পাঁজর বের-করা ভাঙা নৌকো ঝুরি-নামা বটগাছের অন্ধকার তলায়।

এইখানে দিনের শেষ প্রহরে অতীনের বর্তমান বাসস্থানে ছায়াচ্ছন্ন দালানে প্রবেশ করল কানাই গুপ্ত। চমকে উঠল অতীন, কেননা এখানকার ঠিকানা কানাইয়েরও জানবার কথা ছিল না।

"আপনি যে!"

কানাই বললে, "গোয়েন্দাগিরিতে বেরিয়েছি।"

"ঠাট্টাটা বুঝিয়ে দেবেন।"

"ঠাট্টা নয়। আমি তোমাদের রসদ-জোগানদারদের সামান্য একজন। চায়ের দোকানে শনি প্রবেশ করলে, বেরিয়ে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে চলল ওদের কুদৃষ্টি। শেষকালে ওদেরই গোয়েন্দার খাতায় নাম লিখিয়ে এলুম। নিমতলা ঘাটের রাস্তা ছাড়া কোনো রাস্তা নেই যাদের সামনে, তাদের পক্ষে এটা গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড, দেশের বুকের উপর দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বরাবর লম্বমান।"

"চা বানানো ছেড়ে খবর বানাচ্ছেন?"

"বানালে এ ব্যাবসা চলে না। বিশুদ্ধ খাঁটি খবরই দিতে হয়। যে-শিকার জালে পড়েইছে আমি তার ফাঁস টেনে দিই। তোমাদের হরেনের সাড়ে পনেরো আনা খবর ওদের কাছে পৌঁছোল, শেষ বাহুল্য খবরটা আমি দিয়েছি। সে এখন জলপাইগুড়িতে সরকারি ধর্মশালায়।"

"এবার বুঝি আমার পালা?"

"ঘনিয়ে এসেছে। কাজ অনেকখানি এগিয়ে এনেছে বটু। আমার অংশে যেটুকু পড়ল তাতে কিছু সময় পাবে। সাবেক বাসায় থাকতে হঠাৎ তোমার ডায়ারি হারিয়েছিল। মনে আছে?"

"খুব মনে আছে।"

"সেটা পুলিসের হাতে নিশ্চিত পড়ত, কাজেই আমাকেই চুরি করতে হল।"

"আপনি?"

"হাঁ, সাধু যার সংকল্প ভগবান তার সহায়। একদিন সেটা লিখছিলে, আমারই কৌশলে সরে গেলে পাঁচ মিনিটের জন্যে। সেই সময়ে সরিয়েছি।"

অতীন মাথায় হাত দিয়ে বললে, "সবটা পড়েছেন?"

"নিশ্চিত পড়েছি। পড়তে পড়তে রাত হয়ে গেল দেড়টা। বাংলা ভাষায় এত তেজ এত রস তা আগে জানতুম না। ওর মধ্যে গোপনীয় কথা আছে বৈকি। কিন্তু সেটা ব্রিটিশসাম্রাজ্য সম্পর্কে নয়।"

"কাজটা কি ভালো করেছেন?"

"কত ভালো করেছি তা বলতে পারি নে। তুমি সাহিত্যিক, তুমি সমস্ত খাতায় খুঁটিনাটি কথা কিছু লেখ নি, কারও নাম পর্যন্ত নেই। কেবল ভাবের দিক থেকে এত ঘৃণা এত অশ্রদ্ধা যে, তা কোনো

পেনশনভোগী মন্ত্রিপদপ্রার্থীর কলম দিয়ে বেরোলে রাজদরবারে তার মোক্ষলাভ হত। বটু যদি তোমার সঙ্গে না লাগত তা হলে ঐ খাতাখানাই তোমার গ্রহস্বস্ত্যয়নের কাজ করত।"

"বলেন কী? সবটাই পড়েছেন?"

"পড়েছি বৈকি। কী বলব বাবাজি, আমার যদি মেয়ে থাকত আর এমন লেখা যদি সে তোমার কলম থেকে বের করতে পারত তা হলে সার্থক মানতুম আপন পিতৃপদকে। সত্যি কথা বলি, তোমাকে দলে জড়িয়ে ইন্দ্রনাথ ভায়া দেশের লোকসান করেছেন।"

"আপনার এই ব্যাবসার কথা দলের সবাই জানে?"

"কেউ না।"

"মাস্টারমশায়?"

"বুদ্ধিমান, আন্দাজ করতে পারেন কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসাও করেন নি, শোনেন নি আমার মুখ থেকে।"

"আমাকে বললেন যে!"

"এইটেই আশ্চর্য কথা। আমার মতো সন্দেহজীবী মানুষ কাউকে যদি বিশ্বাস না করতে পারে তা হলে দম আটকে মরে। আমি ভাবুক নই, বোকাও নই, তাই ডায়ারি রাখি নি, যদি রাখতুম তোমার হাতে দিতে পারলে মন খোলসা হত।"

"মাস্টারমশায়—"

"মাস্টারমশায়ের কাছে খবর দেওয়া চলে কিন্তু মন খোলা চলে না। ইন্দ্রনাথের প্রধান মন্ত্রী আমি, কিন্তু তার সব কথা আমি যে জানি তা মনেও কোরো না। এমন কথা আছে যা আন্দাজ করতেও সাহস হয় না। আমার বিশ্বাস, আমাদের দলের যারা আপনি ঝরে পড়ে, ইন্দ্রনাথ আমার মতোই তাদের ঝেঁটিয়ে ফেলে পুলিসের পাঁশতলায়। কাজটা গর্হিত কিন্তু নিষ্পাপ। বলে রাখছি, একদিন ওরই বা আমারই সাহায্যে তোমার হাতে শেষ হাতকড়ি পড়বে, তখন কিছু মনে কোরো না যেন। তোমার এ-বাড়িতে আসার খবর বটুই প্রথম থানার কানাকানি-বিভাগে জানিয়েছে। কাজেই আমাকে টেক্কা দিতে হল, ফোটোগ্রাফ তুলে ওদের কাছে দিয়েছি। এখন কাজের কথা বলি। চব্বিশ ঘণ্টা তোমাকে সময় দিচ্ছি, তার পরেও যদি এখানে থাক তা হলে আমিই তোমাকে থানার পথে এগিয়ে দেব। এখান থেকে কোথায় যেতে হবে সবিস্তারে তার রাস্তাঘাট এই লিখে দিয়েছি— এর অক্ষর তোমার জানা আছে, তবু মুখস্থ করেই ছিঁড়ে ফেলো। এই দেখো ম্যাপ। রাস্তার এপাশে তোমার বাসা, ইস্কুলবাড়ির কোণের ঘরে। ঠিক সামনে পুলিসের থানা। সেখানে আছে আমার কোনো এক সম্পর্কে নাতি, রাইটর কনস্টেবল, তাকে রাঘব বোয়াল বলি। তিনপুরুষে পশ্চিমে বাস। বাংলা পড়াবার মাস্টারি পেয়েছ তুমি। সেখানে গেলেই রাঘব তোমার তোরঙ্গ ঘাঁটবে, পকেট ঝাড়া দেবে, গুতোগাঁতাও দিতে পারে। সেইটেকেই ভগবানের দয়া বলে মনে কোরো। বাঙালি মাত্রই যে শ্যালকসম্প্রদায়ভুক্ত এই তত্ত্বটি রঘুবীরের হিন্দিভাষায় সর্বদাই প্রকাশ পেয়ে থাকে। তুমি তার কোনোপ্রকার রূঢ় প্রতিবাদের চেষ্টামাত্র কোরো না, প্রাণ থাকতে এদেশে ফিরে এসো না! বাইসিক্‌লটা রইল বাইরে। ইশারা যখনই পাবে সেই মুহূর্তে চড়ে বোসো। এসো বাবাজি, শেষ দিনের মতো কোলাকুলি করে নিই।" কোলাকুলি হয়ে গেলে চলে গেল কানাই।

অতীন চুপ করে বসে রইল। তাকিয়ে দেখতে লাগল অন্তরের দিকে। অকালে এসে পড়ল তার জীবনের শেষ অঙ্ক, যবনিকা আসন্নপতনমুখী, দীপ নিবে এসেছে। যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল নির্মল ভোরের আলোয়; সেখান থেকে আজ অনেক দূরে এসে পড়েছে। পথে পা বাড়াবার সময় যে পাথেয় হাতে ছিল তার কিছুই বাকি নেই; পথের শেষভাগে নিজেকে কেবলই ঠকিয়ে খেয়েছে; একদিন হঠাৎ পথের একটা বাঁকের মুখে সৌন্দর্যের যে আশ্চর্য দান নিয়ে ভাগ্যলক্ষ্মী তার সামনে দাঁড়িয়েছিল সে যেন অলৌকিক; তেমন অপরিসীম ঐশ্বর্য প্রত্যক্ষ হবে ওর জীবনে, সে-কথা এর আগে ও কখনোই সম্ভব বলে ভাবতে পারে নি, কেবল তার কল্পরূপ দেখেছে কাব্যে ইতিহাসে;

বারেবারে মনে হয়েছে দান্তে বিয়াত্রিচে নূতন জন্ম নিল ওদের দুজনের মধ্যে। সেই ঐতিহাসিক প্রেরণা ওর মনের ভিতরে কথা কয়েছে, দান্তের মতোই রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের আবর্তের মধ্যে অতীন পড়েছিল ঝাঁপ দিয়ে, কিন্তু তার সত্য কোথায়, বীর্য কোথায়, গৌরব কোথায়, দেখতে দেখতে অনিবার্য বেগে যে পাঁকের মধ্যে ওকে টেনে নিয়ে এল সেই মুখোশপরা চুরিডাকাতি-খুনোখুনির অন্ধকারে ইতিহাসের আলোকস্তম্ভ কখনো উঠবে না। আত্মার সর্বনাশ ঘটিয়ে অবশেষে আজ সে দেখছে কোনো যথার্থ ফল নেই এতে, নিঃসংশয় পরাভব সামনে। পরাভবেরও মূল্য আছে কিন্তু আত্মার পরাভবের নয়, যে পরাভব টেনে আনল গোপনচারী বীভৎস বিভীষিকায়, যার অর্থ নেই, যার অন্ত নেই।

দিনের আলো ম্লান হয়ে এল। ঝিঁঝি পোকার ডাক উঠেছে প্রাঙ্গণে, কোথায় গোরুর গাড়ি চলেছে তার আর্তস্বর শোনা যায়।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে দ্রুতপদে এসে পড়ল এলা, আত্মহত্যার জন্যে একঝোঁকে মানুষ জলে পড়ে যেমন ভাবে তেমনি আলুথালু অন্ধবেগে। অতীন লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠতেই তার বুকের উপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলতে লাগল, "অতীন, অতীন, পারলুম না থাকতে।"

অতীন ধীরে ধীরে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে সামনে সরিয়ে ধরে ওর অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বললে, "এলী, কী কাণ্ড করলে তুমি ?"

সে বললে, "কিছু জানি নে, কী করেছি।"

"এ ঠিকানা কেমন করে জানলে ?"

এলা গম্ভীর অভিমানে বললে, "তোমার ঠিকানা তুমি তো জানাও নি।"

"যে তোমাকে জানিয়েছে সে তোমার বন্ধু নয়।"

"তাও আমি নিশ্চিত জানি কিন্তু তোমার কোনো পথ না জানতে পারলে শূন্যে শূন্যে মন ঘুরে বেড়ায়, অসহ্য হয়ে ওঠে। শত্রুমিত্র বিচার করবার মতো অবস্থা আমার নয়। কতকাল তোমাকে দেখি নি বলো দেখি ?"

"ধন্য তুমি !"

"তুমি ধন্য অন্তু ! যেমনি আমার বাড়িতে আসা নিষেধ হল অমনি সেটা তো মেনে নিতে পারলে !"

"ওটা আমার স্বাভাবিক স্পর্ধা। প্রচণ্ড ইচ্ছে আমাকে অজগর সাপের মতো দিনরাত পাক দিয়ে দিয়ে পিষেছিল তবু তাকে মানতে পারলুম না। ওরা আমাকে বলে সেন্টিমেন্টাল, মনে ঠিক করে রেখেছিল সংকটের সময় প্রমাণ হবে আমি ভিজে মাটিতেই তৈরি। ওরা ভাবতেই পারে না সেন্টিমেন্টেই আমার অমোঘশক্তি।"

"মাস্টারমশায়ও তা জানেন।"

"এলী, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এই ভুতুড়ে পাড়া সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালি ভদ্রমহিলা এই জায়গাটার স্বরূপ নির্ধারণ করে নি।"

"তার কারণ, বাংলাদেশের কোনো ভদ্রমহিলার অদৃষ্টে এতবড়ো গরজ এমন দুঃসহ হয়ে কোনোদিন প্রকাশ পায় নি।"

"কিন্তু এলী, আজ তুমি যে কাজ করলে সেটা অবৈধ।"

"জানি সে-কথা, মানব আমার দুর্বলতা, তবু ভাঙব নিয়ম, শুধু নিজের হয়ে না, তোমার হয়েও। প্রতিদিন আমার মন বলেছে তুমি ডাকছ আমাকে। সাড়া দিতে পারি নে বলে যে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। বলো, আমি এসেছি বলে খুশি হয়েছ !"

"এত খুশি হয়েছি যে তা প্রমাণ করবার জন্যে বিপদ স্বীকার করতে রাজি আছি।"

"না না, তোমার কেন হবে বিপদ ! যা হয় তা আমার হোক। তা হলে আমি যাই অন্তু।"

"কিছুতেই না। তুমি নিয়ম ভেঙে চলে এসেছ, আমি নিয়ম ভেঙে তোমাকে ধরে রাখব। দুজনে মিলে অপরাধ সমান করে নেওয়া যাক। নতুন বিস্ময়ের বসন্তী রঙে একদিন দেখেছিলুম তোমার ঐ

মুখ, সে আজ যুগান্তরে পিছিয়ে গেছে। আজ সেই দিনটিকে আবাহন করা যাক এই পোড়ো ঘরটার মধ্যে। এসো, আরো কাছে।"

"রোসো, ঘরটা একটুখানি গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করি।"

"হায় রে, টাকের মাথায় চিরুনি চালাবার চেষ্টা!"

এলা একবার চারি দিক ঘুরে দেখলে। মেঝের উপর কম্বল, তার উপর চাটাই। বালিশের বদলে বই দিয়ে ভরা একটা পুরানো ক্যাম্বিসের থলি। লেখাপড়া করবার জন্যে একখানা প্যাকবাক্স। কোণে জলের কলসি মাটির ভাঁড় দিয়ে ঢাকা। জীর্ণ চাঙারিতে একছড়া কলা, তার মধ্যে এনামেল উঠে-যাওয়া একখানা বাটি, দৈবাৎ সুযোগ ঘটলে চা খাওয়া চলে। ঘরের অন্য প্রান্তে একটা বড়ো চওড়া সিন্দুক, তার উপরে গণেশের একটি মাটির মূর্তি। তার থেকে প্রমাণ হয় এখানে অতীনের কোনো-এক দোসর আছে। এক থাম থেকে আর-এক থাম পর্যন্ত দড়ি খাটানো, তাতে নানা রঙের ছোপ লাগা অনেকগুলো ময়লা গামছা। স্যাঁতসেতে ঘরে শ্বাসরুদ্ধ আকাশের বাষ্পঘন গন্ধ।

ঠিক এমন না হোক এই জাতের দৃশ্য এলা দেখেছে মাঝে মাঝে। কখনো বিশেষ দুঃখ পায় নি, বরঞ্চ ত্যাগবীর ছেলেদেরকে মনে মনে বাহাদুরি দিয়েছে। একদা এক জঙ্গলের ধারে দেখেছিল অনিপুণ হাতে রান্নার চেষ্টায় পোড়ো চালের খড়-বাখারি জ্বালানো চুলোর ভস্মাবশেষ ; মনে হয়েছিল রাষ্ট্রবিপ্লবী রোমান্সের এ একটা অঙ্গারে-আঁকা ছবি। আজ কিন্তু কষ্টে ওর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। আরামের বাহুবেষ্টনে ঘেরা ধনীর ছেলেকে অবজ্ঞা করাই এলার অভ্যস্ত। কিন্তু অতীনকে এই অপরিচ্ছন্ন মলিন অভাবজীর্ণ অকিঞ্চনতার মধ্যে কিছুতে ওর মন মিশ খাওয়াতে পারে না।

এলার উদ্‌বিগ্ন মুখ দেখে অতীন হেসে উঠল, বললে, "আমার ঐশ্বর্য দেখছ স্তম্ভিত হয়ে, তার যে বিরাট অংশটা দেখা যাচ্ছে না, সেইটেতেই তুমি বিস্মিত। আমাদের পা খোলসা রাখতে হয়— দৌড় মারবার সময় মানুষও পিছু ডাকে না, জিনিসপত্রও না। কিছুদূরে পাটকলের মজুরদের বস্‌তি, তারা আমাকে মাস্টারবাবু বলে ডাকে। চিঠি পড়িয়ে নেয়, ঠিকানা লিখিয়ে নেয়, বুঝিয়ে নেয় দেনাপাওনার রসিদ ঠিক হল কি না। এদের কোনো কোনো সন্তানবৎসলাব শখ, ছেলেকে একদিন মজুরশ্রেণী থেকে হুজুরশ্রেণীতে ওঠাবে। আমার সাহায্য চায়, ফলফুলুরি দেয় এনে, কারও বা ঘরে গোরু আছে দুধ জুগিয়ে থাকে।"

"অন্তু, কোণে ঐ-যে সিন্দুক আছে ওটা কার সম্পত্তি?"

"অজায়গায় একলা থাকলেই বেশি করে চোখে পড়তে হয়। অলক্ষ্মীর ঝাঁটার মুখে রাস্তার থেকে এসে পড়েছে এই ঘরটাতে মাড়োয়ারি, তৃতীয় বারকার দেউলে। আমার সন্দেহ হচ্ছে দেউলে হওয়াই ওর সর্বপ্রধান ব্যাবসা। এই পোড়ো দালানটা ওর দুজন ভাইপোর ট্রেনিং অ্যাকাডেমি। তারা ভোরবেলায় ছাতু খেয়ে কাজ করতে আসে, বস্‌তির মেয়েদের জন্যে সস্তাদামের কাপড় রঙায়, বেচে মূলধনের সুদ দেয়, আসলেরও কিছু কিছু শোধ করে। ঐ যে মাটির গামলাগুলো দেখছ, ও আমি আমার যজ্ঞের রান্নায় ব্যবহার করি নে ; ওগুলোতে রঙ গোলা হয়। কাপড়গুলো তুলে রেখে যায় ঐ বাক্সের ভিতর, তা ছাড়া ওতে আছে বস্‌তির মেয়েদের প্রসাধনযোগ্য নানা জিনিস— বেলোয়ারি চুড়ি, চিরুনি, ছোটো আয়না, পিতলের বাজু। রক্ষা করবার ভার আমার উপর আর প্রেতাত্মার উপর। বেলা তিনটের সময় সওদা করতে বেরোয়, এখানে আর ফেরে না। কলকাতায় মাড়োয়ারি জানি নে কিসের দালালি করে। আমার ইংরেজি জানার লোভে আমাকে অংশীদার করতে চেয়েছিল; জীবের প্রতি দয়া করে রাজি হয় নি। আমার আর্থিক অবস্থারও সন্ধান নেবার চেষ্টা ছিল, বুঝিয়ে দিয়েছি পূর্বপুরুষের ঘরে যা ছিল মজুত আজ তারই চোদ্দো আনা ওদেরই পূর্বপুরুষের ঘরে জন্মান্তরিত।"

"এখানে তোমার মেয়াদ কতদিনের?"

"আন্দাজ করছি চব্বিশ ঘণ্টা। ঐ আঙিনায় রসে-বিগলিত নানা রঙের লীলা সমানে চলবে দিনের পর দিন, অতীন্দ্র বিলীন হয়ে যাবে পাণ্ডুবর্ণ দূরদিগন্তে। আমার ছোঁয়াচ লেগেছে যে-মাড়োয়ারিকে তাকে বেড়ি-পরা মহামারীতে না পায় এই আমি কামনা করি। এখনো বিনা মূলধনে আমার ভাগ্যভাগী

হবার সম্ভাবনা যে তার নেই তা বলতে পারি নে।"

"তোমার ভবিষ্যৎ ঠিকানাটা ?"

"হুকুম নেই বলবার।"

"তা হলে কি কল্পনাও করতে পারব না তুমি আছ কোথায় ?"

"কল্পনা করতে দোষ কী। মানস-সরোবরের তীরটা ভালো জায়গা।"

"ইতিমধ্যে ঝুলির ভিতর থেকে বইগুলো বের করে এলা উলটেপালটে দেখছে। কাব্য, তার কিছু ইংরেজি, আর দুই-একখানা বাংলা।

অতীন বললে, "এতদিন ওগুলো বয়ে বেড়িয়েছি পাছে নিজের জাত ভুলি। ওরই বাণীলোকে ছিল আমার আদি বসতি। পাতা খুললেই পেনসিলে চিহ্নিত তার রাস্তা-গলির নির্দেশ পাবে। আর আজ ; এই দেখো চেয়ে।"

এলা হঠাৎ মাটিতে লুটিয়ে অতীনের পা জড়িয়ে ধরলে ; বললে, "মাপ করো, অন্তু, আমাকে মাপ করো।"

"তোমাকে মাপ করবার কী আছে এলী ? ভগবান যদি থাকেন, তাঁর যদি থাকে অসীম দয়া, তবে তিনি যেন আমাকে মাপ করেন।"

"যখন তোমাকে চিনতুম না তখন তোমাকে এই রাস্তায় দাঁড় করিয়েছি।"

অতীন হেসে উঠে বললে, "নিজেরই পাগলামির ফুল-স্টীমে এই অস্থানে পৌঁচেছি সে খ্যাতিটুকুও দেবে না আমাকে ? আমাকে নাবালকের কোঠায় ফেলে অভিভাবকগিরি করতে এলে আমি সইব না বলে রাখছি। তার চেয়ে মঞ্চ থেকে নেবে এসো ; আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলো— এসো এসো বঁধু এসো, আধো আঁচরে বোসো।

"হয়তো বলতুম কিন্তু আজ তুমি এমন করে খেপে উঠলে কেন ?"

"খেপব না ? বললে কিনা ভুজমৃণালের জোরে তুমি আমাকে পথে বের করেছ !"

"সত্যি কথা বললে রাগ কর কেন ?"

"সত্যি কথা হল ? আমি ছিটকে পড়েছি রাস্তায় অন্তরের বেগে, তুমি উপলক্ষ মাত্র। অন্য কোনো শ্রেণীর বঙ্গমহিলাকে উপলক্ষ পেলে এতদিনে গোরা-কালা-সম্মিলনী ক্লাবে ব্রিজ খেলতে যেতুম, ঘোড়দৌড়ের মাঠে গবর্নরের বক্সের অভিমুখে স্বর্গারোহণপর্বের সাধনা করতুম। যদি প্রমাণ হয় আমি মূঢ়, তবে জাঁক করে বলব, সে মূঢ়তা স্বয়ং আমারই, যাকে বলে ভগবদ্দত্ত প্রতিভা।"

"অন্তু, দোহাই তোমার, আর বাজে বকুনি বোকো না। তোমার জীবিকা আমিই ভাসিয়ে দিয়েছি, এ দুঃখ কখনো ভুলতে পারব না। দেখতে পাচ্ছি তোমার জীবনের মূল গেছে ছিন্ন হয়ে।"

"এতক্ষণে সেই মেয়ের প্রকাশ হল, যে-মেয়েটি রিয়ল্। একটুকুতেই ধরা পড়ে দেশোদ্ধারের রঙ্গমঞ্চে তুমি রোম্যান্টিক। যে-সংসারে কাঁসার থালায় দুধ-ভাত মাছের মুড়ো তারই কেন্দ্রে বসে আছ তালপাতার পাখা হাতে। যেখানে পোলিটিক্যাল ঠ্যাঙার গুঁতি সেখানে আলুথালু চুলে চোখদুটো পাকিয়ে এসে পড় অপ্রকৃতিস্থতার ঝোঁকে, সহজবুদ্ধি নিয়ে নয়।"

"এত কথাও বলতে পার, অন্তু, মেয়েমানুষও তোমার কাছে হার মানে।"

"মেয়েমানুষ কথা বলতে পারে নাকি ! তারা তো শুধু বকে। কথার টর্নেডো দিয়ে সনাতন মূঢ়তার ভিত ভাঙব বলে একদিন মনের মধ্যে ঝোড়ো মেঘ জমে উঠেছিল। সেই মূঢ়তার উপরেই তোমাদের জয়স্তম্ভ গাঁথতে বেরিয়েছ কেবল গায়ের জোরে।"

"তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে বুঝিয়ে দাও আমার ভুলে তুমি কেন ভুল করলে ? কেন নিলে জীবিকাবর্জনের দুঃখ ?"

"ওটা আমার ব্যঞ্জনা, ইংরেজিতে যাকে বলে জেস্‌চার। ওটা আমার নিদেনকালের ভাষা। যদি দুঃখ না মানতুম তা হলে মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে, কিছুতে বুঝতে না তোমাকে কতখানি ভালোবেসেছি। সেই কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বোলো না ওটা দেশকে ভালোবাসে।"

"দেশ এর মধ্যে নেই অন্তু ?"

"দেশের সাধনা আর তোমার সাধনা এক হয়েছে বলেই দেশ এর মধ্যে আছে। একদিন বীর্যের জোরে যোগ্যতা দেখিয়ে পেতে হত মেয়েকে। আজ সেই মরণপণের সুযোগ পেয়েছি। সে-কথাটা ভুলে সামান্য আমার জীবিকার অভাব নিয়ে তোমার ব্যথা লেগেছে অন্নপূর্ণা !"

"আমরা মেয়েরা সাংসারিক। সংসারে অকুলোন সইতে পারি নে। আমার একটা কথা তোমাকে রাখতেই হবে। আমার আছে পৈতৃক বাড়ি, আরো আছে কিছু জমা টাকা। দোহাই তোমার, বার বার দোহাই দিচ্ছি, কথা রাখো, আমার কাছে টাকা নিতে সংকোচ কোরো না। জানি তোমার খুবই দরকার।"

"খুবই দরকার পড়লে ম্যাট্রিকুলেশনের নোটবই লেখা থেকে আরম্ভ করে কুলিগিরি পর্যন্ত খোলা রয়েছে।"

"আমি মানছি, অন্তু, আমার সমস্ত জমা টাকা দেশের কাজে এতদিনে খরচ করে ফেলা উচিত ছিল। কিন্তু উপার্জনে আমাদের সুযোগ কম বলেই সঞ্চয়ে আমাদের অন্ধ আসক্তি। ভীতু আমরা।"

"ওটা তোমাদের সহজবুদ্ধির উপদেশ। নিঃসম্বলতায় মেয়েদের শ্রী নষ্ট হয়।"

"আমাদের ছোটো নীড়, সেখানে টুকিটাকি কিছু আমরা জমা করি। কিন্তু সে তো কেবল বাঁচবার প্রয়োজনে নয়, ভালোবাসার প্রয়োজনে। আমার যা-কিছু সমস্তই তোমার জন্যে এ-কথা যদি বুঝিয়ে দিতে পারি তা হলে বাঁচি।"

"কিছুতেই বুঝব না ও-কথাটা। আজ পর্যন্ত মেয়েরা জুগিয়েছে সেবা, পুরুষরা জুগিয়েছে জীবিকা। তার বিপরীত ঘটলে মাথা হেঁট হয়। যে-চাওয়া নিয়ে অসংকোচে তোমার কাছে হাত পাততে পারি তাকে ঠেকিয়ে দিয়ে তুমি পণের বাঁধ বেঁধেছ। সেদিন নারায়ণী ইস্কুলের খাতা নিয়ে হিসেব মেলাচ্ছিলে। বসে পড়লুম কাছে, ঝড়ের ঘা খেয়ে চিল যেমন ধুলায় পড়ে তেমনি। মার-খাওয়া মন নিয়ে এসেছিলুম। কর্তব্যের যেমন-তেমন একটা ছাপমারা জিনিসে মেয়েদের নিষ্ঠা পাণ্ডার পায়ে তাদের অটল ভক্তির মতোই, ছাড়িয়ে নেওয়া অসম্ভব। মুখ তুলে চাইলে না। বসে বসে এক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে ইচ্ছা করছিলুম ঐ সুকুমার আঙুলগুলির ডগা দিয়ে স্পর্শসুধা পড়ুক ঝরে আমার দেহে মনে। দরদ লাগল না তোমার কোনোখানেই। কৃপণ, সেটুকুও দিতে পারলে না ! মনে মনে বললুম, আরো বেশি দাম দিতে হবে বুঝি। একদিন ফাটা মাথা কাটা দেহ নিয়ে পড়ব মাটিতে, তখন ভেঙে-পড়া প্রাণটাকে নেবে তোমার কোলে তুলে।"

এলার চোখ ছলছলিয়ে এল, বললে, "আঃ, তোমার সঙ্গে পারি নে, অন্তু ! এটুকু না চেয়ে নিতে পারলে না ? কেড়ে নিলে না কেন আমার খাতা ? বুঝতে পার না, তোমারই সংকোচ আমাকে সংকুচিত করে। অন্তু, তোমার স্বভাব এক জায়গায় মেয়েদের মতো। ইচ্ছা থাকতে পারে প্রবল কিন্তু উদ্দামভাবে তার দাবি প্রকাশ করতে তোমার রুচিতে ঠেকে।"

"বংশগত ধারণা, ছেলেবেলা থেকে রক্তে মাংসে জড়ানো। বরাবর ভেবে এসেছি মেয়েদের দেহে মনে একটা শুচিতার মর্যাদা আছে ; তাদের দেহের সম্মানকে সশঙ্কচিত্তে রক্ষা করা আমাদের পূর্বপুরুষগত অভ্যাস। আমার কুণ্ঠিত মনকে একটুমাত্র প্রশ্রয় দেবার জন্যে তোমার মন যদি কখনো আর্দ্র হয় তবে আমার পক্ষ থেকে ভিক্ষে চাইবার অপেক্ষা কোরো না। আমি শিখি নি তেমন করে চাইতে। ক্ষুধার সীমা নেই, তাই বলে পেটুক হতে পারব না, ওটা আমার ধাতে নেই। আমার কামনার কৌলীন্য নষ্ট করতে পারি নে।"

এলা অতীনের কাছে এসে ঘেঁষে বসল, তার মাথা বুকে টেনে নিয়ে তার উপরে নিজের মাথা হেলিয়ে রাখলে। কখনো কখনো আস্তে আস্তে চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে অতীন মাথা তুলে বসে এলার হাত চেপে ধরলে। বললে, "যেদিন মোকামায় খেয়াজাহাজে চড়েছিলুম সেদিন ভাগ্যদেবী পিতামহী অদৃশ্য হাতে কান মলে দিয়ে গেলেন তা বুঝতে পারি নি। তার অনতিকাল পর থেকেই মনটা কেবল আকাশকুসুম চয়ন করে বেড়াচ্ছে স্মৃতির আকাশে। সেদিনের

কথা তোমার কাছে পুরোনো হয়েছে কি ?”

“একটুও না।”

“তা হলে শোনো। ভারী মাল নীচের ডেক থেকে গাড়িতে নিয়ে গেছে আমার বিহারী চাকরটা। কাছে ছিল ছোটো একটা চামড়ার কেস— এদিক ওদিকে তাকাচ্ছি কুলির অপেক্ষায়। নেহাত ভালোমানুষের মতো হঠাৎ কাছে এসে বললে, কুলি চান ? দরকার কী ! আমি নিচ্ছি।— হাঁ হাঁ, করেন কী, করেন কী, বলতে বলতেই সেটা তুলে ফেললে। আমার বিপত্তি দেখে যেন পুনশ্চ নিবেদনে বললে, সংকোচ বোধ করেন তো এক কাজ করুন, আমার বাক্সটা ঐ আছে তুলে নিন, পরস্পর ঋণ শোধ হয়ে যাবে।— তুলতে হল। আমার কেসের চেয়ে সাতগুণ ভারী। হাতলটা ধরে ডান হাতে বাঁ হাতে বদল করতে করতে টলতে টলতে রেলগাড়ির থার্ডক্লাস কামরায় টেনে তুললেম। তখন সিল্কের জামা ঘামে ভিজে, নিশ্বাস দ্রুত, নিস্তব্ধ অট্টহাস্য তোমার মুখে। হয়তো বা করুণা কোনো একটা জায়গায় লুকোনো ছিল, সেটা প্রকাশ করা অকর্তব্য মনে করেছিলে। সেদিন আমাকে মানুষ করবার মহৎ দায়িত্ব ছিল তোমারই হাতে।”

“ছি ছি, বোলো না, বোলো না, মনে করতে লজ্জা বোধ হয়। কী ছিলুম তখন, কী বোকা, কী অদ্ভুত ! তখন তুমি হাসি-চেপে রাখতে বলেই আমার স্পর্ধা বেড়ে গিয়েছিল। সহ্য করেছিলে কী করে ? মেয়েদের কী বুদ্ধি থাকবার কোনো দরকার নেই ?”

“থাক্ বা না থাক্ তাতে তো কিছু আসে যায় নি। সেদিন যে-পরিবেশের মধ্যে আমার কাছে দেখা দিয়েছিলে সে তো হায়ার ম্যাথম্যাটিক্স্ নয়, লজিক্ নয়। সেটা যাকে বলে মোহ। শংকরাচার্যের মতো মহামল্লও যার উপর মুদ্গরপাত করে একটু টোল খাওয়াতে পারেন নি। তখন বেলা পড়ে এসেছে, আকাশে যাকে বলে কনে-দেখা মেঘ। গঙ্গার জল লাল আভায় টলটল করছে। ঐ ছিপ্ছিপে ক্ষিপ্রগমন শরীরটি সেই রাঙা আলোর ভূমিকায় চিরদিন আঁকা রয়ে গেল আমার মনে। কী হল তার পরে ? তোমার ডাক শুনলুম কানে। কিন্তু এসে পড়েছি কোথায় ? তোমার থেকে কতদূরে ! তুমিও কি জান তার সব বিবরণ ?”

“আমাকে জানতে দাও না কেন অন্তু ?”

“বারণ মানতে হয়। শুধু তাই কি ? কী হবে সব কথা বলে ?— আলো কমে গিয়েছে, এসো আরো কাছে এসো। আমার চোখ দুটো এসেছে ছুটির দরবারে তোমার কাছে। একমাত্র তোমার কাছেই আমার ছুটি। অতি ছোটো তার আয়তন, সোনার জলে রাঙানো ফ্রেমের মতো। তারই মধ্যে ছবিটিকে বাঁধিয়ে নিই নে কেন ? ঐ-যে তোমার দুই-একগুচ্ছি অশিষ্ট চুল আলগা হয়ে চোখের উপর এসে পড়েছে, দ্রুত হাতে তুলে তুলে দিচ্ছ, কালো পাড় দেওয়া তসরের শাড়ি, ব্রোচ নেই কাঁধে, আঁচলটা মাথার চুলে বিঁধিয়ে রাখা, চোখে ক্লান্ত ক্লেশের ছায়া, ঠোঁটে মিনতির আভাস, চারি দিকে দিনের আলো ডুবে এসেছে শেষ অস্পষ্টতায়। এই যা দেখছি এইটিই আশ্চর্য সত্য, এর মানে কী, কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারব না, কোনো এক অদ্বিতীয় কবির হাতেই ধরা দিতে পারল না বলে এর অব্যক্ত মাধুর্যের মধ্যে এত গভীর বিষাদ। এই ছোটো একটি অপরূপ পরিপূর্ণতাকে চার দিকে ভ্রূকুটি করে ঘিরে আছে বড়োনামওআলা বড়োছায়াওআলা বিকৃতি।”

“কী বলছ, অন্তু !”

“অনেকখানি মিথ্যে। মনে পড়ছে কুলি-বস্তিতে আমাকে বাসা নিতে বলেছিলে। তোমার মনের মধ্যে ছিল আমার বংশের অভিমানকে ধূলিসাৎ করবার অভিপ্রায়। তোমার সেই সুমহৎ অধ্যবসায়ে আমার মজা লাগল। ডিমক্রাটিক্ পিক্‌নিকে নাবা গেল। গাড়োয়ান-পাড়াতে ঘুরলুম। দাদা-খুড়োর সম্পর্ক পাতিয়ে চললুম বহুবিধ মোষের গোয়ালঘরের পাশে পাশে। কিন্তু তাদেরও বুঝতে বাকি ছিল না, আমারও নয় যে এই সম্পর্কের ছাপগুলো ধোপ সইবে না। নিশ্চয় এমন মহৎ লোক আছেন সব যন্ত্রেই যাঁদের সুর বাজে, এমন-কি, তুলো-ধোনা যন্ত্রেও। আমরা নকল করতে গেলে সুর মেলে না। দেখো নি তোমাদের পাড়ার খৃস্টশিষ্যকে ব্রাদার বলে যাকে-তাকে বুকে চেপে ধরা তার অনুষ্ঠানের

অঙ্গ। এতে খ্রীস্টকে ব্যঙ্গ করা হয়।"

"কী হয়েছে তোমার অন্তু! কোন্ ক্ষোভের মুখে এ-সব কথা বলছ? তুমি কি বলতে চাও কর্তব্যকে কর্তব্য বলে মানা যায় না অরুচি কাটিয়ে দিয়েও?"

"রুচির কথা হচ্ছে না এলী, স্বভাবের কথা। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বীরের কর্তব্যই করতে বলেছিলেন অত্যন্ত অরুচি সত্ত্বেও; কুরুক্ষেত্র চাষ করবার উদ্দেশে এগ্রিকাল্‌চারাল ইকনমিক্‌স চর্চা করতে বলেন নি।"

"শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে হলে কী বলতেন, অন্তু?"

"অনেকদিন আগেই কানে-কানে বলে রেখেছেন। সেই তাঁর কানে-কানে কথাটাকে মুখ খুলে বলবার ভার ছিল আমার 'পরে। নির্বিচারে সবারই একই কর্তব্য, গুরুমশায় কানে ধরে এই কথাটা বলতেই এত কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয়েছে! তোমাকে মুখের উপরই বলছি ওদের যে-পাড়ায় অহংকার করে নম্রতা করতে যাও সেখানে তোমারও জায়গা নেই। দেবী! সবাই দেবী তোমরা! নকল দেবীর কৃত্রিম সাজ, মেয়েদের অন্য সাজেরই মতো, পুরুষ-দর্জির দোকানে বানানো।"

"দেখো অন্তু, আজও বুঝতে পারি নে যে-পথ তোমার নয়, সে-পথ থেকে কেন তুমি জোর করে ফিরে আস নি?"

"তা হলে বলি। অনেক কথা জানতুম না, অনেক কথা ভাবি নি এই পথে প্রবেশ করবার আগে। একে একে এমন সব ছেলেকে কাছে দেখলুম, বয়সে যারা ছোটো না হলে যাদের পায়ের ধুলো নিতুম। তারা চোখের সামনে কী দেখেছে, কী সয়েছে, কী অপমান হয়েছে তাদের, সে-সব দুর্বিষহ কথা কোথাও প্রকাশ হবে না। এরই অসহ্য ব্যথায় আমাকে খেপিয়ে তুলেছিল। বারবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, ভয়ে হার মানব না, পীড়নে হার মানব না, পাথরের দেয়ালে মাথা ঠুকে মরব তবু তুড়ি মেরে উপেক্ষা করব সেই হৃদয়হীন দেয়ালটাকে।"

"তার পরে কি তোমার মত বদলে গেল?"

"শোনো আমার কথা। শক্তিমানের বিরুদ্ধে যে লড়াই করে, সে উপায়বিহীন হলেও সেই শক্তিমানের সমকক্ষে দাঁড়ায়; তাতে তার সম্মান রক্ষা হয়। সেই সম্মানের অধিকার আমি কল্পনা করেছিলুম। দিন যতই এগোতে থাকল চোখের সামনে দেখা গেল— অসাধারণ উচ্চ মনের ছেলে অল্পে অল্পে মনুষ্যত্ব খোয়াতে থাকল। এতবড়ো লোকসান আর কিছুই নেই। নিশ্চিত জানতুম আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেবে, রেগে বিদ্রূপ করবে, তবু ওদের বলেছি অন্যায়ে অন্যায়কারীর সমান হলেও তাতে হার, পরাজয়ের আগে মরবার আগে প্রমাণ করে যেতে হবে আমরা ওদের চেয়ে মানবধর্মে বড়ো— নইলে এতবড়ো বলিষ্ঠের সঙ্গে এমনতরো হারের খেলা খেলছি কেন? নির্বুদ্ধিতার আত্মঘাতের জন্যে?— আমার কথা ওদের কেউ বোঝে নি তা নয়। কিন্তু কতজনই বা!"

"তখনো ওদের ছাড়লে না কেন?"

"আর কি ছাড়তে পারি? তখন যে শাস্তির নিষ্ঠুর জাল সম্পূর্ণ জড়িয়ে এসেছে ওদের চার দিকে। ওদের ইতিহাস নিজে দেখলুম, বুঝতে পেরেছি ওদের মর্মান্তিক বেদনা, সেইজন্যেই রাগই করি আর ঘৃণাই করি, তবু বিপন্নদের ত্যাগ করতে পারি নে। কিন্তু একটা কথা এই অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ বুঝেছি, গায়ের জোরে আমরা যাদের অত্যন্ত অসমকক্ষ তাদের সঙ্গে গায়ের জোরের মল্লযুদ্ধ করতে চেষ্টা করলে আন্তরিক দুর্গতি শোচনীয় হয়ে ওঠে। রোগ সব শরীরেই দুঃখের কিন্তু ক্ষীণ শরীরে মারাত্মক। মনুষ্যত্বের অপমান করেও কিছুদিনের মতো জয়ডঙ্কা বাজিয়ে চলতে পারে তারা যাদের আছে বাহুবল, কিন্তু আমরা পারব না। আগাগোড়া কলঙ্কে কালো হয়ে পরাভবের শেষসীমায় অখ্যাতির অন্ধকারে মিশিয়ে যাব আমরা।"

"কিছুকাল থেকে এই ভয়ংকর ট্র্যাজেডির চেহারা আমার কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অন্তু। গৌরবের আহ্বানে নেমেছিলেম কিন্তু লজ্জা বেড়ে উঠছে প্রতিদিন। এখন আমরা কী করতে পারি বলো আমাকে।"

"সব মানুষের সামনেই ধর্মক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধ আছে, সেখানে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং। কিন্তু অন্তত আমাদের কজনের জন্যে এ-যাত্রায় সে-ক্ষেত্রের পথ বন্ধ। এখানকার কর্মফল এখানেই নিঃশেষে চুকিয়ে দিয়ে যেতে হবে।"

"সব বুঝতে পারছি, তবু অন্তু, আমাদের দেশের কাজ নিয়ে কিছুদিন থেকে এমন কঠিন ধিক্কার দিয়ে তুমি কথা বল, সে আমাকে বড়ো বাজে।"

"তার কারণ কী সে-কথা এখন আর না বললেও হয়, সময় চলে গেছে।"

"তবু বলো।"

"আমি আজ স্বীকার করব তোমার কাছে— তোমরা যাকে পেট্রিয়ট বলো আমি সেই পেট্রিয়ট নই। পেট্রিয়টিজ্‌মের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চে না মানে তাদের পেট্রিয়টিজ্‌ম কুমিরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়ানৌকো। মিথ্যাচরণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতালাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়। এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই গর্তের ভিতরকার কুশ্রী জগৎটার মধ্যে দিনরাত মিথ্যের বিযাক্ত হাওয়ায় কখনোই নিজের স্বভাবে সেই পৌরুষকে রক্ষা করতে পারব না, যাতে পৃথিবীতে কোনো বড়ো কাজ করতে পারা যায়।"

"আচ্ছা অন্তু, তুমি যাকে আত্মঘাত বল সে কি কেবল আমাদেরই দেশে?"

"তা বলি নে। দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণ বাঁচিয়ে তোলা যায় এই ভয়ংকর মিথ্যে কথা পৃথিবীসুদ্ধ ন্যাশনালিস্ট আজকাল পাশবগর্জনে ঘোষণা করতে বসেছে, তার প্রতিবাদ আমার বুকের মধ্যে অসহ্য আবেগে গুমরে গুমরে উঠছে— এই কথা সত্যভাষায় হয়তো বলতে পারতুম, সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকোচুরি করে দেশউদ্ধারচেষ্টার চেয়ে সেটা হত চিরকালের বড়ো কথা। কিন্তু এ-জন্মের মতো বলবার সময় হল না। আমার বেদনা তাই আজ এত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে।"

এলা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, বললে, "ফিরে এসো অন্তু।"

"আর ফেরবার পথ নেই।"

"কেন নেই?"

"অজায়গায় যদি এসে পড়ি সেখানকারও দায়িত্ব আছে শেষ পর্যন্ত।"

এলা অতীনের গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "ফিরে এসো, অন্তু। এত বছর ধরে যে-বিশ্বাসের মধ্যে বাসা নিয়েছিলুম তার ভিত তুমি ভেঙে দিয়েছ। আজ আছি ভেসে-চলা ভাঙা নৌকো আঁকড়িয়ে; আমাকেও উদ্ধার করে নিয়ে যাও।— অমন চুপ করে বসে থেকো না, বলো অন্তু, একটা কথা বলো। এখনই তুমি হুকুম করো আমি ভাঙব পণ। ভুল করেছি আমি। আমাকে মাপ করো।"

"উপায় নেই।"

"কেন উপায় নেই? নিশ্চয় আছে।"

"তীর লক্ষ্য হারাতে পারে, তূণে ফিরতে পারে না।

"আমি স্বয়ংবরা, আমাকে বিয়ে করো অন্তু। আর সময় নষ্ট করতে পারব না— গান্ধর্ব বিবাহ হোক, সহধর্মিণী করে নিয়ে যাও তোমার পথে।"

"বিপদের পথ হলে নিয়ে যেতুম সঙ্গে। কিন্তু যেখানে ধর্ম নষ্ট হয়েছে সেখানে তোমাকে সহধর্মিণী করতে পারব না।— থাক্ থাক্, ও-সব কথা থাক। এ-জীবনের নৌকোডুবির অবসানে কিছু সত্য এখনো বাকি আছে। তারই কথাটা শুনি তোমার মুখে।"

"কী বলব?"

"বলো তুমি ভালোবেসেছ।"

"হাঁ বেসেছি।"

"বলো আমি তোমাকে ভালোবেসেছি সে-কথা তোমার মনে থাকবে আমি যখন থাকব না তখনো।"

এলা নিরুত্তরে চুপ করে বসে রইল, জল পড়তে লাগল দুই চোখে। অনেকক্ষণ পরে বাষ্পরুদ্ধ

গলায় বললে, "আবার বলছি অন্তু, কিছু নাও আমার হাত থেকে— নাও এই আমার গলার হার।"

এই বলে পায়ের উপর রাখল হার।

"কিছুতেই না।"

"কেন, অভিমান ?"

"হাঁ, অভিমান। এমন দিন ছিল তখন যদি দিতে পরতুম গলায়— আজ দিলে পকেটে, অন্নাভাবের গর্তটার মধ্যে। ভিক্ষে নেব না তোমার কাছে।"

এলা অতীনের পায়ের কাছে লুটিয়ে বললে, "নাও আমাকে তোমার সঙ্গিনী করে।"

"লোভ দেখিয়ো না, এলা। অনেকবার বলেছি আমার পথ তোমার নয়।"

"তবে সে-পথ তোমারও নয়। ফিরে এসো, ফিরে এসো।"

"পথ আমার নয়, আমিই পথের। গলার ফাঁসকে গলার গয়না কেউ বলে না।"

"অন্তু, নিশ্চয় জেনো, তুমি চলে গেলে একমুহূর্ত আমি বাঁচব না। তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার, এ কথায় আজ যদি বা সন্দেহ কর, একান্ত মনে আশা করি মৃত্যুর পরে সে সন্দেহ সম্পূর্ণ ঘোচাবার একটা কোনো রাস্তা কোথাও আছে।"

হঠাৎ অতীন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। তীরের মতো তীক্ষ্ণ হুইস্‌লের শব্দ এল দূর থেকে। চমকে বলে উঠল, "চললুম।"

এলা তাকে জড়িয়ে ধরলে ; বললে, "আর-একটু থাকো।"

"না।"

"কোথায় যাচ্ছ ?"

"কিচ্ছু জানি নে।"

এলা অতীনের পা জড়িয়ে ধরে বললে, "আমি তোমার সেবিকা, তোমার চরণের সেবিকা, আমাকে ফেলে যেয়ো না, ফেলে যেয়ো না।"

একটুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইল অতীন। দ্বিতীয়বার হুইস্‌লের শব্দ এল। অতীন গর্জন করে বললে, "ছেড়ে দাও।" বলে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। এলা মেঝের উপর উপুড় হয়ে পড়ে। তার বুকের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে, তার চোখে জল নেই। এমন সময় গম্ভীর গলার ডাক শুনতে পেল, "এলা।"

চমকে উঠে বসল। দেখলে ইলেকট্রিক টর্চ হাতে ইন্দ্রনাথ। তখনই উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "ফিরিয়ে আনুন অন্তুকে।"

"সে কথা থাক্। এখানে কেন এলে ?"

"বিপদ আছে জেনেই এসেছি।"

তীব্র ভর্ৎসনার সুরে ইন্দ্রনাথ বললেন, "তোমার বিপদের কথা কে ভাবছে ? এখানকার খবর তোমাকে কে দিলে ?"

"বটু।"

"তবু বুঝলে না মতলব ?"

"বোঝবার বুদ্ধি আমার ছিল না। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল।"

"তোমাকে মারতে পারলে এখনই মারতুম। যাও ঘরে ফিরে। ট্যাক্‌সি আছে বাইরে।"

চতুর্থ অধ্যায়

"আবার অখিল !— পালিয়েছিস বোর্ডিং থেকে ! তোর সঙ্গে কোনোমতে পারবার জো নেই। বার বার বলছি, এ বাড়িতে খবরদার আসিস নে। মরবি যে।"

অখিল কোনো উত্তর না দিয়ে গলার সুর নামিয়ে বললে, "একজন দাড়িওআলা কে পিছনের পাঁচিল টপকিয়ে বাগানে ঢুকল। তাই তোমার এ ঘরে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলুম।— ঐ শোনো পায়ের শব্দ।" অখিল তার ছুরির সব-চেয়ে মোটা ফলাটা খুলে দাঁড়াল।

এলা বললে, "ছুরি খুলতে হবে না তোমাকে, বীরপুরুষ। দে বলছি।" ওর হাত থেকে ছুরি কেড়ে নিলে।

সিঁড়ি থেকে আওয়াজ এল, "ভয় নেই, আমি অন্তু।"

মুহূর্তে এলার মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে এল— বললে, "দে দরজা খুলে।"

দরজা খুলে দিয়ে অখিল জিজ্ঞাসা করলে, "সেই দাড়িওআলা কোথায় ?"

"দাড়ি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে বাগানে, বাকি মানুষটাকে পাবে এইখানেই। যাও খোঁজ করো গে দাড়ির।" অখিল চলে গেল।

এলা পাথরের মূর্তির মতো ক্ষণকাল একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বললে, "অন্তু, এ কী চেহারা তোমার ?"

অতীন বললে, "মনোহর নয়।"

"তবে কি সত্যি ?"

"কী সত্যি ?"

"তোমাকে সর্বনেশে ব্যামোয় ধরেছে।"

"নানা ডাক্তারের নানা মত, বিশ্বাস না করলেও চলে।"

"নিশ্চয় তোমার খাওয়া হয় নি ?"

"ও-কথাটা থাক্। সময় নষ্ট কোরো না।"

"কেন এলে, অন্তু, কেন এলে ? এরা যে তোমাকে ধরবার অপেক্ষায় আছে।"

"ওদের নিরাশ করতে চাই নে।"

অতীনের হাত চেপে ধরে এলা বললে, "কেন এলে এই নিশ্চিত বিপদের মধ্যে। এখন উপায় কী ?"

"কেন এলুম সেই কথাটা যাবার ঠিক আগেই বলে চলে যাব। ইতিমধ্যে যতক্ষণ পারি ঐ কথাটাই ভুলে থাকতে চাই। নীচের দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে আসি গে।"

খানিক পরে উপরে এসে বললে, "চলো ছাদে। নীচের তলাকার আলোর বাল্‌বগুলো সব খুলে নিয়েছি। ভয় পেয়ো না।"

দুজনে ছাদে এসে ছাদে প্রবেশের দরজা বন্ধ করে দিলে। বন্ধ দরজায় ঠেসান দিয়ে বসল অতীন, এলা বসল তার সামনে।

"এলা, মন সহজ করো। যেন কিছু হয় নি, যেন আমরা দুজনে আছি লঙ্কাকাণ্ড আরম্ভ হবার আগে সুন্দরকাণ্ডে। তোমার হাত অমন বরফের মতো ঠাণ্ডা কেন ? কাঁপছে যে। দাও গরম করে দিই।"

এলার হাত দুখানি নিয়ে অতীন জামার নীচে বুকের উপর চেপে রাখলে। তখন দূরের পাড়ায় বিয়েবাড়িতে সানাই বাজছে।

"ভয় করছে, এলী ?"

"কিসের ভয় ?"

"সমস্ত কিছুর। প্রত্যেক মুহূর্তের।"

"ভয় তোমার জন্যে অন্তু, আর কিছুর জন্যে নয়।"

অতীন বললে, "এলী, মনে করতে চেষ্টা করো আমরা আছি পঞ্চাশ কি একশো বছর পরেকার এমনি এক নিস্তব্ধ রাতে। উপস্থিতের গণ্ডিটা নিতান্ত সংকীর্ণ, তার মধ্যে ভয়ভাবনা দুঃখকষ্ট সমস্তই প্রকাণ্ডতার ভান করে দেখা দেয়। বর্তমান সেই নীচ পদার্থ যার ছোটো মুখে বড়ো কথা। ভয় দেখায় সে মুখোশ পরে— যেন আমরা মুহূর্তের কোলে নাচানো শিশু। মৃত্যু মুখোশখানা টান মেরে ফেলে দেয়। মৃত্যু অত্যুক্তি করে না। যা অত্যন্ত করে চেয়েছি তার গায়ে মোটা অঙ্কের দাম লেখা ছিল বর্তমানের ফাঁকির কলমে, যা অত্যন্ত করে হারিয়েছি তার গায়ে দুদিনের কালি লেবেল মেরে লিখেছে অপরিসীম দুঃখ। মিথ্যে কথা! জীবনটা জালিয়াত, সে অনন্তকালের হস্তাক্ষর জাল করে চালাতে চায়। মৃত্যু এসে হাসে, বঞ্চনার দলিলটা লোপ করে দেয়। সে হাসি নিষ্ঠুর হাসি নয়, বিদ্রূপের হাসি নয়, শিবের হাসির মতো সে শান্ত সুন্দর হাসি, মোহরাত্রির অবসানে। এলী, রাত্রে একলা বসে কখনো মৃত্যুর স্নিগ্ধ সুগভীর মুক্তি অনুভব করেছ, যার মধ্যে চিরকালের ক্ষমা?"

"তোমার মতো বড়ো করে দেখবার শক্তি আমার নেই অন্তু— তবু তোমাদের কথা মনে করে উদ্‌বেগে যখন অভিভূত হয়ে পড়ে মন, তখন এই কথাটা খুব নিশ্চিত করে অনুভব করতে চেষ্টা করি যে মরা সহজ।"

"ভীরু, মৃত্যুকে পালাবার পথ বলে মনে করছ কেন? মৃত্যু সব চেয়ে নিশ্চিত— জীবনের সব গতিস্রোতের চরম সমুদ্র, সব সত্যমিথ্যা ভালোমন্দর নিঃশেষ সমন্বয় তার মধ্যে। এইরাত্রে এখনই আমরা আছি সেই বিরাটের প্রসারিত বাহুর বেষ্টনে আমরা দুজনে— মনে পড়ছে ইবসেনের চারিটি লাইন—

Upwards
Towards the peaks,
Towards the stars,
Towards the vast silence."

এলা অতীনের হাত কোলে নিয়ে বসে রইল স্তব্ধ হয়ে। হঠাৎ অতীন হেসে উঠল। বললে, "পিছনে মরণের কালো পর্দাখানা নিশ্চল টানা রয়েছে অসীমে, তারই উপর জীবনের কৌতুকনাট্য নেচে চলেছে অন্তিম অঙ্কের দিকে। তারই একটা ছবি আজ দেখো চেয়ে। আজ তিন বছর আগে এই ছাদের উপর তুমি আমার জন্মদিনের উৎসব করেছিলে, মনে আছে?"

"খুব মনে আছে।"

"তোমার ভক্ত ছেলের দল সবাই এসেছিল। ভোজের আয়োজন ঘটা করে হয় নি। চিঁড়ে ভেজেছিলে সঙ্গে ছিল কলাইশুঁটি সিদ্ধ, মরিচের গুঁড়ো ছিটানো, ডিমের বড়াও ছিল মনে পড়ছে। সবাই মিলে খেল কাড়াকাড়ি করে। হঠাৎ মতিলাল হাত পা ছুঁড়ে শুরু করলে, আজ নবযুগে অতীনবাবুর নবজন্মের দিন— আমি লাফ দিয়ে উঠে তার মুখ চেপে ধরলুম, বললুম, বক্তৃতা যদি কর, তবে তোমার পুরোনো জন্মের দিনটা এইখানেই কাবার। বটু বললে, ছি ছি অতীনবাবু, বক্তৃতার ভ্রূণহত্যা?— নবযুগ, নবজন্ম, মৃত্যুর তোরণ প্রভৃতি ওদের বাঁধাবুলিগুলো শুনলে আমার লজ্জা করে। ওরা প্রাণপণে চেষ্টা করেছে আমার মনের উপর ওদের দলের তুলি বুলোতে— কিছুতে রঙ ধরল না।"

"অন্তু, নির্বোধ আমি; আমিই ভেবেছিলুম তোমাকে মিলিয়ে নেব আমাদের সকল পদাতিকের সঙ্গে এক উর্দি পরিয়ে।"

"তাই আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওদের সঙ্গে ঘোরতর দিদিয়ানা করতে! ভেবেছিলে, আমার সংশোধনের পক্ষে কিছু ঈর্ষার প্রয়োজন আছে। স্নেহযত্ন, কুশলসম্ভাষণ, বিশেষ মন্ত্রণা, অনাবশ্যক উদ্‌বেগ, মনিহারির রঙিন সামগ্রীর মতো ওদের সামনে সাজিয়ে রেখেছিলে তোমার পসরায়। আজও তোমার করুণ প্রশ্ন কানে শুনতে পাচ্ছি, নন্দকুমার, তোমার চোখমুখ লাল দেখছি কেন। বেচারা ভালোমানুষ, সত্যের অনুরোধে মাথাধরা অস্বীকার করতে না-করতে ছেঁড়া ন্যাকড়ার জলপটি এসে

উপস্থিত। আমি মুগ্ধ, তবু বুঝতুম এই অতি অমায়িক দিদিয়ানা তোমার অতিপবিত্র ভারতবর্ষের বিশেষ ফরমাশের। একেবারে আদর্শ স্বদেশী দিদিবৃত্তি।"

"আঃ চুপ করো, চুপ করো অন্তু।"

"অনেক বাজে জিনিসের বাহুল্য ছিল সেদিন তোমার মধ্যে, অনেক হাস্যকর ভড়ং— সে কথা তোমাকে মানতেই হবে।"

"মানছি, মানছি, একশো বার মানছি। তুমিই সে-সমস্ত নিঃশেষে ঘুচিয়ে দিয়েছ। তবে আজ আবার অমন নিষ্ঠুর করে বলছ কেন ?"

"কোন্ মনস্তাপে বলছি, শোনো। জীবিকা থেকে ভ্রষ্ট করেছ বলে সেদিন আমার কাছে মাপ চাইছিলে। যথার্থ জীবনের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি অথচ সেই সর্বনাশের পরিবর্তে যা দাবি করতে পারতুম তা মেটে নি। আমি ভেঙেছি আমার স্বভাবকে, কুসংস্কারে অন্ধ তুমি ভাঙতে পারলে না তোমার পণকে যার মধ্যে সত্য ছিল না ; এজন্যে মাপ চাওয়া কি বাহুল্য ছিল ? জানি, তুমি ভাবছ এতটা কী করে সম্ভব হল।"

"হাঁ অন্তু, আমার বিস্ময় কিছুতেই যায় না— জানি নে আমার এমন কী শক্তি ছিল।"

"তুমি কী করে জানবে ? তোমাদের শক্তি তোমাদের নিজের নয়, ও মহামায়ার। কী আশ্চর্য সুর তোমার কণ্ঠে, আমার মনের অসীম আকাশে ধ্বনির নীহারিকা সৃষ্টি করে। আর তোমার এই হাতখানি, ঐ আঙুলগুলি, সত্যমিথ্যে সব-কিছুর 'পরে পরশমণি ছুঁইয়ে দিতে পারে। জানি নে, কী মোহের বেগে, ধিক্কার দিতে দিতেই নিয়েছি স্খলিত জীবনের অসম্মান। ইতিহাসে পড়েছি এমন বিপত্তির কথা, কিন্তু আমার মতো বুদ্ধি-অভিমানীর মধ্যে এটা যে ঘটতে পারে কখনো তা ভাবতে পারতুম না। এবার জাল ছেঁড়বার সময় এল, তাই আজ বলব তোমাকে সত্য কথা, যত কঠোর হোক।"

"বলো, বলো, যা বলতে হয় বলো। দয়া কোরো না আমাকে। আমি নির্মম, নির্জীব, আমি মূঢ়— তোমাকে বোঝবার শক্তি আমার কোনোকালে ছিল না। অতুল্য যা তাই এসেছিল হাত বাড়িয়ে আমার কাছে, অযোগ্য আমি, মূল্য দিই নি। বহুভাগ্যের ধন চিরজন্মের মতো চলে গেল। এর চেয়ে শাস্তি যদি থাকে, দাও শাস্তি।"

"থাক্, থাক্, শাস্তির কথা। ক্ষমাই করব আমি। মৃত্যু যে ক্ষমা করে সেই অসীম ক্ষমা। সেইজন্যেই আজ এসেছি।"

"সেইজন্যে ?"

"হাঁ কেবলমাত্র সেইজন্যে।"

"না-ই ক্ষমা জানাতে তুমি। কিন্তু কেন এলে এমন করে বেড়া-আগুনের মধ্যে ? জানি, জানি, বাঁচবার ইচ্ছে নেই তোমার। তা যদি হয় তা হলে কটা দিন কেবলমাত্র আমাকে দাও, দাও তোমার সেবা করবার শেষ অধিকার। পায়ে পড়ি তোমার।"

"কী হবে সেবা ! ফুটো জীবনের ঘটে ঢালবে সুধা ! তুমি জান না, কী অসহ্য ক্ষোভ আমার। শুশ্রূষা দিয়ে তার কী করতে পার, যে-মানুষ আপন সত্য হারিয়েছে !"

"সত্য হারাও নি অন্তু। সত্য তোমার অন্তরে আছে অক্ষুণ্ণ হয়ে।"

"হারিয়েছি, হারিয়েছি।"

"বোলো না, বোলো না অমন কথা।"

"আমি যে কী যদি জানতে পারতে তোমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিউরে উঠত।"

"অন্তু, আত্মনিন্দা বাড়িয়ে তুলছ কল্পনায়। নিষ্কামভাবে যা করেছ তার কলঙ্ক কখনোই লাগবে না তোমার স্বভাবে।"

"স্বভাবকেই হত্যা করেছি, সব হত্যার চেয়ে পাপ। কোনো অহিতকেই সমূলে মারতে পারি নি, সমূলে মেরেছি কেবল নিজেকে। সেই পাপে, আজ তোমাকে হাতে পেলেও তোমার সঙ্গে মিলতে পারব না। পাণিগ্রহণ ! এই হাত নিয়ে ! কিন্তু কেন এ-সব কথা ! সমস্ত কালো দাগ মুছবে যমকন্যার

কালো জলে, তারই কিনারায় এসে বসেছি। আজ বলা যাক্ যত-সব হালকা কথা হাসতে হাসতে। সেই জন্মদিনের ইতিবৃত্তটা শেষ করে দিই। কী বল, এলী?"

"অন্তু, মন দিতে পারছি নে।"

"আমাদের দুজনের জীবনে মন দেবার যোগ্য যা-কিছু আছে সে কেবল ঐরকম গোটাকয়েক হালকা দিনের মধ্যে। ভোলবার যোগ্য ভারী ভারী দিনই তো বহু বিস্তর।"

"আচ্ছা, বলো অন্তু।"

"জন্মদিনের খাওয়া হয়ে গেল। হঠাৎ নীরদের শখ হল পলাশির যুদ্ধ আবৃত্তি করবে। উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে গিরিশ ঘোষের ভঙ্গিতে আউড়িয়ে গেল—

কোথা যাও, ফিরে চাও সহস্র কিরণ,
বারেক ফিরিয়া চাও ওগো দিনমণি।

নীরদ লোক ভালো, অত্যন্ত সাদাসিধে, কিন্তু নির্দয় তার স্মরণশক্তি। সভাটা ভেঙে ফেলবার জন্যে আমার মন যখন হন্যে হয়ে উঠেছে তখন ওরা ভবেশকে গান গাইতে অনুরোধ করলে। ভবেশ বললে হার্মোনিয়ম সঙ্গে না থাকলে ও হাঁ করতে পারে না।— তোমার ঘরে ঐ পাপটা ছিল না। ফাঁড়া কাটল। আশান্বিত মনে ভাবছি এইবার উপসংহার, এমন সময় সতু খামকা তর্ক তুললে, মানুষ জন্মায় জন্মদিনে না জন্মতিথিতে? যত বলি থামো, সে থামে না। তর্কের মধ্যে দেশাত্মবোধের ঝাঁজ লাগল, চড়তে লাগল গলার আওয়াজ, বন্ধুবিচ্ছেদ হয় আর কি। বিষম রাগ হল তোমার উপরে। আমার জন্মদিনকে একটা সামান্য উপলক্ষ করেছিলে, মহত্তর লক্ষ্য ছিল কর্মভাইদের একত্র করা।"

"কোন্‌টা লক্ষ্য কোন্‌টা উপলক্ষ বাইরে থেকে বিচার কোরো না অন্তু। শাস্তির যোগ্য আমি, কিন্তু অন্যায় শাস্তির না। মনে নেই তোমার, সেইবারকার জন্মদিনেই অতীন্দ্রবাবু আমার মুখে নাম নিলেন অন্তু? সেটা তো খুব ছোটো কথা নয়। তোমার অন্তু নামের ইতিহাসটা বলো শুনি।"

"সখী, তবে শ্রবণ করো। তখন বয়স আমার চার পাঁচ বছর, মাথায় ছিলুম ছোটো, কথা ছিল না মুখে, শুনেছি বোকার মতো ছিল চোখের চাহনি। জ্যেঠামশায় পশ্চিম থেকে এসে আমাকে প্রথম দেখলেন। কোলে তুলে নিলেন, বললেন, এই বালখিল্যটার নাম অতীন্দ্র রেখেছে কে? অতিশয়োক্তি অলংকার, এর নাম দাও অনতীন্দ্র। সেই অনতি শব্দটা স্নেহের কণ্ঠে অন্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমার কাছেও একদিন অতি হয়েছে অনতি, ইচ্ছে করে খুইয়েছে মান।"

হঠাৎ অতীন চমকে উঠে থেমে গেল। বললে, "পায়ের শব্দ শুনছি যেন।"

এলা বললে, "অখিল।"

আওয়াজ এল, "দিদিমণি।"

ছাদে আসবার দরজা খুলে দিয়ে এলা জিজ্ঞাসা করলে, "কী।"

অখিল বললে, "খাবার।"

বাড়িতে রান্নার ব্যবস্থা নেই। অদূরবর্তী দিশি রেস্‌টোরাঁ থেকে বরাদ্দমত খাবার দিয়ে যায়। এলা বললে, "অন্তু, চলো খেতে।"

"খাওয়ার কথা বোলো না। না খেয়ে মরতে মানুষের অনেকদিন লাগে। নইলে ভারতবর্ষ টিকত না। ভাই অখিল, আর রাগ রেখো না মনে। আমার ভাগটা তুমিই খেয়ে নাও। তার পরে পলায়নেন সমাপয়েৎ— দৌড় দিয়ো যত পার।"

অখিল চলে গেল।

দুজনে ছাদের মেঝের উপর বসল। অতীন আবার শুরু করলে। "সেদিনকার জন্মদিন চলতে লাগল একটানা, কেউ নড়বার নাম করে না। আমি ঘন ঘন ঘড়ি দেখছি, ওটা একটা ইঙ্গিত রাতকানাদের কাছে। শেষকালে তোমাকে বললুম, সকাল সকাল তোমার শুতে যাওয়া উচিত, এই সেদিন ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে উঠেছ।— প্রশ্ন উঠল, 'ক'টা বেজেছে?' উত্তর 'সাড়ে দশটা।' সভা ভাঙবার দুটো-একটা হাইতোলা গড়িমসি-করা লক্ষণ দেখা গেল। বটু বললে, বসে রইলেন যে

অতীনবাবু ? চলুন একসঙ্গে যাওয়া যাক।— কোথায় ? না, মেথরদের বসতিতে ; হঠাৎ গিয়ে পড়ে ওদের মদ খাওয়া বন্ধ করতে হবে।— সর্বশরীর জ্বলে উঠল। বললুম, মদ তো বন্ধ করবে, তার বদলে দেবে কী।— বিষয়টা নিয়ে এতটা উত্তেজিত হবার দরকার ছিল না। ফল হল, যারা চলে যাচ্ছিল তারা দাঁড়িয়ে গেল। শুরু হল— আপনি কি তবে বলতে চান— তীব্রস্বরে বলে উঠলুম— কিছু বলতে চাই নে।— এতটা বেশি ঝাঁজও বেমানান হল। গলা ভারী করে তোমার দিকে আধখানা চোখে চেয়ে বললুম, তবে আজ আসি। দোতলায় তোমার ঘরের সামনে পর্যন্ত এসে পা চলতে চায় না। কী বুদ্ধি হল বুকের পকেট চাপড়িয়ে বললুম, ফাউন্টেন পেনটা বুঝি ফেলে এসেছি। বটু বললে আমিই খুঁজে আনছি— বলেই দ্রুত চলে গেল ছাদে। পিছু পিছু ছুটলুম আমি। খানিকটা খোঁজবার ভান করে বটু ঈষৎ হেসে বললে, দেখুন তো বোধ করি পকেটেই আছে। নিশ্চিত জানতুম আমার ফাউন্টেন পেনটা আবিষ্কার করতে হলে ভূগোল সন্ধানের প্রয়োজন আমার নিজের বাসাতেই। স্পষ্ট বলতে হল, এলাদির সঙ্গে বিশেষ কথা আছে। বটু বললে, বেশ তো অপেক্ষা করছি। আমি বললুম, অপেক্ষা করতে হবে না, যাও। বটু ঈষৎ হেসে বললে, রাগ করেন কেন অতীনবাবু, আমি চললুম।"

আবার পায়ের শব্দ শুনে অতীন চমকে উঠে থামল। অখিল এল ছাদে। বললে, "কে একজন এই চিরকুট দিয়েছে অতীনবাবুকে। তাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেছি।"

এলার বুক ধড়াস করে উঠল, বললে, "কে এল ?"

"অতীন বললে, "বাবুকে ঢুকতে দাও ঘরে।" অখিল জোরের সঙ্গে বললে, "না, দেব না।"

অতীন বললে, "ভয় নেই, বাবুকে তুমি চেন ; অনেকবার দেখেছ ?"

"না চিনি নে।"

"খুব চেন। আমি বলছি, ভয় নেই, আমি আছি।"

এলা বললে, "অখিল, যা তুই মিথ্যে ভয় করিস নে।"

অখিল চলে গেল।

এলা জিজ্ঞাসা করলে, "বটু এসেছে না কি ?"

"না বটু নয়।"

"বলো-না, কে এসেছে। আমার ভালো লাগছে না।"

"থাক্ সে-কথা, যা বলছিলুম বলতে দাও।"

"অন্ত, কিছুতেই মন দিতে পারছি নে।"

"এলা, শেষ করতে দাও আমার কাহিনী। বেশি দেরি নেই।— তুমি উঠে এলে ছাদে। মৃদুগন্ধ পেলুম রজনীগন্ধার। ফুলের গুচ্ছটি সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলে একলা আমার হাতে দেবে বলে। আমাদের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে অন্তর জীবনলীলা শুরু হল এই লাজুক ফুলের গোপন অভ্যর্থনায়, তার পর থেকে অতীন্দ্রনাথের বিদ্যাবুদ্ধি গাম্ভীর্য ক্রমে ক্রমে তলিয়ে গেল অতলস্পর্শ আত্মবিস্মৃতিতে। সেইদিন প্রথম তুমি আমার গলা জড়িয়ে ধরলে, বললে এই নাও জন্মদিনের উপহার— সেই পেয়েছি প্রথম চুম্বন। আজ দাবি করতে এসেছি শেষ চুম্বনের।"

অখিল এসে বললে, "বাবুটি দরজায় ধাক্কা মারতে শুরু করেছে। ভাঙল বুঝি। বলছে, জরুরি কথা।"

"ভয় নেই অখিল, দরজা ভাঙবার আগেই তাকে ঠাণ্ডা করব। বাবুকে ঐখানেই অনাথ করে রেখে তুমি এখনই পালাও অন্য ঠিকানায়। আমি আছি এলাদির খবর নিতে।"

এলা অখিলকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে তার মাথায় চুমো খেয়ে বললে, "সোনা আমার, লক্ষ্মী আমার, ভাই আমার, তুই চলে যা। তোর জন্যে কখানা নোট আমার আঁচলে বেঁধে রেখেছি, তোর এলাদির আশীর্বাদ। আমার পা ছুঁয়ে বল্, এখনই তুই যাবি, দেরি করবি নে।"

অতীন বললে, "অখিল, আমার একটি পরামর্শ তোমাকে শুনতেই হবে। যদি তোমাকে কখনো কোনো প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করে তুমি ঠিক কথাই বলবে। বোলো এই রাত এগারোটার সময় আমিই

তোমাকে জোর করে এ-বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি। চলো কথাটাকে সত্য করে আসি।"

এলা আর-একবার অখিলকে কাছে টেনে নিয়ে বললে, "আমার জন্যে ভাবিস নে ভাই। তোর অন্তুদা রইল, কোনো ভয় নেই।"

অখিলকে যখন ঠেলে নিয়ে অতীন চলেছে এলা বললে, "আমিও যাই তোমার সঙ্গে অন্তু।"

আদেশের স্বরে অতীন বললে, "না, কিছুতেই না।"

ছাদের ছোটো পাঁচিলটার উপর বুক চেপে ধরে এলা দাঁড়িয়ে রইল— কণ্ঠের কাছে গুমরে গুমরে উঠতে লাগল কান্না, বুঝলে আজ রাত্রে ওর কাছ থেকে চিরকালের মতো অখিল গেল চলে!

ফিরে এল অতীন। এলা জিজ্ঞাসা করলে, "কী হল, অন্তু?"

অতীন বললে, "অখিল গেছে। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছি।"

"আর সেই লোকটি?"

"তাকেও দিয়েছি ছেড়ে। সে বসে বসে ভাবছিল কাজে ফাঁকি দিয়ে আমি বুঝি কেবল গল্পই করছি। যেন নতুন একটা আরব্য উপন্যাস শুরু হয়েছে। আরব্য উপন্যাসই বটে, সমস্তটাই গল্প, একেবারেই আজগবি গল্প। ভয় করছে এলা? আমাকে ভয় নেই তোমার?"

"তোমাকে ভয়, কী যে বল।"

"কী না করতে পারি আমি! পড়েছি পতনের শেষ সীমায়। সেদিন আমাদের দল অনাথা বিধবার সর্বস্ব লুঠ করে এনেছে। মন্মথ ছিল বুড়ির গ্রামসম্পর্কে চেনা লোক— খবর দিয়ে পথ দেখিয়ে সে-ই এনেছে দলকে। ছদ্মবেশের মধ্যেও বিধবা তাকে চিনতে পেরে বলে উঠল, মনু, বাবা তুই এমন কাজ করতে পারলি? তার পরে বুড়িকে আর বাঁচতে দিলে না। যাকে বলি দেশের প্রয়োজন সেই আত্মধর্মনাশের প্রয়োজনে টাকাটা এই হাত দিয়েই পৌঁচেছে যথাস্থানে। আমার উপবাস ভেঙেছি সেই টাকাতেই। এতদিন পরে যথার্থ দাগি হয়েছি চোরের কলঙ্কে, চোরাই মাল ছুঁয়েছি, ভোগ করেছি। চোর অতীন্দ্রের নাম বটু ফাঁস করে দিয়েছে। পাছে প্রমাণাভাবে শাস্তি না পাই বা অল্প শাস্তি পাই সেইজন্য পুলিস-সুপারিন্টেন্ডেন্টের মারফত সে-মকদ্দমা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দায়ের না হয়ে যাতে বাঙালি জয়ন্ত হাজরার এজলাসে ওঠে কমিশনরের কাছ থেকে সেই হুকুম আনাবে বলে মন্ত্রণা করে রেখেছে। সে নিশ্চিত জানে, কাল ধরা পড়বই। ইতিমধ্যে ভয় কোরো আমাকে, আমি নিজে ভয় করি আমার মৃত আত্মার কালো ভূতটাকে। আজ তোমার ঘরে কেউ নেই।"

"কেন, তুমি আছ।"

"আমার হাত থেকে বাঁচাবে কে?"

"নেই বা বাঁচালে?"

"তোমারই আপন মণ্ডলীতে একদিন যারা ছিল এলাদির সব দেশভাই— ভাইফোঁটা দিয়েছ যাদের কপালে প্রতিবৎসর— তাদেরই মধ্যে কথা উঠেছে যে তোমার বেঁচে থাকা উচিত নয়।"

"তাদের চেয়ে বেশি অপরাধ আমি কী করেছি?"

"অনেক কথা জান তুমি, অনেকের নামধাম। পীড়ন করলে বেরিয়ে পড়বে।"

"কখনোই না।"

"কী করে বলব যে-মানুষটা এসেছিল আজ, এই হুকুম নিয়েই সে আসে নি? হুকুমের জোর কত সে তো জান তুমি।"

এলা চমকে উঠে বললে, "সত্যি বলছ অন্তু, সত্যি?"

"একটা খবর পেয়েছি আমরা।"

"কী খবর?"

"আজ ভোররাত্রে পুলিস আসবে তোমাকে ধরতে।"

"নিশ্চিত জানতুম একদিন পুলিস আমাকে ধরতে আসছে।"

"কেমন করে জানলে?"

"কাল বটুর চিঠি পেয়েছি, সে খবর দিয়েছে পুলিস আমাকে ধরবে, লিখেছে— সে এখনো আমাকে বাঁচাতে পারে।"

"কী উপায়ে ?"

"বলছে, যদি আমি তাকে বিয়ে করি তা হলে সে আমার জামিন হয়ে আমার দায় গ্রহণ করবে।"

অন্ধকার হয়ে উঠল অতীনের মুখ, জিজ্ঞাসা করলে, "কী জবাব দিলে তুমি ?"

এলা বললে, "আমি সেই চিঠির উপরে কেবল লিখে দিলুম পিশাচ। আর-কিছু নয়।"

"খবর পেয়েছি, সেই বটুই আসবে কাল পুলিসকে সঙ্গে নিয়ে। তোমার সম্মতি পেলেই বাঘের সঙ্গে রফা করে তোমাকে কুমিরের গর্তে আশ্রয় দেবার হিতব্রতে সে উঠে পড়ে লাগবে। তার হৃদয় কোমল।"

এলা অতীনের পা জড়িয়ে ধরে বললে, "মারো আমাকে অন্তু, নিজের হাতে। তার চেয়ে সৌভাগ্য আমার কিছু হতে পারে না।" মেঝের থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অতীনকে বার বার চুমো খেয়ে খেয়ে বললে, "মারো এইবার মারো।" ছিঁড়ে ফেললে বুকের জামা।

অতীন পাথরের মূর্তির মতো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এলা বললে, "একটুও ভেবো না অন্তু। আমি যে তোমার, সম্পূর্ণই তোমার— মরণেও তোমার নাও আমাকে। নোংরা হাত লাগতে দিয়ো না আমার গায়ে, আমার এ দেহ তোমার।"

অতীন কঠিন সুরে বললে, "যাও এখনই শুতে যাও, হুকুম করছি শুতে যাও।"

অতীনকে বুকে চেপে ধরে এলা বলতে লাগল।— "অন্তু, অন্তু আমার, আমার রাজা, আমার দেবতা, তোমাকে কত ভালোবেসেছি আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ করে তা জানাতে পারলুম না। সেই ভালোবাসার দোহাই, মারো, আমাকে মারো।"

অতীন এলার হাত জোর করে ধরে তাকে শোবার ঘরে টেনে নিয়ে গেল, বললে, "শোও, এখনই শোও। ঘুমোও।"

"ঘুম হবে না।"

"ঘুমোবার ওষুধ আছে আমার হাতে।"

"কিচ্ছু দরকার নেই অন্তু। আমার চৈতন্যের শেষ মুহূর্ত তুমিই নাও। ক্লোরোফর্ম এনেছ ? দাও ওটাকে ফেলে। ভীরু নই আমি ; জেগে থেকে যাতে মরি তোমার কোলে তাই করো। শেষ চুম্বন আজ অফুরান হল অন্তু। অন্তু !"

দূরের থেকে হুইস্‌লের শব্দ এল।

গল্পগুচ্ছ

গল্পগুচ্ছ

ঘাটের কথা

পাষাণে ঘটনা যদি অঙ্কিত হইত তবে কতদিনকার কত কথা আমার সোপানে সোপানে পাঠ করিতে পারিতে। পুরাতন কথা যদি শুনিতে চাও, তবে আমার এই ধাপে বইস ; মনোযোগ দিয়া জলকল্লোলে কান পাতিয়া থাকো, বহুদিনকার কত বিস্মৃত কথা শুনিতে পাইবে।

আমার আর-একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। সেও ঠিক এইরূপ দিন। আশ্বিন মাস পড়িতে আর দুই-চারি দিন বাকি আছে। ভোরের বেলায় অতি ঈষৎ মধুর নবীন শীতের বাতাস নিদ্রোত্থিতের দেহে নূতন প্রাণ আনিয়া দিতেছে। তরুপল্লব অমনি একটু একটু শিহরিয়া উঠিতেছে।

ভরা গঙ্গা। আমার চারিটিমাত্র ধাপ জলের উপরে জাগিয়া আছে। জলের সঙ্গে স্থলের সঙ্গে যেন গলাগলি। তীরে আম্রকাননের নীচে যেখানে কচুবন জন্মিয়াছে, সেখান পর্যন্ত গঙ্গার জল গিয়াছে। নদীর ঐ বাঁকের কাছে তিনটে পুরাতন ইঁটের পাঁজা চারি দিকে জলের মধ্যে জাগিয়া রহিয়াছে। জেলেদের যে নৌকাগুলি ডাঙার বাবলাগাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিল সেগুলি প্রভাতে জোয়ারের জলে ভাসিয়া উঠিয়া টলমল করিতেছে— দুরন্তযৌবন জোয়ারের জল রঙ্গ করিয়া তাহাদের দুই পাশে ছল ছল আঘাত করিতেছে, তাহাদের কর্ণ ধরিয়া মধুর পরিহাসে নাড়া দিয়া যাইতেছে।

ভরা গঙ্গার উপরে শরৎপ্রভাতের যে রৌদ্র পড়িয়াছে, তাহা কাঁচা সোনার মতো রঙ, চাঁপা ফুলের মতো রঙ। রৌদ্রের এমন রঙ আর কোনো সময়ে দেখা যায় না। চড়ার উপরে কাশবনের উপরে রৌদ্র পড়িয়াছে। এখনো কাশফুল সব ফুটে নাই, ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র।

রাম রাম বলিয়া মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। পাখিরা যেমন আলোতে পাখা মেলিয়া আনন্দে নীল আকাশে উড়িয়াছে, ছোটো ছোটো নৌকাগুলি তেমনি ছোটো ছোটো পাল ফুলাইয়া সূর্যকিরণে বাহির হইয়াছে। তাহাদের পাখি বলিয়া মনে হয় ; তাহারা রাজহাঁসের মতো জলে ভাসিতেছে, কিন্তু আনন্দে পাখা দুটি আকাশে ছড়াইয়া দিয়াছে।

ভট্টাচার্য মহাশয় ঠিক নিয়মিত সময়ে কোশাকুশি লইয়া স্নান করিতে আসিয়াছেন। মেয়েরা দুই-একজন করিয়া জল লইতে আসিয়াছে।

সে বড়ো বেশি দিনের কথা নহে। তোমাদের অনেক দিন বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু আমার মনে হইতেছে এই সেদিনের কথা। আমার দিনগুলি কিনা গঙ্গার স্রোতের উপর খেলাইতে খেলাইতে ভাসিয়া যায়, বহুকাল ধরিয়া স্থিরভাবে তাহাই দেখিতেছি— এইজন্য সময় বড়ো দীর্ঘ বলিয়া মনে হয় না। আমার দিনের আলো রাত্রের ছায়া প্রতিদিন গঙ্গার উপরে পড়ে আবার প্রতিদিন গঙ্গার উপর হইতে মুছিয়া যায়, কোথাও তাহাদের ছবি রাখিয়া যায় না। সেইজন্য, যদিও আমাকে বৃদ্ধের মতো দেখিতে হইয়াছে, আমার হৃদয় চিরকাল নবীন। বহু বৎসরের স্মৃতির শৈবালভারে আচ্ছন্ন হইয়া আমার সূর্যকিরণ মারা পড়ে নাই। দৈবাৎ, একটা ছিন্ন শৈবাল ভাসিয়া আসিয়া গায়ে লাগিয়া থাকে, আবার স্রোতে ভাসিয়া যায়। তাই বলিয়া যে কিছু নাই এমন বলিতে পারি না। যেখানে গঙ্গার স্রোত পৌঁছায় না, সেখানে আমার ছিদ্রে ছিদ্রে যে লতাগুল্মশৈবাল জন্মিয়াছে, তাহারাই আমার পুরাতনের সাক্ষী, তাহারাই পুরাতন কালকে স্নেহপাশে বাঁধিয়া চিরদিন শ্যামল মধুর, চিরদিন নূতন করিয়া রাখিয়াছে। গঙ্গা প্রতিদিন আমার কাছ হইতে এক-এক ধাপ সরিয়া যাইতেছেন, আমিও এক-এক ধাপ করিয়া পুরাতন হইতেছি।

চক্রবর্তীদের বাড়ির ঐ-যে বৃদ্ধা স্নান করিয়া নামাবলী গায়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মালা জপিতে জপিতে বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছেন, উহার মাতামহী তখন এতটুকু ছিল। আমার মনে আছে তাহার এক খেলা ছিল, সে প্রত্যহ একটা ঘৃতকুমারীর পাতা গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিত। আমার দক্ষিণ বাহুর কাছে একটা পাকের মতো ছিল ; সেইখানে পাতাটা ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, সে কলসী রাখিয়া দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিত। যখন দেখিলাম কিছুদিন বাদে সেই মেয়েটিই আবার ডাগর হইয়া উঠিয়া তাহার নিজের একটি মেয়ে সঙ্গে লইয়া জল লইতে আসিল, সে মেয়েও আবার বড়ো হইল— বালিকারা জল ছুঁড়িয়া দুরন্তপনা করিলে তিনিও আবার তাহাদিগকে শাসন করিতেন ও ভদ্রোচিত ব্যবহার শিক্ষা দিতেন, তখন আমার সেই ঘৃতকুমারীর নৌকা ভাসানো মনে পড়িত ও বড়ো কৌতুক বোধ হইত।

যে কথাটা বলিব মনে করি সে আর আসে না। একটা কথা বলিতে বলিতে স্রোতে আর-একটা কথা ভাসিয়া আসে। কথা আসে, কথা যায়, ধরিয়া রাখিতে পারি না। কেবল এক-একটা কাহিনী সেই ঘৃতকুমারীর নৌকাগুলির মতো পাকে পড়িয়া অবিশ্রাম ফিরিয়া ফিরিয়া আসে। তেমনি একটা কাহিনী তাহার পসরা লইয়া আজ আমার কাছে ফিরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, কখন ডোবে কখন ডোবে। পাতাটুকুরই মতো সে অতি ছোটো, তাহাতে বেশি কিছু নাই, দুটি খেলার ফুল আছে। তাহাকে ডুবিতে দেখিলে কোমলপ্রাণা বালিকা কেবলমাত্র একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইবে।

মন্দিরের পাশে যেখানে ঐ গোঁসাইদের গোয়ালঘরের বেড়া দেখিতেছ, ঐখানে একটা বাবলা গাছ ছিল। তাহারই তলায় সপ্তাহে একদিন করিয়া হাট বসিত। তখনো গোঁসাইরা এখানে বসতি করে নাই। যেখানে তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপ পড়িয়াছে, ঐখানে একটা গোলপাতার ছাউনি ছিল মাত্র।

এই যে অশথ গাছ আজ আমার পঞ্জরে পঞ্জরে বাহু প্রসারণ করিয়া সুবিকট সুদীর্ঘ কঠিন অঙ্গুলিজালের ন্যায় শিকড়গুলির দ্বারা আমার বিদীর্ণ পাষাণ-প্রাণ মুঠা করিয়া রাখিয়াছে, এ তখন এতটুকু একটুখানি চারা ছিল মাত্র। কচি কচি পাতাগুলি লইয়া মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। রৌদ্র উঠিলে ইহার পাতার ছায়াগুলি আমার উপর সমস্ত দিন ধরিয়া খেলা করিত, ইহার নবীন শিকড়গুলি শিশুর অঙ্গুলির ন্যায় আমার বুকের কাছে কিলবিল করিত। কেহ ইহার একটি পাতা ছিঁড়িলে আমার ব্যথা বাজিত।

যদিও বয়স অনেক হইয়াছিল তবু তখনো আমি সিধা ছিলাম। আজ যেমন মেরুদণ্ড ভাঙিয়া অষ্টাবক্রের মতো বাঁকিয়া চুরিয়া গিয়াছি, গভীর ত্রিবলিরেখার মতো সহস্র জায়গায় ফাটল ধরিয়াছে, আমার গর্ভের মধ্যে বিশ্বের ভেক তাহাদের শীতকালের সুদীর্ঘ নিদ্রার আয়োজন করিতেছে, তখন আমার সে দশা ছিল না। কেবল আমার বামবাহুর বাহিরের দিকে দুইখানি ইঁটের অভাব ছিল, সেই গর্তটির মধ্যে একটা ফিঙে বাসা করিয়াছিল। ভোরের বেলায় যখন সে উসুখুসু করিয়া জাগিয়া উঠিত, মৎস্যপুচ্ছের ন্যায় তাহার জোড়াপুচ্ছ দুই-চারিবার দ্রুত নাচাইয়া শিস দিয়া আকাশে উড়িয়া যাইত, তখন জানিতাম, কুসুমের ঘাটে আসিবার সময় হইয়াছে।

যে মেয়েটির কথা বলিতেছি ঘাটের অন্যান্য মেয়েরা তাহাকে কুসুম বলিয়া ডাকিত। বোধ করি কুসুমই তাহার নাম হইবে। জলের উপরে যখন কুসুমের ছোটো ছায়াটি পড়িত, তখন আমার সাধ যাইত সে ছায়াটি যদি ধরিয়া রাখিতে পারি, সে ছায়াটি যদি আমার পাষাণে বাঁধিয়া রাখিতে পারি ; এমনি তাহার একটি মাধুরী ছিল। সে যখন আমার পাষাণের উপর পা ফেলিত ও তাহার চারগাছি মল বাজিতে থাকিত, তখন আমার শৈবালগুল্মগুলি যেন পুলকিত হইয়া উঠিত। কুসুম যে খুব বেশি জলে খেলা করিত বা গল্প করিত, বা হাসিতামাশা করিত তাহা নহে, তথাপি আশ্চর্য এই, তাহার যত সঙ্গিনী এমন আর কাহারও নয়। যত দুরন্ত মেয়েদের তাহাকে না হইলে চলিত না। কেহ তাহাকে বলিত কুসি, কেহ তাহাকে বলিত খুশি, কেহ তাহাকে বলিত রাক্কুসি। তাহার মা তাহাকে বলিত কুস্‌মি। যখন-তখন দেখিতাম কুসুম জলের ধারে বসিয়া আছে। জলের সঙ্গে তাহার হৃদয়ের সঙ্গে বিশেষ যেন কী মিল ছিল। সে জল ভারি ভালোবাসিত।

কিছুদিন পরে কুসুমকে আর দেখিতে পাই না। ভুবন আর স্বর্ণ ঘাটে আসিয়া কাঁদিত। শুনিলাম তাহাদের কুসি-খুশি-রাক্কুসিকে শ্বশুরবাড়ি লইয়া গিয়াছে। শুনিলাম, যেখানে তাহাকে লইয়া গেছে, সেখানে নাকি গঙ্গা নাই। সেখানে আবার কারা সব নূতন লোক, নূতন ঘরবাড়ি, নূতন পথঘাট। জলের পদ্মটিকে কে যেন ডাঙায় রোপণ করিতে লইয়া গেল।

ক্রমে কুসুমের কথা একরকম ভুলিয়া গেছি। এক বৎসর হইয়া গেছে। ঘাটের মেয়েরা কুসুমের গল্পও বড়ো করে না একদিন সন্ধ্যার সময়ে বহুকালের পরিচিত পায়ের স্পর্শে সহসা যেন চমক লাগিল। মনে হইল যেন কুসুমের পা। তাহাই বটে, কিন্তু সে পায়ে আর মল বাজিতেছে না। সে পায়ের সে সংগীত নাই। কুসুমের পায়ের স্পর্শ ও মলের শব্দ চিরকাল একত্র অনুভব করিয়া আসিতেছি— আজ সহসা সেই মলের শব্দটি না শুনিতে পাইয়া সন্ধ্যাবেলাকার জলের কল্লোল কেমন বিষণ্ণ শুনাইতে লাগিল, আম্রবনের মধ্যে পাতা ঝরঝর করিয়া বাতাস কেমন হা হা করিয়া উঠিল।

কুসুম বিধবা হইয়াছে। শুনিলাম তাহার স্বামী বিদেশে চাকরি করিত ; দুই-একদিন ছাড়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎই হয় নাই। পত্রযোগে বৈধব্যের সংবাদ পাইয়া আট বৎসর বয়সে মাথার সিঁদুর মুছিয়া গায়ের গহনা ফেলিয়া আবার তাহার দেশে সেই গঙ্গার ধারে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু, তাহার সঙ্গিনীদেরও বড়ো কেহ নাই। ভুবন স্বর্ণ অমলা শ্বশুরঘর করিতে গিয়াছে। কেবল শরৎ আছে, কিন্তু শুনিতেছি অগ্রহায়ণ মাসে তাহারও বিবাহ হইয়া যাইবে। কুসুম নিতান্ত একলা পড়িয়াছে। কিন্তু, সে যখন দুটি হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া আমার ধাপে বসিয়া থাকিত, তখন আমার মনে হইত যেন নদীর ঢেউগুলি সবাই মিলিয়া হাত তুলিয়া তাহাকে কুসি-খুশি-রাক্কুসি বলিয়া ডাকাডাকি করিত।

বর্ষার আরম্ভে গঙ্গা যেমন প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠে, কুসুম তেমনি দেখিতে দেখিতে প্রতিদিন সৌন্দর্যে যৌবনে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মলিন বসন করুণ মুখ শান্ত স্বভাবে তাহার যৌবনের উপর এমন একটি ছায়াময় আবরণ রচনা করিয়া দিয়াছিল যে, সে যৌবন সে বিকশিত রূপ সাধারণের চোখে পড়িত না। কুসুম যে বড়ো হইয়াছে এ যেন কেহ দেখিতে পাইত না। আমি তো পাইতাম না। আমি কুসুমকে সেই বালিকাটির চেয়ে বড়ো কখনো দেখি নাই। তাহার মল ছিল না বটে, কিন্তু সে যখন চলিত আমি সেই মলের শব্দ শুনিতে পাইতাম। এমনি করিয়া দশ বৎসর কখন কাটিয়া গেল, গাঁয়ের লোকেরা কেহ যেন জানিতেই পারিল না।

এই আজ যেমন দেখিতেছ, সে বৎসরেও ভাদ্র মাসের শেষাশেষি এমন একদিন আসিয়াছিল। তোমাদের প্রপিতামহীরা সেদিন সকালে উঠিয়া এমনিতরো মধুর সূর্যের আলো দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা যখন এতখানি ঘোমটা টানিয়া কলসী তুলিয়া লইয়া আমার উপরে প্রভাতের আলো আরো আলোময় করিবার জন্য গাছপালার মধ্য দিয়া গ্রামের উঁচুনিচু রাস্তার ভিতর দিয়া গল্প করিতে করিতে চলিয়া আসিতেন তখন তোমাদের সম্ভাবনাও তাঁহাদের মনের এক পার্শ্বে উদিত হইত না। তোমরা যেমন ঠিক মনে করিতে পার না, তোমাদের দিদিমারাও সত্যসত্যই একদিন খেলা করিয়া বেড়াইতেন, আজিকার দিন যেমন সত্য, যেমন জীবন্ত, সেদিনও ঠিক তেমনি সত্য ছিল, তোমাদের মতো তরুণ হৃদয়খানি লইয়া সুখে দুঃখে তাঁহারা তোমাদেরই মতো টলমল করিয়া দুলিয়াছেন, তেমনি আজিকার এই শরতের দিন, তাঁহারা-হীন, তাঁহাদের সুখদুঃখের স্মৃতিলেশমাত্রহীন আজিকার এই শরতের সূর্যকরোজ্জ্বল আনন্দছবি— তাঁহাদের কল্পনার নিকটে তদপেক্ষাও অগোচর ছিল।

সেদিন ভোর হইতে প্রথম উত্তরের বাতাস অল্প অল্প করিয়া বহিতে আরম্ভ করিয়া ফুটন্ত বাবলা ফুলগুলি আমার উপরে এক-আধটা উড়াইয়া ফেলিতেছিল। আমার পাষাণের উপরে একটু একটু শিশিরের রেখা পড়িয়াছিল। সেইদিন সকালে কোথা হইতে গৌরতনু সৌম্যোজ্জ্বলমুখচ্ছবি দীর্ঘকায় এক নবীন সন্ন্যাসী আসিয়া আমার সম্মুখস্থ ঐ শিবমন্দিরে আশ্রয় লইলেন। সন্ন্যাসীর আগমনবার্তা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। মেয়েরা কলসী রাখিয়া বাবাঠাকুরকে প্রণাম করিবার জন্য মন্দিরে গিয়া ভিড় করিল।

ভিড় প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। একে সন্ন্যাসী, তাহাতে অনুপম রূপ, তাহাতে তিনি কাহাকেও

অবহেলা করিতেন না, ছেলেদের কোলে লইয়া বসাইতেন, জননীদিগকে ঘরকন্নার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। নারীসমাজে অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার অত্যন্ত প্রতিপত্তি হইল। তাঁহার কাছে পুরুষও বিস্তর আসিত। কোনোদিন ভাগবত পাঠ করিতেন, কোনোদিন ভগবদ্‌গীতার ব্যাখ্যা করিতেন, কোনোদিন মন্দিরে বসিয়া নানা শাস্ত্র লইয়া আন্দোলন করিতেন। তাঁহার নিকটে কেহ উপদেশ লইতে আসিত, কেহ মন্ত্র লইতে আসিত। কেহ রোগের ঔষধ জানিতে আসিত। মেয়েরা ঘাটে আসিয়া বলাবলি করিত— আহা কী রূপ! মনে হয় যেন মহাদেব সশরীরে তাঁহার মন্দিরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

যখন সন্ন্যাসী প্রতিদিন প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের পূর্বে শুকতারাকে সম্মুখে রাখিয়া গঙ্গার জলে নিমগ্ন হইয়া ধীরগম্ভীরস্বরে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেন, তখন আমি জলের কল্লোল শুনিতে পাইতাম না। তাঁহার সেই কণ্ঠস্বর শুনিতে শুনিতে প্রতিদিন গঙ্গার পূর্ব উপকূলের আকাশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত, মেঘের ধারে ধারে অরুণ রঙের রেখা পড়িত, অন্ধকার যেন বিকাশোন্মুখ কুঁড়ির আবরণ-পুটের মতো ফাটিয়া চারি দিকে নামিয়া পড়িত ও আকাশ-সরোবরে উষাকুসুমের লাল আভা অল্প অল্প করিয়া বাহির হইয়া আসিত। আমার মনে হইত যে, এই মহাপুরুষ গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া পূর্বের দিকে চাহিয়া যে এক মহামন্ত্র পাঠ করেন তাহারই এক-একটি শব্দ উচ্চারিত হইতে থাকে আর নিশীথিনীর কুহক ভাঙিয়া যায়, চন্দ্র-তারা পশ্চিমে নামিয়া পড়ে, সূর্য পূর্বাকাশে উঠিতে থাকে, জগতের দৃশ্যপট পরিবর্তিত হইয়া যায়। এ কে মায়াবী। স্নান করিয়া যখন সন্ন্যাসী হোমশিখার ন্যায় তাঁহার দীর্ঘ শুভ্র পুণ্যতনু লইয়া জল হইতে উঠিতেন, তাঁহার জটাজূট হইতে জল ঝরিয়া পড়িত, তখন নবীন সূর্যকিরণ তাঁহার সর্বাঙ্গে পড়িয়া প্রতিফলিত হইতে থাকিত।

এমন আরো কয়েক মাস কাটিয়া গেল। চৈত্র মাসে সূর্যগ্রহণের সময় বিস্তর লোক গঙ্গাস্নানে আসিল। বাবলাতলায় মস্ত হাট বসিল। এই উপলক্ষে সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্যও লোকসমাগম হইল। যে গ্রামে কুসুমের শ্বশুরবাড়ি সেখান হইতেও অনেকগুলি মেয়ে আসিয়াছিল।

সকালে আমার ধাপে বসিয়া সন্ন্যাসী জপ করিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াই সহসা একজন মেয়ে আর-একজনের গা টিপিয়া বলিয়া উঠিল, "ওলো, এ যে আমাদের কুসুমের স্বামী।"

আর-একজন দুই আঙুলে ঘোমটা কিছু ফাঁক করিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "ওমা, তাই তো গা, এ যে আমাদের চাটুজ্যেদের বাড়ির ছোটোদাদাবাবু।"

আর-একজন ঘোমটার বড়ো ঘটা করিত না, সে কহিল, "আহা, তেমনি কপাল, তেমনি নাক, তেমনি চোখ।"

আর-একজন সন্ন্যাসীর দিকে মনোযোগ না করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কলসী দিয়া জল ঠেলিয়া বলিল, "আহা সে কি আর আছে। সে কি আর আসবে। কুসুমের কি তেমনি কপাল।"

তখন কেহ কহিল, "তার এত দাড়ি ছিল না।"

কেহ বলিল, "সে এমন একহারা ছিল না।"

কেহ বলিল, "সে যেন এতটা লম্বা নয়।"

এইরূপে এ কথাটার একরূপ নিষ্পত্তি হইয়া গেল, আর উঠিতে পাইল না।

গ্রামের আর সকলেই সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিল, কেবল কুসুম দেখে নাই। অধিক লোকসমাগম হওয়াতে কুসুম আমার কাছে আসা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা পূর্ণিমা তিথিতে চাঁদ উঠিতে দেখিয়া বুঝি আমাদের পুরাতন সম্বন্ধ তাহার মনে পড়িল।

তখন ঘাটে আর কেহ লোক ছিল না। ঝিঁঝি পোকা ঝিঁ ঝিঁ করিতেছিল। মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বাজা এই কিছুক্ষণ হইল শেষ হইয়া গেল, তাহার শেষ শব্দতরঙ্গ ক্ষীণতর হইয়া পরপারের ছায়াময় বনশ্রেণীর মধ্যে ছায়ার মতো মিলাইয়া গেছে। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না। জোয়ারের জল ছল ছল করিতেছে। আমার উপরে ছায়াটি ফেলিয়া কুসুম বসিয়া আছে। বাতাস বড়ো ছিল না, গাছপালা নিস্তব্ধ। কুসুমের সম্মুখে গঙ্গার বক্ষে অবারিত প্রসারিত জ্যোৎস্না— কুসুমের পশ্চাতে আশে পাশে

ঝোপে ঝাপে গাছে পালায়, মন্দিরের ছায়ায়, ভাঙা ঘরের ভিত্তিতে, পুষ্করিণীর ধারে, তালবনে অন্ধকার গা ঢাকা দিয়া, মুখে মুড়ি দিয়া বসিয়া আছে। ছাতিম গাছের শাখায় বাদুড় ঝুলিতেছে। মন্দিরের চূড়ায় বসিয়া পেচক কাঁদিয়া উঠিতেছে। লোকালয়ের কাছে শৃগালের ঊর্ধ্বচীৎকারধ্বনি উঠিল ও থামিয়া গেল।

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ঘাটে আসিয়া দুই-এক সোপান নামিয়া একাকিনী রমণীকে দেখিয়া ফিরিয়া যাইবেন মনে করিতেছেন— এমন সময়ে সহসা কুসুম মুখ তুলিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল।

তাহার মাথার উপর হইতে কাপড় পড়িয়া গেল। ঊর্ধ্বমুখ ফুটন্ত ফুলের উপরে যেমন জ্যোৎস্না পড়ে, মুখ তুলিতেই কুসুমের মুখের উপর তেমনি জ্যোৎস্না পড়িল। সেই মুহূর্তেই উভয়ের দেখা হইল। যেন চেনাশোনা হইল। মনে হইল যেন পূর্বজন্মের পরিচয় ছিল।

মাথার উপর দিয়া পেচক ডাকিয়া চলিয়া গেল। শব্দে সচকিত হইয়া আত্মসংবরণ করিয়া কুসুম মাথার কাপড় তুলিয়া দিল। উঠিয়া সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া প্রণাম করিল।

সন্ন্যাসী আশীর্বাদ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী।"

কুসুম কহিল, "আমার নাম কুসুম।"

সে-রাত্রে আর কোনো কথা হইল না। কুসুমের ঘর খুব কাছেই ছিল, কুসুম ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সে-রাত্রে সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার সোপানে বসিয়া ছিলেন। অবশেষে যখন পূর্বের চাঁদ পশ্চিমে আসিল, সন্ন্যাসীর পশ্চাতের ছায়া সম্মুখে আসিয়া পড়িল, তখন তিনি উঠিয়া মন্দিরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

তাহার পরদিন হইতে আমি দেখিতাম কুসুম প্রত্যহ আসিয়া সন্ন্যাসীর পদধূলি লইয়া যাইত। সন্ন্যাসী যখন শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেন তখন সে একধারে দাঁড়াইয়া শুনিত। সন্ন্যাসী প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া কুসুমকে ডাকিয়া তাহাকে ধর্মের কথা বলিতেন। সব কথা সে কি বুঝিতে পারিত। কিন্তু অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সে চুপ করিয়া বসিয়া শুনিত। সন্ন্যাসী তাহাকে যেমন উপদেশ করিতেন সে অবিকল তাহাই পালন করিত। প্রত্যহ সে মন্দিরের কাজ করিত— দেবসেবায় আলস্য করিত না— পূজার ফুল তুলিত— গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া মন্দির ধৌত করিত।

সন্ন্যাসী তাহাকে যে-সকল কথা বলিয়া দিতেন, আমার সোপানে বসিয়া সে তাহাই ভাবিত। ধীরে ধীরে তাহার যেন দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া গেল, হৃদয় উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। সে যাহা দেখে নাই তাহা দেখিতে লাগিল, যাহা শোনে নাই তাহা শুনিতে লাগিল। তাহার প্রশান্ত মুখে যে একটি ম্লান ছায়া ছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। সে যখন ভক্তিভরে প্রভাতে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িত, তখন তাহাকে দেবতার নিকটে উৎসর্গীকৃত শিশিরধৌত পূজার ফুলের মতো দেখাইত। একটি সুবিমল প্রফুল্লতা তাহার সর্বশরীর আলো করিয়া তুলিল।

শীতকালের এই অবসান সময়ে শীতের বাতাস বয়, আবার এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সহসা দক্ষিণ হইতে বসন্তের বাতাস দিতে থাকে, আকাশে হিমের ভাব একেবারে দূর হইয়া যায়— অনেক দিন পরে গ্রামের মধ্যে বাঁশি বাজিয়া উঠে, গানের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। মাঝিরা স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া দাঁড় বন্ধ করিয়া শ্যামের গান গাহিতে থাকে। শাখা হইতে শাখান্তরে পাখিরা সহসা পরম উল্লাসে উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে আরম্ভ করে। সময়টা এইরূপ আসিয়াছে।

বসন্তের বাতাস লাগিয়া আমার পাষাণ-হৃদয়ের মধ্যে অল্পে অল্পে যেন যৌবনের সঞ্চার হইতেছে; আমার প্রাণের ভিতরকার সেই নবযৌবনোচ্ছ্বাস আকর্ষণ করিয়াই যেন আমার লতাগুল্মগুলি দেখিতে দেখিতে ফুলে ফুলে একেবারে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। এ সময়ে কুসুমকে আর দেখিতে পাই না। কিছুদিন হইতে সে আর মন্দিরেও আসে না, ঘাটেও আসে না, সন্ন্যাসীর কাছে তাহাকে আর দেখা যায় না।

ইতিমধ্যে কী হইল আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। কিছুকাল পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমারই সোপানে সন্ন্যাসীর সহিত কুসুমের সাক্ষাৎ হইল।

কুসুম মুখ নত করিয়া কহিল, "প্রভু, আমাকে কি ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।"

"হাঁ, তোমাকে দেখিতে পাই না কেন। আজকাল দেবসেবায় তোমার এত অবহেলা কেন।"

কুসুম চুপ করিয়া রহিল।

"আমার কাছে তোমার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলো।"

কুসুম ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া কহিল, "প্রভু, আমি পাপীয়সী, সেইজন্যই এই অবহেলা!"

সন্ন্যাসী অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "কুসুম, তোমার হৃদয়ে অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।"

কুসুম যেন চমকিয়া উঠিল— সে হয়তো মনে করিল, সন্ন্যাসী কতটা না জানি বুঝিয়াছেন। তাহার চোখ অল্পে অল্পে জলে ভরিয়া আসিল, সে সেইখানে বসিয়া পড়িল; মুখে আঁচল ঢাকিয়া সোপানে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী কিছুদূরে সরিয়া গিয়া কহিলেন, "তোমার অশান্তির কথা আমাকে সমস্ত ব্যক্ত করিয়া বলো, আমি তোমাকে শান্তির পথ দেখাইয়া দিব।"

কুসুম অটল ভক্তির স্বরে কহিল, কিন্তু মাঝে মাঝে থামিল, মাঝে মাঝে কথা বাধিয়া গেল— "আপনি আদেশ করেন তো অবশ্য বলিব। তবে, আমি ভালো করিয়া বলিতে পারিব না, কিন্তু আপনি বোধ করি মনে মনে সকলই জানিতেছেন। প্রভু, আমি একজনকে দেবতার মতো ভক্তি করিতাম, আমি তাঁহাকে পূজা করিতাম, সেই আনন্দে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া ছিল। কিন্তু একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম যেন তিনি আমার হৃদয়ের স্বামী, কোথায় যেন একটি বকুলবনে বসিয়া তাঁহার বামহস্তে আমার দক্ষিণহস্ত লইয়া আমাকে তিনি প্রেমের কথা বলিতেছেন। এ ঘটনা আমার কিছুই অসম্ভব, কিছুই আশ্চর্য মনে হইল না। স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল, তবু স্বপ্নের ঘোর ভাঙিল না। তাহার পরদিন যখন তাঁহাকে দেখিলাম আর পূর্বের মতো দেখিলাম না। মনে সেই স্বপ্নের ছবিই উদয় হইতে লাগিল। ভয়ে দূরে পলাইলাম, কিন্তু সে ছবি আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিল। সেই অবধি আমার হৃদয়ের অশান্তি দূর হয় না— আমার সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেছে।"

যখন কুসুম অশ্রু মুছিয়া মুছিয়া এই কথাগুলি বলিতেছিল, তখন আমি অনুভব করিতেছিলাম সন্ন্যাসী সবলে তাঁহার দক্ষিণ পদতল দিয়া আমার পাষাণ চাপিয়া ছিলেন।

কুসুমের কথা শেষ হইলে সন্ন্যাসী বলিলেন, "যাহাকে স্বপ্ন দেখিয়াছ সে কে বলিতে হইবে।"

কুসুম জোড়হাতে কহিল, "তাহা বলিতে পারিব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "তোমার মঙ্গলের জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে কে স্পষ্ট করিয়া বলো।"

কুসুম সবলে নিজের কোমল হাত দুটি পীড়ন করিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, "নিতান্ত সে কি বলিতেই হইবে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "হাঁ, বলিতেই হইবে।"

কুসুম তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "প্রভু, সে তুমি।"

যেমনি তাহার নিজের কথা নিজের কানে গিয়া পৌঁছিল, অমনি সে মূর্ছিত হইয়া আমার কঠিন কোলে পড়িয়া গেল। সন্ন্যাসী প্রস্তরের মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যখন মূর্ছা ভাঙিয়া কুসুম উঠিয়া বসিল, তখন সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে কহিলেন, "তুমি আমার সকল কথাই পালন করিয়াছ; আর-একটি কথা বলিব পালন করিতে হইবে। আমি আজই এখান হইতে চলিলাম, আমার সঙ্গে তোমার দেখা না হয়। আমাকে তোমার ভুলিতে হইবে। বলো এই সাধনা করিবে।" কুসুম উঠিয়া দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর মুখের পানে চাহিয়া ধীর স্বরে কহিল, "প্রভু, তাহাই হইবে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "তবে আমি চলিলাম।"

কুসুম আর কিছু না বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল। সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

কুসুম কহিল, "তিনি আদেশ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাকে ভুলিতে হইবে।" বলিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গার জলে নামিল।

এতটুকু বেলা হইতে সে এই জলের ধারে কাটাইয়াছে, শ্রান্তির সময় এ জল যদি হাত বাড়াইয়া তাহাকে কোলে করিয়া না লইবে, তবে আর কে লইবে। চাঁদ অস্ত গেল, রাত্রি ঘোর অন্ধকার হইল। জলের শব্দ শুনিতে পাইলাম, আর কিছু বুঝিতে পারিলাম না। অন্ধকারে বাতাস হুহু করিতে লাগিল ; পাছে তিলমাত্র কিছু দেখা যায় বলিয়া সে যেন ফুঁ দিয়া আকাশের তারাগুলিকে নিবাইয়া দিতে চায়।

আমার কোলে যে খেলা করিত সে আজ তাহার খেলা সমাপন করিয়া আমার কোল হইতে কোথায় সরিয়া গেল, জানিতে পারিলাম না।

কার্তিক ১২৯১

রাজপথের কথা

আমি রাজপথ। অহল্যা যেমন মুনির শাপে পাষাণ হইয়া পড়িয়া ছিল, আমিও যেন তেমনি কাহার শাপে চিরনিদ্রিত সুদীর্ঘ অজগর সর্পের ন্যায় অরণ্যপর্বতের মধ্য দিয়া, বৃক্ষশ্রেণীর ছায়া দিয়া, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের বক্ষের উপর দিয়া দেশদেশান্তর বেষ্টন করিয়া বহুদিন ধরিয়া জড়শয়নে শয়ান রহিয়াছি। অসীম ধৈর্যের সহিত ধুলায় লুটাইয়া শাপান্তকালের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি। আমি চিরদিন স্থির অবিচল, চিরদিন একই ভাবে শুইয়া আছি, কিন্তু তবুও আমার এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম নাই। এতটুকু বিশ্রাম নাই যে, আমার এই কঠিন শুষ্ক শয্যার উপরে একটিমাত্র কচি স্নিগ্ধ শ্যামল ঘাস উঠাইতে পারি ; এতটুকু সময় নাই যে, আমার শিয়রের কাছে অতি ক্ষুদ্র একটি নীলবর্ণের বনফুল ফুটাইতে পারি। কথা কহিতে পারি না, অথচ অন্ধভাবে সকলই অনুভব করিতেছি। রাত্রিদিন পদশব্দ ; কেবলই পদশব্দ। আমার এই গভীর জড়নিদ্রার মধ্যে লক্ষ লক্ষ চরণের শব্দ অহর্নিশ দুঃস্বপ্নের ন্যায় আবর্তিত হইতেছে। আমি চরণের স্পর্শে হৃদয় পাঠ করিতে পারি। আমি বুঝিতে পারি, কে গৃহে যাইতেছে, কে বিদেশে যাইতেছে, কে কাজে যাইতেছে, কে বিশ্রামে যাইতেছে, কে উৎসবে যাইতেছে, কে শ্মশানে যাইতেছে। যাহার সুখের সংসার আছে, স্নেহের ছায়া আছে, সে প্রতি পদক্ষেপে সুখের ছবি আঁকিয়া আঁকিয়া চলে ; সে প্রতি পদক্ষেপে মাটিতে আশার বীজ রোপিয়া রোপিয়া যায়, মনে হয় যেখানে যেখানে তাহার পা পড়িয়াছে, সেখানে যেন মুহূর্তের মধ্যে এক-একটি করিয়া লতা অঙ্কুরিত পুষ্পিত হইয়া উঠিবে। যাহার গৃহ নাই আশ্রয় নাই, তাহার পদক্ষেপের মধ্যে আশা নাই, অর্থ নাই, তাহার পদক্ষেপের দক্ষিণ নাই, বাম নাই, তাহার চরণ যেন বলিতে থাকে, আমি চলিই বা কেন থামিই বা কেন, তাহার পদক্ষেপে আমার শুষ্ক ধূলি যেন আরো শুকাইয়া যায়।

পৃথিবীর কোনো কাহিনী আমি সম্পূর্ণ শুনিতে পাই না। আজ শত শত বৎসর ধরিয়া আমি কত লক্ষ লোকের কত হাসি কত গান কত কথা শুনিয়া আসিতেছি ; কিন্তু কেবল খানিকটা মাত্র শুনিতে পাই। বাকিটুকু শুনিবার জন্য যখন আমি কান পাতিয়া থাকি, তখন দেখি সে লোক আর নাই। এমন কত বৎসরের কত ভাঙা কথা ভাঙা গান আমার ধূলির সহিত ধূলি হইয়া গেছে, আমার ধূলির সহিত উড়িয়া বেড়ায়, তাহা কি কেহ জানিতে পায়। ঐ শুন, একজন গাহিল, "তারে বলি বলি আর বলা হল না।"— আহা, একটু দাঁড়াও, গানটা শেষ করিয়া যাও, সব কথাটা শুনি। কই আর দাঁড়াইল। গাহিতে গাহিতে কোথায় চলিয়া গেল, শেষটা শোনা গেল না। ঐ একটিমাত্র পদ অর্ধেক রাত্রি ধরিয়া আমার কানে ধ্বনিত হইতে থাকিবে। মনে মনে ভাবিব, ও কে গেল। কোথায় যাইতেছে না জানি। যে কথাটা বলা হইল না, তাহাই কি আবার বলিতে যাইতেছে। এবার যখন পথে আবার দেখা হইবে,

সে যখন মুখ তুলিয়া ইহার মুখের দিকে চাহিবে, তখন বলি বলি করিয়া আবার যদি বলা না হয়। তখন নত শির করিয়া মুখ ফিরাইয়া অতি ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিবার সময় আবার যদি গায়, "তারে বলি বলি আর বলা হল না"।

সমাপ্তি ও স্থায়িত্ব হয়তো কোথাও আছে, কিন্তু আমি তো দেখিতে পাই না। একটি চরণচিহ্নও তো আমি বেশিক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারি না। অবিশ্রাম চিহ্ন পড়িতেছে, আবার নূতন পদ আসিয়া অন্য পদের চিহ্ন মুছিয়া যাইতেছে। যে চলিয়া যায় সে তো পশ্চাতে কিছু রাখিয়া যায় না, যদি তাহার মাথার বোঝা হইতে কিছু পড়িয়া যায়, সহস্র চরণের তলে অবিশ্রাম দলিত হইয়া কিছুক্ষণেই তাহা ধূলিতে মিশাইয়া যায়। তবে এমনও দেখিয়াছি বটে, কোনো কোনো মহাজনের পুণ্যস্তূপের মধ্য হইতে এমন-সকল অমর বীজ পড়িয়া গেছে যাহা ধূলিতে পড়িয়া অঙ্কুরিত ও বর্ধিত হইয়া আমার পার্শ্বে স্থায়ীরূপে বিরাজ করিতেছে, এবং নতুন পথিকদিগকে ছায়া দান করিতেছে।

আমি কাহারও লক্ষ্য নহি, আমি সকলের উপায়মাত্র। আমি কাহারও গৃহ নহি, আমি সকলকে গৃহে লইয়া যাই। আমার অহরহ এই শোক, আমাকে কেহ চরণ রাখে না, আমার উপরে কেহ দাঁড়াইতে চাহে না। যাহাদের গৃহ সুদূরে অবস্থিত, তাহারা আমাকেই অভিশাপ দেয়, আমি যে পরম ধৈর্যে তাহাদিগকে গৃহের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিই তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা কই পাই। গৃহে গিয়া বিরাম, গৃহে গিয়া আনন্দ, গৃহে গিয়া সুখসম্মিলন, আর আমার উপরে কেবল শ্রান্তির ভার, কেবল অনিচ্ছাকৃত শ্রম, কেবল বিচ্ছেদ। কেবল কি সুদূর হইতে, গৃহবাতায়ন হইতে, মধুর হাস্যলহরী পাখা তুলিয়া সূর্যালোকে বাহির হইয়া আমার কাছে আসিবামাত্র সচকিতে শূন্যে মিলাইয়া যাইবে। গৃহের সেই আনন্দের কণা আমি কি একটুখানি পাইব না!

কখনো কখনো তাহাও পাই। বালকবালিকারা হাসিতে হাসিতে কলরব করিতে করিতে আমার কাছে আসিয়া খেলা করে। তাহাদের গৃহের আনন্দ তাহারা পথে লইয়া আসে। তাহাদের পিতার আশীর্বাদ মাতার স্নেহ গৃহ হইতে বাহির হইয়া পথের মধ্যে আসিয়াও যেন গৃহ রচনা করিয়া দেয়। আমার ধূলিতে তাহারা স্নেহ দিয়া যায়। আমার ধূলিকে তাহারা রাশীকৃত করে ও তাহাদের ছোটো ছোটো হাতগুলি দিয়া সেই স্তূপকে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া পরম স্নেহে ঘুম পাড়াইতে চায়। বিমল হৃদয় লইয়া বসিয়া বসিয়া তাহার সহিত কথা কয়। হায় হায়, এত স্নেহ পাইয়াও সে তাহার উত্তর দিতে পারে না।

ছোটো ছোটো কোমল পাগুলি যখন আমার উপর দিয়া চলিয়া যায়, তখন আপনাকে বড়ো কঠিন বলিয়া মনে হয়; মনে হয় উহাদের পায়ে বাজিতেছে। কুসুমের দলের ন্যায় কোমল হইতে সাধ যায়। রাধিকা বলিয়াছেন—

যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চলি যাতা,
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইএ মঝু গাতা।

অরুণ-চরণগুলি এমন কঠিন ধরণী উপরে চলে কেন। কিন্তু তা যদি না চলিত, তবে বোধ করি কোথাও শ্যামল তৃণ জন্মিত না।

প্রতিদিন যাহারা নিয়মিত আমার উপরে চলে, তাহাদিগকে আমি বিশেষরূপে চিনি। তাহারা জানে না তাহাদের জন্য আমি প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। আমি মনে মনে তাহাদের মূর্তি কল্পনা করিয়া লইয়াছি। বহুদিন হইল, এমনি একজন কে তাহার কোমল চরণ দুখানি লইয়া প্রতিদিন অপরাহ্নে বহুদূর হইতে আসিত— ছোটো দুটি নূপুর রুনুঝুনু করিয়া তাহার পায়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিত। বুঝি তাহার ঠোঁট-দুটি কথা কহিবার ঠোঁট নহে, বুঝি তাহার বড়ো বড়ো চোখ-দুটি সন্ধ্যার আকাশের মতো বড়ো ম্লানভাবে মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। যেখানে ঐ বাঁধানো বটগাছের বামদিকে আমার একটি শাখা লোকালয়ের দিকে চলিয়া গেছে, সেখানে সে শ্রান্তদেহে গাছের তলায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। আর-একজন কে দিনের কাজ সমাপন করিয়া অন্যমনে গান গাহিতে গাহিতে সেই সময়ে লোকালয়ের দিকে চলিয়া যাইত। সে বোধ করি, কোনো দিকে চাহিত না, কোনোখানে দাঁড়াইত না—

হয়তো বা আকাশের তারার দিকে চাহিত, তাহার গৃহের দ্বারে গিয়া পূরবী গান সমাপ্ত করিত। সে চলিয়া গেলে বালিকা শ্রান্তপদে আবার যে-পথ দিয়া আসিয়াছিল, সেই পথে ফিরিয়া যাইত। বালিকা যখন ফিরিত তখন জানিতাম অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে ; সন্ধ্যার অন্ধকার হিমস্পর্শ সর্বাঙ্গে অনুভব করিতে পারিতাম। তখন গোধূলির কাকের ডাক একেবারে থামিয়া যাইত ; পথিকেরা আর কেহ বড়ো চলিত না। সন্ধ্যার বাতাসে থাকিয়া থাকিয়া বাঁশবন ঝরঝর ঝরঝর শব্দ করিয়া উঠিত। এমন কতদিন, এমন প্রতিদিন, সে ধীরে ধীরে আসিত, ধীরে ধীরে যাইত। একদিন ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি অপরাহ্নে যখন বিস্তর আম্রকুলের কেশর বাতাসে ঝরিয়া পড়িতেছে— তখন আর-একজন যে আসে সে আর আসিল না। সেদিন অনেক রাত্রে বালিকা বাড়িতে ফিরিয়া গেল। যেমন মাঝে মাঝে গাছ হইতে শুষ্ক পাতা ঝরিয়া পড়িতেছিল, তেমনি মাঝে মাঝেই দুই-এক ফোঁটা অশ্রুজল আমার নীরস তপ্ত ধূলির উপরে পড়িয়া মিলাইতেছিল। আবার তাহার পরদিন অপরাহ্নে বালিকা সেইখানে সেই তরুতলে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সেদিনও আর-একজন আসিল না। আবার রাত্রে সে ধীরে ধীরে বাড়িমুখে ফিরিল। কিছুদূরে গিয়া আর সে চলিতে পারিল না। আমার উপরে ধূলির উপরে লুটাইয়া পড়িল। দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া বুক ফাটিয়া কাঁদিতে লাগিল। কে গো মা, আজি এই বিজন রাত্রে আমার বক্ষেও কি কেহ আশ্রয় লইতে আসে। তুই যাহার কাছ হইতে ফিরিয়া আসিলি সে কি আমার চেয়েও কঠিন। তুই যাহাকে ডাকিয়া সাড়া পাইলি না সে কি আমার চেয়েও মূক। তুই যাহার মুখের পানে চাহিলি সে কি আমার চেয়েও অন্ধ।

বালিকা উঠিল, দাঁড়াইল, চোখ মুছিল— পথ ছাড়িয়া পার্শ্ববর্তী বনের মধ্যে চলিয়া গেল। হয়তো সে গৃহে ফিরিয়া গেল, হয়তো এখনো সে প্রতিদিন শান্তমুখে গৃহের কাজ করে— হয়তো সে কাহাকেও কোনো দুঃখের কথা বলে না ; কেবল এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় গৃহের অঙ্গনে চাঁদের আলোতে পা ছড়াইয়া বসিয়া থাকে, কেহ ডাকিলেই আবার তখনই চমকিয়া উঠিয়া ঘরে চলিয়া যায়। কিন্তু তাহার পরদিন হইতে আজ পর্যন্তও আমি আর তাহার চরণস্পর্শ অনুভব করি নাই।

এমন কত পদশব্দ নীরব হইয়া গেছে, আমি কি এত মনে করিয়া রাখিতে পারি। কেবল সেই পায়ের করুণ নূপুরধ্বনি এখনো মাঝে মাঝে মনে পড়ে! কিন্তু আমার কি আর একদণ্ড শোক করিবার অবসর আছে। শোক কাহার জন্য করিব। এমন কত আসে, কত যায়।

কী প্রখর রৌদ্র। উহু-হুহু। এক-একবার নিশ্বাস ফেলিতেছি আর তপ্ত ধুলা সুনীল আকাশ ধূসর করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। ধনী দরিদ্র, সুখী দুঃখী, জরা যৌবন, হাসি কান্না, জন্ম মৃত্যু সমস্তই আমার উপর দিয়া একই নিশ্বাসে ধূলির স্রোতের মতো উড়িয়া চলিয়াছে। এইজন্য পথের হাসিও নাই, কান্নাও নাই। গৃহই অতীতের জন্য শোক করে, বর্তমানের জন্য ভাবে, ভবিষ্যতের আশা-পথ চাহিয়া থাকে। কিন্তু পথ প্রতি বর্তমান নিমেষের শতসহস্র নূতন অভ্যাগতকে লইয়াই ব্যস্ত। এমন স্থানে নিজের পদগৌরবের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অত্যন্ত সদর্পে পদক্ষেপ করিয়া কে নিজের চির-চরণচিহ্ন রাখিয়া যাইতে প্রয়াস পাইতেছে। এখানকার বাতাসে যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যাইতেছ, তুমি চলিয়া গেলে কি তাহারা তোমার পশ্চাতে পড়িয়া তোমার জন্য বিলাপ করিতে থাকিবে, নূতন অতিথিদের চক্ষে অশ্রু আকর্ষণ করিয়া আনিবে? বাতাসের উপরে বাতাস কি স্থায়ী হয়। না না, বৃথা চেষ্টা। আমি কিছুই পড়িয়া থাকিতে দিই না, হাসিও না, কান্নাও না। আমিই কেবল পড়িয়া আছি।

অগ্রহায়ণ ১২৯১

মুকুট

প্রথম পরিচ্ছেদ

ত্রিপুরার রাজা অমরমাণিক্যের কণিষ্ঠ পুত্র রাজধর সেনাপতি ইশা খাঁকে বলিলেন, "দেখো সেনাপতি, আমি বার বার বলিতেছি তুমি আমাকে অসম্মান করিয়ো না।"

পাঠান ইশা খাঁ কতকগুলি তীরের ফলা লইয়া তাহাদের ধার পরীক্ষা করিতেছিলেন। রাজধরের কথা শুনিয়া কিছুই বলিলেন না, কেবল মুখ তুলিয়া ভুরু উঠাইয়া একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। আবার তখনই মুখ নত করিয়া তীরের ফলার দিকে মনোযোগ দিলেন।

রাজধর বলিলেন, "ভবিষ্যতে যদি তুমি আমার নাম ধরিয়া ডাক, তবে আমি তাহার সমুচিত প্রতিবিধান করিব।"

বৃদ্ধ ইশা খাঁ সহসা মাথা তুলিয়া বজ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বটে!"

রাজধর তাঁহার তলোয়ারের খাপের আগা মেঝের পাথরের উপরে ঠক করিয়া ঠুকিয়া বলিলেন, "হাঁ।"

ইশা খাঁ বালক রাজধরের বুক-ফুলানো ভঙ্গি ও তলোয়ারের আস্ফালন দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না— হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। রাজধরের সমস্ত মুখ, চোখের সাদাটা পর্যন্ত লাল হইয়া উঠিল।

ইশা খাঁ উপহাসের স্বরে হাসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "মহামহিম মহারাজাধিরাজকে কী বলিয়া ডাকিতে হইবে। হজুর, জনাব, জাঁহাপনা, শাহেন শা—"

রাজধর তাঁহার স্বাভাবিক কর্কশ স্বর দ্বিগুণ কর্কশ করিয়া কহিলেন, "আমি তোমার ছাত্র বটে, কিন্তু আমি রাজকুমার— তাহা তোমার মনে নাই!"

ইশা খাঁ তীব্রস্বরে কহিলেন, "বস্। চুপ। আর অধিক কথা কহিয়ো না। আমার অন্য কাজ আছে।" বলিয়া পুনরায় তীরের ফলার প্রতি মন দিলেন।

এমন সময় ত্রিপুরার দ্বিতীয় রাজপুত্র ইন্দ্রকুমার তাঁহার দীর্ঘপ্রস্থ বিপুল বলিষ্ঠ দেহ লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। মাথা হেলাইয়া হাসিয়া বলিলেন, "খাঁ সাহেব, আজিকার ব্যাপারটা কী।"

ইন্দ্রকুমারের কণ্ঠ শুনিয়া বৃদ্ধ ইশা খাঁ তীরের ফলা রাখিয়া সস্নেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন— হাসিতে হাসিতে বলিলেন— "শোনো তো বাবা, বড়ো তামাশার কথা। তোমার এই কনিষ্ঠটিকে, মহারাজ চক্রবর্তীকে জাঁহাপনা জনাব বলিয়া না ডাকিলে উহার অপমান বোধ হয়।" বলিয়া আবার তীরের ফলা লইয়া পড়িলেন।

"সত্য নাকি।" বলিয়া ইন্দ্রকুমার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

রাজধর বিষম ক্রোধে বলিলেন, "চুপ করো দাদা।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "রাজধর, তোমাকে কী বলিয়া ডাকিতে হইবে। জাঁহাপনা। হা হা হা হা।"

রাজধর কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "দাদা, চুপ করো বলিতেছি।"

ইন্দ্রকুমার আবার হাসিয়া বলিলেন, "জনাব।"

রাজধর অধীর হইয়া বলিলেন, "দাদা, তুমি নিতান্ত নির্বোধ।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া রাজধরের পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "ঠাণ্ডা হও ভাই, ঠাণ্ডা হও। তোমার বুদ্ধি তোমার থাক্। আমি তোমার বুদ্ধি কাড়িয়া লইতেছি না।"

ইশা খাঁ কাজ করিতে করিতে আড়চোখে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "উহার বুদ্ধি সম্প্রতি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "নাগাল পাওয়া যায় না।"

রাজধর গসগস করিয়া চলিয়া গেলেন। চলনের দাপে খাপের মধ্যে তলোয়ারখানা ঝনঝন করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজকুমার রাজধরের বয়স উনিশ বৎসর। শ্যামবর্ণ, বেঁটে, দেহের গঠন বলিষ্ঠ। সেকালে অন্য রাজপুত্রেরা যেমন বড়ো বড়ো চুল রাখিতেন ইহার তেমন ছিল না। ইহার সোজা সোজা মোটা চুল ছোটো করিয়া ছাঁটা। ছোটো ছোটো চোখ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। দাঁতগুলি কিছু বড়ো। গলার আওয়াজ ছেলেবেলা হইতেই কেমন কর্কশ। রাজধরের বুদ্ধি অত্যন্ত বেশি এইরূপ সকলের বিশ্বাস, তাঁহার নিজের বিশ্বাসও তাই। এই বুদ্ধির বলে তিনি আপনার দুই দাদাকে অত্যন্ত হেয়জ্ঞান করিতেন। রাজধরের প্রবল প্রতাপে বাড়িসুদ্ধ সকলে অস্থির। আবশ্যক থাক্ না থাক্ একখানা তলোয়ার মাটিতে ঠুকিয়া ঠুকিয়া তিনি বাড়িময় কর্তৃত্ব করিয়া বেড়ান। রাজবাটীর চাকরবাকরেরা তাঁহাকে রাজা বলিয়া মহারাজ বলিয়া হাতজোড় করিয়া সেলাম করিয়া প্রণাম করিয়া কিছুতে নিস্তার পায় না। সকল জিনিসেই তাঁহার হাত, সকল জিনিসই তিনি নিজে দখল করিতে চান। সে-বিষয়ে তাঁহার চক্ষুলজ্জাটুকু পর্যন্ত নাই। একবার যুবরাজ চন্দ্রনারায়ণের একটা ঘোড়া তিনি রীতিমত দখল করিয়াছিলেন, দেখিয়া যুবরাজ ঈষৎ হাসিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। আর-একবার কুমার ইন্দ্রকুমারের রূপার পাত লাগানো একটা ধনুক অম্লানবদনে অধিকার করিয়াছিলেন— ইন্দ্রকুমার চটিয়া বলিলেন, "দেখো, যে জিনিস লইয়াছ উহা আমি আর ফিরাইয়া লইতে চাহি না, কিন্তু ফের যদি তুমি আমার জিনিসে হাত দাও, তবে আমি এমন করিয়া দিব যে, ও-হাতে আর জিনিস তুলিতে পারিবে না।" কিন্তু রাজধর দাদাদের কথা বড়ো গ্রাহ্য করিতেন না। লোকে তাঁহার আচরণ দেখিয়া আড়ালে বলিত, "ছোটোকুমারের রাজার ঘরে জন্ম বটে, কিন্তু রাজার ছেলের মতো কিছুই দেখি না।"

কিন্তু মহারাজা অমরমাণিক্য রাজধরকে কিছু বেশি ভালোবাসিতেন। রাজধর তাহা জানিতেন। আজ পিতার কাছে গিয়া ইশা খাঁর নামে নালিশ করিলেন।

রাজা ইশা খাঁকে ডাকাইয়া আনিলেন। বলিলেন, "সেনাপতি, রাজকুমারদের এখন বয়স হইয়াছে। এখন উহাদিগকে যথোচিত সম্মান করা উচিত।"

"মহারাজ বাল্যকালে যখন আমার কাছে যুদ্ধ শিক্ষা করিতেন তখন মহারাজকে যেরূপ সম্মান করিতাম, রাজকুমারগণকে তাহা অপেক্ষা কম সম্মান করি না।"

রাজধর বলিলেন, "আমার অনুরোধ, তুমি আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়ো না।"

ইশা খাঁ বিদ্যুদ্‌বেগে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "চুপ করো বৎস। আমি তোমার পিতার সহিত কথা কহিতেছি। মহারাজ, মার্জনা করিবেন, আপনার এই কনিষ্ঠ পুত্রটি রাজপরিবারের উপযুক্ত হয় নাই। ইহার হাতে তলোয়ার শোভা পায় না। এ বড়ো হইলে মুনশির মতো কলম চালাইতে পারিবে— আর কোনো কাজে লাগিবে না।"

এমন সময়ে চন্দ্রনারায়ণ ও ইন্দ্রকুমার সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইশা খাঁ তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "চাহিয়া দেখুন মহারাজ, এই তো যুবরাজ বটে। এই তো রাজপুত্র বটে।"

রাজা রাজধরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "রাজধর, খাঁ সাহেব কী বলিতেছেন। তুমি অস্ত্রবিদ্যায় উঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পার নাই?"

রাজধর বলিলেন, "মহারাজ, আমাদের ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করুন, পরীক্ষায় যদি আমি সর্বশ্রেষ্ঠ না হই তবে আমাকে পরিত্যাগ করিবেন। আমি রাজবাটী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।"

রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, আগামী সপ্তাহে পরীক্ষা হইবে। তোমাদের মধ্যে যিনি উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহাকে আমার হীরকখচিত তলোয়ার পুরস্কার দিব।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রকুমার ধনুর্বিদ্যায় অসাধারণ ছিলেন। শুনা যায় একবার তাঁহার এক অনুচর প্রাসাদের ছাদের উপর হইতে একটা মোহর নীচে ফেলিয়া দেয়, সেই মোহর মাটিতে পড়িতে না পড়িতে তীর মারিয়া কুমার তাহাকে শত হাত দূরে ফেলিয়াছিলেন। রাজধর রাগের মাথায় পিতার সম্মুখে দম্ভ করিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু মনের ভিতরে বড়ো ভাবনা পড়িয়া গেল। যুবরাজ চন্দ্রনারায়ণের জন্য বড়ো ভাবনা নাই— তীর-ছোঁড়া বিদ্যা তাঁহার ভালো আসিত না, কিন্তু ইন্দ্রকুমারের সঙ্গে আঁটিয়া উঠা দায়। রাজধর অনেক ভাবিয়া অবশেষে একটা ফন্দি ঠাওরাইলেন। হাসিয়া মনে মনে বলিলেন, 'তীর ছুঁড়িতে পারি না-পারি, আমার বুদ্ধি তীরের মতো— তাহাতে সকল লক্ষ্যই ভেদ হয়।'

কাল পরীক্ষার দিন। যে-জায়গাতে পরীক্ষা হইবে, যুবরাজ, ইশা খাঁ ও ইন্দ্রকুমার সেই জমি তদারক করিতে গিয়াছেন। রাজধর আসিয়া বলিলেন, "দাদা, আজ পূর্ণিমা আছে— আজ রাত্রে যখন বাঘ গোমতী নদীতে জল খাইতে আসিবে, তখন নদীতীরে বাঘ শিকার করিতে গেলে হয় না?"

ইন্দ্রকুমার আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "কী আশ্চর্য। রাজধরের যে আজ শিকারে প্রবৃত্তি হইল? এমন তো কখনো দেখা যায় না।"

ইশা খাঁ রাজধরের প্রতি ঘৃণার কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "উনি আবার শিকারি নন, উনি জাল পাতিয়া ঘরের মধ্যে শিকার করেন। উঁহার বড়ো ভয়ানক শিকার। রাজসভায় একটি জীব নাই যে উঁহার ফাঁদে একবার-না-একবার না পড়িয়াছে।"

চন্দ্রনারায়ণ দেখিলেন কথাটা রাজধরের মনে লাগিয়াছে— ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "সেনাপতি সাহেব, তোমার তলোয়ারও যেমন তোমার কথাও তেমনি, উভয়ই শাণিত— যাহার উপরে গিয়া পড়ে, তাহার মর্মচ্ছেদ করে।"

রাজধর হাসিয়া বলিলেন, "না দাদা, আমার জন্য বেশি ভাবিয়ো না। খাঁ সাহেব অনেক শান দিয়া কথা কহেন বটে, কিন্তু আমার কানের মধ্যে পালকের মতো প্রবেশ করে।"

ইশা খাঁ হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া পাকা গোঁফে চাড়া দিয়া বলিলেন, "তোমার কান আছে নাকি। তা যদি থাকিত, তাহা হইলে এতদিন তোমাকে সিধা করিতে পারিতাম।" বৃদ্ধ ইশা খাঁ কাহাকেও বড়ো মানা করিতেন না।

ইন্দ্রকুমার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। চন্দ্রনারায়ণ গম্ভীর হইয়া রহিলেন, কিছু বলিলেন না। যুবরাজ বিরক্ত হইয়াছেন বুঝিয়া ইন্দ্রকুমার তৎক্ষণাৎ হাসি থামাইয়া তাঁহার কাছে গেলেন— মৃদুভাবে বলিলেন, "দাদা, তোমার কী মত। আজ রাত্রে শিকার করিতে যাইবে কি।"

চন্দ্রনারায়ণ কহিলেন, "তোমার সঙ্গে ভাই শিকার করিতে যাওয়া মিথ্যা, তাহা হইলে নিতান্ত নিরামিষ শিকার করিতে হয়। তুমি বনে গিয়া যত জন্তু মারিয়া আন, আর আমরা কেবল লাউ কুমড়া কচু কাঁঠাল শিকার করিয়া আনি।"

ইশা খাঁ পরম হৃষ্ট হইয়া হাসিতে লাগিলেন— সস্নেহে ইন্দ্রকুমারের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "যুবরাজ ঠিক কথা বলিতেছেন পুত্র। তোমার তীর সকলের আগে গিয়া ছোটে এবং নির্ঘাত গিয়া লাগে। তোমার সঙ্গে কে পারিয়া উঠিবে।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "না না দাদা, ঠাট্টা নয়— যাইতে হইবে। তুমি না গেলে কে শিকার করিতে যাইবে।"

যুবরাজ বলিলেন, "আচ্ছা চলো। আজ রাজধরের শিকারের ইচ্ছা হইয়াছে, উঁহাকে নিরাশ করিব না।"

সহাস্য ইন্দ্রকুমার চকিতের মধ্যে ম্লান হইয়া বলিলেন, "কেন দাদা, আমার ইচ্ছা হইয়াছে বলিয়া কি যাইতে নাই।"

চন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "সে কী কথা ভাই, তোমার সঙ্গে তো রোজই শিকারে যাইতেছি—"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "তাই সেটা পুরাতন হইয়া গেছে।"

চন্দ্রনারায়ণ বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, "তুমি আমার কথা এমন করিয়া ভুল বুঝিলে বড়ো ব্যথা লাগে।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না দাদা, আমি ঠাট্টা করিতেছিলাম। শিকারে যাইব না তো কী। চলো তার আয়োজন করি গে।"

ইশা খাঁ মনে মনে কহিলেন, 'ইন্দ্রকুমার বুকে দশটা বাণ সহিতে পারে, কিন্তু দাদার একটু সামান্য অনাদর সহিতে পারে না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিকারের বন্দোবস্ত সমস্ত স্থির হইলে পরে রাজধর আস্তে আস্তে ইন্দ্রকুমারের স্ত্রী কমলাদেবীর কক্ষে গিয়া উপস্থিত। কমলাদেবী হাসিয়া বলিলেন, "এ কী ঠাকুরপো। একেবারে তীরধনুক বর্মচর্ম লইয়া যে। আমাকে মারিবে নাকি।"

রাজধর বলিলেন, "ঠাকুরানী, আমরা আজ তিন ভাই শিকার করিতে যাইব, তাই এই বেশ।"

কমলাদেবী আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "তিন ভাই ! তুমিও যাইবে না কি ! আজ তিন ভাই একত্র হইবে। এ তো ভালো লক্ষণ নয়। এ যে ত্র্যহস্পর্শ হইল।"

যেন বড়ো ঠাট্টা হইল এই ভাবে রাজধর হা হা করিয়া হাসিলেন, কিন্তু বিশেষ কিছু বলিলেন না।

কমলাদেবী কহিলেন, "না না, তাহা হইবে না— রোজ রোজ শিকার করিতে যাইবেন আর আমি ঘরে বসিয়া ভাবিয়া মরি।"

রাজধর বলিলেন, "আজ আবার রাত্রে শিকার।"

কমলাদেবী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সে কখনোই হইবে না। দেখিব আজ কেমন করিয়া যান।"

রাজধর বলিলেন, "ঠাকুরানী, এক কাজ করো, ধনুকবাণগুলি লুকাইয়া রাখো।"

কমলাদেবী কহিলেন, "কোথায় লুকাইব।"

রাজধর। আমার কাছে দাও, আমি লুকাইয়া রাখিব।

কমলাদেবী হাসিয়া কহিলেন, "মন্দ কথা নয়, সে বড়ো রঙ্গ হইবে।" কিন্তু মনে মনে বলিলেন, 'তোমার একটা কী মতলব আছে। তুমি যে কেবল আমার উপকার করিতে আসিয়াছ তাহা বোধ হয় না।"

"এসো, অস্ত্রশালায় এসো" বলিয়া কমলাদেবী রাজধরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। চাবি লইয়া ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালার দ্বার খুলিয়া দিলেন। রাজধর যেমন ভিতরে প্রবেশ করিলেন অমনি কমলাদেবী দ্বারে তালা লাগাইয়া দিলেন, রাজধর ঘরের মধ্যে বন্ধ হইয়া রহিলেন। কমলাদেবী বাহির হইতে হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, আমি তবে আজ আসি।"

এ দিকে সন্ধ্যার সময় ইন্দ্রকুমার অন্তঃপুরে আসিয়া অস্ত্রশালার চাবি কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছেন না। কমলাদেবী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁগা, আমাকে খুঁজিতেছ বুঝি, আমি তো হারাই নাই।" শিকারের সময় বহিয়া যায় দেখিয়া ইন্দ্রকুমার দ্বিগুণ ব্যস্ত হইয়া খোঁজ করিতে লাগিলেন। কমলাদেবী তাঁহাকে বাধা দিয়া আবার তাঁহার মুখের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন— হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁগা, দেখিতে কি পাও না। চোখের সম্মুখে তবু ঘরময় বেড়াইতেছ।" ইন্দ্রকুমার কিঞ্চিৎ কাতরস্বরে কহিলেন, "দেবী, এখন বাধা দিয়ো না— আমার একটা বড়ো আবশ্যকের জিনিস হারাইয়াছে।"

কমলাদেবী কহিলেন, "আমি জানি তোমার কী হারাইয়াছে। আমার একটা কথা যদি রাখ তো খুঁজিয়া দিতে পারি।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "আচ্ছা রাখিব।"

কমলাদেবী বলিলেন, "তবে শোনো। আজ তুমি শিকার করিতে যাইতে পারিবে না। এই লও তোমার চাবি।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "সে হয় না— এ কথা রাখিতে পারি না।"

কমলাদেবী বলিলেন, "চন্দ্রবংশে জন্মিয়া এই বুঝি তোমার আচরণ। একটা সামান্য প্রতিজ্ঞা রাখিতে পার না।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার কথাই রহিল। আজ আমি শিকারে যাইব না।"

কমলাদেবী। তোমাদের আর কিছু হারাইয়াছে? মনে করিয়া দেখো দেখি।

ইন্দ্রকুমার। কই, মনে পড়ে না তো।

কমলাদেবী। তোমাদের সাত-রাজার-ধন মানিক? তোমাদের সোনার চাঁদ?

ইন্দ্রকুমার মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন। কমলাদেবী কহিলেন, "তবে এসো, দেখো'সে।" বলিয়া অস্ত্রশালার দ্বারে গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। কুমার দেখিলেন রাজধর ঘরের মেজেতে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন— দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন— "এ কী, রাজধর অস্ত্রশালায় যে।"

কমলাদেবী বলিলেন, "উনি আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "তা বটে, উনি সকল অস্ত্রের চেয়ে তীক্ষ্ণ।"

রাজধর মনে মনে বলিলেন, 'তোমাদের জিহ্বার চেয়ে নয়।' রাজধর ঘর হইতে বাহির হইয়া বাঁচিলেন।

তখন কমলাদেবী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "না কুমার, তুমি শিকার করিতে যাও। আমি তোমার সত্য ফিরাইয়া লইলাম।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "শিকার করিব? আচ্ছা।" বলিয়া ধনুকে তীর যোজনা করিয়া অতি ধীরে কমলাদেবীর দিকে নিক্ষেপ করিলেন। তীর তাঁহার পায়ের কাছে পড়িয়া গেল— কুমার বলিলেন, "আমার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল।"

কমলাদেবী বলিলেন, "না, পরিহাস না। তুমি শিকারে যাও।"

ইন্দ্রকুমার কিছু বলিলেন না। ধনুর্বাণ ঘরের মধ্যে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। যুবরাজকে বলিলেন, "দাদা, আজ শিকারের সুবিধা হইল না।" চন্দ্রনারায়ণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আজ পরীক্ষার দিন। রাজবাটীর বাহিরের মাঠে বিস্তর লোক জড়ো হইয়াছে। রাজার ছত্র ও সিংহাসন প্রভাতের আলোকে ঝকঝক করিতেছে। জায়গাটা পাহাড়ে, উঁচু-নিচু— লোকে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, চারি দিকে যেন মানুষের মাথার ঢেউ উঠিয়াছে। ছেলেগুলো গাছের উপর চড়িয়া বসিয়াছে। একটা ছেলে গাছের ডাল হইতে আস্তে আস্তে হাত বাড়াইয়া একজন মোটা মানুষের মাথা হইতে পাগড়ি তুলিয়া আর-একজনের মাথায় পরাইয়া দিয়াছে। যাহার পাগড়ি সে-ব্যক্তি চটিয়া ছেলেটাকে গ্রেফতার করিবার জন্য নিষ্ফল প্রয়াস পাইতেছে, অবশেষে নিরাশ হইয়া সজোরে গাছের ডাল নাড়া দিতেছে, ছোঁড়াটা মুখভঙ্গি করিয়া ডালের উপর বাঁদরের মতো নাচিতেছে। মোটা মানুষের দুর্দশা ও রাগ দেখিয়া সেদিকে একটা হো হো হাসি পড়িয়া গিয়াছে। একজন একহাঁড়ি দই মাথায় করিয়া বাড়ি যাইতেছিল, পথে জনতা দেখিয়া সে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল— হঠাৎ দেখে তাহার মাথায় হাঁড়ি নাই, হাঁড়িটা মুহূর্তের মধ্যে হাতে হাতে কতদূর চলিয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই— দইওআলা খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। একজন বলিল, "ভাই, তুমি দইয়ের বদলে ঘোল খাইয়া গেলে, কিঞ্চিৎ লোকসান হইল বৈ তো নয়।" দইওআলা পরম সান্ত্বনা পাইয়া গেল। হারু নাপিতের 'পরে গাঁ-সুদ্ধ লোক চটা ছিল। তাহাকে ভিড়ের মধ্যে দেখিয়া লোকে তাহার নামে ছড়া কাটিতে লাগিল। সে যত খেপিতে লাগিল খেপাইবার দল তত বাড়িয়া উঠিল— চারি দিকে চটাপট হাততালি পড়িতে লাগিল। আটান্ন প্রকার আওয়াজ বাহির হইতে লাগিল। সে-ব্যক্তি মুখচক্ষু লাল করিয়া চটিয়া গলদঘর্ম হইয়া, চাদর ভূমিতে লুটাইয়া, একপাটি চটিজুতা ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া বিশ্বের লোককে অভিশাপ দিতে দিতে বাড়ি ফিরিয়া গেল। ঠাসাঠাসি ভিড়ের মাঝে মাঝে এক-একটা ছোটো ছেলে

আত্মীয়ের কাঁধের উপর চড়িয়া কান্না জুড়িয়া দিয়াছে। এমন কত জায়গায় কত কলরব উঠিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। হঠাৎ নহবত বাজিয়া উঠিল। সমস্ত কোলাহল ভাসাইয়া দিয়া জয় জয় শব্দে আকাশ প্লাবিত হইয়া গেল। কোলের ছেলে যতগুলো ছিল ভয়ে সমস্বরে কাঁদিয়া উঠিল— গাঁয়ে গাঁয়ে পাড়ায় পাড়ায় কুকুরগুলো ঊর্ধ্বমুখ হইয়া খেউ খেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। পাখি যেখানে যত ছিল ভয়ে গাছের ডাল ছাড়িয়া আকাশে উড়িল। কেবল গোটাকতক বুদ্ধিমান কাক সুদূরে গাম্ভারি গাছের ডালে বসিয়া দক্ষিণে ও বামে ঘাড় হেলাইয়া একাগ্রচিত্তে অনেক বিবেচনা করিতে লাগিল এবং একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ অসন্দিগ্ধচিত্তে কা কা করিয়া ডাকিয়া উঠিতে লাগিল। রাজা আসিয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন। পাত্রমিত্র সভাসদ্গণ আসিয়াছেন। রাজকুমারগণ ধনুর্বাণ হস্তে আসিয়াছেন। নিশান লইয়া নিশানধারী আসিয়াছে। ভাট আসিয়াছে। সৈন্যগণ পশ্চাতে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাজনদারগণ মাথা নাড়াইয়া নাচিয়া সবলে পরমোৎসাহে ঢোল পিটাইতেছে। মহা ধুম পড়িয়া গিয়াছে। পরীক্ষার সময় যখন হইল, ইশা খাঁ রাজকুমারগণকে প্রস্তুত হইতে কহিলেন। ইন্দ্রকুমার যুবরাজকে কহিলেন, "দাদা, আজ তোমাকে জিতিতে হইবে, তাহা না হইলে চলিবে না।"

যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, "চলিবে না তো কী। আমার একটা ক্ষুদ্র তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেও জগৎ সংসার যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিবে। আর যদিই বা না চলিত, তবু আমার জিতিবার কোনো সম্ভাবনা দেখিতেছি না।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "দাদা, তুমি যদি হার তো আমিও ইচ্ছাপূর্বক লক্ষ্যভ্রষ্ট হইব।"

যুবরাজ ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া কহিলেন, "না ভাই, ছেলেমানুষি করিয়ো না— ওস্তাদের নাম রক্ষা করিতে হইবে।"

রাজধর বিবর্ণ শুষ্ক চিন্তাকুল মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ইশা খাঁ আসিয়া কহিলেন, "যুবরাজ, সময় হইয়াছে, ধনুক গ্রহণ করো।"

যুবরাজ দেবতার নাম করিয়া ধনুক গ্রহণ করিলেন। প্রায় দুইশত হাত দূরে গোটা পাঁচ-ছয় কলাগাছের গুঁড়ি একত্র বাঁধিয়া স্থাপিত হইয়াছে। মাঝে একটা কচুর পাতা চোখের মতো করিয়া বসানো আছে। তাহার ঠিক মাঝখানে চোখের তারার মতো আকারে কালো চিহ্ন অঙ্কিত। সেই চিহ্নই লক্ষ্যস্থল। দর্শকেরা অর্ধচক্র আকারে মাঠ ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে— যে দিকে লক্ষ স্থাপিত, সে দিকে যাওয়া নিষেধ।

যুবরাজ ধনুকে বাণ যোজনা করিলেন। লক্ষ্য স্থির করিলেন। বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বাণ লক্ষ্যের উপর দিয়া চলিয়া গেল। ইশা খাঁ তাঁহার গোঁফসুদ্ধ দাড়িসুদ্ধ মুখ বিকৃত করিলেন, পাকা ভুরু কুঞ্চিত করিলেন। কিন্তু কিছু বলিলেন না। ইন্দ্রকুমার বিষণ্ণ হইয়া এমন ভাব ধারণ করিলেন, যেন তাঁহাকেই লজ্জিত করিবার জন্য দাদা ইচ্ছা করিয়া এই কীর্তিটি করিলেন। অস্থিরভাবে ধনুক নাড়িতে নাড়িতে ইশা খাঁকে বলিলেন, "দাদা মন দিলেই সমস্ত পারেন, কিন্তু কিছুতেই মন দেন না।"

ইশা খাঁ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমার দাদার বুদ্ধি আর-সকল জায়গাতেই খেলে, কেবল তীরের আগায় খেলে না, তার কারণ, বুদ্ধি তেমন সূক্ষ্ম নয়।"

ইন্দ্রকুমার ভারি চটিয়া একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন। ইশা খাঁ বুঝিতে পারিয়া দ্রুত সরিয়া গিয়া রাজধরকে বলিলেন, "কুমার, এবার তুমি লক্ষ্যভেদ করো, মহারাজা দেখুন।"

রাজধর বলিলেন, "আগে দাদার হউক।"

ইশা খাঁ রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "এখন উত্তর করিবার সময় নয়। আমার আদেশ পালন করো।"

রাজধর চটিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। ধনুর্বাণ তুলিয়া লইলেন। লক্ষ্য স্থির করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। তীর মাটিতে বিদ্ধ হইল। যুবরাজ রাজধরকে কহিলেন, "তোমার বাণ অনেকটা নিকটে গিয়াছে— আর-একটু হইলেই লক্ষ্য বিদ্ধ হইত।"

রাজধর অম্লানবদনে কহিলেন, "লক্ষ্য তো বিদ্ধ হইয়াছে, দূর হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না।"

যুবরাজ কহিলেন, "না, তোমার দৃষ্টির ভ্রম হইয়াছে, লক্ষ্য বিদ্ধ হয় নাই।"

রাজধর কহিলেন, "হাঁ, বিদ্ধ হইয়াছে। কাছে গেলেই দেখা যাইবে।" যুবরাজ আর কিছু বলিলেন না।

অবশেষে ইশা খাঁর আদেশক্রমে ইন্দ্রকুমার নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারে ধনুক তুলিয়া লইলেন। যুবরাজ তাঁহার কাছে গিয়া কাতরস্বরে কহিলেন, "ভাই, আমি অক্ষম— আমার উপর রাগ করা অন্যায়— তুমি যদি আজ লক্ষ্য ভেদ করিতে না পার, তবে তোমার ভ্রষ্টলক্ষ্য তীর আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিবে, ইহা নিশ্চয় জানিয়ো।"

ইন্দ্রকুমার যুবরাজের পদধূলি লইয়া কহিলেন, "দাদা, তোমার আশীর্বাদে আজ লক্ষ্য ভেদ করিব, ইহার অন্যথা হইবে না।"

ইন্দ্রকুমার তীর নিক্ষেপ করিলেন, লক্ষ্য বিদ্ধ হইল। বাজনা বাজিল। চারি দিকে জয়ধ্বনি উঠিল। যুবরাজ যখন ইন্দ্রকুমারকে আলিঙ্গন করিলেন, আনন্দে ইন্দ্রকুমারের চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল। ইশা খাঁ পরম স্নেহে কহিলেন, "পুত্র, আল্লার কৃপায় তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া থাকো।"

মহারাজা যখন ইন্দ্রকুমারকে পুরস্কার দিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে রাজধর গিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আপনাদের ভ্রম হইয়াছে। আমার তীর লক্ষ্য ভেদ করিয়াছে।"

মহারাজ কহিলেন, "কখনোই না।"

রাজধর কহিলেন, "মহারাজ, কাছে গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন।"

সকলে লক্ষ্যের কাছে গেলেন। দেখিলেন যে-তীর মাটিতে বিদ্ধ তাহার ফলায় ইন্দ্রকুমারের নাম খোদিত— আর যে-তীর লক্ষ্যে বিদ্ধ তাহাতে রাজধরের নাম খোদিত।

রাজধর কহিলেন, "বিচার করুন মহারাজ।"

ইশা খাঁ কহিলেন, "নিশ্চয়ই তূণ বদল হইয়াছে।"

কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল তূণ বদল হয় নাই। সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন।

ইশা খাঁ বলিলেন, "পুনর্বার পরীক্ষা করা হউক।"

রাজধর বিষম অভিমান করিয়া কহিলেন, "তাহাতে আমি সম্মত হইতে পারি না। আমার প্রতি এ বড়ো অন্যায় অবিশ্বাস। আমি তো পুরস্কার চাই না, মধ্যমকুমার বাহাদুরকে পুরস্কার দেওয়া হউক।" বলিয়া পুরস্কারের তলোয়ার ইন্দ্রকুমারের দিকে অগ্রসর করিয়া দিলেন।

ইন্দ্রকুমার দারুণ ঘৃণার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ধিক্। তোমার হাত হইতে এ পুরস্কার গ্রাহ্য করে কে। এ তুমি লও।" বলিয়া তলোয়ারখানা ঝনঝন করিয়া রাজধরের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলেন। রাজধর হাসিয়া নমস্কার করিয়া তাহা তুলিয়া লইলেন।

তখন ইন্দ্রকুমার কম্পিতস্বরে পিতাকে কহিলেন, "মহারাজ, আরাকানপতির সহিত শীঘ্রই যুদ্ধ হইবে। সেই যুদ্ধে গিয়া আমি পুরস্কার আনিব। মহারাজ, আদেশ করুন।"

ইশা খাঁ ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া কঠোরস্বরে কহিলেন, "তুমি আজ মহারাজের অপমান করিয়াছ। উঁহার তলোয়ার ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছ। ইহার সমুচিত শাস্তি আবশ্যক।"

ইন্দ্রকুমার সবলে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন, "বৃদ্ধ, আমাকে স্পর্শ করিয়ো না।"

বৃদ্ধ ইশা খাঁ সহসা বিষণ্ণ হইয়া ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন, "পুত্র, এ কী পুত্র। আমার 'পরে এই ব্যবহার। তুমি আজ আত্মবিস্মৃত হইয়াছ বৎস।"

ইন্দ্রকুমারের চোখে জল উথলিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "সেনাপতি সাহেব, আমাকে মাপ করো, আমি আজ যথার্থই আত্মবিস্মৃত হইয়াছি।"

যুবরাজ স্নেহের স্বরে কহিলেন, "শান্ত হও ভাই— গৃহে ফিরিয়া চলো।"

ইন্দ্রকুমার পিতার পদধূলি লইয়া কহিলেন, "পিতা, অপরাধ মার্জনা করুন।" গৃহে ফিরিবার সময় যুবরাজকে কহিলেন, "দাদা, আজ আমার যথার্থই পরাজয় হইয়াছে।"

রাজধর যে কেমন করিয়া জিতিলেন তাহা কেহ বুঝিতে পারিলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজধর পরীক্ষা-দিনের পূর্বে যখন কমলাদেবীর সাহায্যে ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখনই ইন্দ্রকুমারের তূণ হইতে ইন্দ্রকুমারের নামাঙ্কিত একটি তীর নিজের তূণে তুলিয়া লইয়াছিলেন এবং নিজের নামাঙ্কিত একটি তীর ইন্দ্রকুমারের তূণে এমন স্থানে এমন ভাবে স্থাপিত করিয়াছিলেন, যাহাতে সেইটিই সহজে ও সর্বাগ্রে তাঁহার হাতে উঠিতে পারে। রাজধর যাহা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। ইন্দ্রকুমার দৈবক্রমে রাজধরের স্থাপিত তীরই তুলিয়া লইয়াছিলেন— সেইজন্যই পরীক্ষাস্থলে এমন গোলমাল হইয়াছিল। কালক্রমে যখন সমস্ত শান্তভাব ধারণ করিল তখন ইন্দ্রকুমার রাজধরের চাতুরী কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা আর কাহাকেও কিছু বলিলেন না— কিন্তু রাজধরের প্রতি তাঁহার ঘৃণা আরো দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল।

ইন্দ্রকুমার মহারাজের কাছে বার বার বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আরাকানপতির সহিত যুদ্ধে আমাকে পাঠান।"

মহারাজ অনেক বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

আমরা যে-সময়ের গল্প বলিতেছি সে আজ প্রায় তিনশো বৎসরের কথা। তখন ত্রিপুরা স্বাধীন ছিল এবং চট্টগ্রাম ত্রিপুরার অধীন ছিল। আরাকান চট্টগ্রামের সংলগ্ন। আরাকানপতি মাঝে মাঝে চট্টগ্রাম আক্রমণ করিতেন। এইজন্য আরাকানের সঙ্গে ত্রিপুরার মাঝে মাঝে বিবাদ বাধিত। অমরমাণিক্যের সহিত আরাকানপতির সম্প্রতি সেইরূপ একটি বিবাদ বাধিয়াছে। যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া ইন্দ্রকুমার যুদ্ধে যাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। রাজা অনেক বিবেচনা করিয়া অবশেষে সম্মতি দিলেন। তিন ভাইয়ে পাঁচ হাজার করিয়া পনেরো হাজার সৈন্য লইয়া চট্টগ্রাম অভিমুখে চলিলেন। ইশা খাঁ সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া গেলেন।

কর্ণফুলি নদীর পশ্চিম ধারে শিবির-স্থাপন হইল। আরাকানের সৈন্য কতক নদীর ওপারে কতক এপারে। আরাকানপতি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া নদীর পরপারে আছেন। এবং তাঁহার বাইশ হাজার সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আক্রমণের প্রতীক্ষায় নদীর পশ্চিম পারে অপেক্ষা করিয়া আছে।

যুদ্ধের ক্ষেত্র পর্বতময়। সমুখাসমুখি দুই পাহাড়ের উপর দুই পক্ষের সৈন্য স্থাপিত হইয়াছে। উভয় পক্ষে যদি যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয়, তবে মাঝের উপত্যকায় দুই সৈন্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারে। পর্বতের চারি দিকে হরীতকী আমলকী শাল ও গাম্ভারির বন। মাঝে মাঝে গ্রামবাসীদের শূন্য গৃহ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা ঘর ছাড়িয়া পালাইয়াছে। মাঝে মাঝে শস্যক্ষেত্র। পাহাড়িরা সেখানে ধান কাপাস তরমুজ আলু একত্রে রোপণ করিয়া গিয়াছে। আবার এক-এক জায়গায় জুমিয়া চাষারা এক-একটা পাহাড় সমস্ত দগ্ধ করিয়া কালো করিয়া রাখিয়াছে, বর্ষার পর সেখানে শস্য বপন হইবে। দক্ষিণে কর্ণফুলি, বামে দুর্গম পর্বত।

এইখানে প্রায় এক সপ্তাহকাল উভয় পক্ষ পরস্পরের আক্রমণপ্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। ইন্দ্রকুমার যুদ্ধের জন্য অস্থির হইয়াছেন, কিন্তু যুবরাজের ইচ্ছা বিপক্ষপক্ষেরা আগে আসিয়া আক্রমণ করে। সেইজন্য বিলম্ব করিতেছেন— কিন্তু তাহারাও নড়িতে চাহে না, স্থির হইয়া আছে। অবশেষে আক্রমণ করাই স্থির হইল।

সমস্ত রাত্রি আক্রমণের আয়োজন চলিতে লাগিল। রাজধর প্রস্তাব করিলেন, "দাদা, তোমরা দুইজনে তোমাদের দশ হাজার সৈন্য লইয়া আক্রমণ করো। আমার পাঁচ হাজার হাতে থাক্, আবশ্যকের সময় কাজে লাগিবে।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া বলিলেন, "রাজধর তফাতে থাকিতে চান।"

যুবরাজ কহিলেন, "না, হাসির কথা নয়। রাজধরের প্রস্তাব আমার ভালো বোধ হইতেছে।" ইশা খাঁও তাহাই বলিলেন। রাজধরের প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল।

যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমারের অধীনে দশ হাজার সৈন্য পাঁচ ভাগে ভাগ করা হইল। প্রত্যেক ভাগে দুই

হাজার করিয়া সৈন্য রহিল। স্থির হইল, একেবারে শত্রুব্যূহের পাঁচ জায়গায় আক্রমণ করিয়া ব্যূহভেদ করিবার চেষ্টা করা হইবে। সর্বপ্রথম সারে ধানুকীরা রহিল, তার পরে তলোয়ার বর্শা প্রভৃতি লইয়া অন্য পদাতিকেরা রহিল এবং সর্বশেষে অশ্বারোহীরা সার বাঁধিয়া চলিল।

আরাকানের মগ সৈন্যরা দীর্ঘ এক বাঁশবনের পশ্চাতে ব্যূহরচনা করিয়াছিল। প্রথম দিনের আক্রমণে কিছুই হইল না। ত্রিপুরার সৈন্য ব্যূহ ভেদ করিতে পারিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় দিন সমস্ত দিন নিষ্ফল যুদ্ধ -অবসানে রাত্রি যখন নিশীথ হইল— যখন উভয় পক্ষের সৈন্যেরা বিশ্রামলাভ করিতেছে, দুই পাহাড়ের উপর দুই শিবিরের স্থানে স্থানে কেবল এক-একটা আগুন জ্বলিতেছে, শৃগালেরা রণক্ষেত্রে ছিন্ন হস্তপদ ও মৃতদেহের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া দলে দলে কাঁদিয়া উঠিতেছে— তখন শিবিরের দুই ক্রোশ দূরে রাজধর তাঁহার পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া সারবন্দি নৌকা বাঁধিয়া কর্ণফুলি নদীর উপরে নৌকার সেতু নির্মাণ করিয়াছেন। একটি মশাল নাই, শব্দ নাই, সেতুর উপর দিয়া অতিসাবধানে সৈন্য পার করিতেছেন। নীচে দিয়া যেমন অন্ধকারে নদীর স্রোত বহিয়া যাইতেছে তেমনই উপর দিয়া মানুষের স্রোত অবিচ্ছিন্ন বহিয়া যাইতেছে। নদীতে ভাঁটা পড়িয়াছে। পরপারের পর্বতময় দুর্গম পাড় দিয়া সৈন্যেরা অতিকষ্টে উঠিতেছে। রাজধরের প্রতি সৈন্যাধ্যক্ষ ইশা খাঁর আদেশ ছিল যে, রাজধর রাত্রিযোগে তাঁহার সৈন্যদের লইয়া নদী বাহিয়া উত্তর দিকে যাত্রা করিবেন— তীরে উঠিয়া বিপক্ষ সৈন্যদের পশ্চাদ্ভাগে লুক্কায়িত থাকিবেন। প্রভাতে যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমার সম্মুখভাগে আক্রমণ করিবেন— বিপক্ষেরা যুদ্ধে শ্রান্ত হইলে পর সংকেত পাইলে রাজধর সহসা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবেন। সেইজন্যই এত নৌকার বন্দোবস্ত হইয়াছে। কিন্তু রাজধর ইশা খাঁর আদেশ কই পালন করিলেন। তিনি তো সৈন্য লইয়া নদীর পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি আর-এক কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন; কিন্তু কাহাকেও কিছু বলেন নাই। তিনি নিঃশব্দে আরাকানের রাজার শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। চতুর্দিকে পর্বত, মাঝে উপত্যকা, রাজার শিবির তাহারই মাঝখানেই অবস্থিত। শিবিরে নির্ভয়ে সকলে নিদ্রিত। মাঝে মাঝে অগ্নিশিখা দেখিয়া দূর হইতে শিবিরের স্থান নির্ণয় হইতেছে। পর্বতের উপর হইতে বড়ো বড়ো বনের ভিতর দিয়া রাজধরের পাঁচ হাজার সৈন্য অতি সাবধানে উপত্যকার দিকে নামিতে লাগিল— বর্ষাকালে যেমন পর্বতের সর্বাঙ্গ গিয়া গাছের শিকড় ধুইয়া ঘোলা হইয়া জলধারা নামিতে থাকে, তেমনি পাঁচ সহস্র মানুষ, পাঁচ সহস্র তলোয়ার, অন্ধকারের ভিতর দিয়া গাছের নীচে দিয়া সহস্র পথে আঁকিয়া বাঁকিয়া যেন নিম্নাভিমুখে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিছু শব্দ নাই, মন্দগতি। সহসা পাঁচ সহস্র সৈন্যের ভীষণ চীৎকার উঠিল— ক্ষুদ্র শিবির যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল— এবং তাহার ভিতর হইতে মানুষগুলা কিলবিল করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কেহ মনে করিল দুঃস্বপ্ন, কেহ মনে করিল প্রেতের উৎপাত, কেহ কিছুই মনে করিতে পারিল না।

রাজা বিনা রক্তপাতে বন্দী হইলেন। রাজা বলিলেন, "আমাকে বন্দী করিলে বা বধ করিলে যুদ্ধের অবসান হইবে না। আমি বন্দী হইবামাত্র সৈন্যেরা আমার ভাই হামচুপামুকে রাজা করিবে। যুদ্ধ যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিবে। আমি বরঞ্চ পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধিপত্র লিখিয়া দিই, আমার বন্ধন মোচন করিয়া দিন।"

রাজধর তাহাতেই সম্মত হইলেন। আরাকানরাজ পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধিপত্র লিখিয়া দিলেন। একটি হস্তিদন্তনির্মিত মুকুট, পাঁচশত মণিপুরী ঘোড়া ও তিনটে বড়ো হাতি উপহার দিলেন, এইরূপ নানা ব্যবস্থা করিতে করিতে প্রভাত হইল— বেলা হইয়া গেল। সুদীর্ঘ রাত্রে সমস্তই ভূতের ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছিল, দিনের বেলা আরাকানের সৈন্যগণ আপনাদের অপমান স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিল। চারি দিকে বড়ো বড়ো পাহাড় সূর্যালোকে সহস্রচক্ষু হইয়া তাহাদিগের দিকে তাকাইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজধর আরাকানপতিকে কহিলেন, "আর বিলম্ব নয়— শীঘ্র যুদ্ধ

নিবারণ করিবার এক আদেশপত্র আপনার সেনাপতির নিকট পাঠাইয়া দিন। ওপারে এতক্ষণে ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া গেছে।"

কতকগুলি সৈন্য-সহিত দূতের হস্তে আদেশপত্র পাঠানো হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অতি প্রত্যুষেই অন্ধকার দূর হইতে না হইতেই যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমার দুই ভাগে পশ্চিমে ও পূর্বে মগদিগকে আক্রমণ করিতে চলিয়াছেন। সৈন্যের অল্পতা লইয়া রূপনারায়ণ হাজারি দুঃখ করিতেছিলেন— তিনি বলিতেছিলেন— আর পাঁচ হাজার লইয়া আসিলেই আর ভাবনা ছিল না। ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "ত্রিপুরারির অনুগ্রহ যদি হয় তবে এই কয়জন সৈন্য লইয়াই জিতিব, আর যদি না হয় তবে বিপদ আমাদের উপর দিয়াই যাক, ত্রিপুরাবাসী যত কম মরে ততই ভালো। কিন্তু হরের কৃপায় আজ আমরা জিতিবই।" এই বলিয়াই হর হর বোম্ বোম্ রব তুলিয়া কৃপাণ বর্শা লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বিপক্ষদের অভিমুখে ছুটিলেন— তাঁহার দীপ্ত উৎসাহ তাঁহার সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। গ্রীষ্মকালে দক্ষিনা বাতাসে খড়ের চালের উপর দিয়া আগুন যেমন ছোটে তাঁহার সৈন্যেরা তেমনি ছুটিতে লাগিল। কেহই তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না। বিপক্ষদের দক্ষিণ দিকের ব্যূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। হাতাহাতি যুদ্ধ বাধিল। মানুষের মাথা ও দেহ কাটা-শস্যের মতো শস্যক্ষেত্রের উপর গিয়া পড়িতে লাগিল। ইন্দ্রকুমারের ঘোড়া কাটা পড়িল। তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। রব উঠিল তিনি মারা পড়িয়াছেন। কুঠারাঘাতে এক মগ অশ্বারোহীকে অশ্বচ্যুত করিয়া ইন্দ্রকুমার তৎক্ষণাৎ তাহার ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিলেন। রেকাবের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার রক্তাক্ত তলোয়ার আকাশে সূর্যালোকে উঠাইয়া বজ্রস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "হর হর বোম্ বোম্।" যুদ্ধের আগুন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। এই-সকল ব্যাপার দেখিয়া মগদিগের বাম দিকের ব্যূহের সৈন্যগণ আক্রমণের প্রতীক্ষা না করিয়া সহসা বাহির হইয়া যুবরাজের সৈন্যের উপর গিয়া পড়িল। যুবরাজের সৈন্যগণ সহসা এরূপ আক্রমণ প্রত্যাশা করে নাই। তাহারা মুহূর্তের মধ্যে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। তাহাদের নিজের অশ্ব নিজের পদাতিকদের উপর গিয়া পড়িল, কোন্ দিকে যাইবে ঠিকানা পাইল না। যুবরাজ ও ইশা খাঁ অসমসাহসের সহিত সৈন্যদের সংযত করিয়া লইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। অদূরে রাজধরের সৈন্য লুক্কায়িত আছে কল্পনা করিয়া সংকেতস্বরূপ বার বার তূরীনিনাদ করিলেন কিন্তু রাজধরের সৈন্যের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। ইশা খাঁ বলিলেন, "তাঁহাকে ডাকা বৃথা। সে শৃগাল, দিনের বেলা গর্ত হইতে বাহির হইবে না।" ইশা খাঁ ঘোড়া হইতে মাটিতে লাফাইয়া পড়িলেন। পশ্চিম মুখ হইয়া সত্বর নামাজ পড়িয়া লইলেন। মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া মরিয়া হইয়া লড়িতে লাগিলেন। চারি দিকে মৃত্যু যতই ঘেরিতে লাগিল, দুর্দান্ত যৌবন ততই যেন তাঁহার দেহে ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

এমন সময় ইন্দ্রকুমার শত্রুদের এক অংশ সম্পূর্ণ জয় করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন যুবরাজের একদল অশ্বারোহী সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া পালাইতেছে, তিনি তাহাদিগকে ফিরাইয়া লইলেন। বিদ্যুদ্‌বেগে যুবরাজের সাহায্যার্থে আসিলেন। কিন্তু সে বিশৃঙ্খলার মধ্যে কিছুই কূলকিনারা পাইলেন না। ঘূর্ণা বাতাসে মরুভূমির বালুকারাশি যেমন ঘুরিতে থাকে, উপত্যকার মাঝখানে যুদ্ধ তেমনই পাক খাইতে লাগিল। রাজধরের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বার বার তূরীধ্বনি উঠিল, কিন্তু তাহার উত্তর পাওয়া গেল না।

সহসা কী মন্ত্রবলে সমস্ত থামিয়া গেল, যে যেখানে ছিল স্থির হইয়া দাঁড়াইল— আহতের আর্তনাদ ও অশ্বের হ্রেষা ছাড়া আর শব্দ রহিল না। সন্ধির নিশান লইয়া লোক আসিয়াছে। মগদের রাজা পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। হর হর বোম্ বোম্ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গেল। মগ-সৈন্যগণ আশ্চর্য হইয়া পরস্পরের মুখ চাহিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ

রাজধর যখন জয়োপহার লইয়া আসিলেন, তখন তাঁহার মুখে এত হাসি যে তাঁহার ছোটো চোখ দুটা বিন্দুর মতো হইয়া পিট পিট করিতে লাগিল। হাতির দাঁতের মুকুট বাহির করিয়া ইন্দ্রকুমারকে দেখাইয়া কহিলেন, "এই দেখো, যুদ্ধের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই পুরস্কার পাইয়াছি।"

ইন্দ্রকুমার ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "যুদ্ধ ? যুদ্ধ তুমি কোথায় করিলে। এ পুরস্কার তোমার নহে। এ মুকুট যুবরাজ পরিবেন।"

রাজধর কহিলেন, "আমি জয় করিয়া আনিয়াছি ; এ মুকুট আমি পরিব।"

যুবরাজ কহিলেন, "রাজধর ঠিক কথা বলিতেছেন, এ মুকুট রাজধরেরই প্রাপ্য।"

ইশা খাঁ চটিয়া রাজধরকে বলিলেন, "তুমি মুকুট পরিয়া দেশে যাইবে ! তুমি সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যুদ্ধ হইতে পালাইলে এ কলঙ্ক একটা মুকুটে ঢাকা পড়িবে না। তুমি একটা ভাঙা হাঁড়ির কানা পরিয়া দেশে যাও, তোমাকে সাজিবে ভালো।"

রাজধর বলিলেন, "খাঁ সাহেব, এখন তো তোমার মুখে বোল ফুটিতেছে— কিন্তু আমি না থাকিলে তোমরা এতক্ষণ থাকিতে কোথায়।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "যেখানেই থাকি, যুদ্ধ ছাড়িয়া গর্তের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতাম না।"

যুবরাজ বলিলেন, "ইন্দ্রকুমার, তুমি অন্যায় বলিতেছ, সত্য কথা বলিতে কী, রাজধর না থাকিলে আজ আমাদের বিপদ হইত।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "রাজধর না থাকিলে আজ আমাদের কোনো বিপদ হইত না। রাজধর না থাকিলে এ মুকুট আমি যুদ্ধ করিয়া আনিতাম— রাজধর চুরি করিয়া আনিয়াছে। দাদা, এ মুকুট আনিয়া আমি তোমাকে পরাইয়া দিতাম— নিজে পরিতাম না।"

যুবরাজ মুকুট হাতে লইয়া রাজধরকে বলিলেন, "ভাই, তুমিই আজ জিতিয়াছ। তুমি না থাকিলে অল্প সৈন্য লইয়া আমাদের কী বিপদ হইত জানি না। এ মুকুট আমি তোমাকে পরাইয়া দিতেছি।" বলিয়া রাজধরের মাথায় মুকুট পরাইয়া দিলেন।

ইন্দ্রকুমারের বক্ষ যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল— তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "দাদা, রাজধর শৃগালের মতো গোপনে রাত্রিযোগে চুরি করিয়া এই রাজমুকুট পুরস্কার পাইল; আর আমি যে প্রাণপণে যুদ্ধ করিলাম— তোমার মুখ হইতে একটা প্রশংসার বাক্যও শুনিতে পাইলাম না। তুমি কিনা বলিলে রাজধর না থাকিলে কেহ তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিত না। কেন দাদা, আমি কি সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার চোখের সামনে যুদ্ধ করি নাই— আমি কি যুদ্ধ ছাড়িয়া পালাইয়া গিয়াছিলাম— আমি কি কখনো ভীরুতা দেখাইয়াছি। আমি কি শত্রু-সৈন্যকে ছিন্নভিন্ন করিয়া তোমার সাহায্যের জন্য আসি নাই। কী দেখিয়া তুমি বলিলে যে, তোমার পরম স্নেহের রাজধর ব্যতীত কেহ তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিত না।"

যুবরাজ একান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "ভাই, আমি নিজের বিপদের কথা বলিতেছি না—"

কথা শেষ হইতে না হইতে অভিমানে ইন্দ্রকুমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ইশা খাঁ যুবরাজকে বলিলেন, "যুবরাজ, এ মুকুট তোমার কাহাকেও দিবার অধিকার নাই। আমি সেনাপতি, এ মুকুট আমি যাহাকে দিব তাহারই হইবে।" বলিয়া ইশা খাঁ রাজধরের মাথা হইতে মুকুট তুলিয়া যুবরাজের মাথায় দিতে গেলেন।

যুবরাজ সরিয়া গিয়া বলিলেন, "না, এ আমি গ্রহণ করিতে পারি না।"

ইশা খাঁ বলিলেন, "তবে থাক্। এ মুকুট কেহ পাইবে না।" বলিয়া পদাঘাতে মুকুট কর্ণফুলি নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন, "রাজধর যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন— রাজধর শাস্তির যোগ্য।"

দশম পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রকুমার তাঁহার সমস্ত সৈন্য লইয়া আহতহৃদয়ে শিবির হইতে দূরে চলিয়া গেলেন। যুদ্ধ অবসান হইয়া গিয়াছে। ত্রিপুরার সৈন্য শিবির তুলিয়া দেশে ফিরিবার উপক্রম করিতেছে। এমন সময় সহসা এক ব্যাঘাত ঘটিল।

ইশা খাঁ যখন মুকুট কাড়িয়া লইলেন, তখন রাজধর মনে মনে কহিলেন, 'আমি না থাকিলে তোমরা কেমন করিয়া উদ্ধার পাও একবার দেখিব।'

তাহার পরদিন রাজধর গোপনে আরাকানপতির শিবিরে এক পত্র পাঠাইয়া দিলেন। এই পত্রে তিনি ত্রিপুরার সৈন্যের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদের সংবাদ দিয়া আরাকানপতিকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন।

ইন্দ্রকুমার যখন স্বতন্ত্র হইয়া সৈন্যসমেত স্বদেশাভিমুখে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন এবং যুবরাজের সৈন্যেরা শিবির তুলিয়া গৃহের অভিমুখে যাত্রা করিতেছে, তখন সহসা মগেরা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিল— রাজধর সৈন্য লইয়া কোথায় সরিয়া পড়িলেন তাহার উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

যুবরাজের হতাবশিষ্ট তিন সহস্র সৈন্য প্রায় তাহার চতুর্গুণ মগ-সৈন্য কর্তৃক হঠাৎ বেষ্টিত হইল। ইশা খাঁ যুবরাজকে বলিলেন, "আজ আর পরিত্রাণ নাই। যুদ্ধের ভার আমার উপর দিয়া তুমি পলায়ন করো।"

যুবরাজ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "পালাইলেও তো একদিন মরিতে হইবে।" চারি দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পালাইব বা কোথা। এখানে মরিবার যেমন সুবিধা পালাইবার তেমন সুবিধা নাই। হে ঈশ্বর, সকলই তোমার ইচ্ছা।"

ইশা খাঁ বলিলেন, "তবে আইস, আজ সমারোহ করিয়া মরা যাক।" বলিয়া প্রাচীরবৎ শত্রুসৈন্যের এক দুর্বল অংশ লক্ষ্য করিয়া সমস্ত সৈন্য বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটাইয়া দিলেন। পালাইবার পথ রুদ্ধ দেখিয়া সৈন্যেরা উন্মত্তের ন্যায় লড়িতে লাগিল। ইশা খাঁ দুই হাতে দুই তলোয়ার লইলেন— তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে একটি লোক তিষ্ঠিতে পারিল না। যুদ্ধক্ষেত্রের একস্থানে একটি ক্ষুদ্র উৎস উঠিতেছিল, তাহার জল রক্তে লাল হইয়া উঠিল।

ইশা খাঁ শত্রুর ব্যূহ ভাঙিয়া ফেলিয়া লড়িতে লড়িতে প্রায় পর্বতের শিখর পর্যন্ত উঠিয়াছেন, এমন সময় এক তীর আসিয়া তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। তিনি আল্লার নাম উচ্চারণ করিয়া ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়া গেলেন।

যুবরাজের জানুতে এক তীর, পৃষ্ঠে এক তীর এবং তাঁহার বাহন হাতির পঞ্জরে এক তীর বিদ্ধ হইল। মাহুত হত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। হাতি যুদ্ধক্ষেত্র ফেলিয়া উন্মাদের মতো ছুটিতে লাগিল। যুবরাজ তাহাকে ফিরাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন, সে ফিরিল না। অবশেষে তিনি যন্ত্রণায় ও রক্তপাতে দুর্বল হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অনেক দূরে কর্ণফুলি নদীর তীরে হাতির পিঠ হইতে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আজ রাত্রে চাঁদ উঠিয়াছে। অন্যদিন রাত্রে যে সবুজ মাঠের উপরে চাঁদের আলো বিচিত্রবর্ণ ছোটো ছোটো বনফুলের উপর আসিয়া পড়িত, আজ সেখানে সহস্র সহস্র মানুষের হাত পা কাটামুণ্ড ও মৃতদেহের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে— যে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ উৎসের জলে সমস্ত রাত ধরিয়া চন্দ্রের প্রতিবিম্ব নৃত্য করিত, সে উৎস মৃত অশ্বের দেহে প্রায় রুদ্ধ— তাহার জল রক্তে লাল হইয়া গেছে। কিন্তু দিনের বেলা মধ্যাহ্নের রৌদ্রে যেখানে মৃত্যুর ভীষণ উৎসব হইতেছিল, ভয় ক্রোধ নিরাশা হিংসা সহস্র হৃদয় হইতে অনবরত ফেনাইয়া উঠিতেছিল, অস্ত্রের ঝন ঝন উন্মাদের চীৎকার আহতের আর্তনাদ অশ্বের হ্রেষা রণশঙ্খের ধ্বনিতে নীল আকাশ যেন মথিত হইতেছিল— রাত্রে চাঁদের আলোতে সেখানে কী অগাধ শান্তি কী সুগভীর বিষাদ। মৃত্যুর নৃত্য যেন ফুরাইয়া গেছে, কেবল

প্রকাণ্ড নাট্যশালার চারি দিকে উৎসবের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। সাড়াশব্দ নাই, প্রাণ নাই, চেতনা নাই, হৃদয়ের তরঙ্গ স্তব্ধ। এক দিকে পর্বতের সুদীর্ঘ ছায়া পড়িয়াছে— এক দিকে চাঁদের আলো। মাঝে মাঝে পাঁচ-ছয়টা করিয়া বড়ো বড়ো গাছ ঝাঁকড়া মাথা লইয়া শাখাপ্রশাখা জটাজূট আঁধার করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ইন্দ্রকুমার যুদ্ধের সমস্ত সংবাদ পাইয়া যখন যুবরাজকে খুঁজিতে আসিয়াছেন, তখন তিনি কর্ণফুলি নদীর তীরে ঘাসের শয্যার উপর শুইয়া আছেন। মাঝে মাঝে অঞ্জলি পুরিয়া জলপান করিতেছেন, মাঝে মাঝে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া চোখ বুজিয়া অসিতেছে। দূর সমুদ্রের দিক হইতে বাতাস আসিতেছে। কানের কাছে কুল কুল করিয়া নদীর জল বহিয়া আসিতেছে। জনপ্রাণী নাই। চারি দিকে বিজন পর্বত দাঁড়াইয়া আছে, বিজন অরণ্য ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে— আকাশে চন্দ্র একাকী, জ্যোৎস্নালোকে অনন্ত নীলাকাশ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এমন সময়ে ইন্দ্রকুমার যখন বিদীর্ণহৃদয়ে "দাদা" বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন, তখন আকাশপাতাল যেন শিহরিয়া উঠিল। চন্দ্রনারায়ণ চমকিয়া জাগিয়া "এসো ভাই" বলিয়া আলিঙ্গনের জন্য দুই হাত বাড়াইয়া দিলেন। ইন্দ্রকুমার দাদার আলিঙ্গনের মধ্যে বদ্ধ হইয়া শিশুর মতো কাঁদিতে লাগিলেন।

চন্দ্রনারায়ণ ধীরে ধীরে বলিলেন, "আঃ, বাঁচিলাম ভাই। তুমি আসিবে জানিয়াই এতক্ষণে কোনোমতে আমার প্রাণ বাহির হইতেছিল না। ইন্দ্রকুমার, তুমি আমার উপরে অভিমান করিয়াছিলে, তোমার সেই অভিমান লইয়া কি আমি মরিতে পারি। আজ আবার দেখা হইল, তোমার প্রেম আবার ফিরিয়া পাইলাম— এখন মরিতে আর কোনো কষ্ট নাই।" বলিয়া দুই হাতে তাঁহার তীর উৎপাটন করিলেন। রক্ত ছুটিয়া পড়িল, তাঁহার শরীর হিম হইয়া আসিল— মৃদুস্বরে বলিলেন, "মরিলাম তাহাতে দুঃখ নাই কিন্তু আমাদের পরাজয় হইল।"

ইন্দ্রকুমার কাঁদিয়া কহিলেন, "পরাজয় তোমার হয় নাই দাদা, পরাজয় আমারই হইয়াছে।"

চন্দ্রনারায়ণ ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া হাত জোড় করিয়া কহিলেন, "দয়াময়, ভবের খেলা শেষ করিয়া আসিলাম, এখন তোমার কোলে স্থান দাও।" বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

ভোরের বেলা নদীর পশ্চিম পাড়ে চন্দ্র যখন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিল চন্দ্রনারায়ণের মুদ্রিতনেত্র মুখচ্ছবিও তখন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জীবন অস্তমিত হইল।

পরিশিষ্ট

বিজয়ী মগ সৈন্যেরা সমস্ত চট্টগ্রাম ত্রিপুরার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর পর্যন্ত লুণ্ঠন করিল। অমরমাণিক্য দেওঘাটে পালাইয়া গিয়া অপমানে আত্মহত্যা করিয়া মরিলেন। ইন্দ্রকুমার মগদের সহিত যুদ্ধ করিয়াই মরেন— জীবন ও কলঙ্ক লইয়া দেশে ফিরিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

রাজধর রাজা হইয়া কেবল তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন— তিনি গোমতীর জলে ডুবিয়া মরেন।

ইন্দ্রকুমার যখন যুদ্ধে যান তখন তাঁহার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। তাঁহারই পুত্র কল্যাণমাণিক্য রাজধরের মৃত্যুর পরে রাজা হন। তিনি পিতার ন্যায় বীর ছিলেন। যখন সম্রাট শাজাহানের সৈন্য ত্রিপুরা আক্রমণ করে, তখন কল্যাণমাণিক্য তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১২৯২

প্রবন্ধ

ধর্ম

ধর্ম

উৎসব

সংসারে প্রতিদিন আমরা যে সত্যকে স্বার্থের বিক্ষিপ্ততায় ভুলিয়া থাকি উৎসবের বিশেষ দিনে সেই অখণ্ড সত্যকে স্বীকার করিবার দিন— এইজন্য উৎসবের মধ্যে মিলন চাই। একলার উৎসব হইলে চলে না। বস্তুত বিশ্বের সকল জিনিসকেই আমরা যখন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি, তখনই এই সত্যকে আমরা দেখিতে পাই না— তখনই প্রত্যেক খণ্ডপদার্থ প্রত্যেক খণ্ডঘটনা আমাদের মনোযোগকে স্বতন্ত্ররূপে আঘাত করিতে থাকে। ইহাতে পদে পদে আমাদের চেষ্টা বাড়িয়া উঠে, কষ্ট বাড়িয়া যায়, তাহাতে আমাদের আনন্দ থাকে না। এইজন্য আমাদের প্রতিদিনের স্বার্থের মধ্যে, স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে পূর্ণতা নাই, পরিতৃপ্তি নাই, তাহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য পাই না, তাহার রাগিণী হারাইয়া ফেলি— তাহার চরমসত্য আমাদের অগোচরে থাকে। কিন্তু যে মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা খণ্ডকে মিলিত করিয়া দেখি, সেই ক্ষণেই সেই মিলনেই আমরা সত্যকে উপলব্ধি করি এবং এই অনুভূতিতেই আমাদের আনন্দ। তখনই আমরা দেখিতে পাই—

নিখিলে তব কী মহোৎসব। বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদভূমাস্পদ নির্ভয় শরণে।

সেইজন্যই বলিতেছিলাম, উৎসব একলার নহে। মিলনের মধ্যেই সত্যের প্রকাশ— সেই মিলনের মধ্যেই সত্যকে অনুভব করা উৎসবের সম্পূর্ণতা। একলার মধ্যে যাহা ধ্যানযোগে বুঝিবার চেষ্টা করি, নিখিলের মধ্যে তাহাই প্রত্যক্ষ করিলে তবেই আমাদের উপলব্ধি সম্পূর্ণ হয়।

মিলনের মধ্যে যে সত্য তাহা কেবল বিজ্ঞান নহে, তাহা আনন্দ, তাহা রসস্বরূপ, তাহা প্রেম। তাহা আংশিক নহে, তাহা সমগ্র ; কারণ, তাহা কেবল বুদ্ধিকে নহে, তাহা হৃদয়কেও পূর্ণ করে। যিনি নানাস্থান হইতে আমাদের সকলকে একের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, যাঁহার সম্মুখে, যাঁহার দক্ষিণকরতলচ্ছায়ায় আমরা সকলে মুখামুখি করিয়া বসিয়া আছি, তিনি নীরস সত্য নহেন, তিনি প্রেম। এই প্রেমই উৎসবের দেবতা— মিলনই তাঁহার সজীব সচেতন মন্দির।

মিলনের যে শক্তি, প্রেমের যে প্রবল সত্যতা, তাহার পরিচয় আমরা পৃথিবীতে পদে পদে পাইয়াছি। পৃথিবীতে ভয়কে যদি কেহ সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারে, বিপদকে তুচ্ছ করিতে পারে, ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, মৃত্যুকে উপেক্ষা করিতে পারে, তবে তাহা প্রেম। স্বার্থপরতাকে আমরা জগতের একটা সুকঠিন সত্য বলিয়া জানিয়াছি, সেই স্বার্থপরতার সুদৃঢ় জালকে অনায়াসে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় প্রেম। যে হতভাগ্য দেশবাসীরা পরস্পরের সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে এক হইয়া মিলিতে পারে না, তাহারা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া শ্রী হইতে ভ্রষ্ট হয়— তাহারা ত্যাগ করিতে পারে না, সুতরাং লাভ করিতে জানে না— তাহারা প্রাণ দিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের জীবনধারণ করা বিড়ম্বনা। তাহারা পৃথিবীতে নিয়তই ভয়ে ভীত হইয়া, অপমানে লাঞ্ছিত হইয়া দীনপ্রাণে নতশিরে ভ্রমণ করে। ইহার কারণ কী ? ইহার কারণ এই যে, তাহারা সত্যকে পাইতেছে না, প্রেমকে পাইতেছে না, এইজন্যই কোনোমতেই বল পাইতেছে না। আমরা সত্যকে যে-পরিমাণে উপলব্ধি করি, তাহার জন্য সেই পরিমাণে মূল্য দিতে পারি— আমরা ভাইকে যতখানি সত্য বলিয়া জানি, ভাইয়ের জন্য ততখানি ত্যাগ করিতে পারি। আমাদিগকে যে জলস্থল বেষ্টিত করিয়া আছে,

আমরা যে সকল লোকের মাঝখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যথেষ্ট পরিমাণে যদি তাহাদের সত্যতা অনুভব করিতে না পারি, তবে তাহাদের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে পারিব না।

তাই বলিতেছি, সত্য প্রেমরূপে আমাদের অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইলেই সত্যের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়। তখন বুদ্ধির দ্বিধা হইতে, মৃত্যুপীড়া হইতে, স্বার্থের বন্ধন ও ক্ষতির আশঙ্কা হইতে আমরা মুক্তিলাভ করি। তখন এই অস্থির সংসারের মাঝখানে আমাদের চিত্ত এমন একটি চরম স্থিতির আদর্শ খুঁজিয়া পায়, যাহার উপর সে আপনার সর্বস্ব সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হয়।

প্রাত্যহিক উদ্‌ভ্রান্তির মধ্যে মাঝে মাঝে এই স্থিতির সুখ, এই প্রেমের স্বাদ পাইবার জন্যই মানুষ উৎসবক্ষেত্রে সকল মানুষকে একত্রে আহ্বান করে। সেদিন তাহার ব্যবহার প্রাত্যহিক ব্যবহারের বিপরীত হইয়া উঠে। সেদিন একলার গৃহ সকলের গৃহ হয়, একলার ধন সকলের জন্য ব্যয়িত হয়। সেদিন ধনী দরিদ্রকে সম্মানদান করে, সেদিন পণ্ডিত মূর্খকে আসনদান করে। কারণ আত্মপর ধনী-দরিদ্র পণ্ডিতমূর্খ এই জগতে একই প্রেমের দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে, ইহাই পরম সত্য— এই সত্যেরই প্রকৃত উপলব্ধি পরমানন্দ। উৎসবদিনের অবারিত মিলন এই উপলব্ধিরই অবসর। যে ব্যক্তি এই উপলব্ধি হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইল, সে ব্যক্তি উন্মুক্ত উৎসবসম্পদের মাঝখানে আসিয়াও দীনভাবে রিক্তহস্তে ফিরিয়া চলিয়া গেল।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম— ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ। কিন্তু এই জ্ঞানময় অনন্তসত্য কিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন? "আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি—" তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; যাহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ অর্থাৎ তাঁহার প্রেম। বিশ্বজগৎ তাঁহার অমৃতময় আনন্দ, তাঁহার প্রেম।

সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রকাশ, সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রেম, আনন্দ। আমরা তো লৌকিক ব্যাপারেই দেখিয়াছি অপূর্ণ সত্য অপরিস্ফুট। এবং ইহাও দেখিয়াছি যে, যে-সত্য আমরা যত সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিব, তাহাতেই আমাদের তত আনন্দ, তত প্রেম। উদাসীনের নিকট একটা তৃণে কোনো আনন্দ নাই, তৃণ তাহার নিকট তুচ্ছ, তৃণের প্রকাশ তাহার নিকট অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু উদ্ভিদ্‌বেত্তার নিকট তৃণের মধ্যে যথেষ্ট আনন্দ আছে; কারণ, তৃণের প্রকাশ তাহার নিকট অত্যন্ত ব্যাপক, উদ্ভিদ্‌পর্যায়ের মধ্যে তৃণের সত্য যে ক্ষুদ্র নহে, তাহা সে জানে। যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিদ্বারা তৃণকে দেখিতে জানে তৃণের মধ্যে তাহার আনন্দ আরো পরিপূর্ণ— তাহার নিকট নিখিলের প্রকাশ এই তৃণের প্রকাশের মধ্যে প্রতিবিম্বিত। তৃণের সত্য তাহার নিকট ক্ষুদ্র সত্য অস্ফুট সত্য নয় বলিয়াই সে তাহার আনন্দ তাহার প্রেম উদ্‌বোধিত করে। যে মানুষের প্রকাশ আমার নিকট ক্ষুদ্র, আমার নিকট অস্ফুট, তাহাতে আমার প্রেম অসম্পূর্ণ। যে মানুষকে আমি এতখানি সত্য বলিয়া জানি যে, তাহার জন্য প্রাণ দিতে পারি, তাহাতে আমার আনন্দ, আমার প্রেম। অন্যের স্বার্থ অপেক্ষা নিজের স্বার্থ আমার কাছে এত অধিক সত্য যে, অন্যের স্বার্থসাধনে আমার প্রেম নাই— কিন্তু বুদ্ধদেবের নিকট জীবমাত্রেরই প্রকাশ এত সুপরিস্ফুট যে তাহাদের মঙ্গলচিন্তায় তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়াছিলেন।

তাই বলিতেছি, আনন্দ হইতেই সত্যের প্রকাশ এবং সত্যের প্রকাশ হইতেই আনন্দ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে— এই যে যাহা-কিছু হইয়াছে, ইহা সমস্তই আনন্দ হইতেই জাত। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত এই জগৎ আমাদের নিকট সেই আনন্দরূপে, প্রেমরূপে ব্যক্ত না হয়, ততক্ষণ তাহা পূর্ণসত্যরূপেই ব্যক্ত হইল না। জগতে আমাদের আনন্দ, জগতে আমাদের প্রেমই সত্যের প্রকাশরূপে উপলব্ধি। জগৎ আছে— এটুকু সত্য কিছুই নহে, কিন্তু জগৎ আনন্দ— এই সত্যই পূর্ণ।

আনন্দ কেমন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে? প্রাচুর্যে, ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যে। জগৎপ্রকাশে কোথাও দারিদ্র্য নাই, কৃপণতা নাই, যেটুকুমাত্র প্রয়োজন তাহারই মধ্যে সমস্ত অবসান নাই। এই যে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র হইতে আলোকের ঝরনা আকাশময় ঝরিয়া পড়িতেছে, যেখানে আসিয়া ঠেকিতেছে সেখানে বর্ণে-তাপে-প্রাণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা আনন্দের প্রাচুর্য। প্রয়োজন যতটুকু ইহা তাহার চেয়ে অনেক বেশি— ইহা অজস্র। বসন্তকালে লতাগুল্মের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে কুঁড়ি ধরিয়া ফুল ফুটিয়া পাতা

গজাইয়া একেবারে যে মাতামাতি আরম্ভ হয়, আম্রশাখায় মুকুল ভরিয়া উঠিয়া তাহার তলদেশে অনর্থক রাশি রাশি ঝরিয়া পড়ে, ইহা আনন্দের প্রাচুর্য। সূর্যোদয়ে সূর্যাস্তে মেঘের মুখে যে কত পরিবর্তমান বিচিত্র রঙের পাগলামি প্রকাশ হইতে থাকে, ইহার কোনো প্রয়োজন দেখি না— ইহা আনন্দের প্রাচুর্য। প্রভাতে পাখিদের শত শত কণ্ঠ হইতে উদ্‌গীরিত সুরের উচ্ছ্বাসে অরুণগগনে যেন চারি দিক হইতে গানের হোরিখেলা চলিতে থাকে, ইহাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত, ইহা আনন্দেরই প্রাচুর্য। আনন্দ উদার, আনন্দ অকৃপণ— সৌন্দর্যে-সম্পদে আনন্দ আপনাকে নিঃশেষে বিলাইতে গিয়া আপনার আর অন্ত পায় না।

উৎসবের দিনে আমরা যে সত্যের নামে বহুতর লোকে সম্মিলিত হই, তাহা আনন্দ, তাহা প্রেম। উৎসবে পরস্পরকে পরস্পরের কোনো প্রয়োজন নাই— সকল প্রয়োজনের অধিক যাহা, উৎসব তাহাই লইয়া। এইজন্য উৎসবের একটা প্রধান লক্ষণ প্রাচুর্য। এইজন্য উৎসবদিনে আমরা প্রতিদিনের কার্পণ্য পরিহার করি। প্রতিদিন যেরূপ প্রয়োজন হিসাব করিয়া চলি, আজ তাহা অকাতরে জলাঞ্জলি দিতে হয়। দৈন্যের দিন অনেক আছে, আজ ঐশ্বর্যের দিন।

আজ সৌন্দর্যের দিন। সৌন্দর্যও প্রয়োজনের বাড়া। ইহা আবশ্যকের নহে, ইহা আনন্দের বিকাশ— ইহা প্রেমের ভাষা। ফুল যদি সুন্দর না হইত, তবু সে আমার জ্ঞানগম্য হইত, ইন্দ্রিয়গম্য হইত— কিন্তু ফুল যে আমাকে সৌন্দর্য দেয়, সেটা অতিরিক্ত দান। এই বাহুল্যদানই আমার নিকট হইতে বাহুল্য প্রতিদান গ্রহণ করে— সেই যে বাহুল্য প্রতিদান, তাহাই প্রেম। এই বাহুল্য প্রতিদানটুকু লইয়া ফুলেরই বা কী, আর কাহারই বা কী। কিন্তু এক দিকে এই বাহুল্য সৌন্দর্য, আর-এক দিকে এই বাহুল্য প্রেম, ইহা লইয়াই জগতের নিত্যোৎসব— ইহাই আনন্দসমুদ্রের তরঙ্গলীলা।

তাই উৎসবের দিন সৌন্দর্যের দিন। এই দিনকে আমরা ফুলপাতার দ্বারা সাজাই, দীপমালার দ্বারা উজ্জ্বল করি, সংগীতের দ্বারা মধুর করিয়া তুলি।

এইরূপে মিলনের দ্বারা, প্রাচুর্যের দ্বারা, সৌন্দর্যের দ্বারা আমরা উৎসবের দিনকে বৎসরের সাধারণ দিনগুলির মুকুটমণিস্বরূপ করিয়া তুলি। যিনি আনন্দের প্রাচুর্যে, ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যে বিশ্বজগতের মধ্যে অমৃতরূপে প্রকাশমান— আনন্দরূপমমৃতং যদবিভাতি— উৎসবের দিনে তাঁহারই উপলব্ধি দ্বারা পূর্ণ হইয়া আমাদের মনুষ্যত্ব আপন ক্ষণিক অবস্থাগত সমস্ত দৈন্য দূর করিবে এবং অন্তরাত্মার চিরন্তন ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য প্রেমের আনন্দে অনুভব ও বিকাশ করিতে থাকিবে। এই দিনে সে অনুভব করিবে, সে ক্ষুদ্র নহে, সে বিচ্ছিন্ন নহে, বিশ্বই তাহার নিকেতন, সত্যই তাহার আশ্রয়, প্রেম তাহার চরমগতি, সকলেই তাহার আপন— ক্ষমা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, ত্যাগ তাহার পক্ষে সহজ, মৃত্যু তাহার পক্ষে নাই।

কিন্তু বলা বাহুল্য, উৎসবের এই আয়োজন তেমন দুঃসাধ্য নহে, ইহার উপলব্ধি যেমন দুরূহ। উৎসব অপরূপসুন্দর শতদলপদ্মের ন্যায় যখন বিকশিত হইয়া উঠে তখন আমাদের মধ্যে কতজন আছেন যাঁহারা মধুকরের মতো ইহার সুগন্ধ মধুকোষের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ইহার সুধারস উপভোগ করিতে পারেন? এদিনেও সম্মিলনকে আমরা কেবল জনতা করিয়া ফেলি, আয়োজনকে কেবল আড়ম্বর করিয়া তুলি। এদিনেও তুচ্ছ কৌতূহলে আমাদের চিত্ত কেবল বাহিরেই বিক্ষিপ্ত হইয়া বেড়ায়। যে আনন্দ অন্তরীক্ষে অন্তহীন জ্যোতিষ্কলোকের শিখায় শিখায় নিরন্তর আন্দোলিত, আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে দীপমালা জ্বালাইয়া আমরা কি সেই আনন্দের তরঙ্গে আমাদের আনন্দকে সচেতনভাবে মিলিত করিয়াছি? আমাদের এই সংগীতধ্বনি কি আমাদিগকে জগতের সেই গভীরতম অন্তঃপুরে প্রবাহিত করিয়া লইয়া যাইতেছে— যেখানে বিশ্বভুবনের সমস্ত সুর তাহার আপাতপ্রতীয়মান সমস্ত বিরোধ-বিশৃঙ্খলতা মিলাইয়া দিয়া প্রতি মুহূর্তেই পরিপূর্ণ রাগিণীরূপে উন্মেষিত হইয়া উঠিতেছে?

হায়, প্রত্যেক দিনে যে দরিদ্র, একদিনে সে ঐশ্বর্যলাভ করিবে কী করিয়া? প্রত্যেক দিনে যাহার জীবন শোভা হইতে নির্বাসিত, হঠাৎ একদিনেই সে সুন্দরের সহিত একাসনে বসিবে কেমন করিয়া? দিনে দিনে যে ব্যক্তি সত্যে-প্রেমে প্রস্তুত হইয়াছে, এই উৎসবের দিনে তাহারই উৎসব।

হে বিশ্বযজ্ঞপ্রাঙ্গণের উৎসব-দেবতা, আমি কে ? আজি উৎসবদিনে এই আসন গ্রহণ করিবার অধিকার আমার কী আছে ? জীবনের নৌকাকে আমি যে প্রতিদিন দাঁড় টানিয়া বাহিয়া চলিয়াছি, সে কি তোমার মহোৎসবের সোনাবাঁধানো ঘাটে আসিয়া আজও পৌঁছিয়াছে ? তাহার বাধা কি একটি ? তাহার লক্ষ্য কি ঠিক থাকে ? প্রতিকূল তরঙ্গের আঘাত সে কি সামলাইতে পারিল ? দিনের পর দিন কোথায় সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ? আজ কোথা হইতে সহসা তোমার উৎসবে সকলকে আহ্বানের ভার লইয়া, হে অন্তর্যামিন্, আমার অন্তরাত্মা তোমার সমক্ষে লজ্জিত হইতেছে। তাহাকে ক্ষমা করিয়া তুমিই আমাকে আহ্বান করো। একদিন নহে, প্রত্যহ তাহাকে আহ্বান করো। ফিরাও, ফিরাও, তাহাকে আত্মাভিমান হইতে ফিরাও। দুর্বল প্রবৃত্তির নিদারুণ অপমান হইতে তাহাকে রক্ষা করো। বুদ্ধির জটিলতার মধ্যে আর তাহাকে নিষ্ফল হইতে দিয়ো না। তাহাকে প্রতিদিন তোমার বিশ্বলোকে, তোমার আনন্দলোকে, তোমার সৌন্দর্যলোকে আকর্ষণ করিয়া তাহার চিরজীবনের সমস্ত দৈন্য চূর্ণ করিয়া ফেলো। যে মহাপুরুষগণ তোমার নিত্যোৎসবের নিমন্ত্রণে আহূত, যাঁহারা প্রতিদিনই নিখিললোকের সহিত তোমার আনন্দভোজে আসনগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাকে বিনম্রনতশিরে তাঁহাদের পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইতে দাও। তাহার মিথ্যা গর্ব, তাহার ব্যর্থ চেষ্টা, তাহার বিক্ষিপ্ত প্রবৃত্তি আজই তুমি অপসারিত করিয়া দাও— কাল হইতেই সে যেন নত হইয়া তোমার আসনের সর্বনিম্নস্থানে ধূলিতলে বসিবার অধিকারী হইতে পারে। তোমার উৎসব-সভার মহাসংগীত সেখানে কান পাতিয়া শুনা যাইবে, তোমার আনন্দ-উৎসবের রসস্রোত সেখানকার ধূলিকেও অভিষিক্ত করিবে। কিন্তু যেখানে অহংকার, যেখানে তর্ক, যেখানে বিরোধ, যেখানে খ্যাতিপ্রতিপত্তির জন্য প্রতিযোগিতা, যেখানে মঙ্গলকর্মও লোকে লুব্ধভাবে গর্বিতভাবে করে, যেখানে পুণ্যকর্ম অভ্যস্ত আচারমাত্রে পর্যবসিত— সেখানে সমস্ত আচ্ছন্ন, সমস্ত রুদ্ধ, সেখানে ক্ষুদ্র বৃহৎরূপে প্রতিভাত হয়, বৃহৎ ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে, সেখানে তোমার বিশ্বযজ্ঞোৎসবের আহ্বান উপহসিত হইয়া ফিরিয়া আসে। সেখানে তোমার সূর্য আলোক দেয় কিন্তু তোমার স্বহস্তলিখিত আলোক-লিপি লইয়া প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানে তোমার উদার বায়ু নিশ্বাস জোগায় মাত্র, অন্তঃকরণের মধ্যে বিশ্বপ্রাণকে সমীরিত করিতে পারে না। সেই উদ্ধত কারাগারের পাষাণপ্রাসাদ হইতে তাহাকে উদ্ধার করো— তোমার উৎসব-প্রাঙ্গণের ধুলায় তাহাকে লুটাইতে দাও। জগতে কেহই তাহাকে না চিনুক, কেহই না মানুক, সে যেন এক প্রান্তে থাকিয়া তোমাকে চিনে তোমাকে মানিয়া চলে। এই সৌভাগ্য কবে তাহার ঘটিবে তাহা জানি না, কবে তুমি তাহাকে তোমার উৎসবের অধিকারী করিবে তাহা তুমিই জান— আপাতত তাহার এই নিবেদন যে, এই প্রার্থনাটিও তাহার অন্তরে যেন যথার্থ সত্য হইয়া উঠে— সত্যকে সে যেন সত্যই চায়, অমৃতকে সে যেন মৌখিক যাচ্ঞাবাক্যের দ্বারা অপমান না করে।

১৩১২

দিন ও রাত্রি

সূর্য অস্ত গিয়াছে। অন্ধকার অবগুণ্ঠনের অন্তরালে সন্ধ্যার সীমান্তের শেষ স্বর্ণলেখাটুকু অন্তর্হিত হইয়াছে। রাত্রিকাল আসন্ন।

এই যে দিন এবং রাত্রি প্রত্যহই আমাদের জীবনকে একবার আলোকে একবার অন্ধকারে তালে তালে আঘাত করিয়া যাইতেছে, ইহারা আমাদের চিত্তবীণায় কী রাগিণী ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে। এইরূপে প্রতিদিন আমাদের মধ্যে যে এক অপরূপ ছন্দ রচিত হইতেছে, তাহার মধ্যে কি কোনো বৃহৎ অর্থ নাই ? আমরা এই যে অনন্ত গগনতলের নাড়িস্পন্দনের ন্যায় দিনরাত্রির নিয়মিত উত্থানপতনের অভিঘাতের মধ্যে বাড়িয়া উঠিতেছি, আমাদের জীবনের মধ্যে এই আলোক-অন্ধকারের নিত্য গতিবিধির একটা তাৎপর্য কি গ্রথিত হইয়া যাইতেছে না ? তটভূমির উপরে প্রতি বর্ষায় যে একটা

জলপ্লাবন বহিয়া যাইতেছে এবং তাহার পরে শরৎকালে সে আবার জল হইতে জাগিয়া উঠিয়া শস্যবপনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে— এই বর্ষা ও শরতের গতায়াত তটভূমির স্তরে স্তরে কি নিজের ইতিহাস রাখিয়া যায় না ?

দিনের পর এই যে রাত্রির অবতরণ, রাত্রির পর এই যে দিনের অভ্যুদয়, ইহার পরম বিস্ময়করতা হইতে আমরা চিরাভ্যাসবশত যেন বঞ্চিত না হই। সূর্য একসময়ে হঠাৎ আকাশতলে তাহার আলোকের পুঁথি বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া যায়— রাত্রি নিঃশব্দকরে আর-একটি নূতন গ্রন্থের নূতন অধ্যায় বিশ্বলোকের সহস্র অনিমেষনেত্রের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়, ইহা আমাদের পক্ষে সামান্য ব্যাপার নহে।

এই অল্পকালের পরিবর্তন কী বিপুল, কী আশ্চর্য। কী অনায়াসে মুহূর্তকালের মধ্যেই বিশ্বসংসার ভাব হইতে ভাবান্তরে পদার্পণ করে। অথচ মাঝখানে কোনো বিপ্লব নাই, বিচ্ছেদের কোনো তীব্র আঘাত নাই, একের অবসান ও অন্যের আরম্ভের মধ্যে কী স্নিগ্ধ শান্তি, কী সৌম্য সৌন্দর্য।

দিনের আলোকে, সকল পদার্থের পরস্পরের যে প্রভেদ, যে পার্থক্য, তাহাই বড়ো হইয়া, স্পষ্ট হইয়া, আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। আলোক আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবধানের কাজ করে— আমাদের প্রত্যেকের সীমা পরিস্ফুটরূপে নির্ণয় করিয়া দেয়। দিনের বেলায় আমরা যে-যার আপন-আপন কাজের দ্বারা স্বতন্ত্র, সেই কাজের চেষ্টার সংঘাতে পরস্পরের মধ্যে বিরোধও বাধিয়া যায়। দিনে আমরা সকলেই নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ করিয়া জগতে নিজেকে জয়ী করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত। তখন আমাদের আপন-আপন কর্মশালাই আমাদের কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর-সমস্ত বৃহৎ ব্যাপারের চেয়ে বৃহত্তম— এবং নিজ নিজ কর্মোদ্‌যোগের আকর্ষণই জগতের আর সমস্ত মহৎ আকর্ষণের চেয়ে আমাদের কাছে মহত্তম হইয়া উঠে।

এমন সময় নীলাম্বরা রাত্রি নিঃশব্দপদে আসিয়া নিখিলের উপরে স্নিগ্ধ করস্পর্শ করিবামাত্র আমাদের পরস্পরের বাহ্যপ্রভেদ অস্পষ্ট হইয়া আসে— তখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে গভীরতম যে ঐক্য, তাহাই অন্তরের মধ্যে অনুভব করিবার অবকাশ ঘটে। এইজন্য রাত্রি প্রেমের সময়, মিলনের কাল।

ইহাই ঠিক করিয়া বুঝিতে পারিলে জানিব— দিন আমাদিগকে যাহা দেয়, রাত্রি শুদ্ধমাত্র যে তাহা অপহরণ করে, তাহা নহে, অন্ধকার যে কেবলমাত্র অভাব ও শূন্যতা আনয়ন করে, তাহা নহে— তাহারও দিবার জিনিস আছে এবং যাহা দেয়, তাহা মহামূল্য। সে যে কেবল সুপ্তির দ্বারা আমাদের ক্ষতিপূরণ করে— আমাদের ক্লান্তি অপনোদন করিয়া দেয় মাত্র, তাহা নহে। সে আমাদের প্রেমের নিভৃত নির্ভরস্থান ; সে আমাদের মিলনের মহাদেশ।

শক্তিতে আমাদের গতি, প্রেমে আমাদের স্থিতি। শক্তি কর্মের মধ্যে আপনাকে ধাবিত করে, প্রেম বিশ্রামের মধ্যে আপনাকে পুঞ্জীভূত করে। শক্তি আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিতে থাকে— সে চঞ্চল, প্রেম আপনাকে সংহৃত করিয়া আনে— সে স্থির। আমাদের চিত্ত যাহাদিগকে ভালোবাসে, সংসারে কেবল তাহাদেরই মধ্যে সে বিরাম লাভ করে, আমাদের চিত্ত যখন বিশ্রামের অবকাশ পায়, তখনই সে সম্পূর্ণভাবে ভালোবাসিতে পারে। জগতে আমাদের যথার্থ যে বিরাম, তাহা প্রেম— প্রেমহীন যে বিরাম, তাহা জড়ত্বমাত্র।

এই কারণে কর্মশালা প্রকৃত মিলনের স্থান নহে, স্বার্থে আমরা একত্র হইতে পারি, কিন্তু এক হইতে পারি না। প্রভু-ভৃত্যের মিলন সম্পূর্ণ মিলন নহে, বন্ধুদের মিলনই সম্পূর্ণ মিলন। বন্ধুত্বের মিলন বিশ্রামের মধ্যে বিকশিত হয়— তাহাতে কর্মের তাড়না নাই, তাহাতে প্রয়োজনের বাধ্যতা নাই। তাহা অহেতুক।

এইজন্য দিবাবসানে আমাদের প্রয়োজন যখন শেষ হয়, আমাদের কর্মের বেগ যখন শান্ত হয়, তখনই সমস্ত আবশ্যকের অতীত যে প্রেম, সে আপনার যথার্থ অবকাশ পায়। আমাদের কর্মের সহায় যে ইন্দ্রিয়বোধ সে যখন অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ে, তখন ব্যাঘাতহীন আমাদের হৃদয়ের শক্তি

বাড়িয়া উঠে, তখন আমাদের স্নেহপ্রেম সহজ হয়— আমাদের মিলন সম্পূর্ণ হয়।

তাই বলিতেছিলাম, রাত্রি যে কেবল হরণ করে, তাহা নহে, সে দানও করে। আমাদের এক যায়, আমরা আর পাই ; এবং যায় বলিয়াই আমরা তাহা পাইতে পারি। দিনে সংসারক্ষেত্রে আমাদের শক্তিপ্রয়োগের সুখ, রাত্রে তাহা অভিভূত হয় বলিয়াই নিখিলের মধ্যে আমরা আত্মসমর্পণের আনন্দ পাই। দিনে স্বার্থসাধনচেষ্টায় আমাদের কর্তৃত্ব-অভিমান তৃপ্ত হয়, রাত্রি তাহাকে খর্ব করে বলিয়াই প্রেম এবং শান্তির অধিকার লাভ করি। দিনে আলোকে-পরিচ্ছন্ন এই পৃথিবীকে আমরা উজ্জ্বলরূপে পাই, রাত্রে তাহা ম্লান হয় বলিয়াই অগণ্য জ্যোতিষ্কলোক উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়।

আমরা একই সময়ে সীমাকে এবং অসীমকে, অহংকে এবং অখিলকে, বিচিত্রকে এবং এককে সম্পূর্ণভাবে পাইতে পারি না বলিয়াই একবার দিন আসিয়া আমাদের চক্ষু খুলিয়া দেয়, একবার রাত্রি আসিয়া আমাদের হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করে। একবার আলোক আসিয়া আমাদিগকে কেন্দ্রের মধ্যে নিবিষ্ট করে, একবার অন্ধকার আসিয়া আমাদিগকে পরিধির সহিত পরিচিত করিতে থাকে।

এইজন্য রাত্রিই উৎসবের বিশেষ সময়। এখন বিশ্বভুবন অন্ধকারের মাতৃকক্ষে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। যে অন্ধকার হইতে জগৎচরাচর ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, যে অন্ধকার হইতে আলোক-নির্ঝরিণী নিরন্তর উৎসারিত হইতেছে, যেখানে বিশ্বের সমস্ত উদ্‌যোগ নিঃশব্দে শক্তিসঞ্চয় করিতেছে, সমস্ত ক্লান্তি সুপ্তিসুধার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া নবজীবনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, যে নিস্তব্ধ মহান্ধকারগর্ভ হইতে এক-একটি উজ্জ্বল দিবস নীলসমুদ্র হইতে এক-একটি ফেনিল তরঙ্গের ন্যায় একবার আকাশে উত্থিত হইয়া আবার সেই সমুদ্রের মধ্যে শয়ান হইতেছে, সেই অন্ধকার আমাদের নিকট যাহা গোপন করিতেছে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক প্রকাশ করিতেছে। সে না থাকিলে লোকলোকান্তরের বার্তা আমরা পাইতাম না, আলোক আমাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিত।

এই রজনীর অন্ধকার প্রত্যহ একবার করিয়া দিবালোকের স্বর্ণসিংহদ্বার মুক্ত করিয়া আমাদিগকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃপুরের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করে, বিশ্বজননীর এক অখণ্ড নীলাঞ্চল আমাদের সকলের উপরে টানিয়া দেয়। সন্তান যখন মাতার আলিঙ্গনপাশের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন হইয়া কিছুই দেখে না— শোনে না, তখনই নিবিড়তর ভাবে মাতাকে অনুভব করে— সেই অনুভূতি দেখা-শোনার চেয়ে অনেক বেশি ঐকান্তিক— স্তব্ধ অন্ধকার তেমনি যখন আমাদের দেখা-শোনাকে শান্ত করিয়া দেয়, তখনই আমরা এক শয্যাতলে নিখিলকে ও নিখিলমাতাকে আমাদের বক্ষের কাছে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে নিকটবর্তী করিয়া অনুভব করি। তখন নিজের অভাব, নিজের শক্তি, নিজের কাজ বাড়িয়া উঠিয়া আমাদের চারি দিকে প্রাচীর তুলিয়া দেয় না, অত্যুগ্র ভেদবোধ আমাদের প্রত্যেককে খণ্ড-খণ্ড পৃথক-পৃথক করিয়া রাখে না, মহৎ নিঃশব্দতার মধ্য দিয়া নিখিলের নিশ্বাস আমাদের গায়ের উপর আসিয়া পড়ে, এবং নিত্যজাগ্রত নিখিলজননীর অনিমেষদৃষ্টি আমাদের শিয়রের কাছে প্রত্যক্ষগম্য হইয়া উঠে।

আমাদের রজনীর উৎসব সেই নিভৃতনিগূঢ় অথচ বিশ্বব্যাপী জননীকক্ষের উৎসব। এখন আমরা কাজের কথা ভুলি, সংগ্রামের কথা ভুলি, আত্মশক্তি-অভিমানের চর্চা ভুলি, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার প্রসন্ন মুখচ্ছবির ভিখারী হইয়া দাঁড়াই— বলি, জননী, যখন প্রয়োজন ছিল, তখন তোমার কাছে ক্ষুধার অন্ন, কর্মের শক্তি, পথের পাথেয় প্রার্থনা করিয়াছিলাম— কিন্তু এখন সমস্ত প্রয়োজনকে বাহিরে ফেলিয়া আসিয়া তোমার এই কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, এখন একান্ত তোমাকেই প্রার্থনা করি। আমি তোমার কাছে এখন আর হাত পাতিব না— কেবলমাত্র তুমি আমাকে স্পর্শ করো, মার্জনা করো, গ্রহণ করো। তোমার রজনী-মহাসমুদ্রে অবগাহন-স্নান করিয়া বিশ্বজগৎ যখন কাল উজ্জ্বলবেশে নির্মল ললাটে প্রভাত-আলোকে দণ্ডায়মান হইবে, তখন যেন আমি তাহার সঙ্গে সমান হইয়া দাঁড়াইতে পারি— তখন যেন আমার গ্লানি না থাকে, আমার ক্লান্তি দূর হয়— তখন যেন আমি অন্তরের সহিত বলিতে পারি— সকলের কল্যাণ হউক, কল্যাণ হউক, যেন বলিতে পারি— সকলের মধ্যে যিনি আছেন, তাঁহাকে আমি দেখিতেছি— তাঁহার যাহা প্রসাদ, তিনি অদ্য সমস্তদিন আমাকে যাহা দিবেন,

তাহাই আমি ভোগ করিব, আমি কিছুতেই লোভ করিব না।

প্রাতঃকালে যিনি আমাদের পিতা হইয়া আমাদিগকে কর্মশালায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাকালে তিনিই আমাদের মাতা হইয়া আমাদিগকে তাঁহার অন্তঃপুরে আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন। প্রাতঃকালে তিনি আমাদিগকে ভার দিয়াছিলেন, সন্ধ্যাকালে তিনি আমাদের ভার লইতেছেন। প্রত্যহই দিনে-রাত্রে এই যে দুই বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে আমাদের জীবন আন্দোলিত হইতেছে— একবার পিতা আমাদিগকে বহির্দেশে পাঠাইতেছেন, একবার মাতা আমাদিগকে অন্তঃপুরে টানিতেছেন, একবার নিজের দিকে ধাবিত হইতেছি, একবার অখিলের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি, ইহার মধ্যে আমাদের জীবন ও মৃত্যুর গভীর রহস্যচ্ছবি আলোক-অন্ধকারের তুলিকাপাতে প্রতিদিন বিচিত্র হইতেছে।

আমাদের কাব্যে-গানে আয়ু-অবসানের সহিত আমরা দিনান্তের উপমা দিয়া থাকি— কিন্তু সকল সময়ে তাহার সম্পূর্ণ ভাবটি আমরা হৃদয়ঙ্গম করি না, আমরা কেবল অবসানেরই দিকটা দেখিয়া বিষাদের নিশ্বাস ফেলি, পরিপূরণের দিকটা দেখি না। আমরা ইহা ভাবিয়া দেখি না, প্রত্যহ দিবাবসানে এত বড়ো যে একটা বিপরীত ব্যাপার ঘটিতেছে, আমাদের শক্তির যে এমন-একটা বিপর্যয়দশা উপস্থিত হইতেছে, তাহাতে তো কিছুই বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইতেছে না, জগৎ জুড়িয়া তো হাহাকারধ্বনি উঠিতেছে না, মহাকাশতলে বিশ্বের আরামেরই নিশ্বাস পড়িতেছে।

দিবস আমাদের জীবনেরই প্রতিকৃতি বটে। দিনের আলোক যেমন আর-সমস্ত লোককে আবৃত করিয়া আমাদের কর্মস্থান এই পৃথিবীকেই একমাত্র জাজ্বল্যমান করিয়া তুলে, আমাদের জীবনও আমাদের চতুর্দিকে তেমনি একটি বেষ্টন রচনা করে— সেইজন্যই আমাদের জীবনের অন্তর্গত যাহা-কিছু, তাহাই আমাদের কাছে এত একান্ত, ইহার চেয়ে বড়ো যে আর-কিছু আছে, তাহা সহসা আমাদের মনেই হয় না। দিনের বেলাতেও তো আকাশ ভরিয়া জ্যোতিষ্কলোক বিরাজ করিতেছে, কিন্তু দেখিতে পাই কই? যে আলোক আমাদের কর্মস্থানের ভিতরে জ্বলিতেছে, সেই আলোকই বাহিরের অন্য-সমস্তকে দ্বিগুণতর অন্ধকারময় করিয়া রাখে। তেমনি আমাদের এই জীবনকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া শতসহস্র জ্যোতির্ময় বিচিত্ররহস্য নানা আকারে বিরাজ করিতেছে, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই কই? যে চেতনা, যে বুদ্ধি, যে ইন্দ্রিয়শক্তি আমাদের জীবনের পথকে উজ্জ্বল করে, আমাদের কর্মসাধনেরই পরিধিসীমার মধ্যে আমাদের মনোযোগকে প্রবল করিয়া তোলে, সেই জ্যোতিই আমাদের জীবনের বহিঃসীমার সমস্তই আমাদের নিকট অগোচর রাখিয়া দেয়।

জীবনে যখন আমরাই কর্তা, যখন সংসারই সর্বপ্রধান, যখন আমাদের সুখদুঃখচক্রের পরিধি আমাদের আয়ুকালের মধ্যেই বিশেষভাবে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকে, এমন সময় দিন অবসান হইয়া যায়, জীবনের সূর্য অস্তাচলের অন্তরালে গিয়া পড়ে, মৃত্যু আমাদিগকে অঞ্চলে আচ্ছন্ন করিয়া কোলে তুলিয়া লয়। তখন সেই-যে অন্ধকারের আবরণ, সে কি কেবলই অভাব, কেবলই শূন্যতা? আমাদের কাছে কি তাহার একটি সুগভীর ও সুবিপুল প্রকাশ নাই? আমাদের জীবনাকাশের অন্তরালে যে অসীমতা নিত্যকাল বিরাজ করিতেছে, মৃত্যুর তিমিরপটে তাহা কি দেখিতে দেখিতে আমাদের চতুর্দিকে আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে না? তখন কি সহসা আমাদের এই সীমাবচ্ছিন্ন জীবনকে অসংখ্য জীবনলোকের সহিত যুক্ত করিয়া দেখিতে পাই না? দিবসের বিচ্ছিন্ন পৃথিবীকে সন্ধ্যাকাশে যখন সমস্ত গ্রহদলের সঙ্গে নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে সংযুক্ত করিয়া জানিতে পারি, তখন সমস্তটির যেমন একটি বৃহৎ ছন্দ, একটি প্রকাণ্ড তাৎপর্য আমাদের চিত্তের মধ্যে প্রসারিত হইয়া উঠে, তেমনি মৃত্যুর পরে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত আমাদের জীবনের বিপুল তাৎপর্য কি আমাদের কাছে অতি-সহজেই প্রকাশিত হয় না? জীবিতকালে যাহাকে আমরা একক করিয়া পৃথক করিয়া দেখি, মৃত্যুর পরে তাহাকেই আমরা বিরাটের মধ্যে সম্পূর্ণ করিয়া দেখিবার অবকাশ পাই। আমাদের জীবনের চেষ্টা, আমাদের জীবিকার সংগ্রাম যখন ক্লান্ত হইয়া যায়, তখন সেই গভীর নিস্তব্ধতায় আমরা আপনাকে অসীমেরই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই, নিজের ব্যক্তিগত সীমার মধ্যে নহে, নিজের সংসারগত শক্তির মধ্যে নহে।

এইরূপে জীবন হইতে মৃত্যুতে পদার্পণ, দিন হইতে রাত্রিতে সংক্রমণেরই অনুরূপ। ইহা বাহির হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ, কর্মশালা হইতে মাতৃক্রোড়ে আত্মসমর্পণ, পরস্পরের সহিত পার্থক্য ও বিরোধ হইতে নিখিলের সহিত মিলনের মধ্যে আত্মানুভূতি।

শক্তি আপনাকে ঘোষণা করে, প্রেম আপনাকে আবৃত রাখে। শক্তির ক্ষেত্র আলোক, প্রেমের ক্ষেত্র অন্ধকার। প্রেম অন্তরালের মধ্য হইতেই পালন করে, লালন করে, অন্তরালের মধ্যেই আকর্ষণ করিয়া আনে। বিশ্বের সমস্ত ভাণ্ডার বিশ্বজননীর গোপন অন্তঃপুরের মধ্যে। তাই আমরা কিছুই জানি না, কোথা হইতে এই নিঃশেষবিহীন প্রাণের ধারা লোকে লোকে প্রবাহিত হইতেছে, কোথা হইতে এই অনির্বাণ চেতনার আলোক জীবে জীবে জ্বলিয়া উঠিতেছে, কোথা হইতে এই নিত্যসঞ্জীবিত ধীশক্তি চিত্তে চিত্তে জাগ্রত হইতেছে। আমরা জানি না, এই পুরাতন জগতের ক্লান্তি কোথায় দূর হয়, জীর্ণ-জরার ললাটের শিথিল বলিরেখা কোথায় কোন্ অমৃত-করস্পর্শে মুছিয়া গিয়া আবার নবীনতার সৌকুমার্য লাভ করে, জানি না, কণা-পরিমাণ বীজের মধ্যে বিপুল বনস্পতির মহাশক্তি কোথায় কেমন করিয়া প্রচ্ছন্ন থাকে। জগতের এই যে আবরণ, যে আবরণের মধ্যে জগতের সমস্ত উদ্‌যোগ অদৃশ্য হইয়া কাজ করে, সমস্ত চেষ্টা বিরামলাভ করিয়া যথাকালে নবীভূত হইয়া উঠে, ইহা প্রেমেরই আবরণ। সুপ্তির মধ্যে এই প্রেমই স্তম্ভিত, মৃত্যুর মধ্যে এই প্রেমই প্রগাঢ়, অন্ধকারের মধ্যে এই প্রেমই পুঞ্জীকৃত, আলোকের মধ্যে এই প্রেমই চঞ্চলশক্তির পশ্চাতে থাকিয়া অদৃশ্য, জীবনের মধ্যে এই প্রেমই আমাদের কর্তৃত্বের অন্তরালে থাকিয়া প্রতিমুহূর্তে বলপ্রেরণ, প্রতিমুহূর্তে ক্ষতিপূরণ করিতেছে।

হে মহাতিমিরাবগুণ্ঠিতা রমণীয়া রজনী, তুমি পক্ষিমাতার বিপুল পক্ষপুটের ন্যায় শাবকদিগকে সুকোমল স্নেহাচ্ছাদনে আবৃত করিয়া অবতীর্ণ হইতেছ; তোমার মধ্যে বিশ্বধাত্রীর পরমস্পর্শ নিবিড়ভাবে নিগূঢ়ভাবে অনুভব করিতে চাহি। তোমার অন্ধকার আমাদের ক্লান্ত ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন রাখিয়া আমাদের হৃদয়কে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিক, আমাদের শক্তিকে অভিভূত করিয়া আমাদের প্রেমকে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলুক, আমাদের নিজের কর্তৃত্বপ্রয়োগের অহংকারসুখকে খর্ব করিয়া মাতার আলিঙ্গনপাশে নিঃশেষে আপনাকে বর্জন করিবার আনন্দকেই গরীয়ান করুক।

হে বিরাম-বিভাবরীর ঈশ্বরী মাতা, হে অন্ধকারের অধিদেবতা, হে সুপ্তির মধ্যে জাগ্রত, হে মৃত্যুর মধ্যে বিরাজমান, তোমার নক্ষত্রদীপিত অঙ্গনতলে তোমার চরণচ্ছায়ায় লুণ্ঠিত হইলাম। আমি এখন আর কোনো ভয় করিব না, কেবল আপন ভার তোমার দ্বারে বিসর্জন দিব; কোনো চিন্তা করিব না, কেবল চিত্তকে তোমার কাছে একান্ত সমর্পণ করিব; কোনো চেষ্টা করিব না, কেবল তোমার ইচ্ছায় আমার ইচ্ছাকে বিলীন করিব; কোনো বিচার করিব না, কেবল তোমার সেই আনন্দে আমার প্রেমকে নিমগ্ন করিয়া দিব যে—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি।

ঐ দেখিতেছি, তোমার মহান্ধকার রূপের মধ্যে বিশ্বভুবনের সমস্ত আলোকপুঞ্জ কেবল বিন্দু-বিন্দু-জ্যোতিরূপে একত্র সমবেত হইয়াছে। দিনের বেলায় পৃথিবীর ছোটো ছোটো চাঞ্চল্য, আমাদের নিজকৃত তুচ্ছ আন্দোলন আমাদের কাছে কত বিপুল-বৃহৎ রূপে দেখা দেয়।— কিন্তু আকাশের ঐ যে নক্ষত্রসকল, যাহাদের উদ্দাম বেগ আমরা মনে ধারণাই করিতে পারি না, যাহাদের উচ্ছ্বসিত আলোক তরঙ্গের আলোড়ন আমাদের কল্পনাকে পরাস্ত করিয়া দেয়— তোমার মধ্যে তাহাদের সেই প্রচণ্ড আন্দোলন তো কিছুই নহে, তোমার অন্ধকার-বসনাঞ্চলতলে তোমার অবনত স্থিরদৃষ্টির নিম্নে তাহারা স্তন্যপাননিরত সুপ্তশিশুর মতো নিশ্চল নিস্তব্ধ। তোমার বিরাট ক্রোড়ে তাহাদের অস্থিরতাও স্থিরত্ব, তাহাদের দুঃসহ তীব্রতেজ মাধুর্যরূপে প্রকাশমান। ইহা দেখিয়া এ রাত্রে আমার তুচ্ছ চাঞ্চল্যের আস্ফালন, আমার ক্ষণিক তেজের অভিমান, আমার ক্ষুদ্র দুঃখের আক্ষেপ, কিছুই আর থাকে না, তোমার মধ্যে আমি সমস্তই স্থির করিলাম, সমস্ত আবৃত করিলাম, সমস্ত শান্ত করিলাম, তুমি আমাকে গ্রহণ করো— আমাকে রক্ষা করো,

যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

আমি এখন তোমার নিকট শক্তি প্রার্থনা করি না, আমাকে প্রেম দাও ; আমি সংসারে জয়ী হইতে চাহি না, তোমার নিকট প্রণত হইতে চাই ; আমি সুখদুঃখকে অবজ্ঞা করিতে চাহি না, সুখদুঃখকে তোমার মঙ্গলহস্তের দান বলিয়া বিনয়ে গ্রহণ করিতে চাই। মৃত্যু যখন আমার কর্মশালার দ্বারে দাঁড়াইয়া নীরবসংকেতে আহ্বান করিবে, তখন যেন তাহার অনুসরণ করিয়া, জননী, তোমার অন্তঃপুরের শান্তিকক্ষে নিঃশঙ্কহৃদয়ের মধ্যে আমি ক্ষমা লইয়া যাই, প্রীতি লইয়া যাই, কল্যাণ লইয়া যাই— বিরোধের সমস্ত দাহ যেন সেদিন সন্ধ্যাস্নানে জুড়াইয়া যায়, সমস্ত বাসনার পঙ্ক যেন ধৌত হয়, সমস্ত কুটিলতাকে যেন সরল, সমস্ত বিকৃতিকে যেন সংস্কৃত করিয়া যাইতে পারি। যদি সে অবকাশ না ঘটে, যদি ক্ষুদ্রবল নিঃশেষিত হইয়া যায়, তবু তোমার বিশ্ববিধানের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া যেন দিন হইতে রাত্রে, জীবন হইতে মৃত্যুতে, আমার অক্ষমতা হইতে তোমার করুণার মধ্যে একান্তভাবে আত্মবিসর্জন করিতে পারি। ইহা যেন মনে রাখি— জীবনকে তুমিই আমার প্রিয় করিয়াছিলে, মরণকেও তুমিই আমার প্রিয় করিবে— তোমার দক্ষিণহস্তে তুমি আমাকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছিলে, তোমার বামহস্তে তুমি আমাকে ক্রোড়ে আকর্ষণ করিয়া লইবে— তোমার আলোক আমাকে শক্তি দিয়াছিল, তোমার অন্ধকার আমাকে শান্তি দিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

১৩১০

মনুষ্যত্ব

'উত্তিষ্ঠত ! জাগ্রত !' উত্থান করো, জাগ্রত হও— এই বাণী উদ্‌ঘোষিত হইয়া গেছে। আমরা কে শুনিয়াছি, কে শুনি নাই, জানি না— কিন্তু 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত' এই বাক্য বার বার আমাদের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সংসারের প্রত্যেক বাধা প্রত্যেক দুঃখ প্রত্যেক বিচ্ছেদ কতশতবার আমাদের অন্তরাত্মার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আঘাত দিয়া যে-ঝংকার দিয়াছে, তাহাতে কেবল এই বাণীই ঝংকৃত হইয়া উঠিয়াছে 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত'— উত্থান করো, জাগ্রত হও। অশ্রুশিশিরধৌত আমাদের নবজাগরণের জন্য নিখিল অনিমেষনেত্রে প্রতীক্ষা করিয়া আছে— কবে সেই প্রভাত আসিবে, কবে সেই রাত্রির অন্ধকার অপগত হইয়া আমাদের অপূর্ব বিকাশকে নির্মল নবোদিত অরুণালোকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবে। কবে আমাদের বহুদিনের বেদনা সফল হইবে, আমাদের অশ্রুধারা সার্থক হইবে।

পুষ্পকে আজ প্রাতঃকালে বলিতে হয় নাই যে, 'রজনী প্রভাত হইল— তুমি আজ প্রস্ফুটিত হইয়া ওঠো !' বনে বনে আজ বিচিত্র পুষ্পগুলি অতি অনায়াসেই বিশ্বজগতের অন্তর্গূঢ় আনন্দকে বর্ণে গন্ধে শোভায় বিকশিত করিয়া মাধুর্যের দ্বারা নিখিলের সহিত কমনীয়ভাবে আপনার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। পুষ্প আপনাকেও পীড়ন করে নাই, অন্য কাহাকেও আঘাত করে নাই, কোনো অবস্থায় দ্বিধার লক্ষণ দেখায় নাই, সহজসার্থকতায় আদ্যোপান্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

ইহা দেখিয়া মনের মধ্যে এই আক্ষেপ জন্মে যে, আমার জীবন কেন বিশ্বব্যাপী আনন্দকিরণপাতে এমনি সহজে, এমনি সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠে না ? সে তাহার সমস্ত দলগুলি সংকুচিত করিয়া আপনার মধ্যে এত প্রাণপণে কী আঁকড়িয়া রাখিতেছে ? প্রভাতে তরুণ সূর্য আসিয়া অরুণকরে তাহার দ্বারে আঘাত করিতেছে, বলিতেছে, 'আমি যেমন করিয়া আমার চম্পক-কিরণরাজি সমস্ত আকাশময় মেলিয়া দিয়াছি, তুমি তেমন সহজে আনন্দে বিশ্বের মাঝখানে আপনাকে অবাধিত করিয়া দাও।' রজনী নিঃশব্দপদে আসিয়া স্নিগ্ধহস্তে তাহাকে স্পর্শ করিয়া বলিতেছে, 'আমি যেমন করিয়া আমার অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্য হইতে আমার সমস্ত জ্যোতিঃসম্পদ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি, তুমি তেমনি করিয়া একবার অন্তরের গভীর-তলের দ্বার নিঃশব্দে উদ্‌ঘাটন করিয়া দাও— আত্মার প্রচ্ছন্ন রাজভাণ্ডার একমুহূর্তে বিস্মিত বিশ্বের সম্মুখীন করো।' নিখিল জগৎ প্রতিক্ষণেই তাহার বিচিত্র স্পর্শের

দ্বারা আমাদিগকে এই কথাই বলিতেছে, 'আপনাকে বিকশিত করো, আপনাকে সমর্পণ করো, আপনার দিক হইতে একবার সকলের দিকে ফেরো, এই জল-স্থল-আকাশে, এই সুখদুঃখের বিচিত্র সংসারে অনির্বচনীয় ব্রহ্মের প্রতি আপনাকে একবার সম্পূর্ণ উন্মুখ করিয়া ধরো।'

কিন্তু বাধার অন্ত নাই— প্রভাতে ফুলের মতো করিয়া এমন সহজে এমন পরিপূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করিতে পারি না। আপনাকে আপনার মধ্যেই আবৃত করিয়া রাখি, চারি দিকে নিখিলের আনন্দ-অভ্যুদয় ব্যর্থ হইতে থাকে।

কে বলিবে, ব্যর্থ হইতে থাকে ? প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে অনন্ত জীবন রহিয়াছে তাহার সফলতার পরিমাণ কে করিতে পারে ? পুষ্পের মতো আমাদের ক্ষণকালীন সম্পূর্ণতা নহে। নদী যেমন তাহার বহুদীর্ঘ তটদ্বয়ের ধারাবাহিক বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া কত পর্বত-প্রান্তর-মরু-কানন-নগর-গ্রামকে তরঙ্গাভিহত করিয়া আপন সুদীর্ঘযাত্রার বিপুল সঞ্চয়কে প্রতিমুহূর্তে নিঃশেষে মহাসমুদ্রের নিকট উৎসর্গ করিতে থাকে, কোনোকালে তাহার অন্ত থাকে না— তাহার অবিশ্রাম প্রবাহধারারও অন্ত থাকে না, তাহার চরম বিরামেরও সীমা থাকে না— মনুষ্যত্বকে সেইরূপ বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া বিপুলভাবে মহৎ সার্থকতা লাভ করিতে হয়। তাহার সফলতা সহজ নহে। নদীর ন্যায় প্রতিপদে সে নিজের পথ নিজের বলে নিজের বেগে রচনা করিয়া চলে। কোনো কূল গড়িয়া কোনো কূল ভাঙিয়া, কোথাও বিভক্ত হইয়া কোথাও সংযুক্ত হইয়া, নব নব বাধা দ্বারা আবর্তবেগে ঘূর্ণিত হইয়া সে আপনাকে আপনি বৃহৎ করিয়া সৃষ্টি করিতে থাকে ; অবশেষে যখন সে আপনার সীমাবিহীন পরিণামে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সে বিচিত্রকে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে বলিয়াই মহান একের সহিত তাহার মিলন সম্পূর্ণ হয়। বাধা যদি না থাকিত, তবে সে বৃহৎ হইতে পারিত না— বৃহৎ না হইলে বিরাটের মধ্যে তাহার বিকাশ পরিপূর্ণ হইত না।

দুঃখ আছে— সংসারে দুঃখের শেষ নাই। সেই দুঃখের আঘাতে, সেই দুঃখের বেগে সংসারে প্রকাণ্ড ভাঙন-গড়ন চলিতেছে— ইহাতে অহরহ যে তরঙ্গ উঠিতেছে, তাহার কতই ধ্বনি, কতই বর্ণ, কতই গতিভঙ্গিমা ! মানুষ যদি ক্ষুদ্র হইত এবং ক্ষুদ্রতাতেই মানুষের যদি শেষ হইত, তবে দুঃখের মতো অসংগত কিছুই হইতে পারিত না। এত দুঃখ ক্ষুদ্রের নহে। মহতেরই গৌরব দুঃখ। বিশ্বসংসারের মধ্যে মনুষ্যত্বই সেই দুঃখের মহিমায় মহীয়ান্‌, অশ্রুজলেই তাহার রাজ্যাভিষেক হইয়াছে। পুষ্পের দুঃখ নাই, পশুপক্ষীর দুঃখসীমা সংকীর্ণ— মানুষের দুঃখ বিচিত্র, তাহা গভীর, অনেক সময়ে তাহা অনির্বচনীয়— এই সংসারের মধ্যে তাহার বেদনার সীমা যেন সম্পূর্ণ করিয়া পাওয়া যায় না।

এই দুঃখই মানুষকে বৃহৎ করে, মানুষকে আপন বৃহত্ত্ব সম্বন্ধে জাগ্রত সচেতন করিয়া তোলে, এবং এই বৃহত্ত্বেই মানুষকে আনন্দের অধিকারী করিয়া তোলে। কারণ,

ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি— অল্পে আমাদের আনন্দ নাই।

যাহাতে আমাদের খর্বতা, আমাদের স্বল্পতা, তাহা অনেক সময়ে আমাদের আরামের হইতে পারে, কিন্তু তাহা আমাদের আনন্দের নহে। যাহা আমরা বীর্যের দ্বারা না পাই, অশ্রুর দ্বারা না পাই, যাহা অনায়াসের তাহা আমরা সম্পূর্ণ পাই না— যাহাকে দুঃখের মধ্য দিয়া কঠিনভাবে লাভ করি, হৃদয় তাহাকেই নিবিড়ভাবে সমগ্রভাবে প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যত্ব আমাদের পরমদুঃখের ধন, তাহা বীর্যের দ্বারাই লভ্য। প্রত্যহ পদে পদে বাধা অতিক্রম করিয়া যদি তাহাকে পাইতে না হইত, তবে তাহাকে পাইয়াও পাইতাম না— যদি তাহা সুলভ হইত, তবে আমাদের হৃদয় তাহাকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করিত না। কিন্তু তাহা দুঃখের দ্বারা দুর্লভ, তাহা মৃত্যুশঙ্কার দ্বারা দুর্লভ, তাহা ভয়-বিপদের দ্বারা দুর্লভ, তাহা নানাভিমুখী প্রবৃত্তি সংক্ষোভের দ্বারা দুর্লভ। এই দুর্লভ মনুষ্যত্বকে অর্জন করিবার চেষ্টায় আত্মা আপনার সমস্ত শক্তি অনুভব করিতে থাকে। সেই অনুভূতিতেই তাহার প্রকৃত আনন্দ। ইহাতেই তাহার যথার্থ আত্মপরিচয়। ইহাতেই সে জানিতে পায়, দুঃখের ঊর্ধ্বে তাহার মস্তক, মৃত্যুর ঊর্ধ্বে তাহার প্রতিষ্ঠা। এইরূপে সংসারের বিচিত্র অভিঘাতে, দুঃখ বাধার সহিত নিরন্তর সংগ্রামে যে আত্মার

সমস্ত শক্তি জাগ্রত, সমস্ত তেজ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেই আত্মাই ব্রহ্মকে যথার্থভাবে লাভ করিবার উদ্যম প্রাপ্ত হয়— ক্ষুদ্র আরামের মধ্যে, ভোগবিলাসের মধ্যে যে আত্মা জড়ত্বে আবিষ্ট হইয়া আছে, ব্রহ্মের আনন্দ তাহার নহে। সেইজন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

এই আত্মা (জীবাত্মাই বল, পরমাত্মাই বল) ইনি বলহীনের দ্বারা লভ্য নহেন। সমগ্র শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিবার যত উপলক্ষ ঘটে, ততই আত্মাকে প্রকৃতভাবে লাভ করিবার উপায় হয়।

এইজন্যই পুষ্পের পক্ষে পুষ্পত্ব যত সহজ, মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্ব তত সহজ নহে। মনুষ্যত্বের মধ্য দিয়া মানুষকে যাহা পাইতে হইবে, তাহা নিদ্রিত অবস্থায় পাইবার নহে। এইজন্যই সংসারের সমস্ত কঠিন আঘাত আমাদিগকে এই কথা বলিতেছে—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।
উঠ, জাগো, যথার্থ গুরুকে প্রাপ্ত হইয়া বোধলাভ করো।
সেই পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম, কবিরা এইরূপ বলেন।

অতএব প্রভাতে যখন বনে-উপবনে পুষ্প-পল্লবের মধ্যে তাহাদের ক্ষুদ্র সম্পূর্ণতা, তাহাদের সহজ শোভা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন মানুষ আপন দুর্গম পথ আপন দুঃসহ দুঃখ আপন বৃহৎ অসমাপ্তির গৌরবে মহত্তর বিচিত্রতর আনন্দের গীত কি গাহিবে না? যে প্রভাতে তরুলতার মধ্যে কেবল পুষ্পের বিকাশ এবং পল্লবের হিল্লোল, পাখির গান এবং ছায়ালোকের স্পন্দন, সেই শিশিরধৌত জ্যোতির্ময় প্রভাতে মানুষের সম্মুখে সংসার— তাহার সংগ্রামক্ষেত্র— সেই রমণীয় প্রভাতে মানুষকেই বদ্ধপরিকর হইয়া তাহার প্রতিদিনের দুরূহ জয়চেষ্টার পথে ধাবিত হইতে হইবে, ক্লেশকে বরণ করিয়া লইতে হইবে, সুখদুঃখের উত্তাল তরঙ্গের উপর দিয়া তাহাকে তরণী বাহিতে হইবে— কারণ, মানুষ মহৎ; কারণ, মনুষ্যত্ব সুকঠিন, এবং মানুষের যে পথ, 'দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'।

কিন্তু সংসারের মধ্যেই যদি সংসারের শেষ দেখি, তবে দুঃখকষ্টের পরিমাণ অত্যন্ত উৎকট হইয়া উঠে, তাহার সামঞ্জস্য থাকে না। তবে এই বিষম ভার কে বহন করিবে? কেনই বা বহন করিবে? কিন্তু যেমন নদীর এক প্রান্তে পরমবিরাম সমুদ্র, অন্য দিকে সুদীর্ঘতটনিরুদ্ধ অবিরাম-যুধ্যমান জলধারা, তেমনি আমাদেরও যদি একই সময়ে এক দিকে ব্রহ্মের মধ্যে বিশ্রাম ও অন্য দিকে সংসারের মধ্যে অবিশ্রাম গতিবেগ না থাকে, তবে এই গতির কোনোই তাৎপর্য থাকে না, আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা অদ্ভুত উন্মত্ততা হইয়া দাঁড়ায়। ব্রহ্মের মধ্যেই আমাদের সংসারের পরিণাম, আমাদের কর্মের গতি। শাস্ত্র বলিয়াছেন— ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ

যদযৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।
যে-যে কর্ম করিবেন, তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন।

ইহাতে একই কালে কর্ম এবং বিরাম, চেষ্টা এবং শান্তি, দুঃখ এবং আনন্দ। ইহাতে এক দিকে আমাদের আত্মার কর্তৃত্ব থাকে ও অন্যদিকে যেখানে সেই কর্তৃত্বের নিঃশেষে বিলয়, সেইখানে সেই কর্তৃত্বকে প্রতিক্ষণে বিসর্জন দিয়া আমরা প্রেমের আনন্দলাভ করি।

প্রেম তো কিছু না দিয়া বাঁচিতে পারে না। আমাদের কর্ম, আমাদের কর্তৃত্ব যদি একেবারেই আমাদের না হইত, তবে ব্রহ্মের মধ্যে বিসর্জন দিতাম কী? তবে ভক্তি তাহার সার্থকতালাভ করিত কেমন করিয়া? সংসারেই আমাদের কর্ম, আমাদের কর্তৃত্ব, তাহাই আমাদের দিবার জিনিস। আমাদের প্রেমের চরম সার্থকতা হইবে— যখন আমাদের সমস্ত কর্ম, সমস্ত কর্তৃত্ব আনন্দে ব্রহ্মকে সমর্পণ করিতে পারিব। নতুবা কর্ম আমাদের পক্ষে নিরর্থক ভার ও কর্তৃত্ব বস্তুত সংসারের দাসত্ব হইয়া উঠিবে। পতিব্রতা স্ত্রীর পক্ষে তাহার পতিগৃহের কর্মই গৌরবের, তাহা আনন্দের— সে কর্ম তাহার বন্ধন নহে, পতিপ্রেমের মধ্যেই তাহা প্রতিক্ষণেই মূর্তিলাভ করিতেছে— এক পতিপ্রেমের মধ্যেই

তাহার বিচিত্র কর্মের অখণ্ড ঐক্য, তাহার নানাদুঃখের এক আনন্দ-অবসান— ব্রহ্মের সংসারে আমরা যখন ব্রহ্মের কর্ম করিব, সকল কর্ম ব্রহ্মকে দিব, তখন সেই কর্ম এবং মুক্তি একই কথা হইয়া দাঁড়াইবে, তখন এক ব্রহ্মে আমাদের সমস্ত কর্মের বৈচিত্র্য বিলীন হইবে, সমস্ত দুঃখের ঝংকার একটি আনন্দসংগীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

প্রেম যাহা দান করে, সেই দান যতই কঠিন হয়, ততই তাহার সার্থকতার আনন্দ নিবিড় হয়। সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহ দুঃখের দ্বারাই সম্পূর্ণ— প্রীতিমাত্রই কষ্টদ্বারা আপনাকে সমগ্রভাবে সপ্রমাণ করিয়া কৃতার্থ হয়। ব্রহ্মের প্রতি যখন আমাদের প্রীতি জাগ্রত হইবে, তখন আমাদের সংসারধর্ম দুঃখক্লেশের দ্বারাই সার্থক হইবে, তাহা আমাদের প্রেমকেই প্রতিদিন উজ্জ্বল করিবে, অলংকৃত করিবে ; ব্রহ্মের প্রতি আমাদের আত্মোৎসর্গকে দুঃখের মূল্যেই মূল্যবান করিয়া তুলিবে।

হে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, আমার দৃষ্টি, শ্রবণ, চিন্তা, আমার সমস্ত কর্ম, তোমার অভিমুখেই অহরহ চলিতেছে ইহা আমি জানি না বলিয়াই, ইহা আমার ইচ্ছাকৃত নহে বলিয়াই দুঃখ পাই। আমি সমস্তকেই অন্ধভাবে বলপূর্বক আমার বলিতে চাই— বলরক্ষা হয় না, আমার কিছুই থাকে না। নিখিলের দিক হইতে, তোমার দিক হইতে সমস্ত নিজের দিকে টানিয়া-টানিয়া রাখিবার নিষ্ফল চেষ্টায় প্রতিদিন পীড়িত হইতে থাকি। আজ আমি আর কিছুই চাই না, আমি আজ পাইবার প্রার্থনা করিব না, আজ আমি দিতে চাই, দিবার শক্তি চাই। তোমার কাছে আমি আপনাকে পরিপূর্ণরূপে রিক্ত করিব, রিক্ত করিয়া পরিপূর্ণ করিব। তোমার সংসারে কর্মের দ্বারা তোমার যে সেবা করিব, তাহা নিরন্তর হইয়া আমার প্রেমকে জাগ্রত নিষ্ঠাবান করিয়া রাখুক, তোমার অমৃতসমুদ্রের মধ্যে অতলস্পর্শ যে বিশ্রাম, তাহাও আমাকে অবসানহীন শান্তি দান করুক। তুমি দিনে দিনে স্তরে স্তরে আমাকে শতদল পদ্মের ন্যায় বিশ্বজগতের মধ্যে বিকশিত করিয়া তোমারই পূজার অর্ঘ্যরূপে গ্রহণ করো।

১৩১০

ধর্মের সরল আদর্শ

আমার গৃহকোণের জন্য যদি একটি প্রদীপ আমাকে জ্বালিতে হয়, তবে তাহার জন্য আমাকে কত আয়োজন করিতে হয়— সেটুকুর জন্য কত লোকের উপর আমার নির্ভর। কোথায় সর্ষপ-বপন হইতেছে, কোথায় তৈল-নিষ্কাশন চলিতেছে, কোথায় তাহার ক্রয়-বিক্রয়— তাহার পরে দীপসজ্জারই বা কত উদ্‌যোগ— এত জটিলতায় যে আলোকটুকু পাওয়া যায় তাহা কত অল্প। তাহাতে আমার ঘরের কাজ চলিয়া যায়, কিন্তু বাহিরের অন্ধকারকে দ্বিগুণ ঘনীভূত করিয়া তোলে।

বিশ্বপ্রকাশক প্রভাতের আলোককে গ্রহণ করিবার জন্য কাহারও উপরে আমাকে নির্ভর করিতে হয় না— তাহা আমাকে রচনা করিতে হয় না, কেবলমাত্র জাগরণ করিতে হয়। চক্ষু মেলিয়া ঘরের দ্বার মুক্ত করিলেই সে আলোককে আর কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না।

যদি কেহ বলে প্রভাতের আলোককে দর্শন করিবার জন্য একটি অত্যন্ত নিগূঢ় কৌশল কোথাও গুপ্ত আছে, তবে তৎক্ষণাৎ এই কথা মনে হয়, নিশ্চয় তাহা প্রভাতের আলোক নহে— নিশ্চয় তাহা কোনো কৃত্রিম আলোক— সংসারের কোনো বিশেষ-ব্যবহারযোগ্য কোনো ক্ষুদ্র আলোক। কারণ, বৃহৎ আলোক আমাদের মস্তকের উপরে আপনি বর্ষিত হইয়া থাকে— ক্ষুদ্র আলোকের জন্যই অনেক কলকারখানা প্রস্তুত করিতে হয়।

যেমন এই আলোক, তেমনি ধর্ম। তাহাও এইরূপ অজস্র, তাহা এইরূপ সরল। তাহা ঈশ্বরের আপনাকে দান— তাহা নিত্য, তাহা ভূমা, তাহা আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া আমাদের অন্তরবাহিরকে ওতপ্রোত করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহাকে পাইবার জন্য কেবল চাহিলেই হইল, কেবল হৃদয়কে

উন্মীলিত করিলেই হইল। আকাশপূর্ণ দিবালোককে উদ্‌যোগ করিয়া পাইতে হইলে যেমন আমাদের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব হইত, তেমনি আমাদের অনন্তজীবনের সম্বল ধর্মকে বিশেষ আয়োজনের দ্বারা পাইতে হইলে সে পাওয়া কোনোকালে ঘটিয়া উঠিত না।

আমরা নিজে যাহা রচনা করিতে যাই, তাহা জটিল হইয়া পড়ে। আমাদের সমাজ জটিল, আমাদের সংসার জটিল, আমাদের জীবনযাত্রা জটিল। এই জটিলতা আপন বহুধাবিভক্ত বৈচিত্র্যের দ্বারা অনেক সময় বিপুলতা ও প্রবলতার ভান করিয়া আমাদের মূঢ়চিত্তকে অভিভূত করিয়া দেয়। যে দার্শনিক গ্রন্থের লেখা অত্যন্ত ঘোরালো, আমাদের অজ্ঞবুদ্ধি তাহার মধ্যেই বিশেষ পাণ্ডিত্য আরোপ করিয়া বিস্ময় অনুভব করে। যে সভ্যতার সমস্ত গতিপদ্ধতি দুরূহ ও বিমিশ্রিত, যাহার কলকারখানা আয়োজন উপকরণ বহুলবিস্তৃত, তাহা আমাদের দুর্বল অন্তঃকরণকে বিহ্বল করিয়া দেয়। কিন্তু যে দার্শনিক দর্শনকে সহজ করিয়া দেখাইতে পারেন, তিনিই যথার্থ ক্ষমতাশালী, ধীশক্তিমান ; যে সভ্যতা আপনার সমস্ত ব্যবস্থাকে সরলতার দ্বারা সুশৃঙ্খল ও সর্বত্র সুগম করিয়া আনিতে পারে, সেই সভ্যতাই যথার্থ উন্নততর। বাহিরে দেখিতে যেমনই হউক, জটিলতাই দুর্বলতা, তাহা অকৃতার্থতা— পূর্ণতাই সরলতা। ধর্ম সেই পরিপূর্ণতার, সুতরাং সরলতার, একমাত্র চরমতম আদর্শ।

কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য, সেই ধর্মকেই মানুষ সংসারের সর্বাপেক্ষা জটিলতা দ্বারা আকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। তাহা অশেষ তন্ত্রে-মন্ত্রে, কৃত্রিম ক্রিয়াকর্মে, জটিল মতবাদে, বিচিত্র কল্পনায় এমনি গহন দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে যে, মানুষের সেই স্বকৃত অন্ধকারময় জটিলতার মধ্যে প্রত্যহ এক-একজন অধ্যবসায়ী এক-এক নূতন পথ কাটিয়া নব নব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতেছে। সেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদের সংঘর্ষে জগতে বিরোধ-বিদ্বেষ অশান্তি-অমঙ্গলের আর সীমা নাই।

এমন হইল কেন ? ইহার একমাত্র কারণ, সর্বান্তঃকরণে আমরা নিজেকে ধর্মের অনুগত না করিয়া ধর্মকে নিজের অনুরূপ করিবার চেষ্টা করিয়াছি বলিয়া। ধর্মকে আমরা সংসারের অন্যান্য আবশ্যকদ্রব্যের ন্যায় নিজেদের বিশেষব্যবহারযোগ্য করিয়া লইবার জন্য আপন-আপন পরিমাপে তাহাকে বিশেষভাবে খর্ব করিয়া লই বলিয়া।

ধর্ম আমাদের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ আবশ্যক সন্দেহ নাই— কিন্তু সেইজন্যই তাহাকে নিজের উপযোগী করিয়া লইতে গেলেই তাহার সেই সর্বশ্রেষ্ঠ আবশ্যকতাই নষ্ট হইয়া যায়। তাহা দেশকালপাত্রের ক্ষুদ্র প্রভেদের অতীত, তাহা নিরঞ্জন বিকারবিহীন বলিয়াই তাহা আমাদের চিরদিনের পক্ষে আমাদের সমস্ত অবস্থার পক্ষে এত একান্ত আবশ্যক। তাহা আমাদের অতীত বলিয়াই তাহা আমাদিগকে নিত্যকাল সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে ধ্রুব অবলম্বন দান করে।

কিন্তু ধর্মকে ধারণা করিতে হইবে তো। ধারণা করিতে হইলে তাহাকে আমাদের প্রকৃতির অনুযায়ী করিয়া লইতে হয়। অথচ মানবপ্রকৃতি বিচিত্র— সুতরাং সেই বৈচিত্র্য-অনুসারে যাহা এক, তাহা অনেক হইয়া উঠে। যেখানে অনেক, সেখানে জটিলতা অনিবার্য— যেখানে জটিলতা, সেখানে বিরোধ আপনি আসিয়া পড়ে।

কিন্তু ধর্মকে ধারণা করিতে হইবে না। ধর্মরাজ ঈশ্বর ধারণার অতীত। যাহা ধারণা করি, তাহা তিনি নহেন, তাহা আর-কিছু, তাহা ধর্ম নহে, তাহা সংসার। সুতরাং তাহাতে সংসারের সমস্ত লক্ষণ ফুটিয়া উঠে। সংসারের লক্ষণ বৈচিত্র্য, সংসারের লক্ষণ বিরোধ।

যাহা ধারণা করিতে পারি, তাহাতে আমাদের তৃপ্তির অবসান হইয়া যায়, যাহা ধারণা করি, তাহাতে প্রতিক্ষণে বিকার ঘটিতে থাকে। সুখের আশাতেই আমরা সমস্ত-কিছু ধারণা করিতে যাই, কিন্তু যাহা ধারণা করি, তাহাতে আমাদের সুখের অবসান হয়। এইজন্য উপনিষদে আছে—

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

যাহা ভূমা তাহাই সুখ, যাহা অল্প তাহাতে সুখ নাই।

সেই ভূমাকে যদি আমরা ধারণাযোগ্য করিবার জন্য অল্প করিয়া লই, তবে তাহা দুঃখ সৃষ্টি করিবে— দুঃখ হইতে রক্ষা করিবে কী করিয়া ? অতএব সংসারে থাকিয়া ভূমাকে উপলব্ধি করিতে হইবে, কিন্তু

সংসারের দ্বারা সেই ভূমাকে খণ্ডিত জড়িত করিলে চলিবে না।

একটি উদাহরণ দিই। গৃহ আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, তাহা আমাদের বাসযোগ্য। মুক্ত আকাশ আমাদের পক্ষে সেরূপ বাসযোগ্য নহে, কিন্তু এই মুক্ত আকাশকে মুক্ত রাখাই আমাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। মুক্ত আকাশের সহিত আমাদের গৃহস্থিত আকাশের অবাধ যোগ রাখিলেই তবেই আমাদের গৃহ আমাদের পক্ষে কারাগার, আমাদের পক্ষে কবরস্বরূপ হয় না। কিন্তু যদি বলি, আকাশকে গৃহেরই মতো আমার আপনার করিয়া লইব— যদি আকাশের মধ্যে কেবলই প্রাচীর তুলিতে থাকি, তবে তাহাতে আমাদের গৃহেরই বিস্তার ঘটিতে থাকে, মুক্ত আকাশ দূর হইতে সুদূরে চলিয়া যায়। আমরা যদি বৃহৎ ছাদ পত্তন করিয়া সমস্ত আকাশকে আমার আপনার করিয়া লইলাম বলিয়া কল্পনা করি, তবে আলোকের জন্মভূমি, ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের অনন্ত ক্রীড়াক্ষেত্র আকাশ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করি। যাহা নিতান্ত সহজেই পাওয়া যায়, সহজে ব্যতীত আর-কোনো উপায়ে যাহা পাওয়া যায় না, নিজের প্রভূত চেষ্টার দ্বারাতেই তাহাকে একেবারে দুর্লভ করিয়া তোলা হয়। বেষ্টন করিয়া লইয়া সংসারের আর-সমস্ত পাওয়াকে আমরা পাইতে পারি— কেবল ধর্মকে, ধর্মের অধীশ্বরকে বেষ্টন ভাঙিয়া দিয়া আমরা পাই। সংসারের লাভের পদ্ধতিদ্বারা সংসারের অতীতকে পাওয়া যায় না। বস্তুত যেখানে আমরা না পাইবার আনন্দের অধিকারী, সেখানে পাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া আমরা হারাই মাত্র। সেইজন্য ঋষি বলিয়াছেন—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়, সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কিছু হইতেই ভয় পান না।

ধর্মের সরল আদর্শ একদিন আমাদের ভারতবর্ষেরই ছিল। উপনিষদের মধ্যে তাহার পরিচয় পাই। তাহার মধ্যে যে ব্রহ্মের প্রকাশ আছে, তাহা পরিপূর্ণ, তাহা অখণ্ড, তাহা আমাদের কল্পনা-জালদ্বারা বিজড়িত নহে। উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম

তিনিই সত্য, নতুবা এ জগৎসংসার কিছুই সত্য হইত না। তিনিই জ্ঞান, এই যাহা-কিছু তাহা তাঁহারই জ্ঞান, তিনি যাহা জানিতেছেন, তাহাই আছে, তাহাই সত্য। তিনি অনন্ত। তিনি অনন্ত সত্য, তিনি অনন্ত জ্ঞান।

এই বিচিত্র জগৎসংসারকে উপনিষদ্ ব্রহ্মের অনন্ত সত্যে, ব্রহ্মের অনন্ত জ্ঞানে বিলীন করিয়া দেখিয়াছেন। উপনিষদ্ কোনো বিশেষ লোক কল্পনা করেন নাই, কোনো বিশেষ মন্দির রচনা করেন নাই, কোনো বিশেষ স্থানে তাঁহার বিশেষ মূর্তি স্থাপন করেন নাই— একমাত্র তাঁহাকেই পরিপূর্ণভাবে সর্বত্র উপলব্ধি করিয়া সকলপ্রকার জটিলতা সকলপ্রকার কল্পনার চাঞ্চল্যকে দূরে নিরাকৃত করিয়া দিয়াছেন। ধর্মের বিশুদ্ধ সরলতার এমন বিরাট আদর্শ আর কোথায় আছে?

উপনিষদের এই ব্রহ্ম আমাদের অগম্য, এই কথা নির্বিচারে উচ্চারণ করিয়া ঋষিদের অমর বাণীগুলিকে আমরা যেন আমাদের ব্যবহারের বাহিরে নির্বাসিত করিয়া না রাখি। আকাশ লোষ্ট্রখণ্ডের ন্যায় আমাদের গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া আমরা আকাশকে দুর্গম বলিতে পারি না। বস্তুত সেই কারণেই তাহা সুগম। যাহা ধারণাযোগ্য, যাহা স্পর্শগম্য, তাহাই আমাদিগকে বাধা দেয়। আমাদের স্বহস্তরচিত ক্ষুদ্র প্রাচীর দুর্গম, কিন্তু অনন্ত আকাশ দুর্গম নহে। প্রাচীরকে লঙ্ঘন করিতে হয়, কিন্তু আকাশকে লঙ্ঘন করিবার কোনো অর্থই নাই। প্রভাতের অরুণালোক স্বর্ণমুষ্টির ন্যায় সঞ্চয়যোগ্য নহে, সেই কারণেই কি অরুণালোককে দুর্লভ বলিতে হইবে? বস্তুত একমুষ্টি স্বর্ণই কি দুর্লভ নহে, আর আকাশপূর্ণ প্রভাতকিরণ কি কাহাকেও ক্রয় করিয়া আনিতে হয়? প্রভাতের আলোককে মূল্য দিয়া ক্রয় করিবার কল্পনাই মনে আসিতে পারে না— তাহা দুর্মূল্য নহে, তাহা অমূল্য।

উপনিষদের ব্রহ্ম সেইরূপ। তিনি অন্তরে-বাহিরে সর্বত্র— তিনি অন্তরতম, তিনি সুদূরতম। তাঁহার সত্যে আমরা সত্য, তাঁহার আনন্দে আমরা ব্যক্ত।

কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

কেই বা শরীরচেষ্টা করিত, কেই বা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দ না থাকিতেন।

মহাকাশ পূর্ণ করিয়া নিরন্তর সেই আনন্দ বিরাজ করিতেছেন বলিয়াই আমরা প্রতিক্ষণে নিশ্বাস লইতেছি, আমরা প্রতিমুহূর্তে প্রাণধারণ করিতেছি—

এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

এই আনন্দের কণামাত্র আনন্দকে অন্যান্য জীবসকল উপভোগ করিতেছে।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

সেই সর্বব্যাপী আনন্দ হইতেই এই সমস্ত প্রাণী জন্মিয়াছে, সেই সর্বব্যাপী আনন্দের দ্বারাই এই সমস্ত প্রাণী জীবিত আছে, সেই সর্বব্যাপী আনন্দের মধ্যেই ইহারা গমন করে, প্রবেশ করে।

ঈশ্বর-সম্বন্ধে যত কথা আছে, এই কথাই সর্বাপেক্ষা সরল, সর্বাপেক্ষা সহজ। ব্রহ্মের এই ভাব গ্রহণ করিবার জন্য কিছু কল্পনা করিতে হয় না, কিছু রচনা করিতে হয় না, দূরে যাইতে হয় না, দিনক্ষণের অপেক্ষা করিতে হয় না— হৃদয়ের মধ্যে আগ্রহ উপস্থিত হইলেই, তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার যথার্থ ইচ্ছা জন্মিলেই, নিশ্বাসের মধ্যে তাঁহার আনন্দ প্রবাহিত হয়, প্রাণে তাঁহার আনন্দ কম্পিত হয়, বুদ্ধিতে তাঁহার আনন্দ বিকীর্ণ হয়, ভোগে তাঁহার আনন্দ প্রতিবিম্বিত দেখি। দিনের আলোক যেমন কেবলমাত্র চক্ষু মেলিবার অপেক্ষা রাখে, ব্রহ্মের আনন্দ সেইরূপ হৃদয়-উন্মীলনের অপেক্ষা রাখে মাত্র।

আমি একদা একখানি নৌকায় একাকী বাস করিতেছিলাম। একদিন সায়াহ্নে একটি মোমের বাতি জ্বালাইয়া পড়িতে পড়িতে অনেক রাত হইয়া গেল। শ্রান্ত হইয়া যেমনি বাতি নিবাইয়া দিলাম, অমনি একমুহূর্তেই পূর্ণিমার চন্দ্রালোক চারি দিকের মুক্ত বাতায়ন দিয়া আমার কক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া দিল।[১] আমার স্বহস্তজ্বালিত একটিমাত্র ক্ষুদ্র বাতি এই আকাশপরিপ্লাবী অজস্র আলোককে আমার নিকট হইতে অগোচর করিয়া রাখিয়াছিল। এই অপরিমেয় জ্যোতিঃসম্পদ লাভ কবিবার জন্য আমাকে আর কিছুই করিতে হয় নাই, কেবল সেই বাতিটি এক ফুৎকারে নিবাইয়া দিতে হইয়াছিল। তাহার পরে কী পাইলাম। বাতির মতো কোনো নাড়িবার জিনিস পাই নাই, সিন্দুকে ভরিবার জিনিস পাই নাই— পাইয়াছিলাম আলোক আনন্দ সৌন্দর্য শান্তি। যাহাকে সরাইয়াছিলাম, তাহার চেয়ে অনেক বেশি পাইয়াছিলাম— অথচ উভয়কে পাইবার পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ব্রহ্মকে পাইবার জন্য সোনা পাইবার মতো চেষ্টা না করিয়া আলোক পাইবার মতো চেষ্টা করিতে হয়। সোনা পাইবার মতো চেষ্টা করিতে গেলে নানা বিরোধ-বিদ্বেষ-বাধাবিপত্তির প্রাদুর্ভাব হয়, আর আলোক পাইবার মতো চেষ্টা করিলে সমস্ত সহজ সরল হইয়া যায়। আমরা জানি বা না জানি, ব্রহ্মের সহিত আমাদের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের মধ্যে নিজের চিত্তকে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনা।

ভারতবর্ষে এই উদ্‌বোধনের যে মন্ত্র আছে, তাহাও অত্যন্ত সরল। তাহা এক নিশ্বাসেই উচ্চারিত হয়— তাহা গায়ত্রীমন্ত্র। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ— গায়ত্রীর এই অংশটুকুর নাম ব্যাহৃতি। ব্যাহৃতিশব্দের অর্থ— চারি দিক হইতে আহরণ করিয়া আনা। প্রথমত ভূলোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত

১ তুলনীয় "পূর্ণিমা", 'চিত্রা', রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৭৬ (সুলভ দ্বিতীয় খণ্ড পৃ. ১৭৩), 'ছিন্নপত্র' হইতে উদ্‌ধৃত পত্র (শিলাইদা ১২ ডিসেম্বর ১৮৯৫), রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৫৪৮ (সুলভ দ্বিতীয় খণ্ড পৃ. ৮১৭)।

বিশ্বজগতকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হয়, মনে করিতে হয়, আমি বিশ্বভুবনের অধিবাসী— আমি কোনো বিশেষপ্রদেশবাসী নহি— আমি যে রাজ-অট্টালিকার মধ্যে বাসস্থান পাইয়াছি, লোকলোকান্তর তাহার এক-একটি কক্ষ। এইরূপে, যিনি যথার্থ আর্য, তিনি অন্তত প্রত্যহ একবার চন্দ্রসূর্য গ্রহতারকার মাঝখানে নিজেকে দণ্ডায়মান করেন, পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া নিখিল জগতের সহিত আপনার চিরসম্বন্ধ একবার উপলব্ধি করিয়া লন— স্বাস্থ্যকামী যেরূপ রুদ্ধগৃহ ছাড়িয়া প্রত্যূষে একবার উন্মুক্ত মাঠের বায়ু সেবন করিয়া আসেন, সেইরূপ আর্য সাধু দিনের মধ্যে একবার নিখিলের মধ্যে, ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে নিজের চিত্তকে প্রেরণ করেন। তিনি সেই অগণ্যজ্যোতিষ্কখচিত বিশ্বলোকের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কী মন্ত্র উচ্চারণ করেন—

তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।

এই বিশ্বপ্রসবিতা দেবতার বরণীয় শক্তি ধ্যান করি।

এই বিশ্বলোকের মধ্যে সেই বিশ্বলোকেশ্বরের যে শক্তি প্রত্যক্ষ, তাহাকেই ধ্যান করি। একবার উপলব্ধি করি বিপুল বিশ্বজগৎ একসঙ্গে এই মুহূর্তে এবং প্রতিমুহূর্তেই তাঁহা হইতে অবিশ্রাম বিকীর্ণ হইতেছে। আমরা যাহাকে দেখিয়া শেষ করিতে পারি না, জানিয়া অন্ত করিতে পারি না, তাহা সমগ্রভাবে নিয়তই তিনি প্রেরণ করিতেছেন। এই বিশ্বপ্রকাশক অসীম শক্তির সহিত আমার অব্যবহিত সম্পর্ক কী সূত্রে? কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব?

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—

যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহার প্রেরিত সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে ধ্যান করিব। সূর্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দ্বারা জানি? সূর্য নিজে আমাদিগকে যে কিরণ প্রেরণ করিতেছেন, সেই কিরণেরই দ্বারা। সেইরূপ বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন— যে শক্তি থাকাতেই আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত প্রত্যক্ষব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি— সেই ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি— এবং সেই ধীশক্তিদ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে অন্তরতমরূপে অনুভব করিতে পারি। বাহিরে যেমন ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সবিতৃরূপে তাঁহাকে জগৎচরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করি, অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরে জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী, এ দুইই একই শক্তির বিকাশ, ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চিত্তের এবং আমার চিত্তের সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সংকীর্ণতা হইতে স্বার্থ হইতে ভয় হইতে বিষাদ হইতে মুক্তিলাভ করি। এইরূপে গায়ত্রীমন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তরের, এবং অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগসাধন করে।

ব্রহ্মকে ধ্যান করিবার এই যে প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি ইহা যেমন উদার, তেমনি সরল। ইহা সর্বপ্রকার-কৃত্রিমতা-পরিশূন্য। বাহিরের বিশ্বজগৎ এবং অন্তরের ধী, ইহা কাহাকেও কোথাও অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে হয় না— ইহা ছাড়া আমাদের আর কিছুই নাই। এই জগতকে এবং এই বুদ্ধিকে তাঁহার অশ্রান্তশক্তি দ্বারা তিনিই অহরহ প্রেরণ করিতেছেন, এই কথা স্মরণ করিলে তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ যেমন গভীরভাবে সমগ্রভাবে একান্তভাবে হৃদয়ংগম হয়, এমন আর কোন্ কৌশলে, কোন্ আয়োজনে, কোন্ কৃত্রিম উপায়ে, কোন্ কল্পনানৈপুণ্যে হইতে পারে, তাহা আমি জানি না। ইহার মধ্যে তর্কবিতর্কের কোনো স্থান নাই, মতবাদ নাই, ব্যক্তিবিশেষগত প্রকৃতির কোনো সংকীর্ণতা নাই।

আমাদের এই ব্রহ্মের ধ্যান যেরূপ সরল অথচ বিরাট, আমাদের উপনিষদের প্রার্থনাটিও ঠিক সেইরূপ।

বিদেশীরা এবং তাঁহাদের প্রিয়ছাত্র স্বদেশীরা বলেন, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র পাপের প্রতি প্রচুর মনোযোগ করে নাই, ইহাই হিন্দুধর্মের অসম্পূর্ণতা ও নিকৃষ্টতার পরিচয়।— বস্তুত ইহাই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ। আমরা পাপপুণ্যের একেবারে মূলে গিয়াছিলাম। অনন্ত আনন্দস্বরূপের সহিত চিত্তের

সম্মিলন, ইহার প্রতিই আমাদের শাস্ত্রের সমস্ত চেষ্টা নিবদ্ধ ছিল— তাঁহাকে যথার্থভাবে পাইলে, এক কথায় সমস্ত পাপ দূর হয়, সমস্ত পুণ্য লাভ হয়। মাতাকে যদি কেবলই উপদেশ দিতে হয় যে, তুমি ছেলের কাজে অনবধান হইয়ো না, তোমাকে এই করিতে হইবে, তোমাকে এই করিতে হইবে না, তবে উপদেশের আর অন্ত থাকে না— কিন্তু যদি বলি তুমি ছেলেকে ভালোবাসো, তবে দ্বিতীয় কোনো কথাই বলিতে হয় না, সমস্ত সরল হইয়া আসে। ফলত সেই ভালোবাসা ব্যতিরেকে মাতার কর্ম সম্ভবপর হইতেই পারে না। তেমনি যদি বলি, অন্তরের মধ্যে ব্রহ্মের প্রকাশ হউক, তবে পাপ সম্বন্ধে আর কোনো কথাই বলিতে হয় না। পাপের দিক হইতে যদি দেখি, তবে জটিলতার অন্ত নাই— তাহা ছেদন করিয়া, দাহন করিয়া, নির্মূল করিয়া কেমন করিয়া যে বিনাশ করিতে হয়, তাহা ভাবিয়া শেষ করা যায় না— সেদিক হইতে দেখিতে গেলে ধর্মকে বিরাট বিভীষিকা করিয়া তুলিতে হয়— কিন্তু আনন্দময়ের দিক হইতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ পাপ কুহেলিকার মতো অন্তর্হিত হয়। পাশ্চাত্য ধর্মশাস্ত্রে পাপ ও পাপ হইতে মুক্তি নিরতিশয় জটিল ও নিদারুণ, মানুষের বুদ্ধি তাহাকে উত্তরোত্তর গহন করিয়া তুলিয়াছে এবং সেই বিচিত্র পাপতত্ত্বের দ্বারা ঈশ্বরকে খণ্ডিত করিয়া, দুর্গম করিয়া ধর্মকে দুর্বল করিয়াছে।

অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

অসৎ হইতে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও।

আমাদের অভাব কেবল সত্যের অভাব, আলোকের অভাব, অমৃতের অভাব— আমাদের জীবনের সমস্ত দুঃখ পাপ নিরানন্দ কেবল এইজন্যই। সত্যের, জ্যোতির অমৃতের ঐশ্বর্য যিনি কিছু পাইয়াছেন, তিনিই জানেন, ইহাতে আমাদের জীবনের সমস্ত অভাবের একেবারে মূলোচ্ছেদ করিয়া দেয়। যে-সকল ব্যাঘাতে তাঁহার প্রকাশকে আমাদের নিকট হইতে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহাই বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে নানা দুঃখ এবং অকৃতার্থতার মধ্যে অবতীর্ণ করিয়া দেয়। সেইজন্যেই আমাদের মন অসত্য, অন্ধকার ও বিনাশের আবরণ হইতে রক্ষা চাহে। যখন সে বলে আমার দুঃখ দূর করো তখন সে শেষ পর্যন্ত না বুঝিলেও এই কথাই বলে— যখন সে বলে আমার দৈন্যমোচন করো, তখন সে যথার্থ কী চাহিতেছে, তাহা না জানিলেও এই কথাই বলে। যখন সে বলে আমাকে পাপ হইতে রক্ষা করো, তখনো এই কথা। সে না বুঝিয়াও বলে—

আবিরাবীর্ম এধি।

হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও।

আমরা ধ্যানযোগে আমাদের অন্তরবাহিরকে যেমন বিশ্বেশ্বরের দ্বারাই বিকীর্ণ দেখিতে চেষ্টা করিব, তেমনি আমরা প্রার্থনা করিব যে, যে সত্য যে জ্যোতি যে অমৃতের মধ্যে আমরা নিত্যই রহিয়াছি, তাহাকে সচেতনভাবে জানিবার যাহা-কিছু বাধা, সেই অসত্য সেই অন্ধকার সেই মৃত্যু যেন দূর হইয়া যায়। যাহা নাই তাহা চাই না, আমাদের যাহা আছে তাহাকেই পাইব, ইহাই আমাদের প্রার্থনার বিষয়, যাহা দূরে তাহাকে সন্ধান করিব না, যাহা আমাদের ধীশক্তিতেই প্রকাশিত তাহাকেই আমরা উপলব্ধি করিব, ইহাই আমাদের ধ্যানের লক্ষ্য। আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্ম এইরূপ সরল, এইরূপ উদার, এইরূপ অন্তরঙ্গ, তাহাতে স্বরচিত কল্পনাকুহকের স্পর্শ নাই।

জীবনযাত্রাসম্বন্ধেও ভারতবর্ষের উপদেশ এইরূপ সরল এবং মূলগামী। ভারতবর্ষ বলেঃ সন্তোষং হৃদি সংস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ। সুখার্থী সন্তোষকে হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়া সংযত হইবেন। সুখ যিনি চান তিনি সন্তোষকে গ্রহণ করিবেন, সন্তোষ যিনি চান তিনি সংযম অভ্যাস করিবেন। এ কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, সুখের উপায় বাহিরে নাই, তাহা অন্তরেই আছে— তাহা উপকরণজালের বিপুল জটিলতার মধ্যে নাই, তাহা সংযত চিত্তের নির্মল সরলতার মধ্যে বিরাজমান। উপকরণসঞ্চয়ের আদি-অন্ত নাই, বাসনাবহ্নিতে যত আহুতি দেওয়া যায়, সমস্ত ভস্ম হইয়া ক্ষুধিতশিখা ক্রমশই বিস্তৃত হইতে থাকে, ক্রমেই সে নিজের অধিকার হইতে পরের অধিকারে যায়,

তাহার লোলুপতা ক্রমেই বিশ্বের প্রতি দারুণভাব ধারণ করে। সুখকে বাহিরে কল্পনা করিয়া বিশ্বকে মৃগয়ার মৃগের মতো নিষ্ঠুরবেগে তাড়না করিয়া ফিরিলে জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত কেবল ছুটাছুটিই সার হয় এবং পরিণামে শিকারির উদ্দাম অশ্ব তাহাকে কোন্ অপঘাতের মধ্যে নিক্ষেপ করে, তাহার উদ্দেশ পাওয়া যায় না।

এইরূপ উন্মত্তভাবে যখন আমরা ছুটিতে থাকি, তখন আমাদের আগ্রহের অসহ্যবেগে সমস্ত জগৎ অস্পষ্ট হইয়া যায়। আমাদের চারি দিকে পদে পদে যে-সকল অযাচিত আনন্দ প্রভূত প্রাচুর্যের সহিত অহরহ প্রতীক্ষা করিয়া আছে, তাহাদিগকে অনায়াসেই আমরা লঙ্ঘন করিয়া, দলন করিয়া, বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাই। জগতের অক্ষয় আনন্দের ভাণ্ডারকে আমরা কেবল ছুটিতে ছুটিতেই দেখিতে পাই না। এইজন্যই ভারতবর্ষ বলিতেছেন : সংযতো ভবেৎ। প্রবৃত্তিবেগ সংযত করো। চাঞ্চল্য দূর হইলেই সন্তোষের স্তব্ধতার মধ্যে জগতের সমস্ত বৃহৎ আনন্দগুলি আপনি প্রকাশিত হইবে। গতিবেগের প্রমত্ততাবশতই আমরা সংসারের যে-সকল স্নেহ-প্রেম-সৌন্দর্যকে, প্রতিদিনের শতশত মঙ্গলভাবের আদানপ্রদানকে লক্ষ্য করিতে পারি নাই, সংযত হইয়া, স্থির হইয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহাদের ভিতরকার সমস্ত ঐশ্বর্য অতি সহজেই অবারিত হইয়া যায়।

যাহা নাই, তাহারই শিকারে বাহির হইতে হইবে, ভারতবর্ষ এ পরামর্শ দেয় না— ছুটাছুটিই যে চরম সার্থকতা, এ কথা ভারতবর্ষের নহে। যাহা অন্তরে বাহিরে চারি দিকেই আছে, যাহা অজস্র, যাহা ধ্রুব, যাহা সহজ, ভারতবর্ষ তাহাকেই লাভ করিতে পরামর্শ দেয়— কারণ, তাহাই সত্য, তাহাই নিত্য। যিনি অন্তরে আছেন তাঁহাকে অন্তরেই লাভ করিতে ভারতবর্ষ বলে, যিনি বিশ্বে আছেন তাঁহাকে বিশ্বের মধ্যেই উপলব্ধি করা ভারতবর্ষের সাধনা— আমরা যে অমৃতলোকে সহজেই বাস করিতেছি, দৃষ্টির বাধা দূর করিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্যই ভারতবর্ষের প্রার্থনা— চিত্তসরোবরের যে অনাবিল অচাঞ্চল্য, যাহার নাম সন্তোষ, আনন্দের যাহা দর্পণ, তাহাকেই সমস্ত ক্ষোভ হইতে রক্ষা করা, ইহাই ভারতবর্ষের শিক্ষা। কিছু কল্পনা করা নহে, রচনা করা নহে, আহরণ করা নহে ; জাগরিত হওয়া, বিকশিত হওয়া, প্রতিষ্ঠিত হওয়া— যাহা আছে তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য অত্যন্ত সরল হওয়া। যাহা সত্য তাহা সত্য বলিয়াই আমাদের নিকটতম, সত্য বলিয়াই তাহা দিবালোকের ন্যায় আমাদের সকলেরই প্রাপ্য, তাহা আমাদের স্বরচিত নহে বলিয়াই তাহা আমাদের পক্ষে সুগম, তাহা আমাদের সম্যক্-ধারণার অতীত বলিয়াই তাহা আমাদের চিরজীবনের আশ্রয়— তাহার প্রতিনিধিমাত্রই তাহা অপেক্ষা সুদূর— তাহাকে আমাদের কোনো আবশ্যক-বিশেষের উপযোগিরূপে, বিশেষ আয়ত্তগম্যরূপে সহজ করিতে চেষ্টা করিতে গেলেই তাহাকে কঠিন করা হয়, তাহাকে পরিত্যাগ করা হয়— অধীর হইয়া তাহাকে বাহ্যাড়ম্বরের মধ্যে খুঁজিয়া বেড়াইলে নিজের সৃষ্টিকেই খুঁজিয়া ফিরিতে হয়— এইরূপ চেষ্টার উপস্থিত উত্তেজনামাত্র লাভ করি, কিন্তু চরম সার্থকতা প্রাপ্ত হই না। আজ আমরা ভারতবর্ষের সেই উপদেশ ভুলিয়াছি, তাহার অকলঙ্ক সরলতম বিরাটতম একনিষ্ঠ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শতধাবিভক্ত খর্বতা-খণ্ডতার দুর্গম গহন মধ্যে মায়ামৃগীর অনুধাবন করিয়া ফিরিতেছি।

হে ভারতবর্ষের চিরারাধ্যতম অন্তর্যামী বিধাতৃপুরুষ, তুমি আমাদের ভারতবর্ষকে সফল করো। ভারতবর্ষের সফলতার পথ একান্ত সরল একনিষ্ঠতার পথ। তোমার মধ্যেই তাহার ধর্ম, কর্ম, তাহার চিত্ত পরম ঐক্যলাভ করিয়া জগতের, সমাজের, জীবনের সমস্ত জটিলতার নির্মল সহজ মীমাংসা করিয়াছিল। যাহা স্বার্থের, বিরোধের, সংশয়ের নানা শাখাপ্রশাখার মধ্যে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়, যাহা বিবিধের আকর্ষণে আমাদের প্রবৃত্তিকে নানা অভিমুখে বিক্ষিপ্ত করে, যাহা উপকরণের নানা জঞ্জালের মধ্যে আমাদের চেষ্টাকে নানা আকারে ভ্রাম্যমাণ করিতে থাকে, তাহা ভারতবর্ষের পন্থা নহে। ভারতবর্ষের পথ একের পথ, তাহা বাধাবর্জিত তোমারই পথ— আমাদের বৃদ্ধ পিতামহদের পদাঙ্কচিহ্নিত সেই প্রাচীন প্রশস্ত পুরাতন সরল রাজপথ যদি পরিত্যাগ না করি, তবে কোনোমতেই আমরা ব্যর্থ হইব না। জগতের মধ্যে অদ্য দারুণ দুর্যোগের দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে— চারি দিকে যুদ্ধভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে— বাণিজ্যরথ দুর্বলকে ধূলির সহিত দলন করিয়া ঘর্ঘরশব্দে চারি দিকে

ধাবিত হইয়াছে— স্বাথের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রলয়গর্জনে চারি দিকে পাক খাইয়া ফিরিতেছে— হে বিধাতঃ, পৃথিবীর লোক আজ তোমার সিংহাসন শূন্য মনে করিতেছে, ধর্মকে অভ্যাসজনিত সংস্কারমাত্র মনে করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে— হে শান্তং শিবমদ্বৈতম্, এই ঝঞ্ঝাবর্তে আমরা ক্ষুব্ধ হইব না, শুষ্কমৃত পত্ররাশির ন্যায় ইহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ধূলিধ্বজা তুলিয়া দিক্‌বিদিকে ভ্রাম্যমাণ হইব না— আমরা পৃথিবীব্যাপী প্রলয়-তাণ্ডবের মধ্যে এক মনে একাগ্রনিষ্ঠায় এই বিপুল বিশ্বাস যেন দৃঢ়রূপে ধারণা করিয়া থাকি যে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অধর্মের দ্বারা আপাতত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়, আপাতত মঙ্গল দেখা যায়, আপাতত শত্রুরা পরাজিত হইতে থাকে, কিন্তু সমূলে বিনাশ পাইতে হয়।

একদিন নানা দুঃখ ও আঘাতে বৃহৎ শ্মশানের মধ্যে এই দুর্যোগের নিবৃত্তি হইবে— তখন যদি মানবসমাজ এই কথা বলে যে, শক্তির পূজা, ক্ষমতার মত্ততা, স্বার্থের দারুণ দুশ্চেষ্টা যখন প্রবলতম, মোহান্ধকার যখন ঘনীভূত এবং দলবদ্ধ ক্ষুধিত আত্মম্ভরিতা যখন উত্তরে-দক্ষিণে পূর্বে-পশ্চিমে গর্জন করিয়া ফিরিতেছিল, তখনো ভারতবর্ষ আপন ধর্ম হারায় নাই, বিশ্বাস ত্যাগ করে নাই, একমাত্র নিত্যসত্যের প্রতি নিষ্ঠা স্থির রাখিয়াছিল— সকলের ঊর্ধ্বে নির্বিকার একের পতাকা প্রাণপণ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়াছিল— এবং সমস্ত আলোড়ন গর্জনের মধ্যে মা ভৈঃ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলিতেছিল : আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। একের আনন্দ ব্রহ্মের আনন্দ, যিনি জানিয়াছেন, তিনি কিছু হইতেই ভয়প্রাপ্ত হন না। ইহাই যদি সম্ভবপর হয়, তবে ভারতবর্ষে ঋষিদের জন্ম, উপনিষদের শিক্ষা, গীতার উপদেশ, বহুশতাব্দী হইতে নানা দুঃখ ও অবমাননা, সমস্তই সার্থক হইবে— ধৈর্যের দ্বারা সার্থক হইবে, ধর্মের দ্বারা সার্থক হইবে, ব্রহ্মের দ্বারা সার্থক হইবে— দম্ভের দ্বারা নহে, প্রতাপের দ্বারা নহে, স্বার্থসিদ্ধির দ্বারা নহে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মাঘ ১৩০৯

প্রাচীন ভারতের "একঃ"

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।

বৃক্ষের ন্যায় আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছেন সেই এক। সেই পুরুষে সেই পরিপূর্ণে এ সমস্তই পূর্ণ। যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে এবং হ বৈ তৎ সর্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে। হে সৌম্য, পক্ষিসকল যেমন বাসবৃক্ষে আসিয়া স্থির হয়, তেমনি এই যাহা-কিছু, সমস্তই পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। নদী যেমন নানা বক্রপথে সরলপথে, নানা শাখা-উপশাখা বহন করিয়া, নানা নির্ঝরধারায় পরিপুষ্ট হইয়া, নানা বাধাবিপত্তি ভেদ করিয়া এক মহাসমুদ্রের দিকে ধাবমান হয়— মনুষ্যের চিত্ত সেইরূপ গম্যস্থান না জানিয়াও অসীম বিশ্ববৈচিত্র্যে কেবলই এক হইতে আর একের-দিকে কোথায় চলিয়াছিল? কুতূহলী বিজ্ঞান খণ্ড খণ্ড পদার্থের দ্বারে দ্বারে অণুপরমাণুর মধ্যে কাহার সন্ধান করিতেছিল? স্নেহ-প্রীতি পদে পদে বিরহ-বিস্মৃতি-মৃত্যু-বিচ্ছেদের দ্বারা পীড়িত হইয়া, অন্তহীন তৃষ্ণার দ্বারা তাড়িত হইয়া, পথে পথে কাহাকে প্রার্থনা করিয়া ফিরিতেছিল? ভয়াতুরা ভক্তি তাহার পূজার অর্ঘ্য মস্তকে লইয়া অগ্নি-সূর্য-বায়ু-বজ্র মেঘের মধ্যে কোথায় উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছিল?

এমন সময়ে সেই অন্তবিহীন পথপরম্পরায় ভ্রাম্যমাণ দিশাহারা পথিক শুনিতে পাইল— পথের প্রান্তে ছায়া-নিবিড় তপোবনের গম্ভীরমন্ত্রে এই বার্তা উদ্‌গীত হইতেছে : বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্। বৃক্ষের ন্যায় আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছেন সেই এক। সেই

পুরুষে সেই পরিপূর্ণে এ সমস্তই পূর্ণ। সমস্ত পথ শেষ হইল, সমস্ত পথের কষ্ট দূর হইয়া গেল। তখন অন্তহীন কার্য-কারণের ক্লান্তিকর শাখাপ্রশাখা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জ্ঞান বলিল: একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্। বিচিত্র বিশ্বের চঞ্চল বহুত্বের মধ্যে এই অপরিমেয় ধ্রুবকে একধাই দেখিতে হইবে। সহস্র বিভীষিকা ও বিস্ময়ের মধ্যে দেবতা-সন্ধানশ্রান্ত ভক্তি তখন বলিল : এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এয সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়। এই একই সকলের ঈশ্বর, সকল জীবের অধিপতি, সকল জীবের পালনকর্তা— এই একই সেতুস্বরূপ হইয়া সকল লোককে ধারণ করিয়া ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতেছেন। বাহিরের বহুতর আঘাতে আকর্ষণে ক্লিষ্ট-বিক্ষিপ্ত প্রেম কহিল—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ
প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।

সেই যে এক, তিনি, সকল হইতে অন্তরতর পরমাত্মা, তিনিই পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতেই প্রিয়। মুহূর্তেই বিশ্বের বহুত্ব বিরোধের মধ্যে একের ধ্রুবশান্তি পরিপূর্ণ হইয়া দেখা দিল— একের সত্য, একের অভয়, একের আনন্দ বিচ্ছিন্ন জগতকে এক করিয়া অপ্রমেয় সৌন্দর্যে গাঁথিয়া তুলিল।

শিশির-নিষিক্ত শীতের প্রত্যুষে পূর্ব দিক যখন অরুণবর্ণ, লঘুবাষ্পাচ্ছন্ন বিশাল প্রান্তরের মধ্যে আসন্ন জাগরণের একটি অখণ্ড শান্তি বিরাজমান— যখন মনে হয়, যেন জীবধাত্রী মাতা বসুন্ধরা ব্রাহ্মমুহূর্তে প্রথম নেত্র উন্মীলন করিয়াছেন, এখনো সেই বিশ্বগেহিনী তাঁহার বিপুল গৃহের অসংখ্যজীবপালনকার্য আরম্ভ করেন নাই, তিনি যেন দিবসারম্ভে ওংকারমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জগন্মন্দিরের উদ্‌ঘাটিত স্বর্ণতোরণদ্বারে ব্রহ্মাণ্ডপতির নিকট মস্তক অবনত করিয়া স্তব্ধ হইয়া আছেন— তখন যদি চিন্তা করিয়া দেখি, তবে প্রতীতি হইবে, সেই নির্জন নিঃশব্দ নীহারমণ্ডিত প্রান্তরের মধ্যে প্রয়াসের অন্ত নাই। প্রত্যেক তৃণদলের অণুতে অণুতে জীবনের বিচিত্র চেষ্টা নিরন্তর, প্রত্যেক শিশিরের কণায় কণায় সংযোজন-বিযোজন-আকর্ষণ-বিকর্ষণের কার্য বিশ্রামবিহীন। অথচ এই অশ্রান্ত অপরিমেয় কর্মব্যাপারের মধ্যে শান্তিসৌন্দর্য অচল হইয়া আছে। অদ্য এই মুহূর্তে এই প্রকাণ্ড পৃথিবীকে যে প্রচণ্ড শক্তি প্রবলবেগে শূন্যে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছে, সে শক্তি আমাদের কাছে কথাটিমাত্র কহিতেছে না, শব্দটিমাত্র করিতেছে না। অদ্য এই মুহূর্তে পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া সমস্ত মহাসমুদ্রে যে লক্ষলক্ষ তরঙ্গ সগর্জন তাণ্ডবনৃত্য করিতেছে, শতসহস্র নদনদীনির্ঝরে যে কল্লোল উঠিতেছে, অরণ্যেঅরণ্যে যে আন্দোলন, পল্লবে-পল্লবে যে মর্মরধ্বনি, আমরা তাহার কি জানিতেছি। বিশ্বব্যাপী যে মহাকর্মশালায় দিবারাত্রি লক্ষকোটি জ্যোতিষ্কদীপের নির্বাণ নাই, তাহার অনন্ত কলরব কাহাকে বধির করিয়াছে— তাহার প্রচণ্ড প্রয়াসের দৃশ্য কাহাকে পীড়িত করিতেছে ? এই কর্মজালবেষ্টিত পৃথিবীকে যখন বৃহদ্‌ভাবে দেখি, তখন দেখি, তাহা চিরদিন অক্লান্ত অক্লিষ্ট প্রশান্ত সুন্দর— এত কর্মে, এত চেষ্টায়, এত জন্মমৃত্যু-সুখদুঃখের অবিশ্রাম চক্ররেখায় সে চিন্তিত চিহ্নিত ভারাক্রান্ত হয় নাই। চিরদিনই তাহার প্রভাত কী সৌম্যসুন্দর, তাহার মধ্যাহ্ন কী শান্ত গম্ভীর, তাহার সায়াহ্ন কী করুণ-কোমল, তাহার রাত্রি কী উদার-উদাসীন। এত বৈচিত্র্য এবং প্রয়াসের মধ্যে এই স্থির শান্তি এবং সৌন্দর্য, এত কলরবের মধ্যে এই পরিপূর্ণ সংগীত কী করিয়া সম্ভবপর হইল ? ইহার এক উত্তর এই যে : বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ। মহাকাশে বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আছেন, সেই এক। সেইজন্যই বৈচিত্র্যও সুন্দর এবং বিশ্বকর্মের মধ্যেও বিশ্বব্যাপী শান্তি বিরাজমান।

গভীর রাত্রে অনাবৃত আকাশতলে চারি দিককে কী নিভৃত এবং নিজেকে কী একাকী বলিয়া মনে হয়। অথচ তখন আলোকের যবনিকা অপসারিত হইয়া গিয়া হঠাৎ আমরা জানিতে পাই যে, অন্ধকার সভাতলে জ্যোতিষ্কলোকের অনন্ত জনতার মধ্যে আমরা দণ্ডায়মান। এ কী অপরূপ আশ্চর্য ; অনন্ত জগতের নিভৃত নির্জনতা। কত জ্যোতির্ময় এবং কত জ্যোতির্হীন মহাসূর্যমণ্ডল, কত অগণ্য যোজনব্যাপী চক্রপথে ঘূর্ণনৃত্য, কত উদ্দাম বাষ্পসংঘাত, কত ভীষণ অগ্নি-উচ্ছ্বাস— তাহারই মধ্যস্থলে

আমি সম্পূর্ণ নিভৃতে— একান্তনির্জনে রহিয়াছি— শান্তি এবং বিরামের সীমা নাই। এমন সম্ভব হইল কী করিয়া ? ইহার কারণ : বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ। নহিলে এই জগৎ, যাহা বিচিত্র, যাহা অগণ্য, যাহার প্রত্যেক কণা-কণিকাটিও কম্পিতঘূর্ণিত, তাহা কী ভয়ংকর। বৈচিত্র্য যদি এক-বিরহিত হয়, অগণ্যতা যদি একসূত্রে গ্রথিত না হয়, উদ্যত শক্তিসকল যদি স্তব্ধ একের দ্বারা ধৃত হইয়া না থাকে, তবে তাহা কী করাল, তবে বিশ্বসংসার কী অনির্বচনীয় বিভীষিকা। তবে আমরা দুর্ধর্ষ জগৎপুঞ্জের মধ্যে কাহার বলে এত নিশ্চিন্ত হইয়া আছি ? এই মহা-অপরিচিত, যাহার প্রত্যেক কণাটিও আমাদের কাছে দুর্ভেদ্য রহস্য, কাহার বিশ্বাসে আমরা ইহাকে চিরপরিচিত মাতৃক্রোড়ের মতো অনুভব করিতেছি। এই-যে আসনের উপর আমি এখনই বসিয়া আছি, ইহার মধ্যে সংযোজন-বিযোজনের যে মহাশক্তি কাজ করিতেছে, তাহা এই আসন হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্যলোক-নক্ষত্রলোক পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন-অখণ্ড ভাবে চলিয়া গেছে, তাহা যুগযুগান্তর হইতে নিরন্তরভাবে লোকলোকান্তরকে পিণ্ডীকৃত-পৃথক্কৃত করিতেছে, আমি তাহারই ক্রোড়ের উপর নির্ভয়ে আরামে বসিয়া আছি, তাহার ভীষণ সত্তাকে জানিতেও পারিতেছি না— সেই বিশ্বব্যাপী বিরাট ব্যাপার আমার বিশ্রামের লেশমাত্র ক্ষতি করিতেছে না। ইহার মধ্যে আমরা খেলিতেছি, গৃহনির্মাণ করিতেছি— এ আমাদের কে ? ইহাকে প্রশ্ন করিলে, এ কোনোই উত্তর দেয় না। ইহা দিকে-দিকে আকাশ হইতে আকাশান্তরে নিরুদ্দেশ হইয়া শতধা-সহস্রধা চলিয়া গেছে— এই মূক মূঢ় মহাবহুরূপীর সঙ্গে কে আমাদের এমন প্রিয়, পরিচিত আত্মীয়সম্বন্ধ বাঁধিয়া দিয়াছেন ? তিনি— যিনি, বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

এই একতে আমরা বিশ্বের বৈচিত্র্যের মধ্যে সুন্দর এবং বিশ্বের শক্তির মধ্যে শান্তিস্বরূপে দেখিতেছি, তেমনি মানুষের সংসারের মধ্যে সেই স্তব্ধ একের ভাবটি কী ? সেই ভাবটি মঙ্গল। এখানে আঘাত-প্রতিঘাতের সীমা নাই, এখানে সুখদুঃখ বিরহমিলন বিপৎসম্পদ লাভক্ষতিতে সংসারের সর্বত্র সর্বক্ষণ বিক্ষুব্ধ হইয়া আছে। কিন্তু এই চাঞ্চল্য এই সংগ্রামের মধ্যে সেই এক নিয়ত স্তব্ধ হইয়া আছেন বলিয়া সংসার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। সেইজন্যে নানা বিরোধবিদ্বেষের মধ্যেও পিতামাতার সহিত পুত্র, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতা, প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশী, নিকটের সহিত দূর, প্রত্যহ প্রতিমুহূর্তেই গ্রথিত হইয়া উঠিতেছে। সেই ঐক্যজাল আমরা ক্ষণিকের আক্ষেপে যতই ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতেছি, ততই তাহা আপনি জোড়া লাগিয়া যাইতেছে। যেমন খণ্ডভাবে আমরা জগতের মধ্যে অসংখ্য কদর্যতা দেখিতে পাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সমস্ত জগৎ মহাসৌন্দর্যে প্রকাশিত— তেমনি খণ্ডভাবে সংসারে পাপতাপের সীমা নাই, তথাপি সমস্ত সংসার অবিচ্ছিন্ন মঙ্গলসূত্রে চিরদিন ধৃত হইয়া আছে। ইহার অংশের মধ্যে কত অশান্তি, কত অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই, তবু দেখি, ইহার সমগ্রের মঙ্গল-আদর্শ কিছুতে নষ্ট হয় না। সেইজন্য মানুষ সংসারকে এমন সহজে আশ্রয় করিয়া আছে। এত বৃহৎ লোকসংঘ, এত অসংখ্য অনাত্মীয়, এত প্রবল স্বার্থসংঘাত, তবু এ সংসার রমণীয়, তবু ইহা আমাদিগকে রক্ষা ও পালন করিবার চেষ্টা করে, নষ্ট করে না ! ইহার দুঃখতাপও মহামঙ্গলসংগীতের একতানে অপূর্ব ছন্দে মিলিত হইয়া উঠিতেছে— কেননা, বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

আমরা আমাদের জীবনকে প্রতিক্ষণে খণ্ড খণ্ড করি বলিয়াই সংসারতাপ দুঃসহ হয়। সমস্ত ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্নতাকে সেই মহান একের মধ্যে গ্রথিত করিতে পারিলে সমস্ত আক্ষেপ বিক্ষেপের হাত হইতে পরিত্রাণ পাই। সমস্ত হৃদয়বৃত্তি সমস্ত কর্মচেষ্টাকে তাঁহার দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে কোন্ বাধায় আমার অধীরতা, কোন্ বিঘ্নে আমার নৈরাশ্য, কোন্ লোকের কথায় আমার ক্ষোভ, কোন্ ক্ষমতায় আমার অহংকার, কোন্ বিফলতায় আমার গ্লানি ! তাহা হইলেই আমার সকল কর্মের মধ্যেই ধৈর্য ও শান্তি, সকল হৃদ্‌বৃত্তির মধ্যেই সৌন্দর্য ও মঙ্গল উদ্ভাসিত হয়, দুঃখতাপ পুণ্যে বিকশিত এবং সংসারের সমস্ত আঘাতবেদনা মাধুর্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। তখন সর্বত্র সেই স্তব্ধ একের মঙ্গলবন্ধন অনুভব করিয়া সংসারে দুঃখের অস্তিত্বকে দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা বলিয়া গণ্য করি না— দুঃখের মধ্যে, শোকের মধ্যে, অভাবের মধ্যে নতমস্তকে তাঁহাকেই স্বীকার করি— যাঁহার মধ্যে যুগযুগান্তর হইতে সমস্ত

জগৎসংসারের সমস্ত দুঃখতাপের সমস্ত তাৎপর্য অখণ্ড মঙ্গলে পরিসমাপ্ত হইয়া আছে।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি। মৃত্যু হইতে সে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়, যে ইহাকে নানা করিয়া দেখে।

খণ্ডতার মধ্যে কদর্যতা, সৌন্দর্য একের মধ্যে ; খণ্ডতার মধ্যে প্রয়াস, শান্তি একের মধ্যে ; খণ্ডতার মধ্যে বিরোধ, মঙ্গল একের মধ্যে ; তেমনি খণ্ডতার মধ্যেই মৃত্যু, অমৃত সেই একের মধ্যে। সেই এককে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে, সহস্রের হাত হইতে আপনাকে আর রক্ষা করিতে পারি না। তবে বিষয় প্রবল হইয়া উঠে, ধন-জন-মান বড়ো আকার ধারণ করিয়া আমাদিগকে ঘুরাইতে থাকে, অশ্বরথ-ইষ্টককাষ্ঠ মর্যাদালাভ করে, দ্রব্যসামগ্রী-সংগ্রহচেষ্টার অন্ত থাকে না, প্রতিবেশীর সহিত নিরন্তর প্রতিযোগিতা জাগিয়া উঠে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাড়াকাড়ি-হানাহানির মধ্যে নিজেকে খণ্ড খণ্ড করিতে থাকি, এবং মৃত্যু যখন আমাদের এই ভাণ্ডারদ্বার হইতে আমাদিগকে অকস্মাৎ আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, তখন সেই শেষ মুহূর্তে সমস্ত জীবনের বহুবিরোধের সঞ্চিত স্তূপাকার দ্রব্যসামগ্রীগুলাকেই প্রিয়তম বলিয়া, আত্মার পরম আশ্রয়স্থল বলিয়া, অন্তিমবলে বক্ষে আকর্ষণ করিয়া ধরিতে চাহি। মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মনের দ্বারাই ইহা পাওয়া যায় যে, ইহাতে 'নানা' কিছুই নাই।

বিশ্বজগতের মধ্যে যে অপ্রমেয় ধ্রুব রহিয়াছেন, তিনি বাহ্যত একভাবে কোথাও প্রতিভাত নহেন— মনই নানার মধ্যে সেই এককে দেখে, সেই এককে প্রার্থনা করে, সেই এককে আশ্রয় করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করে। নানার মধ্যে সেই এককে না পাইলে মনের সুখশান্তিমঙ্গল নাই, তাহার উদ্‌ভ্রান্ত-ভ্রমণের অবসান নাই। সে ধ্রুব একের সহিত মন আপনাকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করিতে না পারিলে, সে অমৃতের সহিত যুক্ত হয় না— সে খণ্ড খণ্ড মৃত্যুদ্বারা আহত তাড়িত বিক্ষিপ্ত হইয়া বেড়ায়। মন আপনার স্বাভাবিকধর্মবশতই কখনো জানিয়া, কখনো না জানিয়া, কখনো বক্রপথে, কখনো সরলপথে, সকল জ্ঞানের মধ্যে— সকল ভাবের মধ্যে অহরহ সেই পরম ঐক্যের পরম আনন্দকে সন্ধান করিয়া ফিরে। যখন পায়, তখন একমুহূর্তেই বলিয়া উঠে— আমি অমৃতকে পাইয়াছি— বলিয়া উঠে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

অন্ধকারের পরে আমি এই জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে জানিয়াছি। যাঁহারা ইহাকে জানেন তাঁহারা অমর হন।

পত্নী মৈত্রেয়ীকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়া যাজ্ঞবল্ক্য যখন বনে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন মৈত্রেয়ী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন— এ সমস্ত লইয়া আমি কি অমর হইব? যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, না, যাহারা উপকরণ লইয়া থাকে, তাহাদের যেরূপ, তোমারও সেইরূপ জীবন হইবে। তখন মৈত্রেয়ী কহিলেন : যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্? যাহার দ্বারা আমি অমৃতা না হইব, তাহা লইয়া আমি কী করিব? যাহা বহু, যাহা বিচ্ছিন্ন, যাহা মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া মৈত্রেয়ী অখণ্ড অমৃত একের মধ্যে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মৃত্যু এই জগতের সহিত, বিচিত্রের সহিত, অনেকের সহিত, আমাদের সম্বন্ধের পরিবর্তন করিয়া দেয়— কিন্তু সেই একের সহিত আমাদের সম্বন্ধের পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না। অতএব যে সাধক সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সেই এককে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি অমৃতকে বরণ করিয়াছেন, তাঁহার কোনো ক্ষতির ভয় নাই, বিচ্ছেদের আশঙ্কা নাই। তিনি জানেন, জীবনের সুখদুঃখ নিয়ত চঞ্চল, কিন্তু তাহার মধ্যে সেই কল্যাণরূপী এক স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন, লাভক্ষতি নিত্য আসিতেছে যাইতেছে, কিন্তু সেই এক পরমলাভ আত্মার মধ্যে স্তব্ধ হইয়া বিরাজ করিতেছেন ; বিপদসম্পদ মুহূর্তে-মুহূর্তে আবর্তিত হইতেছে, কিন্তু—

এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ,
এষোহস্য পরমো লোকঃ এষোহস্য পরম আনন্দঃ।

সেই এক রহিয়াছেন— যিনি জীবের পরমা গতি, যিনি জীবের পরমা সম্পৎ, যিনি জীবের পরম লোক, যিনি জীবের পরম আনন্দ।

রেশম-পশম আসন-বসন কাষ্ঠ-লোষ্ট্র স্বর্ণ-রৌপ্য লইয়া কে বিরোধ করিবে ? তাহারা আমার কে ? তাহারা আমাকে কী দিতে পারে ? তাহারা আমার পরমসম্পৎকে অন্তরাল করিতেছে, তাহাতে দিবারাত্রির মধ্যে লেশমাত্র ক্ষোভ অনুভব করিতেছি না, কেবল তাহাদের পুঞ্জীকৃত সঞ্চয়ে গর্ববোধ করিতেছি। হস্তি-অশ্ব-কাচ-প্রস্তরেরই গৌরব, আত্মার গৌরব নাই, শূন্য হৃদয়ে হৃদয়েশ্বরের স্থান নাই। সর্বাপেক্ষা হীনতম দীনতা যে পরমার্থহীনতা, তাহার দ্বারা সমস্ত অন্তঃকরণ রিক্ত শ্রীহীন মলিন, কেবল বসনে-ভূষণে উপকরণে আয়োজনে আমি স্ফীত। জগদীশ্বরের কাজ করিতে পারি না ; কেননা শয্যা-আসন বেশভূষার কাছে দাসখত লিখিয়া দিয়াছি, জড়-উপকরণ জঞ্জালের কাছে মাথা বিকাইয়া বসিয়াছি, সেই-সকল ধূলিময় পদার্থের ধুলা ঝাড়িতেই আমার দিন যায়। ঈশ্বরের কাজে আমার কিছু দিবার সামর্থ্য নাই, কারণ খট্টাপর্যঙ্ক-অশ্বরথে আমার সমস্ত দান নিঃশেষিত। সমস্ত মঙ্গলকর্ম পড়িয়া রহিল, কারণ পাঁচজনের মুখে নিজের নামকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়া আড়ম্বরে জীবনযাপন করিতেই আমার সমস্ত চেষ্টার অবসান। শতছিদ্র কলসের মধ্যে জলসঞ্চয় করিবার জন্য জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ব্যাপৃত রহিয়াছি, অবারিত অমৃতপারাবার সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে ; যিনি সকল সত্যের সত্য, অন্তরে-বাহিরে জ্ঞানে-ধর্মে কোথাও তাঁহাকে দেখি না— এতবড়ো অন্ধতা লইয়া আমি পরিতৃপ্ত। যিনি আনন্দরূপমমৃতম্, যে আনন্দের কণামাত্র আনন্দে সমস্ত জীবজন্তুর প্রাণের চেষ্টা, মনের চেষ্টা, প্রীতির চেষ্টা, পুণ্যের চেষ্টা, উৎসাহিত রহিয়াছে, তাঁহাতে আমার আনন্দ নাই ; আমার আনন্দ, আমার গর্ব কেবল উপকরণ-সামগ্রীতে— এমন বৃহৎ জড়ত্বে আমি পরিবৃত ; যাঁহার অদৃশ্য অঙ্গুলিনির্দেশে জীবপ্রকৃতি অজ্ঞাত অকীর্তিত সহস্র সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া স্বার্থ হইতে পরমার্থে, স্বেচ্ছাচার হইতে সংযমে, এককতা হইতে সমাজতন্ত্রে উপনীত হইয়াছে, যিনি মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্, যিনি দগ্ধেন্ধন ইবানলঃ, সর্বকালে সর্বলোকে যিনি আমার ঈশ্বর, তাঁহার আদেশবাক্য আমার কর্ণগোচর হয় না, তাঁহার কর্মে আমার কোনো আস্থা নাই, কেবল জীবনের কয়েকদিনমাত্র যে-কয়েকটি লোককে পাঁচজন বলিয়া জানি, তাহাদেরই ভয়ে এবং তাহাদেরই চাটুবাক্যে চালিত হওয়াই আমার দুর্লভ মানবজন্মের একমাত্র লক্ষ্য— এমন মহামূঢ়তার দ্বারা আমি সমাচ্ছন্ন। আমি জানি না আমি দেখিতে পাই না ; বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্। আমার কাছে সমস্ত জগৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন, সমস্ত বিজ্ঞান খণ্ডবিখণ্ড, সমস্ত জীবনের লক্ষ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহস্র অংশে বিভক্ত বিদীর্ণ।

হে অনন্ত বিশ্বসংসারের পরম এক পরমাত্মন্, তুমি আমার সমস্ত চিত্তকে গ্রহণ করো। তুমি সমস্ত জগতের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও পূর্ণ করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছ, তোমার সেই পূর্ণতা আমি আমার দেহে-মনে, অন্তরে-বাহিরে, জ্ঞানে-কর্মে-ভাবে যেন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারি। আমি আপনাকে সর্বতোভাবে তোমার দ্বারা আবৃত রাখিয়া নীরবে নিরভিমানে তোমার কর্ম করিতে চাই। অহরহ তুমি আদেশ করো, তুমি আহ্বান করো, তোমার প্রসন্নদৃষ্টিদ্বারা আমাকে আনন্দ দাও, তোমার দক্ষিণবাহু দ্বারা আমাকে বল দান করো। অবসাদের দুর্দিন যখন আসিবে, বন্ধুরা যখন নিরস্ত হইবে, লোকেরা যখন লাঞ্ছনা করিবে, আনুকূল্য যখন দুর্লভ হইবে, তুমি আমাকে পরাস্ত-ভূলুণ্ঠিত হইতে দিয়ো না ; আমাকে সহস্রের মুখাপেক্ষী করিয়ো না ; আমাকে সহস্রের ভয়ে ভীত, সহস্রের বাক্যে বিচলিত, সহস্রের আকর্ষণে বিক্ষিপ্ত হইতে যেন না হয়। একতুমি আমার চিত্তের একাসনে অধীশ্বর হও, আমার সমস্ত কর্মকে একাকী অধিকার করো, আমার সমস্ত অভিমানকে দমন করিয়া আমার সমস্ত প্রবৃত্তিকে তোমার পদপ্রান্তে একত্রে সংযত করিয়া রাখো। হে অক্ষরপুরুষ, পুরাতন ভারতবর্ষে তোমা হইতে যখন পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃত হইয়াছিল, তখন আমাদের সরলহৃদয় পিতামহগণ ব্রহ্মের অভয়, ব্রহ্মের আনন্দ যে কী, তাহা জানিয়াছিলেন। তাঁহারা একের বলে বলী, একের তেজে তেজস্বী, একের গৌরবে মহীয়ান হইয়াছিলেন। পতিত ভারতবর্ষের জন্য পুনর্বার সেই প্রজ্ঞালোকিত নির্মল নির্ভয় জ্যোতির্ময় দিন তোমার নিকটে প্রার্থনা করি। পৃথিবীতলে আর-একবার আমাদিগকে তোমার সিংহাসনের দিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে দাও। আমরা কেবল যুদ্ধবিগ্রহ-যন্ত্রতন্ত্র-বাণিজ্যব্যবসায়ের দ্বারা নহে, আমরা সুকঠিন সুনির্মল সন্তোষবলিষ্ঠ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা মহিমান্বিত হইয়া উঠিতে চাহি। আমরা রাজত্ব চাই না,

প্রভুত্ব চাই না, ঐশ্বর্য চাই না, প্রত্যহ একবার ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে তোমার মহাসভাতলে একাকী দণ্ডায়মান হইবার অধিকার চাই। তাহা হইলে আর আমাদের অপমান নাই, অধীনতা নাই, দারিদ্র্য নাই। আমাদের বেশভূষা দীন হউক, আমাদের উপকরণসামগ্রী বিরল হউক, তাহাতে যেন লেশমাত্র লজ্জা না পাই— কিন্তু চিত্তে যেন ভয় না থাকে, ক্ষুদ্রতা না থাকে, বন্ধন না থাকে, আত্মার মর্যাদা সকল মর্যাদার ঊর্ধ্বে থাকে, তোমারই দীপ্তিতে ব্রহ্মপরায়ণ ভারতবর্ষের মুকুটবিহীন উন্নত ললাট যেন জ্যোতিষ্মৎ হইয়া উঠে। আমাদের চতুর্দিকে সভ্যতাভিমানী বিজ্ঞানমদমত্ত বাহুবলগর্বিত স্বার্থনিষ্ঠুর জাতিরা যাহা লইয়া অহরহ নখদন্ত শাণিত করিতেছে, পরস্পরের প্রতি সতর্ক-রুষ্ট কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে, পৃথিবীকে আতঙ্কে কম্পান্বিত ও ভ্রাতৃশোণিতপাতে পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছে, সেই-সকল কাম্যবস্তু এবং সেই পরিস্ফীত আত্মাভিমানের দ্বারা তাহারা কখনোই অমর হইবে না, তাহাদের যন্ত্রতন্ত্র ; তাহাদের বিজ্ঞান, তাহাদের পর্বতপ্রমাণ উপকরণ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তাহাদের সেই বলমত্ততা ধনমত্ততা সেই উপকরণবহুলতার প্রতি ভারতবর্ষের যেন লোভ না জন্মে। হে অদ্বিতীয় এক, তপস্বিনী ভারতভূমি যেন তাহার বল্কলবসন পরিয়া তোমার দিকে তাকাইয়া ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর সেই মধুরকণ্ঠে বলিতে পারে : যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্ ? যাহা দ্বারা আমি অমৃতা না হইব, তাহা লইয়া আমি কী করিব ? কামান-ধূম্র এবং স্বর্ণধূলির দ্বারা সমাচ্ছন্ন তমসাবৃত রাষ্ট্রগৌরবের দিকে ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ো না ; তোমার সেই অনন্ধকার লোকের প্রতি দীন ভারতের নতশির উত্থিত করো।— যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ। যখন তোমার সেই অনন্ধকার আবির্ভূত হয় তখন কোথায় দিবা, কোথায় রাত্রি, কোথায় সৎ, কোথায় অসৎ। শিব এব কেবলঃ, তখন কেবল শিব, কেবল মঙ্গল।

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ,
নমঃ শংকরায় চ ময়স্করায় চ,
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

হে শম্ভব, হে ময়োভব, তোমাকে নমস্কার ; হে শংকর, হে ময়স্কর, তোমাকে নমস্কার ; হে শিব, হে শিবতর, তোমাকে নমস্কার।

ফাল্গুন ১৩০৮

প্রার্থনা

সকলেই জানেন, একটা গল্প আছে— দেবতা একজনকে তিনটে বর দিতে চাহিয়াছিলেন। এতবড়ো সুযোগটাতে হতভাগ্য কী যে চাহিবে, ভাবিয়া বিহ্বল হইল— শেষকালে উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে যে তিনটে প্রার্থনা জানাইল, তাহা এমনি অকিঞ্চিৎকর যে, তাহার পরে চিরজীবন অনুতাপ করিয়া তাহার দিন কাটিল।

এই গল্পের তাৎপর্য এই যে, আমরা মনে করি পৃথিবীতে আর কিছু জানি বা না-জানি, ইচ্ছাটাই বুঝি আমাদের কাছে সব-চেয়ে জাজ্বল্যমান— আমি সব-চেয়ে কী চাই, তাহাই বুঝি সব-চেয়ে আমার কাছে সুস্পষ্ট— কিন্তু সেটা ভ্রম। আমার যথার্থ ইচ্ছা আমার অগোচর।

অগোচরে থাকিবার একটা কারণ আছে— সেই ইচ্ছাই আমাকে নানা অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিবার ভার লইয়াছে। যে বিরাট ইচ্ছা সমস্ত মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিতে উদ্‌যোগী, সেই ইচ্ছাই আমার অন্তরে থাকিয়া কাজ করিতেছে। ততক্ষণ পর্যন্ত সেই ইচ্ছা লুকাইয়া কাজ করে— যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাকে সর্বাংশে তাহার অনুকূল করিয়া তুলিতে না পারি। তাহার উপরে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরা লাভ করি নাই বলিয়াই সে আমাদিগকে ধরা দেয় না।

আমার সব-চেয়ে সত্য ইচ্ছা, নিত্য ইচ্ছা কোন্‌টা ? যে-ইচ্ছা আমার সার্থকতাসাধনে নিরত। আমার সার্থকতা আমার কাছে যতদিন পর্যন্ত রহস্য, সেই ইচ্ছাও ততদিন আমার কাছে গুপ্ত। কিসে আমার পেট ভরিবে, আমার নাম হইবে, তাহা বলা শক্ত নয়— কিন্তু কিসে আমি সম্পূর্ণ হইব, তাহা পৃথিবীতে কয়জন লোক আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে ? আমি কী, আমার মধ্যে যে-একটা প্রকাশচেষ্টা চলিতেছে তাহার পরিণাম কী, তাহার গতি কোন্ দিকে, তাহা স্পষ্ট করিয়া কে জানে ?

অতএব দেবতা যদি বর দিতে আসেন, তবে হঠাৎ দেখি, প্রার্থনা জানাইবার জন্যও প্রস্তুত নই। তখন এই কথা বলিতে হয়, আমার যথার্থ প্রার্থনা কী, তাহা জানিবার জন্য আমাকে সুদীর্ঘ সময় দাও। নহিলে উপস্থিতমত হঠাৎ একটা-কিছু চাহিতে গিয়া হয়তো ভয়ানক ফাঁকিতে পড়িতে হইবে।

বস্তুত আমরা সেই সময় লইয়াছি— আমাদের জীবনটা এই কাজেই আছে। আমরা কী প্রার্থনা করিব, তাহাই অহরহ পরখ করিতেছি। আজ বলিতেছি খেলা, কাল বলিতেছি ধন, পরদিন বলিতেছি মান— এমনি করিয়া সংসারকে অবিশ্রাম মন্থন করিতেছি— আলোড়ন করিতেছি। কিসের জন্য ? আমি যথার্থ কী চাই, তাহারই সন্ধান পাইবার জন্য। মনে করিতেছি— টাকা খুঁজিতেছি, বন্ধু খুঁজিতেছি, মান খুঁজিতেছি ; কিন্তু আসলে আর-কিছু নয়, কাহাকে যে খুঁজিতেছি, তাহাই নানাস্থানে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি— আমার প্রার্থনা কী, তাহাই জানি না।

যাঁহারা আপনাদের অন্তরের প্রার্থনা খুঁজিয়া পাইয়াছেন বলেন— শোনা গিয়াছে তাঁহারা কী বলেন। তাঁহারা বলেন, একটিমাত্র প্রার্থনা আছে, তাহা এই—

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।
আবিরাবীর্ম এধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্।

অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকটে প্রকাশিত হও। রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদাই রক্ষা করো।

কিন্তু কানে শুনিয়া কোনো ফল নাই এবং মুখে উচ্চারণ করিয়া যাওয়া আরো বৃথা। আমরা যখন সত্যকে আলোককে অমৃতকে যথার্থ চাহিব, সমস্ত জীবনে তাহার পরিচয় দিব, তখনই এ প্রার্থনা সার্থক হইবে। যে প্রার্থনা আমি নিজে মনের মধ্যে পাই নাই, তাহা পূর্ণ হইবার কোনো পথ আমার সম্মুখে নাই। অতএব, সবই শুনিলাম বটে, মন্ত্রও কর্ণগোচর হইল— কিন্তু তবু এখনো প্রার্থনা করিবার পূর্বে প্রার্থনাটিকে সমস্ত জীবন দিয়া খুঁজিয়া পাইতে হইবে।

বনস্পতি হইয়া উঠিবার একমাত্র প্রার্থনা বীজের শস্যাংশের মধ্যে সংহতভাবে নিগূঢ়ভাবে নিহিত হইয়া আছে— কিন্তু যতক্ষণ তাহা অঙ্কুরিত হইয়া আকাশে আলোকে মাথা না তুলিয়াছে, ততক্ষণ তাহা না থাকারই তুল্য হইয়া আছে। সত্যের আকাঙ্ক্ষা, অমৃতের আকাঙ্ক্ষা আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার অন্তর্নিহিত, কিন্তু ততক্ষণ আমরা তাহাকে জানিই না, যতক্ষণ না সে আমাদের সমস্ত ধূলিস্তর বিদীর্ণ করিয়া মুক্ত আকাশে পাতা মেলিতে পারে।

আমাদের এই যথার্থ প্রার্থনাটি কী, তাহা অনেক সময় অন্যের ভিতর দিয়া আমাদিগকে জানিতে হয়। জগতের মহাপুরুষেরা আমাদিগকে নিজের অন্তর্গূঢ় ইচ্ছাটিকে জানিবার সহায়তা করেন। আমরা চিরকাল মনে করিয়া আসিতেছি, আমরা বুঝি পেট ভরাইতেই চাই, আরাম করিতেই চাই— কিন্তু যখন দেখি, কেহ ধন-মান আরামকে উপেক্ষা করিয়া সত্য, আলোক ও অমৃতের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেছেন, তখন হঠাৎ একরকম করিয়া বুঝিতে পারি যে, আমার অন্তরাত্মার মধ্যে যে ইচ্ছা আমার অগোচরে কাজ করিতেছে, তাহাকেই তিনি তাঁহার জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছেন। আমার

ইচ্ছাকে যখন তাঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, তখন অন্তত ক্ষণকালের জন্যও জানিতে পারি— কিসের প্রতি আমার যথার্থ ভক্তি, কী আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা।

তখন আরো একটা কথা বোঝা যায়। ইহা, বুঝিতে পারি যে, যে-সমস্ত ইচ্ছা প্রতিক্ষণে আমার সুগোচর, যাহারা কেবলই আমাকে তাড়না করে, তাহারাই আমার অন্তরতম ইচ্ছাকে, আমার সার্থকতালাভের প্রার্থনাকে বাধা দিতেছে, স্ফূর্তি দিতেছে না, তাহাকে কেবলই আমার চেতনার অন্তরালবর্তী, আমার চেষ্টার বহির্গত করিয়া রাখিয়াছে।

আর, যাঁহার কথা বলিতেছি, তাঁহার পক্ষে ঠিক ইহার বিপরীত। যে-মঙ্গল-ইচ্ছা, যে সার্থকতার ইচ্ছা বিশ্বমানবের মজ্জাস্বরূপ, যাহা মানব সমাজের মধ্যে চিরদিনই অকথিত বাণীতে এই মন্ত্র গান করিতেছে— অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়— এই ইচ্ছাই তাঁহার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ, আর সমস্ত ইচ্ছা ছায়ার মতো তাঁহার পশ্চাদ্বর্তী, তাঁহার পদতলগত। তিনি জানেন— সত্য, আলোক, অমৃতই চাই, মানুষের ইহা না হইলেই নয়, অন্নবস্ত্র-ধনমানকে তিনি ক্ষণিক ও আংশিক আবশ্যক বলিয়াই জানেন। বিশ্বমানবের অন্তর্নিহিত এই ইচ্ছাশক্তি তাঁহার ভিতর দিয়া জগতে প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া, প্রমাণিত হয় বলিয়াই তিনি চিরকালের জন্য মানবের সামগ্রী হইয়া উঠেন। আর আমরা খাই পরি, টাকা করি, নাম করি, মরি ও পুড়িয়া ছাই হইয়া যাই— মানবের চিরন্তন সত্য ইচ্ছাকে আমাদের যে-জীবনের মধ্যে প্রতিফলিত করিতে পারি না, মানবসমাজে সে-জীবনের ক্ষণিক-মূল্য ক্ষণকালের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়।

কিন্তু মহাপুরুষদের দৃষ্টান্ত আনিলে একটা ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা থাকে। মনে হইতে পারে যে, ক্ষমতাসাধ্য প্রতিভাসাধ্য কর্মের দ্বারাতেই বুঝি মানুষ সত্য, আলোক ও অমৃতানুসন্ধানের পরিচয় দেয়।

তাহা কোনোমতেই নহে। তাহা যদি হইত, তবে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক অমৃতের আশামাত্র করিতে পারিত না। যাহা সাধারণ বুদ্ধিবল-বাহুবলের পক্ষে দুঃসাধ্য, তাহাতেই প্রতিভা বা অসামান্য শারীরিক শক্তির প্রয়োজন; কিন্তু সত্যকে অবলম্বন করা, আলোককে গ্রহণ করা, অমৃতকে বরণ করিয়া লওয়া, ইহা কেবল একান্তভাবে, যথার্থভাবে ইচ্ছার কর্ম। ইহা আর কিছু নয়— যাহা কাছেই আছে, তাহাকেই পাওয়া।

ইহা মনে রাখিতে হইবে, আমাদিগকে যাহা-কিছু দিবার তাহা আমাদের প্রার্থনার বহুপূর্বেই দেওয়া হইয়া গেছে। আমাদের যথার্থ ঈপ্সিতধনের দ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত। বাকি আছে কেবল লইবার চেষ্টা— তাহাই যথার্থ প্রার্থনা।

ঈশ্বর এইখানেই আমাদের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। তিনিই সব দিয়াছেন, অথচ এটুকু আমাদের বলিবার মুখ রাখিয়াছেন যে, আমরাই লইয়াছি। এই লওয়াটাই সফলতা, ইহাই লাভ— পাওয়াটা সকল সময়ে লাভ নহে— তাহা অধিকাংশস্থলেই পাইয়াও না-পাওয়া, অবশিষ্টস্থলে বিষম একটা বোঝা। আর্থিক-পারমার্থিক সকল বিষয়েই এ কথা খাটে।

ঋষি বলিয়াছেন—

আবিরাবীর্ম এধি। হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও।

তুমি তো স্বপ্রকাশ, আপনা-আপনি প্রকাশিত আছই, এখন, আমার কাছে প্রকাশিত হও, এই আমার প্রার্থনা। তোমার পক্ষে প্রকাশের অভাব নাই, আমার পক্ষে সেই প্রকাশ উপলব্ধির সুযোগ বাকি আছে। যতক্ষণ আমি তোমাকে না দেখিব, ততক্ষণ তুমি পরিপূর্ণ প্রকাশ হইলেও আমার কাছে দেখা দিবে না। সূর্য তো আপন আলোকে আপনি প্রকাশিত হইয়াই আছেন, এখন আমারই কেবল চোখ খুলিবার, জাগ্রত হইবার অপেক্ষা। যখন আমাদের চোখ খুলিবার ইচ্ছা হয়, আমরা চোখ খুলি, তখন সূর্য আমাদিগকে নূতন করিয়া কিছু দেন না, তিনি যে আপনাকে আপনি দান করিয়া রাখিয়াছেন, ইহাই আমরা মুহূর্তের মধ্যে বুঝিতে পারি।

অতএব দেখা যাইতেছে— আমরা যে কী চাই, তাহা যথার্থভাবে জানিতে পারাই প্রার্থনার আরম্ভ। যখন তাহা জানিতে পারিলাম, তখন সিদ্ধির আর বড়ো বিলম্ব থাকে না, তখন দূরে যাইবার প্রয়োজন

হয় না। তখন বুঝিতে পারা যায়, সমস্ত মানবের নিত্য আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে জাগ্রত হইয়াছে— এই সুমহৎ-আকাঙ্ক্ষাই আপনার মধ্যে আপনার সফলতা অতি সুন্দরভাবে, অতি সহজভাবে বহন করিয়া আনে।

আমাদের ছোটো বড়ো সকল ইচ্ছাকেই মানবের এই বড়ো ইচ্ছা, এই মর্মগত প্রার্থনা দিয়া যাচাই করিয়া লইতে হইবে। নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, আমাদের যে-কোনো ইচ্ছা এই সত্য-আলোক-অমৃতের ইচ্ছাকে অতিক্রম করে, তাহাই আমাদিগকে খর্ব করে, তাহাই, কেবল আমাকে নহে, সমস্ত মানবকে পশ্চাতের দিকে টানিতে থাকে।

এ-যে কেবল আমাদের খাওয়া পরা, আমাদের ধনমান-অর্জন সম্বন্ধেই খাটে, তাহা নহে— আমাদের বড়ো বড়ো চেষ্টা সম্বন্ধে আরো বেশি করিয়াই খাটে।

যেমন দেশহিতৈষা। এ-প্রবৃত্তি যদিও আমাদের আত্মত্যাগ ও দুষ্কর তপঃসাধনের দিকে লইয়া যায়, তবু ইহা মানবত্বের গুরুতর অন্তরায়-স্বরূপ হইয়া উঠিতে পারে। ইহার প্রমাণ আমাদের সম্মুখেই, আমাদের নিকটেই রহিয়াছে। য়ুরোপীয় জাতিরা ইহাকেই তাহাদের চরম লক্ষ্য, পরম ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইহা প্রতিদিনই সত্যকে, আলোককে, অমৃতকে য়ুরোপের দৃষ্টি হইতে আড়াল করিতেছে। য়ুরোপের স্বদেশাসক্তিই মানবত্বলাভের ইচ্ছাকে, সার্থকতালাভের ইচ্ছাকে প্রবলবেগে প্রতিহত করিতেছে এবং য়ুরোপীয় সভ্যতা অধিকাংশ পৃথিবীর পক্ষে প্রকাণ্ড বিভীষিকা হইয়া উঠিতেছে। য়ুরোপ কেবলই মাটি চাহিতেছে, সোনা চাহিতেছে, প্রভুত্ব চাহিতেছে— এমন লোলুপভাবে, এমন ভীষণভাবে চাহিতেছে যে, সত্য, আলোক ও অমৃতের জন্য মানবের যে চিরন্তন প্রার্থনা তাহা য়ুরোপের কাছে উত্তরোত্তর প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়া তাহাকে উদ্দাম করিয়া তুলিতেছে। ইহাই বিনাশের পথ— পথ নহে— ইহাই মৃত্যু।

আমাদের সম্মুখে, আমাদের অত্যন্ত নিকটে য়ুরোপের এই দৃষ্টান্ত আমাদিগকে প্রতিদিন মোহাভিভূত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষকে এই কথাই কেবল মনে রাখিতে হইবে যে, সত্য-আলোক-অমৃতই প্রার্থনার সামগ্রী; বিষয়ানুরাগই হউক আর দেশানুরাগই হউক, আপনার উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যসাধনের উপায় যেখানেই এই সত্য, আলোক ও অমৃতকে অতিক্রম করিতে চাহে, সেখানেই তাহাকে অভিশাপ দিয়া বলিতে হইবে— 'বিনিপাত!' বলা কঠিন। প্রলোভন প্রবল, ক্ষমতার মোহ অতিক্রম করা অতি দুঃসাধ্য, তবু ভারতবর্ষ এই কথা সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

আষাঢ় ১৩১১

ধর্মপ্রচার

'এস আমরা ফললাভ করি' বলিয়া হঠাৎ উৎসাহে তখনই পথে বাহির হইয়া পড়াই যে ফললাভের উপায়, তাহা কেহই বলিবেন না। কারণ কেবলমাত্র সদিচ্ছা এবং সদুৎসাহের বলে ফল সৃষ্টি করা যায় না, বীজ হইতে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ হইতে ফল জন্মে। দলবদ্ধ উৎসাহের দ্বারাতেও সে-নিয়মের অন্যথা ঘটিতে পারে না। বীজ ও বৃক্ষের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া আমরা যদি অন্য উপায়ে ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করি, তবে সেই ঘরগড়া কৃত্রিম ফল খেলার পক্ষে, গৃহসজ্জার পক্ষে অতি উত্তম হইতে পারে— কিন্তু তাহা আমাদের যথার্থ ক্ষুধানিবৃত্তির পক্ষে অত্যন্ত অনুপযোগী হয়।

আমাদের দেশে আধুনিক ধর্মসমাজে আমরা এই কথাটা ভাবি না। আমরা মনে করি, দল বাঁধিলেই বুঝি ফল পাওয়া যায়। শেষকালে মনে করি দল বাঁধাটাই ফল।

ক্ষণে ক্ষণে আমাদের উৎসাহ হয়, প্রচার করিতে হইবে। হঠাৎ অনুতাপ হয়, কিছু করিতেছি না।

যেন করাটাই সব চেয়ে প্রধান— কী করিব, কে করিবে, সেটা বড়ো-একটা ভাবিবার কথা নয়।

কিন্তু এ কথাটা সর্বদাই স্মরণ রাখা দরকার যে, ধর্মপ্রচারকার্যে ধর্মটা আগে, প্রচারটা তাহার পরে। প্রচার করিলেই তবে ধর্মরক্ষা হইবে, তাহা নহে, ধর্মকে রক্ষা করিলেই প্রচার আপনি হইবে।

মনুষ্যত্বের সমস্ত মহাসত্যগুলিই পুরাতন এবং 'ঈশ্বর আছেন' এ কথা পুরাণতম। এই পুরাতনকে মানুষের কাছে চিরদিন নূতন করিয়া রাখাই মহাপুরুষের কাজ। জগতের চিরন্তন ধর্মগুরুগণ কোনো নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা নহে— তাঁহারা পুরাতনকে তাঁহাদের জীবনের মধ্যে নূতন করিয়া পাইয়াছেন এবং সংসারের মধ্যে তাহাকে নূতন করিয়া তুলিয়াছেন।

নব নব বসন্ত নব নব পুষ্প সৃষ্টি করে না— সেরূপ নূতনত্বে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা আমাদের চিরকালের পুরাতন ফুলগুলিকেই বর্ষে বর্ষে বসন্তে বসন্তে নূতন করিয়া দেখিতে চাই। সংসারের যাহা-কিছু মহোত্তম, যাহা মহার্ঘতম, তাহা পুরাতন, তাহা সরল, তাহার মধ্যে গোপন কিছুই নাই ; যাঁহাদের অভ্যুদয় বসন্তের ন্যায় অনির্বচনীয় জীবন ও যৌবনের দক্ষিণসমীরণ মহাসমুদ্রবক্ষ হইতে সঙ্গে করিয়া আনে, তাঁহারা সহসা এই পুরাতনকে অপূর্ব করিয়া তোলেন— অতিপরিচিতকে নিজ জীবনের নব নব বর্ণে গন্ধে রূপে সজীব সরস প্রস্ফুটিত করিয়া মধুপিপাসুগণকে দিগ্‌দিগন্ত হইতে আকর্ষণ করিয়া আনেন।

আমরা ধর্মনীতির সর্বজনবিদিত সহজ সত্যগুলি এবং ঈশ্বরের শক্তি ও করুণা প্রত্যহ পুনরাবৃত্তি করিয়া সত্যকে কিছুমাত্র অগ্রসর করি না, বরঞ্চ অভ্যস্তবাক্যের তাড়নায় বোধশক্তিকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলি। যে-সকল কথা অত্যন্ত জানা, তাহাদিগকে একটা নিয়ম বাঁধিয়া বারংবার শুনাইতে গেলে, হয় আমাদের মনোযোগ একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে, নয় আমাদের হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

বিপদ কেবল এই একমাত্র নহে। অনুভূতিরও একটা অভ্যাস আছে। আমরা বিশেষ স্থানে বিশেষ ভাষাবিন্যাসে একপ্রকার ভাবাবেগ মাদকতার ন্যায় অভ্যাস করিয়া ফেলিতে পারি। সেই অভ্যস্ত আবেগকে আমরা আধ্যাত্মিক সফলতা বলিয়া ভ্রম করি— কিন্তু তাহা একপ্রকার সম্মোহনমাত্র।

এইরূপে ধর্মও যখন সম্প্রদায়বিশেষে বদ্ধ হইয়া পড়ে, তখন তাহা সম্প্রদায়স্থ অধিকাংশ লোকের কাছে হয় অভ্যস্ত অসাড়তায়, নয় অভ্যস্ত সম্মোহনে পরিণত হইয়া থাকে। তাহার প্রধান কারণ, চিরপুরাতন ধর্মকে নূতন করিয়া বিশেষভাবে আপনার করিবার এবং সেই সূত্রে তাহাকে পুনর্বার বিশেষভাবে সমস্ত মানবের উপযোগী করিবার ক্ষমতা যাহাদের নাই, ধর্মরক্ষা ও ধর্মপ্রচারের ভার তাহারাই গ্রহণ করে। তাহারা মনে করে, আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে সমাজের ক্ষতি হইবে।

ধর্মকে যাহারা সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করে, তাহারা ক্রমশই ধর্মকে জীবন হইতে দূরে ঠেলিয়া দিতে থাকে। ইহারা ধর্মকে বিশেষ গণ্ডি আঁকিয়া একটা বিশেষ সীমানার মধ্যে বদ্ধ করে। ধর্ম বিশেষ দিনের বিশেষ স্থানের বিশেষ প্রণালীর ধর্ম হইয়া উঠে। তাহার কোথাও কিছু ব্যত্যয় হইলেই সম্প্রদায়ের মধ্যে হুলুস্থুল পড়িয়া যায়। বিষয়ী নিজের জমির সীমানা এত সতর্কতার সহিত বাঁচাইতে চেষ্টা করে না, ধর্মব্যবসায়ী যেমন প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত ধর্মের স্বরচিত গণ্ডি রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে থাকে। এই গণ্ডিরক্ষাকেই তাহারা ধর্মরক্ষা বলিয়া জ্ঞান করে। বিজ্ঞানের কোনো নূতন মূলতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে তাহারা প্রথমে ইহাই দেখে যে, সে-তত্ত্ব তাহাদের গণ্ডির সীমানায় হস্তক্ষেপ করিতেছে কি না ; যদি করে তবে ধর্ম গেল বলিয়া তাহারা ভীত হইয়া উঠে। ধর্মের বৃন্তটিকে তাহারা এতই ক্ষীণ করিয়া রাখে যে, প্রত্যেক বায়ুহিল্লোলকে তাহারা শত্রুপক্ষ বলিয়া জ্ঞান করে। ধর্মকে তাহারা সংসার হইতে বহুদূরে স্থাপিত করে— পাছে ধর্ম-সীমানার মধ্যে মানুষ আপন হাস্য, আপন ক্রন্দন, আপন প্রাত্যহিক ব্যাপারকে, আপন জীবনের অধিকাংশকে লইয়া উপস্থিত হয়। সপ্তাহের এক দিনের এক অংশকে, গৃহের এক কোণকে বা নগরের একটি মন্দিরকে ধর্মের জন্য উৎসর্গ করা হয়— বাকি সমস্ত দেশকালের সহিত ইহার একটি পার্থক্য, এমন-কি, ইহার একটি বিরোধ ক্রমশ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। দেহের সহিত আত্মার, সংসারের সহিত ব্রহ্মের, এক সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের বৈষম্য ও বিদ্রোহভাব স্থাপন করাই, মনুষ্যত্বের মাঝখানে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত করাই যেন

ধর্মের বিশেষ লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়।

অথচ সংসারে একমাত্র যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম বলা যায়। তাহা মনুষ্যত্বের এক অংশে অবস্থিত হইয়া অপর অংশের সহিত অহরহ কলহ করে না— সমস্ত মনুষ্যত্ব তাহার অন্তর্ভূত— তাহাই যথার্থভাবে মনুষ্যত্বের ছোটোবড়ো, অন্তর-বাহির সর্বাংশে পূর্ণ সামঞ্জস্য। সেই সুবৃহৎ সামঞ্জস্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মনুষ্যত্ব সত্য হইতে স্খলিত হয়, সৌন্দর্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। সেই অমোঘ ধর্মের আদর্শকে যদি গির্জার গণ্ডির মধ্যে নির্বাসিত করিয়া দিয়া অন্য যে-কোনো উপস্থিত প্রয়োজনের আদর্শ দ্বারা সংসারের ব্যবহার চালাইতে যাই, তাহাতে সর্বনাশী অমঙ্গলের সৃষ্টি হইতে থাকে।

কিন্তু ভারতবর্ষের এ আদর্শ সনাতন নহে। আমাদের ধর্ম রিলিজন নহে, তাহা মনুষ্যত্বের একাংশ নহে— তাহা পলিটিক্স হইতে তিরস্কৃত, যুদ্ধ হইতে বহিষ্কৃত, ব্যবসায় হইতে নির্বাসিত, প্রাত্যহিক ব্যবহার হইতে দূরবর্তী নহে। সমাজের কোনো বিশেষ অংশে তাহাকে প্রাচীরবদ্ধ করিয়া মানুষের আরাম আমোদ হইতে, কাব্য-কলা হইতে, জ্ঞানবিজ্ঞান হইতে তাহার সীমানা-রক্ষার জন্য সর্বদা পাহারা দাঁড়াইয়া নাই। ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রমগুলি এই ধর্মকেই জীবনের মধ্যে, সংসারের মধ্যে সর্বতোভাবে সার্থক করিবার সোপান। ধর্ম সংসারের আংশিক প্রয়োজন সাধনার জন্য নহে, সমগ্র সংসারই ধর্মসাধনের জন্য। এইরূপে ধর্ম গৃহের মধ্যে গৃহধর্ম, রাজত্বের মধ্যে রাজধর্ম হইয়া ভারতবর্ষের সমগ্র সমাজকে একটি অখণ্ড তাৎপর্য দান করিয়াছিল। সেইজন্য ভারতবর্ষে, যাহা অধর্ম, তাহাই অনুপযোগী ছিল— ধর্মের দ্বারাই সফলতা বিচার করা হইত, অন্য সফলতা দ্বারা ধর্মের বিচার চলিত না।

এইজন্য ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজে শিক্ষার কালকে ব্রহ্মচর্য নাম দেওয়া হইয়াছিল। ভারতবর্ষ জানিত, ব্রহ্মলাভের দ্বারা মনুষ্যত্বলাভই শিক্ষা। সেই শিক্ষা ব্যতীত গৃহস্থতনয় গৃহী, রাজপুত্র রাজা হইতে পারে না। কারণ গৃহকর্মের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মলাভ, রাজকর্মের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ভারতবর্ষের লক্ষ্য। সকল কর্ম সকল আশ্রমের সাহায্যেই ব্রহ্মউপলব্ধি যখন ভারতবর্ষের চরমসাধনা, তখন ব্রহ্মচর্যই তাহার শিক্ষা না হইয়া থাকিতে পারে না।

যে যাহা যথার্থভাবে চায়, সে তাহার উপায় সেইরূপ যথার্থভাবে অবলম্বন করে। য়ুরোপ যাহা কামনা করে, বাল্যকাল হইতে তাহার পথ সে প্রস্তুত করে, তাহার সমাজে, তাহার প্রাত্যহিক জীবনে সেই লক্ষ্য জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে সে ধরিয়া রাখে। এই কারণেই য়ুরোপ দেশজয় করে, ঐশ্বর্য লাভ করে, প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজের সেবাকার্যে নিযুক্ত করিয়া আপনাকে পরম চরিতার্থ জ্ঞান করে। তাহার উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই সে সিদ্ধকাম হইয়াছে। এইজন্য য়ুরোপীয়েরা বলিয়া থাকে, তাহাদের পাবলিক-স্কুলে, তাহাদের ক্রিকেটক্ষেত্রে তাহারা রণজয়ের চর্চা করিয়া লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে।

এককালে আমরা সেইরূপ যথার্থভাবেই ব্রহ্মলাভকে যখন চরমলাভ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলাম, তখন সমাজের সর্বত্রই তাহার যথার্থ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। তখন য়ুরোপীয় রিলিজন-চর্চার আদর্শকে আমাদের দেশ কখনোই ধর্মলাভের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিত না। সুতরাং ধর্মপালন তখন সংকুচিত হইয়া বিশেষভাবে রবিবার বা আর-কোনো বারের সামগ্রী হইয়া উঠে নাই। ব্রহ্মচর্য তাহার শিক্ষা ছিল, গৃহাশ্রম তাহার সাধনা ছিল, সমস্ত সমাজ তাহার অনুকূল ছিল— এবং যে ঋষিরা লব্ধকাম হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ

যাঁহারা বলিয়াছেন—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন

তাঁহারাই তাহার গুরু ছিলেন।

ধর্মকে যে আমরা শৌখিনের ধর্ম করিয়া তুলিব ; আমরা যে মনে করিব, অজস্র ভোগবিলাসের

একপার্শ্বে ধর্মকেও একটুখানি স্থান দেওয়া আবশ্যক, নতুবা ভব্যতারক্ষা হয় না, নতুবা ঘরের ছেলেমেয়েদের জীবনে যেটুকু ধর্মের সংস্রব রাখা শোভন, তাহা রাখিবার উপায় থাকে না ; আমরা যে মনে করিব, আমাদের আদর্শভূত পাশ্চাত্যসমাজে ভদ্রপরিবারেরা ধর্মকে যেটুকু পরিমাণে স্বীকার করা ভদ্রতারক্ষার অঙ্গ বলিয়া গণ্য করেন, আমরাও সর্ববিষয়ে তাঁহাদের অনুবর্তন করিয়া অগত্যা সেইটুকু পরিমাণ ধর্মের ব্যবস্থা না রাখিলে লজ্জার কারণ হইবে ; তবে আমাদের সেই ভদ্রতাবিলাসের আসবাবের সঙ্গে ভারতের সুমহৎ ব্রহ্মনামকে জড়িত করিয়া রাখিলে আমাদের পিতামহদের পবিত্রতম সাধনাকে চটুলতম পরিহাসে পরিণত করা হইবে।

যাঁহারা ব্রহ্মকে সর্বত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই ঋষিরা কী বলিয়াছিলেন ? তাঁহারা বলেন—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

বিশ্বজগতে যাহা-কিছু চলিতেছে, সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত দেখিতে হইবে— এবং তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই ভোগ করিতে হইবে— অন্যের ধনে লোভ করিবে না।

ইহার অর্থ এমন নহে যে, 'ঈশ্বর সর্বব্যাপী' এই কথাটা স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহার পরে সংসারে যেমন ইচ্ছা, তেমনি করিয়া চলা। যথার্থভাবে ঈশ্বরের দ্বারা সমস্তকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিবার অর্থ অত্যন্ত বৃহৎ— সেরূপ করিয়া না দেখিলে সংসারকে সত্য করিয়া দেখা হয় না এবং জীবনকে অন্ধ করিয়া রাখা হয়।

'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্'— ইহা কাজের কথা— ইহা কাল্পনিক কিছু নহে— ইহা কেবল শুনিয়া জানার এবং উচ্চারণ দ্বারা মানিয়া লইবার মন্ত্র নহে। গুরুর নিকট এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া লইয়া তাহার পরে দিনে দিনে পদে পদে ইহাকে জীবনের মধ্যে সফল করিতে হইবে। সংসারকে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দেখিতে হইবে। পিতাকে সেই পিতার মধ্যে, মাতাকে সেই মাতার মধ্যে, বন্ধুকে সেই বন্ধুর মধ্যে, প্রতিবেশী, স্বদেশী ও মনুষ্যসমাজকে সেই সর্বভূতান্তরাত্মার মধ্যে উপলব্ধি করিতে হইবে।

ঋষিরা যে ব্রহ্মকে কতখানি সত্য বলিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের একটি কথাতেই বুঝিতে পারি— তাঁহারা বলিয়াছেন—

তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।

এই যে ব্রহ্মলোক— অর্থাৎ যে ব্রহ্মলোক সর্বত্রই রহিয়াছে— ইহা তাঁহাদেরই, তপস্যা যাঁহাদের, ব্রহ্মচর্য যাঁহাদের, সত্য যাঁহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত।

অর্থাৎ যাঁহারা যথার্থভাবে ইচ্ছা করেন, যথার্থভাবে চেষ্টা করেন, যথার্থ উপায় অবলম্বন করেন। তপস্যা একটা কোনো কৌশলবিশেষ নহে, তাহা কোনো গোপনরহস্য নহে—

ঋতং তপঃ সত্যং তপঃ শ্রুতং তপঃ শান্তং তপো দানং তপো যজ্ঞস্তপো ভূর্ভুবঃসুবর্ব্রহ্মৈতদুপাস্যৈতৎ তপঃ।

ঋতুই তপস্যা, সত্যই তপস্যা, শ্রুত তপস্যা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ তপস্যা, দান তপস্যা, কর্ম তপস্যা, এবং ভূর্লোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোকব্যাপী এই যে ব্রহ্ম, ইঁহার উপাসনাই তপস্যা। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা বল তেজ শান্তি সন্তোষ নিষ্ঠা ও পবিত্রতা লাভ করিয়া, দান ও কর্ম দ্বারা স্বার্থপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তবে অন্তরে-বাহিরে আত্মায়-পরে লোক-লোকান্তরে ব্রহ্মকে লাভ করা যায়।

উপনিষদ বলেন, যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তিনি

সর্বমেবাবিবেশ, সকলের মধ্যে প্রবেশ করেন।

বিশ্ব হইতে আমরা যে পরিমাণে বিমুখ হই, ব্রহ্ম হইতেই আমরা সেই পরিমাণে বিমুখ হইতে থাকি। আমরা ধৈর্যলাভ করিলাম কি না, অভয়লাভ করিলাম কি না, ক্ষমা আমাদের পক্ষে সহজ হইল কি না, আত্মবিস্মৃত মঙ্গলভাব আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইল কি না, পরনিন্দা আমাদের পক্ষে অপ্রিয় ও পরের প্রতি ঈর্ষার উদ্রেক আমাদের পক্ষে পরম লজ্জার বিষয় হইল কি না, বৈষয়িকতার বন্ধন

ঐশ্বর্য-আড়ম্বরের প্রলোভন পাশ ক্রমশ শিথিল হইতেছে কি না, এবং সর্বাপেক্ষা যাহাকে বশ করা দুরূহ সেই উদ্যত আত্মাভিমান বংশীরববিমুগ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় ক্রমে ক্রমে আপন মস্তক নত করিতেছে কি না, ইহাই অনুধাবন করিলে আমরা যথার্থভাবে দেখিব, ব্রহ্মের মধ্যে আমরা কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিয়াছি, ব্রহ্মের দ্বারা নিখিলজগৎকে কতদূর পর্যন্ত সত্যরূপে আবৃত দেখিয়াছি।

আমরা বিশ্বের অন্য সর্বত্র ব্রহ্মের আবির্ভাব কেবলমাত্র সাধারণভাবে জ্ঞানে জানিতে পারি। জল-স্থল-আকাশ-গ্রহ-নক্ষত্রের সহিত আমাদের হৃদয়ের আদানপ্রদান চলে না— তাহাদের সহিত আমাদের মঙ্গলকর্মের সম্বন্ধ নাই। আমরা জ্ঞানে-প্রেমে-কর্মে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কেবল মানুষকেই পাইতে পারি। এইজন্য মানুষের মধ্যেই পূর্ণতরভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভবপর। নিখিল মানবাত্মার মধ্যে আমরা সেই পরমাত্মাকে নিকটতম, অন্তরতম রূপে জানিয়া তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি। 'সর্বভূতান্তরাত্মা' ব্রহ্ম এই মনুষ্যত্বের ক্রোড়েই আমাদিগকে মাতার ন্যায় ধারণ করিয়াছেন, এই বিশ্বমানবের স্তন্যরসপ্রবাহে ব্রহ্ম আমাদিগকে চিরকালসঞ্চিত প্রাণ বুদ্ধি প্রীতি ও উদ্যমে নিরন্তর পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতেছেন, এই বিশ্বমানবের কণ্ঠ হইতে ব্রহ্ম আমাদের মুখে পরমাশ্চর্য ভাষার সঞ্চার করিয়া দিতেছেন, এই বিশ্বমানবের অন্তঃপুরে আমরা চিরকালরচিত কাব্যকাহিনী শুনিতেছি, এই বিশ্বমানবের রাজভাণ্ডারে আমাদের জন্য জ্ঞান ও ধর্ম প্রতিদিন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। এই মানবাত্মার মধ্যে সেই বিশ্বাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিলে আমাদের পরিতৃপ্তি ঘনিষ্ঠ হয়— কারণ, মানবসমাজের উত্তরোত্তর বিকাশমান অপরূপ রহস্যময় ইতিহাসের মধ্যে ব্রহ্মের আবির্ভাবকে কেবল জানামাত্র আমাদের পক্ষে যথেষ্ট আনন্দ নহে, মানবের বিচিত্র প্রীতিসম্বন্ধের মধ্যে ব্রহ্মের প্রীতিরস নিশ্চয়ভাবে অনুভব করিতে পারা আমাদের অনুভূতির চরম সার্থকতা এবং প্রীতিবৃত্তির স্বাভাবিক পরিণাম যে কর্ম, সেই কর্ম দ্বারা মানবের সেবারূপে ব্রহ্মের সেবা করিয়া আমাদের কর্মপরতার পরম সাফল্য। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি হৃদয়বৃত্তি কর্মবৃত্তি, আমাদের সমস্ত শক্তি সমগ্রভাবে প্রয়োগ করিলে তবে আমাদের অধিকার আমাদের পক্ষে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ হয়। এইজন্য ব্রহ্মের অধিকারকে বুদ্ধি প্রীতি ও কর্ম-দ্বারা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ করিবার ক্ষেত্র মনুষ্যত্ব ছাড়া আর কোথাও নাই। মাতা যেমন একমাত্র মাতৃসম্বন্ধেই শিশুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা নিকট, সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ, সংসারের সহিত তাঁহার অন্যান্য বিচিত্র সম্বন্ধ শিশুর নিকট অগোচর এবং অব্যবহার্য, তেমনি ব্রহ্ম মানুষের নিকট একমাত্র মনুষ্যত্বের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা সত্যরূপে প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান— এই সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই আমরা তাঁহাকে জানি, তাঁহাকে প্রীতি করি, তাঁহার কর্ম করি। এইজন্য মানবসংসারের মধ্যেই প্রতিদিনের ছোটো বড়ো সমস্ত কর্মের মধ্যেই ব্রহ্মের উপাসনা মানুষের পক্ষে একমাত্র সত্য উপাসনা। অন্য উপাসনা আংশিক, কেবল জ্ঞানের উপাসনা, কেবল ভাবের উপাসনা— সেই উপাসনা দ্বারা আমরা ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারি না।

এ কথা সকলেই জানেন, অনেক সময়ে মানুষ যাহাকে উপায়রূপে আশ্রয় করে, তাহাকেই উদ্দেশ্যরূপে বরণ করিয়া লয়, যাহাকে রাজ্যলাভের সহায়মাত্র বলিয়া ডাকিয়া লয়, সেই রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া বসে। আমাদের ধর্মসমাজরচনাতেও সে বিপদ আছে। আমরা ধর্মলাভের জন্য ধর্মসমাজ স্থাপন করি, শেষকালে ধর্মসমাজই ধর্মের স্থান অধিকার করে। আমাদের নিজের চেষ্টারচিত সামগ্রী আমাদের সমস্ত মমতা ক্রমে এমন করিয়া নিঃশেষে আকর্ষণ করিয়া লয় যে, ধর্ম, যাহা আমাদের স্বরচিত নহে, তাহা ইহার পশ্চাতে পড়িয়া যায়। তখন, আমাদের সমাজের বাহিরে যে আর-কোথাও ধর্মের স্থান থাকিতে পারে, সে কথা স্বীকার করিতে কষ্টবোধ হয়। ইহা হইতে ধর্মের বৈষয়িকতা আসিয়া পড়ে। দেশলুব্ধগণ যে ভাবে দেশ জয় করিতে বাহির হয়, আমরা সেই ভাবেই ধর্মসমাজের ধ্বজা লইয়া বাহির হই। অন্যান্য দলের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের দলের লোকবল, অর্থবল, আমাদের দলের মন্দিরসংখ্যা গণনা করিতে থাকি। মঙ্গলকর্মে মঙ্গলসাধনের আনন্দ অপেক্ষা মঙ্গলসাধনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড়ো হইয়া উঠে। দলাদলির আগুন কিছুতেই নেবে না, কেবলই বাড়িয়া চলিতে থাকে। আমাদের এখনকার প্রধান কর্তব্য এই যে, ধর্মকে যেন আমরা ধর্মসমাজের হস্তে

পীড়িত হইতে না দিই। ব্রহ্ম ধন্য— তিনি সর্বদেশে, সর্বকালে, সর্বজীবে ধন্য— তিনি কোনো দলের নহেন, কোনো সমাজের নহেন, কোনো বিশেষ ধর্মপ্রণালীর নহেন, তাঁহাকে লইয়া ধর্মের বিষয়কর্ম ফাঁদিয়া বসা চলে না। ব্রহ্মচারী শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন— 'স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি'— 'হে ভগবন, তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন?' ব্রহ্মবাদী গুরু উত্তর করিলেন— 'স্বে মহিম্নি'— 'আপন মহিমাতে।' তাঁহারই সেই মহিমার মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা অনুভব করিতে হইবে— আমাদের রচনার মধ্যে নহে।

ফাল্গুন ১৩১০

বর্ষশেষ

পুরাতন বর্ষের সূর্য পশ্চিম প্রান্তরের প্রান্তে নিঃশব্দে অস্তমিত হইল। যে কয়বৎসর পৃথিবীতে কাটাইলাম অদ্য তাহারই বিদায়যাত্রার নিঃশব্দ পক্ষধ্বনি এই নির্বাণালোকে নিস্তব্ধ আকাশের মধ্যে যেন অনুভব করিতেছি। সে অজ্ঞাত সমুদ্রপারগামী পক্ষীর মতো কোথায় চলিয়া গেল তাহার আর কোনো চিহ্ন নাই।

হে চিরদিনের চিরন্তন, অতীত জীবনকে এই যে আজ বিদায় দিতেছি এই বিদায়কে তুমি সার্থক করো— আশ্বাস দাও যে, যাহা নষ্ট হইল বলিয়া শোক করিতেছি তাহার সকলই যথাকালে তোমার মধ্যে সফল হইতেছে। আজি যে প্রশান্ত বিষাদ সমস্ত সন্ধ্যাকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের হৃদয়কে আবৃত করিতেছে, তাহা সুন্দর হউক, মধুময় হউক, তাহার মধ্যে অবসাদের ছায়ামাত্র না পড়ুক। আজ বর্ষাবসানের অবসানদিনে বিগত জীবনের উদ্দেশে আমাদের ঋষি পিতামহদিগের আনন্দময় মৃত্যুমন্ত্র উচ্চারণ করি।

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্যঃ। ওঁ।

বায়ু মধু বহন করিতেছে। নদী সিন্ধু সকল মধুক্ষরণ করিতেছে। ওষধী বনস্পতি সকল মধুময় হউক। রাত্রি মধু হউক, উষা মধু হউক, পৃথিবীর ধূলি মধুমৎ হউক। সূর্য মধুমান হউক।

রাত্রি যেমন আগামী দিবসকে নবীন করে, নিদ্রা যেমন আগামী জাগরণকে উজ্জ্বল করে, তেমনি অদ্যকার বর্ষাবসান যে গত জীবনের স্মৃতির বেদনাকে সন্ধ্যার ঝিল্লীঝংকারসুপ্ত অন্ধকারের মতো হৃদয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে, তাহা যেন নববর্ষের প্রভাতের জন্য আমাদের আগামী বৎসরের আশামুকুলকে লালন করিয়া বিকশিত করিয়া তুলে। যাহা যায় তাহা যেন শূন্যতা রাখিয়া যায় না, তাহা যেন পূর্ণতার জন্য স্থান করিয়া যায়। যে বেদনা হৃদয়কে অধিকার করে তাহা যেন নব আনন্দকে জন্ম দিবার বেদনা হয়।

যে বিষাদ ধ্যানের পূর্বাভাস, যে শান্তি মঙ্গলকর্মনিষ্ঠার জননী, যে বৈরাগ্য উদার প্রেমের অবলম্বন, যে নির্মল শোক তোমার নিকটে আত্মসমর্পণের মন্ত্রগুরু তাহাই আজিকার আসন্ন রজনীর অগ্রগামী হইয়া আমাদিগকে সন্ধ্যাদীপোজ্জ্বলগৃহ-প্রত্যাগত শ্রান্ত বালকের মতো অঞ্চলের মধ্যে আবৃত করিয়া লউক।

পৃথিবীতে সকল বস্তুই আসিতেছে এবং যাইতেছে— কিছুই স্থির নহে; সকলই চঞ্চল— বর্ষশেষের সন্ধ্যায় এই কথাই তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত হৃদয়ের মধ্যে প্রবাহিত হইতে থাকে। কিন্তু যাহা আছে, যাহা চিরকাল স্থির থাকে, যাহাকে কেহই হরণ করিতে পারে না, যাহা আমাদের অন্তরের অন্তরে বিরাজমান— গত বর্ষে সেই ধ্রুবের কি কোনো পরিচয় পাই নাই— জীবনে কি তাঁহার কোনো লক্ষণ

চিহ্নিত হয় নাই ? সকলই কি কেবল আসিয়াছে এবং গিয়াছে ? আজ স্তব্ধভাবে ধ্যান করিয়া বলিতেছি তাহা নহে— যাহা আসিয়াছে এবং যাহা গিয়াছে তাহার কোথাও যাইবার সাধ্য নাই, হে নিস্তব্ধ, তাহা তোমার মধ্যে বিধৃত হইয়া আছে। যে তারা নিবিয়াছে তাহা তোমার মধ্যে নিবে নাই, যে পুষ্প ঝরিয়াছে তাহা তোমার মধ্যে বিকশিত— আমি যাহার লয় দেখিতেছি, তোমার নিকট হইতে তাহা কোনোকালেই চ্যুত হইতে পারে না। আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে শান্ত হইয়া তোমার মধ্যে নিখিলের সেই স্থিরত্ব অনুভব করি। বিশ্বের প্রতীয়মান চঞ্চলতাকে অবসানকে বিচ্ছেদকে আজ একেবারে ভুলিয়া যাই। গত বৎসর যদি তাহার উড্ডীন পক্ষপুটে আমাদের কোনো প্রিয়জনকে হরণ করিয়া যায় তবে হে পরিণামের আশ্রয়, করজোড়ে সমস্ত হৃদয়ের সহিত তোমারই প্রতি তাহাকে সমর্পণ করিলাম। জীবনে যে তোমার ছিল মৃত্যুতেও সে তোমারই। আমি তাহার সহিত আমার বলিয়া যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলাম তাহা ক্ষণকালের— তাহা ছিন্ন হইয়াছে। আজ তোমারই মধ্যে তাহার সহিত যে সম্বন্ধ স্বীকার করিতেছি তাহার আর বিচ্ছেদ নাই। সেও তোমার ক্রোড়ে আছে, আমিও তোমার ক্রোড়ে রহিয়াছি। অসীম জগদরণ্যের মধ্যে আমিও হারাই নাই, সেও হারায় নাই— তোমার মধ্যে অতি নিকটে অতি নিকটতম স্থানে তাহার সাড়া পাইতেছি।

বিগত বৎসর যদি আমার কোনো চিরপালিত অপূর্ণ আশাকে শাখাচ্ছিন্ন করিয়া থাকে তবে, হে পরিপূর্ণস্বরূপ, অদ্য নতমস্তকে একান্ত ধৈর্যের সহিত তাহাকে তোমার নিকটে সমর্পণ করিয়া ক্ষত উদ্যমে পুনরায় বারিসেচন করিবার জন্য প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। তুমি আমাকে পরাভূত হইতে দিয়ো না। একদিন তোমার অভাবনীয় কৃপাবলে আমার অসিদ্ধ সাধনগুলিকে অপূর্বভাবে সম্পূর্ণ করিয়া স্বহস্তে আমার ললাটে স্থাপনপূর্বক আমাকে বিস্মিত ও চরিতার্থ করিবে এই আশাই আমি হৃদয়ে গ্রহণ করিলাম।

যে-কোনো ক্ষতি, যে-কোনো অন্যায়, যে-কোনো অবমাননা বিগত বৎসর আমার মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া থাকুক, কার্যে যে-কোনো বাধা, প্রণয়ে যে-কোনো আঘাত, লোকের নিকট হইতে যে-কোনো প্রতিকূলতা দ্বারা আমাকে পীড়ন করিয়া থাক— তবু তাহাকে আমার মস্তকের উপরে তোমারই আশিস-হস্তস্পর্শ বলিয়া অদ্য তাহাকে প্রণাম করিতেছি। গত বৎসরের প্রথম দিন নীরব স্মিতমুখে তাহার বস্ত্রাঞ্চলের মধ্যে তোমার নিকট হইতে আমার জন্য কী লইয়া আসিয়াছিল সেদিন তাহা আমাকে জানায় নাই— আমাকে কী যে দান করিল আজ তাহাও আমাকে বলিয়া গেল না, মুখ আবৃত করিয়া নিঃশব্দপদে চলিয়া গেল। দিনে রাত্রিতে আলোকে অন্ধকারে তাহার সুখদুঃখের দূতগুলি আমার হৃদয়গুহাতলে কী সঞ্চিত করিয়া গেল সে-সম্বন্ধে আমার অনেক ভ্রম আছে, আমি নিশ্চয় কিছুই জানি না— একদিন তোমার আদেশে ভাণ্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইলে যাহা দেখিব তাহার জন্য আগে হইতেই অদ্য সন্ধ্যায় বর্ষাবসানকে ভক্তির সহিত প্রণতি করিয়া কৃতজ্ঞতার বিদায়-সম্ভাষণ জানাইতেছি।

এই বর্ষশেষের শুভ সন্ধ্যায় হে নাথ, তোমার ক্ষমা মস্তকে লইয়া সকলকে ক্ষমা করি, তোমার প্রেম হৃদয়ে অনুভব করিয়া সকলকে প্রীতি করি, তোমার মঙ্গলভাব ধ্যান করিয়া সকলের মঙ্গল কামনা করি। আগামী বর্ষে যেন ধৈর্যের সহিত সহ্য করি, বীর্যের সহিত কর্ম করি, আশার সহিত প্রতীক্ষা করি, আনন্দের সহিত ত্যাগ করি এবং ভক্তির সহিত সর্বদা সর্বত্র সঞ্চরণ করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্

[বর্ষশেষ] ১৩০৮

নববর্ষ

যে অক্ষর পুরুষকে আশ্রয় করিয়া

অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সম্বৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি,

দিন এবং রাত্রি, পক্ষ এবং মাস, ঋতু এবং সম্বৎসর বিধৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে, তিনি অদ্য নববর্ষের প্রথম প্রাতঃসূর্যকিরণে আমাদিগকে স্পর্শ করিলেন। এই স্পর্শের দ্বারা তিনি তাঁহার জ্যোতির্লোকে তাঁহার আনন্দলোকে আমাদিগকে নববর্ষের আহ্বান প্রেরণ করিলেন। তিনি এখনই কহিলেন, পুত্র, আমার এই নীলাম্বরবেষ্টিত তৃণধান্যশ্যামল ধরণীতলে তোমাকে জীবন ধারণ করিতে বর দিলাম— তুমি আনন্দিত হও, তুমি বর লাভ করো।

প্রান্তরের মধ্যে পুণ্যনিকেতনে নববর্ষের প্রথম নির্মল আলোকের দ্বারা আমাদের অভিষেক হইল। আমাদের নবজীবনের অভিষেক। মানবজীবনের যে মহোচ্চ সিংহাসনে বিশ্ববিধাতা আমাদিগকে বসিতে স্থান দিয়াছেন তাহা আজ আমরা নবগৌরবে অনুভব করিব। আমরা বলিব, হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, এই যে অরুণরাগরক্ত নীলাকাশের তলে আমরা জাগ্রত হইলাম আমরা ধন্য। এই যে চিরপুরাতন অন্নপূর্ণা বসুন্ধরাকে আমরা দেখিতেছি আমরা ধন্য। এই যে গীতগন্ধবর্ণস্পন্দনে আন্দোলিত বিশ্বসরোবরের মাঝখানে আমাদের চিত্তশতদল জ্যোতিঃপরিপ্লাবিত অনন্তের দিকে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে আমরা ধন্য। অদ্যকার প্রভাতে এই যে জ্যোতির্ধারা আমাদের উপর বর্ষিত হইতেছে ইহার মধ্যে তোমার অমৃত আছে, তাহা ব্যর্থ হইবে না, তাহা আমরা গ্রহণ করিব; এই যে বৃষ্টিধৌত বিশাল পৃথিবীর বিস্তীর্ণ শ্যামলতা ইহার মধ্যে তোমার অমৃত ব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহা ব্যর্থ হইবে না, তাহা আমরা গ্রহণ করিব। এই যে নিশ্চল মহাকাশ আমাদের মস্তকের উপর তাহার স্থির হস্ত স্থাপন করিয়াছে তাহা তোমারই অমৃতভারে নিস্তব্ধ, তাহা ব্যর্থ হইবে না, তাহা আমরা গ্রহণ করিব।

এই মহিমান্বিত জগতের অদ্যকার নববর্ষদিন আমাদের জীবনের মধ্যে যে গৌরব বহন করিয়া আনিল, এই পৃথিবীতে বাস করিবার গৌরব, আলোকে বিচরণ করিবার গৌরব, এই আকাশতলে আসীন হইবার গৌরব, তাহা যদি পরিপূর্ণভাবে চিত্তের মধ্যে গ্রহণ করি তবে আর বিষাদ নাই, নৈরাশ্য নাই, ভয় নাই, মৃত্যু নাই। তবে সেই ঋষিবাক্য বুঝিতে পারি—

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

কেই বা শরীরচেষ্টা করিত, কেই বা প্রাণধারণ করিত যদি এই আকাশে আনন্দ না থাকিতেন।

আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া তিনি আনন্দিত, তাই আমার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত, আমার রক্ত প্রবাহিত, আমার চেতনা তরঙ্গিত। তিনি আনন্দিত, তাই সূর্যলোকের বিরাট যজ্ঞহোমে অগ্নি-উৎস উৎসারিত; তিনি আনন্দিত, তাই পৃথিবীর সর্বাঙ্গ পরিবেষ্টন করিয়া তৃণদল সমীরণে কম্পিত হইতেছে; তিনি আনন্দিত, তাই গ্রহে নক্ষত্রে আলোকের অনন্ত উৎসব। আমার মধ্যে তিনি আনন্দিত, তাই আমি আছি— তাই আমি গ্রহতারকার সহিত লোকলোকান্তরের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত— তাহার আনন্দে আমি অমর, সমস্ত বিশ্বের সহিত আমার সমান মর্যাদা।

তাঁহার প্রতিনিমেষের ইচ্ছাই আমাদের প্রতিমুহূর্তের অস্তিত্ব, আজ নববর্ষের দিনে এই কথা যদি উপলব্ধি করি— আমাদের মধ্যে তাঁহার অক্ষয় আনন্দ যদি স্তব্ধ গভীরভাবে অন্তরে উপভোগ করি— তবে সংসারের কোনো বাহ্য ঘটনাকে আমার চেয়ে প্রবলতর মনে করিয়া অভিভূত হইব না— কারণ ঘটনাবলী তাহার সুখদুঃখ বিরহমিলন লাভক্ষতি জন্মমৃত্যু লইয়া আমাদিগকে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করে ও অপসারিত হইয়া যায়। বৃহত্তম বিপদই বা কতদিনের, মহত্তম দুঃখই বা কতখানি, দুঃসহতম বিচ্ছেদই বা আমাদের কতটুকু হরণ করে— তাঁহার আনন্দ থাকে; দুঃখ সেই আনন্দেরই রহস্য, মৃত্যু সেই আনন্দেরই রহস্য। এই রহস্য ভেদ না করিতে পারি, নাই পারিলাম— আমাদের বোধ-শক্তিতে এই শাশ্বত আনন্দ এত বিপরীত আকারে এত বিবিধভাবে কেন প্রতীয়মান হইতেছে তাহা নাই জানিলাম— কিন্তু ইহা যদি নিশ্চয় জানি, এক মুহূর্ত সর্বত্র সেই পরিপূর্ণ আনন্দ না থাকিলে সমস্তই তৎক্ষণাৎ ছায়ার

ন্যায় বিলীন হইয়া যায়— যদি জানি,

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

তবে—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

নিজের মধ্যে ও নিজের বাহিরে সেই ব্রহ্মের আনন্দ জানিয়া কোনো অবস্থাতেই আর ভয় পাওয়া যায় না।

স্বার্থের জড়তা এবং পাপের আবর্ত ব্রহ্মের এই নিত্যবিরাজমান আনন্দের অনুভূতি হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করে। তখন সহস্র রাজা আমাদের নিকট হইতে কর গ্রহণে উদ্যত হয়, সহস্র প্রভু আমাদিগকে সহস্র কাজে চারি দিকে ঘূর্ণ্যমান করে। তখন যাহা-কিছু আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাই বড়ো হইয়া উঠে— তখন সকল বিরহই ব্যাকুল, সকল বিপদই বিভ্রান্ত করিয়া তোলে— সকলকেই চূড়ান্ত বলিয়া ভ্রম হয়। লোভের বিষয় সম্মুখে উপস্থিত হইলেই মনে হয় তাহাকে না পাইলে নয়, বাসনার বিষয় উপস্থিত হইলেই মনে হয় ইহাকে পাইলেই আমার চরম সার্থকতা। ক্ষুদ্রতার এই-সকল অবিশ্রাম ক্ষোভে ভূমা আমাদের নিকটে অগোচর হইয়া থাকেন, এবং প্রত্যেক ক্ষুদ্র ঘটনা আমাদিগকে প্রতিপদে অপমানিত করিয়া যায়।

সেইজন্যই আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা এই যে,

অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

আমাকে অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যাও ; প্রতি নিমেষের খণ্ডতা হইতে তোমার অনন্ত পরিপূর্ণতার মধ্যে আমাকে উপনীত করো ; অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও— অহংকারের যে অন্তরাল, বিশ্বজগৎ আমার সম্মুখে যে স্বাতন্ত্র্য লইয়া দাঁড়ায়, আমাকে এবং জগৎকে তোমার ভিতর দিয়া না দেখিবার যে অন্ধকার তাহা হইতে আমাকে মুক্ত করো ; মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও— আমার প্রবৃত্তি আমাকে মৃত্যুদোলায় চড়াইয়া দোল দিতেছে, মুহূর্তকাল অবসর দিতেছে না ; আমার মধ্যে আমার ইচ্ছাগুলাকে খর্ব করিয়া আমার মধ্যে তোমার আনন্দকে প্রকাশমান করো, সেই আনন্দই অমৃতলোক।

আজিকার নববর্ষদিনে ইহাই আমাদের বিশেষ প্রার্থনা। সত্য, আলোক ও অমৃতের জন্য আমরা করপুট করিয়া দাঁড়াইয়াছি। বলিতেছি—

আবিরাবীর্ম এধি।

হে স্বপ্রকাশ, তুমি আমাদের নিকটে প্রকাশিত হও।

অন্তরে বাহিরে তুমি উদ্ভাসিত হইলেই, প্রবৃত্তির দাসত্ব, জগতের দৌরাত্ম্য কোথায় চলিয়া যায়— তখন তোমার মধ্যে সমস্ত দেশকালের একটি অনবচ্ছিন্ন সামঞ্জস্য একটি পরিপূর্ণ সমাপ্তি দেখিয়া সুগভীর শান্তির মধ্যে আমরা নিমগ্ন ও নিস্তব্ধ হইয়া যাই। তখন যে চেষ্টাহীন বলে সমস্ত জগৎ সহজে বিধৃত তাহা আমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়, যে চেষ্টাহীন সৌন্দর্যে নিখিল ভুবন পরস্পর গ্রথিত তাহা আমাদের জীবনে আবির্ভূত হয়। তখন আমি যে তোমাকে আত্মসর্মপণ করিতেছি এ কথা মনে থাকে না— তোমার সমস্ত জগতের একসঙ্গে তুমিই আমাকে লইতেছ এই কথাই আমার মনে হয়।

সেই স্বপ্রকাশ যতদিন না আমাদের নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিবেন ততদিন যেন নিজের ভিতর হইতে তাঁহার দিকে বাহির হইবার একটা দ্বার উন্মুক্ত থাকে। সেই পথ দিয়া প্রত্যহ প্রভাতে তাঁহার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া আসিতে পারি। আমাদের জীবনে একটা দিনের সহিত আর-একটা দিনের যে বন্ধন সে যেন শুধু স্বার্থের বন্ধন না হয়, জড় অভ্যাস-সূত্রের বন্ধন না হয়— একটা বৎসরের সহিত আর-একটা বৎসরকে যেন প্রাত্যহিক নিবেদনের দ্বারা তাঁরই সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারি। এমন কোনো সূত্রে যেন মানবজীবনের দুর্লভ মুহূর্তগুলিকে না বাঁধিতে থাকি যাহা মৃত্যুর স্পর্শমাত্রে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। জীবনের যে বৎসরটা গেছে তাহা পূজার পদ্মের ন্যায় তাহাকে উৎসর্গ করিতে পারি নাই— তাহার তিন শত পঁয়ষট্টি দল দিনে দিনে ছিন্ন করিয়া লইয়া

পঙ্কের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছি। অদ্য বৎসরের অনুদ্‌ঘাটিত প্রথম মুকুল সূর্যের আলোকে মাথা তুলিয়াছে ইহাকে আমরা খণ্ডিত করিব না, সৌন্দর্যে সৌগন্ধ্যে শুভ্রতায় ইহাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিব। তাহা কখনোই অসাধ্য নহে— সে শক্তি আমাদের মধ্যে আছে—

নাত্মানমবমন্যেত

নিজেকে অপমান অবজ্ঞা করিয়ো না।

ন হ্যাত্মপরিভূতস্য ভূতির্ভবতি শোভনা।

আপনাকে যে ব্যক্তি দীন বলিয়া অবমান করে তাহার কখনোই শোভন ঐশ্বর্য লাভ হয় না।

ধর্মের যে আদর্শ সর্বশ্রেষ্ঠ, যে আদর্শে ব্রহ্মের জ্যোতি বিশুদ্ধভাবে প্রতিফলিত হয়, তাহা কল্পনাগম্য, অসাধ্য নহে, তাহা রক্ষা করিবার তেজ আমাদের মধ্যে আছে; নিজেকে জাগ্রত রাখিবার শক্তি আমাদের আছে— এবং জাগ্রত থাকিলে অন্যায় অসত্য হিংসা ঈর্ষা প্রলোভন দ্বারের নিকটে আসিয়া দূরে চলিয়া যায়। আমরা ভয় ত্যাগ করিতে পারি, হীনতা পরিহার করিতে পারি, আমরা প্রাণ বিসর্জন করিতে পারি— এ ক্ষমতা আমাদের প্রত্যেকের আছে। কেবল দীনতায় সেই শক্তিকে অবিশ্বাস করি বলিয়া তাহাকে ব্যবহার করিতে পারি না। সেই শক্তি আমাদিগকে কী ভূমানন্দে, কী চরম সার্থকতায় লইয়া যাইতে পারে তাহা জানি না বলিয়াই আত্মার সেই শক্তিকে আমরা স্বার্থে এবং ব্যর্থ চেষ্টায় এবং পাপের আয়োজনে নিযুক্ত করি। মনে করি অর্থলাভেই আমাদের চরম সুখ, বাসনা তৃপ্তিতেই আমাদের পরমানন্দ, ইচ্ছার বাধা মোচনেই আমাদের পরম মুক্তি। আমাদের যে-শক্তি চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে তাহাকে একাগ্রধারায় ব্রহ্মের দিকে প্রবাহিত করিয়া দিলে জীবনের কর্ম সহজ হয়, সুখদুঃখ সহজ হয়, মৃত্যু সহজ হয়। সেই শক্তি আমাদিগকে বর্ষার স্রোতের মতো অনায়াসেই বহন করিয়া লইয়া যায়; দুঃখশোক বিপদ-আপদ বাধাবিঘ্ন, তাহার পথের সম্মুখে শরবনের মতো মাথা নত করিয়া দেয়, তাহাকে প্রতিহত করিতে পারে না।

পুনর্বার বলিতেছি, এই শক্তি আমাদের মধ্যে আছে। কেবল, চারি দিকে ছড়াইয়া আছে বলিয়াই তাহার উপর নিজের সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া গতিলাভ করিতে পারি না। নিজেকে প্রত্যহ নিজেই বহন করিতে হয়। প্রত্যেক কাজ আমাদের স্কন্ধের উপর আসিয়া পড়ে; প্রত্যেক কাজের আশানৈরাশ্য-লাভক্ষতির সমস্ত ঋণ নিজেকে শেষ কড়া পর্যন্ত শোধ করিতে হয়। স্রোতের উপর যেমন মাঝির নৌকা থাকে এবং নৌকার উপরেই তাহার সমস্ত বোঝা থাকে তেমনি ব্রহ্মের প্রতি যাঁহার চিত্ত একাগ্রভাবে ধাবমান, তাঁহার সমস্ত সংসার এই পরিপূর্ণ ভাবের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া যায় এবং কোনো বোঝা তাঁহার স্কন্ধকে পীড়িত করে না।

নববর্ষের প্রাতঃসূর্যালোকে দাঁড়াইয়া অদ্য আমাদের হৃদয়কে চার দিক হইতে আহ্বান করি। ভারতবর্ষের যে পৈতৃক মঙ্গলশঙ্খ গৃহের প্রান্তে উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া আছে সমস্ত প্রাণের নিশ্বাস তাহাতে পরিপূর্ণ করি— সেই মধুর গম্ভীর শঙ্খধ্বনি শুনিলে আমাদের বিক্ষিপ্ত চিত্ত অহংকার হইতে, স্বার্থ হইতে, বিলাস হইতে, প্রলোভন হইতে ছুটিয়া আসিবে। আজ শতধারা একধারা হইয়া গোমুখীর মুখনিঃসৃত সমুদ্রবাহিনী গঙ্গার ন্যায় প্রবাহিত হইবে— তাহা হইলে মুহূর্তের মধ্যে প্রান্তরশায়ী এই নির্জন তীর্থ যথার্থই হরিদ্বার তীর্থ হইয়া উঠিবে।

হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, অদ্য নববর্ষের প্রভাতে তোমার জ্যোতিঃস্নাত তরুণ সূর্য পুরোহিত হইয়া নিঃশব্দে আমাদের আলোকের অভিষেক সম্পন্ন করিল। আমাদের ললাটে আলোক স্পর্শ করিয়াছে। আমাদের দুই চক্ষু আলোকে ধৌত হইয়াছে। আমাদের পথ আলোকে রঞ্জিত হইয়াছে। আমাদের সদ্যোজাগ্রত হৃদয় ব্রতগ্রহণের জন্য তোমার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়াছে। যে শরীরকে অদ্য তোমার সমীরণ স্পর্শ করিল তাহাকে যেন প্রতিদিন পবিত্র রাখিয়া তোমার কর্মে নিযুক্ত করি। যে মস্তকে তোমার প্রভাতকিরণ বর্ষিত হইল সে মস্তককে ভয় লজ্জা ও হীনতার অবনতি হইতে রক্ষা করিয়া তোমারই পূজায় প্রণত করি। তোমার নামগানধারা আজ প্রত্যুষে যে হৃদয়কে পুণ্যবারিতে স্নান করাইল, সে যেন আনন্দে পাপকে পরিহার করিতে পারে, আনন্দে তোমার কল্যাণকর্মে জীবনকে উৎসর্গ করিতে

পারে, আনন্দে দারিদ্র্যকে ভূষণ করিতে পারে, আনন্দে দুঃখকে মহীয়ান্ করিতে পারে, এবং আনন্দে মৃত্যুকে অমৃতরূপে বরণ করিতে পারে। আজিকার প্রভাতকে কালি যেন বিস্মৃত না হই। প্রতিদিনের প্রাতঃসূর্য যেন আমাদিগকে লজ্জিত না দেখে ; তাহার নির্মল আলোক আমাদের নির্মলতার, তাহার তেজ আমাদের তেজের সাক্ষী হইয়া যায়— এবং প্রতি সন্ধ্যাকালে আমাদের প্রত্যেক দিনটিকে নির্মল অর্ঘ্যের ন্যায় তাহার রক্তিম স্বর্ণথালিতে বহন করিয়া তোমার সিংহাসনের সম্মুখে স্থাপন করিতে পারে। হে পিতা, আমার মধ্যে নিয়তকাল তোমার যে আনন্দ স্তব্ধ হইয়া আছে, যে আনন্দে তুমি আমাকে নিমেষকালও পরিত্যাগ কর নাই, যে আনন্দে তুমি আমাকে জগতে জগতে রক্ষা করিতেছ, যে আনন্দে সূর্যোদয় প্রতিদিনই আমার নিকটে অপূর্ব, সূর্যাস্ত প্রতিসন্ধ্যায় আমার নিকট রমণীয়, যে আনন্দে অজ্ঞাত ভুবন আমার আত্মীয়, অগণ্য নক্ষত্র আমার সুপ্তরাত্রির মণিমাল্য, যে আনন্দে জন্মমাত্রেই আমি বহুলোকের প্রিয় পরিচিত, সমস্ত অতীত মানবের মনুষ্যত্বের উত্তরাধিকারী, যে আনন্দে দুঃখ নৈরাশ্য বিপদ মৃত্যু কিছুই লেশমাত্র নিরর্থক নহে— আমি যেন প্রবৃত্তির ক্ষোভে, পাপের লজ্জায় আমার মধ্যে তোমার সেই আনন্দ-মন্দিরের দ্বার নিজের নিকটে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া পথের পঙ্কে যদৃচ্ছা লুণ্ঠিত হওয়াকেই আমার সুখ আমার স্বাধীনতা বলিয়া ভ্রম না করি। জগৎ তোমার জগৎ, আলোক তোমার আলোক, প্রাণ তোমার নিশ্বাস, এই কথা স্মরণে রাখিয়া জীবনধারণের যে পরম পবিত্র গৌরব তাহার অধিকারী হই, অস্তিত্বে যে অপার অজ্ঞেয় রহস্য তাহা বহন করিবার উপযুক্ত হই— এবং প্রতিদিন তোমাকে এই বলিয়া ধ্যান করি—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।
বিশ্বসবিতা এই-সমস্ত ভূলোক ভুবর্লোক স্বর্লোককে যেমন প্রত্যেক নিমেষেই প্রকাশের মধ্যে প্রেরণ করিতেছেন— তেমনি তিনি আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রতি নিমেষে প্রেরণ করিতেছেন— তাঁহার প্রেরিত এই জগৎ দিয়া সেই জগদীশ্বরকে উপলব্ধি করি— তাঁহার প্রেরিত এই বুদ্ধি দিয়া সেই চেতনস্বরূপকে ধ্যান করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্

[বৈশাখ] ১৩০৯

উৎসবের দিন

সকালবেলায় অন্ধকার ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া আলোক যেমনি ফুটিয়া বাহির হয়, অমনি বনে-উপবনে পাখিদের উৎসব পড়িয়া যায়। সে-উৎসব কিসের উৎসব ? কেন এই-সমস্ত বিহঙ্গের দল নাচিয়া-কুঁদিয়া গান গাহিয়া এমন অস্থির হইয়া উঠে ? তাহার কারণ এই, প্রতিদিন প্রভাতে আলোকের স্পর্শে পাখিরা নূতন করিয়া আপনার প্রাণশক্তি অনুভব করে। দেখিবার শক্তি, উড়িবার শক্তি, খাদ্যসন্ধান করিবার শক্তি তাহার মধ্যে জাগ্রত হইয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়া তোলে— আলোকে উদ্ভাসিত এই বিচিত্র বিশ্বের মধ্যে সে আপনার প্রাণবান গতিবান চেতনাবান পক্ষিজন্ম সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া অন্তরের আনন্দকে সংগীতের উৎসে উৎসারিত করিয়া দেয়।

জগতের যেখানে অব্যাহতশক্তির প্রচুর প্রকাশ, সেইখানেই যেন মূর্তিমান উৎসব। সেইজন্য হেমন্তের সূর্যকিরণে অগ্রহায়ণের পক্বশস্যসমুদ্রের সোনার উৎসব হিল্লোলিত হইতে থাকে— সেইজন্য আম্রমঞ্জরীর নিবিড় গন্ধে ব্যাকুল নববসন্তে পুষ্পবিচিত্র কুঞ্জবনে উৎসবের উৎসাহ উদ্দাম হইয়া উঠে। প্রকৃতির মধ্যে এইরূপে আমরা নানাস্থানে নানাভাবে শক্তির জয়োৎসব দেখিতে পাই।

মানুষের উৎসব কবে ? মানুষ যেদিন আপনার মনুষ্যত্বের শক্তি বিশেষভাবে স্মরণ করে, বিশেষভাবে উপলব্ধি করে, সেইদিন। যেদিন আমরা আপনাদিগকে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের দ্বারা চালিত করি, সেদিন না— যেদিন আমরা আপনাদিগকে সাংসারিক সুখদুঃখের দ্বারা ক্ষুব্ধ করি, সেদিন

না— যেদিন প্রাকৃতিক নিয়মপরম্পরার হস্তে আপনাদিগকে ক্রীড়াপুত্তলির মতো ক্ষুদ্র ও জড়ভাবে অনুভব করি, সেদিন আমাদের উৎসবের দিন নহে ; সেদিন তো আমরা জড়ের মতো উদ্ভিদের মতো সাধারণ জন্তুর মতো—সেদিন তো আমরা আমাদের নিজের মধ্যে সর্বজয়ী মানবশক্তি উপলব্ধি করি না— সেদিন আমাদের আনন্দ কিসের ? সেদিন আমরা গৃহে অবরুদ্ধ, সেদিন আমরা কর্মে ক্লিষ্ট—সেদিন আমরা উজ্জ্বলভাবে আপনাকে ভূষিত করি না—সেদিন আমরা উদারভাবে কাহাকেও আহ্বান করি না— সেদিন আমাদের ঘরে সংসারচক্রের ঘর্ঘর-ধ্বনি শোনা যায়, কিন্তু সংগীত শোনা যায় না।

প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র দীন একাকী— কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।

হে ভ্রাতৃগণ, আজ আমি তোমাদের সকলকে ভাই বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছি—আজ, আলোক জ্বলিয়াছে, সংগীত ধ্বনিতেছে, দ্বার খুলিয়াছে— আজ মনুষ্যত্বের গৌরব আমাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে— আজ আমরা কেহ একাকী নহি— আজ আমরা সকলে মিলিয়া এক— আজ অতীত সহস্র বৎসরের অমৃতবাণী আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে— আজ অনাগত সহস্র বৎসর আমাদের কণ্ঠস্বরকে বহন করিবার জন্য সম্মুখে প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

আজ আমাদের কিসের উৎসব ? শক্তির উৎসব। মানুষের মধ্যে কী আশ্চর্যশক্তি আশ্চর্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে ! আপনার সমস্ত ক্ষুদ্র প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া মানুষ কোন্ ঊর্ধ্বে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। জ্ঞানী জ্ঞানের কোন্ দুর্লক্ষ্য দুর্গমতার মধ্যে ধাবমান হইয়াছে, প্রেমিক প্রেমের কোন্ পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে, কর্মী কর্মের কোন্ অশ্রান্ত দুঃসাধ্য সাধনের মধ্যে অকুতোভয়ে প্রবেশ করিয়াছে ? জ্ঞানে প্রেমে কর্মে মানুষ যে অপরিমেয় শক্তিকে প্রকাশ করিয়াছে, আজ আমরা সেই শক্তির গৌরব স্মরণ করিয়া উৎসব করিব। আজ আমরা আপনাকে, ব্যক্তিবিশেষ নহে, কিন্তু মানুষ বলিয়া জানিয়া ধন্য হইব।

মানুষের সমস্ত প্রয়োজনকে দুরূহ করিয়া দিয়া ঈশ্বর মানুষের গৌরব বাড়াইয়াছেন। পশুর জন্য মাঠ ভরিয়া তৃণ পড়িয়া আছে, মানুষকে অন্নের জন্য প্রাণপণ করিয়া মরিতে হয়। প্রতিদিন আমরা যে অন্নগ্রহণ করিতেছি, তাহার পশ্চাতে মানুষের বুদ্ধি মানুষের উদ্যম মানুষের উদ্‌যোগ রহিয়াছে— আমাদের অন্নমুষ্টি আমাদের গৌরব। পশুর গাত্রবস্ত্রের অভাব একদিনের জন্যও নাই, মানুষ উলঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। শক্তির দ্বারা আপন অভাবকে জয় করিয়া মানুষকে আপন অঙ্গ আচ্ছাদন করিতে হইয়াছে— গাত্রবস্ত্র মনুষ্যত্বের গৌরব। আত্মরক্ষার উপায় সঙ্গে লইয়া মানুষ ভূমিষ্ঠ হয় নাই, আপন শক্তির দ্বারা তাহাকে আপন অস্ত্র নির্মাণ করিতে হইয়াছে— কোমল ত্বক্ এবং দুর্বল শরীর লইয়া মানুষ যে আজ সমস্ত প্রাণিসমাজের মধ্যে আপনাকে জয়ী করিয়াছে, ইহা মানবশক্তির গৌরব। মানুষকে দুঃখ দিয়া ঈশ্বর মানুষকে সার্থক করিয়াছেন— তাহাকে নিজের পূর্ণশক্তি অনুভব করিবার অধিকারী করিয়াছেন।

মানুষের এই শক্তি যদি নিজের প্রয়োজন সাধনের সীমার মধ্যেই সার্থকতা লাভ করিত, তাহা হইলেও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত, তাহা হইলেও আমরা জগতের সমস্ত জীবের উপরে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিতে পারিতাম। কিন্তু আমাদের শক্তির মধ্যে কোন্ মহাসমুদ্র হইতে এ কী জোয়ার আসিয়াছে— সে আমাদের সমস্ত অভাবের কূল ছাপাইয়া সমস্ত প্রয়োজনকে লঙ্ঘন করিয়া অহর্নিশি অক্লান্ত উদ্যমের সহিত এ কোন্ অসীমের রাজ্যে কোন্ অনির্বচনীয় আনন্দের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। যাহাকে জানিবার জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিতেছে, তাহাকে জানিবার ইহার কী প্রয়োজন। যাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিবার জন্য ইহার সমস্ত অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে তাহার সহিত ইহার আবশ্যকের সম্বন্ধ কোথায়। যাহার কর্ম করিবার জন্য এ আপনার আরাম, স্বার্থ, এমন-কি, প্রাণকে পর্যন্ত তুচ্ছ করিতেছে, তাহার সঙ্গে ইহার দেনাপাওনার হিসাব লেখা থাকিতেছে কই। আশ্চর্য। ইহাই আশ্চর্য। আনন্দ। ইহাই আনন্দ। যেখানটা মানুষের সমস্ত আবশ্যকসীমার বাহিরে

চলিয়া গেছে, সেইখানেই মানুষের গভীরতম সর্বোচ্চতম শক্তি সর্বদাই আপনাকে স্বাধীন আনন্দে উধাও করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। জগতের আর কোথাও ইহার কোনো তুলনা দেখি না। মনুষ্যশক্তির এই প্রয়োজনাতীত পরম গৌরব অদ্যকার উৎসবে আনন্দসংগীতে ধ্বনিত হইতেছে। এই শক্তি অভাবের উপরে জয়ী, ভয়শোকের উপরে জয়ী, মৃত্যুর উপরে জয়ী। আজ অতীত-ভবিষ্যতের সুমহান মানবলোকের দিকে দৃষ্টিস্থাপনপূর্বক মানবাত্মার মধ্যে এই অভ্রভেদী চিরন্তনশক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাকে সার্থক করিব।

একদা কত সহস্র-বৎসর পূর্বে মানুষ এই কথা বলিয়াছে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি, যিনি জ্যোতির্ময়, যিনি অন্ধকারের পরপারবর্তী।

এই প্রত্যক্ষ পৃথিবীতে ইহাই আমাদের জানা আবশ্যক যে, কোথায় আমাদের খাদ্য, কোথায় আমাদের খাদক, কোথায় আমাদের আরাম, কোথায় আমাদের ব্যাঘাত— কিন্তু এই সমস্ত জানাকে বহুদূর পশ্চাতে ফেলিয়া মানুষ চিররহস্য অন্ধকারের এ কোন্ পরপারে, এ কোন্ জ্যোতির্লোকে কিসের প্রত্যাশায় চলিয়া গেছে। মানুষ এই যে তাহার সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের অভ্যন্তরেও সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে জানিয়াছে, আজ আমরা মানুষের সেই আশ্চর্য জ্ঞানের গৌরব লইয়া উৎসব করিতে বসিয়াছি। যে জ্ঞানের শক্তি কোনো সংকীর্ণতা কোনো নিত্যনৈমিত্তিক আবশ্যকের মধ্যে বদ্ধ থাকিতে চাহে না, যে জ্ঞানের শক্তি কেবলমাত্র মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিবার জন্য সীমাহীনের মধ্যে পরম সাহসের সহিত আপন পক্ষ বিস্তার করিয়া দেয়, যে তেজস্বী জ্ঞান আপন শক্তিকে কোনো প্রয়োজনসাধনের উপায়রূপে নহে, পরন্তু চরমশক্তিরূপেই অনুভব করিবার জন্য অগ্রসর— মনুষ্যত্বের মধ্যে অদ্য আমরা সেই জ্ঞান সেই শক্তিকে স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইব।

কত-সহস্র বৎসর পূর্বে মানুষ একদা এই কথা উচ্চারণ করিয়াছে—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কিছু হইতেই ভয় পান না।

এই পৃথিবীতে যেখানে প্রবল দুর্বলকে পীড়ন করিতেছে, যেখানে ব্যাধি-বিচ্ছেদ-মৃত্যু প্রতিদিনের ঘটনা, বিপদ যেখানে অদৃশ্য থাকিয়া প্রতি পদক্ষেপে আমাদের প্রতীক্ষা করে এবং প্রতিকারের উপায় যেখানে অধিকাংশস্থলে আমাদের আয়ত্তাধীন নহে, সেখানে মানুষ সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের ঊর্ধ্বে মস্তক তুলিয়া এ কী কথা বলিয়াছে যে, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন! আজ আমরা দুর্বল মানুষের মুখের এই প্রবল অভয়বাণী লইয়া উৎসব করিতে বসিয়াছি। সহস্রশীর্ষ ভয়ের করাল কবলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে মানুষ অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারিয়াছে, ব্রহ্ম আছেন, ভয় নাই— অদ্য আপনাকে সেই মানুবের অন্তর্গত জানিয়া গৌরব লাভ করিব।

বহুসহস্রবৎসর পূর্বের উচ্চারিত এই বাণী আজিও ধ্বনিত হইতেছে—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতর যদয়মাত্মা।

অন্তরতর এই যে আত্মা, ইনি এই পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সমস্ত হইতেই প্রিয়।

সংসারের সমস্ত স্নেহপ্রেমের সামগ্রীর মধ্যে মানুষের যে প্রেম সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয় নাই, সংসারের সমস্ত প্রিয়পদার্থের অন্তরে তাহার অন্তরতর যে প্রিয়তম, যিনি সমস্ত আত্মীয়পরের অন্তরতর, যিনি সমস্ত দূর-নিকটের অন্তরতম তাঁহার প্রতি যে প্রেম এমন প্রবল আবেগে এমন অসংশয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে— আমরা জানি, মানুষের যে পরমতম প্রেম আপনার সমস্ত প্রিয়সামগ্রীকে এক মুহূর্তে বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়, মানুষের সেই পরমাশ্চর্য প্রেমশক্তির গৌরব অদ্য আমরা উপলব্ধি করিয়া উৎসব করিতে সমাগত হইয়াছি।

সন্তানের জন্য আমরা মানুষকে দুঃসাধ্যকর্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়াছি, অনেক জন্তুকেও সেরূপ দেখিয়াছি— স্বদেশীয়-স্বদলের জন্যও আমরা মানুষকে দুরূহ চেষ্টা প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি— পিপীলিকাকেও মধুমক্ষিকাকেও সেরূপ দেখিয়াছি। কিন্তু মানুষের কর্ম যেখানে আপনাকে, আপনার

সন্তানকে এবং আপনার দলকেও অতিক্রম করিয়া গেছে, সেইখানেই আমরা মনুষ্যত্বের পূর্ণশক্তির বিকাশে পরম গৌরব লাভ করিয়াছি। বুদ্ধদেবের করুণা সন্তানবাৎসল্য নহে, দেশানুরাগও নহে— বৎস যেমন গাভী-মাতার পূর্ণস্তন হইতে দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র অথবা মহৎ কোনো-শ্রেণীর স্বার্থপ্রবৃত্তি সেই করুণাকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে না। তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে। ইহাই পরিপূর্ণতার চিত্র, ইহাই ঐশ্বর্য। ঈশ্বর প্রয়োজনবশত নহে, শক্তির অপরিসীম প্রাচুর্যবশতই আপনাকে নির্বিশেষে নিয়তই বিশ্বরূপে দান করিতেছেন। মানুষের মধ্যেও যখন আমরা সেইরূপ শক্তির প্রয়োজনাতীত প্রাচুর্য ও স্বতঃপ্রবৃত্ত উৎসর্জন দেখিতে পাই, তখনই মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ বিশেষভাবে অনুভব করি। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্‌খে।
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবযে অপরিমাণং।
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসম্ভাবযে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং ॥
তিট্‌ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্ধো।
এতং সতিং অধিট্‌ঠেযং ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু ॥

মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন, এইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। ঊর্ধ্বদিকে, অধোদিকে, চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, হিংসাশূন্য, শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কি দাঁড়াইতে, কি চলিতে, কি বসিতে, কি শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে, এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে— ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।

এই যে ব্রহ্মবিহারের কথা ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন, ইহা মুখের কথা নহে, ইহা অভ্যস্ত নীতিকথা নহে— আমরা জানি, ইহা তাঁহার জীবনের মধ্য হইতে সত্য হইয়া উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা লইয়া অদ্য আমরা গৌরব করিব। এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণা, এই ব্রহ্মবিহার, এই সমস্ত-আবশ্যকের অতীত অহেতুক অপরিমেয় মৈত্রীশক্তি, মানুষের মধ্যে কেবল কথার কথা হইয়া থাকে নাই, ইহা কোনো-না-কোনো স্থানে সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই শক্তিকে আর আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না— এই শক্তি মনুষ্যত্বের ভাণ্ডারে চিরদিনের মতো সঞ্চিত হইয়া গেল। যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অপর্যাপ্ত দয়াশক্তির এমন সত্যরূপে বিকাশ হইয়াছে, আপনাকে সেই মানুষ জানিয়া উৎসব করিতেছি।

এই ভারতবর্ষে একদিন মহাসম্রাট অশোক তাঁহার রাজশক্তিকে ধর্মবিস্তারকার্যে মঙ্গলসাধনকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজশক্তির মাদকতা যে কী সুতীব্র তাহা আমরা সকলেই জানি— সেই শক্তি ক্ষুধিত অগ্নির মতো গৃহ হইতে গৃহান্তরে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে দেশ হইতে দেশান্তরে আপনার জ্বালাময়ী লোলুপ রসনাকে প্রেরণ করিবার জন্য ব্যগ্র। সেই বিশ্বলুব্ধ রাজশক্তিকে মহারাজ অশোক মঙ্গলের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন— তৃপ্তিহীন ভোগকে বিসর্জন দিয়া তিনি শ্রান্তিহীন সেবাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজত্বের পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয় ছিল না— ইহা যুদ্ধসজ্জা নহে, দেশজয় নহে, বাণিজ্যবিস্তার নহে— ইহা মঙ্গলশক্তির অপর্যাপ্ত প্রাচুর্য— ইহা সহসা চক্রবর্তী রাজাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সমস্ত রাজাড়ম্বরকে এক মুহূর্তে হীনপ্রভ করিয়া দিয়া সমস্ত মনুষ্যত্বকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কত বড়ো বড়ো রাজার বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত বিস্মৃত ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে— কিন্তু অশোকের মধ্যে এই মঙ্গলশক্তির মহান আবির্ভাব, ইহা আমাদের গৌরবের ধন হইয়া আজও আমাদের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিতেছে। মানুষের মধ্যে যাহা-কিছু সত্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহার গৌরব হইতে তাহার সহায়তা হইতে মানুষ আর কোনোদিন বঞ্চিত হইবে না। আজ মানুষের মধ্যে, সমস্ত-স্বার্থজয়ী এই অদ্ভুত মঙ্গলশক্তির মহিমা স্মরণ করিয়া আমরা পরিচিত-অপরিচিত সকলে মিলিয়া উৎসব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। মানুষের এই-সকল মহত্ত্ব আজ আমাদের দীনতমকে আমাদের

শ্রেষ্ঠতমের সহিত এক গৌরবের বন্ধনে মিলিত করিয়াছে। আজ আমরা মানুষের এই-সকল অবারিত সাধারণসম্পদের সমান অধিকারের সূত্রে ভাই হইয়াছি— আজ মনুষ্যত্বের মাতৃশালায় আমাদের ভ্রাতৃসম্মিলন।

ঈশ্বরের শক্তিবিকাশকে আমরা প্রভাতের জ্যোতিরুন্মেষের মধ্যে দেখিয়াছি, ফাল্গুনের পুষ্পপর্যাপ্তির মধ্যে দেখিয়াছি, মহাসমুদ্রের নীলাম্বুনৃত্যের মধ্যে দেখিয়াছি, কিন্তু সমগ্র মানবের মধ্যে যেদিন তাহার বিরাট বিকাশ দেখিতে সমাগত হই, সেইদিন আমাদের মহামহোৎসব। মনুষ্যত্বের মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা যে শত শত অভ্রভেদী শিখরমালায় জাগ্রত-বিরাজিত সেখানে সেই উত্তুঙ্গ শৈলাশ্রমে আমরা মানবমাহাত্ম্যের ঈশ্বরকে মানবসংঘের মধ্যে বসিয়া পূজা করিতে আসিয়াছি।

আমাদের ভারতবর্ষে সমস্ত উৎসবই এই মহান ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ কথা আমরা প্রতিদিন ভুলিতে বসিয়াছি। আমাদের জীবনের যে-সমস্ত ঘটনাকে উৎসবের ঘটনা করিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটাতেই আমরা বিশ্বমানবের গৌরব অর্পণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। জন্মোৎসব হইতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পর্যন্ত কোনোটাকেই আমরা ব্যক্তিগত ঘটনার ক্ষুদ্রতার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখি নাই। এই সকল উৎসবে আমরা সংকীর্ণতা বিসর্জন দিই— সেদিন আমাদের গৃহের দ্বার একেবারে উন্মুক্ত হইয়া যায়, কেবল আত্মীয়স্বজনের জন্য নহে, কেবল বন্ধুবান্ধবের জন্য নহে, রবাহূত-অনাহূতের জন্য। পুত্র যে জন্মগ্রহণ করে, সে আমার ঘরে নহে, সমস্ত মানুষের ঘরে। সমস্ত মানুষের গৌরবের অধিকারী হইয়া সে জন্মগ্রহণ করে। তাহার জন্ম-মঙ্গলের আনন্দে সমস্ত মানুষকে আহ্বান করিব না? সে যদি শুদ্ধমাত্র আমার ঘরে ভূমিষ্ঠ হইত, তবে তাহার মতো দীনহীন জগতে আর কে থাকিত। সমস্ত মানুষ যে তাহার জন্য অন্ন বস্ত্র আবাস ভাষা জ্ঞান ধর্ম প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। মানুষের অন্তরস্থিত সেই নিত্যচেতন মঙ্গলশক্তির ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সে যে এক মুহূর্তে ধন্য হইয়াছে। তাহার জন্ম উপলক্ষে একদিন গৃহের সমস্ত দ্বার খুলিয়া দিয়া যদি সমস্ত মানুষকে স্মরণ না করি, তবে কবে করিব। অন্য সমাজ যাহাকে গৃহের ঘটনা করিয়াছে, ভারতসমাজ তাহাকে জগতের ঘটনা করিয়াছে; এবং এই জগতের ঘটনাই জগদীশ্বরের পূর্ণমঙ্গল আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিবার যথার্থ অবকাশ। বিবাহব্যাপারকেও ভারতবর্ষ কেবলমাত্র পতিপত্নীর আনন্দমিলনের ঘটনা বলিয়া জানে না। প্রত্যেক মঙ্গলবিবাহকে মানবসমাজের এক-একটি স্তম্ভস্বরূপ জানিয়া ভারতবর্ষ তাহা সমস্ত মানবের ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছে— এই উৎসবেও ভারতের গৃহস্থ সমস্ত মনুষ্যকে অতিথিরূপে গৃহে অভ্যর্থনা করে— তাহা করিলেই যথার্থভাবে ঈশ্বরকে গৃহে আবাহন করা হয়— শুদ্ধমাত্র ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিলেই হয় না। এইরূপে গৃহের প্রত্যেক বিশেষ ঘটনায় আমরা এক-একদিন গৃহকে ভুলিয়া সমস্ত মানবের সহিত মিলিত হই এবং সেইদিন সমস্ত মানবের মধ্যে ঈশ্বরের সহিত আমাদের মিলনের দিন।

হায়, এখন আমরা আমাদের উৎসবকে প্রতিদিন সংকীর্ণ করিয়া আনিতেছি। এতকালে যাহা বিনয়রসাপ্লুত মঙ্গলের ব্যাপার ছিল, এখন তাহা ঐশ্বর্যমদোদ্ধত আড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে। এখন আমাদের হৃদয় সংকুচিত, আমাদের দ্বার রুদ্ধ। এখন কেবল বন্ধুবান্ধব এবং ধনিমানী ছাড়া মঙ্গলকর্মের দিনে আমাদের ঘরে আর কাহারো স্থান হয় না। আজ আমরা মানবসাধারণকে দূর করিয়া নিজেকে বিচ্ছিন্ন-ক্ষুদ্র করিয়া, ঈশ্বরের বাধাহীন পবিত্রপ্রকাশ হইতে বঞ্চিত করিয়া বড়ো হইলাম বলিয়া কল্পনা করি। আজ আমাদের দীপালোক উজ্জ্বলতর খাদ্য প্রচুরতর আয়োজন বিচিত্রতর হইয়াছে— কিন্তু মঙ্গলময় অন্তর্যামী দেখিতেছেন আমাদের শুষ্কতা আমাদের দীনতা আমাদের নির্লজ্জ কৃপণতা। আড়ম্বর দিনে দিনে যতই বাড়িতেছে, ততই এই দীপালোকে এই গৃহসজ্জায় এই রসলেশশূন্য কৃত্রিমতার মধ্যে সেই শান্তমঙ্গলস্বরূপের প্রশান্ত-প্রসন্নমুখচ্ছবি আমাদের মদান্ধ দৃষ্টিপথ হইতে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। এখন আমরা কেবল আপনাকেই দেখিতেছি, আপনার স্বর্ণরৌপ্যের চাকচিক্য দেখাইতেছি, আপনার নাম শুনিতেছি ও শুনাইতেছি।

হে ঈশ্বর, তুমি আজ আমাদিগকে আহ্বান করো। বৃহৎ মনুষ্যত্বের মধ্যে আহ্বান করো। আজ উৎসবের দিন শুদ্ধমাত্র ভাবরসসম্ভোগের দিন নহে, শুদ্ধমাত্র মাধুর্যের মধ্যে নিমগ্ন হইবার দিন নহে—

আজ বৃহৎ সম্মিলনের মধ্যে শক্তি-উপলব্ধির দিন, শক্তিসংগ্রহের দিন। আজ তুমি আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন জীবনের প্রাত্যহিক জড়ত্ব প্রাত্যহিক ঔদাসীন্য হইতে উদ্‌বোধিত করো, প্রতিদিনের নির্বীর্য নিশ্চেষ্টতা হইতে আরাম-আবেশ হইতে উদ্ধার করো। যে কঠোরতায় যে উদ্যমে যে আত্মবিসর্জনে আমাদের সার্থকতা, তাহার মধ্যে আজ আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করো। আমরা এতগুলি মানুষ একত্র হইয়াছি; আজ যদি, যুগে যুগে তোমার মনুষ্যসমাজের মধ্যে যে সত্যের গৌরব যে প্রেমের গৌরব যে মঙ্গলের গৌরব যে কঠিনবীর্য নির্ভীক মহত্ত্বের গৌরব উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা না দেখিতে পাই, দেখি কেবল ক্ষুদ্র দীপের আলোক, তুচ্ছ ধনের আড়ম্বর, তবে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল— যুগে যুগে মহাপুরুষের কণ্ঠ হইতে যে-সকল অভয়বাণী-অমৃতবাণী উৎসারিত হইয়াছে, তাহা যদি মহাকালের মঙ্গলশঙ্খ নির্ঘোষের মতো আজ না শুনিতে পাই— শুনি কেবল লৌকিকতার কলকলা এবং সাম্প্রদায়িকতার বাগ্‌বিন্যাস— তবে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। এই সমস্ত ধনাড়ম্বরের নিবিড় কুজ্ঝটিকারাশি ভেদ করিয়া একবার সেই সমস্ত পবিত্র দৃশ্যের মধ্যে লইয়া যাও— যেখানে ধূলি-শয্যায় নগ্নদেহে তোমার সাধক বসিয়া আছেন যেখানে তোমার সর্বত্যাগী সেবক কর্তব্যের কঠিন পথে রিক্ত হস্তে ধাবমান হইয়াছেন— যেখানে তোমার বরপুত্রগণ দারিদ্র্যের দ্বারা নিষ্পিষ্ট, বিষয়ীদের দ্বারা পরিত্যক্ত, মদান্ধদের দ্বারা অপমানিত। হায় দেব, সেখানে কোথায় দীপচ্ছটা, কোথায় বাদ্যোদ্যম, কোথায় স্বর্ণভাণ্ডার, কোথায় মণিমাল্য। কিন্তু সেইখানে তেজ, সেইখানে শক্তি, সেইখানে দিব্যৈশ্বর্য, সেইখানেই তুমি। দূর করো, দূর করো এই-সমস্ত আবরণ আচ্ছাদন, এই-সমস্ত ক্ষুদ্র দম্ভ, এই-সমস্ত মিথ্যা কোলাহল, এই-সমস্ত অপবিত্র আয়োজন— মনুষ্যত্বের সেই অভ্রভেদিচূড়াবিশিষ্ট নিরাভরণ নিস্তব্ধ রাজনিকেতনের দ্বারের সম্মুখে অদ্য আমাকে দাঁড় করাইয়া দাও। সেখানে, সেই কঠিন ক্ষেত্রে সেই রিক্ত নির্জনতার মধ্যে, সেই বহুযুগের অনিমেষ দৃষ্টিপাতের সম্মুখে তোমার নিকট হইতে দীক্ষা লইব প্রভু।

দাও হস্তে তুলি
নিজহাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহো
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।
করো মোরে সম্মানিত নববীরবেশে,
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন-অলংকার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।

মাঘ ১৩১১

দুঃখ

জগৎসংসারের বিধান সম্বন্ধে যখনই আমরা ভাবিয়া দেখিতে যাই তখনই, এ বিশ্বরাজ্যে দুঃখ কেন আছে, এই প্রশ্নই সকলের চেয়ে আমাদিগকে সংশয়ে আন্দোলিত করিয়া তোলে। আমরা কেহ বা তাহাকে মানবপিতামহের আদিম পাপের শাস্তি বলিয়া থাকি— কেহ বা তাহাকে জন্মান্তরের কর্মফল বলিয়া জানি— কিন্তু তাহাতে দুঃখ তো দুঃখই থাকিয়া যায়।

না থাকিয়া যে জো নাই। দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব যে একেবারে একসঙ্গে বাঁধা। কারণ, অপূর্ণতাই তো দুঃখ এবং সৃষ্টিই যে অপূর্ণ।

সেই অপূর্ণতাই বা কেন ? এটা একেবারে গোড়ার কথা। সৃষ্টি অপূর্ণ হইবে না, দেশে কালে বিভক্ত হইবে না, কার্যকারণে আবদ্ধ হইবে না, এমন সৃষ্টিছাড়া আশা আমরা মনেও আনিতে পারি না। অপূর্ণের মধ্য দিয়া নহিলে পূর্ণের প্রকাশ হইবে কেমন করিয়া ?

উপনিষৎ বলিয়াছেন যাহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাঁহারই অমৃত আনন্দরূপ। তাঁহার মৃত্যুহীন ইচ্ছাই এই-সমস্ত রূপে ব্যক্ত হইতেছে।

ঈশ্বরের এই যে প্রকাশ, উপনিষৎ ইহাকে তিন ভাগ করিয়া দেখিয়াছেন। একটি প্রকাশ জগতে, আর-একটি প্রকাশ মানবসমাজে, আর-একটি প্রকাশ মানবাত্মায়। একটি শান্তং, একটি শিবং, একটি অদ্বৈতং।

শান্তম্ আপনাতেই আপনি স্তব্ধ থাকিলে তো প্রকাশ পাইতেই পারেন না— এই যে চঞ্চল বিশ্বজগৎ কেবলই ঘুরিতেছে, ইহার প্রচণ্ড গতির মধ্যেই তিনি অচঞ্চল নিয়মস্বরূপে আপন শান্তরূপকে ব্যক্ত করিতেছেন। শান্ত এই সমস্ত চাঞ্চল্যকে বিধৃত করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি শান্ত, নহিলে তাঁহার প্রকাশ কোথায়।

শিবম্ কেবল আপনাতেই আপনি স্থির থাকিলে তাঁহাকে শিবই বলিতে পারি না। সংসারে চেষ্টা ও দুঃখের সীমা নাই, সেই কর্মক্লেশের মধ্যেই অমোঘ মঙ্গলের দ্বারা তিনি আপনার শিবস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। মঙ্গল সংসারের সমস্ত দুঃখ তাপকে অতিক্রম করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি মঙ্গল, তিনি ধর্ম, নহিলে তাঁহার প্রকাশ কোথায় ?

অদ্বৈত যদি আপনাতে আপনি এক হইয়া থাকিতেন তবে সেই ঐক্যের প্রকাশ হইত কী করিয়া ? আমাদের চিত্ত সংসারে আপনপরের ভেদবৈচিত্র্যের দ্বারা কেবলই আহত প্রতিহত হইতেছে ; সেই ভেদের মধ্যেই প্রেমের দ্বারা তিনি আপনার অদ্বৈতরূপ প্রকাশ করিতেছেন। প্রেম যদি সমস্ত ভেদের মধ্যেই সম্বন্ধ স্থাপন না করিত তবে অদ্বৈত কাহাকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেন ?

জগৎ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা চঞ্চল, মানবসমাজ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা সচেষ্ট, এবং আমাদের আত্মবোধ অপূর্ণ বলিয়াই আমরা আত্মাকে এবং অন্য সমস্তকে বিভিন্ন করিয়াই জানি। কিন্তু সেই চাঞ্চল্যের মধ্যেই শান্তি, দুঃখচেষ্টার মধ্যেই সফলতা এবং বিভেদের মধ্যেই প্রেম।

অতএব এ কথা মনে রাখিতে হইবে পূর্ণতার বিপরীত শূন্যতা ; কিন্তু অপূর্ণতা পূর্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধে নহে, তাহা পূর্ণতারই বিকাশ। গান যখন চলিতেছে, যখন তাহা সমে আসিয়া শেষ হয় নাই তখন তাহা সম্পূর্ণ গান নহে বটে কিন্তু তাহা গানের বিপরীতও নহে, তাহার অংশে অংশে সেই সম্পূর্ণ গানেরই আনন্দ তরঙ্গিত হইতেছে।

এ নহিলে রস কেমন করিয়া হয় ? রসো বৈ সঃ। তিনিই যে রসস্বরূপ। অপূর্ণকে প্রতি নিমেষেই তিনি পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন বলিয়াই তো তিনি রস। তাঁহাতে করিয়া সমস্ত ভরিয়া উঠিতেছে, ইহাই রসের আকৃতি, ইহাই রসের প্রকৃতি। সেইজন্যই জগতের প্রকাশ আনন্দরূপমমৃতং— ইহাই আনন্দের রূপ, ইহা আনন্দের অমৃতরূপ।

সেইজন্যই এই অপূর্ণ জগৎ শূন্য নহে, মিথ্যা নহে। সেইজন্যই এ-জগতে রূপের মধ্যে অপরূপ, শব্দের মধ্যে বেদনা, ঘ্রাণের মধ্যে ব্যাকুলতা আমাদিগকে কোন্ অনির্বচনীয়তায় নিমগ্ন করিয়া দিতেছে। সেইজন্য আকাশ কেবলমাত্র আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া নাই তাহা আমাদের হৃদয়কে বিস্ফারিত করিয়া দিতেছে ; আলোক কেবল আমাদের দৃষ্টিকে সার্থক করিতেছে না তাহা আমাদের অন্তঃকরণকে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিতেছে এবং যাহা-কিছু আছে তাহা কেবল আছে মাত্র নহে, তাহাতে আমাদের চিত্তকে চেতনায়, আমাদের আত্মাকে সত্যে সম্পূর্ণ করিতেছে।

যখন দেখি শীতকালের পদ্মার নিস্তরঙ্গ নীলকান্ত জলস্রোত পীতাভ বালুতটের নিঃশব্দ নির্জনতার মধ্য দিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতেছে— তখন কি বলিব, এ কী হইতেছে। নদীর জল বহিতেছে এই বলিলেই তো সব বলা হইল না— এমন-কি, কিছুই বলা হইল না। তাহার আশ্চর্য শক্তি ও আশ্চর্য সৌন্দর্যের কী বলা হইল। সেই বচনের অতীত পরম পদার্থকে সেই অপরূপ রূপকে, সেই ধ্বনিহীন

সংগীতকে, এই জলের ধারা কেমন করিয়া এত গভীরভাবে ব্যক্ত করিতেছে। এ তো কেবলমাত্র জল ও মাটি— "মৃৎপিণ্ডো জলরেখয়া বলয়িতঃ"— কিন্তু যাহা প্রকাশ হইয়া উঠিতেছে তাহা কী। তাহাই আনন্দরূপমমৃতম্, তাহাই আনন্দের অমৃতরূপ।

আবার কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড়েও এই নদীকে দেখিয়াছি। বালি উড়িয়া সূর্যাস্তের রক্তচ্ছটাকে পাণ্ডুবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, কশাহত কালোঘোড়ার মসৃণ চর্মের মতো নদীর জল রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, পরপারের স্তব্ধ তরুশ্রেণীর উপরকার আকাশে একটা নিঃস্পন্দ আতঙ্কের বিবর্ণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে; তার পর সেই জলস্থল-আকাশের জালের মাঝখানে নিজের ছিন্নবিচ্ছিন্ন মেঘমধ্যে জড়িত আবর্তিত হইয়া উন্মত্ত ঝড় একেবারে দিশেহারা হইয়া আসিয়া পড়িল, সেই আবির্ভাব দেখিয়াছি। তাহা কি কেবল মেঘ এবং বাতাস, ধুলা এবং বালি, জল এবং ডাঙা? এই-সমস্ত অকিঞ্চিৎকরের মধ্যে এ যে অপরূপের দর্শন। এই তো রস। ইহা তো শুধু বীণার কাঠ ও তার নহে, ইহাই বীণার সংগীত। এই সংগীতেই আনন্দের পরিচয় সেই আনন্দরূপমমৃতম্।

আবার মানুষের মধ্যে যাহা দেখিয়াছি তাহা মানুষকে কতদূরেই ছাড়াইয়া গেছে। রহস্যের অন্ত পাই নাই। শক্তি এবং প্রীতি কত লোকের এবং কত জাতির ইতিহাসে কত আশ্চর্য আকার ধরিয়া কত অচিন্ত্য ঘটনা ও কত অসাধ্যসাধনের মধ্যে সীমার বন্ধনকে বিদীর্ণ করিয়া ভূমাকে প্রত্যক্ষ করাইয়া দিয়াছে। মানুষের মধ্যে ইহাই আনন্দরূপমমৃতম্।

কে যেন বিশ্বমহোৎসবে এই নীলাকাশের মহাপ্রাঙ্গণে অপূর্ণতার পাত পাড়িয়া গিয়াছেন— সেইখানে আমরা পূর্ণতার ভোজে বসিয়া গিয়াছি। সেই পূর্ণতা কত বিচিত্র রূপে এবং কত বিচিত্র স্বাদে ক্ষণে ক্ষণে আমাদিগকে অভাবনীয় ও অনির্বচনীয় চেতনার বিস্ময়ে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে।

এমন নহিলে রসস্বরূপ রস দিবেন কেমন করিয়া। এই রস অপূর্ণতার সুকঠিন দুঃখকে কানায় কানায় ভরিয়া তুলিয়া উছলিয়া পড়িয়া যাইতেছে। এই দুঃখের সোনার পাত্রটি কঠিন বলিয়াই কি ইহাকে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া এতবড়ো রসের ভোজকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে; না, পরিবেশনের লক্ষ্মীকে ডাকিয়া বলিব হোক হোক কঠিন হোক কিন্তু ইহাকে ভরপুর করিয়া দাও, আনন্দ ইহাকে ছাপাইয়া উঠুক?

জগতের এই অপূর্ণতা যেমন পূর্ণতার বিপরীত নহে, কিন্তু তাহা যেমন পূর্ণতারই একটি প্রকাশ তেমনি এই অপূর্ণতার নিত্যসহচর দুঃখও আনন্দের বিপরীত নহে, তাহা আনন্দেরই অঙ্গ। অর্থাৎ দুঃখের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা দুঃখই নহে তাহা আনন্দ। দুঃখও আনন্দরূপমমৃতম্।

এ কথা কেমন করিয়া বলি? ইহাকে সম্পূর্ণ প্রমাণ করিবই বা কী করিয়া?

কিন্তু অমাবস্যার অন্ধকারে অনন্ত জ্যোতিষ্কলোককে যেমন প্রকাশ করিয়া দেয়, তেমনি দুঃখের নিবিড়তম তমসার মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া আত্মা কি কোনোদিনই আনন্দলোকের ধ্রুবদীপ্তি দেখিতে পায় নাই— হঠাৎ কি কখনোই বলিয়া উঠে নাই— বুঝিয়াছি, দুঃখের রহস্য বুঝিয়াছি, আর কখনো সংশয় করিব না? পরম দুঃখের শেষ প্রান্ত যেখানে গিয়া মিলিয়া গেছে সেখানে কি আমাদের হৃদয় কোনো শুভমুহূর্তে চাহিয়া দেখে নাই? অমৃত ও মৃত্যু, আনন্দ ও দুঃখ সেখানে কি এক হইয়া যায় নাই, সেইদিকেই কি তাকাইয়া ঋষি বলেন নাই

যস্যচ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

অমৃত যাঁহার ছায়া এবং মৃত্যুও যাঁহার ছায়া তিনি ছাড়া আর কোন্ দেবতাকে পূজা করিব।

ইহা কি তর্কের বিষয়? ইহা কি আমাদের উপলব্ধির বিষয় নহে? সমস্ত মানুষের অন্তরের মধ্যে এই উপলব্ধি গভীরভাবে আছে বলিয়াই মানুষ দুঃখকেই পূজা করিয়া আসিয়াছে, আরামকে নহে। জগতের ইতিহাসে মানুষের পরমপূজ্যগণ দুঃখেরই অবতার, আরামে লালিত লক্ষ্মীর ক্রীতদাস নহে।

অতএব দুঃখকে আমরা দুর্বলতাবশত খর্ব করিব না, অস্বীকার করিব না, দুঃখের দ্বারাই আনন্দকে আমরা বড়ো করিয়া এবং মঙ্গলকে আমরা সত্য করিয়া জানিব।

এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে অপূর্ণতার গৌরবই দুঃখ, দঃখই এই অপূর্ণতার সম্পৎ,

দুঃখই তাহার একমাত্র মূলধন। মানুষ সত্যপদার্থ যাহা-কিছু পায় তাহা দুঃখের দ্বারাই পায় বলিয়াই তাহার মনুষ্যত্ব। তাহার ক্ষমতা অল্প বটে কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে ভিক্ষুক করেন নাই। সে শুধু চাহিয়াই কিছু পায় না, দুঃখ করিয়া পায়। আর যত কিছু ধন সে তো তাহার নহে— সে সমস্তই বিশ্বেশ্বরের— কিন্তু দুঃখ যে তাহার নিতান্তই আপনার। সেই দুঃখের ঐশ্বর্যেই অপূর্ণ জীব পূর্ণস্বরূপের সহিত আপনার গর্বের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াছে, তাহাকে লজ্জা পাইতে হয় নাই। সাধনার দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে পাই, তপস্যার দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে লাভ করি— তাহার অর্থই এই, ঈশ্বরের মধ্যে যেমন পূর্ণতা আছে আমাদের মধ্যে তেমনই পূর্ণতার মূল্য আছে— তাহাই দুঃখ ; সেই দুঃখই সাধনা, সেই দুঃখই তপস্যা, সেই দুঃখেরই পরিণাম আনন্দ মুক্তি ঈশ্বর।

আমাদের পক্ষ হইতে ঈশ্বরকে যদি কিছু দিতে হয় তবে কী দিব, কী দিতে পারি? তাঁহার ধন তাঁহাকে দিয়া তো তৃপ্তি নাই— আমাদের একটিমাত্র যে আপনার ধন দুঃখ ধন আছে তাহাই তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হয়। এই দুঃখকেই তিনি আনন্দ দিয়া, তিনি আপনাকে দিয়া পূর্ণ করিয়া দেন— নহিলে তিনি আনন্দ ঢালিবেন কোন্‌খানে? আমাদের এই আপন ঘরের পাত্রটি না থাকিলে তাঁহার সুধা তিনি দান করিতেন কী করিয়া? এই কথাই আমরা গৌরব করিয়া বলিতে পারি। দানেই ঐশ্বর্যের পূর্ণতা? হে ভগবান, আনন্দকে দান করিবার বর্ষণ করিবার প্রবাহিত করিবার এই যে তোমার শক্তি ইহা তোমার পূর্ণতারই অঙ্গ। আনন্দ আপনাতে বদ্ধ হইয়া সম্পূর্ণ হয় না, আনন্দ আপনাকে ত্যাগ করিয়াই সার্থক— তোমার সেই আপনাকে দান করিবার পরিপূর্ণতা আমরাই বহন করিতেছি, আমাদের দুঃখের দ্বারা বহন করিতেছি, এই আমাদের বড়ো অভিমান ; এইখানেই তোমাতে আমাতে মিলিয়াছি, এইখানেই তোমার ঐশ্বর্যে আমার ঐশ্বর্যে যোগ— এইখানে তুমি আমাদের অতীত নহ, এইখানেই তুমি আমাদের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছ ; তুমি তোমার অগণ্য গ্রহসূর্যনক্ষত্র-খচিত মহাসিংহাসন হইতে আমাদের এই দুঃখের জীবনে তোমার লীলা সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছ। হে রাজা, তুমি আমাদের দুঃখের রাজা ; হঠাৎ যখন অর্ধরাত্রে তোমার রথচক্রের বজ্রগর্জনে মেদিনী বলির পশুর হৃৎপিণ্ডের মতো কাঁপিয়া উঠে তখন জীবনে তোমার সেই প্রচণ্ড আবির্ভাবের মহাক্ষণে যেন তোমার জয়ধ্বনি করিতে পারি, হে দুঃখের ধন, তোমাকে চাহি না এমন কথা সেদিন যেন ভয়ে না বলি ; সেদিন যেন দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তোমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে না হয়— যেন সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়া তোমার উদ্দীপ্ত ললাটের দিকে দুই চক্ষু তুলিয়া বলিতে পারি, হে দারুণ, তুমিই আমার প্রিয়।

আমরা দুঃখের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া অনেকবার বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকি যে আমরা সুখদুঃখকে সমান করিয়া বোধ করিব। কোনো উপায়ে চিত্তকে অসাড় করিয়া ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সেরূপ উদাসীন হওয়া হয়তো অসম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু সুখদুঃখ তো কেবলই নিজের নহে, তাহা যে জগতের সমস্ত জীবের সঙ্গে জড়িত। আমার দুঃখবোধ চলিয়া গেলেই তো সংসার হইতে দুঃখ দূর হয় না।

অতএব, কেবলমাত্র নিজের মধ্যে নহে, দুঃখকে তাহার সেই বিরাট রঙ্গভূমির মাঝখানে দেখিতে হইবে যেখানে সে আপনার বহ্নির তাপে বজ্রের আঘাতে কত জাতি কত রাজ্য কত সমাজ গড়িয়া তুলিতেছে ; যেখানে সে মানুষের জিজ্ঞাসাকে দুর্গম পথে ধাবিত করিতেছে, মানুষের ইচ্ছাকে দুর্ভেদ্য বাধার ভিতর দিয়া উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিতেছে এবং মানুষের চেষ্টাকে কোনো ক্ষুদ্র সফলতার মধ্যে নিঃশেষিত হইতে দিতেছে না ; যেখানে যুদ্ধবিগ্রহ দুর্ভিক্ষমারী অন্যায় অত্যাচার তাহার সহায় ; যেখানে রক্তসরোবরের মাঝখান হইতে শুভ্র শান্তিকে সে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে, দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর তাপের দ্বারা শোষণ করিয়া বর্ষণের মেঘকে রচনা করিতেছে এবং যেখানে হলধরমূর্তিতে সুতীক্ষ্ণ লাঙল দিয়া সে মানব-হৃদয়কে বারংবার শত শত রেখায় দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়াই তাহাকে ফলবান করিয়া তুলিতেছে। সেখানে সেই দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণকে পরিত্রাণ বলে না— সেই পরিত্রাণই মৃত্যু— সেখানে স্বেচ্ছায় অঞ্জলি রচনা করিয়া যে তাহাকে প্রথম অর্ঘ্য না দিয়াছে সে নিজেই বিড়ম্বিত হইয়াছে।

মানুষের এই যে দুঃখ ইহা কেবল কোমল অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন নহে, ইহা রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত। বিশ্বজগতে তেজঃপদার্থ যেমন, মানুষের চিত্তে দুঃখ সেইরূপ ; তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই গতি, তাহাই প্রাণ ; তাহাই চক্রপথে ঘুরিতে ঘুরিতে মানব-সমাজে নূতন নূতন কর্মলোক ও সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করিতেছে— এই দুঃখের তাপ কোথাও বা প্রকাশ পাইয়া কোথাও বা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মানব-সংসারের সমস্ত বায়ুপ্রবাহগুলিকে বহমান করিয়া রাখিয়াছে।

মানুষের এই দুঃখকে আমরা ক্ষুদ্র করিয়া বা দুর্বলভাবে দেখিব না। আমরা বক্ষ বিস্ফারিত ও মস্তক উন্নত করিয়াই ইহাকে স্বীকার করিব। এই দুঃখের শক্তির দ্বারা নিজেকে ভস্ম করিব না, নিজেকে কঠিন করিয়া গড়িয়া তুলিব। দুঃখের দ্বারা নিজেকে উপরে না তুলিয়া নিজেকে অভিভূত করিয়া অতলে তলাইয়া দেওয়াই দুঃখের অবমাননা— যাহাকে যথার্থভাবে বহন করিতে পারিলেই জীবন সার্থক হয় তাহার দ্বারা আত্মহত্যা সাধন করিতে বসিলে দুঃখদেবতার কাছে অপরাধী হইতে হয়। দুঃখের দ্বারা আত্মাকে অবজ্ঞা না করি, দুঃখের দ্বারাই যেন আত্মার সম্মান উপলব্ধি করিতে পারি। দুঃখ ছাড়া সে সম্মান বুঝিবার আর কোনো পন্থা নাই।

কারণ, পূর্বেই আভাস দিয়াছি দুঃখই জগতে একমাত্র সকল পদার্থের মূল্য। মানুষ যাহা-কিছু নির্মাণ করিয়াছে তাহা দুঃখ দিয়াই করিয়াছে। দুঃখ দিয়া যাহা না করিয়াছে তাহা তাহার সম্পূর্ণ আপন হয় না।

সেইজন্য ত্যাগের দ্বারা দানের দ্বারা তপস্যার দ্বারা দুঃখের দ্বারাই আমরা আপন আত্মাকে গভীররূপে লাভ করি— সুখের দ্বারা আরামের দ্বারা নহে। দুঃখ ছাড়া আর কোনো উপায়েই আপন শক্তিকে আমরা জানিতে পারি না। এবং আপন শক্তিকে যতই কম করিয়া জানি আত্মার গৌরবও তত কম করিয়া বুঝি, যথার্থ আনন্দও তত অগভীর হইয়া থাকে।

রামায়ণে কবি রামকে সীতাকে লক্ষ্মণকে ভরতকে দুঃখের দ্বারাই মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। রামায়ণের কাব্যরসে মানুষ যে আনন্দের মঙ্গলময় মূর্তি দেখিয়াছে দুঃখই তাহাকে ধারণ করিয়া আছে মহাভারতেও সেইরূপ। মানুষের ইতিহাসে যত বীরত্ব যত মহত্ত্ব সমস্তই দুঃখের আসনে প্রতিষ্ঠিত। মাতৃস্নেহের মূল্য দুঃখে, পাতিব্রত্যের মূল্য দুঃখে, বীর্যের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে।

এই মূল্যটুকু ঈশ্বর যদি মানুষের নিকট হইতে হরণ করিয়া লইয়া যান, যদি তাহাকে অবিমিশ্র সুখ ও আরামের মধ্যে লালিত করিয়া রাখেন, তবেই আমাদের অপূর্ণতা যথার্থ লজ্জাকর হয়, তাহার মর্যাদা একেবারে চলিয়া যায়। তাহা হইলে কিছুকেই আর আপনার অর্জিত বলিতে পারি না, সমস্তই দানের সামগ্রী হইয়া উঠে। আজ ঈশ্বরের শস্যকে কর্ষণের দুঃখের দ্বারা আমরা আমার করিতেছি, ঈশ্বরের পানীয় জলকে বহনের দুঃখের দ্বারা আমার করিতেছি, ঈশ্বরের অগ্নিকে ঘর্ষণের দুঃখের দ্বারা আমার করিতেছি। ঈশ্বর আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনের সামগ্রীকেও সহজে দিয়া আমাদের অসম্মান করেন নাই— ঈশ্বরের দানকেও বিশেষরূপে আমাদের করিয়া লইলে তবেই তাহাকে পাই নহিলে তাহাকে পাই না। সেই দুঃখ তুলিয়া লইলে জগৎ সংসারে আমাদের সমস্ত দাবি চলিয়া যায়, আমাদের নিজের কোনো দলিল থাকে না ; আমরা কেবল দাতার ঘরে বাস করি, নিজের ঘরে নহে। কিন্তু তাহাই যথার্থ অভাব— মানুষের পক্ষে দুঃখের অভাবের মতো এতবড়ো অভাব আর-কিছু হইতেই পারে না।

উপনিষৎ বলিয়াছেন—

স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।

তিনি তপ করিলেন, তিনি তপ করিয়া এই যাহা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করিলেন।

সেই তাঁহার তপই দুঃখরূপে জগতে বিরাজ করিতেছে। আমরা অন্তরে বাহিরে যাহা-কিছু সৃষ্টি করিতে যাই সমস্তই তপ করিয়া করিতে হয়— আমাদের সমস্ত জন্মই বেদনার মধ্য দিয়া, সমস্ত লাভই ত্যাগের পথ বাহিয়া, সমস্ত অমৃতত্বই মৃত্যুর সোপান অতিক্রম করিয়া। ঈশ্বরের সৃষ্টির তপস্যাকে আমরা এমনি করিয়াই বহন করিতেছি। তাঁহারই তপের তাপ নব নব রূপে মানুষের অন্তরে নব নব প্রকাশকে উন্মেষিত করিতেছে।

সেই তপস্যাই আনন্দের অঙ্গ। সেইজন্য আর-একদিক দিয়া বলা হইয়াছে—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।

আনন্দ হইতেই এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

আনন্দ ব্যতীত সৃষ্টির এতবড়ো দুঃখকে বহন করিবে কে।

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

কৃষক চাষ করিয়া যে ফসল ফলাইতেছে সেই ফসলে তাহার তপস্যা যত বড়ো, তাহার আনন্দও ততখানি। সম্রাটের সাম্রাজ্যরচনা বৃহৎ দুঃখ এবং বৃহৎ আনন্দ, দেশভক্তের দেশকে প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা পরম দুঃখ এবং পরম আনন্দ— জ্ঞানীর জ্ঞানলাভ এবং প্রেমিকের প্রিয়সাধনাও তাই।

খৃস্টান শাস্ত্রে বলে ঈশ্বর মানবগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদনার ভার বহন ও দুঃখের কণ্টক-কিরীট মাথায় পরিয়াছিলেন। মানুষের সকল প্রকার পরিত্রাণের একমাত্র মূল্যই সেই দুঃখ। মানুষের নিতান্ত আপন সামগ্রী যে দুঃখ, প্রেমের দ্বারা তাহাকে ঈশ্বরও আপন করিয়া এই দুঃখসংগমে মানুষের সঙ্গে মিলিয়াছেন— দুঃখকে অপরিসীম মুক্তিতে ও আনন্দে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন— ইহাই খৃস্টানধর্মের মর্মকথা।

আমাদের দেশেও কোনো সম্প্রদায়ের সাধকেরা ঈশ্বরকে দুঃখদারুণ ভীষণ মূর্তির মধ্যেই মা বলিয়া ডাকিয়াছেন। সে-মূর্তিকে বাহ্যত কোথাও তাঁহারা মধুর ও কোমল, শোভন ও সুখকর করিবার লেশমাত্র চেষ্টা করেন নাই। সংহার-রূপকেই তাঁহারা জননী বলিয়া অনুভব করিতেছেন। এই সংহারের বিভীষিকার মধ্যেই তাঁহারা শক্তি ও শিবের সম্মিলন প্রত্যক্ষ করিবার সাধনা করেন।

শক্তিতে ও ভক্তিতে যাহারা দুর্বল, তাহারাই কেবল সুখস্বাচ্ছন্দ্য-শোভাসম্পদের মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাবকে সত্য বলিয়া অনুভব করিতে চায়। তাহারা বলে ধনমানই ঈশ্বরের প্রসাদ, সৌন্দর্যই ঈশ্বরের মূর্তি, সংসার সুখের সফলতাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং তাহাই পুণ্যের পুরস্কার। ঈশ্বরের দয়াকে তাহারা বড়োই সকরুণ বড়োই কোমলকান্ত রূপে দেখে। সেইজন্যই এই-সকল দুর্বলচিত্ত সুখের পূজারিগণ ঈশ্বরের দয়াকে নিজের লোভের, মোহের ও ভীরুতার সহায় বলিয়া ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত করিয়া জানে।

কিন্তু হে ভীষণ, তোমার দয়াকে তোমার আনন্দকে কোথায় সীমাবদ্ধ করিব ? কেবল সুখে, কেবল সম্পদে, কেবল জীবনে, কেবল নিরাপদ নিরাতঙ্কতায় ? দুঃখ বিপদ মৃত্যু ও ভয়কে তোমা হইতে পৃথক করিয়া তোমার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া জানিতে হইবে ? তাহা নহে। হে পিতা, তুমিই দুঃখ তুমিই বিপদ, হে মাতা, তুমিই মৃত্যু তুমিই ভয়। তুমিই—

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং।

তুমিই—

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণোঃ।

সমগ্র লোককে তোমার জ্বলৎবদনের দ্বারা গ্রাস করিতে করিতে লেহন করিতেছ, সমস্ত জগৎকে তেজের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া, হে বিষ্ণু, তোমার উগ্রজ্যোতি প্রতপ্ত হইতেছে।

হে রুদ্র, তোমারই দুঃখরূপ তোমারই মৃত্যুরূপ দেখিলে আমরা দুঃখ ও মৃত্যুর মোহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তোমাকেই লাভ করি। নতুবা ভয়ে ভয়ে তোমার বিশ্বজগতে কাপুরুষের মতো সংকুচিত হইয়া বেড়াইতে হয়— সত্যের নিকট নিঃসংশয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে পারি না। তখন দয়াময় বলিয়া ভয়ে তোমার নিকটে দয়া চাহি— তোমার কাছে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনি— তোমার হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য তোমার কাছে ক্রন্দন করি।

কিন্তু হে প্রচণ্ড, আমি তোমার কাছে সেই শক্তি প্রার্থনা করি যাহাতে তোমার দয়াকে দুর্বলভাবে নিজের আরামের নিজের ক্ষুদ্রতার উপযোগী করিয়া না কল্পনা করি— তোমাকে অসম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া নিজেকে না প্রবঞ্চিত করি। কম্পিত হৃৎপিণ্ড লইয়া অশ্রুসিক্ত নেত্রে তোমাকে দয়াময় বলিয়া

নিজেকে ভুলাইব না— তুমি যে মানুষকে যুগে যুগে অসত্য হইতে সত্যে অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে মৃত্যু হইতে অমৃতে উদ্ধার করিতেছ, সেই যে উদ্ধারের পথ সে তো আরামের পথ নহে সে যে পরম দুঃখেরই পথ। মানুষের অন্তরাত্মা প্রার্থনা করিতেছে—

আবিরাবীর্ম এধি।

হে আবিঃ, তুমি আমার নিকট আবির্ভূত হও।

হে প্রকাশ, তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও— এ প্রকাশ তো সহজ নহে। এ যে প্রাণান্তিক প্রকাশ। অসত্য যে আপনাকে দগ্ধ করিয়া তবেই সত্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, অন্ধকার যে আপনাকে বিসর্জন করিয়া তবেই জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং মৃত্যু যে আপনাকে বিদীর্ণ করিয়া তবেই অমৃতে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে। হে আবিঃ, মানুষের জ্ঞানে মানুষের কর্মে মানুষের সমাজে তোমার আবির্ভাব এইরূপেই। এই কারণে ঋষি তোমাকে করুণাময় বলিয়া ব্যর্থ সম্বোধন করেন নাই। তোমাকে বলিয়াছেন—

রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্নমুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করো।

হে রুদ্র, তোমার যে সেই রক্ষা, তাহা ভয় হইতে রক্ষা নহে, বিপদ হইতে রক্ষা নহে, মৃত্যু হইতে রক্ষা নহে— তাহা জড়তা হইতে রক্ষা, ব্যর্থতা হইতে রক্ষা, তোমার অপ্রকাশ হইতে রক্ষা। হে রুদ্র, তোমার প্রসন্নমুখ কখন দেখি, যখন আমরা ধনের বিলাসে লালিত, মানের মদে মত্ত, খ্যাতির অহংকারে আত্মবিস্মৃত, যখন আমরা নিরাপদ অকর্মণ্যতার মধ্যে সুখসুপ্ত তখন? নহে, নহে, কদাচ নহে। যখন আমরা অজ্ঞানের বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াই, যখন আমরা ভয়ে ভাবনায় সত্যকে লেশমাত্র অস্বীকার না করি, যখন আমরা দুরূহ ও অপ্রিয় কর্মকেও গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত না হই, যখন আমরা কোনো সুবিধা কোনো শাসনকেই তোমার চেয়ে বড়ো বলিয়া মান্য না করি— তখনই বধে বন্ধনে আঘাতে অপমানে দারিদ্র্যে দুর্যোগে, হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন মুখের জ্যোতি জীবনকে মহিমান্বিত করিয়া তুলে। তখন দুঃখ এবং মৃত্যু, বিঘ্ন এবং বিপদ প্রবল সংঘাতের দ্বারা তোমার প্রচণ্ড আনন্দভেরী ধ্বনিত করিয়া আমাদের সমস্ত চিত্তকে জাগরিত করিয়া দেয়। নতুবা সুখে আমাদের সুখ নাই, ধনে আমাদের মঙ্গল নাই, আলস্যে আমাদের বিশ্রাম নাই। হে ভয়ংকর, হে প্রলয়ংকর, হে শংকর, হে ময়স্কর, হে পিতা, হে বন্ধু, অন্তঃকরণের সমস্ত জাগ্রত শক্তির দ্বারা উদ্যত চেষ্টার দ্বারা অপরাজিত চিত্তের দ্বারা তোমাকে ভয়ে দুঃখে মৃত্যুতে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিব, কিছুতেই কুণ্ঠিত অভিভূত হইব না এই ক্ষমতা আমাদের মধ্যে উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করিতে থাকুক এই আশীর্বাদ করো। জাগাও হে জাগাও— যে ব্যক্তি ও যে জাতি আপন শক্তি ও ধনসম্পদকেই জগতের সর্বাপেক্ষা শ্রেয় বলিয়া অন্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে প্রলয়ের মধ্যে যখন এক মুহূর্তে জাগাইয়া তুলিবে তখন, হে রুদ্র, সেই উদ্ধত ঐশ্বর্যের বিদীর্ণ প্রাচীর ভেদ করিয়া তোমার যে জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে তাহাকে আমরা যেন সৌভাগ্য বলিয়া জানিতে পারি— এবং যে ব্যক্তি ও যে জাতি আপন শক্তি ও সম্পদকে একেবারেই অবিশ্বাস করিয়া জড়তা, দৈন্য ও অপমানের মধ্যে নির্জীব অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে তাহাকে যখন দুর্ভিক্ষ ও মারী ও প্রবলের অবিচার আঘাতের পর আঘাতে অস্থিমজ্জায় কম্পান্বিত করিয়া তুলিবে তখন তোমার সেই দুঃসহ দুর্দিনকে আমরা যেন সমস্ত জীবন সমর্পণ করিয়া সম্মান করি— এবং তোমার সেই ভীষণ আবির্ভাবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেন বলিতে পারি—

আবিরাবীর্ম এধি— রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

দারিদ্র্য ভিক্ষুক না করিয়া যেন আমাদিগকে দুর্গম পথের পথিক করে, এবং দুর্ভিক্ষ ও মারী আমাদিগকে মৃত্যুর মধ্যে নিমজ্জিত না করিয়া সচেষ্টতর জীবনের দিকে আকর্ষণ করে। দুঃখ আমাদের শক্তির কারণ হউক, শোক আমাদের মুক্তির কারণ হউক, এবং লোকভয় রাজভয় ও মৃত্যুভয় আমাদের জয়ের কারণ হউক। বিপদের কঠোর পরীক্ষায় আমাদের মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ সপ্রমাণ করিলে তবেই, হে রুদ্র, তোমার দক্ষিণমুখ আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে; নতুবা অশক্তের প্রতি অনুগ্রহ,

অলসের প্রতি প্রশ্রয়, ভীরুর প্রতি দয়া কদাচই তাহা করিবে না— কারণ সেই দয়াই দুর্গতি, সেই দয়াই অবমাননা ; এবং হে মহারাজ, সে দয়া তোমার দয়া নহে।

১৩১৪

শান্তং শিবমদ্বৈতম্

অনন্ত বিশ্বের প্রচণ্ড শক্তিসংঘ দশ দিকে ছুটিয়াছে, যিনি শান্তং তিনি কেন্দ্রস্থলে ধ্রুব হইয়া অচ্ছেদ্য শান্তির বল্গা দিয়া সকলকেই বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, কেহ কাহাকেও অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। মৃত্যু চতুর্দিকে সঞ্চরণ করিতেছে কিন্তু কিছুই ধ্বংস করিতেছে না, জগতের সমস্ত চেষ্টা স্ব স্ব স্থানে একমাত্র প্রবল কিন্তু তাহাদের সকলের মধ্যে আশ্চর্য সামঞ্জস্য ঘটিয়া অনন্ত আকাশে এক বিপুল সৌন্দর্যের বিকাশ হইতেছে। কতই ওঠাপড়া কতই ভাঙাচোরা চলিতেছে, কত হানাহানি কত বিপ্লব, তবু লক্ষ লক্ষ বৎসরের অবিশ্রাম আঘাতচিহ্ন বিশ্বের চিরনতুন মুখচ্ছবিতে লক্ষই করিতে পারি না। সংসারের অনন্ত চলাচল অনন্ত কোলাহলের মর্মস্থান হইতে নিত্যকাল এক মন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। যিনি শান্তং তাঁহারই আনন্দমূর্তি চরাচরের মহাসনের উপরে ধ্রুবরূপে প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের অন্তরাত্মাতেও সেই শান্তং যে নিয়ত বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার সাক্ষাৎলাভ হইবে কী উপায়ে ? সেই শান্তস্বরূপের উপাসনা করিতে হইবে কেমন করিয়া ? তাঁহার শান্তরূপ আমাদের কাছে প্রকাশ হইবে কবে ?

আমরা নিজেরা শান্ত হইলেই সেই শান্তস্বরূপের আবির্ভাব আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইবে। আমাদের অতিক্ষুদ্র অশান্তিতে জগতের কতখানি যে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তাহা কি লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই ? নিভৃত নদীতীরে প্রশান্ত সন্ধ্যায় আমরা দুজনমাত্র লোক যদি কলহ করি, তবে সায়াহ্নের যে অপরিমেয় স্নিগ্ধ নিঃশব্দতা আমাদের পদতলের তৃণাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূরতম নক্ষত্রলোক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, দুটিমাত্র অতিক্ষুদ্র ব্যক্তির অতিক্ষুদ্র কণ্ঠের কলকলায় তাহা আমরা অনুভবও করিতে পারি না। আমার মনের এতটুকু ভয়ে জগৎ চরাচর বিভীষিকাময় হইয়া উঠে, আমার মনের এতটুকু লোভে আমার নিকটে সমস্ত বৃহৎ সংসারের মুখশ্রীতে যেন বিকার ঘটে। তাই বলিতেছি, যিনি শান্তং, তাঁহাকে সত্যভাবে অনুভব করিব কী করিয়া, যদি আমি শান্ত না হই ? আমাদের অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য কেবল নিজের তরঙ্গগুলাকেই বড়ো করিয়া দেখায়, তাহারই কল্লোল বিশ্বের অন্তরতম বাণীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

নানা দিকে আমাদের নানা প্রবৃত্তি যে উদ্দাম হইয়া ছুটিয়াছে, আমাদের মনকে তাহারা একবার এ-পথে একবার ও-পথে ছিঁড়িয়া লইয়া চলিয়াছে, ইহাদের সকলকে দৃঢ়রশ্মিদ্বারা সংযত করিয়া সকলকে পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যের নিয়মে আবদ্ধ করিয়া অন্তঃকরণের মধ্যে কর্তৃত্বলাভ করিলে, চঞ্চল পরিধির মাঝখানে অচঞ্চল কেন্দ্রকে স্থাপিত করিয়া নিজেকে স্থির করিতে পারিলে তবেই এই বিশ্বচরাচরের মধ্যে যিনি শান্তং, তাঁহার উপাসনা তাঁহার উপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে।

জীবনের হ্রাসকে, শক্তির অভাবকে আমরা শান্তি বলিয়া কল্পনা করি। জীবনহীন শান্তি তো মৃত্যু, শক্তিহীন শান্তি তো লুপ্তি। সমস্ত জীবনের সমস্ত শক্তির অচলপ্রতিষ্ঠ আধারস্বরূপ যাহা বিরাজ করিতেছে, তাহাই শান্তি ; অদৃশ্য থাকিয়া সমস্ত সুরকে যিনি সংগীত, সমস্ত ঘটনাকে যিনি ইতিহাস করিয়া তুলিতেছেন, একের সহিত অন্যের যিনি সেতু, সমস্ত দিনরাত্রি-মাসপক্ষ-ঋতুসংবৎসর চলিতে চলিতেও যাঁহার দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে, তিনিই শান্তম্। নিজের সমস্ত শক্তিকে যে সাধক বিক্ষিপ্ত না করিয়া ধারণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার নিকটে এই পরম শান্তস্বরূপ প্রত্যক্ষ।

বাষ্পই যে রেলগাড়ি চালায়, তাহা নহে, বাষ্পকে যে স্থিরবুদ্ধি লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছে, সে-ই গাড়ি চালায়। গাড়ির কলটা চলিতেছে, গাড়ির চাকাগুলা ছুটিতেছে, তবুও গাড়ির মধ্যে গাড়ির এই

চলাটাই কর্তা নহে, সমস্ত চলার মধ্যে অচল হইয়া যে আছে, যথেষ্ট পরিমাণ চলাকে যথেষ্ট পরিমাণ না-চলার দ্বারা যে ব্যক্তি প্রতিমুহূর্তে স্থিরভাবে নিয়মিত করিতেছে, সেই কর্তা। একটা বৃহৎ কারখানার মধ্যে কোনো অজ্ঞ লোক যদি প্রবেশ করে, তবে সে মনে করে, এ একটা দানবীয় ব্যাপার; চাকার প্রত্যেক আবর্তন, লৌহদণ্ডের প্রত্যেক আস্ফালন, বাষ্পপুঞ্জের প্রত্যেক উচ্ছ্বাস তাহার মনকে একেবারে বিভ্রান্ত করিতে থাকে, কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই-সমস্ত নড়াচড়া-চলাফিরার মূলে একটি স্থির শান্তি দেখিতে পায়— সে জানে ভয়কে অভয় করিয়াছে কে, শক্তিকে সফল করিতেছে কে, গতির মধ্যে স্থিতি কোথায়, কর্মের মধ্যে পরিণামটা কী? সে জানে এই শক্তি যাহাকে আশ্রয় করিয়া চলিতেছে তাহা শান্তি, সে জানে যেখানে এই শক্তির সার্থক পরিণাম, সেখানেও শান্তি। শান্তির মধ্যে সমস্ত গতির, সমস্ত শক্তির তাৎপর্য পাইয়া সে নির্ভয় হয়, সে আনন্দিত হয়।

এই জগতের মধ্যে যে প্রবল প্রচণ্ড শক্তি কেবলমাত্র শক্তিরূপে বিভীষিকা, শান্তং তাহাকেই ফলে-ফুলে প্রাণে-সৌন্দর্যে মঙ্গলময় করিয়া তুলিয়াছেন। কারণ, যিনি শান্তং, তিনিই শিবং। এই শান্তস্বরূপ জগতের সমস্ত উদ্দামশক্তিকে ধারণ করিয়া একটি মঙ্গললক্ষ্যের দিকে লইয়া চলিয়াছেন। শক্তি এই শান্তি হইতে উদ্‌গত ও শান্তির দ্বারা বিধৃত বলিয়াই তাহা মঙ্গলরূপে প্রকাশিত। তাহা ধাত্রীর মতো নিখিলজগৎকে অনাদিকাল হইতে অনিদ্রভাবে প্রত্যেক মুহূর্তেই রক্ষা করিতেছে। তাহা সকলের মাঝখানে আসীন হইয়া বিশ্বসংসারের ছোটো হতে বড়ো পর্যন্ত প্রত্যেক পদার্থকে পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধবন্ধনে বাঁধিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর ধূলিকণাটুকুও লক্ষযোজন দূরবর্তী সূর্যচন্দ্র-গ্রহতারার সঙ্গে নাড়ির যোগে যুক্ত। কেহ কাহারও পক্ষে অনাবশ্যক নহে। এক বিপুল পরিবার এক বিরাট কলেবর রূপে নিখিল বিশ্ব তাহার প্রত্যেক অংশ-প্রত্যংশ তাহার প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্য দিয়া একই রক্ষণসূত্রে, একই পালনসূত্রে গ্রথিত। সেই রক্ষণী শক্তি সেই পালনী শক্তি নানা মূর্তি ধরিয়া জগতে সঞ্চরণ করিতেছে; মৃত্যু তাহার এক রূপ, ক্ষতি তাহার এক রূপ, দুঃখ তাহার এক রূপ; সেই মৃত্যু, ক্ষতি ও দুঃখের মধ্য দিয়াও নবতর প্রকাশের লীলা আনন্দে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ লাভক্ষতি সকলেরই মধ্যেই শিবং শান্তরূপে বিরাজমান। নহিলে এ-সকল ভার এক মুহূর্ত বহন করিত কে। নহিলে আজ যাহা সম্বন্ধবন্ধনরূপে আমাদের পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা যে আঘাত করিয়া আমাদিগকে চূর্ণ করিয়া ফেলিত। যাহা আলিঙ্গন, তাহাই যে পীড়ন হইয়া উঠিত। আজ সূর্য আমার মঙ্গল করিতেছে, গ্রহতারা আমার মঙ্গল করিতেছে, জল-স্থল-আকাশ আমার মঙ্গল করিতেছে, যে বিশ্বের একটি বালুকণাকেও আমি সম্পূর্ণ জানি না, তাহারই বিরাট প্রাঙ্গণে আমি ঘরের ছেলের মতো নিশ্চিন্তমনে খেলা করিতেছি; আমিও যেমন সকলের, সকলেও তেমনি আমার— ইহা কেমন করিয়া ঘটিল? যিনি এই প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর, তিনি নিখিলের সকল আকর্ষণ সকল সম্বন্ধ সকল কর্মের মধ্যে নিগূঢ় হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া সকলকে রক্ষা করিতেছেন। তিনি শিবম্‌।

এই শিবস্বরূপকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকেও সমস্ত অশিব পরিহার করিয়া শিব হইতে হইবে। অর্থাৎ শুভকর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যেমন শক্তিহীনতার মধ্যে শান্তি নাই, তেমনি কর্মহীনতার মধ্যে মঙ্গলকে কেহ পাইতে পারে না। ঔদাসীন্যে মঙ্গল নাই। কর্মসমুদ্র মন্থন করিয়াই মঙ্গলের অমৃত লাভ করা যায়। ভালোমন্দের দ্বন্দ্ব দেবদৈত্যের সংঘাতের ভিতর দিয়া দুর্গম সংসারপথের দুরূহ বাধাসকল কাটাইয়া তবে সেই মঙ্গল-নিকেতনের দ্বারে গিয়া পৌঁছিতে পারি— শুভকর্মসাধনদ্বারা সমস্ত ক্ষতিবিপদ ক্ষোভবিক্ষোভের ঊর্ধ্বে নিজের অপরাজিত হৃদয়ের মধ্যে মঙ্গলকে যখন ধারণ করিব, তখনই জগতের সকল কর্মের সকল উত্থানপতনের মধ্যে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইব, তিনি রহিয়াছেন, যিনি শান্তং যিনি শিবম্‌। তখন ঘোরতর দুর্লক্ষণ দেখিয়াও ভয় পাইব না; নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে আমাদের সমস্ত শক্তিকে যেখানে পরাস্ত দেখিব সেখানেও জানিব, তিনি রাখিয়াছেন, যিনি শিবম্‌।

তিনি অদ্বৈতম্‌। তিনি অদ্বিতীয়, তিনি এক।

সংসারের সব-কিছুকে পৃথক করিয়া বিচিত্র করিয়া গণনা করিতে গেলে বুদ্ধি অভিভূত হইয়া পড়ে, আমাদিগকে হার মানিতে হয়। তবু তো সংখ্যার অতীত এই বৈচিত্র্যের মহাসমুদ্রের মধ্যে আমরা পাগল হইয়া যাই নাই, আমরা তো চিন্তা করিতে পারিতেছি ; অতি ক্ষুদ্র আমরাও এই অপরিসীম বৈচিত্র্যের সঙ্গে তো একটা ব্যাবহারিক সম্বন্ধ পাতাইতে পারিয়াছি। প্রত্যেক ধূলিকণাটির সম্বন্ধে আমাদিগকে তো প্রতিমুহূর্তে স্বতন্ত্র করিয়া ভাবিতে হয় না, সমস্ত পৃথিবীকে তো আমরা একসঙ্গে গ্রহণ করিয়া লই, তাহাতে তো কিছুই বাধে না। কত বস্তু, কত কর্ম, কত মানুষ ; কত লক্ষকোটি বিষয় আমাদের জ্ঞানের মধ্যে বোঝাই হইতেছে ; কিন্তু সে-বোঝার ভারে আমাদের হৃদয়মন তো একেবারে পিষিয়া যায় না। কেন যায় না ? সমস্ত গণনাতীত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসঞ্চার করিয়া তিনি যে আছেন, যিনি একমাত্র, যিনি অদ্বৈতম্। তাই সমস্ত ভার লঘু হইয়া গেছে। তাই মানুষের মন আপনার সকল বোঝা নামাইয়া নিষ্কৃতি পাইবার জন্য অনেকের মধ্যে খুঁজিয়া ফিরিতেছে তাঁহাকে, যিনি অদ্বৈতম্। আমাদের সকলকে লইয়া যদি এই এক না থাকিতেন, তবে আমরা কেহ কাহাকেও কিছুমাত্র জানিতাম কি ? তবে আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোনোপ্রকারের আদানপ্রদান কিছুমাত্র হইতে পারিত কি ? তবে আমরা পরস্পরের ভার ও পরস্পরের আঘাত এক মুহূর্তও সহ্য করিতে পারিতাম কি ? বহুর মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাইলেই তবে আমাদের বুদ্ধির শ্রান্তি দূর হইয়া যায়, পরের সহিত আপনার ঐক্য উপলব্ধি করিলে তবেই আমাদের হৃদয় আনন্দিত হয়। বাস্তবিক প্রধানত আমরা যাহা-কিছু চাই তাহার লক্ষ্যই এই ঐক্য। আমরা ধন চাই, কারণ, এক ধনের মধ্যে ছোটোবড়ো বহুতর বিষয় ঐক্যলাভ করিয়াছে ; সেইজন্য বহুতর বিষয়কে প্রত্যহ পৃথকরূপে সংগ্রহ করিবার দুঃখ ও বিচ্ছিন্নতা ধনের দ্বারাই দূর হয়। আমরা খ্যাতি চাই, কারণ, এক খ্যাতির দ্বারা নানা লোকের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ একেবারেই বাঁধিয়া যায়— খ্যাতি যাহার নাই, সকল লোকের সঙ্গে সে যেন পৃথক। ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, পার্থক্য যেখানে, মানুষের দুঃখ সেখানে, ক্লান্তি সেখানে ; কারণ মানুষের সীমা সেখানেই। যে আত্মীয়, তাহার সঙ্গ আমাকে শ্রান্ত করে না ; যে বন্ধু, সে আমার চিত্তকে প্রতিহত করে না ; যাহাকে আমার নহে বলিয়া জানি, সেই আমাকে বাধা দেয়, সেই, হয় অভাবের, নয় বিরোধের কষ্ট দিয়া আমাকে কিছু-না-কিছু পীড়িত করে। পৃথিবীতে আমরা সমস্ত মিলনের মধ্যে সমস্ত সম্বন্ধের মধ্যে ঐক্যবোধ করিবামাত্র যে আনন্দ অনুভব করি, তাহাতে সেই অদ্বৈতকে নির্দেশ করিতেছে। আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার মূলেই জ্ঞানে-অজ্ঞানে সেই অদ্বৈতের সন্ধান রহিয়াছে। অদ্বৈতই আনন্দ।

এই যিনি অদ্বৈতং, তাঁহার উপাসনা করিব কেমন করিয়া ? পরকে আপন করিয়া, অহমিকাকে খর্ব করিয়া, বিরোধের কাঁটা উৎপাটন করিয়া, প্রেমের পথ প্রশস্ত করিয়া।

আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।
সকল প্রাণীকে আত্মবৎ যে দেখে, সেই যথার্থ দেখে।

কারণ, সে জগতের সমস্ত পার্থক্যের মধ্যে পরম সত্য যে অদ্বৈতং, তাঁহাকেই দেখে। অন্যকে যখন আঘাত করিতে যাই, তখন সেই অদ্বৈতের উপলব্ধিকে হারাই, সেইজন্য তাহাতে দুঃখ দিই ও দুঃখ পাই ; নিজের স্বার্থের দিকে যখন তাকাই, তখন সেই অদ্বৈতং প্রচ্ছন্ন হইয়া যান, সেইজন্যে স্বার্থসাধনার মধ্যে এত মোহ, এত দুঃখ।

জ্ঞানে কর্মে ও প্রেমে শান্তকে শিবকে ও অদ্বৈতকে উপলব্ধি করিবার একটি পর্যায় উপনিষদের 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' মন্ত্রে কেমন নিগূঢ়ভাবে নিহিত আছে, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখো।

প্রথমে শান্তম্। আরম্ভেই জগতের বিচিত্রশক্তি মানুষের চোখে পড়ে। যতক্ষণ শান্তিতে তাহার পর্যাপ্তি দেখিতে না পাই, ততক্ষণ পর্যন্ত কত ভয় কত সংশয় কত অমূলক কল্পনা। সকল শক্তির মূলে যখন অমোঘ নিয়মের মধ্যে দেখিতে পাই শান্তং, তখন আমাদের কল্পনা শান্তি পায়। শক্তির মধ্যে তিনি নিয়মস্বরূপ, তিনি শান্তম্। মানুষ আপন অন্তঃকরণের মধ্যেও প্রবৃত্তিরূপিণী অনেকগুলি শক্তি লইয়া সংসারে প্রবেশ করে ; যতক্ষণ তাহাদের উপর কর্তৃত্বলাভ না করিতে পারে, ততক্ষণ পদে পদে বিপদ, ততক্ষণ দুঃখের সীমা নাই। অতএব এই-সমস্ত শক্তিকে শান্তির মধ্যে সংবরণ করিয়া আনাই

মানুষের জীবনের সর্বপ্রথম কাজ। এই সাধনায় যখন সিদ্ধ হইব, তখন জলে স্থলে আকাশে সেই শান্তস্বরূপকে দেখিব, যিনি জগতের অসংখ্য শক্তিকে নিয়মিত করিয়া অনাদি অনন্তকাল স্থির হইয়া আছেন। এইজন্য আমাদের জীবনের প্রথম আশ্রম ব্রহ্মচর্য— শক্তির মধ্যে শান্তিলাভের সাধনা।

পরে শিবম্। সংযমের দ্বারা শক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই তবে কর্ম করা সহজ হয়। এইরূপে কর্ম যখন আরম্ভ করি, তখন নানা লোকের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে জড়াইয়া পড়িতে হয়। এই আত্মপরের সংস্রবেই যত ভালোমন্দ যত পাপপুণ্য যত আঘাত প্রতিঘাত। শান্তি যেমন শক্তিকে যথোচিতভাবে সংবরণ করিয়া তাহাদের বিরোধভঞ্জন করিয়া দেয়, তেমনি সংসারে আত্মপরের শতসহস্র সম্বন্ধের অপরিসীম জটিলতার মধ্যে কে সামঞ্জস্য স্থাপন করে? মঙ্গল। শান্তি না থাকিলে জগৎপ্রকৃতির প্রলয়, মঙ্গল না থাকিলে মানবসমাজের ধ্বংস। শান্তকে শক্তিসংকুল জগতে উপলব্ধি করিতে হইবে, শিবকে সম্বন্ধসংকুল সংসারে উপলব্ধি করিতে হইবে। তাঁহার শান্তস্বরূপকে জ্ঞানের দ্বারা ও তাঁহার শিবস্বরূপকে শুভকর্মের দ্বারা মনে ধারণা করিতে হইবে। আমাদের শাস্ত্রে বিধান আছে, প্রথমে ব্রহ্মচর্য, পরে গার্হস্থ্য— প্রথমে শিক্ষার দ্বারা প্রস্তুত হওয়া, পরে কর্মের দ্বারা পরিপক্ক হওয়া। প্রথমে শান্তং, পরে শিবম্।

তার পরে অদ্বৈতম্। এইখানেই সমাপ্তি। শিক্ষাতেও সমাপ্তি নয়, কর্মেও সমাপ্তি নয়। কেনই বা শিখিব, কেনই বা খাটিব? একটা কোথাও তো তাহার পরিণাম আছে। সেই পরিণাম অদ্বৈতম্। তাহাই নিরবচ্ছিন্ন প্রেম, তাহাই নির্বিকার আনন্দ। মঙ্গলকর্মের সাধনায় যখন কর্মের বন্ধন ক্ষয় হইয়া যায়, অহংকারের তীব্রতা নষ্ট হইয়া আসে, যখন আত্মপরের সমস্ত সম্বন্ধের বিরোধ ঘুচিয়া যায়, তখনই নম্রতাদ্বারা ক্ষমার দ্বারা করুণার দ্বারা প্রেমের পথ প্রস্তুত হইয়া আসে। তখন অদ্বৈতম্। তখন সমস্ত সাধনার সিদ্ধি, সমস্ত কর্মের অবসান। তখন মানবজীবন তাহার প্রারম্ভ হইতে পরিণাম পর্যন্ত পরিপূর্ণ; কোথাও সে আর অসংগত অসমাপ্ত অর্থহীন নহে।

হে পরমাত্মন, মানবজীবনের সকল প্রার্থনার অভ্যন্তরে একটিমাত্র গভীরতম প্রার্থনা আছে, তাহা আমরা বুদ্ধিতে জানি বা না জানি, তাহা আমরা মুখে বলি বা না বলি, আমাদের ভ্রমের মধ্যেও আমাদের দুঃখের মধ্যেও আমাদের অন্তরাত্মা হইতে সে প্রার্থনা সর্বদাই তোমার অভিমুখে পথ খুঁজিয়া চলিতেছে। সে প্রার্থনা এই যে, আমাদের সমস্ত জ্ঞানের দ্বারা যেন শান্তকে জানিতে পারি, আমাদের সমস্ত কর্মের দ্বারা যেন শিবকে দেখিতে পাই, আমাদের সমস্ত প্রেমের দ্বারা যেন অদ্বৈতকে উপলব্ধি করি। ফললাভের প্রত্যাশা সাহস করিয়া তোমাকে জানাইতে পারি না, কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা এইমাত্র যে, সমস্ত বিঘ্ন-বিক্ষেপ-বিকৃতির মধ্যেও এই প্রার্থনা যেন সমস্ত শক্তির সহিত সত্যভাবে তোমার নিকট উপস্থিত করিতে পারি। অন্য সমস্ত বাসনাকে ব্যর্থ করিয়া, হে অন্তর্যামিন, আমার এই প্রার্থনাকেই গ্রহণ করো যে, আমি কদাপি যেন জ্ঞানে কর্মে প্রেমে উপলব্ধি করিতে পারি যে, তুমি শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

১৩১৬

স্বাতন্ত্র্যের পরিণাম

মানুষকে দুই কূল বাঁচাইয়া চলিতে হয়: তাহার নিজের স্বাতন্ত্র্য এবং সকলের সঙ্গে মিল— দুই বিপরীত কূল। দুটির মধ্যে একটিকেও বাদ দিলে আমাদের মঙ্গল নাই।

স্বাতন্ত্র্য জিনিসটা যে মানুষের পক্ষে বহুমূল্য, তাহা মানুষের ব্যবহারেই বুঝা যায়। ধন দিয়া প্রাণ দিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখিবার জন্য মানুষ কী না লড়াই করিয়া থাকে।

নিজের বিশেষত্বকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য সে কোথাও কোনো বাধা মানিতে চায় না। ইহাতে

যেখানে বাধা পায় সেইখানেই তাহার বেদনা লাগে। সেইখানেই সে ক্রুদ্ধ হয়, লুব্ধ হয়, হনন করে, হরণ করে।

কিন্তু আমাদের স্বাতন্ত্র্য তো অবাধে চলিতে পারে না। প্রথমত, সে যে-সকল মালমসলা যে-সকল ধনজন লইয়া আপনার কলেবর গড়িয়া তুলিতে চায়, তাহাদেরও স্বাতন্ত্র্য আছে ; আমাদের ইচ্ছামত কেবল গায়ের জোরে তাহাদিগকে নিজের কাজে লাগাইতে পারি না। তখন আমাদের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে তাহাদের স্বাতন্ত্র্যের একটা বোঝাপড়া চলিতে থাকে। সেখানে বুদ্ধির সাহায্যে বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা একটা আপস করিয়া লই। সেখানে পরের স্বাতন্ত্র্যের খাতিরে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে কিছু পরিমাণে খাটো করিয়া না আনিলে একেবারে নিষ্ফল হইতে হয়। তখন কেবলই স্বাতন্ত্র্য মানিয়া নয়, নিয়ম মানিয়া জয়ী হইতে চেষ্টা হয়।

কিন্তু এটা দায়ে পড়িয়া করা— ইহাতে সুখ নাই। একেবারে যে সুখ নাই, তাহা নহে। বাধাকে যথাসম্ভব নিজের প্রয়োজনের অনুগত করিয়া আনিতে যে বুদ্ধি ও যে শক্তি খাটে, তাহাতেই সুখ আছে। অর্থাৎ কেবল পাইবার সুখ নয়, খাটাইবার সুখ। ইহাতে নিজের স্বাতন্ত্র্যের জোর স্বাতন্ত্র্যের গৌরব অনুভব করা যায়— বাধা না পাইলে তাহা করা যাইত না। এইরূপে যে অহংকারের উত্তেজনা জন্মে, তাহাতে আমাদের জিতিবার ইচ্ছা, প্রতিযোগিতার চেষ্টা বাড়িয়া উঠে। পাথরের বাধা পাইলে ঝরনার জল যেমন ফেনাইয়া ডিঙাইয়া উঠিতে চায়, তেমনি পরস্পরের বাধায় আমাদের পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য ঠেলিয়া ফুলিয়া উঠে।

যাই হোক, ইহা লড়াই। বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে শক্তিতে শক্তিতে চেষ্টায় চেষ্টায় লড়াই। প্রথমে এই লড়াই বেশির ভাগ গায়ের জোরই খাটাইত, ভাঙিয়া-চুরিয়া কাজ-উদ্ধারের চেষ্টা করিত। ইহাতে যাহাকে চাই, তাহাকেও ছারখার করা হইত ; যে চায়, সেও ছারখার হইত অপব্যয়ের সীমা থাকিত না। তাহার পরে বুদ্ধি আসিয়া কর্মকৌশলের অবতারণা করিল। সে গ্রন্থি ছেদন করিতে চাহিল না, গ্রন্থি মোচন করিতে বসিল। এ কাজটা ইচ্ছার অন্ধতা বা অধৈর্যের দ্বারা হইবার জো নাই ; শান্ত হইয়া সংযত হইয়া শিক্ষিত হইয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে হয়। এখানে জিতিবার চেষ্টা নিজের সমস্ত অপব্যয় বন্ধ করিয়া নিজের বলকে গোপন করিয়া বলী হইয়াছে। ঝরনা যেমন উপত্যকায় পড়িয়া কতকটা বেগসংবরণ করিয়া প্রশস্ত হইয়া উঠে, আমাদের স্বাতন্ত্র্যের বেগ তেমনি বাহুবল ছাড়িয়া বিজ্ঞানে আসিয়া আপনার উগ্রতা ছাড়িয়া উদারতা লাভ করে।

ইহা আপনিই হয়। জোর কেবল নিজেকেই জানে, অন্যকে মানিতে চায় না। কিন্তু বুদ্ধি কেবল নিজের স্বাতন্ত্র্য লইয়া কাজ করিতে পারে না। অন্যের মধ্যে তাহাকে প্রবেশ করিয়া সন্ধান করিতে হয়— অন্যকে সে যতই বেশি করিয়া বুঝিতে পারিবে, ততই নিজের কাজ উদ্ধার করিতে পারিবে. অন্যকে বুঝিতে গেলে, অন্যের দরজায় ঢুকিতে গেলে নিজেকে অন্যের নিয়মের অনুগত করিতেই হয়। এইরূপে স্বাতন্ত্র্যের চেষ্টা জয়ী হইতে গিয়াই নিজেকে পরাধীন না করিয়া থাকিতে পারে না।

এ-পর্যন্ত কেবল প্রতিযোগিতার রণক্ষেত্রে আমাদের পরস্পরের স্বাতন্ত্র্যের জয়ী হইবার চেষ্টাই দেখা গেল। ডারউয়িনের প্রাকৃতিক নির্বাচনতত্ত্ব এই রণভূমিতে লড়াইয়ের তত্ত্ব— এখানে কেহ কাহাকেও রেয়াত করে না, সকলেই সকলের চেয়ে বড়ো হইতে চায়।

কিন্তু ক্রপট্‌কিন প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানবিৎরা দেখাইতেছেন যে পরস্পরকে জিতিবার চেষ্টা, নিজেকে টেঁকাইয়া রাখিবার চেষ্টাই প্রাণিসমাজের একমাত্র চেষ্টা নয়। দল বাঁধিবার, পরস্পরকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা, ঠেলিয়া উঠিবার চেষ্টার চেয়ে অল্প প্রবল নহে ; বস্তুত নিজের বাসনাকে খর্ব করিয়াও পরস্পরকে সাহায্য করিবার ইচ্ছাই প্রাণীদের মধ্যে উন্নতির প্রধান উপায় হইয়াছে।

তবেই দেখিতেছি এক দিকে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্যের স্ফূর্তি এবং অন্য দিকে সমগ্রের সহিত সামঞ্জস্য, এই দুই নীতিই একসঙ্গে কাজ করিতেছে। অহংকার এবং প্রেম, বিকর্ষণ এবং আকর্ষণ সৃষ্টিকে একসঙ্গে গড়িয়া তুলিতেছে।

স্বাতন্ত্র্যেও পূর্ণতালাভ করিব এবং মিলনেও নিজেকে পূর্ণভাবে সমর্পণ করিব, ইহা হইলেই মানুষের

সার্থকতা ঘটে। অর্জন করিয়া আমার পুষ্টি হইবে এবং বর্জন করিয়া আমার আনন্দ হইবে, জগতের মধ্যে এই দুই বিপরীত নীতির মিলন দেখা যাইতেছে। ফলত, নিজেকে যদি পূর্ণ করিয়া না সঞ্চিত করি, তবে নিজেকে পূর্ণরূপে দান করিব কী করিয়া। সে কতটুকু দান হইবে। যতবড়ো অহংকার, তাহা বিসর্জন করিয়া ততবড়ো প্রেম।

এই যে আমি, অতিক্ষুদ্র আমি, এতবড়ো জগতের মাঝখানেও সেই আমি স্বতন্ত্র। চারি দিকে কত তেজ কত বেগ কত বস্তু কত ভার, তাহার আর সীমা নাই, কিন্তু আমার অহংকারকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ করিতে পারে নাই, আমি এতটুকু হইলেও স্বতন্ত্র। আমার যে অহংকার সকলের মধ্যেও ক্ষুদ্র আমাকে ঠেলিয়া রাখিয়াছে, এই অহংকার যে ঈশ্বরের ভোগের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ইহা নিঃশেষ করিয়া তাঁহাকে দিয়া ফেলিলে তবেই যে আনন্দের চূড়ান্ত। ইহাকে জাগাইবার সমস্ত দুঃসহ দুঃখের তবেই যে অবসান। ভগবানের এই ভোগের সামগ্রীটিকে নষ্ট করিয়া ফেলিবে কে।

আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে ঈশ্বরে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিবার পূর্ববর্তী অবস্থায় যত-কিছু দ্বন্দ্ব। তখনই এক দিকে স্বার্থ, আর-একদিকে প্রেম ; এক দিকে প্রবৃত্তি, আর-এক দিকে নিবৃত্তি। সেই দোলায়মান অবস্থায়, এই দ্বন্দ্বের মাঝখানেই যাহা সৌন্দর্যকে ফুটাইয়া তোলে, যাহা ঐক্যের আদর্শরক্ষা করে, তাহাকেই বলি মঙ্গল। যাহা এক দিকে আমার স্বাতন্ত্র্য, অন্যদিকে অন্যের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়াও পরস্পরের আঘাতে বেসুর বাজাইয়া তোলে না, যাহা স্বতন্ত্রকে এক সমগ্রের শান্তি দান করে, যাহা দুই অহংকারকে এক সৌন্দর্যের পরিণয়সূত্রে বাঁধিয়া দেয়, তাহাই মঙ্গল। শক্তি স্বাতন্ত্র্যকে বাড়াইয়া তোলে, মঙ্গল স্বাতন্ত্র্যকে সুন্দর করে, প্রেম স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দেয়। মঙ্গল সেই শক্তি ও প্রেমের মাঝখানে থাকিয়া প্রবল অর্জনকে একান্ত বিসর্জনের দিকেই অগ্রসর করিতে থাকে। এই দ্বন্দ্বের অবস্থাতেই মঙ্গলের রশ্মি লাগিয়া মানবসংসারে সৌন্দর্য প্রাতঃসন্ধ্যার মেঘের মতো বিচিত্র হইয়া উঠে।

নিজের সঙ্গে পরের, স্বার্থের সঙ্গে প্রেমের যেখানে সংঘাত, সেখানে মঙ্গলকে রক্ষা করা বড়ো সুন্দর এবং বড়ো কঠিন। কবিত্ব যেমন সুন্দর তেমনি সুন্দর, এবং কবিত্ব যেমন কঠিন তেমনি কঠিন।

কবি যে-ভাষায় কবিত্ব প্রকাশ করিতে চায়, সে-ভাষা তো তাহার নিজের সৃষ্টি নহে। কবি জন্মিবার বহুকাল পূর্বেই সে-ভাষা আপনার একটা স্বাতন্ত্র্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে। কবি যে-ভাবটি যেমন করিয়া ব্যক্ত করিতে চায়, ভাষা ঠিক তেমনটি করিয়া রাশ মানে না। তখন কবির ভাবের স্বাতন্ত্র্য এবং ভাবপ্রকাশের উপায়ের স্বাতন্ত্র্যে একটা দ্বন্দ্ব হয়। যদি সেই দ্বন্দ্বটা কেবল দ্বন্দ্ব-আকারেই পাঠকের চোখে পড়িতে থাকে, তবে পাঠক কাব্যের নিন্দা করে, বলে, ভাষার সঙ্গে ভাবের মিল হয় নাই। এমন স্থলে কথাটার অর্থগ্রহ হইলেই তাহা হৃদয়কে তৃপ্ত করিতে পারে না। যে-কবি ভাবের স্বাতন্ত্র্য এবং ভাষার স্বাতন্ত্র্যের অনিবার্য দ্বন্দ্বকে ছাপাইয়া সৌন্দর্যরক্ষা করিতে পারেন, তিনি ধন্য হন। যেটা বলিবার কথা তাহা পুরা বলা কঠিন, ভাষার বাধাবশত কতক বলা যায় এবং কতক বলা যায় না— কিন্তু তবু সৌন্দর্যকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, কবির এই কাজ। ভাবের যেটুকু ক্ষতি হইয়াছে সৌন্দর্য তাহার চেয়ে অনেক বেশি পূরণ করিয়া দেয়।

তেমনি আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে সংসারের মধ্যে প্রকাশ করিতেছি। সে সংসার তো আমার নিজের হাতে গড়া নয়। সে আমাকে পদে পদে বাধা দেয়। যেমনটি হইলে সকল দিকে আমার পুরা বিকাশ হইতে পারিত, তেমন আয়োজনটি চারি দিকে নাই ; সুতরাং সংসারে আমার সঙ্গে বাহিরের দ্বন্দ্ব আছেই। কাহারও জীবনে সেই দ্বন্দ্বটাই কেবলই চোখে পড়িতে থাকে ; সে কেবলই বেসুরই বাজাইয়া তোলে। আর কোনো কোনো গুণী সংসারে এই অনিবার্য দ্বন্দ্বের মধ্যেই সংগীত সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহার সমস্ত অভাব ও ব্যাঘাতের উপরেই সৌন্দর্য রক্ষা করেন। মঙ্গলই সেই সৌন্দর্য। সংসারের প্রতিঘাতে তাঁহাদের অবাধ স্বাতন্ত্র্যবিকাশের যে ক্ষতি হয়, মঙ্গল তাহার চেয়ে অনেক বেশি পূরণ করিয়া দেয়। বস্তুত দ্বন্দ্বের বাধাই মঙ্গলের সৌন্দর্যকে প্রকাশিত হইয়া উঠিবার অবকাশ দেয় ; স্বার্থের ক্ষতিই ক্ষতিপূরণের প্রধান উপায় হইয়া উঠে।

এমনি করিয়া দেখা যাইতেছে, স্বাতন্ত্র্য আপনাকে সফলতা দিবার জন্যই আপনারই খর্বতা স্বীকার

করিতে থাকে ; নহিলে তাহা বিকৃতিতে গিয়া পৌঁছে এবং বিকৃতি বিনাশে গিয়া উপনীত হইবেই। স্বাতন্ত্র্য যেখানে মঙ্গলের অনুসরণ করিয়া প্রেমের দিকে না গেছে, সেখানে সে বিনাশের দিকে চলিতেছে। অতিবৃদ্ধিদ্বারা সে বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে বিশ্বপ্রকৃতি তাহার বিরুদ্ধ হইয়া উঠে ; কিছুদিনের মতো উপদ্রব করিয়া তাহাকে মরিতেই হয়।

অতএব মানুষের স্বাতন্ত্র্য যখন মঙ্গলের সহায়তায় সমস্ত দ্বন্দ্বকে নিরস্ত করিয়া দিয়া সুন্দর হইয়া উঠে, তখনই বিশ্বাত্মার সহিত মিলনে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জনের জন্য সে প্রস্তুত হয়। বস্তুত আমাদের দুর্দান্ত স্বাতন্ত্র্য মঙ্গলসোপান হইতে প্রেমে উত্তীর্ণ হইয়া তবেই সম্পূর্ণ হয়, সমাপ্ত হয়।

১৩১৩

ততঃ কিম্

আহারসংগ্রহ ও আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে শিখিলেই পশুপাখির শেখা সম্পূর্ণ হয় ; সে জীবলীলা সম্পন্ন করিবার জন্যই প্রস্তুত হয়।

মানুষ শুধু জীব নহে, মানুষ সামাজিক জীব। সুতরাং জীবনধারণ করা এবং সমাজের যোগ্য হওয়া, এই উভয়ের জন্যই মানুষকে প্রস্তুত হইতে হয়।

কিন্তু সামাজিক জীব বলিলেই মানুষের সব কথা ফুরায় না। মানুষকে আত্মারূপে দেখিলে সমাজে তাহার অন্ত পাওয়া যায় না। যাহারা মানুষকে সেইভাবে দেখিয়াছে, তাহারা বলিয়াছে,

আত্মানং বিদ্ধি— আত্মাকে জানো।

আত্মাকে উপলব্ধি করাই তাহারা মানুষের চরমসিদ্ধি বলিয়া গণ্য করিয়াছে।

নীচের ধাপ বরাবর উপরের ধাপেরই অনুগত। সামাজিক জীবের পক্ষে শুদ্ধমাত্র জীবলীলা সমাজধর্মের অনুবর্তী। ক্ষুধা পাইলেই খাওয়া জীবের প্রবৃত্তি— কিন্তু সামাজিক জীবকে সেই আদিমপ্রবৃত্তি খর্ব করিয়া চলিতে হয়। সমাজের দিকে তাকাইয়া অনেক সময় ক্ষুধাতৃষ্ণাকে উপেক্ষা করাই আমরা ধর্ম বলি। এমন-কি, সমাজের জন্য প্রাণ দেওয়া অর্থাৎ জীবধর্ম ত্যাগ করাও শ্রেয় বলিয়া গণ্য হয়। তবেই দেখা যাইতেছে, জীবধর্মকে সংযত করিয়া সমাজধর্মের অনুকূল করাই সামাজিক জীবের শিক্ষার প্রধান কাজ।

কিন্তু মানুষের সত্যকে যাহারা এইখানেই সীমাবদ্ধ না করিয়া পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা জীবধর্ম ও সমাজধর্ম উভয়কেই সেই আত্ম-উপলব্ধির অনুগত করিবার সাধনাকেই শিক্ষা বলিয়া জানে। এক কথায়, মানবাত্মার মুক্তিই তাহাদের কাছে মানবজীবনের চরমলক্ষ্য— জীবনধারণ ও সমাজরক্ষার সমস্ত লক্ষ্যই ইহার অনুবর্তী।

তবেই দেখা যাইতেছে, মানুষ বলিতে যে যেমন বুঝিয়াছে, সে সেই অনুসারেই মানুষের শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছে— কারণ, মানুষ করিয়া তোলাই শিক্ষা।

আমরা প্রাচীন সংহিতায় ছাত্রশিক্ষার যে আদর্শ দেখিতে পাই, তাহা কবে হইতে এবং কতদূর পর্যন্ত দেশে চলিয়াছিল, তাহার ঐতিহাসিক বিচার করিতে আমি অক্ষম। অন্তত এইটুকু নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, যাঁহারা সমাজের নিয়ন্তা ছিলেন তাঁহাদের মনে শিক্ষার উদ্দেশ্য কী ছিল ; তাঁহারা মানুষকে কী বলিয়া জানিতেন এবং সেই মানুষকে গড়িয়া তুলিবার জন্য কোন্ উপায়কে সকলের চেয়ে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

সংসারে কিছুই নিত্য নয়, অতএব সংসার অসার অপবিত্র এবং তাহাকে ত্যাগ করাই শ্রেয়, এইরূপ বৈরাগ্যধর্মের শ্রেষ্ঠতা য়ুরোপে সাধুগণ মধ্যযুগে প্রচার করিতেন। তখন সন্ন্যাসিদলের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল। য়ুরোপের এখনকার ভাবখানা এই যে, সংসারটা কিছুই নয় বলিয়া মানুষের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মধ্যে একটা চিরস্থায়ী দেবাসুরের ঝগড়া বাধাইয়া রাখিলে মনুষ্যত্বকে খর্ব করা হয়। সংসারের

হিতসাধন করাই সংসারীর জীবনের শেষ লক্ষ্য— ইহাই ধর্মনীতি। এই ধর্মনীতিকে প্রবলভাবে আশ্রয় করিতে গেলে সংসারকে মায়া-ছায়া বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলে না। এই সংসারক্ষেত্রে জীবনের শেষদণ্ড পর্যন্ত পুরাদমে কাজ করিতে পারাই বীরত্ব— লাগামজোতা অবস্থাতেই মরা অর্থাৎ কাজে বিশ্রাম না দিয়াই জীবন শেষ করা ইংরেজের কাছে গৌরবের বিষয় বলিয়া গণ্য হয়।

সংসার যে অনিত্য এ কথা ভুলিয়া, মৃত্যু যে নিশ্চিত এ কথা মনের মধ্যে পোষণ না করিয়া সংসারের সঙ্গে চিরন্তন-সম্বন্ধ-স্থাপনের চেষ্টা করায় য়ুরোপীয়জাতি একটা বিশেষ বললাভ করিয়াছে, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ইহার বিপরীত অবস্থাকে ইহারা morbid অর্থাৎ রুগ্‌ণ অবস্থা বলিয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য এই যে, ছাত্ররা এমন করিয়া মানুষ হইবে, যাহাতে তাহারা শেষ পর্যন্ত প্রাণপণবলে সংসারের কর্মক্ষেত্রে লড়াই করিতে পারে। জীবনকে ইহারা সংগ্রাম বলিয়া জানে; বিজ্ঞানও ইহাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে, জীবিকার লড়াইয়ে যাহারা জেতে, তাহারাই পৃথিবীতে টিকিয়া যায়। এক দিকে "চাইই চাই, নহিলেই নয়" মনের এই গৃধ্নুভাবকে খুব সতেজ রাখিবার জন্য ইহাদের চেষ্টা, অপর দিকে মুঠাটাও ইহারা খুব শক্ত করিতে থাকে। আটঘাট বাঁধিয়া রশারশি কষিয়া দশ আঙুল দিয়া ইহারা আঁটিয়া ধরিতে জানে। পৃথিবীকে কোনো অংশেই এবং কোনোমতেই ছাড়িব না, ইহাই সবলে বলিতে বলিতে মাটি কামড়াইয়া মরিয়া যাওয়া ইহাদের পক্ষে বীরের মৃত্যু। সব জানিব, সব কাড়িব, সব রাখিব, এই প্রতিজ্ঞার সার্থকতা সাধন করিবার শিক্ষাই ইহাদের শিক্ষা।

আমরা বলিয়া আসিয়াছি,

গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ।

মৃত্যু যেন চুলের ঝুঁটি ধরিয়া আছে, এই মনে করিয়া ধর্মাচরণ করিবে। য়ুরোপের সন্ন্যাসীরাও যে এ কথা বলে নাই, তাহা নহে এবং সংসারীকে ভয় দেখাইবার জন্য মৃত্যুর বিভীষিকাকে তাহারা সাহিত্যে চিত্রে এবং নানাস্থানে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আমাদের প্রাচীন সংহিতার মধ্যে যে ভাবটা দেখা যায়, তাহার একটু বিশেষত্ব আছে।

সংসারের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের অন্ত নাই, এমন মনে করিয়া কাজ করিলে কাজ ভালো হয় কি মন্দ হয়, সে পরের কথা— কিন্তু ইহাতে সন্দেহ নাই যে, সে কথা মিথ্যা। সংসারে আমাদের সমুদয় সম্বন্ধেরই যে অবসান আছে, এতবড়ো সত্য কথা আর কিছুই নাই। প্রয়োজনের খাতিরে গালি দিয়া সত্যকে মিথ্যা বলিয়া চালাইলেও সে সমানে আপনার কাজ করিয়া যায়; সোনার রাজদণ্ডকেই যে-রাজা চরম বলিয়া জানে, তাহারও হাত হইতে চরমে সেই রাজদণ্ড ধুলায় খসিয়া পড়ে; লোকালয়ে প্রতিষ্ঠালাভকেই যে-ব্যক্তি একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া জানে, সমস্ত জীবনের সমস্ত চেষ্টার শেষে তাহাকে সেই লোকালয় একলা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। বড়ো বড়ো কীর্তি লুপ্ত হইয়া যায় এবং বড়ো বড়ো জাতিকেও উন্নতির নাট্যমঞ্চ হইতে প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া রঙ্গলীলা সমাধা করিতে হয়। এ-সব অত্যন্ত পুরাতন কথা, তবু ইহা কিছুমাত্র মিথ্যা নহে।

সকল সম্বন্ধেরই অবসান হয়, কিন্তু তাই বলিয়া অবসান হইবার পূর্বে তাহাকে অস্বীকার করিলে তো চলে না। অবসানের পরে যাহা অসত্য, অবসানের পূর্বে তো তাহা সত্য। যাহা যে-পরিমাণে সত্য তাহাকে সেই পরিমাণে যদি না মানি তবে হয় সে আমাদিগকে কানে ধরিয়া মানাইবে, নয়তো কোনোদিন কোনোদিক দিয়া সুদসুদ্ধ শোধ করিয়া লইবে।

ছাত্র বিদ্যালয়ে চিরদিন পড়ে না, পড়ার একদিন অবসান হয়ই। কিন্তু যতদিন বিদ্যালয়ে আছে, ততদিন সে যদি পড়াটাকে যথার্থভাবে স্বীকার করিয়া লয়, তবেই পড়ার অবসানটা প্রকৃত হয়— তবেই বিদ্যালয় হইতে নিষ্কৃতি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ হয়। যদি সে জোর করিয়া বিদ্যালয় হইতে অবসর লয়, তবে চিরদিন ধরিয়া অসম্পূর্ণ বিদ্যার ফল তাহাকে ভোগ করিতে হয়। পথ গম্যস্থান নয়, এ কথা ঠিক— পথের সমাপ্তিই আমাদের লক্ষ্য, কিন্তু আগে পথটাকে ভোগ না করিলে তাহার সমাপ্তিটাই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

তবেই দেখা যাইতেছে, জগতের সম্বন্ধগুলিকে আমরা ধ্বংস করিতে পারি না, তাহাদের ভিতর দিয়া গিয়া তাহাদিগকে উত্তীর্ণ হইতে পারি। অর্থাৎ সকল সম্বন্ধ যেখানে আসিয়া মিলিয়াছে, সেইখানে পৌঁছিতে পারি। অতএব, ঠিকভাবে এই ভিতর দিয়া যাওয়াটাই সাধনা— কোনো সম্বন্ধকে নাই বলিয়া বিমুখ হওয়াই সাধনা নহে। পথকে যদি বৈরাগ্যের জোরে ছাড়িয়া দাও, অপথে তবে সাতগুণ বেশি ঘুর খাইয়া মরিতে হইবে।

জর্মান মহাকবি গ্যয়টে তাঁহার ফাউস্ট নাটকে দেখাইয়াছেন যে-ব্যক্তি মানব প্রবৃত্তিকে উপবাসী রাখিয়া সংসারের লীলাভূমি হইতে উচ্চে নিভৃতে বসিয়া জ্ঞানসংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিল, সংসারের ধুলার উপরে বহুজোরে আছাড় খাইয়া তাহাকে কেমনতরো শক্ত জ্ঞান লাভ করিতে হইয়াছিল। মুক্তির প্রতি অসময়ে অযথা লোভ করিয়া যেটুকু ফাঁকি দিতে যাইব, সেটুকু তো শোধ করিতেই হইবে, তাহার উপরে আবার ফাঁকির চেষ্টার জন্য দণ্ড আছে। বেশি তাড়াতাড়ি করিতে গেলেই বেশি বিলম্ব ঘটিয়া যায়।

বস্তুত গ্রহণ এবং বর্জন, বন্ধন এবং বৈরাগ্য, এই দুটাই সমান সত্য— একের মধ্যেই অন্যটির বাসা, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া সত্য নহে। দুইকে যথার্থরূপে মিলাইতে পারিলেই তবে পূর্ণতা লাভ করিতে পারা যায়। শংকর ত্যাগের এবং অন্নপূর্ণা ভোগের মূর্তি— উভয়ে মিলিয়া যখন একাঙ্গ হইয়া যায়, তখনই সম্পূর্ণতার আনন্দ। আমাদের জীবনে যেখানেই এই শিব ও শিবানীর বিচ্ছেদ, যেখানেই বন্ধন ও মুক্তির একত্রে প্রতিষ্ঠা নাই, যেখানেই অনুরাগ ও বৈরাগ্যের বিরোধ ঘটিয়াছে সেইখানেই যত অশান্তি, যত নিরানন্দ। সেইখানেই আমরা লইতে চাই, দিতে চাই না ; সেইখানেই আমরা নিজের দিকে টানি, অন্যের দিকে তাকাই না ; সেইখানেই আমরা যাহাকে ভোগ করি, তাহার আর অন্ত দেখিতে পাই না— অন্ত দেখিলে বিধাতাকে ধিক্কার দিয়া হাহাকার করিতে থাকি ; সেখানেই কর্মে আমাদের প্রতিযোগিতা, ধর্মেও আমাদের বিদ্বেষ ; সেখানেই কোনো-কিছুরই যেন স্বাভাবিক পরিণাম নাই, অপঘাতমৃত্যুতেই সমস্ত ব্যাপারের অকস্মাৎ বিলোপ।

জীবনটাকে না-হয় যুদ্ধ বলিয়াই গণ্য করা গেল। এই যুদ্ধ ব্যাপারে যদি কেবল ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিবার বিদ্যা আমাদের শেখা থাকে, ব্যূহ হইতে বাহির হইবার কৌশল আমরা না জানি, তবে সপ্তরথী ঘিরিয়া যে আমাদিগকে মারিবে। সেরূপ মরিয়াও আমরা বীরত্ব দেখাইতে পারি, কিন্তু যুদ্ধে জয় তো তাহাকে বলে না। অপর পক্ষে, যাহারা ব্যূহের মধ্যে একেবারে প্রবেশ করিতেই বিরত, সেই কাপুরুষদের বীরের সদ্‌গতি নাই। প্রবেশ করা এবং বাহির হওয়া, এই দুয়ের দ্বারাতেই জীবনের চরিতার্থতা।

প্রাচীন সংহিতাকারগণ হিন্দুসমাজে হরগৌরীকে অভেদাঙ্গ করিতে চাহিয়াছিলেন— বিশ্বচরাচর যে গ্রহণ ও বর্জন, যে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, যে কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ, যে স্ত্রী ও পুরুষ ভাবের নিয়ত সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া সত্য ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে, সমাজকে তাঁহারা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সকল দিকে সেই বৃহৎ সামঞ্জস্যের উপরে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শিব ও শক্তির, নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সম্মিলনই সমাজের একমাত্র মঙ্গল, এবং শিব ও শক্তির বিরোধই সমাজের সমস্ত অমঙ্গলের কারণ, ইহাই তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন।

এই সামঞ্জস্যকে আশ্রয় করিতে হইলে প্রথমে মানুষকে সত্যভাবে দেখিতে হইবে। অর্থাৎ তাহাকে কোনো একটা বিশেষ প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে চলিবে না। আমরা যদি আম্রকে অম্বল খাওয়ার দিক হইতে দেখি, তাহা হইলে তাহাকে সমগ্রভাবে দেখি না ; এইজন্য তাহার স্বাভাবিক পরিণামে বাধা ঘটাই ; তাহাকে কাঁচা পাড়িয়া আনিয়া তাহার কষিটাকে মাটি করিয়া দিই! গাছকে যদি জ্বালানি কাঠ বলিয়াই দেখি, তবে তাহার ফলফুলপাতার কোনো তাৎপর্যই দেখিতে পাই না। তেমনি মানুষকে যদি রাজ্যরক্ষার উপায় মনে করি, তবে তাহাকে সৈনিক করিয়া তুলিব, তাহাকে যদি জাতীয়সমৃদ্ধিবৃদ্ধির হেতু বলিয়া গণ্য করি, তবে তাহাকে বণিক করিবার একান্ত চেষ্টা করিব— এমনি করিয়া আমাদের আবহমান সংস্কার অনুসারে যেটাকেই আমরা পৃথিবীতে সকলের চেয়ে অভিলষিত

বলিয়া জানি, মানুষকে তাহারই উপকরণমাত্র বলিয়া দেখিব ও সেই প্রয়োজনসাধনকেই মানুষের সার্থকতা বলিয়া মনে করিব। এমন করিয়া দেখাতে কোনো হিত হয় না, তাহা নহে— কিন্তু সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া শেষকালে অহিত আসিয়া পড়ে— এবং যাহাকে তারা মনে করিয়া আকাশে উড়াই তাহা খানিকক্ষণ ঠিক তারার মতোই ভঙ্গি করে, তাহার পরে পুড়িয়া ছাই হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়।

আমাদের দেশে একদিন মানুষকে সমস্ত প্রয়োজনের চেয়ে কিরূপ বড়ো করিয়া দেখা হইয়াছিল, তাহা সাধারণে প্রচলিত একটি চাণক্যশ্লোকেই দেখা যায়—

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ ॥

মানুষের আত্মা কুলের চেয়ে, গ্রামের চেয়ে, দেশের চেয়ে, সমস্ত পৃথিবীর চেয়ে বড়ো। অন্তত কাহারও চেয়ে ছোটো নয়। প্রথমে মানুষের আত্মাকে এইরূপে সমস্ত দেশিক ও ক্ষণিক প্রয়োজন হইতে পৃথক করিয়া তাহাকে বিশুদ্ধ ও বৃহৎ করিয়া দেখিতে হইবে, তবেই সংসারের সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্গে তাহার সত্য সম্বন্ধ, জীবনের ক্ষেত্রের মধ্যে তাহার যথার্থ স্থান নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়।

আমাদের দেশে তাই করা হইয়াছিল ; শাস্ত্রকারগণ মানুষের আত্মাকে অত্যন্ত বড়ো করিয়া দেখিয়াছিলেন। মানুষের মর্যাদার কোথাও সীমা ছিল না, ব্রহ্মের মধ্যেই তাহার সমাপ্তি। আর যাহাতেই মানুষকে শেষ করিয়া দেখো, তাহাকে মিথ্যা করিয়া দেখা হয়— তাহাকে citizen করিয়া দেখো, কিন্তু কোথায় আছে city আর কোথায় আছে সে, cityতে তাহার পর্যাপ্তি নহে ; তাহাকে patriot করিয়া দেখো, কিন্তু দেশেই তাহার শেষ পাওয়া যায় না, দেশ তো জলবিম্ব ; সমস্ত পৃথিবীই বা কী।

ভর্তৃহরি, যিনি এক সময়ে রাজা ছিলেন, তিনি বলিয়াছেন—

প্রাপ্তাঃ শ্রিয়ঃ সকলকামদুঘাস্ততঃ কিং।
ন্যস্তং পদং শিরসি বিদ্বিষতাং ততঃ কিম্ ॥
সম্পাদিতাঃ প্রণয়িনো বিভবৈস্ততঃ কিং।
কল্পস্থিতাস্তনুভৃতাং তনবস্ততঃ কিম্ ॥

সকলকাম্যফলপ্রদ লক্ষ্মীকেই না-হয় লাভ করিলে, তাহাতেই বা কী ; শত্রুদের মাথার উপরেই না-হয় পা রাখিলে, তাহাতেই বা কী ; না-হয় বিভবের বলে বহু সুহৃদ সংগ্রহ করিলে, তাহাতেই বা কী ; দেহধারীদের দেহগুলিকে না-হয় কল্পকাল বাঁচাইয়া রাখিলে, তাহাতেই বা কী।

অর্থাৎ এই-সমস্ত কামনার বিষয়ের দ্বারা মানুষকে খাটো করিয়া দেখিলে চলিবে না, মানুষ ইহার চেয়েও বড়ো। মানুষের সেই যে সকলের চেয়ে বড়ো সত্য, যাহা অনাদি হইতে অনন্তের অভিমুখ, তাহাকে মনে রাখিলে তবেই তাহার জীবনকে সজ্ঞানভাবে সম্পূর্ণতার পথে চালনা করিবার উপায় করা যাইতে পারে। কিন্তু মানুষকে যদি সংসারের জীব বলিয়াই মানি, তবে তাহাকে সংসারের প্রয়োজনের মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া ছোটো করিয়া ছাঁটিয়া কাটিয়া লই।

আমাদের দেশের প্রাচীন মনীষীরা মানুষের আত্মাকে বড়ো করিয়া দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের জীবনযাত্রার আদর্শ য়ুরোপের সহিত স্বতন্ত্র হইয়াছে— তাঁহারা জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত খাটিয়া মরাকে গৌরবের বিষয় মনে করেন নাই— কর্মকেই তাঁহারা শেষলক্ষ্য না করিয়া কর্মের দ্বারা কর্মকে ক্ষয় করাই চরম সাধনার বিষয় বলিয়া জানিয়াছিলেন। আত্মার মুক্তিই যে প্রত্যেক মানুষের একমাত্র শ্রেয়, এ বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ ছিল না।

য়ুরোপে স্বাধীনতার গৌরব সকল সময়েই গাওয়া হইয়া থাকে। এই স্বাধীনতার অর্থ আহরণ করিবার স্বাধীনতা, ভোগ করিবার স্বাধীনতা, কাজ করিবার স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা বড়ো কম জিনিস নয়— এ সংসারে ইহাকে রক্ষা করিতে অনেক শক্তি এবং আয়োজন আবশ্যক হয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষ ইহার প্রতিও অবজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিল— ততঃ কিম্। এ স্বাধীনতাকে সে স্বাধীনতা

বলিয়াই স্বীকার করে নাই। ভারতবর্ষ কামনার উপরে, কর্মের উপরেও স্বাধীন হইতে চাহিয়াছিল।

কিন্তু স্বাধীন হইলাম মনে করিলেই তো স্বাধীন হওয়া যায় না।— নিয়ম অর্থাৎ অধীনতার ভিতর দিয়া না গেলে স্বাধীন হওয়া যায় না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে যদি বড়ো মনে কর, তবে সৈনিকরূপে স্বাধীন হইতে হইবে, বণিকরূপে অধীন হইতে হইবে। ইংলণ্ডে যে কত লক্ষ সৈনিক আছে, তাহারা কি স্বাধীন? মনুষ্যত্বকে যে তাহারা মানুষমারা কলে পরিণত করিয়াছে, তাহারা সজীব বন্দুকমাত্র। কত লক্ষ মজুর খনির অন্ধ রসাতলে, কারখানার অগ্নিকুণ্ডে থাকিয়া ইংলণ্ডের রাজ্যশ্রীর পায়ের তলায় বুকের রক্ত দিয়া আলতা পরাইতেছে। তাহারা কি স্বাধীন? তাহারা তো নির্জীব কলের সজীব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। য়ুরোপে স্বাধীনতার ফলভোগ করিতেছে কয়জন? তবে স্বাধীনতা কাহাকে বলে? Individualism অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য য়ুরোপের সাধনার বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির পরতন্ত্রতা এত বেশি কি অন্যত্র দেখা গিয়াছে?

ইহার উত্তরে একটা স্বতোবিরোধী কথা বলিতে হয়। পরতন্ত্রতার ভিতর দিয়াই স্বাতন্ত্র্যে যাইবার পথ। বাণিজ্যে তুমি যতবড়ো লাভের টাকা আনিতে চাও, ততবড়ো মূলধনের টাকা ফেলিতে হইবে। টাকা কিছুই খাটিতেছে না, কেবলই লাভ করিতেছে, ইহা হয় না। স্বাতন্ত্র্য তেমনি সুদের মতো, বিপুল পরতন্ত্রতা খাটাইয়া তবে সেইটুকু লাভ হইতেছে— আগাগোড়া সমস্তটাই লাভ, আগাগোড়া সমস্তই স্বাধীনতা, এ কখনো সম্ভবপর নহে।

আমাদের দেশেরও সাধনার বিষয় ছিল Individualism— ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। কিন্তু সে তো কোনো ছোটোখাটো স্বাতন্ত্র্য নয়। সেই স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ একেবারে মুক্তিতে গিয়া ঠেকিয়াছে। ভারতবর্ষ প্রত্যেক লোককে জীবনের প্রতিদিনের ভিতর দিয়া, সমাজের প্রত্যেক সম্বন্ধের ভিতর দিয়া সেই মুক্তির অধিকার দিবার চেষ্টা করিয়াছে। য়ুরোপে যেমন কঠোর পরতন্ত্রতার ভিতর দিয়া স্বাতন্ত্র্য বিকাশ পাইতেছে, আমাদের দেশেও তেমনি নিয়মসংযমের নিবিড় বন্ধনের ভিতর দিয়াই মুক্তির উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে। সেই মুক্তির পরিণামকে লক্ষ্য হইতে বাদ দিয়া যদি কেবল নিয়মসংযমকেই একান্ত করিয়া দেখি, তবে বলিতেই হয়, আমাদের দেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের খর্বতা বড়ো বেশি।

আসল কথা, কোনো দেশের যখন দুর্গতির দিন আসে, তখন সে মুখ্য জিনিসটাকে হারায়, অথচ গৌণটা জঞ্জাল হইয়া জায়গা জুড়িয়া বসে। তখন পাখি উড়িয়া পালায়, খাঁচা পড়িয়া থাকে। আমাদের দেশেও তাই ঘটিয়াছে। আমরা এখনো নানাবিধ বাঁধাবাঁধি মানিয়া চলি, অথচ তাহার পরিণামের প্রতি লক্ষ নাই। মুক্তির সাধনা আমাদের মনের মধ্যে আমাদের ইচ্ছার মধ্যে নাই, অথচ তাহার বন্ধনগুলি আমরা আপাদমস্তক বহন করিয়া বেড়াইতেছি। ইহাতে আমাদের দেশের যে মুক্তির আদর্শ, তাহা তো নষ্ট হইতেছেই, য়ুরোপের যে স্বাধীনতার আদর্শ, তাহার পথেও পদে পদে বাধা পড়িতেছে। সাত্ত্বিকতার যে পূর্ণতা তাহা ভুলিয়াছি, রাজসিকতার যে ঐশ্বর্য তাহাও দুর্লভ হইয়াছে, কেবল তামসিকতার যে নিরর্থক অভ্যাসগত বোঝা তাহাই বহন করিয়া নিজেকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিতেছি। অতএব এখনকার দিনে আমাদের দিকে তাকাইয়া যদি কেহ বলে, ভারতবর্ষের সমাজ মানুষকে কেবল আচারে-বিচারে আটে-ঘাটে বন্ধন করিবারই ফাঁদ, তবে মনে রাগ হইতে পারে কিন্তু জবাব দেওয়া কঠিন। পুকুর যখন শুকাইয়া গেছে, তখন তাহাকে যদি কেহ গর্ত বলে, তবে তাহা আমাদের পৈতৃকসম্পত্তি হইলেও চুপ করিয়া থাকিতে হয়। আসল কথা, সরোবরের পূর্ণতা এককালে যতই সুগভীর ছিল, শুষ্ক অবস্থায় তাহার রিক্ততার গর্তটাও ততই প্রকাণ্ড হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষেও মুক্তির লক্ষ্য যে একদা কত সচেষ্ট ছিল, তাহা এখনকার দিনের নিরর্থক বাঁধাবাঁধি, অনাবশ্যক আচার-বিচারের দ্বারাই বুঝা যায়। য়ুরোপেও কালক্রমে যখন শক্তির হ্রাস হইবে, তখন নিয়মের অসংখ্য জালের দ্বারাই তাহার পূর্বতন স্বাতন্ত্র্যচেষ্টার পরিমাপ হইবে। এখনই কি ভাব অনুভব করিয়া সে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে না? এখনই কি তাহার উপায় ক্রমশ উদ্দেশ্যকে ছাড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে না?

কিন্তু সে তর্ক থাক; আসল কথা এই, যদি লক্ষ্য সজাগ থাকে, তবে নিয়মসংযমের বন্ধনই মুক্তির

একমাত্র উপায়। ভারতবর্ষ একদিন নিয়মের দ্বারা সমাজকে খুব করিয়া বাঁধিয়াছিল। মানুষ সমাজের মধ্য দিয়া সমাজকে ছাড়াইয়া যাইবে বলিয়াই বাঁধিয়াছিল। ঘোড়াকে তাহার সওয়ার লাগাম দিয়ে বাঁধে কেন, এবং নিজেই বা তাহার সঙ্গে রেকাবের দ্বারা বদ্ধ হয় কেন— ছুটিতে হইবে বলিয়া, দূরের লক্ষ্যস্থানে যাইতে হইবে বলিয়া। ভারতবর্ষ জানিত, সমাজ মানুষের শেষলক্ষ্য নহে, মানুষের চির-অবলম্বন নহে— সমাজ হইয়াছে মানুষকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য। সংসারের বন্ধন ভারতবর্ষ বরঞ্চ বেশি করিয়াই স্বীকার করিয়াছে তাহার হাত হইতে বেশি করিয়া নিষ্কৃতি পাইবার অভিপ্রায়ে।

এইরূপে বন্ধন ও মুক্তি, উপায় ও উদ্দেশ্য, উভয়কেই মান্য করিবার কথা প্রাচীন উপনিষদের মধ্যেও দেখা যায়। ঈশোপনিষৎ বলিতেছেন—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো যউ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা অর্থাৎ সংসারের উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতমসের মধ্যে প্রবেশ করে; তদপেক্ষাও ভূয় অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে তাহারা, যাহারা কেবলমাত্র ব্রহ্মবিদ্যায় নিরত।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কেই যিনি একত্র করিয়া জানেন, তিনি অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাদ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হন।

মৃত্যুকে প্রথমে উত্তীর্ণ হইতে হইবে, তাহার পরে অমৃতলাভ। সংসারের ভিতর দিয়া এই মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইতে হয়। কর্মের মধ্যে প্রবৃত্তিকে যথার্থভাবে নিযুক্ত করিয়া আগে সেই প্রবৃত্তিকে ও কর্মকে ক্ষয় করিয়া ফেলা, তার পরে ব্রহ্মলাভের কথা— সংসারকে বলপূর্বক অস্বীকার করিয়া কেহ অমৃতের অধিকার পাইতে পারে না।

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥

কর্ম করিয়া শতবৎসর ইহলোকে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে— হে নর, তোমার পক্ষে ইহার আর অন্যথা নাই; কর্মে লিপ্ত হইবে না, এমন পথ নাই।

মানুষকে পূর্ণতালাভ করিতে হইলে পরিপূর্ণ জীবন এবং সম্পূর্ণ কর্মের প্রয়োজন হয়। জীবন সম্পূর্ণ হইলেই জীবনের প্রয়োজন নিঃশেষ হইয়া যায়, কর্ম সমাপ্ত হইলেই কর্মের বন্ধন শিথিল হইয়া আসে।

জীবনকে ও জীবনের অবসানকে, কর্মকে ও কর্মের সমাপ্তিকে এইরূপ অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করিতে হইলে যে-কথাটি মনে রাখিতে হইবে, তাহা ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকেই রহিয়াছে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
ঈশ্বরের দ্বারা এই জগতের সমস্ত যাহা-কিছু আচ্ছন্ন জানিবে।

এবং

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

তিনি যাহা ত্যাগ করিতেছেন— তিনি যাহা দিতেছেন, তাহাই ভোগ করিবে, অন্য কাহারও ধনে লোভ করিবে না।

সংসারকে যদি ব্রহ্মের দ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া জানিতে পারি, তাহা হইলে সংসারের বিষ কাটিয়া যায়, তাহার সংকীর্ণতা দূর হইয়া তাহার বন্ধন আমাদিগকে আঁটিয়া ধরে না। এবং সংসারের ভোগকে ঈশ্বরের দান বলিয়া গ্রহণ করিলে কাড়াকাড়ি-মারামারি থামিয়া যায়।

এইরূপে সংসারকে, সংসারের সুখকে, কর্মকে ও জীবনকে ব্রহ্ম-উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত করিয়া খুব বড়ো করিয়া জানাটা হইল সমাজ-রচনার, জীবন-নির্বাহের গোড়াকার কথা।

ভারতবর্ষ এই ভূমার সুরেই সমাজকে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সমাজকে বাঁধিয়া মানুষের

আত্মাকে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। শরীরকে অপবিত্র বলিয়া পীড়া দিতে চায় নাই, সমাজকে কলুষিত বলিয়া পরিহার করিতে চায় নাই, জীবনকে অনিত্য বলিয়া অবজ্ঞা করিতে চায় নাই— সে সমস্তকেই ব্রহ্মের দ্বারা অখণ্ড-পরিপূর্ণ করিতে চাহিয়াছিল।

য়ুরোপে মানুষের জীবনের দুইটি ভাগ দেখা যায়। এক শেখার অবস্থা— তাহার পরে সংসারের কাজ করিবার অবস্থা। এইখানেই শেষ।

কিন্তু কাজ জিনিসটাকে তো কোনো-কিছুর শেষ বলা যায় না। লাভই শেষ। শক্তিকে শুদ্ধমাত্র খাটাইয়া চলাই তো শক্তির পরিণাম নহে, সিদ্ধিতে পৌঁছানোই পরিণাম। আগুনে কেবল ইন্ধন চাপানোই তো লক্ষ্য নহে, রন্ধনেই তাহার সার্থকতা। কিন্তু য়ুরোপ মানুষকে এমন-কোনো জায়গায় লক্ষ্যস্থাপন করিতে দেয় নাই, কাজ যেখানে তাহার স্বাভাবিক পরিণামে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতে পারে। টাকা সংগ্রহ করিতে চাও, সংগ্রহের তো শেষ নাই ; জগতের খবর জানিতে চাও, জানার তো অন্ত নাই ; সভ্যতাকে progress বলিয়া থাক, প্রোগ্রেস শব্দের অর্থই এই দাঁড়াইয়াছে যে, কেবলই পথে চলা কোথাও ঘরে না পৌঁছানো। এইজন্য জীবনকে না-শেষের মধ্যে হঠাৎ শেষ করা, না-থামার মধ্যে হঠাৎ থামিয়া যাওয়া য়ুরোপের জীবনযাত্রা। Not the game but the chase— শিকার পাওয়া নহে, শিকারের পশ্চাতে অনুধাবন করাই য়ুরোপের কাছে আনন্দের সারভাগ বলিয়া গণ্য হয়।

যাহা হাতে পাওয়া যায়, তাহাতে সুখ নাই, এ কথা কি আমরাও বলি না ? আমরাও বলি—

নিঃস্বো ব্যষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো।
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ ॥
চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতির্ব্রাহ্মং পদং বাঞ্ছতি।
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরিঃ শিবপদং ত্বাশাবধিং কো গতঃ ॥

এক কথায়, যে যাহা পায়, তাহাতে তাহার আশা মিটে না— যতই বেশি পাও-না কেন, তাহার চেয়ে বেশি পাইবার দিকে মন ছুটে। তবে আর কাজের অন্ত হইবে কেমন করিয়া ? পাওয়াতে যখন চাওয়ার শেষ নহে, তখন অসম্পূর্ণ আশার মধ্যে অসমাপ্ত কর্ম লইয়া মরাই মানুষের একমাত্র গতি বলিয়া মনে হয়।

এইখানে ভারতবর্ষ বলিয়াছেন, আর-সমস্ত পাওয়ার এই লক্ষণ বটে, কিন্তু এক জায়গায় পাওয়ার সমাপ্তি আছে। সেইখানেই যদি লক্ষ্যস্থাপন করি, তবে কাজের অবসান হইবে, আমরা ছুটি পাইব। কোনোখানেই চাওয়ার শেষ নাই, জগৎটা এতবড়ো একটা ফাঁকি, জীবনটা এতবড়ো একটা পাগলামি হইতেই পারে না। মানুষের জীবনসংগীতে কেবলই অবিশ্রাম তানই আছে, আর কোনো জায়গাতেই সম নাই, এ কথা আমরা মানি না। অবশ্য এ কথা বলিতে হইবে, তান যতই মনোহর হউক, তাহার মধ্যে গানের অকস্মাৎ শেষ হইলে রসবোধে আঘাত লাগে, সমে আসিয়া শেষ হইলে সমস্ত তানের লীলা নিবিড় আনন্দের মধ্যে পরিসমাপ্ত হয়।

ভারতবর্ষ তাই কাজের মাঝখানে জীবনকে মৃত্যু দ্বারা হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হইতে উপদেশ দেন নাই। পুরাদমের মধ্যেই সাঁকো ভাঙিয়া হঠাৎ অতলে তলাইয়া যাইতে বলেন নাই, তাহাকে ইস্টিশনে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। সংসার কোনোদিন সমাপ্ত হইবে না, এ কথা ঠিক ; জীবসৃষ্টির আরম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত উন্নতি-অবনতির ঢেউখেলার মধ্য দিয়া সংসার চলিয়া আসিতেছে, তাহার বিরাম নাই। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের সংসারলীলার যখন শেষ আছে, তখন মানুষ যদি একটা সম্পূর্ণতার উপলব্ধিকে না জানিয়া প্রস্থান করে, তবে তাহার কী হইল ?

বাহিরে কিছুর শেষ নাই, কেবলই একটা হইতে আর-একটা বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই চির-চলমান বহিঃসংসারের দোলায় দুলিয়া আমরা মানুষ হইয়াছি— আমার পক্ষে একদিন সে-দোলার কাজ ফুরাইলেও কোনোদিন একবারে তাহার কাজ শেষ হইবে না। এই কথা মনে করিয়া, আমার যতটুকু সাধ্য, এই প্রবাহের পথকে আগে ঠেলিয়া দিতে হইবে। ইহার জ্ঞানের ভাণ্ডারে আমার সাধ্যমত জ্ঞান, ইহার কর্মের চক্রে আমার সাধ্যমত বেগ সঞ্চার করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া বাহিরের এই

অশেষের মধ্যে আমিসুদ্ধ ভাসিয়া গেলে নষ্ট হইতে হইবে। অন্তরের মধ্যে একটা সমাধার পন্থা আছে। বাহিরে উপকরণের অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরে সন্তোষ আছে ; বাহিরে দুঃখবেদনার অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরে ধৈর্য আছে ; বাহিরে প্রতিকূলতার অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরে ক্ষমা আছে ; বাহিরে লোকের সহিত সম্বন্ধভাবের অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরে প্রেম আছে ; বাহিরে সংসারের অন্ত নাই, কিন্তু আত্মাতে আত্মা সম্পূর্ণ। এক দিকের অশেষের দ্বারাতেই আর-এক দিকের অখণ্ডতার উপলব্ধি পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। গতির দ্বারাতেই স্থিতিকে মাপিয়া লইতে হয়।

এইজন্য ভারতবর্ষ মানুষের জীবনকে যেরূপ বিভক্ত করিয়াছিলেন, কর্ম তাহার মাঝখানে ও মুক্তি তাহার শেষে।

দিন যেমন চার স্বাভাবিক অংশে বিভক্ত— পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ এবং সায়াহ্ন, ভারতবর্ষ জীবনকে সেইরূপ চারি আশ্রমে ভাগ করিয়াছিল। এই বিভাগ স্বভাবকে অনুসরণ করিয়াই হইয়াছিল। আলোক ও উত্তাপের ক্রমশ বৃদ্ধি এবং ক্রমশ হ্রাস যেমন দিনের আছে, তেমনি মানুষেরও ইন্দ্রিয়শক্তির ক্রমশ উন্নতি এবং ক্রমশ অবনতি আছে। সেই স্বাভাবিক ক্রমকে অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষ জীবনের আরম্ভ হইতে জীবনান্ত পর্যন্ত একটি অখণ্ড তাৎপর্যকে বহন করিয়া লইয়া গেছে। প্রথমে শিক্ষা, তাহার পরে সংসার, তাহার পরে বন্ধনগুলিকে শিথিল করা, তাহার পরে মুক্তি ও মৃত্যুর মধ্যে প্রবেশ— ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও প্রব্রজ্যা।

আধুনিককালে আমরা জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর একটা বিরোধ অনুভব করি। মৃত্যু যে জীবনের পরিণাম, তাহা নহে, মৃত্যু যেন জীবনের শত্রু। জীবনের পর্বে পর্বে আমরা অক্ষমভাবে মৃত্যুর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া চলিতে থাকি। যৌবন চলিয়া গেলেও আমরা যৌবনকে টানাটানি করিয়া রাখিতে চাই। ভোগের আগুন নিবিয়া আসিতে থাকিলেও আমরা নানাপ্রকার কাঠখড় জোগাইয়া তাহাকে জাগাইয়া রাখিতে চাই। ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস হইয়া আসিলেও আমরা প্রাণপণে কাজ করিতে চেষ্টা করি। মুষ্টি যখন স্বভাবতই শিথিল হইয়া আসে, তখনো আমরা কোনোমতেই কোনো-কিছুর দখল ছাড়িতে চাই না। প্রভাত ও মধ্যাহ্ন ছাড়া আমাদের জীবনের আর-কোনো অংশকে আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে ইচ্ছা করি না। অবশেষে যখন আমাদের চেয়ে প্রবলতর শক্তি কানে ধরিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য করায়, তখন হয় বিদ্রোহ, নয় বিষাদ উপস্থিত হয়— তখন আমাদের সেই পরাভব কেবল রণে-ভঙ্গরূপেই পরিণত হয়, তাহাকে কোনো কাজে লাগাইতেই পারি না। যে পরিণামগুলি নিশ্চয় পরিণাম, তাহাদিগকে সহজে গ্রহণ করিবার শিক্ষা হয় নাই বলিয়া কিছুই নিজে ছাড়িয়া দিই না, সমস্ত নিজের কাছ হইতে কাড়িয়া লইতে দিই। সত্যকে অস্বীকার করি বলিয়া পদেপদেই সত্যের নিকটে পরাস্ত হইতে থাকি।

কাঁচা আম শক্ত বোঁটা লইয়া ডালকে খুব জোরে আকর্ষণ করিয়া আছে, তাহার অপরিণত আঁটির গায়ে তাহার অপরিণত শাঁস আঁটিয়া লাগিয়া আছে। কিন্তু প্রত্যহ সে যতটুকু পাকিতেছে, ততটুকু পরিমাণে তাহার বোঁটা ঢিলা হইতেছে, তাহার আঁটি শাঁস হইতে আলগা, সমস্ত ফলটা গাছ হইতে পৃথক হইয়া আসিতেছে। ফল যে একদিন গাছের বাঁধন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া যাইবে, ইহাই তাহার সফলতা— গাছকে চিরকাল আঁটিয়া ধরিয়া থাকিলেই সে ব্যর্থ। ফলের মতো আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তিও একদিন সংসারের ডাল হইতে সমস্ত রস আকর্ষণ করিয়া লইয়া শেষকালে এই ডালকে ত্যাগ করিয়া ধূলিসাৎ হয়। ইহা জগতের নিয়মেই হয়, ইহার উপরে আমাদের হাত নাই। কিন্তু ভিতরে যেখানে আমাদের স্বাধীন মনুষ্যত্ব, যেখানে আমাদের ইচ্ছাশক্তির লীলা, সেখানকার পরিণতির পক্ষে ইচ্ছাশক্তিই একটা প্রধান শক্তি। এঞ্জিনের বয়লারের গায়ে যে তাপমান যন্ত্রটা আছে, তাহার পারা স্বভাবের নিয়মেই ওঠে বা নামে, কিন্তু ভিতরের আগুনের আঁচটাকে এই সংকেত বুঝিয়া বাড়াইব কি কমাইব, তাহা এঞ্জিনিয়ারের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও কর্মে উৎসাহকে বাড়াইব কি কমাইব, তাহা আমাদের হাতে। সেই যথাসময়ে বাড়ানো-কমানোর দ্বারাতেই আমরা সফলতালাভ করি।

পাকা ফলে এক দিকে বোঁটা দুর্বল ও শাঁস আলগা হইতে থাকে বটে, তেমনি অন্য দিকে তাহার আঁটি শক্ত হইয়া নূতন প্রাণের সম্বল লাভ করিতে থাকে। আমাদের মধ্যেও সেই হরণ-পূরণ আছে। আমাদেরও বাহিরে হ্রাসের সঙ্গে ভিতরে বৃদ্ধির যোগ আছে। কিন্তু ভিতরের কাজে মানুষের নিজের ইচ্ছা বলবান বলিয়া এই বৃদ্ধি এই পরিণতি আমাদের সাধনার অপেক্ষা রাখে। সেইজন্যই দেখিতে পাই, দাঁত পড়িল, চুল পাকিল, শরীরের তেজ কমিল, মানুষ তাহার আয়ুর শেষপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল, তবু কোনোমতেই সহজে সংসার হইতে আপন বোঁটা আলগা হইতে দিল না— প্রাণপণে সমস্ত আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল, এমন-কি, মৃত্যুর পরেও সংসারের ক্ষুদ্র বিষয়েও তাহার ইচ্ছাই বলবান রহিবে, ইহা লইয়া জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিল। আধুনিককাল ইহাকে গর্বের বিষয় মনে করে, কিন্তু ইহা গৌরবের বিষয় নহে।

ত্যাগ করিতেই হইবে এবং ত্যাগের দ্বারাই আমরা লাভ করি। ইহা জগতের মর্মগত সত্য। ফুলকে পাপড়ি খসাইতেই হয়, তবে ফল ধরে, ফলকে ঝরিয়া পড়িতেই হয়, তবে গাছ হয়। গর্ভের শিশুকে গর্ভাশ্রয় ছাড়িয়া পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইতে হয়। ভূমিষ্ঠ হইয়া শরীরে মনে সে নিজের মধ্যে বাড়িতে থাকে, তখন তাহার আর কোনো কর্তব্য নাই। তাহার ইন্দ্রিয়শক্তি তাহার বুদ্ধি-বিদ্যা বাড়ার একটা সীমায় আসিলে তাহাকে আবার নিজের মধ্য হইতে সংসারের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হইতে হয়। এইখানে পুষ্ট শরীর, শিক্ষিত মন ও সবল প্রবৃত্তি লইয়া সে পরিবার ও প্রতিবেশীদের মাঝখানে নিবিষ্ট হয়। ইহাই তাহার দ্বিতীয় শরীর, তাহার বৃহৎ কলেবর। তাহার পরে শরীর জীর্ণ ও প্রবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া আসে, তখন সে আপনার বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনাসক্ত প্রবীণতা লইয়া আপন ক্ষুদ্রসংসার হইতে বৃহত্তর সংসারে জন্মগ্রহণ করে : তাহার শিক্ষা, জ্ঞান ও বুদ্ধি এক দিকে সাধারণ মানবের কাজে লাগিতে থাকে, অন্য দিকে সে অবসন্নপ্রায় মানবজীবনের সঙ্গে নিত্যজীবনের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে থাকে। তাহার পরে পৃথিবীর নাড়ীর বন্ধন সম্পূর্ণ ক্ষয় করিয়া দিয়া সে অতিসহজে মৃত্যুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় ও অনন্তলোকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে সে শরীর হইতে সমাজে, সমাজ হইতে নিখিলে, নিখিল হইতে অধ্যাত্মক্ষেত্রে মানবজন্মকে শেষপরিণতি দান করে।

প্রাচীন সংহিতাকারগণ আমাদের শিক্ষাকে আমাদের গার্হস্থ্যকে অনন্তের মধ্যে সেই শেষ পরিণামের অভিমুখ করিতে চাহিয়াছিলেন। সমস্ত জীবনকে জীবনের পরিণামের অনুকূল করিতে চাহিয়াছিলেন। সেইজন্য আমাদের শিক্ষা কেবল বিষয়শিক্ষা কেবল গ্রন্থশিক্ষা ছিল না, তাহা ছিল ব্রহ্মচর্য। নিয়মসংযমের অভ্যাসদ্বারা এমন একটি বললাভ হইত, যাহাতে ভোগ এবং ত্যাগ উভয়ই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইত। সমস্ত জীবনই নাকি ধর্মাচরণ, কারণ, তাহার লক্ষ্য ব্রহ্মের মধ্যে মুক্তি, সেইজন্য সেই জীবন বহন করিবার শিক্ষাও ধর্মব্রত ছিল। এই ব্রত শ্রদ্ধার সহিত ভক্তির সহিত নিষ্ঠার সহিত অতিসাবধানে যাপন করিতে হইত। মানুষের পক্ষে যাহা একমাত্র পরমসত্য, সেই সত্যকে সম্মুখে রাখিয়া বালক তাহার জীবনের পথে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইত।

বাহিরের শক্তির সঙ্গে ভিতরের শক্তির সামঞ্জস্যক্রিয়া প্রাণের লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। গাছপালায় এই সামঞ্জস্যের কাজ যন্ত্রের মতো ঘটে। আলোকের বাতাসের খাদ্যরসের উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ার দ্বারা তাহার প্রাণের কাজ চলিতে থাকে। আমাদের দেহেও সেইরূপ ঘটে। জিহ্বায় খাদ্যসংযোগের উত্তেজনায় আপনি রস ক্ষরিয়া আসে, পাকযন্ত্রেও খাদ্যের সংস্পর্শে সহজেই পাকরসের উদ্রেক হয়। আমাদের শরীরের প্রাণক্রিয়া বাহিরের বিশ্বশক্তির সহজ প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু আমাদের আবার মন বলিয়া ইচ্ছা বলিয়া আর-একটা পদার্থ যোগ হওয়াতে প্রাণের উপর আর-একটা উপসর্গ বাড়িয়া গেছে। খাইবার অন্যান্য উত্তেজনার সঙ্গে খাইবার আনন্দ একটা আসিয়াছে। তাহাতে করিয়া আহারের কাজটা শুধু আমাদের আবশ্যকের কাজ নহে, আমাদের খুশির কাজ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে প্রকৃতির কাজের সঙ্গে আমাদের একটা মানসিক সম্বন্ধ বাড়িয়া গেছে। দেহের সঙ্গে দেহের বাহিরের শক্তির একটা সামঞ্জস্য প্রাণের মধ্যে ঘটিতেছে, আবার তাহার সঙ্গে ইচ্ছা-শক্তির একটা সামঞ্জস্য মনের মধ্যে ঘটিতেছে। ইহাতে মানুষের প্রকৃতিযন্ত্রের সাধনা বড়ো শক্ত

হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বশক্তির সঙ্গে প্রাণশক্তির সুর অনেকদিন হইতে বাঁধিয়া চুকিয়া গেছে, সেজন্য বড়ো ভাবিতে হয় না ; কিন্তু ইচ্ছাশক্তির সুরবাঁধা লইয়া আমাদিগকে অহরহ ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয়। খাদ্যসম্বন্ধে প্রাণশক্তির আবশ্যক হয়তো ফুরাইল, কিন্তু আমাদের ইচ্ছার তাগিদ শেষ হইল না— শরীরের আবশ্যকসাধনে সে যে আনন্দ পাইল, সেই আনন্দকে সে আবশ্যকের বাহিরেও টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল— সে নানা কৃত্রিম উপায়ে বিমুখ রসনাকে রসসিক্ত করিতে ও শ্রান্ত পাকযন্ত্রকে উত্তেজিত করিতে লাগিল, এমনি করিয়া বাহিরের সহিত প্রাণের এবং প্রাণের সহিত মনের একতানতা নষ্ট করিয়া সে নানা অনাবশ্যক চেষ্টা, অনাবশ্যক উপকরণ ও শাখাপল্লবায়িত দুঃখের সৃষ্টি করিয়া চলিল। আমাদের যাহা প্রয়োজন, তাহার সংগ্রহই যথেষ্ট দুরূহ, তাহার উপরে ভূরিপরিমাণ অনাবশ্যকের বোঝা চাপিয়া সেই আবশ্যকের আয়োজনও কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাহাই নয়— ইচ্ছা যখন একবার স্বভাবের সীমা লঙ্ঘন করে, তখন কোথাও তাহার আর থামিবার কারণ থাকে না, তখন সে "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে"— কেবল সে চাই চাই করিয়া বাড়িয়াই চলে। পৃথিবীতে নিজের এবং পরের পনেরো-আনা দুঃখের কারণ ইহাই। অথচ এই ইচ্ছা-শক্তিকেই বিশ্বশক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যে আনাই আমাদের পরমানন্দের হেতু। এইজন্য ইচ্ছাকে নষ্ট করা আমাদের সাধনার বিষয় নহে, ইচ্ছাকে বিশ্ব-ইচ্ছার সঙ্গে একসুরে বাঁধাই আমাদের সকল শিক্ষার চরমলক্ষ্য। গোড়ায় তাহা যদি না করি, তবে আমাদের চঞ্চল মনে জ্ঞান লক্ষ্যভ্রষ্ট, প্রেম কলুষিত ও কর্ম বৃথা পরিভ্রান্ত হইতে থাকে। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম বিশ্বের সহিত সহজ মিলনে মিলিত না হইয়া আমাদের আত্মম্ভরি ইচ্ছার কৃত্রিম সৃষ্টি-সকলের মধ্যে মরীচিকা-অনুসরণে নিযুক্ত হইতে থাকে।

এইজন্য আমাদের আয়ুর প্রথম ভাগে ব্রহ্মচর্যপালনদ্বারা ইচ্ছাকে তাহার যথাবিহিত সীমার মধ্যে সহজে সঞ্চরণ করিবার অভ্যাস করাইতে হইবে। ইহাতে আমাদের বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানসপ্রকৃতির সুর বাঁধা হইয়া আসিবে। তাহার পরে সেই সুরে তোমার সাধ্যমত ও ইচ্ছামত যে-কোনো রাগিণী বাজাও-না কেন, সত্যের সুরকে মঙ্গলের সুরকে আনন্দের সুরকে আঘাত করিবে না।

এইরূপে শিক্ষার কাল যাপন করিয়া সংসারধর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

মনু বলিয়াছেন—

> ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া।
> বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ।

বিষয়ের সেবা না করিয়া সেরূপ সংযমন করা যায় না, বিষয়ে নিযুক্ত থাকিয়া জ্ঞানের দ্বারা নিত্যশ যেমন করিয়া করা যায়।

অর্থাৎ বিষয়ে নিযুক্ত না হইলে জ্ঞান পূর্ণতালাভ করে না, এবং যে সংযম জ্ঞানের দ্বারা লব্ধ নহে, তাহা পূর্ণসংযম নহে— তাহা জড় অভ্যাস বা অনভিজ্ঞতার অন্তরালমাত্র— তাহা প্রকৃতির মূলগত নহে, তাহা বাহ্যিক।

সংযমের সঙ্গে প্রবৃত্তিকে চালনা করিবার শিক্ষা ও সাধনা থাকিলেই কর্ম, বিশেষত মঙ্গলকর্ম করা সহজ ও সুখসাধ্য হয়। সেই অবস্থাতেই গৃহাশ্রম জগতের কল্যাণের আধার হইয়া উঠে। সেই অবস্থাতেই গৃহাশ্রম মানুষের মুক্তিপথে অগ্রসর হইবার বাধা নহে, সহায় হয়। সেই অবস্থাতেই গৃহস্থ যে-কোনো কর্ম করেন, তাহা সহজে ব্রহ্মকে সমর্পণ করিয়া আনন্দিত হইতে পারেন। গৃহের সমস্ত কর্ম যখন মঙ্গলকর্ম হয়— তাহা যখন ধর্মকর্ম হইয়া উঠে, তখন, সেই কর্মের বন্ধন মানুষকে বাঁধিয়া একেবারে জর্জরীভূত করিয়া দেয় না। যথাসময়ে সে-বন্ধন অনায়াসে স্খলিত হইয়া যায়, যথাসময়ে সে-কর্মের একটা স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি আপনি আসে।

আয়ুর দ্বিতীয় ভাগকে এইরূপে সংসারধর্মে নিযুক্ত করিয়া শরীরের তেজ যখন হ্রাস হইতে থাকিবে, তখন এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, এই ক্ষেত্রের কাজ শেষ হইল— সেই খবরটা আসিল। শেষ হইল খবর পাইয়া চাকরি-বরখাস্ত হতভাগার মতো নিজেকে দীন বলিয়া দেখিতে হইবে না। আমার সমস্ত গেল, ইহাকেই অনুশোচনার বিষয় করিলে চলিবে না, এখন আরো বড়ো পরিধিবিশিষ্ট ক্ষেত্রের

মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে বলিয়া সেই দিকে আশার সহিত বলের সহিত মুখ ফিরাইতে হইবে। যাহা গায়ের জোরের, যাহা ইন্দ্রিয়শক্তির, যাহা প্রবৃত্তি-সকলের ক্ষেত্র ছিল, তাহা এবারে পিছনে পড়িয়া রহিল— সেখানে যাহা-কিছু ফসল জন্মাইয়াছি, তাহা কাটিয়া মাড়াই করিয়া গোলা বোঝাই করিয়া দিয়া এ মজুরি শেষ করিয়া চলিলাম— এবার সন্ধ্যা আসিতেছে— আপিসের কুঠরি ছাড়িয়া বড়ো রাস্তা ধরিতে হইবে। ঘরে না পৌঁছিলে তো চরমশান্তি নাই। যেখানে যত-কিছু সহিলাম, কত-কিছু খাটিলাম, সে কিসের জন্য ? ঘরের জন্য তো ? সেই ঘরই ভূমা— সেই ঘরই আনন্দ— যে আনন্দ হইতে আমরা আসিয়াছি, যে আনন্দে আমরা যাইব। তাহা যদি না হয়, তবে ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্।

তাই গৃহাশ্রমের কাজ সারিয়া সন্তানের হাতে সংসারের ভার সমর্পণ করিয়া এবার বড়ো রাস্তায় বাহির হইবার সময়। এবার বাহিরের খোলা বাতাসে বুক ভরিয়া লইতে হইবে— খোলা আকাশের আলোতে দৃষ্টিকে নিমগ্ন এবং শরীরের সমস্ত রোমকূপকে পুলকিত করিতে হইবে। এবার একদিককার পালা সমাধা হইল। আঁতুড়ঘরে নাড়ী কাটা পড়িল, এখন অন্য জগতে স্বাধীন সঞ্চরণের অধিকার লাভ করিতে হইবে।

শিশু গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেও সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার পূর্বে কিছুকাল মাতার কাছেকাছেই থাকে। বিযুক্ত হইয়াও যুক্ত থাকে, সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হয়। বানপ্রস্থ-আশ্রমও সেইরূপ। সংসারের গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াও বাহিরের দিক হইতে সংসারের সঙ্গে সেই তৃতীয়-আশ্রমধারীর যোগ থাকে। বাহিরের দিক হইতে সে সংসারকে আপনার জীবনের সঞ্চিত জ্ঞানের ফলদান করে এবং সংসার হইতে সহায়তা গ্রহণ করে। এই দান-গ্রহণ সংসারীর মতো একান্তভাবে করে না, মুক্তভাবে করে।

অবশেষে আয়ুর চতুর্থভাগে এমন দিন আসে, যখন এই বন্ধনটুকুও ফেলিয়া একাকী সেই পরম একের সম্মুখীন হইতে হয়। মঙ্গলকর্মের দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত সম্বন্ধকে পূর্ণপরিণতি দান করিয়া আনন্দস্বরূপের সহিত চিরন্তন সম্বন্ধকে লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। পতিব্রতা স্ত্রী যেমন সমস্তদিন সংসারের নানা লোকের সহিত নানা সম্বন্ধ পালন করিয়া নানা কর্ম সমাধা করিয়া স্বামীরই কর্ম করেন, স্বামীরই সম্বন্ধ যথার্থভাবে স্বীকার করেন ; অবশেষে দিন-অবসান হইলে একে একে কাজের জিনিসগুলি তুলিয়া রাখিয়া, কাজের কাপড় ছাড়িয়া, গা ধুইয়া, কর্মস্থানের চিহ্ন মুছিয়া নির্মল মিলনবেশে একাকিনী স্বামীর সহিত একমাত্র পূর্ণসম্বন্ধের অধিকার গ্রহণ করিবার জন্য নির্জনগৃহে প্রবেশ করেন, সমাপ্তকর্ম পুরুষ সেইরূপ একে একে কাজের জীবনের সমস্ত খণ্ডতা ঘুচাইয়া দিয়া অসীমের সহিত সম্মিলনের জন্য প্রস্তুত হইয়া অবশেষে একাকী সেই একের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন এবং সম্পূর্ণ জীবনকে এই পরিপূর্ণ সমাপ্তির মধ্যে অখণ্ড সার্থকতা দান করেন। এইরূপেই মানবজীবন আদ্যোপান্ত সত্য হয়, জীবন মৃত্যুকে লঙ্ঘন করিতে বৃথা চেষ্টা করে না ও মৃত্যু শত্রুপক্ষের ন্যায় জীবনকে আক্রমণ করিয়া বলপূর্বক পরাস্ত করে না। জীবনকে আর আমরা যেমন করিয়াই খণ্ডবিখণ্ড বিক্ষিপ্ত করি, অন্য যে-কোনো অভিপ্রায়কেই আমরা চরম বলিয়া জ্ঞান করি এবং তাহাকে আমরা দেশ-উদ্ধার, লোকহিত বা যে-কোনো বড়ো নাম দিই-না কেন, তাহার মধ্যে সম্পূর্ণতা থাকে না— তাহা আমাদিগকে মাঝপথে অকস্মাৎ পরিত্যাগ করে, তাহার মধ্য হইতে এই প্রশ্নই কেবলই বাজিতে থাকে— ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্। আর ভারতবর্ষ চারি আশ্রমের মধ্য দিয়া মানুষের জীবনকে বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়বয়স ও বার্ধক্যের স্বাভাবিক বিভাগের অনুগত করিয়া অধ্যায়ে অধ্যায়ে যেরূপ একমাত্র সমাপ্তির দিকে লইয়া গিয়াছেন, তাহাতে বিশাল বিশ্বসংগীতের সহিত মানুষের জীবন অবিরোধে সম্মিলিত হয়। বিদ্রোহ-বিরোধ থাকে না ; অশিক্ষিত প্রবৃত্তি আপনার উপযুক্ত স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া যে-সকল গুরুতর অশান্তির সৃষ্টি করিতে থাকে, তাহারই মধ্যে বিভ্রান্ত ও নিখিলের সহিত সহজ-সত্যসম্বন্ধ-ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীর মধ্যে উৎপাতস্বরূপ হইয়া উঠিতে হয় না।

আমি জানি, এইখানে একটা প্রশ্ন উদয় হইবে যে, একটা দেশের সকল লোককেই কি এই আদর্শে

গড়িয়া তোলা যায় ? তাহার উত্তরে আমি এই কথা বলি যে, যখন ঘরে আলো জ্বলে, তখন কি পিলসুজ হইতে আরম্ভ করিয়া পলিতা পর্যন্ত প্রদীপের সমস্তটাই জ্বলে ? জীবনযাপনসম্বন্ধে ধর্মসম্বন্ধে যে-দেশের যে-কোনো আদর্শই থাক্-না কেন, তাহা সমস্ত দেশের মুখাগ্রভাগেই উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু পলিতার ডগাটামাত্র জ্বলাকেই সমস্ত দীপের জ্বলা বলে। তেমনি দেশের এক অংশমাত্র যে ভাবকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত করেন, সমস্ত দেশেরই তাহা লাভ। বস্তুত সেই অংশটুকুমাত্রকে পূর্ণতা দিবার জন্য সমস্ত দেশকে প্রস্তুত হইতে হয়, সমস্ত সমাজকে অনুকূল হইতে হয়— ডালের আগায় ফল ধরাইতে গাছের শিকড় এবং গুঁড়িকে সচেষ্ট থাকিতে হয়। ভারতবর্ষে যদি এমন দিন আসে যে, আমাদের দেশের মান্যশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা সর্বোচ্চ সত্য এবং সর্বোচ্চ মঙ্গলকেই আর-সমস্ত খণ্ড প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে তুলিয়া চিরজীবনের সাধনার সামগ্রী করিয়া রাখেন, তবে তাঁহাদের সাধনা ও সার্থকতা সমস্ত দেশের মধ্যে একটা বিশেষ গতি একটা বিশেষ শক্তি সঞ্চার করিবেই। একদিন ভারতবর্ষে ঋষিরা যখন ব্রহ্মের সাধনায় রত ছিলেন, তখন সমস্ত আর্যসমাজের মধ্যেই— রাজকার্যে যুদ্ধে বাণিজ্যে সাহিত্যে শিল্পে ধর্মার্চনায়— সর্বত্রই সেই ব্রহ্মের সুর বাজিয়াছিল, কর্মের মধ্যে মোক্ষের ভাব বিরাজ করিয়াছিল— ভারতবর্ষের সমস্ত সমাজস্থিতি মৈত্রেয়ীর ন্যায় বলিতেছিল, "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্।" সে বাণী চিরদিনের মতোই নীরব হইয়া গেছে এমনিই যদি আমাদের ধারণা হয়, তবে আমাদের এই মৃতসমাজকে এত উপকরণ জোগাইয়া বৃথা সেবা করিয়া মরিতেছি কেন ? তবে তো এই মুহূর্তেই আপাদমস্তকে পরজাতির অনুকরণ করাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়— কারণ, পরিণামহীন ব্যর্থতার বোঝা অকারণে বহিয়া পড়িয়া থাকার চেয়ে সজীবভাবে কিছু-একটা হইয়া উঠার চেষ্টা করা ভালো। কিন্তু এ কথা কখনোই মানিব না। আমাদের প্রকৃতি মানিবে না। যতই দুর্গতি হউক, আমাদের অন্তরতম স্থান এমনভাবে তৈরি হইয়া আছে যে, কোনো অসম্পূর্ণ অধিকারকে আমাদের মন পরমলাভ বলিয়া সায় দিতে পারিবে না। এখনো যদি কোনো সাধক তাঁহার জীবনের যন্ত্রে সংসারের সকল চাওয়া সকল পাওয়ার চেয়ে উচ্চতম সপ্তকে একটা বড়ো সুর বাজাইয়া তোলেন, সেটা আমাদের হৃদয়ের তারে তখনই প্রতিঝংকৃত হইতে থাকে— তাহাকে আমরা ঠেকাইতে পারি না। প্রতাপ এবং ঐশ্বর্যের প্রতিযোগিতাকে আমরা যতবড়ো কণ্ঠে যতবড়ো করিয়াই প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছি, আমরা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। তাহা আমাদের মনের বহির্দ্বারে একটা গোলমাল পাকাইয়া তুলিয়াছে মাত্র। আমাদের সমাজে আজকাল বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মে দেশী রোশনচৌকির সঙ্গে সঙ্গে একইকালে গড়ের বাদ্য বাজানো হয় দেখিতে পাই। ইহাতে সংগীত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া কেবল একটা সুরের গণ্ডগোল হইতে থাকে। এই বিষম গণ্ডগোলের ঝঞ্ঝনার মধ্যে মনোযোগ দিলেই বুঝা যায় যে, রোশনচৌকির বৈরাগ্যগাম্ভীর্যমিশ্রিত করুণ শাহানাই আমাদের উৎসবের চিরন্তন হৃদয়ের মধ্য হইতে বাজিতেছে, আর গড়ের বাদ্য তাহার প্রচণ্ড কাংস্যকণ্ঠ ও স্ফীতোদর জয়ঢাকটা লইয়া কেবলমাত্র ধনের অহংকার কেবলমাত্র ফ্যাশানের আড়ম্বরকে অভ্রভেদী করিয়া সমস্ত গভীরতর অন্তরতর সুরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের মঙ্গলঅনুষ্ঠানের মধ্যে একটা গর্বপরিপূর্ণ অসামঞ্জস্যকেই অত্যুৎকট করিয়া তুলিতেছে— তাহা আমাদের উৎসবের চিরদিনের বেদনার সঙ্গে আপনার সুর মিলাইতেছে না। আমাদের জীবনের সকল দিকেই এমনিতরো একটা খাপছাড়া জোড়াতাড়া ব্যাপার ঘটিতেছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের আয়োজন আমাদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করিয়াছে ; তাহার অসংগত ক্ষীণ অনুকরণের দ্বারা আমরা আমাদের আড়ম্বর-আস্ফালনের প্রবৃত্তিকে খুব দৌড় করাইতেছি ; আমাদের দেউড়ির কাছে তাহার বড়ো জয়ঢাকটা কাঠি পিটাইয়া খুবই শব্দ করিতেছে, কিন্তু যে আমাদের অন্তঃপুরের খবর রাখে, সে জানে সেখানকার মঙ্গলশঙ্খ এই বাহ্যাড়ম্বরের ধমকে নীরব হইয়া যায় নাই, ভাড়া-করা গড়ের বাদ্য একসময় যখন গড়ের মধ্যে ফিরিয়া যায়, তখনো ঘরের এই শঙ্খ আকাশে উৎসবের মঙ্গলধ্বনি ঘোষণা করে। আমরা ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি বাণিজ্যনীতির উপযোগিতা খুব করিয়া স্বীকার ও প্রচার করিতেছি, কিন্তু তাহাতে কোনোমতেই আমাদের সমস্ত হৃদয়কে পূর্ণভাবে আকর্ষণ করিতেছে না।

আমরা সকলের চেয়ে বড়ো সুর যাহা শুনিয়াছি, এ সুর যে তাহাকে আঘাত করিতেছে— আমাদের অন্তরাত্মা এক জায়গায় ইহাকে কেবলই অস্বীকার করিতেছে।

আমরা কোনোদিন এমনতরো হাটের মানুষ ছিলাম না। আজ আমরা হাটের মধ্যে বাহির হইয়া ঠেলাঠেলি ও চীৎকার করিতেছি— ইতর হইয়া উঠিয়াছি, কলহে মাতিয়াছি, পদ ও পদবী লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছি, বড়ো অক্ষরের ও উচ্চকণ্ঠের বিজ্ঞাপনের দ্বারা নিজেকে আর-পাঁচজনের চেয়ে অগ্রসর করিয়া ঘোষণা করিবার প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে। অথচ ইহা একটা নকল। ইহার মধ্যে সত্য অতি অল্পই আছে। ইহার মধ্যে শান্তি নাই, গাম্ভীর্য নাই, শিষ্টতাশীলতার সংযম নাই, শ্রী নাই। এই নকলের যুগ আসিবার পূর্বে আমাদের মধ্যে এমন একটা স্বাভাবিক মর্যাদা ছিল যে, দারিদ্র্যেও আমাদিগকে মানাইত, মোটা ভাত মোটা কাপড়ে আমাদের গৌরব নষ্ট করিতে পারিত না। কর্ণ যেমন তাঁহার কবচকুণ্ডল লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখনকার দিনে আমরা সেইরূপ একটা স্বাভাবিক আভিজাত্যের কবচ লইয়াই জন্মিতাম। সেই কবচেই আমাদিগকে বহুদিনের অধীনতা ও দুঃখদারিদ্র্যের মধ্যেও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে— আমাদের সম্মান নষ্ট করিতে পারে নাই। কারণ, আমাদের সে সম্মান বাহিরের আহরণ-করা ধন ছিল না, সে আমাদের অন্তরের সামগ্রী ছিল। সেই সহজাত কবচখানি আমাদের কাছ হইতে কে ভুলাইয়া লইল। ইহাতেই আমাদের আত্মরক্ষার উপায় চলিয়া গেছে। এখন আমরা বিশ্বের মধ্যে লজ্জিত। এখন আমাদের বেশে-ভূষায় আয়োজনে উপকরণে একটু কোথাও কিছু খাটো পড়িয়া গেলেই আমরা আর মাথা তুলিতে পারি না। সম্মান এখন বাহিরের জিনিস হইয়া পড়িয়াছে, তাই উপাধির জন্য খ্যাতির জন্য আমরা বাহিরের দিকে ছুটিয়াছি, বাহিরের আড়ম্বরকে কেবলই বাড়াইয়া তুলিতেছি, এবং কোথাও একটু-কিছু ছিদ্র বাহির হইবার উপক্রম হইলেই তাহাকে মিথ্যার তালি দিয়া ঢাকা দিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু ইহার অন্ত কোথায়? যে ভদ্রতা আমাদের অন্তরের সামগ্রী ছিল, তাহাকে আজ যদি বাহিরে টানিয়া জুতার দোকান, কাপড়ের দোকান, ঘোড়ার হাট এবং গাড়ির কারখানায় ঘোরাইতে আরম্ভ করি, তবে কোথায় লইয়া গিয়া তাহাকে বলিব, বাস, হইয়াছে, এখন বিশ্রাম করো। আমরা সন্তোষকেই সুখের পূর্ণতা বলিয়া জানিতাম ; কারণ, সন্তোষ অন্তরের সামগ্রী— এখন সেই সুখকে যদি হাটে-হাটে ঘাটে-ঘাটে খুঁজিয়া ফিরিতে হয়, তবে কবে বলিতে পারিব, সুখ পাইয়াছি। এখন আমাদের ভদ্রতাকে সস্তা কাপড়ে অপমান করে, বিলাতি গৃহসজ্জার অভাবে উপহাস করে, চেকবহির অঙ্কপাতের ন্যূনতায় তাহার প্রতি কলঙ্কপাত করে— এমন ভদ্রতাকে মজুরের মতো বহন করিয়া গৌরববোধ করা যে কত লজ্জাকর, তাহাই আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। আর যে-সকল পরিণামহীন উত্তেজনা উন্মাদনাকে আমরা সুখ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছি, তাহার দ্বারা আমাদের মতো বহির্বিষয়ে পরাধীন জাতিকে অন্তঃকরণেও দাসানুদাস করিয়াছে।

কিন্তু তবু বলিতেছি, এই উপসর্গ এখনো আমাদের মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করে নাই। এখনো ইহা বাহিরেই পড়িয়া আছে ; এবং বাহিরে আছে বলিয়াই ইহার কলরব এত বেশি— সেইজন্যই ইহার এত আতিশয্য ও অতিশয়োক্তির প্রয়োজন হয়। এখনো এ আমাদের গভীরতর স্বভাবের অনুগত হয় নাই বলিয়াই সন্তরণ-মূঢ়ের সাঁতারকাটার মতো ইহাকে লইয়া আমাদিগকে এমন উন্মত্তের ন্যায় আস্ফালন করিতে হয়।

কিন্তু একবার কেহ যদি আমাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া যথার্থ অধিকারের সহিত এ কথা বলেন যে, "অসম্পূর্ণ প্রয়াসে, উন্মত্ত প্রতিযোগিতায়, অনিত্য ঐশ্বর্যে আমাদের শ্রেয় নহে— জীবনের একটি পরিপূর্ণ পরিণাম আছে, সকল কর্ম সকল সাধনার একটি পরিপূর্ণ পরিসমাপ্তি আছে, এবং সেই পরিণাম সেই পরিসমাপ্তিই আমাদের প্রত্যেকের একমাত্র চরম চরিতার্থতা— তাহার নিকটে আর সমস্তই তুচ্ছ"— তবে আজও এই হাট-বাজারের কোলাহলের মধ্যেও আমাদের সমস্ত হৃদয় সায় দিয়া উঠে, বলে, "সত্য, ইহাই সত্য, ইহার চেয়ে সত্য আর কিছুই নাই।" তখন, ইস্কুলে যে-সকল ইতিহাসের পড়া মুখস্থ করিয়াছিলাম ; কাড়াকাড়ি-মারামারির কথা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিমানকেই সর্বোচ্চ সিংহাসনে নররক্তে দিয়া অভিষেক করিবার কথা অত্যন্ত ক্ষীণ-খর্ব হইয়া আসে ; তখন লালকুর্তিপরা

অক্ষৌহিণী সেনার দম্ভ, উদ্যতমাস্তুল বৃহদাকার যুদ্ধজাহাজের ঔদ্ধত্য আমাদের চিত্তকে আর অভিভূত করে না ; আমাদের মর্মস্থলে ভারতবর্ষের বহুযুগের একটি সজলজলদগম্ভীর ওংকারধ্বনি নিত্যজীবনের আদিসুরটিকে জগতের সমস্ত কোলাহলের উর্ধ্বে জাগাইয়া তুলে। ইহাকে আমরা কোনোমতেই অস্বীকার করিতে পারিব না ; যদি করি, তবে ইহার পরিবর্তে আমরা এমন কিছুই পাইব না, যাহার দ্বারা আমরা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইব, যাহার দ্বারা আমরা আপনাকে রক্ষা করিতে পারিব। আমরা কেবলই তরবারির ছটা, বাণিজ্যের ঘটা, কলকারখানার রক্তচক্ষু এবং স্বর্গের প্রতিস্পর্ধী যে ঐশ্বর্য উত্তরোত্তর আপনার উপকরণস্তূপকে উচ্চে তুলিয়া আকাশের সীমা মাপিবার ভান করিতেছে, তাহার উৎকটমূর্তি দেখিয়া সমস্ত মনেপ্রাণে কেবলই পরাস্ত পরাভূত হইতে থাকিব, কেবলই সংকুচিত শঙ্কিত হইয়া পৃথিবীর রাজপথে ভিক্ষাসম্বল দীনহীনের মতো ফিরিয়া বেড়াইব।

অথচ এ কথাও আমি কোনোমতেই স্বীকার করি না যে, আমরা যাহাকে শ্রেয় বলিতেছি, তাহা কেবল আমাদের পক্ষেই শ্রেয়। আমরা অক্ষম বলিয়া ধর্মকে দায়ে পড়িয়া বরণ করিতে হইবে, তাহাকে দারিদ্র্য গোপন করিবার একটা কৌশলস্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, এ কথা কখনোই সত্য নহে। প্রাচীন সংহিতাকার মানবজীবনের যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র কোনো একটি বিশেষ জাতির বিশেষ অবস্থার পক্ষেই সত্য, তাহা নহে। ইহাই একমাত্র সত্য আদর্শ, সুতরাং ইহাই সকল মানুষেরই পক্ষে মঙ্গলের হেতু। প্রথম বয়সে শ্রদ্ধার দ্বারা সংযমের দ্বারা ব্রহ্মচর্যের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া দ্বিতীয় বয়সে সংসার-আশ্রমে মঙ্গলকর্মে আত্মাকে পরিপুষ্ট করিতে হইবে ; তৃতীয় বয়সে উদারতর ক্ষেত্রে একে একে সমস্ত বন্ধন শিথিল করিয়া অবশেষে আনন্দের সহিত মৃত্যুকে মোক্ষের নামান্তররূপে গ্রহণ করিবে— মানুষের জীবনকে এমন করিয়া চালাইলেই তবে তাহার আদ্যন্তসংগত পূর্ণ তাৎপর্য পাওয়া যায়। তবেই সমুদ্র হইতে যে মেঘ উৎপন্ন হইয়া পর্বতের রহস্যগূঢ় গুহা হইতে নদীরূপে বাহির হইল, সমস্ত যাত্রাশেষে আবার তাহাকে সেই সমুদ্রের মধ্যেই পূর্ণতররূপে সম্মিলিত হইতে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করি। মাঝপথে যেখানেই হউক, তাহার অকস্মাৎ অবসান অসংগত অসমাপ্ত। এ কথা যদি অন্তরের সঙ্গে বুঝিতে পারি, তবে বলিতেই হইবে, এই সত্যকেই উপলব্ধি করিবার জন্য সকল জাতিকেই নানা পথ দিয়া নানা আঘাতে ঠেকিয়া বারংবার চেষ্টা করিতেই হইবে। ইহার কাছে বিলাসীর উপকরণ, নেশনের প্রতাপ, রাজার ঐশ্বর্য, বণিকের সমৃদ্ধি, সমস্তই গৌণ ; মানুষের আত্মাকে জয়ী হইতে হইবে, মানুষের আত্মাকে মুক্ত হইতে হইবে, তবেই মানুষের এতকালের সমস্ত চেষ্টা সার্থক হইবে— নহিলে ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্ ?

১৩১৩

আনন্দরূপ

সত্যং জ্ঞানমনন্তম্। তিনি সত্য, তিনি জ্ঞান, তিনি অনন্ত। এই অনন্ত সত্যে, অনন্ত জ্ঞানে তিনি আপনাতে আপনি বিরাজিত। সেখানে আমরা তাঁহাকে কোথায় পাইব ? সেখান হইতে যে বাক্যমন নিবৃত্ত হইয়া আসে।

কিন্তু উপনিষদ্ এ কথাও বলেন যে, এই সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ আমাদের কাছে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি অগোচর নহেন। কিন্তু তিনি কই প্রকাশ পাইতেছেন ? কোথায় ?

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। তাঁহার আনন্দরূপ অমৃতরূপ আমাদের কাছে প্রকাশ পাইতেছে। তিনি যে আনন্দিত, তিনি যে রসস্বরূপ, ইহাই আমাদের নিকট প্রকাশমান।

কোথায় প্রকাশমান ? এ প্রশ্ন কি জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ? যাহা অপ্রকাশিত, তাহার সম্বন্ধেই প্রশ্ন চলিতে পারে, কিন্তু যাহা প্রকাশিত, তাহাকে "কোথায়" বলিয়া কে সন্ধান করিয়া বেড়ায় ?

প্রকাশ কোন্‌খানে ? এই যে চারি দিকে যাহা দেখিতেছি, তাহাই যে প্রকাশ। এই যে সম্মুখে, এই

যে পার্শ্বে, এই যে অধোতে, এই যে উর্ধ্বে— এই যে কিছুই গুপ্ত নাই। এ যে সমস্তই সুস্পষ্ট। এ যে আমার ইন্দ্রিয়মনকে অহোরাত্রি অধিকার করিয়া রহিয়াছে। স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ। এই তো প্রকাশ, এ ছাড়া আর প্রকাশ কোথায়?

এই যে যাহাকে আমরা প্রকাশ বলিতেছি, এ কেমন করিয়া হইল? তাঁহার ইচ্ছায়, তাঁহার আনন্দে, তাঁহার অমৃতে। আর তো কোনো কারণ থাকিতেই পারে না। তিনি আনন্দিত, সমস্ত প্রকাশ এই কথাই বলিতেছে। যাহা-কিছু আছে, এ-সমস্তই তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ, সুতরাং ইহার কিছুই অপ্রকাশ হইতে পারে না। তাঁহার আনন্দকে কে আচ্ছন্ন করিবে? এমন মহান্ধকার কোথায় আছে? ইহার কণাটিকেও ধ্বংস করিতে পারে, এমন শক্তি কার? এমন মৃত্যু কোথায়? এ যে অমৃত।

সত্যং জ্ঞানমনন্তম্। তিনি বাক্যের মনের অতীত। কিন্তু অতীত হইয়া রহিলেন কই? এই যে দশ দিকে তিনি আনন্দরূপে আপনাকে একেবারে দান করিয়া ফেলিতেছেন। তিনি তো লুকাইলেন না! যেখানে আনন্দে অমৃতে তিনি অজস্র ধরা দিয়াছেন, সেখানে প্রাচুর্যের অন্ত কোথায়, সেখানে বৈচিত্র্যের যে সীমা নাই; সেখানে কী ঐশ্বর্য, কী সৌন্দর্য! সেখানে আকাশ যে শতধা বিদীর্ণ হইয়া আলোকে আলোকে নক্ষত্রে নক্ষত্রে খচিত হইয়া উঠিল, সেখানে রূপ যে কেবলই নূতন নূতন, সেখানে প্রাণের প্রবাহ যে আর ফুরায় না। তিনি যে আনন্দরূপে নিজেকে নিয়তই দান করিতে বসিয়াছেন— লোকে-লোকান্তরে সে-দান আর ধারণ করিতে পারিতেছে না— যুগে-যুগান্তরে তাহার আর অন্ত দেখিতে পাই না। কে বলে তাঁহাকে দেখা যায় না; কে বলে, তিনি শ্রবণের অতীত; কে বলে, তিনি ধরা দেন না? তিনিই যে প্রকাশমান— আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। সহস্র চক্ষু থাকিলেও যে দেখিয়া শেষ করিতে পারিতাম না, সহস্র কর্ণ থাকিলেও শোনা ফুরাইত কবে? যদি ধরিতেই চাও, তবে বাহু কতদূর বিস্তার করিলে সে-ধরার অন্ত হইবে? এ যে আশ্চর্য। মানুষজন্ম লইয়া এই নীল আকাশের মধ্যে কী চোখই মেলিয়াছি! এ কী দেখাই দেখিলাম। দুটি কর্ণপুট দিয়া অনন্ত রহস্যলীলাময় স্বরের ধারা অহরহ পান করিয়া সে ফুরাইল না। সমস্ত শরীরটা যে আলোকের স্পর্শে বায়ুর স্পর্শে স্নেহের স্পর্শে প্রেমের স্পর্শে কল্যাণের স্পর্শে বিদ্যুৎতন্ত্রীখচিত অলৌকিক বীণার মতো বারংবার স্পন্দিত ঝংকৃত হইয়া উঠিতেছে। ধন্য হইলাম, আমরা ধন্য হইলাম— এই প্রকাশের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া ধন্য হইলাম— পরিপূর্ণ আনন্দের এই আশ্চর্য অপরিমেয় প্রাচুর্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐশ্বর্যের মধ্যে আমরা ধন্য হইলাম। পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে তৃণের সঙ্গে কীটপতঙ্গের সঙ্গে গ্রহতারা-সূর্যচন্দ্রের সঙ্গে আমরা ধন্য হইলাম।

ধূলিকে আজ ধূলি বলিয়া অবজ্ঞা করিয়ো না, তৃণকে আজ তৃণজ্ঞান করিয়ো না— তোমার ইচ্ছায় এ ধূলিকে পৃথিবী হইতে মুছিতে পার না, এ ধূলি তাঁহার ইচ্ছা; তোমার ইচ্ছায় এ তৃণকে অবমানিত করিতে পার না, এ শ্যামল তৃণ তাঁহারই আনন্দ মূর্তিমান। তাঁহার আনন্দপ্রবাহ আলোকে উচ্ছ্বসিত হইয়া আজ বহুলক্ষক্রোশ দূর হইতে নবজাগরণের দেবদূতরূপে তোমার সুপ্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, ইহাকে ভক্তির সহিত অন্তঃকরণে গ্রহণ করো, ইহার স্পর্শের যোগে আপনাকে সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত করিয়া দাও।

আজ প্রভাতের এই মুহূর্তে পৃথিবীর অর্ধভূখণ্ডের নবজাগ্রত সংসারে কর্মের কী তরঙ্গই জাগিয়া উঠিয়াছে! এই-সমস্ত প্রবল প্রয়াস, এই-সমস্ত বিপুল উদ্‌যোগে যত পুঞ্জ-পুঞ্জ সুখদুঃখ-বিপৎসম্পদ্ গ্রামে-গ্রামে নগরে-নগরে দূরে-দূরান্তরে হিল্লোলিত-ফেনায়িত হইয়া উঠিতেছে, সমস্তই কেবল তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার আনন্দ, ইহাই জানিয়া পৃথিবীর সমস্ত লোকালয়ের কর্মকলরবের সংগীতকে একবার স্তব্ধ হইয়া অধ্যাত্মকর্ণে শ্রবণ করো— তার পরে সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া বলো— সুখে-দুঃখে তাঁহারই আনন্দ, লাভে-ক্ষতিতে তাঁহারই আনন্দ, জন্মে-মরণে তাঁহারই আনন্দ— সেই "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"— ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি জানেন, তিনি কাহা হইতেও ভয়প্রাপ্ত হন না।

ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলিয়া, ক্ষুদ্র অহমিকা দূর করিয়া তোমার নিজের অন্তঃকরণকে একবার আনন্দে

জাগাইয়া তোলো— তবেই আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি, আনন্দরূপে অমৃতরূপে যিনি চতুর্দিকেই প্রকাশ পাইতেছেন, সেই আনন্দময়ের উপাসনা সম্পূর্ণ হইবে। কোনো ভয় কোনো সংশয় কোনো দীনতা মনের মধ্যে রাখিয়ো না ; আনন্দে প্রভাতে জাগ্রত হও, আনন্দে দিনের কর্ম করো, দিবাবসানে নিঃশব্দ স্নিগ্ধ অন্ধকারের মধ্যে আনন্দে আত্মসমর্পণ করিয়া দাও, কোথাও যাইতে হইবে না, কোথাও খুঁজিতে হইবে না, সর্বত্র যে আনন্দরূপে তিনি বিরাজ করিতেছেন, সেই আনন্দরূপের মধ্যে তুমি আনন্দলাভ করিতে শিক্ষা করো— যাহা-কিছু তোমার সম্মুখে উপস্থিত, পূর্ণ আনন্দের সহিত তাহাকে স্বীকার করিয়া লইবার সাধনা করো—

সম্পদে সংকটে থাকো কল্যাণে
থাকো আনন্দে নিন্দা অপমানে।
সবারে ক্ষমা করি থাকো আনন্দে
চির-অমৃত-নির্ঝরে শান্তিরসপানে।

নিজের এই ক্ষুদ্র চোখের দীপ্তিটুকু যদি আমরা নষ্ট করিয়া ফেলি, তবে আকাশভরা আলো তো আর দেখিতে পাই না ; তেমনি আমাদের ছোটো মনের ছোটো ছোটো বিষাদ-অবসাদ-নৈরাশ্য-নিরানন্দ আমাদিগকে অন্ধ করিয়া দেয়— আনন্দরূপমমৃতং আমরা আর দেখিতে পাই না— নিজের কালিমাদ্বারা আমরা একেবারে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকি, চারি দিকে কেবল ভাঙাচোরা কেবল অসম্পূর্ণতা কেবল অভাব দেখি— কানা যেমন মধ্যাহ্নের আলোকে কালো দেখে, আমাদেরও সেই দশা ঘটে। একবার চোখ যদি খোলে, যদি দৃষ্টি পাই, হৃদয়ের মধ্যে নিমেষের মধ্যেও যদি সেই আনন্দ সপ্তকে সপ্তকে বাজিয়া উঠে, যে-আনন্দে জগদ্‌ব্যাপী আনন্দের সমস্ত সুর মিলিয়া যায়, তবে যেখানেই চোখ পড়ে সেখানে তাঁহাকেই দেখি— আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। বধে-বন্ধনে দুঃখে-দারিদ্র্যে অপকারে-অপমানেও তাঁহাকেই দেখি— আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। তখন মুহূর্তেই বুঝিতে পারি, প্রকাশমাত্রই তাঁহারই প্রকাশ— এবং প্রকাশমাত্রই আনন্দরূপমমৃতং। তখন বুঝিতে পারি, যে আনন্দে আকাশে-আকাশে আলোক উদ্ভাসিত, আমাতেও সেই পরিপূর্ণ আনন্দেরই প্রকাশ— সেই আনন্দে আমি কাহারও চেয়ে কিছুমাত্র ন্যূন নহি, আমি সকলেরই সমান, আমি জগতের সঙ্গে এক। সেই আনন্দে আমার ভয় নাই ক্ষতি নাই অসম্মান নাই। আমি আছি, কারণ আমাতে পরিপূর্ণ আনন্দ আছেন, কে তাহার কণামাত্রও অপলাপ করিতে পারে ? এমন কী ঘটনা ঘটিতে পারে, যাহাতে তাহার লেশমাত্র ক্ষুণ্ণতা হইবে ? তাই আজ আনন্দের দিনে, আজ উৎসবের প্রভাতে আমরা যেন সমস্ত অন্তরের সহিত বলিতে পারি— এষাস্য পরমা গতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোহস্য পরমো লোক এষোহস্য পরম আনন্দঃ— এবং প্রার্থনা করি, যেন সেই আনন্দের এমন একটু অংশ লাভ করিতে পারি, যাহাতে সমস্ত জীবনের প্রত্যেক দিনে সর্বত্র তাঁহাকেই স্বীকার করি, ভয়কে নয়, দ্বিধাকে নয়, শোককে নয়— তাঁহাকেই স্বীকার করি— আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। তিনি প্রচুররূপে আপনাকে দান করিতেছেন, আমরা প্রচুররূপে গ্রহণ করিতে পারিব না কেন ? তিনি প্রচুর ঐশ্বর্যে এই যে দিগ্‌দিগন্ত পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন, আমরা সংকুচিত হইয়া দীন হইয়া অতি ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া সেই অবারিত ঐশ্বর্যের অধিকার হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিব কেন ? হাত বাড়াও। বক্ষকে বিস্তৃত করিয়া দাও। দুই হাত ভরিয়া চোখ ভরিয়া প্রাণ ভরিয়া অবাধ আনন্দে সমস্ত গ্রহণ করো। তাঁহার প্রসন্নদৃষ্টি যে সর্বত্র হইতেই তোমাকে দেখিতেছে— তুমি একবার তোমার দুই চোখের সমস্ত জড়তা সমস্ত বিষাদ মুছিয়া ফেলো— তোমার দুই চক্ষুকে প্রসন্ন করিয়া চাহিয়া দেখো, তখনই দেখিবে, তাঁহারই প্রসন্নসুন্দর কল্যাণমুখ তোমাকে অনন্তকাল রক্ষা করিতেছে— সে কী প্রকাশ, সে কী সৌন্দর্য, সে কী প্রেম, সে কী আনন্দরূপমমৃতং ! যেখানে দানের লেশমাত্র কৃপণতা নাই সেখানে গ্রহণে এমন কৃপণতা কেন ? ওরে মূঢ়, ওরে অবিশ্বাসী, তোর সম্মুখেই সেই আনন্দমুখের দিকে তাকাইয়া সমস্ত প্রাণমনকে প্রসারিত করিয়া পাতিয়া ধর্— বলের সহিত বল্— 'অল্প নহে, আমার সবই চাই। ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি'। তুমি যতটা দিতেছ, আমি সমস্তটাই লইব। আমি ছোটোটার জন্য বড়োটাকে বাদ দিব না,

আমি একটার জন্য অন্যটা হইতে বঞ্চিত হইব না, আমি এমন সহজ ধন লইব, যাহা দশ দিক ছাপাইয়া আছে, যাহার অর্জনে আনন্দ, রক্ষণে আনন্দ, যাহার বিনাশ নাই, যাহার জন্য জগতে কাহারও সঙ্গে বিরোধ করিতে হয় না। তোমার যে প্রেম নানা দেশে, নানা কালে, নানা রসে, নানা ঘটনায় অবিশ্রাম আনন্দে-অমৃতে বিকাশিত, কোথাও যাহার প্রকাশের অন্ত নাই, তাহাকেই একান্তভাবে উপলব্ধি করিতে পারি, এমন প্রেম তোমার প্রসাদে আমার অন্তরে অঙ্কুরিত হইয়া উঠুক।

যেখানে সমস্তই দেওয়া হইতেছে, সেখানে কেবল পাওয়ার ক্ষমতা হারাইয়া যেন কাঙালের মতো না ঘুরিয়া বেড়াই। যেখানে আনন্দরূপমমৃতং তুমি আপনাকে স্বয়ং প্রকাশিত করিয়া রহিয়াছ, সেখানে চিরজীবন আমার এমন বিভ্রান্তি না ঘটে যে, সর্বদাই সর্বত্রই তোমাকে দেখিয়াও না দেখি এবং কেবল শোকদুঃখ শ্রান্তিজরা বিচ্ছেদক্ষতি লইয়া হাহাকার করিতে করিতে সংসার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

১৩১৩

শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতন

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত ! সকালবেলায় তো ঈশ্বরের আলো আপনি এসে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়— সমস্ত রাত্রির গভীর নিদ্রা এক মুহূর্তেই ভেঙে যায় । কিন্তু সন্ধ্যাবেলাকার মোহ কে ভাঙাবে ? সমস্ত দীর্ঘদিনের চিন্তা ও কর্ম হতে উৎক্ষিপ্ত একটা কুহকের আবেষ্টন, তার থেকে চিত্তকে নির্মল উদার শান্তির মধ্যে বাহির করে আনব কী করে ? সমস্ত দিনটা একটা মাকড়সার মতো জালের উপর জাল বিস্তার করে আমাদের নানা দিক থেকে জড়িয়ে রয়েছে— চিরন্তনকে, ভূমাকে একেবারে আড়াল করে রয়েছে— এই-সমস্ত জালকে কাটিয়ে চেতনাকে অনন্তের মধ্যে জাগ্রত করে তুলব কী করে ! ওরে, "উত্তিষ্ঠত ! জাগ্রত !"

দিন যখন নানা কর্ম নানা চিন্তা নানা প্রবৃত্তির ভিতর দিয়ে একটি একটি পাক আমাদের চার দিকে জড়াতে থাকে, বিশ্ব এবং আমার আত্মার মাঝখানে একটা আবরণ গড়ে তুলতে থাকে, সেই সময়েই যদি মাঝে মাঝে আমাদের চেতনাকে সতর্ক করতে না থাকি— "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত" এই জাগরণের মন্ত্র যদি ক্ষণে ক্ষণে দিনের সমস্ত বিচিত্রব্যাপারের মাঝখানেই আমাদের অন্তরাত্মা থেকে ধ্বনিত হয়ে না উঠতে থাকে তা হলে পাকের পর পাক পড়ে ফাঁসের পর ফাঁস লেগে শেষ কালে আমাদের অসাড় করে ফেলে ; তখন আবল্য থেকে নিজেকে টেনে বের করতে আমাদের আর ইচ্ছাও থাকে না, নিজের চারি দিকের বেষ্টনকেই অত্যন্ত সত্য বলে জানি— তার অতীত যে উন্মুক্ত বিশুদ্ধ শাশ্বত সত্য তার প্রতি আমাদের বিশ্বাসই থাকে না, এমন-কি, তার প্রতি সংশয় অনুভব করবারও সচেষ্টতা আমাদের চলে যায় । অতএব সমস্ত দিন যখন নানা ব্যাপারের কলধ্বনি, তখন মনের গভীরতার মধ্যে একটি একতারা যন্ত্রে যেন বাজতে থাকে ওরে, "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত !"

১৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

সংশয়

সংশয়ের যে বেদনা সেও যে ভালো । কিন্তু যে প্রকাণ্ড জড়তার কুণ্ডলীর পাকে সংশয়কেও আবৃত করে থাকে— তার হাত থেকে যেন মুক্তিলাভ করি । নিজের অজ্ঞতাসম্বন্ধে অজ্ঞানতার মতো অজ্ঞান আর তো কিছু নেই । ঈশ্বরকে যে জানি নে, তাঁকে যে পাই নি এইটে যখন অনুভবমাত্র না করি তখনকার যে আত্মবিস্মৃত নিশ্চিন্ততা সেইটে থেকে উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত । সেই অসাড়তাকে বিচলিত করে গভীরতর বেদনা জেগে উঠুক । আমি বুঝছি নে আমি পাচ্ছি নে আমাদের অন্তরতম প্রকৃতি এই বলে যেন কেঁদে উঠতে পারে । মনের সমস্ত তারে এই গান বেজে উঠুক, "সংশয়-তিমির-মাঝে না হেরি গতি হে ।"

আমরা মনে করি যে ব্যক্তি নাস্তিক সেই সংশয়ী, কিন্তু আমরা যেহেতু ঈশ্বরকে স্বীকার করি অতএব আমরা আর সংশয়ী নই । বাস্, এই বলে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি— এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে যাদের

সঙ্গে আমাদের মতে না মেলে তাদেরই আমরা পাষণ্ড বলি, নাস্তিক বলি, সংশয়াত্মা বলি। এই নিয়ে সংসারে কত দলাদলি কত বিবাদ বিরোধ কত শাসন পীড়ন তার আর অন্ত নেই। আমাদের দল এবং আমাদের দলের বাহির, এই দুইভাগে মানুষকে বিভক্ত ক'রে আমরা ঈশ্বরের অধিকারকে নিজের দলের বিশেষ সম্পত্তি বলে গণ্য করে আরামে বসে আছি। এ সম্বন্ধে কোনো চিন্তা নেই সন্দেহ নেই।

এই ব'লে কেবল কথাটুকুর মধ্যে ঈশ্বরকে স্বীকার করে আমরা সমস্ত সংসার থেকে তাঁকে নির্বাসিত করে দেখছি। আমরা এমন ভাবে গৃহে এবং সমাজে বাস করছি যেন সে গৃহে সে সমাজে ঈশ্বর নেই। আমরা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই বিশ্বজগতের ভিতর দিয়ে এমন ভাবে চলে যাই যেন এ জগতে সেই বিশ্বভুবনেশ্বরের কোনো স্থান নেই। আমরা সকালবেলায় আশ্চর্য আলোকের অভ্যুদয়ের মধ্যে জাগ্রত হয়ে সেই অদ্ভুত আবির্ভাবের মধ্যে তাঁকে দেখতে পাই নে, এবং রাত্রিকালে যখন অনিমেষজাগ্রত নিঃশব্দ জ্যোতিষ্কলোকের মাঝখানে আমরা নিদ্রার গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করতে যাই তখন এই আশ্চর্য শয়নাগারের বিপুলমহিমান্বিত অন্ধকার শয্যাতলের কোনো এক প্রান্তেও সেই বিশ্বজননীর নিস্তব্ধগম্ভীর স্নিগ্ধমূর্তি অনুভব করি নে। এই অনির্বচনীয় অদ্ভুত জগৎকে আমরা নিজের জমিজমা ঘরবাড়ির মধ্যেই সংকীর্ণ করে দেখতে সংকোচবোধ করি নে। আমরা যেন ঈশ্বরের জগতে জন্মাই নি— নিজের ঘরেই জন্মেছি— এখানে আমি আমি আমি ছাড়া আর কোনো কথাই নেই— তবু আমরা বলি আমরা ঈশ্বরকে মানি, তাঁর সম্বন্ধে আমার মধ্যে কোনো সংশয় নেই।

আমার গৃহের মধ্যে সংসারের মধ্যে আমরা কোনোদিন এমন করে চলি নে যাতে প্রকাশ পায় যে এই গৃহের গৃহদেবতা তিনি, এই সংসার-রথকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সেই মহাসারথি। আমিই ঘরের কর্তা, আমিই সংসারের সংসারী। ভোরের বেলা ঘুম ভাঙবামাত্রই সেই চিন্তাই শুরু হয় এবং রাত্রে ঘুম এসে সেই চিন্তাকেই ক্ষণকালের জন্য আবৃত করে। "আমি"র দ্বারাই এই গৃহ এই সংসার ঠাসা রয়েছে— কত দলিল, কত দস্তাবেজ, কত বিলিব্যবস্থা, কত বাদবিসংবাদ! কিন্তু ঈশ্বর কোথায়? কেবল মুখের কথায়! আর কোথাও যে তিলধারণের স্থান নেই।

এই মুখের কথায় ঈশ্বরকে স্বীকার করার মতো নিজেকে ফাঁকি দেবার আর কি কিছু আছে? আমি এই সম্প্রদায়ভুক্ত, আমাদের এই মত, আমি এই কথা বলি— ঈশ্বরকে এইটুকুমাত্র ফাঁকির জায়গা ছেড়ে দিয়ে তার পরে বাকি সমস্ত জায়গাটা অসংকোচে নিজে জুড়ে বসবার যে স্পর্ধা, সেই স্পর্ধা আপনাকে আপনি জানে না বলেই এত ভয়ানক। এই স্পর্ধা সংশয়ের সমস্ত বেদনাকে নিঃসাড় করে রাখে। আমরা যে জানি নে, এটাও জানতে দেয় না।

সংশয়ের বেদনা তখনই জেগে ওঠে যখন গোপনভাবে ঈশ্বর আমাদের চৈতন্যের একটা দিকে স্পর্শ করেন। তখন সংসারের মধ্যে থেকেও সংসার আমাদের কান্না থামাতে পারে না। এবং তাঁর দিকে দুই বাহু প্রসারিত করেও অন্ধকারে তাঁর নাগাল পাই নে। তখন এইটে জানা আরম্ভ হয় যে, যা পেয়েছি তাতে কোনোমতেই আমার চলবে না এবং যা না হলে আমার চলা অসম্ভব তা আমি কিছুতেই পাচ্ছি নে। এমন অসহ্য কষ্টের অবস্থা আর কিছুই নেই।

যখন প্রসবের সময় আসন্ন তখন গর্ভের শিশুকে একদিকে নাড়ী সম্পূর্ণ ছাড়ছে না অন্য দিকে ভূমিষ্ঠ হবার বেগ তাকে আকর্ষণ করছে। মুক্তির সঙ্গে বন্ধনের টানাটানির তখনো কোনো মীমাংসা হয় নি। এই সময়ের বেদনাই জন্মদানের পূর্বসূচনা, এই বেদনার অভাবকেই চিকিৎসক ভয় করেন।

যথার্থ সংশয়ের বেদনাও আত্মাকে সত্যের মধ্যে মুক্তিদানের বেদনা। সংসার এক দিকে তাকে আপনার মধ্যে আবৃত আচ্ছন্ন করে রেখেছে, বিমুক্ত সত্য অন্য দিকে তার অলক্ষ্যে তাকে আহ্বান করছে— সে অন্ধকারের মধ্যেই আছে অথচ আলোককে না জেনেই সে আলোকের আকর্ষণ অনুভব করছে। সে মনে করছে বুঝি তার এই ব্যাকুলতার কোনো পরিণাম নেই, কেননা সে তো সম্মুখে পরিণামকে দেখতে পাচ্ছে না, সে গর্ভস্থ শিশুর মতো নিজের আবরণকেই চার দিকে অনুভব করছে।

আসুক সেই অসহ্য বেদনা— সমস্ত প্রকৃতি কাঁদতে থাক্— সে কান্নার অবসান হবে। কিন্তু যে-কান্না বেদনায় জেগে ওঠে নি, ফুটে ওঠে নি, জড়তার শত বেষ্টনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে— তার

যে কোনো পরিণাম নেই। সে যে রক্তেমাংসে অস্থিমজ্জায় জড়িয়ে রয়েই গেল— তার ভার যে চব্বিশঘণ্টা নাড়ীতে নাড়ীতে বহন করে বেড়াতে হবে।

যেদিন সংশয়ের ক্রন্দন আমাদের মধ্যে সত্য হয়ে ওঠে, সেদিন আমরা সম্প্রদায়ের মত, দর্শনের তর্ক ও শাস্ত্রের বাক্য নিয়ে আরাম পাই নে ; সেদিন আমরা এক মুহূর্তেই বুঝতে পারি প্রেম ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই— সেদিন আমাদের প্রার্থনা এই হয় যে, "প্রেম-আলোকে প্রকাশো জগপতি হে।"

জ্ঞানের প্রকাশে আমাদের সংশয়ের সমস্ত অন্ধকার দূর হয় না। আমরা জেনেও জানি নে কখন ? যখন আমাদের মধ্যে প্রেমের প্রকাশ হয় না। একবার ভেবে দেখো-না এই পৃথিবীতে কত শত সহস্র লোক আমাকে বেষ্টন করে আছে। তাদের যে জানি নে তা নয়, কিন্তু তারা আমার পক্ষে কিছুই নয়। সংসারে আমি এমন ভাবে চলি যেন এই অগণ্য লোক তাদের সুখদুঃখ নিয়ে নেই। তবে কারা আছে ? যারা আমার আত্মীয়স্বজন, আমার প্রিয়ব্যক্তি, তারাই অগণ্য জীবকে ছাড়িয়ে আছে। এই কয়েকটি লোকই আমার সংসার। কেননা এদেরই আমি প্রেমের আলোতে দেখেছি। এদেরই আমি কমবেশি পরিমাণে আমার আত্মারই সমান করে দেখেছি। আমার আত্মা যে সত্য, আত্মপ্রেমে সেটা আমার কাছে একান্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে— সেই প্রেম যাদের মধ্যে প্রসারিত হতে পেরেছে তাদেরই আমি আত্মীয় বলে জানি— তাই তাদের সম্বন্ধে আমার কোনো সংশয় নেই, তারা আমার পক্ষে অনেকটা আমারই মতো সত্য।

ঈশ্বর যে আছেন এবং সর্বত্রই আছেন এ কথাটা যে আমার জানার অভাব আছে তা নয়, কিন্তু আমি অহরহ সম্পূর্ণ এমন ভাবেই চলি যেন তিনি কোনোখানেই নেই। এর কারণ কী ? তাঁর প্রতি আমার প্রেম জন্মে নি, সুতরাং তিনি থাকলেই বা কী, না থাকলেই বা কী ? তাঁর চেয়ে আমার নিজের ঘরের অতি তুচ্ছ বস্তুও আমার কাছে বেশি করে আছে। প্রেম নেই বলেই তাঁর দিকে আমাদের সমস্ত চোখ চায় না, আমাদের সমস্ত কান যায় না, আমাদের সমস্ত মন খোলে না। এইজন্যেই যিনি সকলের চেয়ে আছেন তাঁকেই সকলের চেয়ে পাই নে— তাই এমন একটা অভাব জীবনে থেকে যায় যা আর কিছুতেই কোনোমতেই পোরাতে পারে না। ঈশ্বর থেকেও থাকেন না— এতবড়ো প্রকাণ্ড না-থাকা আমাদের পক্ষে আর কী আছে। এই না-থাকার ভারে আমরা প্রতি মুহূর্তেই মরছি। এই না-থাকার মানে আর কিছুই না, আমাদের প্রেমের অভাব। এই না-থাকারই শুষ্কতায় জগতের সমস্ত লাবণ্য মারা গেল, জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট হল। যিনি আছেন তিনি নেই, এতবড়ো ক্ষতি কী দিয়ে পূরণ হবে ! কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। দিনে রাত্রে এইজন্যেই যে গেলুম। সব জানি সব বুঝি, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ— প্রেম-আলোকে প্রকাশো জগপতি হে।

২৩ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

অভাব

ঈশ্বরকে যে আমরা দিন রাত্রি বাদ দিয়ে চলছি তাতে আমাদের সাংসারিক ক্ষতি যদি সিকি পয়সাও হত তা হলে তখনই সতর্ক হয়ে উঠতুম। কিন্তু সে বিপদ নেই ; সূর্য আমাদের আলো দিচ্ছে, পৃথিবী আমাদের অন্ন দিচ্ছে, বৃহৎ লোকালয় তার সহস্র নাড়ী দিয়ে আমাদের সহস্র অভাব পূরণ করে চলেছে। তবে সংসারকে ঈশ্বরবর্জিত করে আমাদের কী অভাব হচ্ছে ? হায়, যে অভাব হচ্ছে তা যতক্ষণ না জানতে পারি ততক্ষণ আরামে নিঃসংশয়ে থাকি এবং সচ্ছল সংসারের মধ্যে বাস করে মনে করি আমরা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি।

কিন্তু ক্ষতিটা কী হয় তা কেমন করে বোঝানো যেতে পারে ?

এইখানে দৃষ্টান্তস্বরূপে আমার একটি স্বপ্নের কথা বলি। আমি নিতান্ত বালককালে মাতৃহীন। আমার বড়ো বয়সের জীবনে মার অধিষ্ঠান ছিল না। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম আমি যেন বাল্যকালেই রয়ে গেছি। গঙ্গার ধারের বাগানবাড়িতে মা একটি ঘরে বসে রয়েছেন। মা আছেন তো আছেন— তাঁর আবির্ভাব তো সকল সময়ে চেতনাকে অধিকার করে থাকে না। আমিও মাতার প্রতি মন না দিয়ে তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে চলে গেলুম। বারান্দায় গিয়ে এক মুহূর্তে আমার হঠাৎ কী হল জানি নে— আমার মনে এই কথাটা জেগে উঠল যে মা আছেন। তখনই তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে বললেন, "তুমি এসেছ!"

এইখানেই স্বপ্ন ভেঙে গেল। আমি ভাবতে লাগলুম— মায়ের বাড়িতেই বাস করছি, তাঁর ঘরের দুয়ার দিয়েই দশবার করে আনাগোনা করি— তিনি আছেন এটা জানি সন্দেহ নেই কিন্তু যেন নেই এমনি ভাবেই সংসার চলছে। তাতে ক্ষতিটা কী হচ্ছে। তাঁর ভাঁড়ারের দ্বার তিনি বন্ধ করেন নি, তাঁর অন্ন তিনি পরিবেশন করছেন, যখন ঘুমিয়ে থাকি তখনো তাঁর পাখা আমাকে বীজন করছে। কেবল ঐটুকু হচ্ছে না, তিনি আমার হাতটি ধরে বলছেন না, তুমি এসেছ! অন্ন জল ধন জন সমস্তই আছে কিন্তু সেই স্বরটি সেই স্পর্শটি কোথায়! মন যখন সম্পূর্ণ জেগে উঠে সেইটিকেই চায় এবং চেয়ে যখন না পায়, কেবল উপকরণভরা ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়ায়, তখন অন্নজল তার আর কিছুতেই রোচে না।

একবার ভালো করে ভেবে দেখো, জগতে কোনো জিনিসের কাছে কোনো মানুষের কাছে যাওয়া আমাদের জীবনে অল্পই ঘটে। পরম আত্মীয়ের নিকট দিয়েও আমরা প্রত্যহ আনাগোনা করি বটে কিন্তু দৈবাৎ এক মুহূর্ত তার কাছে গিয়ে পৌঁছোই। কত দিন তার সঙ্গে নিভৃতে কথা কয়েছি এবং সকাল সন্ধ্যার আলোকে একসঙ্গে বেড়িয়েছি কিন্তু এর মধ্যে হয়তো সকলের চেয়ে কেবল একদিনের কথা মনে পড়ে যেদিন হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে মনে হয়েছে আমি তার কাছে এসেছি। এমন শত সহস্র লোক আছে যারা সমস্ত জীবনে একবারও কোনো জিনিসের কোনো মানুষের কাছে আসে নি। জগতে জন্মেছে কিন্তু জগতের সঙ্গে তাদের অব্যবহিত সংস্পর্শ ঘটে নি। ঘটে নি যে, এও তারা একেবারেই জানে না। তারা যে সকলের সঙ্গে হাসছে খেলছে গল্পগুজব করছে, নানা লোকের সঙ্গে দেনাপাওনা আনাগোনা চলছে, তারা ভাবছে এই তো আমি সকলের সঙ্গে আছি। এইরূপ সঙ্গে থাকার মধ্যে সঙ্গটা যে কতই যৎসামান্য সে তার বোধের অতীত।

আত্মার দৃষ্টি

বাল্যকালে আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু আমি তা জানতুম না। আমি ভাবতুম দেখা বুঝি এই রকমই— সকলে বুঝি এই পরিমাণেই দেখে। একদিন দৈবাৎ লীলাচ্ছলে আমার কোনো সঙ্গীর চশমা নিয়ে চোখে পরেই দেখি, সব জিনিস স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তখন মনে হল আমি যেন হঠাৎ সকলের কাছে এসে পড়েছি, সমস্তকে এই যে স্পষ্ট দেখা ও কাছে পাওয়ার আনন্দ, এর দ্বারা বিশ্বভুবনকে যেন হঠাৎ দ্বিগুণ করে লাভ করলুম— অথচ এতদিন যে আমি এত লোকসান বহন করে বেড়াচ্ছি তা জানতুমই না।

এ যেমন চোখ দিয়ে কাছে আসা, তেমনি আত্মা দিয়ে কাছে আসা আছে। সেই রকম করে যারই কাছে আসি সেই আমার হাত তুলে ধরে বলে, তুমি এসেছ! এই যে জল বায়ু চন্দ্র সূর্য আমাদের পরমবন্ধু, এরা আমাদের নানা কাজ করছে, কিন্তু আমাদের হাত ধরছে না, আনন্দিত হয়ে বলছে না, তুমি এসেছ! যদি তাদের তেমনি কাছে যেতে পারতুম, যদি তাদের সেই স্পর্শ সেই সম্ভাষণ লাভ করতুম তা হলে মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারতুম, তাদের কৃত সমস্ত উপকারের চেয়ে এইটুকু কত বড়ো। মানুষের মধ্যে আমি চিরজীবন বাস করলুম কিন্তু মানুষ আমাকে স্পর্শ করে বলছে না, তুমি

এসেছ ! আমি একটা আবরণের মধ্যে আবৃত হয়ে পৃথিবীতে সঞ্চরণ করছি। ডিমের মধ্যে পক্ষীশিশু যেমন পৃথিবীতে জন্মেও জন্মলাভ করে না, এও সেই রকম।

এই অস্ফুট চেতনার ডিমের ভিতর থেকে জন্মলাভই আধ্যাত্মিক জন্ম। সেই জন্মের দ্বারাই আমরা দ্বিজ হব। সেই জন্মই জগতে যথার্থরূপে জন্ম— জীবচৈতন্যের বিশ্বচৈতন্যের মধ্যে জন্ম। তখনই পক্ষীশিশু পক্ষীমাতার পক্ষপুটের সম্পূর্ণ সংস্পর্শ লাভ করে— তখনই মানুষ সর্বত্রই সেই সর্বকে প্রাপ্ত হয়। সেই প্রাপ্ত হওয়া যে কী আশ্চর্য সার্থকতা কী অনির্বচনীয় আনন্দ তা আমরা জানি নে, কিন্তু জীবনে কি ক্ষণে ক্ষণে তার আভাসমাত্রও পাই নে !

আধ্যাত্মিকতায় আমাদের আর কিছু দেয় না ; আমাদের ঔদাসীন্য আমাদের অসাড়তা ঘুচিয়ে দেয়। অর্থাৎ তখনই আমরা চেতনার দ্বারা চেতনাকে, আত্মার দ্বারা আত্মাকে পাই। সেই রকম করে যখন পাই তখন আর আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে সমস্তই তাঁর আনন্দরূপ।

তৃণ থেকে মানুষ পর্যন্ত জগতে যেখানেই আমার চিত্ত উদাসীন থাকে সেখানেই আমাদের আধ্যাত্মিকতা সীমাবদ্ধ হয়েছে এটি জানতে হবে। আমাদের চেতনা আমাদের আত্মা যখন সর্বত্র প্রসারিত হয় তখন জগতের সমস্ত সত্তাকে আমাদের সত্তার দ্বারাই অনুভব করি, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নয়, বুদ্ধির দ্বারা নয়, বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা নয়। সেই পরিপূর্ণ অনুভূতি একটি আশ্চর্য ব্যাপার। এই সমুখের গাছটিকেও যদি সেই সত্তারূপে গভীররূপে অনুভব করি তবে যে আমার সমস্ত সত্তা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই দেখি নে বলে একে চোখ দিয়ে দেখবামাত্র এতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই বলে এর সম্মুখ দিয়ে চলে যাই, এই গাছের সত্তে আমার সত্তাকে জাগিয়ে তুলে আমাকে আনন্দের অধিকারী করে না। মানুষকেও আমরা আত্মা দিয়ে দেখি নে— ইন্দ্রিয় দিয়ে যুক্তি দিয়ে স্বার্থ দিয়ে সংসার দিয়ে সংস্কার দিয়ে দেখি— তাকে পরিবারের মানুষ, বা প্রয়োজনের মানুষ, বা নিঃসম্পর্ক মানুষ বা কোনো-একটা বিশেষ শ্রেণীভুক্ত মানুষ বলেই দেখি— সুতরাং সেই সীমাতেই গিয়ে আমার পরিচয় ঠেকে যায়— সেইখানেই দরজা রুদ্ধ— তার ভিতরে আর প্রবেশ করতে পারি নে— তাকেও আত্মা বলে আমার আত্মা প্রত্যক্ষ ভাবে সম্ভাষণ করতে পারে না। যদি পারত তবে পরস্পর হাত ধরে বলত, তুমি এসেছ !

আধ্যাত্মিক সাধনার যে চরম লক্ষ্য কী তা উপনিষদে স্পষ্ট লেখা আছে—

তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানং সর্বমেবাবিশন্তি।

ধীর ব্যক্তিরা সর্বব্যাপীকে সকল দিক থেকে পেয়ে যুক্তাত্মা হয়ে সর্বত্রই প্রবেশ করেন। এই সর্বত্র প্রবেশ করবার ক্ষমতাই শেষ ক্ষমতা। প্রবেশ করার মানেই হচ্ছে যুক্তাত্মা হওয়া। যখন সমস্ত পাপের সমস্ত অভ্যাসের সংস্কারের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের আত্মা সর্বত্রই আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয় তখনই সে সর্বত্র প্রবেশ করে— সেই আত্মায় গিয়ে না পৌঁছোলে সে দ্বারে এসে ঠেকে— সে মৃত্যুতেই আবদ্ধ হয়, অমৃতং যদ্বিভাতি, অমৃতরূপে যিনি সকলের মধ্যেই প্রকাশমান, সেই অমৃতের মধ্যে আত্মা পৌঁছোতে পারে না— সে আর সমস্তই দেখে কেবল আনন্দরূপমমৃতং দেখে না।

এই যে আত্মা দিয়ে বিশ্বের সর্বত্র আত্মার মধ্যে প্রবেশ করা এই তো আমাদের সাধনার লক্ষ্য। প্রতিদিন এই পথেই যে আমরা চলছি এটা তো আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। অন্ধভাবে জড়ভাবে তো এটা হবে না। চেতন ভাবেই তো চেতনার বিস্তার হতে থাকবে। প্রতিদিন তো আমাদের বুঝতে হবে— একটু একটু করে আমাদের প্রবেশপথ খুলে যাচ্ছে, আমাদের অধিকার ব্যাপ্ত হচ্ছে। সকলের সঙ্গে বেশি করে মিলতে পাচ্ছি, অল্পে অল্পে সমস্ত বিরোধ কেটে যাচ্ছে— মানুষের সঙ্গে মিলনের মধ্যে, সংসারের কর্মের মধ্যে, ভূমার প্রকাশ প্রতিদিন অব্যাহত হয়ে আসছে। আমিত্ব বলে যে সুদুর্ভেদ্য আবরণ আমাকে সকলের সঙ্গে অত্যন্ত বিভক্ত করে রেখেছিল তা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছে, ক্রমেই তা স্বচ্ছ হয়ে তার ভিতর থেকে নিখিলের আলো ক্রমে ক্রমে স্ফুটতর হয়ে দেখা যাচ্ছে— আমি আমার দ্বারা কাউকে আচ্ছন্ন কাউকে বিকৃত করছি নে, আমার মধ্যে অন্যের এবং অন্যের মধ্যে আমার বাধা প্রত্যহই কেটে যাচ্ছে।

পাপ

এমনি করে আত্মা যখন আত্মাকে চায়, আর-কিছুতেই তাকে থামিয়ে রাখতে পারে না, তখনই পাপ জিনিসটা কী তা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি। আমাদের চৈতন্য যখন বরফগলা ঝরনার মতো ছুটে বেরোতে চায় তখনই পাপের বাধাকে সে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে— এক মুহূর্ত আর তাকে ভুলে থাকতে পারে না— তাকে ক্ষয় করবার জন্যে তাকে সরিয়ে ফেলবার জন্যে আমাদের পীড়িত চৈতন্য পাপের চারি দিকে ফেনিল হয়ে উঠতে থাকে। বস্তুত আমাদের চিত্ত যখন চলতে থাকে তখন সে তার গতির সংঘাতেই ছোটো নুড়িটিকেও অনুভব করে, কিছুই তার আর অগোচর থাকে না।

তার পূর্বে পাপ পুণ্যকে আমরা সামাজিক ভালোমন্দ সুবিধা-অসুবিধার জিনিস বলেই জানি; চরিত্রকে এমন করে গড়ি যাতে লোকসমাজের উপযুক্ত হই, যাতে ভদ্রতার আদর্শ রক্ষা হয়। সেইটুকুতে কৃতকার্য হলেই আমাদের মনে আর কোনো সংকোচ থাকে না; আমরা মনে করি, চরিত্রনীতির যে উপযোগিতা তা আমার দ্বারা সিদ্ধ হল।

এমন সময় একদিন যখন আত্মা জেগে ওঠে, জগতের মধ্যে সে আত্মাকে খোঁজে, তখন সে দেখতে পায় যে শুধু ভদ্রতার কাজ নয়, শুধু সমাজ রক্ষা করা নয়— প্রয়োজন আরো বড়ো, বাধা আরো গভীর। উপর থেকে কেটে কুটে রাস্তা সাফ করে দিয়েছি, সংসারের পথে কোনো বাধা দিচ্ছে না, কারও চোখে পড়ছে না; কিন্তু শিকড়গুলো সমস্তই ভিতরে রয়ে গেছে— তারা পরস্পরে ভিতরে ভিতরে জড়াজড়ি করে একেবারে জাল বুনে রেখেছে, আধ্যাত্মিক চাষ-আবাদে সেখানে পদে পদে ঠেকে যেতে হয়। অতি ক্ষুদ্র অতি সূক্ষ্ম শিকড়টিও জড়িয়ে ধরে, আবরণ রচনা করে। তখন পূর্বে যে পাপটি চোখে পড়ে নি তাকেও দেখতে পাই এবং পাপ জিনিসটা আমাদের পরম সার্থকতার পথে সে কী রকম বাধা তাও বুঝতে পারি। তখন মানুষের দিকে না তাকিয়ে কোনো সামাজিক প্রয়োজনের দিকে না তাকিয়ে পাপকে কেবল পাপ বলেই সমস্ত অন্তঃকরণের সঙ্গে ঠেলা দিতে থাকি— তাকে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠে। সে যে চরম মিলনের, পরম প্রেমের পথ দলবল নিয়ে জুড়ে বসে আছে— তার সম্বন্ধে অন্যকে বা নিজেকে ফাঁকি দেওয়া আর চলবে না— লোকের কাছে ভালো হয়ে আর কোনো সুখ নেই— তখন সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে সেই নির্মল স্বরূপকে বলতে হবে, বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব— সমস্ত পাপ দূর করো— একেবারে বিশ্বদুরিত, সমস্ত পাপ— একটুও বাকি থাকলে চলবে না— কেননা তুমি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং, আত্মা তোমাকেই চায়— সেই তার একমাত্র যথার্থ চাওয়া, সেই তার শেষ চাওয়া। হে সর্বগ, তোমাকে, সর্বতঃ প্রাপ্য, সকল দিক থেকে পেয়ে যুক্তাত্মা হব, সকলের মধ্যে প্রবেশ লাভ করব, সেই আশ্চর্য সৌভাগ্যের ধারণাও এখন আমার মনে হয় না কিন্তু এই অনুগ্রহটুকু করতে হবে, যে, তোমার পরিপূর্ণ প্রকাশের অধিকারী নাই হই তবু আমার রুদ্ধদ্বারের ছিদ্র দিয়ে তোমার সেইটুকু আলোক আসুক যে আলোকে ঘরের আবদ্ধ অন্ধকারকে আমি অন্ধকার বলে জানতে পারি। রাত্রে দ্বার জানালা বন্ধ করে অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে ছিলুম। সকাল বেলায় দ্বারের ফাঁক দিয়ে যখন আলো ঢুকল তখন জড়শয্যায় পড়ে থেকে হঠাৎ বাইরের সুনির্মল প্রভাতের আবির্ভাব আমার তন্দ্রালস চিত্তকে আঘাত করল। তখন তপ্তশয্যার তাপ অসহ্য বোধ হল, তখন নিজের নিশ্বাস-কলুষিত বদ্ধ ঘরের বাতাস আমার নিশ্বাস রোধ করতে লাগল; তখন তো আর থাকতে পারা গেল না; তখন উন্মুক্ত নিখিলের স্নিগ্ধতা নির্মলতা পবিত্রতা, সমস্ত সৌন্দর্য সৌগন্ধ্য সংগীতের আভাস আমাকে আহ্বান করে বাইরে নিয়ে এল। তুমি তেমনি করে আমার আবরণের কোনো দুই একটা ছিদ্রের ভিতর দিয়ে তোমার আলোকের দূতকে তোমার মুক্তির বার্তাবহকে প্রেরণ করো— তা হলেই নিজের আবদ্ধতার তাপ এবং কলুষ এবং অন্ধকার আমাকে আর সুস্থির হতে দেবে না, আরামের শয্যা আমাকে দগ্ধ করতে থাকবে, তখন বলতেই হবে যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।

২৫ অগ্রহায়ণ

দুঃখ

আমাদের উপাসনার মন্ত্রে আছে, নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ— সুখকরকে নমস্কার করি, কল্যাণকরকে নমস্কার। কিন্তু আমরা সুখকরকেই নমস্কার করি, কল্যাণকরকে সব সময়ে নমস্কার করতে পারি নে। কল্যাণকর যে শুধু সুখকর নন, তিনি যে দুঃখকর। আমরা সুখকেই তাঁর দান বলে জানি আর দুঃখকে কোনো দুর্দৈবকৃত বিড়ম্বনা বলেই জ্ঞান করি।

এইজন্যে দুঃখভীরু বেদনাকাতর আমরা দুঃখ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে নানা প্রকার আবরণ রচনা করি, আমরা কেবলই লুকিয়ে থাকতে চাই। তাতে কী হয় ? তাতে সত্যের পূর্ণ সংস্পর্শ থেকে আমরা বঞ্চিত হই।

ধনী বিলাসী সমস্ত আয়াস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে কেবল আরামের মধ্যে পরিবৃত হয়ে থাকে। তাতে কী হয় ? তাতে সে নিজেকে পঙ্গু করে ফেলে ; নিজের হাত-পায়ের উপর তার অধিকার থাকে না, যে সমস্ত শক্তি নিয়ে সে পৃথিবীতে জন্মেছিল সেগুলি কর্ম-অভাবে পরিণত হতে পারে না, মুষড়ে যায়, বিগড়ে যায়। স্বরচিত আবরণের মধ্যে সে একটি কৃত্রিম জগতে বাস করে। কৃত্রিম জগৎ আমাদের প্রকৃতিকে কখনোই তার সমস্ত স্বাভাবিক খাদ্য জোগাতে পারে না, এইজন্যে সে অবস্থায় আমাদের স্বভাব একটি ঘরগড়া পুতুলের মতো হয়ে ওঠে, পূর্ণতালাভ করে না।

দুঃখের আঘাত থেকে আমাদের মনকে ভয়ে ভয়ে কেবলই বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করলে জগতে আমাদের অসম্পূর্ণভাবে বাস করা হয় সুতরাং তাতে কখনোই আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও শক্তির পরিণতি হয় না। পৃথিবীতে এসে যে ব্যক্তি দুঃখ পেলে না সে লোক ঈশ্বরের কাছ থেকে তার সব পাওনা পেলে না— তার পাথেয় কম পড়ে গেল।

যাদের স্বভাব অতিবেদনাশীল, আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই তাদের বাঁচিয়ে চলে ; সে ছোটোকে বড়ো করে তোলে বলেই লোকে কেবলই বলে কাজ নেই— তার সম্বন্ধে লোকের কথাবার্তা ব্যবহার কিছুই স্বাভাবিক হয় না। সে সব কথা শোনে না কিংবা ঠিক কথা শোনে না— তার যা উপযুক্ত পাওনা তা সে সবটা পায় না কিংবা ঠিকমত পায় না। এতে তার মঙ্গল হতেই পারে না। যে ব্যক্তি বন্ধুর কাছ থেকে কখনো আঘাত পায় না, কেবলই প্রশ্রয় পায়, সে হতভাগ্য বন্ধুত্বের পূর্ণ আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়— বন্ধুরা তার সম্বন্ধে পূর্ণরূপে বন্ধু হয়ে উঠতে পারে না।

জগতে এই যে আমাদের দুঃখের পাওনা এ যে সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত হবেই তা নয়। যাকে আমরা অন্যায় বলি অবিচার বলি তাও আমাদের গ্রহণ করতে হবে— অত্যন্ত সাবধানে সূক্ষ্মহিসাবের খাতা খুলে কেবলমাত্র ন্যায্যটুকুর ভিতর দিয়েই নিজেকে মানুষ করে তোলা— সে তো হয়েও ওঠে না এবং হলেও তাতে আমাদের মঙ্গল হয় না। অন্যায় এবং অবিচারকেও আমরা উপযুক্ত ভাবে গ্রহণ করতে পারি এমন আমাদের সামর্থ্য থাকা চাই।

পৃথিবীতে আমাদের ভাগে যে সুখ পড়ে তাও কি একেবারে ঠিক হিসাবমত পড়ে, অনেক সময়েই কি আমরা গাঁঠের থেকে যা দাম দিয়েছি তার চেয়ে বেশি খরিদ করে ফেলি নে ? কিন্তু কখনো তো মনে করি নে আমি তার অযোগ্য। সবটুকুই তো দিব্য অসংকোচে দখল করি। দুঃখের বেলাতেই কি কেবল ন্যায় অন্যায়ের হিসাব মেলাতে হবে ?

ঠিক হিসাব মিলিয়ে কোনো জিনিস যে আমরা পাই নে, তার একটি কারণ আছে। গ্রহণ এবং বর্জনের ভিতর দিয়েই আমাদের প্রাণের ক্রিয়া চলতে থাকে— কেন্দ্রানুগ এবং কেন্দ্রাতিগ, এই দুটো শক্তিই আমাদের পক্ষে সমান গৌরবের— আমাদের প্রাণের আমাদের বুদ্ধির আমাদের সৌন্দর্যবোধের আমাদের মঙ্গল প্রবৃত্তির, বস্তুত আমাদের সমস্ত শ্রেষ্ঠতার মূল ধর্মই এই যে, সে যে কেবলমাত্র নেবে তা নয় সে ত্যাগও করবে।

এইজন্যই আমাদের আহার্য পদার্থে ঠিক হিসাবমত আমাদের প্রয়োজনের উপকরণ থাকে না, তাতে যেমন খাদ্য অংশ আছে তেমনি অখাদ্য অংশও আছে। এই অখাদ্য অংশ শরীর পরিত্যাগ করে। যদি

ঠিক ওজনমত নিছক খাদ্য পদার্থ আমরা গ্রহণ করি তা হলে আমাদের চলে না, শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হয়। কারণ কেবল কি আমাদের পাকশক্তি ও পাকযন্ত্র আছে ? আমাদের ত্যাগশক্তি ও ত্যাগযন্ত্র আছে— সেই শক্তি সেই যন্ত্রকেও আমাদের কাজ দিতে হবে, তবেই গ্রহণ-বর্জনের সামঞ্জস্যে প্রাণের পূর্ণতাসাধন ঘটবে।

সংসারে তেমনি আমরা যে কেবলমাত্র ন্যায্যটুকু পাব, কেউ আমাদের প্রতি কোনো অবিচার করবে না, এও বিধান নয়। সংসারে এই ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায় মিশ্রিত থাকা আমাদের চরিত্রের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার মতো আমাদের চরিত্রের এমন একটি সহজ ক্ষমতা থাকা চাই যাতে আমাদের যেটুকু প্রাপ্য সেটুকু অনায়াসে গ্রহণ করি এবং যেটুকু ত্যাজ্য সেটুকু বিনাক্ষোভে ত্যাগ করতে পারি।

অতএব দুঃখ এবং আঘাত ন্যায্য হোক বা অন্যায্য হোক তার সংস্পর্শ থেকে নিজেকে নিঃশেষে বাঁচিয়ে চলবার অতিচেষ্টায় আমাদের মনুষ্যত্বকে দুর্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত করে তোলে।

এই ভীরুতায় শুধুমাত্র বিলাসিতার পেলবতা ও দৌর্বল্য জন্মে তা নয়, যে-সমস্ত অতিবেদনাশীল লোক আঘাতের ভয়ে নিজেকে আবৃত করে তাদের শুচিতা নষ্ট হয়— আবরণের ভিতরে ভিতরে তাদের অনেক মলিনতা জমতে থাকে ; যতই লোকের ভয়ে তারা সেগুলো লোকচক্ষুর সামনে বের করতে না চায় ততই সেগুলো দূষিত হয়ে উঠে স্বাস্থ্যকে বিকৃত করতে থাকে। পৃথিবীর নিন্দা অবিচার দুঃখকষ্টকে যারা অবাধে অসংকোচে গ্রহণ করতে পারে তারা কেবল বলিষ্ঠ হয় তা নয়, তারা নির্মল হয়, অনাবৃত জীবনের উপর দিয়ে জগতের পূর্ণসংঘাত লেগে তাদের কলুষ ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে।

অতএব সমস্ত মনপ্রাণ নিয়ে প্রস্তুত হও— যিনি সুখকর তাঁকে প্রণাম করো এবং যিনি দুঃখকর তাঁকেও প্রণাম করো— তা হলেই স্বাস্থ্যলাভ করবে শক্তিলাভ করবে— যিনি শিব যিনি শিবতর তাঁকেই প্রণাম করা হবে।

২৬ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

ত্যাগ

প্রতিদিন প্রাতে আমরা যে এই উপাসনা করছি যদি তার মধ্যে কিছু সত্য থাকে তবে তার সাহায্যে আমরা প্রত্যহ অল্পে অল্পে ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। নিতান্তই প্রস্তুত হওয়া চাই, কারণ, সংসারের মধ্যে একটি ত্যাগের ধর্ম আছে, তার বিধান অমোঘ। সে আমাদের কোথাও দাঁড়াতে দিতে চায় না : সে বলে, কেবলই ছাড়তে হবে এবং এগোতে হবে। এমন কোথাও কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে যেখানে পৌঁছে বলতে পারি এইখানেই সমস্ত সমাপ্ত হল, পরিপূর্ণ হল, অতএব এখান থেকে আর কোনোকালেই নড়ব না।

সংসারের ধর্মই যখন কেবল ধরে রাখা নয়, সরিয়ে দেওয়া, এগিয়ে দেওয়া— তখন তারই সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার সামঞ্জস্য সাধন না করলে দুটোতে কেবলই ঠোকাঠুকি হতে থাকে। আমরা যদি কেবলই বলি, আমরা থাকব আমরা রাখব আর সংসার বলে, তোমাকে ছাড়তে হবে চলতে হবে তা হলে বিষম কষ্ট উৎপন্ন হতে থাকে। আমাদের ইচ্ছাকে পরাস্ত হতে হয়— যা আমরা ছাড়তে চাই নে তা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। অতএব আমাদের ইচ্ছাকেও এই বিশ্বধর্মের সুরে বাঁধতে হবে।

বিশ্বধর্মের সঙ্গে আমাদের ইচ্ছাকে মেলাতে পারলেই আমরা বস্তুত স্বাধীন হই। স্বাধীনতার নিয়মই তাই। আমি স্বেচ্ছায় বিশ্বের সঙ্গে যোগ না দিই যদি, তা হলেই বিশ্ব আমার প্রতি জবরদস্তি করে আমাকে তার অনুগত করবে— তখন আমার আনন্দ থাকবে না, গৌরব থাকবে না, তখন দাসের মতো সংসারের কানমলা খাব।

অতএব একদিন এ কথা যেন সংসার না বলতে পারে যে, তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেব, আমিই যেন বলতে পারি আমি ত্যাগ করব। কিন্তু প্রতিদিনই যদি ইচ্ছাকে এই ত্যাগের অভিমুখে প্রস্তুত না করি তবে মৃত্যু ও ক্ষতি যখন তার বড়ো বড়ো দাবি নিয়ে আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়াবে তখন তাকে কোনোমতে ফাঁকি দিতে ইচ্ছা হবে, অথচ সেখানে একেবারেই ফাঁকি চলবে না— সে বড়ো দুঃখের দিন উপস্থিত হবে।

এই ত্যাগের দ্বারা আমরা দারিদ্র্য ও রিক্ততা লাভ করি, এমন কথা যেন আমাদের মনে না হয়। পূর্ণতররূপে লাভ করবার জন্যেই আমাদের ত্যাগ।

আমরা যেটা থেকে বেরিয়ে না আসব সেটাকে আমরা পাব না। গর্ভের মধ্যে আবৃত শিশু তার মাকে পায় না— সে যখন নাড়ির বন্ধন কাটিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়, স্বাধীন হয়, তখনই সে তার মাকে পূর্ণতরভাবে পায়।

এই জগতের গর্ভাবরণের মধ্যে থেকে আমাদের সেই রকম করে মুক্ত হতে হবে— তা হলেই যথার্থভাবে আমরা জগৎকে পাব— কারণ, স্বাধীনভাবে পাব। আমরা জগতের মধ্যে বদ্ধ হয়ে ভ্রূণের মতো জগৎকে দেখতে পাই নে— যিনি মুক্ত হয়েছেন, তিনিই জগৎকে জানেন, জগৎকে পান।

এইজন্যই বলছি, যে লোক সংসারের ভিতরে জড়িয়ে রয়েছে সেই যে আসল সংসারী তা নয়— যে সংসার থেকে বেরিয়ে এসেছে সেই সংসারী— কারণ, সে তখন সংসারের থাকে না, সংসার তারই হয়— সেই সত্য করে বলতে পারে আমার সংসার।

ঘোড়া গাড়ির সঙ্গে লাগামে বদ্ধ হয়ে গাড়ি চালায়— কিন্তু ঘোড়া কি বলতে পারে গাড়িটা আমার? বস্তুত গাড়ির চাকার সঙ্গে তার বেশি তফাত কী? যে সারথি মুক্ত থেকে গাড়ি চালায় গাড়ির উপরে কর্তৃত্ব তারই।

যদি কর্তা হতে চাই তবে মুক্ত হতে হবে। এইজন্য গীতা সেই যোগকেই কর্মযোগ বলেছেন যে যোগে আমরা অনাসক্ত হয়ে কর্ম করি। অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলেই কর্মের উপর আমার পূর্ণ অধিকার জন্মে— নইলে কর্মের সঙ্গে জড়ীভূত হয়ে আমরা কর্মেরই অঙ্গীভূত হয়ে পড়ি, আমরা কর্মী হই নে।

অতএব সংসারকে লাভ করতে হলে আমাদের সংসারের বাইরে যেতে হবে, এবং কর্মকে সাধন করতে গেলে আসক্তি পরিহার করে আমাদের কর্ম করতে হবে।

তার মানেই হল এই যে, সংসারে নেওয়া এবং দেওয়া এই যে দুটো বিপরীত ধর্ম আছে এই দুই বিপরীতের সামঞ্জস্য করতে হবে— এর মধ্যে একটা একান্ত হয়ে উঠলেই তাতে অকল্যাণ ঘটে। যদি নেওয়াটাই একমাত্র বড়ো হয় তা হলে আমরা আবদ্ধ হই, আর যদি দেওয়াটাই একমাত্র বড়ো হয় তা হলে আমরা বঞ্চিত হই। যদি কর্মটা মুক্তিবিবর্জিত হয় তা হলে আমরা দাস হই আর যদি মুক্তি কর্মবিহীন হয় তা হলে আমরা বিলুপ্ত হই।

বস্তুত ত্যাগ জিনিসটা শূন্যতা নয়, তা অধিকারের পূর্ণতা। নাবালক যখন সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকারী না হয় তখন সে দান বিক্রয় করতে পারে না— তখন তার কেবল ভোগের ক্ষুদ্র অধিকার থাকে, ত্যাগের মহৎ অধিকার থাকে না। আমরা যে অবস্থায় কেবল জমাতে পারি কিন্তু প্রাণ ধরে দিতে পারি নে সে অবস্থায় আমাদের সেই সঞ্চিত সামগ্রীর সম্বন্ধে আমাদের স্বাধীনতা থাকে না।

এইজন্যে খৃস্ট বলে গিয়েছেন, যে লোক ধনী তার পক্ষে মুক্তি বড়ো কঠিন। কেননা, যেটুকু ধন সে ছাড়তে না পারে সেইটুকু ধনই যে তাকে বাঁধে, এই বন্ধনটাকে যে যতই বড়ো করে তুলেছে সে যে ততই বিপদে পড়েছে।

এই সমস্ত বন্ধন প্রত্যহ শিথিল হয়ে আসছে, প্রত্যহ ত্যাগ আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে আসছে, আমাদের উপাসনা থেকে এই ফলটি যেন লাভ করি। নানা আসক্তির নিবিড় আকর্ষণে আমাদের প্রকৃতি একেবারে পাথরের মতো আঁট হয়ে আছে। উপাসনার সময় অমৃতের ঝরনা ঝরতে থাকে— আমাদের অণুপরমাণুর ছিদ্রের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করতে থাক্— এই পাষাণটাকে দিনে দিনে বিশ্লিষ্ট করতে থাক্, আর্দ্র করতে থাক্, তার পরে ক্রমে এটা খইয়ে দিয়ে সরিয়ে দিয়ে জীবনের মাঝখানে

একটি বৃহৎ অবকাশ রচনা করে সেই অবকাশটিকে পূর্ণ করে দিক। দেখো, একবার ভিতরের দিকে চেয়ে দেখো— অন্তরের সংকোচনগুলি তাঁর নামের আঘাতে প্রতিদিন প্রসারিত হয়ে আসছে, সমস্ত প্রসন্ন হচ্ছে, শান্ত হচ্ছে, কর্ম সহজ হচ্ছে, সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ সত্য ও সরল হচ্ছে, এবং ঈশ্বরের মহিমা এই মানবজীবনের মধ্যে ধন্য হয়ে উঠছে।

২৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

ত্যাগের ফল

কিন্তু ত্যাগ কেন করব এ প্রশ্নটার চরম উত্তরটি এখনো মনের মধ্যে এসে পৌঁছোল না। শাস্ত্রে উত্তর দেয়, ত্যাগ না করলে স্বাধীন হওয়া যায় না, যেটিকে ত্যাগ না করব সেইটিই আমাদের বদ্ধ করে রাখবে— ত্যাগের দ্বারা আমরা মুক্ত হব।

মুক্তিলাভ করব, এ কথাটার জোর যে আমাদের কাছে নেই। আমরা তো মুক্তি চাচ্ছি নে; আমাদের ভিতরে যে অধীনতার একটা বিষম ঝোঁক আছে— আমরা যে ইচ্ছা করে খুশি হয়ে সংসারের অধীন হয়েছি— আমরা ঘটিবাটি থালার অধীন, আমরা ভৃত্যেরও অধীন, আমরা কথার অধীন, প্রথার অধীন, অসংখ্য প্রবৃত্তির অধীন— এতবড়ো জন্ম-অধীন দাসানুদাসকে এ কথা বলাই মিথ্যা যে, মুক্তিতে তোমার সার্থকতা আছে; যে ব্যক্তি স্বভাবত এবং স্বেচ্ছাক্রমেই বদ্ধ তাকে মুক্তির প্রলোভন দেখানো মিথ্যা।

বস্তুত মুক্তি তার কাছে শূন্যতা, নির্বাণ, মরুভূমি। যে মুক্তির মধ্যে তার ঘর-দুয়ার ঘটিবাটি টাকাকড়ি কিছুই নেই, যা কিছুকে সে একমাত্র আশ্রয় বলে জানত তার সমস্তই বিলুপ্ত— সে মুক্তি তার কাছে বিভীষিকা, বিনাশ।

আমরা যে ত্যাগ করব তা যদি শূন্যতার মধ্যেই ত্যাগ হয় তবে সে তো একেবারেই লোকসান। একটি কানাকড়িকেও সেইরকম শূন্যের মধ্যে বিসর্জন দেওয়া আমাদের পক্ষে একেবারে অসহ্য।

কিন্তু ত্যাগ তো শূন্যের মধ্যে নয়। যদ্ যদ্ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ— যা কিছু করবে সমস্তই ব্রহ্মে সমর্পণ করবে। তোমার সংসারকে তোমার প্রিয়জনকে তোমার সমস্ত কিছুকেই তাঁকে নিবেদন করে দাও— এই যে ত্যাগ এ যে পরিপূর্ণতার মধ্যে বিসর্জন।

পূর্ণের মধ্যে যাকে ত্যাগ করি তাকেই সত্যরূপে পূর্ণরূপে লাভ করি এ কথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু এতেও কথা শেষ হয় না। কেবলমাত্র লাভের কথায় কোনো কথার সমাপ্তি হতে পারে না— লাভ করে কী হবে এ প্রশ্ন থেকে যায়। স্বাধীন হয়েই বা কী হবে, পূর্ণতা লাভ করেই বা কী হবে?

যখন কোনো ছেলেকে পয়সা দিই সে জিজ্ঞাসা করতে পারে পয়সা নিয়ে কী হবে? উত্তর যদি দিই বাজারে যাবে, তা হলেও প্রশ্ন এই যে বাজারে গিয়ে কী হবে? পুতুল কিনবে। পুতুল কিনে কী হবে? খেলা করবে। খেলা করে কী হবে? তখন একটি উত্তরে সব প্রশ্নের শেষ হয়ে যায়— খুশি হবে। খুশি হয়ে কী হবে এ প্রশ্ন কেউ কখনো অন্তরের থেকে বলে না। ইচ্ছার পূর্ণ চরিতার্থতা হয়ে যে আনন্দ ঘটে সেই আনন্দের মধ্যেই সকল প্রশ্ন সকল সন্ধান নিঃশেষিত হয়ে যায়।

কেমন করে সংগ্রহ করব যার দ্বারা ত্যাগের শক্তি জন্মাবে? আমাদের এই প্রতিদিনের উপাসনার মধ্যে আমরা কিছু কিছু সংগ্রহ করছি। এই প্রাতঃকালে সেই চৈতন্যস্বরূপের সঙ্গে নিজের চৈতন্যকে নিবিড়ভাবে পরিবেষ্টিত করে দেখবার জন্যে আমাকে যে ক্ষণকালের জন্যেও সমস্ত আবরণ ত্যাগ করতে হচ্ছে, অনাবৃত হয়ে সদ্যোজাত শিশুর মতো তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে, এতেই আমার দিনে দিনে কিছু কিছু করে জমে উঠবে। আনন্দের সঙ্গে আনন্দ, প্রেমের সঙ্গে প্রেমের মিলন নিশ্চয় ক্রমশই কিছু না কিছু সহজ হয়ে আসছে।

কেমন করে ত্যাগ করব? সংসারের মাঝখানে থেকে অন্তত একটা মঙ্গলের যজ্ঞ আরম্ভ করে

দাও। সেই মঙ্গল-যজ্ঞের জন্য তোমার ভাণ্ডারের একটা অতি ছোটো দরজাও যদি খুলে রাখ তা হলে দেখবে আজ যে অনভ্যাসের দ্বারে একটু টান দিতে গেলেই আর্তনাদ করে উঠছে, যার মরচে-পড়া তালায় চাবি ঘুরছে না— ক্রমেই তা খোলা অতি সহজ ব্যাপারের মতো হয়ে উঠবে— একটি শুভ উপলক্ষে ত্যাগ আরম্ভ হয়ে তা ক্রমশই বিস্তৃত হতে থাকবে। সংসারকে তো আমরা অহোরাত্র সমস্তই দিই, ভগবানকেও কিছু দাও— প্রতিদিন একবার অন্তত মুষ্টিভিক্ষা দাও— সেই নিঃস্পৃহ ভিখারি তাঁর ভিক্ষাপাত্রটি হাতে হাসিমুখে প্রতিদিনই আমাদের দ্বারে আসছেন এবং প্রতিদিনই ফিরে যাচ্ছেন। তাঁকে যদি একমুঠো করে দান করা আমরা অভ্যাস করি তবে সেই দানই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠবে। ক্রমে সে আর আমাদের মুঠোয় ধরবে না, ক্রমে কিছুই আর হাতে রাখতে পারব না। কিন্তু তাঁকে যেটুকু দেব সেটুকু গোপনে দিতে হবে, তাঁর জন্যে কোনো মানুষের কাছে এতটুকু খ্যাতি চাইলে চলবে না। কেননা লোককে দেখিয়ে দেওয়া সেটুকু এক রকম করে দিয়ে অন্যরকম করে হরণ করা। সেই মহাভিক্ষুকে যা দিতে হবে তা অল্প হলেও নিঃশেষে দেওয়া চাই। তার হিসেব রাখলে হবে না, তার রসিদ চাইলে চলবে না। দিনের মধ্যে আমাদের একটা কোনো দান যেন এইরূপ পরিপূর্ণ দান হতে পারে— সে যেন সেই পরিপূর্ণ স্বরূপের কাছে পরিপূর্ণ ত্যাগ হয় এবং সংসারের মধ্যে এইটুকু ব্যাপারে কেবল তাঁরই সঙ্গে একাকী আমার প্রত্যহ একটি গোপন সাক্ষাতের অবকাশ ঘটে।

২৮ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

প্রেম

বেদমন্ত্রে আছে, মৃত্যুও তাঁর ছায়া, অমৃতও তাঁর ছায়া— উভয়কেই তিনি নিজের মধ্যে এক করে রেখেছেন। যাঁর মধ্যে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে আছে তিনিই হচ্ছেন চরম সত্য। তিনিই বিশুদ্ধতম জ্যোতি, তিনিই নির্মলতম অন্ধকার।

সংসারের সমস্ত বিপরীতের সমন্বয় যদি কোনো একটি সত্যের মধ্যে না ঘটে তবে তাকে চরম সত্য বলে মানা যায় না। তবে তার মধ্যে যেটুকু কুলোল না তার জন্যে আর একটা সত্যকে মানতে হয়, এবং সে দুটিকে পরস্পরের বিরুদ্ধ বলেই ধরে নিতে হয়। তা হলেই অমৃতের জন্যে ঈশ্বরকে এবং মৃত্যুর জন্যে শয়তানকে মানতে হয়।

কিন্তু আমরা ব্রহ্মের কোনো শরিককে মানি নে— আমরা জানি তিনিই সত্য, খণ্ড সত্যের সমস্ত বিরোধ তাঁর মধ্যে সামঞ্জস্য লাভ করেছে ; আমরা জানি তিনিই এক ; খণ্ড সত্তার সমস্ত বিচ্ছিন্নতা তাঁর মধ্যে সম্মিলিত হয়ে আছে।

কিন্তু এ তো হল তত্ত্বকথা। তিনি সত্য এ কথা জানলে কেবল জ্ঞানে জানা হয়— এর সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের যোগ কোথায়। এই সত্যের কি কোনো রসই নেই।

তা বললে চলবে কী করে। সমস্ত সত্য যেমন তাঁতে মিলেছে তেমনি সমস্ত রসও তাঁতে মিলে গেছে। সেইজন্যে উপনিষৎ তাঁকে শুধু সত্য বলেন নি, তাঁকে রসস্বরূপ বলেছেন— তাঁকে সেই পরিপূর্ণ রসরূপে জানলে জানার সার্থকতা হয়।

তা হলে দাঁড়ায় এই যিনি চরম সত্য তিনিই পরম রস। অর্থাৎ তিনি প্রেমস্বরূপ। নইলে তাঁর মধ্যে কিছুরই সমাধান হতে পারতই না— ভেদ ভেদই থাকত, বিরোধ কেবলই আঘাত করত এবং মৃত্যু কেবলই হরণ করে নিত। তাঁর মধ্যে যে সমস্তই মেলে— সেটা একটা জ্ঞানতত্ত্বের মিলন নয়— তাঁর মধ্যে একটি প্রেমতত্ত্ব আছে— সেইজন্য সমস্তকে মিলতেই হয়— সেইজন্যই বিচ্ছেদ বিরোধ কখনোই চিরন্তন সত্য বস্তু হয়ে উঠতে পারে না।

ইচ্ছার শেষ চরিতার্থতা প্রেমে। প্রেমে— কেন, কী হবে, এ সমস্ত প্রশ্ন থাকতেই পারে না— প্রেম

আপনিই আপনার জবাবদিহি, আপনিই আপনার লক্ষ্য।

যদি বল, ত্যাগের দ্বারা ত্যক্তবস্তু থেকে মুক্তিলাভ করবে, তাতে আমাদের মন সায় দেয় না, যদি বল, ত্যাগের দ্বারা ত্যক্তবস্তুকে পূর্ণতররূপে লাভ করবে তা হলেও আমাদের মনের সম্পূর্ণরূপে সাড়া পাওয়া যায় না। যদি বল, ত্যাগের দ্বারা প্রেমকে পাওয়া যাবে, তা হলে মন আর কথাটি কইতে পারে না— এ কথাটাকে যদি সে ঠিকমত অবধান করে শোনে তবে তাকে বলে উঠতেই হবে, "তা হলে যে বাঁচি।"

ত্যাগের সঙ্গে প্রেমের ভারি একটা সম্বন্ধ আছে— এমন সম্বন্ধ যে, কে আগে কে পরে তা ঠিক করাই দায়। প্রেম ছাড়া ত্যাগ হয় না, আবার ত্যাগ ছাড়া প্রেম হতে পারে না। যা আমাদের কাছ থেকে প্রয়োজনের তাগিদে বা অত্যাচারের তাড়নায় ছিনিয়ে নেওয়া হয় সে তো ত্যাগই নয়— আমরা প্রেমে যা দিই তাই সম্পূর্ণ দিই, কিছুই তার আর রাখি নে, সেই দেওয়াতেই দানকে সার্থক মনে করি। কিন্তু এই যে প্রেম এও ত্যাগের সাধনাতেই শেষে আমাদের কাছে ধরা দেয়। যে লোক চিরকাল কেবল আপনার দিকেই টানে, নিজের অহংকারকেই জয়ী করবার জন্যে ব্যস্ত সেই স্বার্থপর সেই দাম্ভিক ব্যক্তির মনে প্রেমের উদয় হয় না— প্রেমের সূর্য একবারে কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

স্বার্থের বন্ধন ছাড়তে হবে, অহংকারের নাগপাশ মোচন করতে হবে, যা কেবল জমাবার জন্যেই জীবনপাত করেছি প্রত্যহ তা ত্যাগ করতে বসতে হবে— ত্যাগটা যেন ক্রমশই সহজ হয়ে আসে, নিজের দিকের টানটা যেন প্রত্যহই আলগা হয়ে আসে। তা হলেই কি যাকে মুক্তি বলে তাই পাব। হাঁ, মুক্তি পাবে। মুক্তি পেয়ে কী পাব। মুক্তির যা চরম লক্ষ্য সেই প্রেমকে পাব।

প্রেম কে? তিনিই প্রেম, যিনি কোনো প্রয়োজন নেই তবু আমাদের জন্য সমস্তই ত্যাগ করছেন, তিনিই প্রেমস্বরূপ। তিনি নিজের শক্তিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতর দিয়ে নিয়ত আমাদের জন্য উৎসর্জন করছেন— সমস্ত সৃষ্টি তাঁর কৃত উৎসর্গ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে— আনন্দ থেকেই এই যা কিছু সমস্ত সৃষ্টি হচ্ছে, দায়ে পড়ে কিছুই হচ্ছে না— সেই স্বয়ম্ভূ সেই স্বতউৎসারিত প্রেমই সমস্ত সৃষ্টির মূল।

এই প্রেমস্বরূপের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ যোগ হলেই আমাদের সমুদয় ইচ্ছার পরিপূর্ণ চরিতার্থতা হবে। সম্পূর্ণ যোগ হতে গেলেই যার সঙ্গে যার যোগ হবে তার মতন হতে হবে। প্রেমের সঙ্গে প্রেমের দ্বারাই যোগ হবে।

কিন্তু প্রেম যে মুক্ত, সে যে স্বাধীন। দাসত্বের সঙ্গে প্রেমের আর কোনো তফাতই নেই— কেবল দাসত্ব বদ্ধ আর প্রেম মুক্ত। প্রেম নিজের নিয়মেই নিজে চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত, সে নিজের চেয়ে উপরের আর কারও কাছে কোনো বিষয়ে কোনো কৈফিয়ত দেয় না।

সুতরাং প্রেমস্বরূপের সঙ্গে মিলতে গেলে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে হবে। স্বাধীন ছাড়া স্বাধীনের সঙ্গে আদান প্রদান চলতে পারে না। তাঁর সঙ্গে আমাদের এই কথাবার্তা হয়ে গেছে, তিনি আমাদের বলে রেখেছেন, তুমি মুক্ত হয়ে আমার কাছে এসো— যে ব্যক্তি দাস তার জন্য আমার আম-দরবার খোলা আছে বটে কিন্তু সে আমার খাস-দরবারে প্রবেশ করতে পারবে না।

এক এক সময় মনের আগ্রহে আমরা তাঁর সেই খাস-দরবারের দরজার কাছে ছুটে যাই— কিন্তু দ্বারী বার বার আমাদের ফিরিয়ে দেয়। বলে, তোমার নিমন্ত্রণ পত্র কই। খুঁজতে গিয়ে দেখি আমার কাছে যে কটা নিমন্ত্রণ আছে সে ধনের নিমন্ত্রণ, যশের নিমন্ত্রণ, অমৃতের নিমন্ত্রণ নয়। বার বার ফিরে আসতে হল— বার বার!

টিকিট-পরীক্ষককে ফাঁকি দেবার জো নেই। আমরা দাম দিয়ে যে ইস্টেশনের টিকিট কিনেছি সেই ইস্টেশনেই আমাদের নামতে হবে। আমরা বহুকালের সাধনা এবং বহুদুঃখের সঞ্চয় দিয়ে এই সংসার লাইনেরই নানা গম্যস্থানের টিকিট কিনেছি অন্য লাইনে তা চলবে না। এবার থেকে প্রতিদিন আবার অন্য লাইনের টাকা সংগ্রহ করতে হবে। এবার থেকে যা কিছু সংগ্রহ এবং যা কিছু ত্যাগ করতে হবে সে কেবল সেই প্রেমের জন্যে।

সামঞ্জস্য

আমরা আর কোনো চরম কথা জানি বা না জানি, নিজের ভিতর থেকে একটি চরম কথা বুঝে নিয়েছি, সেটি হচ্ছে এই যে, একমাত্র প্রেমের মধ্যেই সমস্ত দ্বন্দ্ব এক সঙ্গে মিলে থাকতে পারে। যুক্তিতে তারা কাটাকাটি করে, কর্মেতে তারা মারামারি করে, কিছুতেই তারা মিলতে চায় না, প্রেমেতে সমস্তই মিটমাট হয়ে যায়। তর্কক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে যারা দিতিপুত্র ও অদিতিপুত্রের মতো পরস্পরকে একেবারে বিনাশ করবার জন্যেই সর্বদা উদ্যত, প্রেমের মধ্যে তারা আপন ভাই।

তর্কের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত পরস্পরের একমন্ত বিরোধী ; হাঁ যেমন না-কে কাটে, না যেমন হাঁ-কে কাটে, তারা তেমনি বিরোধী। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত ঠিক একই স্থান জুড়ে রয়েছে। প্রেমেতে একই কালে দুই হওয়াও চাই, এক হওয়াও চাই। এই দুই প্রকাণ্ড বিরোধের কোনোটাই বাদ দিলে চলে না— আবার তাদের বিরুদ্ধরূপে থাকলেও চলবে না। যা বিরুদ্ধ তাকে অবিরুদ্ধ হয়ে থাকতে হবে এই এক সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড এ কেবল প্রেমেতেই ঘটে। এইজন্যই, কেন যে আমি অন্যের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে যাই, নিজের ভিতরকার এই রহস্য তলিয়ে বুঝতে পারি নে— কিন্তু স্বার্থ জিনিসটা বোঝা কিছুই শক্ত নয়।

ভগবান প্রেমস্বরূপ কিনা তাই তিনি এককে নিয়ে দুই করেছেন আবার দুইকে নিয়ে এক করেছেন। স্পষ্টই যে দেখতে পাচ্ছি, দুই যেমন সত্য, একও তেমনি সত্য। এই অদ্ভুত ব্যাপারটাকেও তো যুক্তির দ্বারা নাগাল পাওয়া যাবে না, এ যে প্রেমের কাণ্ড।

উপনিষদে ঈশ্বরের সম্বন্ধে এইজন্যে কেবলই বিরুদ্ধ কথাই দেখতে পাই। য একোঽবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি। তিনি এক, এবং তাঁর কোনো বর্ণ নেই অথচ বহুশক্তি নিয়ে সেই জাতিহীন এক, অনেক জাতির গভীর প্রয়োজনসকল বিধান করেছেন। যিনি এক, তিনি আবার কোথা থেকে অনেকের প্রয়োজনসকল বিধান করতে যান। তিনি যে প্রেমস্বরূপ— তাই, শুধু এক হয়ে তাঁর চলে না, অনেকের বিধান নিয়েই তিনি থাকেন।

স পর্যগাৎ শুক্রং আবার তিনিই ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ— অর্থাৎ অনন্ত দেশে তিনি স্তব্ধ হয়ে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, আবার অনন্তকালে তিনি বিধান করছেন, তিনি কাজ করছেন। একাধারে স্থিতিও তিনি, গতিও তিনি।

আমাদের প্রকৃতির মধ্যেও এই স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য আমরা একটি মাত্র জায়গায় দেখতে পাই ; সে হচ্ছে প্রেমে। এই চঞ্চল সংসারের মধ্যে যেখানে আমাদের প্রেম, কেবলমাত্র সেইখানেই আমাদের চিত্তের স্থিতি— আর সমস্তকে আমরা ছুঁই আর চলে যাই, ধরি আর ছেড়ে দিই, যেখানে প্রেম সেইখানেই আমাদের মন স্থির হয়। অথচ সেইখানেই তার ক্রিয়াও বেশি। সেইখানেই আমাদের মন সকলের চেয়ে সচল। প্রেমেতেই যেখানে স্থির করায় সেইখানেই অস্থির করে। প্রেমের মধ্যেই স্থিতি গতি এক নাম নিয়ে আছে।

কর্মক্ষেত্রে ত্যাগ এবং লাভ ভিন্নশ্রেণীভুক্ত— তারা বিপরীত পর্যায়ের। প্রেমেতে ত্যাগও যা লাভও তাই। যাকে ভালোবাসি তাকে যা দিই সেই দেওয়াটাই লাভ। আনন্দের হিসাবের খাতায় জমা খরচ একই জায়গায়— সেখানে দেওয়াও যা পাওয়াও তাই। ভগবানও সৃষ্টিতে এই যে আনন্দের যজ্ঞ, এই যে প্রেমের খেলা ফেঁদেছেন, এতে তিনি নিজেকে দিয়ে নিজেকেই লাভ করছেন। এই দেওয়া-পাওয়াকে একেবারে এক করে দেওয়াকেই বলে প্রেম।

দর্শনশাস্ত্রে মস্ত একটা তর্ক আছে, ঈশ্বর পুরুষ কি অপুরুষ, তিনি সগুণ কি নির্গুণ, তিনি personal কি impersonal ? প্রেমের মধ্যে এই হাঁ না একসঙ্গে মিলে আছে। প্রেমের একটা কোটি সগুণ, আর একটা কোটি নির্গুণ। তার এক দিক বলে, আমি আছি, আর এক দিক বলে, আমি নেই। "আমি" না হলেও প্রেম নেই, "আমি" না ছাড়লেও প্রেম নেই। সেইজন্যে ভগবান সগুণ কি নির্গুণ, সে সমস্ত তর্কের কথা কেবল তর্কের ক্ষেত্রেই চলে— সে তর্ক তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না।

পাশ্চাত্য ধর্মতত্ত্বে বলে, আমাদের অনন্ত উন্নতি— আমরা ক্রমাগতই তাঁর দিকে যাই, কোনো কালে তাঁর কাছে যাই নে। আমাদের উপনিষৎ বলেছেন, আমরা তাঁর কাছে যেতেও পারি নে, আবার তাঁর কাছে যেতেও পারি ; তাঁকে পাইও না, তাঁকে পাইও। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ— আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। এমন অদ্ভুত বিরুদ্ধ কথা একই শ্লোকের দুই চরণের মধ্যে তো এমন সুস্পষ্ট করে আর কোথাও শোনা যায় নি। শুধু বাক্য ফেরে না, মনও তাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে— এ একেবারে সাফ জবাব। অথচ সেই ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি জেনেছেন তিনি আর কিছু থেকে ভয় পান না। তবেই তো যাঁকে একেবারেই জানা যায় না তাঁকে এমনি জানা যায় যে আর কিছু থেকেই ভয় থাকে না। সেই জানাটা কিসের জানা ? আনন্দের জানা। প্রেমের জানা। এ হচ্ছে সমস্ত জানাকে লঙ্ঘন করে জানা। প্রেমের মধ্যেই না জানার সঙ্গে জানার ঐকান্তিক বিরোধ নেই। স্ত্রী তার স্বামীকে জ্ঞানের পরিচয়ে সকল দিক থেকে সম্পূর্ণ না জানতে পারে কিন্তু প্রেমের জানায় আনন্দের জানায় এমন করে জানতে পারে যে, কোনো জ্ঞানী তেমন করে জানতে পারে না। প্রেমের ভিতরকার এই এক অদ্ভুত রহস্য যে, যেখানে এক দিকে কিছুই জানি নে সেখানে অন্য দিকে সম্পূর্ণ জানি। প্রেমেতেই অসীম সীমার মধ্যে ধরা দিচ্ছেন এবং সীমা অসীমকে আলিঙ্গন করছে— তর্কের দ্বারা এর কোনো মীমাংসা করবার জো নেই।

ধর্মশাস্ত্রে তো দেখা যায়, মুক্তি এবং বন্ধনে এমন বিরুদ্ধ সম্বন্ধ যে, কেউ কাউকে রেয়াত করে না। বন্ধনকে নিঃশেষে নিকাশ করে দিয়ে মুক্তিলাভ করতে হবে এই আমাদের প্রতি উপদেশ। স্বাধীনতা জিনিসটা যেন একটা চূড়ান্ত জিনিস, পাশ্চাত্য শাস্ত্রেও এই সংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল করে দিয়েছে। কিন্তু একটি ক্ষেত্র আছে যেখানে অধীনতা এবং স্বাধীনতা ঠিক সমান গৌরব ভোগ করে, এ কথা আমাদের ভুললে চলবে না। সে হচ্ছে প্রেমে। সেখানে অধীনতা স্বাধীনতার কাছে এক চুলও মাথা হেঁট করে না। প্রেমই সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং প্রেমই সম্পূর্ণ অধীন।

ঈশ্বর তো কেবলমাত্র মুক্ত নন, তা হলে তো তিনি একেবারে নিষ্ক্রিয় হতেন। তিনি নিজেকে বেঁধেছেন। না যদি বাঁধতেন, তা হলে সৃষ্টিই হত না এবং সৃষ্টির মধ্যে কোনো নিয়ম কোনো তাৎপর্যই দেখা যেত না। তাঁর যে আনন্দরূপ, যে রূপে তিনি প্রকাশ পাচ্ছেন, এই তো তাঁর বন্ধনের রূপ। এই বন্ধনেই তিনি আমাদের কাছে আপন, আমাদের কাছে সুন্দর। এই বন্ধন তাঁর আমাদের সঙ্গে প্রণয়বন্ধন। এই তাঁর নিজকৃত স্বাধীন বন্ধনেই তো তিনি আমাদের সখা, আমাদের পিতা। এই বন্ধনে যদি তিনি ধরা না দিতেন তা হলে আমরা বলতে পারতুম না যে, স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা, তিনিই বন্ধু তিনিই পিতা তিনিই বিধাতা, এত বড়ো একটা আশ্চর্য কথা মানুষের মুখ দিয়ে বের হতেই পারত না। কোন্‌টা বড়ো কথা ? ঈশ্বর শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত, এইটে ? না তিনি আমাদের সঙ্গে পিতৃত্বে সখিত্বে পতিত্বে বদ্ধ— এইটে ? দুটোই সমান বড়ো কথা। অধীনতাকে অত্যন্ত ছোটো করে দেখে তার সম্বন্ধে আমাদের একটা হীন সংস্কার হয়ে গেছে। এরকম অন্ধ সংস্কার আরো আমাদের অনেক আছে। যেমন আমরা ছোটোকে মনে করি তুচ্ছ, বড়োকেই মনে করি মহৎ— যেন গণিতশাস্ত্রের দ্বারা কাউকে মহত্ত্ব দিতে পারে ! তেমনি সীমাকে আমরা গাল দিয়ে থাকি। যেন, সীমা জিনিসটা যে কি, তা আমরা কিছুই জানি ? সীমা একটি পরমাশ্চর্য রহস্য। এই সীমাই তো অসীমকে প্রকাশ করছে। এ কী অনির্বচনীয়। এর কী আশ্চর্য রূপ, কী আশ্চর্য গুণ, কী আশ্চর্য বিকাশ। এক রূপ হতে আর এক রূপ, এক গুণ হতে আর এক গুণ, এক শক্তি হতে আর এক শক্তি— এরই বা নাশ কোথায়। এরই বা সীমা কোন্‌খানে। সীমা যে ধারণাতীত বৈচিত্র্যে, যে অগণনীয় বহুলত্বে, যে অশেষ পরিবর্তনপরম্পরায় প্রকাশ পাচ্ছে তাকে অবজ্ঞা করতে পারে এতবড়ো সাধ্য আছে কার। বস্তুত আমরা নিজের ভাষাকেই নিজে অবজ্ঞা করি, কিন্তু সীমা পদার্থকে অবজ্ঞা করি এমন অধিকার আমাদের নেই। অসীমের অপেক্ষা সীমা কোনো অংশেই কম আশ্চর্য নয়, অব্যক্তের অপেক্ষা ব্যক্ত কোনোমতেই অশ্রদ্ধেয় নয়।

স্বাধীনতা অধীনতা নিয়েও আমরা কথার খেলা করি। অধীনতাও যে স্বাধীনতার সঙ্গেই এক আসনে বসে রাজত্ব করে, এ কথা আমরা ভুলে যাই। স্বাধীনতাই যে আমরা চাই তা নয়, অধীনতাও

আমরা চাই। যে চাওয়াতে আমাদের ভিতরকার এই দুই চাওয়ারই সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়, সেই হচ্ছে প্রেমের চাওয়া। বন্ধনকে স্বীকার করে বন্ধনকে অতিক্রম করব, এই হচ্ছে প্রেমের কাজ। প্রেম যেমন স্বাধীন এমন স্বাধীন আর দ্বিতীয় কেউ নেই, আবার প্রেমের যে অধীনতা এতবড়ো অধীনতাই বা জগতে কোথায় আছে।

অধীনতা জিনিসটা যে কত বড়ো মহিমান্বিত বৈষ্ণবধর্মে সেইটে আমাদের দেখিয়েছে। অদ্ভুত সাহসের সঙ্গে অসংকোচে বলেছে, ভগবান জীবের কাছে নিজেকে বাঁধা রেখেছেন— সেই পরম গৌরবের উপরেই জীবের অস্তিত্ব। আমাদের পরম অভিমান এই যে, তিনি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারেন নি— এই বন্ধনটি তিনি মেনেছেন— নইলে আমরা আছি কি করে।

মা যেমন সন্তানের, প্রণয়ী যেমন প্রণয়ীর সেবা করে তিনি তেমনি বিশ্ব জুড়ে আমাদের সেবা করছেন। তিনি নিজে সেবক হয়ে সেবা-জিনিসকে অসীম মাহাত্ম্য দিয়েছেন। তাঁর প্রকাণ্ড জগৎটি নিয়ে তিনি তো খুব ধুমধাম করতে পারতেন কিন্তু আমাদের মন ভোলাবার এত চেষ্টা কেন? নানা ছলে নানা কলায় বিশ্বের সঙ্গে আমাদের এত অসংখ্য ভালো লাগাবার সম্পর্ক পাতিয়ে দিচ্ছেন কেন? এই ভালো লাগাবার অপ্রয়োজনীয় আয়োজনের কি অন্ত আছে? তিনি নানা দিক থেকে কেবলই বলছেন, তোমাকে আমার আনন্দ দিচ্ছি, তোমার আনন্দ আমাকে দাও। তিনি যে নিজেকে চারি দিকেই সীমার অপরূপ ছন্দে বেঁধেছেন— নইলে প্রেমের গীতিকাব্য প্রকাশ হয় না যে।

এই প্রেমস্বরূপের সঙ্গে আমাদের প্রেম যেখানেই ভালো করে না মিলছে সেইখানে সমস্ত জগতে তার বেসুরটা বাজছে। সেইখানে কত দুঃখ যে জাগছে তার সীমা নেই— চোখের জল বয়ে যাচ্ছে। ওগো প্রেমিক, তুমি যে প্রেম কেড়ে নেবে না, তুমি যে মন ভুলিয়ে নেবে— একদিন সমস্ত মনে প্রাণে কাঁদিয়ে তার পরে তোমার প্রেমের ঋণ শোধ করাবে। তাই এত বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে— তাই তো, সন্ধ্যা হয়ে আসে তবু আমার অভিসারের সজ্জা হল না।

২৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

কী চাই?

আমরা এতদিন প্রত্যহ আমাদের উপাসনা থেকে কী ফল চেয়েছিলুম। আমরা চেয়েছিলুম শান্তি। ভেবেছিলুম, এই উপাসনা বনস্পতির মতো আমাদের ছায়া দেবে, প্রতিদিন সংসারের তাপ থেকে আমাদের বাঁচাবে।

কিন্তু শান্তিকে চাইলে শান্তি পাওয়া যায় না। তার চেয়ে আরো অনেক বেশি না চাইলে শান্তির প্রার্থনাও বিফল হয়।

জ্বরের রোগী কাতর হয়ে বলে, আমার এই জ্বালাটা জুড়োক; হয়তো জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। তাতে যেটুকু শান্তি হয় সেটা তো স্থায়ী হয় না— এমন-কি, তাতে তাপ বেড়ে যেতে পারে। রোগী যদি শান্তি চায়, স্বাস্থ্য না চায়, তবে সে শান্তিও পায় না, স্বাস্থ্যও পায় না।

আমাদেরও শান্তিতে চল্‌বে না, প্রেম দরকার। বরঞ্চ মনে ঐ যে একটুকু শান্তি পাওয়া যায়, কিছুক্ষণের জন্য একটা স্নিগ্ধতার আবরণ আমাদের উপরে এসে পড়ে, সেটাতে আমাদের ভুলায়— আমরা মনে নিশ্চিন্ত হয়ে বলি, আমাদের উপাসনা সার্থক হল— কিন্তু ভিতরের দিকে সার্থকতা দেখতে পাই নে।

কেননা, দেখতে পাই, ব্যাধি যে যায় না। সমস্ত দিন নানা ঘটনায় দেখতে পাই, সংসারের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ সহজ হয় নি। রোগীর সঙ্গে তার বাহিরের প্রকৃতির সম্বন্ধ যেরকম সেইরকম হয়ে আছে। বাহিরে যেখানে সামান্য ঠাণ্ডা, রোগীর দেহে সেখানে অসহ্য শীত; বাহিরের স্পর্শ যেখানে

অতি মৃদু, রোগীর দেহে সেখানে দুঃসহ বেদনা। আমাদেরও সেই দশা, বাহিরের সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের ওজন ঠিক থাকছে না। ছোটো কথা অত্যন্ত বড়ো করে শুনছি, ছোটো ব্যাপার অত্যন্ত ভারী হয়ে উঠছে।

ভার বাড়ে কখন ; না, কেন্দ্রের দিকে ভারাকর্ষণ যখন বেশি হয়। পৃথিবীতে যে হালকা জিনিস আমরা সহজেই তুলছি, যদি বৃহস্পতিগ্রহে যাই তবে সেখানে সেটুকু আমাদের হাড় গুঁড়িয়ে দিতে পারে। কেননা সেখানে এই কেন্দ্রের দিকের আকর্ষণ পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি। আমরাও তাই দেখছি, আমাদের নিজের কেন্দ্রের দিকের টানটা অত্যন্ত বেশি— আমাদের স্বার্থ ভিতরের দিকেই টানছে, অহংকার ভিতরের দিকেই টানছে, এইজন্যেই সব জিনিসই অত্যন্ত ভারী হয়ে উঠছে— যা তুচ্ছ তা কেবলমাত্র আমার ঐ ভিতরের টানের জোরেই আমাকে কেবলই চাপছে— সব জিনিসই আমাকে ঠেসে ধরেছে— সব কথাই আমাকে ঠেলে দিচ্ছে— ক্ষণকালের শান্তির দ্বারা এটাকে ভুলে থেকে আমাদের লাভটা কী।

এই চাপটা হালকা হয় কখন ? প্রেমে। তখন যে ঐ টানটা বাহিরের দিকে যায়। আমাদের জীবনে অনেকবার তার পরিচয় পেয়েছি। যেদিন প্রণয়ীর সঙ্গে আমাদের প্রণয় বিশেষভাবে সার্থক হয়েছে সেদিন কেবল যে আকাশের আলো উজ্জ্বলতর, বনের শ্যামলতা শ্যামলতর হয়েছে তা নয়, সেদিন আমাদের সংসারের ভারাকর্ষণের টান একেবারে আলগা হয়ে গেছে। অন্য দিন ভিক্ষুককে যখন একপয়সামাত্র দিই, সেদিন তাকে আধুলি দিয়ে ফেলি ; অর্থাৎ অন্যদিন এক পয়সার যে ভার ছিল, আজ বত্রিশ পয়সার সেই ভার। অন্য দিন যে-কাজে হয়রান হয়ে পড়তুম আজ সে-কাজে ক্লান্তি নেই— হঠাৎ কাজ হালকা হয়ে গেছে। পয়সা সেই পয়সাই আছে, কাজ সেই কাজই আছে, কেবল তার ওজন কমে গেছে কেননা টান যে আজ আমার নিজের কেন্দ্রের দিকে নয় ; প্রেমে যে আমাকে বাইরে টান দিয়ে একেবারে এক মুহূর্তে সমস্ত জগতের বোঝা নামিয়ে দিয়ে গেছে।

আমাদের সাধনা যেমনই হোক আমাদের সংসার সেই সঙ্গে যদি হালকা হতে না থাকে তবে বুঝব যে হল না। যদি বুঝি টাকার ওজন তেমনি ভয়ানক আছে, উপকরণের বোঝা তেমনিই আমাকে চেপে আছে, তার মধ্যে অতি ছোটোটুকুকেও ফেলে দিতে পারি এমন বল আমার নেই ; যদি দেখি কাজ যত বড়ো তার ভার যেন তার চেয়ে অনেক বেশি, তা হলে বুঝতে হবে প্রেম জোটে নি— আমাদের বরণসভায় বর আসে নি।

তবে আর ঐ শান্তিটুকু নিয়ে কী হবে ? ওতে আমাদের আসল জিনিসটা ফাঁকি দিয়ে অল্পে সন্তুষ্ট করে রাখবে। প্রেমের মধ্যে শুধু শান্তি নেই, তাতে অশান্তিও আছে ; জোয়ারের জলের মতো কেবল যে তার পূর্ণতা, তা নয় ; তারই মতো তার গতিবেগও আছে ; সে আমাদের ভরিয়ে দিয়ে বসিয়ে রাখবে না, সে আমাদের ভাঁটার মুখের থেকে ফিরিয়ে উলটো টানে টেনে নিয়ে যাবে— তখন এই অচল সংসারটাকে নিয়ে কেবলই গুণ-টানাটানি লগি-ঠেলাঠেলি করে মরতে হবে না— সে হুহু করে ভেসে চলবে।

যতদিন সেই প্রেমের টান না ধরে ততদিন শান্তিতে কাজ নেই— ততদিন অশান্তিকে যেন অনুভব করতে পারি। ততদিন যেন বেদনাকে নিয়ে রাত্রে শুতে যাই এবং বেদনাকে নিয়ে সকাল বেলায় জেগে উঠি— চোখের জলে ভাসিয়ে দাও, স্থির থাকতে দিয়ো না।

প্রতিদিন প্রাতে যখন অন্ধকারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়, তখন যেন দেখতে পাই, বন্ধু, দাঁড়িয়ে আছ ; সুখের দিন হোক, দুঃখের দিন হোক, বিপদের দিন হোক, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল, আজ আমার আর ভাবনা নেই, আমার আজ সমস্তই সহ্য হবে। যখন প্রেম না থাকে, হে সখা, তখনই শান্তির জন্যে দরবার করি। তখন অল্প পুঁজিতে যে কোনো আঘাত সইতে পারি নে। কিন্তু যখন প্রেমের অভ্যুদয় হয় তখন যে-দুঃখ যে-অশান্তিতে সেই প্রেমের পরীক্ষা হবে সেই দুঃখ সেই অশান্তিকেও মাথায় তুলে নিতে পারি। হে বন্ধু, উপাসনার সময় আমি আর শান্তি চাইব না— আমি কেবল প্রেম চাইব। প্রেম শান্তিরূপেও আসবে অশান্তিরূপেও আসবে, সুখ হয়েও আসবে দুঃখ হয়েও

আসবে— সে যে-কোনো বেশেই আসুক তার মুখের দিকে চেয়ে যেন বলতে পারি : তোমাকে চিনেছি, বন্ধু, তোমাকে চিনেছি।

৩০ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

প্রার্থনা

উপনিষৎ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি। এ যে কেবল সুন্দর শ্যামল ছায়াময়, তা নয়, এ বৃহৎ এবং এ কঠিন। এর মধ্যে যে কেবল সিদ্ধির প্রাচুর্য পল্লবিত, তা নয় ; এতে তপস্যার কঠোরতা ঊর্ধ্বগামী হয়ে রয়েছে। সেই অভ্রভেদী সুদৃঢ় অটলতার মধ্যে একটি মধুর ফুল ফুটে আছে—তার গন্ধে আমাদের ব্যাকুল করে তুলেছে। সেটি ঐ মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা-মন্ত্রটি।

যাজ্ঞবল্ক্য যখন গৃহত্যাগ করবার সময় তাঁর পত্নী দুটিকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করে যেতে উদ্যত হলেন তখন মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বলো তো এ-সব নিয়ে কি আমি অমর হব ? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, না, তা হবে না, তবে কিনা উপকরণবন্তের যেমনতরো জীবন তোমার জীবন সেইরকম হবে। সংসারীরা যেমন করে তাদের ঘরদুয়ার গোরুবাছুর অশনবসন নিয়ে স্বচ্ছন্দে দিন কাটায় তোমরাও তেমনি করে দিন কাটাতে পারবে।

মৈত্রেয়ী তখন এক মুহূর্তে বলে উঠলেন, "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।" যার দ্বারা আমি অমৃতা না হব তা নিয়ে আমি কী করব। এ তো কঠোর জ্ঞানের কথা নয়— তিনি তো চিন্তার দ্বারা ধ্যানের দ্বারা কোন্‌টা নিত্য কোন্‌টা অনিত্য তার বিবেকলাভ করে এ কথা বলেন নি— তাঁর মনের মধ্যে একটি কষ্টিপাথর ছিল যার উপরে সংসারের সমস্ত উপকরণকে একবার ঘষে নিয়েই তিনি বলে উঠলেন, "আমি যা চাই এ তো তা নয়।"

উপনিষদে সমস্ত পুরুষঋষিদের জ্ঞানগম্ভীর বাণীর মধ্যে একটিমাত্র স্ত্রীকণ্ঠের এই একটিমাত্র ব্যাকুল বাক্য ধ্বনিত হয়ে উঠেছে এবং সে ধ্বনি বিলীন হয়ে যায় নি— সেই ধ্বনি তাঁদের মেঘমন্দ্র শান্তস্বরের মাঝখানে অপূর্ব একটি অশ্রুপূর্ণ মাধুর্য জাগ্রত করে রেখেছে। মানুষের মধ্যে যে পুরুষ আছে, উপনিষদে নানা দিকে নানা ভাবে আমরা তারই সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম ; এমন সময়ে হঠাৎ এক প্রান্তে দেখা গেল মানুষের মধ্যে যে নারী রয়েছেন তিনিও সৌন্দর্য বিকীর্ণ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

আমাদের অন্তর-প্রকৃতির মধ্যে একটি নারী রয়েছেন। আমরা তাঁর কাছে আমাদের সমুদয় সঞ্চয় এনে দিই, আমরা ধন এনে বলি, এই নাও। খ্যাতি এনে বলি, এই তুমি জমিয়ে রাখো। আমাদের পুরুষ সমস্ত জীবন প্রাণপণ পরিশ্রম করে কত দিক থেকে কত কী যে আনছে তার ঠিক নেই— স্ত্রীটিকে বলছে, এই নিয়ে তুমি ঘর ফাঁদো, বেশ গুছিয়ে ঘরকন্না করো, এই নিয়ে তুমি সুখে থাকো। আমাদের অন্তরের তপস্বিনী এখনো স্পষ্ট করে বলতে পারছে না যে, এ সবে আমার কোনো ফল হবে না, সে মনে করছে হয়তো আমি যা চাচ্ছি তা বুঝি এইই। কিন্তু তবু সব নিয়েও সব পেলুম বলে তার মন মানছে না। সে ভাবছে হয়তো পাওয়ার পরিমাণটা আরো বাড়াতে হবে— টাকা আরো চাই, খ্যাতি আরো দরকার, ক্ষমতা আরো না হলে চলছে না। কিন্তু সেই আরো-র শেষ হয় না। বস্তুত সে যে অমৃতই চায় এবং এই উপকরণগুলো যে অমৃত নয় এটা একদিন তাকে বুঝতেই হবে— একদিন এক মুহূর্তে সমস্ত জীবনের স্তূপাকার সঞ্চয়কে এক পাশে আবর্জনার মতো ঠেলে দিয়ে তাকে বলে উঠতেই হবে—যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্!

কিন্তু মৈত্রেয়ী ঐ যে বলেছিলেন, আমি যাতে অমৃতা না হব তা নিয়ে আমি কী করব, তার মানেটা কী। অমর হওয়ার মানে কি এই পার্থিব শরীরটাকে অনন্তকাল বহন করে চলা। অথবা মৃত্যুর পরেও কোনোরূপে জন্মান্তরে বা অবস্থান্তরে টিকে থাকা ? মৈত্রেয়ী যে শরীরের অমরতা চান নি এবং আত্মার

নিত্যতা সম্বন্ধেও তাঁর কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না, এ কথা নিশ্চিত। তবে তিনি কী ভাবে অমৃতা হতে চেয়েছিলেন।

তিনি এই কথা বলেছিলেন, সংসারে আমরা তো কেবলই একটার ভিতর দিয়ে আর একটাতে চলেছি— কিছুতেই তো স্থির হয়ে থাকতে পারছি নে। আমার মনের বিষয়গুলোও সরে যায়, আমার মনও সরে যায়। যাকে আমার চিত্ত অবলম্বন করে তাকে যখন ছাড়ি তখন তার সম্বন্ধে আমার মৃত্যু ঘটে। এমনি করে ক্রমাগত এক মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আর মৃত্যুতে চলেছি— এই যে মৃত্যুর পর্যায় এর আর অন্ত নেই।

অথচ আমার মন এমন কিছুকে চায় যার থেকে তাকে আর নড়তে হবে না— যেটা পেলে সে বলতে পারে, এ ছাড়া আমি আর বেশি চাই নে— যাকে পেলে আর ছাড়া-ছাড়ির কোনো কথাই উঠবে না। তা হলেই তো মৃত্যুর হাত একেবারে এড়ানো যায়। এমন কোন্ মানুষ এমন কোন্ উপকরণ আছে যাকে নিয়ে বলতে পারি, এই আমার চিরজীবনের সম্বল লাভ হয়ে গেল— আর কিছুই দরকার নেই!

সেইজন্যেই তো স্বামীর ত্যক্ত সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ঠেলে ফেলে দিয়ে মৈত্রেয়ী বলে উঠেছিলেন, এ-সব নিয়ে আমি কী করব। আমি যে অমৃতকে চাই।

আচ্ছা, বেশ, উপকরণ তো অমৃত নয়, তা হলে অমৃত কী! আমরা জানি, অমৃত কী। পৃথিবীতে একেবারে যে তার স্বাদ পাই নি, তা নয়। যদি না পেতুম তা হলে তার জন্যে আমাদের কান্না উঠত না। আমরা সংসারের সমস্ত বিষয়ের মধ্যে কেবলই তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, তার কারণ, ক্ষণে-ক্ষণে সে আমাদের স্পর্শ করে যায়।

মৃত্যুর মধ্যে এই অমৃতের স্পর্শ আমরা কোন্‌খানে পাই? যেখানে আমাদের প্রেম আছে। এই প্রেমেই আমরা অনন্তের স্বাদ পাই। প্রেমই সীমার মধ্যে অসীমতার ছায়া ফেলে পুরাতনকে নবীন করে রাখে, মৃত্যুকে কিছুতেই স্বীকার করে না। সংসারের বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে এই যে প্রেমের আভাস, দেখতে পেয়ে আমরা মৃত্যুর অতীত পরম পদার্থের পরিচয় পাই, তাঁর স্বরূপ যে প্রেমস্বরূপ তা বুঝতে পারি— এই প্রেমকেই যখন পরিপূর্ণরূপে পাবার জন্যে আমাদের অন্তরাত্মার সত্য আকাঙ্ক্ষা আবিষ্কার করি তখন আমরা সমস্ত উপকরণকে অনায়াসেই ঠেলে দিয়ে বলতে পারি, "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।"

এই যে বলা, এটি যখন রমণীর মুখের থেকে উঠেছে তখন কী স্পষ্ট, কী সত্য, কী মধুর হয়েই উঠেছে। সমস্ত চিন্তা সমস্ত যুক্তি পরিহার করে কী অনায়াসেই এটি ধ্বনিত হয়ে উঠছে। ওগো, আমি ঘর-দুয়ার কিছুই চাই নে। আমি প্রেম চাই— এ কী কান্না।

মৈত্রেয়ীর সেই সরল কান্নাটি যে প্রার্থনারূপ ধারণ করে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তেমন আশ্চর্য পরিপূর্ণ প্রার্থনা কি জগতে আর কোথাও কখনো শোনা গিয়েছে? সমস্ত মানবহৃদয়ের একান্ত প্রার্থনাটি এই রমণীর ব্যাকুলকণ্ঠে চিরন্তনকালের জন্যে বাণীলাভ করেছে। এই প্রার্থনাই আমাদের প্রত্যেকের একমাত্র প্রার্থনা, এবং এই প্রার্থনাই বিশ্বমানবের বিরাট ইতিহাসে যুগে যুগান্তরে উচ্চারিত হয়ে আসছে।

যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্— এই কথাটি সবেগে বলেই কি সেই ব্রহ্মবাদিনী তখনই জোড়হাতে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর অশ্রুপ্লাবিত মুখটি আকাশের দিকে তুলে বলে উঠলেন— অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়— আবিরাবীর্ম এধি— রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্?

উপনিষদে পুরুষের কণ্ঠে আমরা অনেক গভীর উপলব্ধির কথা পেয়েছি, কিন্তু কেবল স্ত্রীর কণ্ঠেই এই একটি গভীর প্রার্থনা লাভ করেছি। আমরা যথার্থ কী চাই অথচ কী নেই, তার একাগ্র অনুভূতি প্রেমকাতর রমণীহৃদয় থেকেই অতি সহজে প্রকাশ পেয়েছে। হে সত্য, সমস্ত অসত্য হতে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম উপবাসী হয়ে থাকে; হে জ্যোতি, গভীর অন্ধকার

হতে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম কারারুদ্ধ হয়ে থাকে ; হে অমৃত, নিরন্তর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম আসন্নরাত্রির পথিকের মতো নিরাশ্রয় হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। হে প্রকাশ, তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও, তা হলেই আমার সমস্ত প্রেম সার্থক হবে। আবিরাবীর্ম এধি— হে আবিঃ, হে প্রকাশ, তুমি তো চিরপ্রকাশ, কিন্তু তুমি একবার আমার হও, আমার হয়ে প্রকাশ পাও— আমাতে তোমার প্রকাশ পূর্ণ হোক। হে রুদ্র, হে ভয়ানক— তুমি যে পাপের অন্ধকারে বিরহরূপে দুঃসহ, রুদ্র যত্তে দক্ষিণংমুখং, তোমার যে প্রসন্নসুন্দর মুখ, তোমার যে প্রেমের মুখ, তাই আমাকে দেখাও— তেন মাং পাহি নিত্যম্— তাই দেখিয়ে আমাকে রক্ষা করো, আমাকে বাঁচাও, আমাকে নিত্যকালের মতো বাঁচাও— তোমার সেই প্রেমের প্রকাশ, সেই প্রসন্নতাই আমার অনন্তকালের পরিত্রাণ।

হে তপস্বিনী মৈত্রেয়ী, এসো, সংসারের উপকরণপীড়িতের হৃদয়ের মধ্যে তোমার পবিত্র চরণ দুটি আজ স্থাপন করো, তোমার সেই অমৃতের প্রার্থনাটি তোমার মৃত্যুহীন মধুর কণ্ঠে আমার হৃদয়ে উচ্চারণ করে যাও— নিত্যকাল যে কেমন করে রক্ষা পেতে হবে, আমার মনে তার যেন লেশমাত্র সন্দেহ না থাকে।

২ পৌষ ১৩১৫

২

বিকার-শঙ্কা

প্রেমের সাধনায় বিকারের আশঙ্কা আছে। প্রেমের একটা দিক আছে যেটা প্রধানত রসেরই দিক— সেইটের প্রলোভনে জড়িয়ে পড়লে কেবলমাত্র সেইখানেই ঠেকে যেতে হয়— তখন কেবল রসসম্ভোগকেই আমরা সাধনার চরম সিদ্ধি বলে জ্ঞান করি। তখন এই নেশায় আমাদের পেয়ে বসে। এই নেশাকেই দিনরাত্রি জাগিয়ে তুলে আমরা কর্মের কঠোরতা জ্ঞানের বিশুদ্ধতাকে ভুলে থাকতে চাই— কর্মকে বিস্মৃত হই, জ্ঞানকে অমান্য করি।

এমনি করে বস্তুত আমরা গাছকে কেটে ফেলে ফুলকে নেবার চেষ্টা করি ; ফুলের সৌন্দর্যে যতই মুগ্ধ হই না, গাছকে যদি তার সঙ্গে তুলনায় নিন্দিত ক'রে, তাকে কঠোর ব'লে, তাকে দুরারোহ ব'লে উৎপাটন ক'রে ফুলটি তুলে নেবার চেষ্টা করি তা হলে তখনকার মতো ফুলকে পাওয়া যায় কিন্তু চিরদিন সেই ফুল নূতন নূতন করে ফোটবার মূল আশ্রয়কেই নষ্ট করা হয়। এমনি করে ফুলটির প্রতিই একান্ত লক্ষ করে তার প্রতি অবিচার এবং অত্যাচারই করে থাকি।

কাব্যের থেকে আমরা ভাবের রস গ্রহণ করে পরিতৃপ্ত হই। কিন্তু সেই রসের সম্পূর্ণতা নির্ভর করে কিসের উপরে ? তার তিনটি আশ্রয় আছে। একটি হচ্ছে কাব্যের কলেবর— ছন্দ এবং ভাষা ; তা ছাড়া, ভাবকে যেটির পরে যেটিকে যেরূপে সাজালে তার প্রকাশটি সুন্দর হয় সেই বিন্যাসনৈপুণ্য। এই কলেবর-রচনার কাজ যেমন-তেমন করে চলে না— কঠিন নিয়ম রক্ষা করে চলতে হয়— তার একটু ব্যাঘাত হলেই যতিঃপতন ঘটে, কানকে পীড়িত করে, ভাবের প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। অতএব এই ছন্দ, ভাষা এবং ভাববিন্যাসে কবিকে নিয়মের বন্ধন স্বীকার করতেই হয়, এতে যথেচ্ছাচার খাটে না। তার পরে আর-একটা বড়ো আশ্রয় আছে, সেটা হচ্ছে জ্ঞানের আশ্রয়। সমস্ত শ্রেষ্ঠকাব্যের ভিতরে এমন একটা কিছু থাকে যাতে আমাদের জ্ঞান তৃপ্ত হয়, যাতে আমাদের মননবৃত্তিকেও উদ্‌বোধিত করে তোলে। কবি যদি অত্যন্তই খামখেয়ালি এমন একটা বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেন যাতে আমাদের জ্ঞানের কোনো খাদ্য না থাকে অথবা যাতে সত্যের বিকৃতিবশত মননশক্তিকে পীড়িত করে তোলে তবে সে-কাব্যে রসের প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়— সে-কাব্য স্থায়িভাবে ও গভীরভাবে আমাদের আনন্দ দিতে পারে না। তার তৃতীয় আশ্রয় এবং শেষ আশ্রয় হচ্ছে ভাবের আশ্রয়— এই

ভাবের সংস্পর্শে আমাদের হৃদয় আনন্দিত হয়ে ওঠে। অতএব শ্রেষ্ঠকাব্যে প্রথমে আমাদের কানের এবং কলাবোধের তৃপ্তি, তার পরে আমাদের বুদ্ধির তৃপ্তি ও তার পরে হৃদয়ের তৃপ্তি ঘটলে তবেই আমাদের সমগ্র প্রকৃতির তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের যে-রস তাই আমাদের স্থায়িরূপে প্রগাঢ়রূপে অন্তরকে অধিকার করে। নইলে, হয় রসের ক্ষীণতা ক্ষণিকতা, নয় রসের বিকার ঘটে।

চিনি মধু গুড়ের যখন বিকার ঘটে তখন সে গাঁজিয়ে ওঠে, তখন সে ম'দো হয়ে ওঠে, তখন সে আপনার পাত্রটিকে ফাটিয়ে ফেলে। মানসিক রসের বিকৃতিতেও আমাদের মধ্যে প্রমত্ততা আনে, তখন আর সে বন্ধন মানে না, অধৈর্য-অশান্তিতে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এই রসের উন্মত্ততায় আমাদের চিত্ত যখন উন্মথিত হতে থাকে তখন সেইটেকেই সিদ্ধি বলে জ্ঞান করি। কিন্তু নেশাকে কখনোই সিদ্ধি বলা চলে না, অসতীত্বকে প্রেম বলা চলে না, জ্বরবিকারের দুর্বার উত্তেজনাকে স্বাস্থ্যের বলপ্রকাশ বলা চলে না। মত্ততার মধ্যে যে একটা উগ্র প্রবলতা আছে সেটা বস্তুত লাভ নয়— সেটাতে নিজের স্বভাবের অন্য সবদিক থেকেই হরণ ক'রে কেবল একটিমাত্র দিককে অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত করে তোলা হয়। তাতে যে কেবল যে-সকল অংশের থেকে হরণ করা হয় তাদেরই ক্ষতি ও কৃশতা ঘটে তা নয়, যে অংশকে ফাঁপিয়ে মাতিয়ে তোলা হয় তারও ভালো হয় না। কারণ, স্বভাবের ভিন্ন ভিন্ন অংশ যখন সহজভাবে সক্রিয় থাকে তখনই প্রত্যেকটির যোগে প্রত্যেকটি সার্থক হয়ে থাকে— একটির থেকে আর-একটি যদি চুরি করে তবে যার চুরি যায় তারও ক্ষতি হয় এবং চোরও নষ্ট হতে থাকে।

তাই বলছিলুম, প্রেম যদি সত্য থেকে জ্ঞান থেকে চুরি করে মত্ত হয়ে বেড়ায়, তার সংযম ও ধৈর্য নষ্ট হয়, তার কল্পনাবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে, তবে সে নিজের প্রতিষ্ঠাকে নিজের হাতে নষ্ট করে— নিজেকে লক্ষ্মীছাড়া করে তোলে।

আমরা যে প্রেমের সাধনা করব সে সতী স্ত্রীর সাধনা। তাতে সতীর তিন লক্ষণই থাকবে— তাতে হ্রী থাকবে, ধী থাকবে এবং শ্রী থাকবে। তাতে সংযম থাকবে, সুবিবেচনা থাকবে এবং সৌন্দর্য থাকবে।[১] এই প্রেম সংসারের মধ্যে চলায় ফেরায়, কথায় বার্তায়, কাজে কর্মে, দেনায় পাওনায়, ছোটোয় বড়োয়, সুখে দুঃখে, ব্যাপ্তভাবে সুতরাং সংযতভাবে নির্মলভাবে মধুরভাবে প্রকাশ পেতে থাকবে। প্রেমের যে একটি স্বাভাবিক হ্রী আছে সেই লজ্জার আবরণটুকু থাকলেই তবে সে বৃহৎভাবে পরিব্যাপ্ত হতে পারে, নইলে কোনো একটা দিকেই সে জ্বলে উঠে হয়তো কর্মকে নষ্ট করে, জ্ঞানকে বিকৃত করে, সংসারকে আঘাত করে, নিজেকে একদমে খরচ করে ফেলে। হ্রী দ্বারাই সতী স্ত্রী আপনার প্রেমকে ধারণ করে, তাকে নানাদিকে বিকীর্ণ করে দেয়— এইরূপে সে-প্রেম কাউকে দগ্ধ করে না, সকলকে আলোকিত করে। আমাদের পৃথিবীর এই রকমের একটি আবরণ আছে— সেটি হচ্ছে বাতাসের আবরণ। এই আবরণটির দ্বারাই ধরণী সূর্যের আলোককে পরিমিত এবং ব্যাপকভাবে সর্বত্র বিকীর্ণ করে দেয়। এই আবরণটি না থাকলে রৌদ্র যেখানটিতে পড়ত সেখানটিতে দগ্ধ এবং রুদ্ররূপে উজ্জ্বল করত এবং ঠিক তার পাশেই যেখানে ছায়া সেখানে হিমশীতল মৃত্যু ও নিবিড়তম অন্ধকার বিরাজ করত। অসতীর যে প্রেমে হ্রী নেই, সংযম নেই, সে প্রেম নিজেকে পরিমিতভাবে সর্বত্র বিকীর্ণ করতে পারে না, সে প্রেম এক জায়গায় উগ্রজ্বালা এবং ঠিক তার পাশেই তেজোহীন আলোকবঞ্চিত ঔদাসীন্য বিস্তার করে।

আমাদেরও এই মানস-পুরীর সতীর প্রেমে ধী থাকবে, জ্ঞানের বিশুদ্ধতা থাকবে। এ প্রেম সংস্কারজালে জড়িত মূঢ় প্রেম নয়। পশুদের মতো একটা সংস্কারগত অন্ধ প্রেম নয়। এর দৃষ্টি জাগ্রত, এর চিত্ত উন্মুক্ত। কোনো কল্পনার দ্রব্য দিয়ে এ নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চায় না— এ যাকে চায় তার অবাধ পরিচয় চায়, তার সম্বন্ধে সে যে নিজের জ্ঞানকে অপমানিত করে রাখবে এ সে সহ্য করতে পারে না। এর মনে মনে কেবলই এই ভয় যে, পাছে পাবার একান্ত আগ্রহে একটা কোনো

১ স্ত্রীলোকের কোন্ গুণগুলি শ্রেষ্ঠ তাহার উত্তরে পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অগ্রজ মহাশয় কোনো একটি খাতায় লিখিয়াছিলেন— শ্রী, হ্রী ও ধী।

ভুলকে পেয়েই সে নিজেকে শান্ত করে রাখে। পাখি যেমন ডিমে তা দেবার জন্যেই ব্যাকুল, তাই সে একটা নুড়ি পেলেও তাতে তা দিতে বসে, তেমনি পাছে আমাদের প্রেম কোনোমতে কেবল আত্মসমর্পণ করতেই ব্যগ্র হয়, কাকে যে আত্মসমর্পণ করছে সেটার দিকে পাছে তার কোনো খেয়াল না থাকে এই আশঙ্কাটুকু যায় না— পতিকে দেখে নেবার জন্যে সন্ধ্যার অন্ধকারে নিজের প্রদীপটিকে যেন সে সাবধানে জ্বালিয়ে রাখতে চায়।

তার পরে আমাদের এই সতীর প্রেমে শ্রী থাকবে, সৌন্দর্যের আনন্দময়তা থাকবে। কিন্তু যদি হ্রীর অভাব ঘটে, যদি ধীর বিকার ঘটে, তবে এই শ্রীও নষ্ট হয়ে যায়।

সতী আত্মা যে প্রার্থনা উচ্চারণ করেছিলেন তার মধ্যে প্রেমের কোনো অঙ্গের অভাব ছিল না। তিনি যে অমৃত চেয়েছিলেন, তা পরিপূর্ণ প্রেম— তা কর্মহীন জ্ঞানহীন প্রমত্ত প্রেম নয়। তিনি বলেছিলেন, অসতো মা সদ্‌গময়— অসত্য হতে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও। তিনি বলেছিলেন, আমি যাঁকে চাই তিনি যে সত্য, নিজেকে সকল দিকে সত্যের নিয়মে সত্যের বন্ধনে না বাঁধলে তাঁর সঙ্গে যে আমার পরিণয়বন্ধন সমাপ্ত হবে না। বাক্যে চিন্তায় কর্মে সত্য হতে হবে, তা হলেই যিনি বিশ্বজগতে সত্য, যিনি বিশ্বসমাজে সত্য তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্মিলন সত্য হয়ে উঠবে, নইলে পদে পদে বাধতে থাকবে। এ সাধনা কঠিন সাধনা, এ পুণ্যের সাধনা, এ কর্মের সাধনা।

তার পরে তিনি বলেছিলেন, তমসো মা জ্যোতির্গময়। তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ— বিশ্বজগতের মধ্যে তিনি যেমন ধ্রুব সত্যরূপে আছেন, তেমনি সেই সত্যকে যে আমরা জানছি সেই জ্ঞান যে জ্ঞানস্বরূপেরই প্রকাশ। সেইজন্যই তো গায়ত্রী মন্ত্রে এক দিকে ভূলোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোকের মধ্যে তাঁর সত্য প্রত্যক্ষ করবার নির্দেশ আছে তেমনি অন্য দিকে আমাদের জ্ঞানের মধ্যে তাঁর জ্ঞানকে উপলব্ধি করবারও উপদেশ আছে— যিনি ধীকে প্রেরণ করছেন তাঁকে জ্ঞানের মধ্যে ধীস্বরূপ বলেই জানতে হবে। বিশ্বভুবনের মধ্যে সেই সত্যের সঙ্গে মিলতে হবে, জ্ঞানের মধ্যে সেই জ্ঞানের সঙ্গে মিলতে হবে। ধ্যানের দ্বারা যোগের দ্বারা এই মিলন।

তার পরের প্রার্থনা— মৃত্যোর্মামৃতং গময়। আমরা আমাদের প্রেমকে মৃত্যুর মধ্যে পীড়িত খণ্ডিত করছি ; তোমার অনন্ত প্রেম অখণ্ড আনন্দের মধ্যে তাকে সার্থক করো। আমাদের অন্তঃকরণের বহুবিভক্ত রসের উৎস, হে রসস্বরূপ, তোমার পরিপূর্ণ রসসমুদ্রে মিলিত হয়ে চরিতার্থ হোক। এমনি করে অন্তরাত্মা সত্যের সংযমে, জ্ঞানের আলোকে ও আনন্দের রসে পরিপূর্ণ হয়ে, প্রকাশই যাঁর স্বরূপ তাঁকে নিজের মধ্যে লাভ করুক, তা হলেই রুদ্রের যে প্রেমমুখ তাই আমাদের চিরন্তন কাল রক্ষা করবে।

৩ পৌষ

দেখা

এই তো দিনের পর দিন, আলোকের পর আলোক আসছে। কতকাল থেকেই আসছে, প্রত্যহই আসছে। এই আলোকের দূতটি পুষ্পকুঞ্জে প্রতিদিন প্রাতেই একটি আশা বহন করে আনছে ; যে কুঁড়িগুলির ঈষৎ একটু উদ্‌গম হয়েছে মাত্র, তাদের বলছে, তোমরা আজ জান না কিন্তু তোমরাও তোমাদের সমস্ত দলগুলি একেবারে মেলে দিয়ে সুগন্ধে সৌন্দর্যে একেবারে বিকশিত হয়ে উঠবে। এই আলোকের দূতটি শস্যক্ষেত্রের উপরে তার জ্যোতির্ময় আশীর্বাদ স্থাপন করে প্রতিদিন এই কথাটি বলছে, "তোমরা মনে করছ, আজ যে বায়ুতে হিল্লোলিত হয়ে তোমরা শ্যামল মাধুর্যে চারি দিকের চক্ষু জুড়িয়ে দিয়েছ এতেই বুঝি তোমাদের সব হয়ে গেল, কিন্তু তা নয় ; একদিন তোমাদের জীবনের মাঝখানটি হতে একটি শিষ উঠে একেবারে স্তরে স্তরে ফসলে ভরে যাবে।" যে ফুল ফোটে নি আলোক প্রতিদিন সেই ফুলের প্রতীক্ষা নিয়ে আসছে— যে ফসল ধরে নি, আলোকের বাণী সেই

ফসলের নিশ্চিত আশ্বাসে পরিপূর্ণ। এই জ্যোতির্ময় আশা প্রতিদিনই পুষ্পকুঞ্জকে এবং শস্যক্ষেত্রকে দেখা দিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এই প্রতিদিনের আলোক, এ তো কেবল ফুলের বনে এবং শস্যের খেতে আসছে না। এ যে রোজই সকালে আমাদের ঘুমের পর্দা খুলে দিচ্ছে। আমাদেরই কাছে এর কি কোনো কথা নেই। আমাদের কাছেও এই আলো কি প্রত্যহ এমন কোনো আশা আনছে না, যে আশার সফল মূর্তি হয়তো কুঁড়িটুকুর মতো নিতান্ত অন্ধভাবে আমাদের ভিতরে রয়েছে, যার শিষটি এখনো আমাদের জীবনের কেন্দ্রস্থল থেকে ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে মাথা তোলে নি?

আলো কেবল একটিমাত্র কথা প্রতিদিন আমাদের বলছে— "দেখো।" বাস্। "একবার চেয়ে দেখো।" আর কিছুই না।

আমরা চোখ মেলি, আমরা দেখি। কিন্তু সেই দেখাটুকু দেখার একটু কুঁড়িমাত্র, এখনো তা অন্ধ। সেই দেখায় দেখার সমস্ত ফসল ধরবার মতো স্বর্গাভিগামী শিষটি এখনো ধরে নি। বিকশিত দেখা এখনো হয় নি, ভরপুর দেখা এখনো দেখি নি।

কিন্তু তবু রোজ সকালবেলায় বহুযোজন দূর থেকে আলো এসে বলছে— দেখো। সেই যে একই মন্ত্র রোজই আমাদের কানে উচ্চারণ করে যাচ্ছে তার মধ্যে একটি অশ্রান্ত আশ্বাস প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে— আমাদের এই দেখার ভিতরে এমন একটি দেখার অঙ্কুর রয়েছে যার পূর্ণ পরিণতির উপলব্ধি এখনো আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়ে ওঠে নি।

কিন্তু এ কথা মনে কোরো না, আমার এই কথাগুলি অলংকারমাত্র। মনে কোরো না, আমি রূপকে কথা কচ্ছি। আমি জ্ঞানের কথা ধ্যানের কথা কিছু বলছি নে, আমি নিতান্তই সরলভাবে চোখে দেখার কথাই বলছি।

আলোক যে-দেখাটা দেখায় সে তো ছোটোখাটো কিছুই নয়। শুধু আমাদের নিজের শয্যাটুকু, শুধু ঘরটুকু তো দেখায় না— দিগন্তবিস্তৃত আকাশমণ্ডলের নীলোজ্জ্বল থালাটির মধ্যে যে সামগ্রী সাজিয়ে সে আমাদের সম্মুখে ধরে, সে কী অদ্ভুত জিনিস। তার মধ্যে বিস্ময়ের যে অন্ত পাওয়া যায় না। আমাদের প্রতিদিনের যেটুকু দরকার তার চেয়ে সে যে কতই বেশি।

এই যে বৃহৎ ব্যাপারটা আমরা রোজ দেখছি, এই দেখাটা কি নিতান্তই একটা বাহুল্য ব্যাপার। এ কি নিতান্ত অকারণে মুক্তহস্ত ধনীর অপব্যয়ের মতো আমাদের চার দিকে কেবল নষ্ট হবার জন্যেই হয়েছে। এতবড়ো দৃশ্যের মাঝখানে থেকে আমরা কিছু টাকা জমিয়ে, কিছু খ্যাতি নিয়ে কিছু ক্ষমতা ফলিয়েই যেমনি একদিন চোখ বুজব, অমনি এমন বিরাটজগতে চোখ মেলে চাবার আশ্চর্য সুযোগ একেবারে চূড়ান্ত হয়ে শেষ হয়ে যাবে! এই পৃথিবীতে যে আমরা প্রতিদিন চোখ মেলে চেয়েছিলুম এবং আলোক এই চোখকে প্রতিদিনই অভিষিক্ত করেছিল, তার কি পুরা হিসাব ঐ টাকা এবং খ্যাতি এবং ভোগের মধ্যে পাওয়া যায়?

না, তা পাওয়া যায় না। তাই আমি বলছি এই আলোক অন্ধ কুঁড়িটির কাছে প্রত্যহই যেমন একটি অভাবনীয় বিকাশের কথা বলে যাচ্ছে, আমাদের দেখাকেও সে তেমনি করেই আশা দিয়ে যাচ্ছে যে, একটি চরম দেখা, একটি পরম দেখা আছে সেটি তোমার মধ্যেই আছে। সেইটি একদিন ফুটে উঠবে বলেই রোজ আমি তোমার কাছে আনাগোনা করছি।

তুমি কি ভাবছ, চোখ বুজে ধ্যানযোগে দেখবার কথা আমি বলছি? আমি এই চর্মচক্ষে দেখার কথাই বলছি। চর্মচক্ষুকে চর্মচক্ষু বলে গাল দিলে চলবে কেন? একে শারীরিক বলে তুমি ঘৃণা করবে এতবড়ো লোকটি তুমি কে? আমি বলছি, এই চোখ দিয়েই, এই চর্মচক্ষু দিয়েই এমন দেখা দেখবার আছে যা চরম দেখা— তাই যদি না থাকত তবে আলোক বৃথা আমাদের জাগ্রত করছে, তবে এতবড়ো এই গ্রহতারা-চন্দ্র-সূর্যখচিত প্রাণে সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ বিশ্বজগৎ বৃথা আমাদের চারি দিকে অহোরাত্র নানা আকারে আত্মপ্রকাশ করছে। এই জগতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার চরম সফলতা কি বিজ্ঞান? সূর্যের চার দিকে পৃথিবী ঘুরছে— নক্ষত্রগুলি এক-একটি সূর্যমণ্ডল, এই কথাগুলি আমরা জানব বলেই

এতবড়ো জগতের সামনে আমাদের এই দুটি চোখের পাতা খুলে গেছে ? এ জেনেই বা কী হবে।

জেনে হয়তো অনেক লাভ হতে পারে, কিন্তু জানার লাভ সে তো জানারই লাভ ; তাতে জ্ঞানের তহবিল পূর্ণ হচ্ছে— তা হোক। কিন্তু আমি যে বলছি চোখের দেখার কথা। আমি বলছি, এই চোখেই আমরা যা দেখতে পাব তা এখনো পাই নি। আমাদের সামনে আমাদের চার দিকে যা আছে তার কোনোটাকেই আমরা দেখতে পাই নি— ঐ তৃণটিকেও না। আমাদের মনই আমাদের চোখকে চেপে রয়েছে— সে যে কত মাথামুণ্ড ভাবনা নিয়ে আছে তার ঠিকানা নেই— সেই অশনবসনের ভাবনা নিয়ে সে আমাদের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে রেখেছে— সে কত লোকের মুখ থেকে কত সংস্কার নিয়ে জমা করেছে— তার যে কত বাঁধা শব্দ আছে, কত বাঁধা মত আছে তার সীমা নেই, সে কাকে যে বলে শরীর কাকে যে বলে আত্মা, কাকে যে বলে হেয় কাকে যে বলে শ্রেয়, কাকে যে বলে সীমা কাকে যে বলে অসীম তার ঠিকানা নেই— এই সমস্ত সংস্কারের দ্বারা চাপা দেওয়াতে আমাদের দৃষ্টি নির্মল নির্মুক্ত ভাবে জগতের সংস্রব লাভ করতেই পারে না।

আলোক তাই প্রত্যহই আমাদের চক্ষুকে নিদ্রালসতা থেকে ধৌত করে দিয়ে বলছে, তুমি স্পষ্ট করে দেখো, তুমি নির্মল হয়ে দেখো, পদ্ম যে-রকম সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে সূর্যকে দেখে তেমনি করে দেখো। কাকে দেখবে। তাঁকে, যাঁকে ধ্যানে দেখা যায় ? না, তাঁকে না, যাঁকে চোখে দেখা যায় তাঁকেই। সেই রূপের নিকেতনকে, যাঁর থেকে গণনাতীত রূপের ধারা অনন্ত কাল থেকে ঝরে পড়ছে। চারি দিকেই রূপ— কেবলই এক রূপ থেকে আর-এক রূপের খেলা ; কোথাও তার আর শেষ পাওয়া যায় না— দেখেও পাই নে, ভেবেও পাই নে। রূপের ঝরনা দিকে দিকে থেকে কেবলই প্রবাহিত হয়ে সেই অনন্তরূপসাগরে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। সেই অপরূপ অনন্তরূপকে তাঁর রূপের লীলার মধ্যেই যখন দেখব তখন পৃথিবীর আলোকে একদিন আমাদের চোখ মেলা সার্থক হবে, আমাদের প্রতিদিনকার আলোকের অভিষেক চরিতার্থ হবে। আজ যা দেখছি, এই যে চারি দিকে আমার যে-কেউ আছে, যা-কিছু আছে, এদের একদিন যে কেমন ক'রে, কী পরিপূর্ণ চৈতন্যযোগে দেখব তা আজ মনে কবতে পারি নে— কিন্তু এটুকু জানি, আমাদের এই চোখের দেখার সামনে সমস্ত জগৎকে সাজিয়ে আলোক আমাদের কাছে যে আশার বার্তা আনছে, তা এখনো কিছুই সম্পূর্ণ হয় নি। এই গাছের রূপটি যে তার আনন্দরূপ, সে-দেখা এখনো আমাদের দেখা হয় নি— মানুষের মুখে যে তাঁর অমৃতরূপ, সে-দেখার এখনো অনেক বাকি— "আনন্দরূপমমৃতং" এই কথাটি যেদিন আমার এই দুই চক্ষু বলবে সেইদিনই তারা সার্থক হবে। সেইদিনই তাঁর সেই পরমসুন্দর প্রসন্নমুখ, তাঁর দক্ষিণং মুখং একেবারে আকাশে তাকিয়ে দেখতে পাব। তখনই সর্বত্রই নমস্কারে আমাদের মাথা নত হয়ে পড়বে— তখন ওষধি-বনস্পতির কাছেও আমাদের স্পর্ধা থাকবে না— তখন আমরা সত্য করে বলতে পারব, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ, য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

৪ পৌষ

শোনা

কাল সন্ধ্যা থেকে এই গানটি কেবলই আমার মনের মধ্যে ঝংকৃত হচ্ছে— "বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে।" আমি কোনোমতেই ভুলতে পারছি নে—

বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে।
অমল কমল-মাঝে, জ্যোৎস্না রজনী-মাঝে,
কাজল ঘন-মাঝে, নিশি-আঁধার-মাঝে,
কুসুমসুরভি-মাঝে বীণ-রণন শুনি যে—
প্রেমে প্রেমে বাজে।

কাল রাত্রে ছাদে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রলোকের দিকে চেয়ে আমার মন সম্পূর্ণ স্বীকার করেছে, "বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে।" এ কবিকথা নয়, এ বাক্যালংকার নয়— আকাশ এবং কালকে পরিপূর্ণ করে অহোরাত্র সংগীত বেজে উঠছে।

বাতাসে যখন ঢেউয়ের সঙ্গে ঢেউ সুন্দর করে খেলিয়ে ওঠে তখন তাদের সেই আশ্চর্য মিলন এবং সৌন্দর্যকে আমাদের চোখ দেখতে পায় না, আমাদের কানের মধ্যে সেই লীলা গান হয়ে প্রকাশ পায়। আবার আকাশের মধ্যে যখন আলোর ঢেউ ধারায় ধারায় বিচিত্র তালে নৃত্য করতে থাকে তখন সেই অপরূপ লীলার কোনো খবর আমাদের কান পায় না, চোখের মধ্যে সেইটে রূপ হয়ে দেখা দেয়। যদি এই মহাকাশের লীলাকেও আমরা কানের সিংহদ্বার দিয়ে অভ্যর্থনা করতে পারতুম তা হলে বিশ্ববীণার এই ঝংকারকে আমরা গান বলেও চিনতে পারতুম।

এই প্রকাণ্ড বিপুল বিশ্ব-গানের বন্যা যখন সমস্ত আকাশ ছাপিয়ে আমাদের চিত্তের অভিমুখে ছুটে আসে তখন তাকে এক পথ দিয়ে গ্রহণ করতেই পারি নে, নানা দ্বার খুলে দিতে হয় চোখ দিয়ে, কান দিয়ে, নাক দিয়ে, স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে, নানা দিক দিয়ে তাকে নানারকম করে নিই। এই একতান মহাসংগীতকে আমরা দেখি, শুনি, ছুঁই, শুঁকি, আস্বাদন করি।

এই বিশ্বের অনেকখানিকেই যদিও আমরা চোখে দেখি, কানে শুনি নে, তবুও বহুকাল থেকে অনেক কবি এই বিশ্বকে গানই বলেছেন। গ্রীসের ভাবুকেরা আকাশে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতায়াতকে নক্ষত্রলোকের গান বলেই বর্ণনা করেছেন। কবিরা বিশ্বভুবনের রূপবিন্যাসের সঙ্গে চিত্রকলার উপমা অতি অল্পই দিয়েছেন তার একটা কারণ, বিশ্বের মধ্যে নিয়ত একটা গতির চাঞ্চল্য আছে। কিন্তু শুধু তাই নয়— এর মধ্যে গভীরতর একটা কারণ আছে।

ছবি যে আঁকে তার পট চাই, তুলি চাই, রঙ চাই, তার বাইরের আয়োজন অনেক। তার পরে সে যখন আঁকতে থাকে তখন তার আরম্ভের রেখাতে সমস্ত ছবির আনন্দ দেখা যায় না— অনেক রেখা এবং অনেক বর্ণ মিললে পর তবেই পরিণামের আভাস পাওয়া যায়। তার পরে আঁকা হয়ে গেলে, চিত্রকর চলে গেলেও সে ছবি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে— চিত্রকরের সঙ্গে তার আর কোনো একান্ত সম্বন্ধ থাকে না।

কিন্তু যে গান করে গানের সমস্ত আয়োজন তার নিজেরই মধ্যে— আনন্দ যার, সুর তারই, কথাও তার— কোনোটাই বাইরের নয়। হৃদয় যেন একেবারে অব্যবহিতভাবে নিজেকে প্রকাশ করে, কোনো উপকরণের ব্যবধানও তার নেই। এইজন্যে গান যদিচ একটা সম্পূর্ণতার অপেক্ষা রাখে, তবু তার প্রত্যেক অসম্পূর্ণ সুরটিও হৃদয়কে যেন প্রকাশ করতে থাকে। হৃদয়ের এই প্রকাশে শুধু যে উপকরণের ব্যবধান নেই, তা নয়— কথা জিনিসটাও একটা ব্যবধান— কেননা ভেবে তার অর্থ বুঝতে হয়— গানে সেই অর্থ বোঝবারও প্রয়োজন নেই— কোনো অর্থ না থাকলেও কেবলমাত্র সুরেই যা বলবার তা অনির্বচনীয় রকম করে বলে। তার পরে আবার গানের সঙ্গে গায়কের এক মুহূর্তও বিচ্ছেদ নেই— গান ফেলে রেখে গায়ক চলে গেলে, গানও তার সঙ্গে সঙ্গেই চলে যায়। গায়কের প্রাণের সঙ্গে শক্তির সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে গানের সুর একেবারে চিরমিলিত হয়েই প্রকাশ পায়। যেখানে গান সেখানেই গায়ক, এর আর কোনো ব্যত্যয় নেই।

এই বিশ্বসংগীতটিও তার গায়ক থেকে এক মুহূর্তও ছাড়া নেই। তাঁর বাইরের উপকরণ থেকেও এ গড়া নয়। একেবারে তাঁরই চিত্ত তাঁরই নিশ্বাসে তাঁরই আনন্দ রূপ ধরে উঠছে। এ গান একেবারে সম্পূর্ণ হয়ে তাঁর অন্তরে রয়েছে, অথচ ক্রমাভিব্যক্তরূপে প্রকাশ পাচ্ছে, কিন্তু এর প্রত্যেক সুরই সেই সম্পূর্ণ গানের আবির্ভাব। এক সুরকে আর এক সুরের সঙ্গে আনন্দে সংযুক্ত করে চলেছে। এই বিশ্বগানের যখন কোনো বচনগম্য অর্থও না পাই তখনো আমাদের চিত্তের কাছে এর প্রকাশ কোনো বাধা পায় না। এ যে চিত্তের কাছে চিত্তের অব্যবহিত প্রকাশ।

গায়ত্রীমন্ত্রে তাই তো শুনতে পাই, সেই বিশ্বসবিতার ভর্গ তাঁর তেজ তাঁর শক্তি ভূর্ভুবঃ স্বঃ হয়ে কেবলই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে এবং তাঁরই সেই এক শক্তি কেবলই ধীরূপে আমাদের অন্তরে বিকীর্ণ

হচ্ছে। কেবলই উঠছে, কেবলই আসছে সুরের পর সুর, সুরের পর সুর।

কাল কৃষ্ণএকাদশীর নিভৃত রাত্রের নিবিড় অন্ধকারকে পূর্ণ করে সেই বীনকার তাঁর রম্য বীণা বাজাচ্ছিলেন ; জগতের প্রান্তে আমি একলা দাঁড়িয়ে শুনছিলুম ; সেই ঝংকারে অনন্ত আকাশের সমস্ত নক্ষত্রলোক ঝংকৃত হয়ে অপূর্ব নিঃশব্দ সংগীতে গাঁথা পড়ছিল। তার পরে যখন শুতে গেলুম তখন এই কথাটি মনে নিয়ে নিদ্রিত হলুম যে, আমি যখন সুপ্তিতে অচেতন থাকব তখনো সেই জাগ্রত বীনকারের নিশীথ রাত্রের বীণা বন্ধ হবে না— তখনো তাঁর যে ঝংকারের তালে নক্ষত্রমণ্ডলীর নৃত্য চলছে সেই তালে তালেই আমার নিদ্রানিভৃত দেহ-নাট্যশালায় প্রাণের নৃত্য চলতে থাকবে, আমার হৃৎপিণ্ডের নৃত্য থামবে না, সর্বাঙ্গে রক্ত নাচবে এবং লক্ষ লক্ষ জীবকোষ আমার সমস্ত শরীরে সেই জ্যোতিষ্কসভার সংগীতচ্ছন্দেই স্পন্দিত হতে থাকবে।

"বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে!" আবার আমাদের ওস্তাদজি আমাদের হাতেও একটি করে ছোটো বীণা দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছে আমরাও তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাজাতে শিখি। তাঁর সভায় তাঁরই সঙ্গে বসে আমরা একটু একটু সংগত করব, এই তাঁর স্নেহের অভিপ্রায়। জীবনের বীণাটি ছোটো কিন্তু এতে কত তারই চড়িয়েছেন। সব তারগুলি সুর মিলিয়ে বাঁধা কি কম কথা! এটা হয় তো ওটা হয় না, মন যদি হল তো আবার শরীর বাদী হয়— একদিন যদি হল তো আবার আর-একদিন তার নেবে যায়। কিন্তু ছাড়লে চলবে না। একদিন তাঁর মুখ থেকে এ কথাটি শুনতে হবে— বাহবা, পুত্র, বেশ! এই জীবনের বীণাটি একদিন তাঁর পায়ের কাছে গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া তার সব রাগিণীটি বাজিয়ে তুলবে। এখন কেবল এই কথাটি মনে রাখতে হবে যে, সব তারগুলি বেশ এঁটে বাঁধা চাই— ঢিল দিলেই ঝনঝন্ খনখন করে। যেমন এঁটে বাঁধতে হবে তেমনি তাকে মুক্তও রাখতে হবে— তার উপরে কিছু চাপা পড়লে সে আর বাজতে চায় না। নির্মল সুরটুকু যদি চাও তবে দেখো, তারে যেন ধুলো না পড়ে— মরচে না পড়ে— আর প্রতিদিন তাঁর পদপ্রান্তে বসে প্রার্থনা কোরো— হে আমার গুরু, তুমি আমাকে বেসুর থেকে সুরে নিয়ে যাও।

৫ পৌষ

হিসাব

রোজ কেবল লাভের কথাটাই শোনাতে ইচ্ছে হয়। হিসাবের কথাটা পাড়তে মন যায় না। ইচ্ছে করে, কেবল রসের কথাটা নিয়েই নাড়াচাড়া করি, যে-পাত্রের মধ্যে সেই রস থাকে সেটাকে বড়ো কঠিন বলে মনে হয়।

কিন্তু অমৃতের নীচের তলায় সত্য বসে রয়েছেন, তাঁকে একেবারে বাদ দিয়ে সেই আনন্দলোকে যাবার জো নেই।

সত্য হচ্ছেন নিয়মস্বরূপ। তাঁকে মানতে হলেই তাঁর সমস্ত বাঁধন মানতেই হয়। যা কিছু সত্য অর্থাৎ যা কিছু আছে এবং থাকে, তা কোনোমতেই বন্ধনহীন হতে পারে না— তা কোনো নিয়মে আছে বলেই আছে। যে-সত্যের কোনো নিয়ম নেই, বন্ধন নেই, সে তো স্বপ্ন, সে তো খেয়াল— সে তো স্বপ্নের চেয়েও মিথ্যা, খেয়ালের চেয়েও শূন্য।

যিনি পূর্ণ সত্যস্বরূপ তিনি অন্যের নিয়মে বদ্ধ হন না, তাঁর নিজের নিয়ম নিজেরই মধ্যে। তা যদি না থাকে, তিনি আপনাকে যদি আপনি বেঁধে না থাকেন, তবে তাঁর থেকে কিছুই হতে পারে না, কিছুই রক্ষা পেতে পারে না। তবে উন্মত্ততার তাণ্ডবনৃত্যে কোনো কিছুর কিছুই ঠিকানা থাকত না।

কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, সত্যের রূপই হচ্ছে নিয়ম— একেবারে অব্যর্থ নিয়ম— তার কোনো প্রান্তেও লেশমাত্র ব্যত্যয় নেই। এইজন্যেই এই সত্যের বন্ধনে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিধৃত হয়ে আছে,

এইজন্যই সত্যের সঙ্গে আমাদের বুদ্ধির যোগ আছে এবং তার প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর আছে।

গাছের যেমন গোড়াতেই দরকার শিকড় দিয়ে ভূমিকে আঁকড়ে ধরা, আমাদেরও তেমনি গোড়ার প্রয়োজন হচ্ছে স্থূল সূক্ষ্ম অসংখ্য শিকড় দিয়ে সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠা লাভ করা।

আমরা ইচ্ছা করি না করি, এ সাধনা আমাদের করতেই হয়। শিশু বলে, আমি পা ফেলে চলব; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত বহু সাধনায় সে চলার নিয়মটিকে পালন করে ভারাকর্ষণের সঙ্গে আপস করতে না পারে ততক্ষণ তার আর উপায় নেই— শুধু বললেই হবে না, আমি চলব।

এই চলবার নিয়মকে শিশু যখনই গ্রহণ করে এ-নিয়ম আর তখন তাকে পীড়া দেয় না। শুধু যে পীড়া দেয় না, তা নয়; তাকে আনন্দ দেয়; সত্য-নিয়মের বন্ধনকে স্বীকার করবামাত্রই শিশু নিজের গতিশক্তিকে লাভ করে আহ্লাদিত হয়।

এমনি করে ক্রমে ক্রমে যখন সে জলের সত্য, মাটির সত্য, আগুনের সত্যকে সম্পূর্ণ মানতে শেখে তখন যে কেবল তার কতকগুলি অসুবিধা দূর হয় তা নয়, জল মাটি আগুন সম্বন্ধে তার শক্তি সফল হয়ে উঠে তাকে আনন্দ দেয়।

শুধু বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নয়, সমাজের সঙ্গেও শিশুকে সত্যসম্বন্ধে যুক্ত হয়ে ওঠবার জন্যে বিস্তর সাধনা করতে হয়, তাকে বিস্তর নিয়ম স্বীকার করতে হয়— তাকে অনেকরকম আবদার থামাতে হয়, অনেক রাগ কমাতে হয়— নিজেকে অনেকরকম করে বাঁধতে হয় এবং অনেকের সঙ্গে বাঁধতে হয়। যখন এই বন্ধনগুলি মানা তার পক্ষে সহজ হয় তখন সমাজের মধ্যে বাস করা তার পক্ষে আনন্দের হয়ে ওঠে— তখনই তার সামাজিক শক্তি সেই-সকল বিচিত্র নিয়মবন্ধনের সাহায্যেই বাধামুক্ত হয়ে স্ফূর্তিলাভ করে।

এমনি করে অধিকাংশ মানুষই যখন বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এবং সমাজের মধ্যে মোটামুটি রকমে চলনসই হয়ে ওঠে তখনই তারা নিশ্চিন্ত হয়, এবং নিজেকে অনিন্দনীয় মনে করে খুশি হয়।

কিন্তু এমন টাকা আছে যা গাঁয়ে চলে কিন্তু শহরে চলে না, শহরের বাজে দোকানে চলে যায় কিন্তু ব্যাঙ্কে চলে না। ব্যাঙ্কে তাকে ভাঙাতে গেলেই সেখানে যে পোদ্দারটি আছে সে একেবারে স্পর্শমাত্রেই তাকে তৎক্ষণাৎ মেকি বলে বাতিল করে দেয়।

আমাদেরও সেই দশা— আমরা ঘরের মধ্যে, গাঁয়ের মধ্যে, সমাজের মধ্যে নিজেকে চলনসই করে রেখেছি কিন্তু বড়ো ব্যাঙ্কে যখন দাঁড়াই তখনই পোদ্দারের কাছে এক মুহূর্তে আমাদের সমস্ত খাদ ধরা পড়ে যায়।

সেখানে যদি চলতি হতে চাই তবে সত্য হতে হবে, আরো সত্য হতে হবে। আরো অনেক বাঁধনে নিজেকে বাঁধতে হবে, আরো অনেক দায় মানতে হবে। সেই অমৃতের বাজারে এতটুকু মেকিও চলে না— একেবারে খাঁটি সত্য না হলে অমৃত কেনবার আশা করাও যায় না।

তাই বলছিলুম কেবল অমৃতরসের কথা তো বললেই হবে না, তার হিসাবটাও দেখতে হবে।

আমরা নিজের হিসাব যখন মেলাতে বসি তখন দু-চার টাকার গরমিল হলেও বলি ওতে কিছু আসে যায় না। এমনি করে রোজই গরমিলের অংশ কেবলই জমে উঠছে। প্রকৃতির সঙ্গে এবং মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে প্রত্যহই ছোটোবড়ো কত অসত্য কত অন্যায়ই চালিয়ে দিচ্ছি সে-সম্বন্ধে যদি কথা ওঠে তো বলে বসি, অমন তো আক্‌সার হয়েই থাকে, অমন তো কত লোকেই করে— ওতে করে এমন ঘটে না যে আমি ভদ্রসমাজের বার হয়ে যাই।

ঘ'রো হিসাবের খাতায় এইরকম শৈথিল্য ঘটে কিন্তু যারা জাতিতে সাধু, যারা মহাজন, তারা লাখটাকার কারবারে এক পয়সার হিসাবটি না মিললে সমস্ত রাত্রি ঘুমোতে পারে না। যারা মস্ত লাভের দিকে তাকিয়ে আছে তারা ছোট্ট গরমিলকেও ডরায়— তারা হিসাবকে একেবারে নিখুঁত সত্য না করে বাঁচে না।

তাই বলছিলুম, সেই যে পরম রস, প্রেমরস— তার মহাজন যদি হতে চাই তবে হিসাবের খাতাকে নীরস বলে একটু ফাঁকি দিলেও চলবে না। যিনি অমৃতের ভাণ্ডারী তাঁর কাছে বেহিসাবি আবদার

একেবারেই খাটবে না। তিনি যে মস্ত হিসাবি— এই প্রকাণ্ড জগদ্‌ব্যাপারে কোথাও হিসাবের গোল হয় না— তাঁর কাছে কোন্‌ লজ্জায় গিয়ে বলব, আমি আর কিছু জানি নে, আর কিছু মানি নে, আমাকে কেবল প্রেম দাও, আমাকে প্রেমে মাতাল করে তোলো।

আত্মা যেদিন অমৃতের জন্যে কেঁদে ওঠে তখন সর্বপ্রথমেই বলে— অসতো মা সদ্‌গময়— আমার জীবনকে আমার চিত্তকে সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল অসত্য হতে সত্যে বেঁধে ফেলো। অমৃতের কথা তার পরে!

আমাদেরও প্রতিদিন সেই প্রার্থনাই করতে হবে, বলতে হবে, অসতো মা সদ্‌গময়— বন্ধনহীন অসংযত অসত্যের মধ্যে আমাদের মন হাজার টুকরো করে ছড়িয়ে ফেলতে দিয়ো না— তাকে অটুট সত্যের সূত্রে সম্পূর্ণ করে বেঁধে ফেলো— তার পরে সে হার তোমার গলায় যদি পরাতে চাই তবে আমাকে লজ্জা পেতে হবে না।

৬ পৌষ

শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের উৎসব

উৎসব তো আমরা রচনা করতে পারি নে, যদি সুযোগ হয় তবে উৎসব আমরা আবিষ্কার করতে পারি।

সত্য যেখানেই সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায় সেইখানেই উৎসব। সে প্রকাশ কবেই বা বন্ধ আছে। পাখি তো রোজই ভোর রাত্রি থেকেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে তার সকালবেলাকার গীতোৎসবের নিত্য নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার জন্যে। আর প্রভাতের আনন্দসভাটিকে সাজিয়ে তোলবার জন্য একটি অন্ধকার পুরুষ সমস্ত রাত্রি কত যে গোপন আয়োজন করে তার কি সীমা আছে। শুতে যাবার আগে একবার যদি কেবল তাকিয়ে দেখি, তবে দেখতে পাই নে কি জগতের নিত্য উৎসবের মহাবিজ্ঞাপন সমস্ত আকাশ জুড়ে কে টাঙিয়ে দিয়েছে।

এর মধ্যে আমাদের উৎসবটা কবে? যেদিন আমরা সময় করতে পারি সেই দিন। যেদিন হঠাৎ হুঁশ হয় যে আমাদের নিমন্ত্রণ আছে এবং সে নিমন্ত্রণ প্রতিদিন মারা যাচ্ছে। যেদিন স্নান করে সাজ করে ঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি।

সেই দিন উৎসবের সকালে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলি— বাঃ আজ আলোটি কী মধুর, কী পবিত্র। আরে মূঢ়, এ আলো কবে মধুর ছিল না, কবে পবিত্র ছিল না। তুমি একটা বিশেষ দিনের গায়ে একটা বিশেষ চিহ্ন কেটে দিয়েছ বলেই কি আকাশের আলো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলেছে।

আর কিছু নয়— আজকে নিমন্ত্রণরক্ষা করতে এসেছি অন্যদিন করি নি, এইমাত্র তফাত। আয়োজনটা এমনিই প্রতিদিনই ছিল, প্রতিদিনই আছে। জগৎ যে আনন্দরূপ, এইটে আজ দেখব বলে কাজকর্ম ফেলে এসেছি। শুধু তাই নয়, আমিও নিজের আনন্দময় স্বরূপটিকেই ছুটি দিয়েছি; আজ বলেছি, থাক্‌ আজ দেনাপাওনার টানাটানি, ঘুচুক আজ আত্মপরের ভেদ, মরুক আজ সমস্ত কার্পণ্য, বাহির হোক আজ যত ঐশ্বর্য আছে। যে আনন্দ জলে স্থলে আকাশে সর্বত্র বিরাজমান সেই আনন্দকে আজ আমার আনন্দনিকেতনের মধ্যে দেখব। যে উৎসব নিখিলের উৎসব সেই উৎসবকে আজ আমার উৎসব করে তুলব।

বিশ্বের একটা মহল তো নয়। তার নানা মহলে নানারকম উৎসবের ব্যবস্থা হয়ে আছে। সজনে নির্জনে নানাক্ষেত্রে উৎসবের নানা ভিন্ন ভাব, আনন্দের নানা ভিন্ন মূর্তি। নীলাকাশতলে প্রসারিত প্রান্তরের মাঝখানে এই ছায়াস্নিগ্ধ নিভৃত আশ্রমের যে প্রাত্যহিক উৎসব, আমরা আশ্রমের আশ্রিতগণ কি সেই উৎসবে সূর্যতারা ও তরুশ্রেণীর সঙ্গে কোনোদিন যোগ দিয়েছি? আমরা এই আশ্রমটিকে কি তার সমস্ত সত্যে ও সৌন্দর্যে দেখেছি। দেখি নি। এই আশ্রমের মাঝখানে থেকেও আমরা প্রতিদিন

প্রাতে সংসারের মধ্যেই জেগেছি এবং প্রতিদিন রাত্রে সংসারের কোলেই শুয়েছি।

৩৬৪ দিন পরে আজ আমরা আশ্রমবাসিগণ এই আশ্রমকে দেখতে এসেছি। যখন সূর্য পূর্বগগনকে আলো করে ছিল তখন দেখতে পাই নি— যখন আকাশ ভরে তারার দীপমালা জ্বলেছিল তখনো দেখতে পাই নি— আজ আমাদের এই কটা তেলের আলো, বাতির আলো জ্বালিয়ে একে দেখব! তা হোক, তাতে অপরাধ নেই। মহেশ্বরের মহোৎসবের সঙ্গে যোগ দিতে গেলে আমাদেরও যেটুকু আলোর সম্বল আছে তাও বের করতে হয়। শুধু তাঁর আলোতেই তাঁকে দেখব, এ যদি হত তা হলে সহজেই চুকে যেত— কিন্তু এইটুকু কড়ার তিনি আমাদের দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন যে, আমাদের আলোটুকুও জ্বালতে হবে— নইলে দর্শন হবে না, মিলন ঘটবে না— আমাদের যে অহংকারটি দিয়ে রেখেছেন সে এরই জন্যে। অহংকারের আগুন জ্বেলে আমরা মহোৎসবের মশাল তৈরি করব। তাই চিরজাগ্রত আনন্দকে দেখবার জন্যে আমার নিজের এইটুকু আনন্দকেও জাগিয়ে তুলতে হয়, সেই চিরপ্রকাশিত জ্ঞানকেও জানবার জন্যে আমার জ্ঞানটুকুর ক্ষুদ্র পলতেটিকে উসকে দিতে হয়— আর যাঁর প্রেম আপনি প্রবাহিত হয়ে ছাপিয়ে পড়ছে তাঁর সেই অফুরান প্রেমকেও আমরা উপলব্ধি করতে পারি নে যদি ছোটো জুঁইফুলটির মতো আমাদের এই এতটুকু প্রেমকে না ফুটিয়ে তুলতে পারি।

এইজন্যেই বিশ্বেশ্বরের জগদ্‌ব্যাপী মহোৎসবেও আমরা ঠিকমত যোগ দিতে পারি না যদি আমরা নিজের ক্ষুদ্র আয়োজনটুকু নিয়ে উৎসব না করি। আমাদের অহংকার আজ তাই আকাশপরিপূর্ণ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর চোখের সামনে নিজের এই দরিদ্র আলো কয়টা নির্লজ্জভাবে জ্বালিয়েছে। আমাদের অভিমান এই যে, আমরা নিজের আলো দিয়েই তাঁকে দেখব। আমাদের এই অভিমানে মহাদেব খুশি, তিনি হাসছেন। আমাদের এই প্রদীপ কটা জ্বালা দেখে সেই কোটি সূর্যের অধিপতি আনন্দিত হয়েছেন। এই তো তাঁর প্রসন্ন মুখ দেখবার শুভ অবসর। এই সুযোগটিতে আমাদের সমস্ত চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। এই চেতনা আমাদের সমস্ত শরীরে জেগে উঠে রোমে রোমে পুলকিত হোক, এই চেতনা দিবালোকের তরঙ্গে তরঙ্গে স্পন্দিত হোক, নিশীথরাত্রির অন্ধকারের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হোক, আজ সে যেন ঘরের কোণে ঘরের চিন্তায় বিক্ষিপ্ত না হয়, নিখিলের পক্ষে যেন মিথ্যা হয়ে না থাকে— আজ সে কোনোখানে সংকুচিত হয়ে বঞ্চিত না হয়। অনন্ত সভার সমস্ত আয়োজন, সমস্ত দর্শন স্পর্শন মিলন কেবল এই চৈতন্যের উদ্‌বোধনের অপেক্ষায় আছে— এইজন্যে আলো জ্বলছে, বাঁশি বাজছে— দূতগুলি চতুর্দিক থেকেই দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে— সমস্তই প্রস্তুত, ওরে চেতনা, তুই কোথায়। ওরে উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।

৭ পৌষ

দীক্ষা

একদিন যাঁর চেতনা বিলাসের আরামশয্যা থেকে হঠাৎ জেগে উঠেছিল— এই ৭ই পৌষ দিনটি সেই দেবেন্দ্রনাথের দিন। এই দিনটিকে তিনি আমাদের জন্যে দান করে গিয়েছেন। রত্ন যেমন করে দান করতে হয় তেমনি করে দান করেছেন। ঐ দিনটিকে এই আশ্রমের কৌটোটির মধ্যে স্থাপন করে দিয়ে গেছেন। আজ কৌটো উদ্‌ঘাটন করে রত্নটিকে এই প্রান্তরের আকাশের মধ্যে তুলে ধরে দেখব— এখানকার ধূলিবিহীন নির্মল নিভৃত আকাশতলে যে নক্ষত্রমণ্ডলী দীপ্তি পাচ্ছে সেই তারাগুলির মাঝখানে তাকে তুলে ধরে দেখব। সেই সাধকের জীবনের ৭ই পৌষকে আজ উদ্‌ঘাটন করার দিন, সেই নিয়ে আমরা আজ উৎসব করি।

এই ৭ই পৌষের দিনে সেই ভক্ত তাঁর দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন; সেই দীক্ষার যে কতবড়ো অর্থ

আজকের দিন কি সে কথা আমাদের কাছে কিছু বলছে ? সেই কথাটি না শুনে গেলে কী জন্যেই বা এসেছি আর কী নিয়েই বা যাব ?

সেই যেদিন তাঁর জীবনে এই ৭ই পৌষের সূর্য একদিন উদিত হয়েছিল সেই দিনে আলোও জ্বলে নি, জনসমাগমও হয় নি— সেই শীতের নির্মল দিনটি শান্ত ছিল, স্তব্ধ ছিল। সেই দিনে যে কী ঘটছে তা তিনি নিজেও সম্পূর্ণ জানেন নি, কেবল অন্তর্যামী বিধাতা পুরুষ জানছিলেন।

সেই যে দীক্ষা সেদিন তিনি গ্রহণ করেছিলেন সেটি সহজ ব্যাপার নয়। সে শুধু শান্তির দীক্ষা নয়, সে অগ্নির দীক্ষা। তাঁর প্রভু সেদিন তাঁকে বলেছিলেন, 'এই যে জিনিসটি তুমি আজ আমার হাত থেকে নিলে এটি যে সত্য— এর ভার যখন গ্রহণ করেছ তখন তোমার আর আরাম নেই, তোমাকে রাত্রিদিন জাগ্রত থাকতে হবে। এই সত্যকে রক্ষা করতে তোমার যদি সমস্তই যায় তো সমস্তই যাক। কিন্তু সাবধান, তোমার হাতে আমার সত্যের অসম্মান না ঘটে।'

তাঁর প্রভুর কাছ থেকে এই সত্যের দান নিয়ে তার পরে আর তো তিনি ঘুমোতে পারেন নি। তাঁর আত্মীয় গেল, ঘর গেল, সমাজ গেল, নিন্দায় দেশ ছেয়ে গেল— এতবড়ো বৃহৎ সংসার, এত মানী বন্ধু, এত ধনী আত্মীয়, এত তাঁর সহায়, সমস্তের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে গেল এমন দীক্ষা তিনি নিয়েছিলেন। জগতের সমস্ত আনুকূল্যকে বিমুখ করে দিয়ে এই সত্যটি নিয়ে তিনি দেশে দেশে অরণ্যে পর্বতে ভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন। এ যে প্রভুর সত্য। এই অগ্নি রক্ষার ভার নিয়ে আর আরাম নেই, আর নিদ্রা নেই। রুদ্রদেবের সেই অগ্নিদীক্ষা আজকের দিনের উৎসবের মাঝখানে আছে। কিন্তু সে কি প্রচ্ছন্নই থাকবে ? এই গীতবাদ্যকোলাহলের মাঝখানে প্রবেশ করে সেই 'ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং' যিনি তাঁর দীপ্ত সত্যের বজ্রমূর্তি আজ প্রত্যক্ষ করে যাবে না ? গুরুর হাত হতে সেই যে "বজ্রমুদ্যতং" তিনি গ্রহণ করেছিলেন, এই ৭ই পৌষের মর্মস্থানে সেই বজ্রতেজ রয়েছে।

কিন্তু শুধু বজ্র নয়, শুধু পরীক্ষা নয়, সেই দীক্ষার মধ্যে যে কী বরাভয় আছে তাও দেখে যেতে হবে। সেই ধনিসন্তানের জীবনে যে সংকটের দিন এসেছিল তা তো সকলের জানা আছে। যে বিপুল ঐশ্বর্য রাজহর্ম্যের মতো একদিন তাঁর আশ্রয় ছিল সেইটে যখন অকস্মাৎ তাঁর মাথার উপরে ভেঙে প'ড়ে তাঁকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবার উদ্‌যোগ করেছিল তখন সেই ভয়ংকর বিপৎপতনের মাঝখানে একমাত্র এই সত্যদীক্ষা তাঁকে আবৃত করে রক্ষা করেছিল— সেইদিন তাঁর আর-কোনো পার্থিব সহায় ছিল না। এই দীক্ষা শুধু যে দুর্দিনের দারুণ আঘাত থেকে তাঁকে বাঁচিয়েছিল, তা নয়— প্রলোভনের দারুণতর আক্রমণ থেকে তাঁকে রক্ষা করেছিল।

আজকের এই ৭ই পৌষের মাঝখানে তাঁর সেই সত্যদীক্ষার রুদ্রদীপ্তি এবং বরাভয়রূপ দুইই রয়েছে— সেটি যদি আমরা দেখতে পাই এবং লেশমাত্রও গ্রহণ করতে পারি তবে ধন্য হব। সত্যের দীক্ষা যে কাকে বলে, আজ যদি ভক্তির সঙ্গে তাই স্মরণ করে যেতে পারি তা হলে ধন্য হব। এর মধ্যে ফাঁকি নেই, লুকোচুরি নেই, দ্বিধা নেই, দুই দিক বজায় রেখে চলবার চাতুরী নেই, নিজেকে ভোলাবার জন্যে সুনিপুণ মিথ্যাযুক্তি নেই, সমাজকে প্রসন্ন করবার জন্যে বুদ্ধির দুই চক্ষু অন্ধ করা নেই, মানুষের হাটে বিকিয়ে দেবার জন্যে ভগবানের ধন চুরি করা নেই। সেই সত্যকে সমস্ত দুঃখপীড়নের মধ্যে স্বীকার করে নিলে তার পরে একেবারে নির্ভয়, ধূলিঘর ভেঙে দিয়ে একেবারে পিতৃভবনের অধিকার লাভ— চিরজীবনের যে গম্যস্থান, যে অমৃতনিকেতন, সেই পথের যিনি একমাত্র বন্ধু তাঁরই আশ্রয়প্রাপ্তি, সত্যদীক্ষার এই অর্থ।

সেই সাধু সাধক তাঁর জীবনের সকলের চেয়ে বড়ো দিনটিকে, তাঁর দীক্ষার দিনটিকে, এই নির্জন প্রান্তরের মুক্ত আকাশ ও নির্মল আলোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে রেখে দিয়ে গেছেন। তাঁর সেই মহাদিনটির চারি দিকে এই মন্দির, এই আশ্রম, এই বিদ্যালয় প্রতিদিন আকার ধারণ করে উঠছে ; আমাদের জীবন, আমাদের হৃদয়, আমাদের চেতনা একে বেষ্টন করে দাঁড়িয়েছে ; এই দিনটিরই আহ্বানে কল্যাণ মূর্তিমান হয়ে এখানে আবির্ভূত হয়েছে ; এবং তাঁর সেই সত্যদীক্ষার দিনটি ধনী ও দরিদ্রকে, বালক ও বৃদ্ধকে, জ্ঞানী ও মূর্খকে বর্ষে বর্ষে আনন্দ-উৎসবে আমন্ত্রণ করে আনছে। এই

দিনটিকে যেন আমাদের অন্যমনস্ক জীবনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়ে না রাখি— একে ভক্তিপূর্বক সমাদর করে ভিতরে ডেকে নাও, আমাদের তুচ্ছ জীবনের প্রতিদিনের যে দৈন্য তাকে সম্পদে পূর্ণ করো।

হে দীক্ষাদাতা, হে গুরু, এখনো যদি প্রস্তুত হয়ে না থাকি তো প্রস্তুত করো, আঘাত করো, চেতনাকে সর্বত্র উদ্যত করো— ফিরিয়ে দিয়ো না, ফিরিয়ে দিয়ো না— দুর্বল ব'লে তোমার সভাসদ্‌দের সকলের পশ্চাতে ঠেলে রেখো না। এই জীবনে সত্যকে গ্রহণ করতেই হবে— নির্ভয়ে এবং অসংকোচে। অসত্যের স্তূপাকার আবর্জনার মধ্যে ব্যর্থ জীবনকে নিক্ষেপ করব না। দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে— তুমি শক্তি দাও।

৭ পৌষ

মানুষ

কালকের উৎসবমেলার দোকানি পসারিরা এখনো চলে যায় নি। সমস্ত রাত তারা এই মাঠের মধ্যে আগুন জ্বেলে গল্প করে গান গেয়ে বাজনা বাজিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে।

কৃষ্ণচতুর্দশীর শীতরাত্রি। আমি যখন আমাদের নিত্য উপাসনার স্থানে এসে বসলুম তখনো রাত্রি প্রভাত হতে বিলম্ব আছে। চারি দিকে নিবিড় অন্ধকার— এখানকার ধূলিবাষ্পশূন্য স্বচ্ছ আকাশের তারাগুলি দেবচক্ষুর অক্লিষ্ট জাগরণের মতো অক্লান্তভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। মাঠের মাঝে মাঝে আগুন জ্বলছে, ভাঙামেলার লোকেরা শুকনো পাতা জ্বালিয়ে আগুন পোয়াচ্ছে।

অন্যদিন এই ব্রাহ্মমুহূর্তে কী শান্তি, কী স্তব্ধতা। বাগানের সমস্ত পাখি জেগে গেয়ে উঠলেও সে স্তব্ধতা নষ্ট হয় না— শালবনের মর্মরিত পল্লবরাশির মধ্যে পৌষের উত্তরে হাওয়া দুরন্ত হয়ে উঠলেও সেই শান্তিকে স্পর্শ করে না।

কিন্তু কয়জন মানুষে মিলে যখন কলরব করে তখন প্রভাত প্রকৃতির এই স্তব্ধতা কেন এমন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। উপাসনার জন্যে সাধক পশুপক্ষিহীন স্থান তো খোঁজে না, মানুষহীন স্থান খুঁজে বেড়ায় কেন?

তার কারণ এই যে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পূর্ণ ঐক্য নেই। বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে মানুষ একটানে একতালে চলে না। এইজন্যেই যেখানেই মানুষ থাকে সেইখানেই চারি দিকে সে নিজের একটা তরঙ্গ তোলে; সে একটিমাত্র কথা না বললেও, তারার মতো নিঃশব্দ ও একটুমাত্র নড়াচড়া না করলেও বনস্পতির মতো নিস্তব্ধ থাকে না। তার অস্তিত্বই অগ্রসর হয়ে আঘাত করে।

ভগবান ইচ্ছা করেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সামঞ্জস্য একটুখানি নষ্ট করে দিয়েছেন— এই তাঁর আনন্দের কৌতুক। ঐ যে আমাদের পঞ্চভূতের মধ্যে একটু বুদ্ধির সঞ্চার করেছেন, একটা অহংকার যোজনা করে বসে আছেন, তাতে করেই আমরা বিশ্ব থেকে আলাদা হয়ে গেছি— ঐ জিনিসটার দ্বারাতেই আমাদের পঙ্‌ক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। এইজন্যেই গ্রহসূর্যতারার সঙ্গে আমরা আর মিল রক্ষা করে চলতে পারি নে— আমরা যেখানে আছি সেখানে যে আমরা আছি, এ কথাটা আর কারও ভোলবার জো থাকে না।

ভগবান আমাদের সেই সামঞ্জস্যটি নষ্ট করে প্রকৃতির কাছ থেকে আমাদের একঘরে করে দেওয়াতে সকালবেলা থেকে রাত্রি পর্যন্ত আমাদের নিজের কাজের ধান্দায় নিজে ঘুরে বেড়াতে হয়।

ঐ সামঞ্জস্যটি ভেঙে গেছে বলেই আমাদের প্রকৃতির মধ্যে বিরাট বিশ্বের শান্তি নেই— আমাদের ভিতরকার নানা মহল থেকে রব উঠেছে, চাই চাই চাই। শরীর বলছে চাই, মন বলছে চাই, হৃদয় বলছে চাই— এক মুহূর্তও এই রবের বিশ্রাম নেই। যদি সমস্তর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন মিল থাকত তা হলে

আমাদের মধ্যে এই হাজার সুরে চাওয়ার বালাই থাকত না।

আজ অন্ধকার প্রত্যুষে বসে আমার চারি দিকে সেই বিচিত্র চাওয়ার কোলাহল শুনছিলুম— কত দরকারের হাঁক। ওরে গোরুটা কোথায় গেল! অমুক কই! আগুন চাই রে! তামাক কোথায়! গাড়িটা ডাক্‌ রে! হাঁড়িটা পড়ে রইল যে!

এক জাতের পাখি সকালে যখন গান গায় তখন তারা একসুরে একরকমেরই গান গায়— কিন্তু মানুষের এই যে কলধ্বনি তাতে এক জনের সঙ্গে আর-এক জনের না আছে বাণীর মিল, না আছে সুরের।

কেননা ভগবান ঐ যে অহংকারটি জুড়ে দিয়ে আমাদের জগতের সঙ্গে ভেদ জন্মিয়ে দিয়েছেন তাতে আমাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন। আমাদের রুচি আকাঙ্ক্ষা চেষ্টা সমস্তই এক-একটি ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র আশ্রয় করে এক-একটি অপরূপ মূর্তি ধরে বসে আছে। কাজেই একের সঙ্গে আরের ঠেকাঠেকি ঠোকাঠুকি চলেইছে। কাড়াকাড়ি টানাটানির অন্ত নেই। তাতে কত বেসুর কত উত্তাপ যে জন্মাচ্ছে, তার আর সীমা নেই। সেই বেসুরে পীড়িত, সেই তাপে তপ্ত আমাদের স্বাতন্ত্র্যগত অসামঞ্জস্য কেবলই সামঞ্জস্যকে প্রার্থনা করছে, সেইজন্যেই আমরা কেবলমাত্র খেয়ে পরে জীবন ধারণ করে বাঁচি নে। আমরা একটা সুরকে, একটা মিলকে চাচ্ছি। সে চাওয়াটা আমাদের খাওয়াপরার চাওয়ার চেয়ে বেশি বৈ কম নয়— সামঞ্জস্য আমাদের নিতান্তই চাই। সেইজন্যেই কথা নেই, বার্তা নেই, আমরা কাব্য রচনা করতে বসে গেছি— কত লিখছি, কত আঁকছি, কত গড়ছি। কত গৃহ কত সমাজ বাঁধছি, কত ধর্মমত ফাঁদছি। আমাদের কত অনুষ্ঠান, কত প্রতিষ্ঠান, কত প্রথা। এই সামঞ্জস্যের আকাঙ্ক্ষার তাগিদে নানা দেশের মানুষ কত নানা আকৃতির রাজ্যতন্ত্র গড়ে তুলছে। কত আইন, কত শাসন, কত রকম-বেরকমের শিক্ষাদীক্ষা। কী করলে নানা মানুষের নানা অহংকারকে সাজিয়ে একটি বিচিত্র সুন্দর ঐক্য স্থাপিত হতে পারে, এই চেষ্টায়, এই তপস্যায় পৃথিবী জুড়ে সমস্ত মানুষ ব্যস্ত হয়ে রয়েছে।

এই চেষ্টার তাড়নাতেই মানুষ আপনার একটা সৃষ্টি তৈরি করে তুলছে— নিখিল সৃষ্টি থেকে এই অহংকারের মধ্যে নির্বাসিত হওয়াতেই তার এই নিজের সৃষ্টির এত অধিক প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। মানুষের ইতিহাস কেবলই এই সৃষ্টির ইতিহাস, এই সমন্বয়ের ইতিহাস— তার সমস্ত ধর্ম ও কর্ম, সমস্ত ভাব ও কল্পনার মধ্যে কেবলই এই অমিলের মেলবার ইতিহাস রচিত হচ্ছে। পেতে চাই, পেতে চাই, মিলতে চাই, মিলতে চাই। এ ছাড়া আর কথা নেই।

সেইজন্যে এই মাঠ জুড়ে নানা লোকের নানা স্বতন্ত্র প্রয়োজনের নানা কলরবের মধ্যে যখন শুনলুম একজন গান গাচ্ছে, "হরি, আমায় বিনামূল্যে পার করে দাও" তখন সেই গানটির ভিতর এই-সমস্ত কলরবের মাঝখানটির কথা আমি শুনতে পেলুম। সমস্ত চাওয়ার ভিতরকার চাওয়া হচ্ছে এই পার হতে চাওয়া। যে বিচ্ছিন্ন সে কেবলই বলছে, ওগো আমাকে এই বিচ্ছেদ উত্তীর্ণ করে দাও। এই বিচ্ছেদ পার হলেই তবে যে প্রেম পূর্ণ হয়। এই প্রেম পূর্ণ না হলে কোনো কিছু পেয়েই আমার তৃপ্তি নেই— নইলে কেবলই মৃত্যু থেকে মৃত্যুতে যাচ্ছি— একের থেকে আরে ঘুরে মরছি— মিলে গেলেই এই বিষম আপদ চুকে যায়।

কিন্তু যে মিলটি হচ্ছে অমৃত, তাকে পেতে গেলেই তো বিচ্ছেদের ভিতর দিয়েই পেতে হয়। মিলে থাকলে তো মিলকে পাওয়া হয় না।

সেইজন্যে ঈশ্বর যে অহংকার দিয়ে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন সেটা তাঁর প্রেমেরই লীলা। অহংকার না হলে বিচ্ছেদ হয় না, বিচ্ছেদ না হলে মিলন হয় না, মিলন না হলে প্রেম হয় না। মানুষ তাই বিচ্ছেদপারাবারের পারে বসে প্রেমকেই নানা আকারে চাইতে চাইতে নানা রকমের তরী গড়ে তুলছে— এ সমস্তই তার পার হবার তরণী— রাজ্যতন্ত্রই বল, সমাজতন্ত্রই বল, আর ধর্মতন্ত্রই বল।

কিন্তু তাই যদি হয়, তবে পার হয়ে যাব কোথায়? তবে কি অহংকারকে একেবারেই লুপ্ত করে দিয়ে সম্পূর্ণ অবিচ্ছেদের দেশে যাওয়াই অমৃতলোক প্রাপ্তি? সেই দেশেই তো ধুলা মাটি পাথর রয়েছে।

তারা তো সমষ্টির সঙ্গে একতানে মিলে চলেছে, কোনো বিচ্ছেদ জানে না। এই রকমের আত্মবিলয়ের জন্যেই কি মানুষ কাঁদছে?

কখনোই নয়। তা যদি হত, সকলপ্রকার বিলয়ের মধ্যেই সে সান্ত্বনা পেত, আনন্দ পেত। বিলুপ্তিকে যে মানুষ সর্বান্তঃকরণে ভয় করে, তার প্রমাণ-প্রয়োগের কোনো দরকার নেই। কিছু একটা গেল, এ কথার স্মরণ তার সুখের স্মরণ নয়। এই আশঙ্কা এবং এই স্মরণের সঙ্গেই তার জীবনের গভীর বিষাদ জড়িত— সে ধরে রাখতে চায়, অথচ ধরে রাখতে পারে না। মানুষ সর্বান্তঃকরণে যদি কিছুকে না চায় তো সে বিলয়কে।

তাই যদি হল, তবে যে অসামঞ্জস্য, যে বিচ্ছেদের উপর তার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত, সেইটেকে কি সে চায়? তাও তো চায় না। এই বিচ্ছেদ, এই অসামঞ্জস্যের জন্যেই তো সে চিরদিন কেঁদে মরছে। তার যত পাপ, যত তাপ, সে তো একেই আশ্রয় করে। এইজন্যেই তো সে গান গেয়ে উঠছে— হরি, আমায় বিনামূল্যে পার করো। কিন্তু পারে যাওয়া যদি লুপ্ত হওয়াই হল তবে তো আমরা মুশকিলেই পড়েছি। তবে তো এপারে দুঃখ, আর ওপারে ফাঁকি।

আমরা কিন্তু দুঃখকেও চাই নে, ফাঁকিকেও চাই নে। তবে আমরা কী চাই, আর সেটা পাবই বা কী করে।

আমরা প্রেমকেই চাই। কখন সেই প্রেমকে পাই? যখন বিচ্ছেদ-মিলনের সামঞ্জস্য ঘটে; যখন বিচ্ছেদ মিলনকে নাশ করে না এবং মিলনও বিচ্ছেদকে গ্রাস করে না— দুই যখন একসঙ্গে থাকে, অথচ তাদের মধ্যে আর বিরোধ থাকে না— তারা পরস্পরের সহায় হয়।

এই ভেদ ও ঐক্যের সামঞ্জস্যের জন্যেই আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা। আমরা এর কোনোটাকেই ছাড়তে চাই নে। আমাদের যা কিছু প্রয়াস যা কিছু সৃষ্টি সে কেবল এই ভেদ ও অভেদের অবরুদ্ধ ঐক্যের মূর্তি দেখবার জন্যেই— দুইয়ের মধ্যেই এককে লাভ করবার জন্যে। আমাদের প্রেমের ভগবান যখন আমাদের পার করবেন তখন তিনি আমাদের চিরদুঃখের বিচ্ছেদকেই চিরন্তন আনন্দের বিচ্ছেদ করে তুলবেন। তখন তিনি আমাদের এই বিচ্ছেদের পাত্র ভরেই মিলনের সুধা পান করাবেন। তখনই বুঝিয়ে দেবেন বিচ্ছেদটি কী অমূল্য রত্ন।

৮ পৌষ

ভাঙা হাট

মানুষের মনটা কেবলই যেমন বলছে, চাই, চাই, চাই— তেমনি তার পিছনে পিছনেই আর-একটি কথা বলছে, চাই নে, চাই নে, চাই নে। এইমাত্র বলে, না হলে নয়, পরক্ষণেই বলে, কোনো দরকার নেই।

ভাঙা মেলার লোকেরা কাল রাত্রে বলেছিল, গোটাকতক কাঠকুটা লতাপাতা পেলে বেঁচে যাই; তখন এমনি হয়েছিল যে, না হলে চলে না। শীতে খোলা মাঠের মধ্যে ঐ একটুখানি আশ্রয় রচনা করাই জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুতর প্রয়োজনসাধন বলে মনে হয়েছিল। কোনোমতে একটা চুলো বানিয়ে, শুকনো পাতা জ্বালিয়ে, যা হোক কিছু একটা রেঁধে নিয়ে আহার করবার চেষ্টাও অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল। এ চাওয়া ও চেষ্টার কাছে পৃথিবীর আর-সমস্ত ব্যাপারই ছোটো হয়ে গিয়েছিল।

কোনো গতিকে এই কাঠকুটো পাতালতা সংগ্রহ হয়েছিল। কিন্তু আজ রাত্রি না যেতেই শুনতে পাচ্ছি— "ওরে গাড়ি কোথায় রে, গোরু জোত রে।" যেতে হবে, এবার গ্রামে যেতে হবে। এই চলে যাওয়ার প্রয়োজনটাই এখন সকলের বড়ো। কাল রাত্রিবেলাকার একান্ত প্রয়োজনগুলো আজ আবর্জনা হয়ে পড়ে রইল— কাল যাকে বলেছিল বড়ো দরকার, আজ তাকে পরিত্যাগ করে যাবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত।

বিশ্বমানবও এমনি করেই এক যুগ থেকে আর-এক যুগে যাবার আয়োজন করছে। যখন নূতন প্রভাত উঠছে, যখন রাত ভোর হবে-হবে করছে— তখন এ ওকে ঠেলাঠেলি করে ডাকছে— ওরে চল্ রে— ওরে গোরু কোথায় রে, ওরে গাড়ি কোথায়। তখন ঐ রাত্রির অত্যন্ত প্রয়োজনের সামগ্রীগুলো এই দিনের আলোতে অত্যন্ত আবর্জনা হয়ে লজ্জিত হয়ে পড়ে রইল। শুকনো পাতা থেকে এখনো ধোঁয়া উঠছে, তার ছাইগুলো জমে উঠছে। ভাঙা হাঁড়িসরা, শালপাতায় মাঠ বিকীর্ণ। আশ্রয়গৃহগুলি আশ্রিতদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে অত্যন্ত শ্রীভ্রষ্ট ও লজ্জিত হয়ে আছে। সমস্তই রইল— পূর্বাকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে— এবারে যাত্রা করে বেরোতে হবে। আবার, আবার আর-এক যুগের প্রয়োজন সংগ্রহ করতে হবে। তখন মনে হবে, এইবারকার এই প্রয়োজনগুলিই চরম— আর কোনো দিন ভোরেরবেলায় গাড়িতে গোরু জুততে হবে না। এই বলে আবার কাঠকুটো ডালপালা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। কিন্তু তখনো এই অত্যন্ত একান্ত প্রয়োজনের দূর সম্মুখ দিগন্ত থেকে করুণ ভৈরবীসুরে বাণী আসছে, প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই।

যদি এই সুরটুকু না থাকত— যদি এই অত্যন্ত প্রয়োজনের ভিতরেই অত্যন্ত অপ্রয়োজন বাস না করত তা হলে কি আমরা বাঁচতে পারতুম। প্রয়োজন যদি সত্যই একান্ত হত তা হলে তার ভয়ংকর চাপ কে সহ্য করতে পারত। অত্যন্ত অপ্রয়োজনের দিন ও রাত্রি এই অত্যন্ত প্রয়োজনের ভার হরণ করে রয়েছে বলেই আমরা দরকারের অতি প্রবল মাধ্যাকর্ষণের মধ্যেও চলাফেরা করে বেড়াতে পারছি। সেইজন্যেই ভোরের আলো দেখা দেবা মাত্রই রাশীকৃত বোঝা যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন করে ফেলে রেখে আমরা গাড়িতে চড়ে বসতে পারছি। "কিছুই থাকে না" বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছি— তেমনি "কিছুই নড়ে না" বলে হতাশ হয়ে পড়ছি নে। থাকছেও বটে, যাচ্ছেও বটে, এই দুইয়ের মাঝখানে আমরা ফাঁকও পেয়েছি, আশ্রয়ও পেয়েছি— আমাদের ঘরও জুটেছে, আলো-বাতাসও মারা যায় নি।

৮ পৌষ

উৎসবশেষ

আমরা অনেক সময় উৎসব করে ফতুর হয়ে যাই। ঋণশোধ করতেই দিন বয়ে যায়। অল্পসম্বল ব্যক্তি যদি একদিনের জন্যে রাজা হওয়ার শখ মেটাতে যায় তবে তার দশদিনকে সে দেউলে করে দেয়, আর তো কোনো উপায় নেই।

সেইজন্যে উৎসবের পরদিন আমাদের কাছে বড়ো ম্লান। সেদিন আকাশের আলোর উজ্জ্বলতা চলে যায়— সেদিন অবসাদে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু উপায় নেই। মানুষ বৎসরে অন্তত একটা দিন নিজের কার্পণ্য দূর করে তবে সেই অকৃপণের সঙ্গে আদানপ্রদানের সম্বন্ধ স্থাপন করতে চায়। ঐশ্বর্যের দ্বারা সেই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে।

দুই রকমের উপলব্ধি আছে। একরকম— দরিদ্র যেমন ধনীকে উপলব্ধি করে, দানপ্রাপ্তির দ্বারা। এই উপলব্ধিতে পার্থক্যটাকেই বেশি করে বোঝা যায়। আর একরকম উপলব্ধি হচ্ছে সমকক্ষতার উপলব্ধি। সেইস্থলে আমাকে দ্বারের বাইরে বসে থাকতে হয় না— কতকটা এক জাজিমে বসা চলে।

প্রতিদিন যখন আমরা দীনভাবে থাকি তখন নিরানন্দ চিত্তটা আনন্দময়ের কাছে ভিক্ষুকতা করে। উৎসবের দিনে সেও বলতে চায়, আজ কেবল নেওয়া নয়, আজ আমিও তোমার মতো আনন্দ করব— আজ আমার দীনতা নেই, কৃপণতা নেই, আজ আমার আনন্দ এবং আমার ত্যাগ তোমারই মতো অজস্র।

এইরূপে ঐশ্বর্য জিনিসটি কী, অকৃপণ প্রাচুর্য কাকে বলে, সেটা নিজের মধ্যে অনুভব করলে ঈশ্বর

যে কেবলমাত্র আমার অনুগ্রহকর্তা নন, তিনি যে আমার আত্মীয় সেটা আমি বুঝি এবং প্রমাণ করি।

কিন্তু এইটে বুঝতে এবং প্রচার করতে গিয়ে অনেক সময় শেষে দুঃখ পেতে হয়। পরদিনের ছড়ানো উচ্ছিষ্ট, গলা বাতি এবং শুকনো মালার দিকে তাকিয়ে মন উদাস হয়ে যায়— তখন আর চিত্তের রাজকীয় ঔদার্য থাকে না— হিসাবের কথাটা মনে পড়ে মন ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে।

কিন্তু দুঃখ পেতে হয় না তাকে যে প্রতিদিনই কিছু কিছু সম্বল জমিয়ে তোলে— প্রতিদিনই যে লোক উৎসবের আয়োজন করে চলেছে— যার উৎসবদিনের সঙ্গে প্রতিদিনের সম্পূর্ণ পার্থক্য নেই, পরস্পর নাড়ীর যোগ আছে।

এটি না হলেই আমাদের ঋণ করে উৎসব করতে হয়। আনন্দ করি বটে কিন্তু সে আনন্দের অধিকাংশই ঠিক নিজের কড়ি দিয়ে করি নে— তার পনেরো-আনাই ধারে চালাই। লোক-সমাগম থেকে ধার করি, ফুলের মালা থেকে, আলো থেকে, সভাসজ্জা থেকে ধার করি— গান থেকে, বাজনা থেকে, বক্তৃতা থেকে ধার নিই। সেদিনকার উত্তেজনায় চেতনাই থাকে না যে, ধারে চালাচ্ছি— পরদিনে যখন ফুল শুকোয়, আলো নেবে, লোক চলে যায় তখন দেনার প্রকাণ্ড শূন্যতাটা চোখে পড়ে হৃদয়কে ব্যাকুল করে।

আমাদের এই দৈন্যবশতই উৎসবদেবতাকে আমরা উৎসবের সঙ্গে সঙ্গেই বিসর্জন দিয়ে বসি— উৎসবের অধিপতিকে প্রতিদিনের সিংহাসনে বসাবার কোনো আয়োজন করি নে।

আমাদের সৌভাগ্য এই যে আমরা কয়জন প্রতিদিন প্রত্যুষে এই মন্দির-প্রাঙ্গণে একত্রে মিলে কিছু কিছু জমাচ্ছিলুম— আমরা উৎসবের মেলায় একেবারেই রবাহূত বিদেশীর মতো জুটি নি— আমাদের প্রতিদিনের সকালবেলায় সব-কটিই হাতে হাতেই বাজে খরচ হয়ে যায় নি। আমার উৎসবকর্তাকে বোধ করি বলতে পেরেছি যে, তোমার সঙ্গে আমার কিছু পরিচয় আছে, তোমার নিমন্ত্রণ আমি পেয়েছি।

তার পরে আমাদের উৎসবকে, হঠাৎ একদিনেই সাঙ্গ করে দেব না— এই উৎসবকে আমাদের দৈনিক উৎসবের মধ্যে প্রবাহিত করে দেব। প্রতিদিন প্রাতঃকালেই আমাদের দশজনের এই উৎসব চলতে থাকবে। আমাদের প্রতিদিনের সমস্ত তুচ্ছতা এবং আত্মবিস্মৃতির মধ্যে অন্তত একবার করে দিনারম্ভে জগতের নিত্য উৎসবের ঐশ্বর্যকে উপলব্ধি করে যাব। যখন প্রত্যহই উষা তাঁর আলোকটি হাতে করে পূর্ব দিকের প্রান্তে এসে দাঁড়াবেন তখন আমরা কয়জনেই স্তব্ধ হয়ে বসে অনুভব করব, আমাদের প্রত্যেক দিনই মহিমান্বিত, ঐশ্বর্যময়— আমাদের জীবনের তুচ্ছতা তাকে লেশমাত্র মলিন করে নি— প্রতিদিনই সে নবীন, সে উজ্জ্বল, সে পরমাশ্চর্য— তার হাতের অমৃতপাত্র একেবারে উপুড় করে ঢেলেও তার এক বিন্দু ক্ষয় হয় না।

৯ পৌষ

সঞ্চয়তৃষ্ণা

একদিনের প্রয়োজনের বেশি যিনি সঞ্চয় করেন না, আমাদের প্রাচীন সংহিতায় সেই দ্বিজ গৃহীকেই প্রশংসা করেছেন। কেননা একবার সঞ্চয় করতে আরম্ভ করলে ক্রমে আমরা সঞ্চয়ের কল হয়ে উঠি, তখন আমাদের সঞ্চয় প্রয়োজনকেই বহুদূরে ছাড়িয়ে চলে যায়, এমন-কি, প্রয়োজনকেই বঞ্চিত ও পীড়িত করতে থাকে।

আধ্যাত্মিক সঞ্চয় সম্বন্ধেও যে এ কথা খাটে না, তা নয়। আমরা যদি কোনো পুণ্যকে মনে করি যে ভবিষ্যৎ কোনো একটা ফললাভের জন্যে তাকে জমাচ্ছি, তা হলে জমানোটাই আমাদের পেয়ে বসে— তার সম্বন্ধে আমরা কৃপণের মতো হয়ে উঠি— তার সম্বন্ধে আমাদের স্বাভাবিকতা একেবারে চলে যায়; সব কথাতেই কেবল আমরা সুদের দিকে তাকাই, লাভের হিসাব করতে থাকি।

এমন অবস্থায় পুণ্য আমাদের আনন্দকে উপবাসী করে রাখে এবং মনে করে উপবাস করেই সেই পুণ্যের বৃদ্ধিলাভ হচ্ছে। এইরূপ আধ্যাত্মিক সাধনাক্ষেত্রেও অনেক কৃপণ আহারকে জমিয়ে তুলে প্রাণকে নষ্ট করে।

আধ্যাত্মিক গৃহস্থালিতে আমরা কালকের জন্যে আজকে ভাবব না। তা যদি করি, তবে আজকেরটাকেই বঞ্চিত করব। আমরা জমানোর কথা চিন্তাই করব না, আমরা খরচই জানি। আমাদের প্রতিদিনের উপাসনা যেন আমাদের প্রতিদিনের নিঃশেষ সামগ্রী হয়। মনে করব না, তার থেকে আমরা শান্তিলাভ করব, পুণ্যলাভ করব, ভবিষ্যতে কোনো একসময়ে পরিত্রাণলাভ করব, বা আর কিছু। যা কিছু সংগ্রহ হয়েছে তা হাতে হাতে সমস্তই তাঁকে ঢেলে শেষ করে দিতে হবে ; তাঁকেই সব দেওয়াতেই সেই দেওয়ার শেষ।

যদি আমরা মনে করি তাঁর উপাসনা করে আমার পুণ্য হচ্ছে তা হলে সমস্ত পূজা ঈশ্বরকে দেওয়া হয় না, পুণ্যের জন্যেই তার অনেকখানি জমানো হয়। যদি মনে করতে আরম্ভ করি, ঈশ্বরের যে কাজ করছি তার থেকে লোকহিত হবে, তা হলে লোকহিতের উত্তেজনাটা ক্রমেই ঈশ্বরের প্রসাদলাভকে খর্ব করে দিয়ে বেড়ে উঠতে থাকে।

ধর্মব্যাপারে এই পাপের ছিদ্র দিয়েই বিষয়কর্মের সাংসারিকতার চেয়ে তীব্রতর সাংসারিকতা প্রবেশলাভ করে। তার থেকেই ক্রোধ বিদ্বেষ পরনিন্দা পরপীড়ন নিশাচরগণ ধর্মের নামে তাদের গুহাগহ্বর থেকে বেরিয়ে পড়ে— মতের সঙ্গে মতের যুদ্ধে পৃথিবী একেবারে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। তখন ঈশ্বরকে পিছনে ঠেলে রেখে আমরা এগিয়ে চলতে থাকি। আমরা হিত করব, আমরা পুণ্য করব, আমরা ঈশ্বরকে প্রচার করব এই কথাটাই ক্রমে ভীষণ হয়ে বেড়ে উঠতে থাকে— ঈশ্বর করবেন, সে আর মনে থাকে না ; তখন ঈশ্বরের ভৃত্যেরাই ঈশ্বরের পথ রোধ করে দাঁড়ায়, কোথায় থাকে শান্তি, কোথায় থাকে হিত, কোথায় থাকে পুণ্য।

তাই আমার এক-একবার ভয় হয়, আমিও বা সকালবেলায় ক্রমে ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরের কথা জমাবার ব্যাবসা খুলেছি। তোমরা কী করলে বুঝবে, তোমাদের কী করলে ভালো লাগবে, কী করলে আমার কথা হিতকর হয়ে উঠবে, এই ভাবনা ক্রমে বুঝি আমাকে পেয়ে বসে। তার ফল হবে এই যে, উপাসনার উপলক্ষে এমন একটা কিছু জমানো চলতে থাকবে যার দিকে আমার বারো-আনা মন পড়ে থাকবে— যদি কেউ বলে, তোমার কথা ভালো বোঝা যাচ্ছে না বা তুমি ভালো সাজিয়ে বলতে পার নি, তা হলে আমার রাগ হবে।

শুধু তাই নয়, আমার কথার দ্বারা অন্য লোকে ফল পাবে, এই চিন্তা গুরুতর হয়ে উঠলে অন্য লোকের উপর জুলুম করবার প্রবৃত্তি ঘাড়ে চেপে বসে। যদি দেখি যে, মনের মতো ফল হচ্ছে না, তা হলে জবরদস্তি করতে ইচ্ছা করে, তখন, নিজের শক্তি ও অধিকারকে নয়, অন্যেরই বুদ্ধি ও স্বভাবকে ধিক্কার দিতে প্রবৃত্তি জন্মে। তখন আর মনের সঙ্গে, শ্রদ্ধার সঙ্গে বলতে পারি নে যে, ঈশ্বর তাঁর বহুধাশক্তিযোগে বিচিত্র উপায়ে বিচিত্র মানবের মঙ্গল করুন ; তখন আমাদের অসহিষ্ণু উদ্যম এই কথাই বলতে থাকে যে, আমারই শক্তি, আমারই বাক্য আমারই উপায়ে পৃথিবীর লোককে আমারই মতে বাধ্য করে তাদের ভালো করুক।

সেইজন্যে ঐ আমাদের প্রতিদিনের উপাসনা থেকে এই যে কিছু কিছু করে কথা বাঁচাচ্ছি, একেই আমি ভয় করি। এই কথা আমার বোঝা না হোক, আমার বন্ধন না হোক ; আমার পথের বাধা না হোক। এই কথা সম্পূর্ণই তোমার সেবায় উৎসর্গীকৃত মনে করে যেন নিজ খাতে এর কোনো হিসাব না রাখি। এর যদি কোনো ফল থাকে তবে তুমি ফলাও— আমার মমতার নাড়ী বিচ্ছিন্ন করে এ যেন ভূমিষ্ঠ হয়। হে নীরব, এই প্রভাতের উপাসনার সমস্ত বাক্যকে তুমি গ্রহণের দ্বারাই সফল করো, আমার কণ্টকিত অহংকারের বৃন্ত থেকে একে একেবারে উৎপাটিত করে নাও।

১০ পৌষ

পার করো

সেই যে সেদিন ভাঙা মেলার ভোর রাত্রে নানা হাসিতামাশা-গোলমাল-তুচ্ছকথার মাঝখানে গান উঠেছিল— হরি, আমায় পার করো— সে আমি ভুলিতে পারছি নে, সে আমাকে আজও বিস্মিত করছে।

এই যে কথাটা মানুষ এতদিন থেকে বলে আসছে, আমায় পার করো, এটা একটা আশ্চর্য কথা। তার এই আকাঙ্ক্ষাটা আপনাকে আপনি সম্পূর্ণ জানে কি না, তাও বুঝতে পারি নে।

যদি কোনো সাধক সংসারের সমস্ত চেষ্টা ছেড়েছুড়ে দিয়ে তাঁর সাধন-সমুদ্রের কূলে এসে দাঁড়িয়ে বলেন, হে সিদ্ধিদাতা, তুমি আমাকে সিদ্ধির কূলে পার করে দাও তবে তার মানে বুঝতে পারি। কিন্তু যার সম্মুখে কোনো উদ্দেশ্য নেই, কোনো সাধনা নেই— তার নাবিক কোথায়, তার সমুদ্র কোথায়, সে কী পার হতে চাচ্ছে? তার এপারটাই বা কোথায়, আর ওপারটাই বা কোথায়?

আমরা আমাদের কাজকর্মের ভিড়ের মাঝখানে থেকেই বলছি, হরি, পার করো; গাড়োয়ান যখন গাড়ি চালাচ্ছে, বলছে, পার করো; মুদি যখন চালডাল ওজন করছে, বলছে, পার করো।

মনে কোরো না, তারা বলছে, আমাদের এই কর্ম হতেই পার করো। তারা কর্মের মধ্যে থেকেই পার হতে চাচ্ছে, সেইজন্যে গান গাবার সময় তাদের কাজ কামাই যাচ্ছে না।

হে আনন্দসমুদ্র, এপারও তোমার, ওপারও তোমার। কিন্তু একটা পারকে যখন আমার পার বলি, তখন ওপারের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে। তখন সে আপনার সম্পূর্ণতার অনুভব হতে ভ্রষ্ট হয়, ওপারের জন্যে ভিতরে ভিতরে কেবলই তার প্রাণ কাঁদতে থাকে। আমার পারের আমিটি তোমার পারের তুমির বিরহে বিরহিণী। পার হবার জন্যে তাই এত ডাকাডাকি।

এইটে আমার ঘর বলে আমি লোকটা দিনরাত্রি খেটে মরছে, যতক্ষণ না বলতে পারছে, এইটে তোমারও ঘর, ততক্ষণ তার যে কত দাহ, কত বন্ধন, কত ক্ষতি, তার সীমা নেই— ততক্ষণ ঘরের কাজ করতে করতে তার অন্তরাত্মা কেঁদে গাইতে থাকে, হরি, আমায় পার করো। যখনই সে আমার ঘরকে তোমার ঘর করে তুলতে পারে তখনই সে ঘরের মধ্যে থেকে পার হয়ে যায়। আমার কর্ম মনে করে আমি-লোকটা রাত্রিদিন যখন হাঁসফাঁস করে বেড়ায়, তখন সে কত আঘাত পায় আর কত আঘাত করে, তখনই তার গান, আমায় পার করো— যখন সে বলতে পারে, তোমার কর্ম, তখন সে পার হয়ে গেছে।

আমার ঘরকে তোমার ঘর করব, আমার কর্মকে তোমার কর্ম করব তবেই তো আমাতে তোমাতে মিল হবে। আমার ঘর ছেড়ে তোমার ঘরে যাব, আমার কর্ম ছেড়ে তোমার কর্মে যাব এ কথা আমাদের প্রাণের কথা নয়। কেননা, এও যে বিচ্ছেদের কথা। যে-আমির মধ্যে তুমি নেই, আর যে-তুমির মধ্যে আমি নেই দুইই আমার পক্ষে সমান।

এইজন্যেই আমাদের ঘরের মাঝখানেই, আমাদের কাজকর্মের হাটের মধ্যেই দিনরাত রব উঠছে, হরি আমায় পার করো। এইখানেই সমুদ্র, এইখানেই পার।

১১ পৌষ

এপার ওপার

যার সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় আছে মাত্র সে আমার পাশে বসে থাকলেও তার আর আমার মাঝখানে একটি সমুদ্র পড়ে থাকে— সেটি হচ্ছে অচৈতন্যের সমুদ্র, ঔদাসীন্যের সমুদ্র। যদি কোনোদিন সেই লোক আমার প্রাণের বন্ধু হয়ে ওঠে তখনই সমুদ্র পার হয়ে যাই। তখন আকাশের ব্যবধান মিথ্যা হয়ে যায়, দেহের ব্যবধানও ব্যবধান থাকে না, এমন-কি, মৃত্যুর ব্যবধানও অন্তরাল

রচনা করে না। যে অহংকার আমাদের পরস্পরের চার দিকে পাঁচিল তুলে পরস্পরকে অতিনিকটেও দূর করে রাখে, সে যার জন্যে পথ ছেড়ে দেয় সেই আমাদের আপন হয়ে ওঠে।

সেইজন্যে কাল বলেছিলুম সমুদ্র পার হওয়া কোনো একটা সুদূরে পাড়ি দেবার ব্যাপার নয়, সে হচ্ছে কাছের জিনিসকেই কাছের করে নেওয়া।

বস্তুত আমাদের যত কাছের জিনিস যত দূরে রয়েছে তার দূরত্বটাও ততই ভয়ানক। এই কারণেই, আমরা আত্মীয়কে যখন পর করি তখন পরের চেয়ে তাকে বেশি পর করি। যার ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আছি তাকে যখন অনুভবমাত্র করি নে তখন সেই অসাড়তা মৃত্যুর অসাড়তার চেয়ে অনেক বেশি।

এই কারণেই, জগতের সকলের চেয়ে যিনি অন্তরতম তাঁকেই যখন দূর বলে জানি তখন তিনি জগতের সকলের চেয়ে দূরে গিয়ে পড়েন— যিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ তিনি ঐ স্থূল দেয়ালের চেয়ে দূরে দাঁড়ান— সংসারে তখন এমন কোনো দূরত্ব নেই যার চেয়ে দূরে তিনি সরে না যান। এই দূরত্বের বেদনা আমরা স্পষ্ট করে উপলব্ধি করি নে বটে কিন্তু এই দূরত্বের ভারে আমাদের প্রতিদিনের অস্তিত্ব, আমাদের ঘরদুয়ার, কাজকর্ম, আমাদের সমস্ত সামাজিক সম্বন্ধ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

অথচ যে সমুদ্রপারের জন্যে আমরা কেঁদে বেড়াচ্ছি সে পারটা যে কত কাছে— এমন-কি, এপারের চেয়েও যে সে কাছে, সে কথা, যাঁরা জানেন, তাঁরা অত্যন্ত স্পষ্ট করেই বলেছেন। শুনলে হঠাৎ আমাদের চমক লাগে— মনে হয় এত কাছের কথাকেও আমরা এতই দূর করে জেনেছিলুম। একেই বলেছিলুম, অগম্য, অপার, অসাধ্য।

যাঁরা সমুদ্র পার হয়েছেন তাঁরা কী বলেন! তাঁরা বলেন, এষাস্য পরমাগতিঃ, এষাস্য পরমাসম্পৎ, এষোঽস্য পরমোলোকঃ, এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। এষঃ মানে ইনি— এই সামনেই যিনি, এই কাছেই যিনি আছেন। অস্য মানে ইহার— সেও খুব নিকটের ইহার। ইনিই হচ্ছেন ইহার পরম গতি। যিনি যার পরম গতি তিনি তার থেকে লেশমাত্র দূরে নেই। এতই কাছে যে তাঁকে ইনি বললেই হয়, তাঁর নাম করবারও দরকার নেই— "এই যে ইনি" বলা ছাড়া তাঁর আর কোনো পরিচয় দেবার প্রয়োজন হয় না। ইনিই হচ্ছেন ইহার সমস্তই। ইনি যে কে এবং ইহার যে কাহার সে আর বলাই হল না। সমুদ্রের এপারে যে আছে সে তো ওপারের লোককে এষঃ বলে না, ইনি বলে না।

ইনি হচ্ছেন ইহার পরমাগতি। আমরা যে চলি, আমাদের চালায় কে? আমরা মনে করি টাকা আমাদের চালায়, খ্যাতি আমাদের চালায়, মানুষ আমাদের চালায়; যিনি পার হয়েছেন তিনি বলেন ইনিই ইহার গতি— এঁর টানেই এ চলেছে— টাকার টান, খ্যাতির টান, মানুষের টান, সব টানের মধ্যে পরম টান হচ্ছে এঁর— সব টান যেতে পারে কিন্তু সে টান থেকেই যায়— কেননা সব যাওয়ার মধ্যেই তাঁর কাছে যাওয়ার তাগিদ রয়েছে। টাকাও বলে না তুমি এইখানেই থেকে যাও, খ্যাতিও বলে না, মানুষও বলে না— সবাই বলে তুমি চলো— যিনি পরমাগতি তিনিই গতি দিচ্ছেন, আর-কেউ যে পথের মধ্যে বরাবরের মতো আটক করে রাখবে এমন সাধ্য আছে কার?

আমরা হয়তো মনে করতে পারি পৃথিবী যে আমাকে টানছে সেটা পৃথিবীরই টান, কিন্তু তাই যদি হবে, পৃথিবীকে টানে কে? সূর্যকে কে আকর্ষণ করছে? এই যে বিশ্বব্যাপী আকর্ষণের জোরে গ্রহতারানক্ষত্রকে ঘোরাচ্ছে, কাউকে নিশ্চল থাকতে দিচ্ছে না। সেই বিরাট কেন্দ্রাকর্ষণের কেন্দ্র তো পৃথিবীতে নেই। একটি পরমাগতি আছে, যা আমারও গতি, পৃথিবীরও গতি, সূর্যেরও গতি।

এই পরমাগতির কথা স্মরণ করেই উপনিষৎ বলেছেন, "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"—কেই বা কোনোপ্রকারের কিছুমাত্র চেষ্টা করত যদি আকাশ পরিপূর্ণ করে সেই আনন্দ না থাকতেন। সেই আনন্দই বিশ্বকে অনন্তগতি দান করে রয়েছেন— আকাশপূর্ণ সেই আনন্দ আছেন বলেই আমার চোখের পাতাটি আমি খুলতে পারছি।

তাই আমি বলছি, আমার পরমাগতি দূরে নেই, আমার সকল তুচ্ছ গতির মধ্যেই সেই পরমাগতি আছেন। যেমন আপেল ফলটি মাটিতে পড়ার মধ্যেই বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রাকর্ষণশক্তি আছে। আমার শরীরের সকল চলা এবং আমার মনের সকল চেষ্টার যিনি পরমাগতি, তিনি হচ্ছেন এষঃ, এই ইনি।

সেই গতির কেন্দ্র দূরে নয়— এই যে এইখানেই।

তার পরে যিনি আমাদের পরম সম্পৎ, আমাদের পরম আশ্রয়, আমাদের পরম আনন্দ— তিনি আমাদের প্রতিদিনের সমস্ত সম্পদ, প্রতিদিনের সমস্ত আশ্রয় এবং প্রতিদিনের সমস্ত আনন্দের মধ্যেই রয়েছেন। আমাদের ধনজন, আমাদের ঘরদুয়ার, আমাদের সমস্ত রসভোগের মধ্যেই যিনি পরমরূপে রয়েছেন তিনি যে এষঃ তিনি যে ইনি— এই যে এইখানেই।

আমার সমস্ত গতিতে সেই পরম গতিকে, আমার সমস্ত সম্পদে সেই পরম সম্পদকে, আমার সমস্ত আশ্রয়ে সেই পরম আশ্রয়কে, আমার সমস্ত আনন্দেই সেই পরম আনন্দকে এষঃ বলে জানব— একেই বলে পার হওয়া।

১২ পৌষ

৩

দিন

প্রতিদিনই আলোক এবং অন্ধকার, নিদ্রা এবং জাগরণ, সংকোচন এবং প্রসারণের মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবন চলেছে— একবার তার জোয়ার একবার তার ভাঁটা। রাত্রে নিদ্রার সময় আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়-মনের শক্তি আমাদের নিজের মধ্যেই সংহৃত হয়ে আসে। সকালবেলায় সমস্ত জগতের দিকে ধাবিত হয়।

শক্তি যখন কেবল আমাদের নিজের মধ্যে সমাহৃত হয় সেই সময়েই কি আমরা নিজেকে বেশি করে জানি, বেশি করে পাই ? আর সকালে যখন আমাদের শক্তি অন্যের দিকে নানা পথে বিকীর্ণ হতে থাকে তখনই কি আমরা নিজেকে হারাই ?

ঠিক তার উলটো। কেবল নিজের মধ্যে যখন আমরা আসি তখন আমরা অচেতন, যখন সকলের দিকে যাই তখন আমরা জাগ্রত, তখনই আমরা নিজেকে জানি। যখন আমরা একা তখন আমরা কেউ নই।

আমাদের যথার্থ তাৎপর্য আমাদের নিজেদের মধ্যে নেই, তা জগতের সমস্তের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে— সেইজন্যে আমরা বুদ্ধি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, কর্ম দিয়ে কেবলই সমস্তকে খুঁজছি, কেবলই সমস্তের সঙ্গে যুক্ত হতে চাচ্ছি নইলে যে নিজেকে পাই নে। আত্মাকে সর্বত্র উপলব্ধি করব এই হচ্ছে আত্মার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

আপেল ফলের পতন-শক্তিকে যখন জ্ঞানী বিশ্বের সকল বস্তুর মধ্যেই দর্শন করলেন তখন তাঁর বুদ্ধি অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হল ; কারণ, সত্যকে সর্বত্র দেখলেই তার সত্যমূর্তি প্রকাশ পায় এবং সেই মূর্তিই আমাদের আনন্দ দান করে।

তেমনি আমরা আমাদের নিজেকে সর্বত্র ব্যাপ্ত দেখব এই হলেই নিজেকে সত্যরূপে দেখা হয়। নিজের এই সত্যকে যতই ব্যাপক করে জানব ততই আমাদের আনন্দ হবে। যে কেউ আমাদের আপনাকে তার নিজের ভিতর থেকে বাইরের দিকে টেনে নিয়ে তাকে আমাদের কাছে সত্যতররূপে প্রকাশ করে তাকেই আমরা আত্মীয় বলি, সেই আমাদের আনন্দ দেয়।

এই কারণেই মানবাত্মা বহু প্রাচীন যুগ হতে গৃহ বল, সমাজ বল, রাজ্য বল, যা কিছু সৃষ্টি করছে তার ভিতরকার একটি মাত্র মূল তাৎপর্য এই যে, মানুষ একাকিত্ব পরিহার করে বহুর মধ্যে বিচিত্রের মধ্যে আপনার নানা শক্তিকে নানা সম্বন্ধে বিস্তৃত করে দিয়ে নিজেকে বৃহৎক্ষেত্রে উপলব্ধি করবে—

এই তার যথার্থ সুখ। এইজন্যেই বলা হয়েছে "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি"— ভূমাই সুখ অল্পে সুখ নেই। তার কারণ, অল্পে আত্মাও অল্প হয়।

যে সমাজ সভ্য সেই সমাজ বহুকে বিচিত্রভাবে আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে বলেই সে সমাজের গৌরব। নইলে কেবল উপকরণবাহুল্য এবং সুবিধার সমাবেশ তার সার্থকতা নয়।

সভ্যসমাজে যেখানে জ্ঞান প্রেম ও কর্মচেষ্টা নিয়ত দূরপ্রসারিত ক্ষেত্রে সর্বদাই সচেষ্ট হয়ে আছে সেইখানে যে-মানুষ বাস করে সে ক্ষুদ্র হয়ে থাকে না। সে ব্যক্তির শক্তি অল্প হলেও সে শক্তি সহজেই নিজেকে সার্থক করবার অবকাশ পায়। এইজন্যেই সকলের যোগে ভূমার যোগে সভ্যসমাজবাসী প্রত্যেকেই যথাসম্ভব বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

যে সমাজ সভ্য নয় সে সমাজে স্বভাববলিষ্ঠ লোকও দুর্বল হয়ে থাকে, কারণ সে সমাজের লোকেরা আপনাকে যথেষ্ট পরিমাণে পায় না। সে সমাজে যে-সকল প্রতিষ্ঠান আছে সে কেবল ঘরের উপযোগী গ্রামের উপযোগী, ভূমার সঙ্গে যে-সকল সংকীর্ণ প্রতিষ্ঠানের যোগ নেই— সেখানে চিত্তসমুদ্রের জোয়ার এসে পৌঁছোয় না ; এইজন্যে সেখানে মানুষ নিজের সত্য নিজের গৌরব অনুভব করে শক্তিলাভ করতে পারে না, সে সর্বত্র পরাভূত হয়ে থাকে। তার দারিদ্র্যের অন্ত থাকে না।

এইজন্যেই আমাদের সভ্যতার সাধনা করতে হবে, রেলওয়ে টেলিগ্রাফের জন্যে নয়। কারণ রেলওয়ে টেলিগ্রাফেরও শেষ গম্যস্থান হচ্ছে মানুষ— কোনো স্থানীয় ইস্টেশন বিশেষ নয়।

এই সভ্যতা-সাধনার গোড়াকার কথাই হচ্ছে ধর্মবুদ্ধি। যতই আপনার প্রসার অল্প হয় ততই ধর্মবুদ্ধি অল্প হলেও চলে। নিজের ঘরে সংকীর্ণ জায়গায় যখন কাজ করি তখন ধর্মবুদ্ধি সংকীর্ণ হলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু যেখানে বহুলোককে বহুবন্ধনে বাঁধতে হয় সেখানে ধর্মবুদ্ধি প্রবল হওয়া চাই। সেখানে ধৈর্যবীর্য অধ্যবসায় ত্যাগ সেবাপরতা লোকহিতৈষা সমস্তই খুব বড়ো রকমের না হলে নয়। বস্তু কোনোমতেই বৃহৎ হয়ে উঠতে পারে না যদি তাকে ধরে রাখবার উপযোগী ধর্মও বৃহৎ না হয়— ধর্ম যখনই দুর্বল হয় তখনই বৃহৎ সমাজ বিশ্লিষ্ট হয়ে ভেঙে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে, কখনোই কেউ তাকে বাঁধতে পারে না।

অতএব যখনই বহুব্যাপারবিশিষ্ট বহুদূরব্যাপ্ত বহুশক্তিশালী কোনো সভ্যসমাজকে দেখব তখনই গোড়াতেই ধরে নিতে হবে তার ভিতরে একটি প্রবল ধর্মবুদ্ধি আছে— নইলে এতলোকের পরস্পরে বিশ্বাস পরস্পরে যোগ, এক মুহূর্তও থাকতে পারে না।

আমাদের দেশের সমাজেও সমস্ত ক্ষুদ্রতা বিচ্ছিন্নতা দূর করে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে ভূমার প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে মানবাত্মা কখনোই বলিষ্ঠ এবং আনন্দিত হতে পারবে না। সাধারণের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগ যতই নানা প্রকার আচারে বিচারে বাধা প্রাপ্ত হতে থাকবে ততই আমাদের নিরানন্দ, অক্ষমতা ও দারিদ্র্য কেবলই বেড়ে চলবে। আমাদের দেশে বহুর সঙ্গে ঐক্যযোগের নানা সুযোগ রচনা করতে না পারলে আমাদের মহত্ত্বের তপস্যা চলবে না।

সেই সুযোগ রচনা করবার জন্যে আমরা নানাদিক থেকে চেষ্টা করছি। কিন্তু ছোটো-বড়ো আমরা যা কিছু বেঁধে তুলতে চাচ্ছি তার মধ্যে যদি কেবলই বিশ্লিষ্টতা এসে পড়ছে এইটেই দেখা যায় তা হলে নিশ্চয়ই বুঝতে হবে গোড়ায় ধর্মবুদ্ধির দুর্বলতা আছে— নিশ্চয়ই সত্যের অভাব আছে, ত্যাগের কার্পণ্য আছে, ইচ্ছার জড়তা আছে ; নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার বল নেই এবং পূজার উপকরণ থেকে আমাদের আত্মাভিমান নিজের জন্য বৃহৎ অংশ চুরি করবার চেষ্টা করছে ; নিশ্চয়ই পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা রয়েছে, ক্ষমা নেই ; এবং মঙ্গলকেই মঙ্গলের চরম ফলরূপে গণ্য করতে না পারাতে আমাদের অধ্যবসায় ক্ষুদ্র বাধাতেই নিরস্ত হয়ে যাচ্ছে।

অতএব আমাদের সতর্ক হতে হবে। যেখানে কৃতকার্যতার বাধা ঘটবে সেখানে নির্বাক উপকরণের প্রতি দোষারোপ করে যেন নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা না-করি। পাপ আছে তাই বাঁধছে না, ধর্মের অভাব আছে তাই কিছুই ধরা যাচ্ছে না। এইজন্যেই আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষুদ্র হয়ে সর্ববিষয়েই নিষ্ফল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি— এইজন্যেই আমাদের জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান, প্রাণের সঙ্গে প্রাণ, চেষ্টার সঙ্গে চেষ্টা

সম্মিলিত হয়ে মানবাত্মার উপযুক্ত বিহারক্ষেত্র নির্মাণ করছে না— আমাদের আত্মা কোনোমতেই সেই বিশ্বকর্মা বিরাট পুরুষের সঙ্গে যুক্ত হবার যোগ্য নিজের বিরাট রূপ ধারণ করতে পারছে না।

১৩ পৌষ

রাত্রি

গতকল্য রাত্রি এবং দিন, নিদ্রা এবং জাগরণের একটি কথা বলা হয় নি। সেটাই হচ্ছে প্রধান কথা।

যখন আমরা জাগ্রত থাকি তখন আমাদের শক্তির সঙ্গে শক্তির লীলা ঘটে। বিশ্বকর্মার বিশ্বকর্মের সঙ্গে আমাদের কর্মের যোগসাধন হয়। যিনি "বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি"— তাঁরই সেই বহুবিভক্ত শক্তির বিচিত্র প্রবাহ-পথে আমাদের চেষ্টাকে চালন করে আমরা শক্তির আশ্চর্য গতিসকল আবিষ্কার করে আনন্দিত হই। এক সময়ে যেখানে মনে করেছিলুম শক্তির শেষ, চলতে গিয়ে দেখতে পাই সেখান থেকে পথ আবার একটা নূতন বাঁক নিয়েছে ; এমনি করে জগদ্ব্যাপারের সেই বহুধাশক্তির মধ্যে নিজের শক্তিকেও বহুধা করে দিয়ে তার সঙ্গে সকল দিকে সমান গতিলাভ করবার জন্যে আমাদের চিত্ত উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

এমনি করে আমাদের জাগ্রত চৈতন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি ও মানসশক্তির জালকে চতুর্দিকে নিক্ষেপ করে নানা বেগ নানা স্পর্শ, নানা লাভের দ্বারা নিজেকে সার্থক করে।

কিন্তু কেবলই জাল বাইচ করে তো জেলের চলে না। জালে গ্রন্থি পড়ে, জাল ছিঁড়ে আসে, জাল মলিন হয়। তখন আবার সেগুলো সংশোধন করে নেবার জন্যে জাল-বাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিতে হয়।

রাত্রে নিদ্রার সময় আমরা প্রাণের জাল-বাওয়া, চেতনার জাল-বাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিই। তখন সংশোধন ও ক্ষতি-পূরণের সময়। তখন আমাদের ছিন্নভিন্ন গ্রন্থিল মলিন জালটিকে তাঁর হাতে সমর্পণ করে দিতে হয় "য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ" যে পুরুষ, সকলে যখন সুপ্ত তখন জাগ্রত থেকে, প্রয়োজনসকলকে নির্মাণ করছেন।

অতএব একবার করে নিজের সমস্ত চেষ্টাকে সংবরণ করে সম্পূর্ণভাবে সেই বিশ্বপ্রাণের হাতে আমাদের প্রাণকে সমর্পণ করে দিতে হয়— সেই সময়ে আমরা গাছপালার সমান হয়ে যাই, প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের কোনো বিচ্ছেদ থাকে না, আমাদের অহংকারের একেবারে নিবৃত্তি হয়, তখনই আমরা নিখিলের অন্তর্বর্তী যে গভীর আরাম তাকেই লাভ করি। জেগে উঠে বুঝতে পারি যে, বিশ্রামকে আমরা এতক্ষণ কেবলমাত্র শূন্যতারূপে পাই নি, তা একটা পূর্ণ বস্তু, আমাদের নিশ্চেষ্টতা নিশ্চৈতন্যের মধ্যেও সে একটা আরাম— সেটা হচ্ছে বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির মূলগত আরাম— যে আরামের শ্যামল মূর্তি ও নির্বাক প্রকাশ আমরা শাখাপল্লবিত নিস্তব্ধ বনস্পতির মধ্যে দেখতে পাই।

এই যেমন আমাদের প্রাণকে প্রতি রাত্রে প্রকৃতির হাতে সমর্পণ করে দিয়ে আমরা প্রভাতে নূতন প্রাণচেষ্টার জন্যে পুনরায় প্রস্তুত হয়ে উঠি— তেমনি দিনের মধ্যে অন্তত একবার করে আমাদের আত্মাকে পরমাত্মার হাতে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে দেবার প্রয়োজন আছে— নইলে আবর্জনা জমে ওঠে, ভাঙাচোরাগুলো সারে না, তাপ বাড়তেই থাকে— কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলো তাদের প্রয়োজনকে অতিক্রম করে অন্তরে বাহিরে বিদ্রোহ রচনা করে।

সেইজন্যে প্রভাতে উপাসনার সময়ে আমাদের সকল চেষ্টাকে ক্ষান্ত করে সব রিপুকে শান্ত করে কিছুকালের জন্যে পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের আপনার পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপন করে নেওয়া দরকার— সেই সময়ে আমাদের অন্তরের মধ্যে পরমাত্মাকে সম্পূর্ণ পথ ছেড়ে দিতে হবে ; তা হলে সেই একান্ত আত্মবিসর্জনের সুগভীর শান্তির সুযোগে আমাদের মনের ব্যাধির মধ্যে স্বাস্থ্যের সঞ্চার হবে, সমস্ত

সংকোচন প্রসারিত হয়ে যাবে এবং হৃদয়গ্রন্থিগুলি শিথিল হয়ে আসবে।

তার পরে উপাসনাশান্ত সেই আমাদের অন্তরপ্রকৃতি যখন সংসারে বিচিত্রের মধ্যে বহুর মধ্যে বিভক্ত হয়ে ব্যাপ্ত হয়ে নানা আকারে প্রকারে আত্মোপলব্ধিতে প্রবৃত্ত হবে তখন সকল কাজে সে গম্ভীরভাবে পবিত্রভাবে নিযুক্ত হতে পারবে, তখন কথায় কথায় চতুর্দিককে সে আঘাত দিতে থাকবে না, তখন তার সমস্ত চেষ্টার মধ্যে শান্তি থাকবে। বিশাল বিশ্বের বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে যেমন একটি আশ্চর্য সামঞ্জস্য আছে, যেটি থাকাতে সমস্ত চেষ্টার মূর্তি শান্ত ও শক্তির মূর্তি সুন্দর হয়ে উঠেছে— যেটি থাকাতে বিশ্বজগৎ একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালা অথবা প্রকাণ্ড কারখানাঘরের মতো কঠোর আকার ধারণ করে নি— আমাদের চেষ্টার মধ্যে সেই সামঞ্জস্য থাকবে, আমাদের কর্মের মধ্যে সেই সৌন্দর্য ফুটে উঠবে। ঈশ্বর যেমন করে কাজ করেন, কিছুক্ষণ তার কাছে আমাদের সমস্ত অহংকারটি নিবৃত্ত করে দিয়ে তাঁর সেই পরম সুন্দর কৌশলটি শিখে নেব। আপনাকে তাঁর চরণ-প্রান্তে উপস্থিত করে দিয়ে বলব, জননী, প্রাতঃকালে এর উপরে তোমার নিপুণ হস্তটি একবার স্পর্শ করে দাও— তা হলে গতকল্যকার সংসারের আঘাতে এর উপরে যে-সকল ছিন্নতা এসেছে তা সমস্তই সেরে যাবে।

আমরা যদি প্রতিদিন দিবসারম্ভে তাঁর পবিত্র হস্তের স্পর্শ ললাটে গ্রহণ করে নিয়ে যাই এবং সে কথা যদি স্মরণ রাখি তবে ললাটকে আর ধূলিতে লুণ্ঠিত করতে পারব না। এই উপাসনার সুরটি যেন তানপুরার সুরের মতো আমাদের মধ্যে সমস্তদিন নিয়তই বাজতে থাকে— যাতে আমাদের প্রত্যেক কথাটি এবং ব্যবহারটিকে সেই সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে বিচার করতে পারি এবং সমস্ত দিনকে বিশুদ্ধ সংগীতে পরিণত করে সংসারের কর্মক্ষেত্রকে আনন্দক্ষেত্র করে তুলতে পারি।

১৪ পৌষ

প্রভাতে

প্রভাতের এই পবিত্র প্রশান্ত মুহূর্তে নিজের আত্মাকে পরমাত্মার মধ্যে একবার সম্পূর্ণ সমাবৃত করে দেখো, সমস্ত ব্যবধান দূর হয়ে যাক। নিমগ্ন হয়ে যাই, নিবিষ্ট হয়ে যাই, তিনি নিবিড়ভাবে আমাদের আত্মাকে গ্রহণ করেছেন এই উপলব্ধি দ্বারা একান্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠি।

নইলে আমাদের আপনার সত্য পরিচয় হয় না। ভূমার সঙ্গে যোগযুক্ত করে না দেখলে নিজেকে ক্ষুদ্র বলে ভ্রম হয়, নিজেকে দুর্বল বলে মিথ্যা ধারণা হয়। আমি যে কিছুমাত্র ক্ষুদ্র নই, অশক্ত নই, মানবসমাজে মহাপুরুষেরা তার প্রমাণ দিয়েছেন— তাঁদের যে সিদ্ধি সে আমাদের প্রত্যেকের সিদ্ধি— আমাদের প্রত্যেক আত্মার শক্তি তাঁদের মধ্যে প্রত্যক্ষ হয়েছে। বাতির উর্ধ্বভাগ যখন আলোকশিখা লাভ করেছে তখন সে লাভ সমস্ত বাতির। বাতির নিতান্ত নিম্ন ভাগেও সেই জ্বলবার ক্ষমতা রয়েছে— যখন সময় হবে সেও জ্বলবে— যখন সময় না হবে তখন সে উপরের জ্বলন্ত অংশকে ধারণ করে থাকবে। প্রতিদিন প্রভাতের উপাসনায় নিজের ভিতরকার মানবাত্মার সেই মাহাত্ম্যকে আমরা যেন একেবারে বাধামুক্ত করে দেখে নিতে পারি। নিজেকে দীন দরিদ্র বলে আমাদের যে ভ্রম আছে সেই ভ্রম যেন দূর করে যেতে পারি। আমরা যে কেবল ঘরের কোণে জন্মলাভ করেছি বলে একটা সংস্কার নিয়ে বসে আছি সেটা যেন ত্যাগ করে স্পষ্ট অনুভব করি ভূর্ভুবঃ স্বর্লোকে আমার এই শরীরের জন্ম, সেইজন্যে বহুলক্ষ যোজন দূর পথ হতে আমাদের জ্যোতিষ্ক কুটুম্বগণ আমাদের তত্ত্ব নেবার জন্যে আলোকের দূত পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আর আমার অহংকারটুকুর মধ্যেই যে আমার আত্মার চরম আবাস তা নয়— যে অধ্যাত্মলোকে তার স্থিতি সে হচ্ছে ব্রহ্মলোক। যে জগৎসভায় আমরা এসেছি এখানে রাজত্ব করবার আমাদের অধিকার, এখানে আমরা দাসত্ব করতে আসি নি। যিনি ভূমা তিনি স্বয়ং আমাদের ললাটে রাজটিকা পরিয়ে পাঠিয়েছেন। অতএব আমরা যেন নিজেকে অকুলীন বলে মাথা

হেঁট করে সংকুচিত হয়ে সংসারে সঞ্চরণ না করি— নিজের অনন্ত আভিজাত্যের গৌরবে নিজের উচ্চ স্থানটি যেন গ্রহণ করতে পারি।

আকাশের অন্ধকার যেমন নিতান্ত কাল্পনিক পদার্থের মতো দেখতে দেখতে কেটে গেল— আমাদের অন্তরপ্রকৃতির চার দিক থেকে সমস্ত মিথ্যা সংস্কার তেমনি করে মুহূর্তে কেটে যাক। আমাদের আত্মা উদয়োন্মুখ সূর্যের মতো আমাদের চিত্তগগনে তার বাধামুক্ত জ্যোতির্ময় স্বরূপে প্রকাশ পাক— তার উজ্জ্বল চৈতন্যে তার নির্মল আলোকে আমাদের সংসারক্ষেত্র সর্বত্র পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হোক।

১৫ পৌষ

বিশেষ

জগতের সর্বসাধারণের সঙ্গে সাধারণভাবে আমার মিল আছে— ধূলির সঙ্গে পাথরের সঙ্গে আমার মিল আছে, ঘাসের সঙ্গে গাছের সঙ্গে আমার মিল আছে ; পশুপক্ষীর সঙ্গে আমার মিল আছে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমার মিল আছে ; কিন্তু এক জায়গায় একেবারে মিল নেই— যেখানে আমি হচ্ছি বিশেষ। আমি যাকে আজ আমি বলছি এর আর কোনো দ্বিতীয় নেই। ঈশ্বরের অনন্ত বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে এ-সৃষ্টি সম্পূর্ণ অপূর্ব— এ কেবলমাত্র আমি, একলা আমি, অনুপম অতুলনীয় আমি। এই আমির যে জগৎ সে একলা আমারই জগৎ— সেই মহা বিজনলোকে আমার অন্তর্যামী ছাড়া আর কারও প্রবেশ করবার কোনো জো নেই।

হে আমার প্রভু, সেই যে একলা আমি, বিশেষ আমি, তার মধ্যে তোমার বিশেষ আনন্দ, বিশেষ আবির্ভাব আছে— সেই বিশেষ আবির্ভাবটি আর কোনো দেশে কোনো কালে নেই। আমার সেই বিশিষ্টতাকে আমি সার্থক করব প্রভু। আমি নামক তোমার সকল হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এই যে একটি বিশেষ লীলা আছে, এই বিশেষ লীলায় তোমার সঙ্গে যোগ দেব। এইখানে একের সঙ্গে এক হয়ে মিলব।

পৃথিবীর ক্ষেত্রে আমার এই মানবজন্ম তোমার সেই বিশেষ লীলাটিকে যেন সৌন্দর্যের সঙ্গে সংগীতের সঙ্গে পবিত্রতার সঙ্গে মহত্ত্বের সঙ্গে সচেতনভাবে বহন করে নিয়ে যায়। আমাতে তোমার যে একটি বিশেষ অধিষ্ঠান আছে সে কথা যেন কোনোদিন কোনোমতেই না ভোলে। অনন্ত বিশ্বসংসারে এই যে একটি আমি হয়েছি মানবজীবনে এই আমি সার্থক হোক।

এই আমিটিকে আর-সকল হতে স্বতন্ত্র করে অনাদিকাল থেকে তুমি বহন করে আনছ। সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারার মধ্যে দিয়ে একে হাতে ধরে নিয়ে এসেছ কিন্তু কারও সঙ্গে একে জড়িয়ে ফেল নি। কোন নীহারিকার জ্যোতির্ময় বাষ্পনির্ঝর থেকে অণুপরমাণুকে চালন করে কত পুষ্টি, কত পরিবর্তন, কত পরিণতির মধ্যে দিয়ে এই আমিকে আজ এই শরীরে ফুটিয়ে তুলেছ। তোমার সেই অনাদিকালের সঙ্গ আমার এই দেহটির মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে। অনাদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত অনন্ত সৃষ্টির মাঝখান দিয়ে একটি বিশেষ রেখাপাত হয়ে এসেছে সেটি হচ্ছে এই আমির রেখা— সেই রেখাপথে তোমার সঙ্গে আমি বরাবর চলে এসেছি। সেই তুমি আমার অনাদি পথের চালক, অনন্ত পথের অদ্বিতীয় বন্ধু তোমাকে আমার সেই একলা বন্ধুরূপে আমার জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করব। আর কোনো কিছুই তোমার সমান না হোক তোমার চেয়ে বড়ো না হোক। আর আমার এই যে সাধারণ জীবন যা নানা ক্ষুধাতৃষ্ণা চিন্তাচেষ্টা দ্বারা আমি সমস্ত তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে একত্রে মিলে ভোগ করছি সেইটেই নানাদিক দিয়ে প্রবল হয়ে না ওঠে, আমাতে তোমার যে একটি বিশেষ স্পর্শ, বিশেষ ক্রিয়া, বিশেষ আনন্দ অনন্তকালের সুহৃদ ও সারথিরূপে রয়েছে তাকে যেন আচ্ছন্ন করে না দাঁড়ায়। আমি যেখানে

জগতের শামিল সেখানে তোমাকে জগদীশ্বর বলে মানি, তোমার সব নিয়ম পালন করবার চেষ্টা করি, না পালন করলে তোমার শাস্তি গ্রহণ করি— কিন্তু আমিরূপে তোমাকে আমি আমার একমাত্র বলে জানতে চাই সেইখানে তুমি আমাকে স্বাধীন করে দিয়েছ— কেননা স্বাধীন না হলে প্রেম সার্থক হবে না, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলবে না, লীলার সঙ্গে লীলার যোগ হতে পারবে না। এইজন্যে এই স্বাধীনতার আমি-ক্ষেত্রেই আমার সব দুঃখের চেয়ে পরম দুঃখ তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ অর্থাৎ অহংকারের দুঃখ, আর, সব সুখের চেয়ে পরম সুখ তোমার সঙ্গে মিলন, অর্থাৎ প্রেমের সুখ। এই অহংকারের দুঃখ কেমন করে ঘুচবে সেই ভেবেই বুদ্ধ তপস্যা করেছিলেন এবং এই অহংকারের দুঃখ কেমন করে ঘোচে সেই জানিয়েই খৃষ্ট প্রাণ দিয়েছিলেন। হে পুত্র হতে প্রিয়, বিত্ত হতে প্রিয়, হে অন্তরতম প্রিয়তম, এই আমিনিকেতনেই যে তোমার চরমলীলা। সেইজন্যেই তো এইখানেই এত নিদারুণ দুঃখ এবং সে দুঃখের এমন অপরিসীম অবসান—. সেইজন্যেই তো এইখানেই মৃত্যু— এবং অমৃত সেই মৃত্যুর বক্ষ বিদীর্ণ করে উৎসারিত হচ্ছে। এই দুঃখ ও সুখ, বিচ্ছেদ ও মিলন, অমৃত ও মৃত্যু, এই তোমার দক্ষিণ ও বাম দুই বাহু, এর মধ্যে সম্পূর্ণ ধরা দিয়ে যেন বলতে পারি, আমার সব মিটেছে, আমি আর কিছুই চাই নে।

১৬ পৌষ ১৩১৫

প্রেমের অধিকার

কাল রাত্রে এই গানটা আমার মনের মধ্যে বাজছিল—

নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও।
মাঝে কিছু রেখো না, থেকো না দূরে।
নির্জনে সজনে অন্তরে বাহিরে নিত্য তোমারে হেরিব,
সব বাধা ভাঙিয়া দাও।

কিন্তু এ কেমন প্রার্থনা। এ প্রেম কার সঙ্গে মানুষ কেমন করে এ কথা কল্পনাতে এনেছে এবং মুখে উচ্চারণ করেছে যে বিশ্বভুবনেশ্বরের সঙ্গে তার প্রেম হবে।

বিশ্বভুবন বলতে কতখানি বোঝায় এবং তার তুলনায় একজন মানুষ যে কত ক্ষুদ্র সে কথা মনে করলে যে মুখ দিয়ে কথা সরে না। সমস্ত মানুষের মধ্যে আমি ক্ষুদ্র, আমার সুখ-দুঃখ কতই অকিঞ্চিৎকর। সৌরজগতের মধ্যে সেই মানুষ এক মুষ্টি বালুকার মতো যৎসামান্য— এবং সমস্ত নক্ষত্রলোকের মধ্যে এই সৌরজগতের স্থান এত ছোটো যে অঙ্কের দ্বারা তার গণনা করা দুঃসাধ্য।

সেই-সমস্ত অগণ্য অপরিচিত লোকলোকান্তরের অধিবাসী এই মুহূর্তেই সেই বিশ্বেশ্বরের মহারাজ্যে তাদের অভাবনীয় জীবনযাত্রা বহন করছে। এমন সকল জ্যোতিষ্কলোক অনন্ত আকাশের গভীরতার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে রয়েছে যার আলোক যুগযুগান্তর হতে অবিশ্রাম যাত্রা করে আজও আমাদের দূরবীক্ষণ ক্ষেত্রে এসে প্রবেশ করে নি। সেই-সমস্ত অজ্ঞাত অদৃশ্য লোকও সেই পরমপুরুষের পরমশক্তির উপরে প্রতিমুহূর্তেই একান্ত নির্ভর করে রয়েছে, আমরা তার কিছুই জানি নে।

এমন যে অচিন্তনীয় ব্রহ্মাণ্ডের পরমেশ্বর— তাঁরই সঙ্গে এই কণার কণা, অণুর অণু, বলে কিনা প্রেম করবে! অর্থাৎ, তাঁর রাজসিংহাসনে তাঁর পাশে গিয়ে বসবে! অনন্ত আকাশের নক্ষত্রে নক্ষত্রে তাঁর জগৎযজ্ঞের হোমহুতাশন যুগযুগান্তর জ্বলছে, আমি সেই যজ্ঞক্ষেত্রের অসীম জনতার একটি প্রান্তে দাঁড়িয়ে কোন্ দাবির জোরে দ্বারীকে বলছি এই যজ্ঞেশ্বরের এক শয্যায় আমাকে আসন দিতে হবে!

বড়ো হয়ে ওঠবার জন্যে মানুষের আকাঙ্ক্ষার সীমা নেই এ কথা জানা কথা। শুনেছি নাকি আলেকজান্ডার এমনি ভাবে কথা বলেছিলেন যে একটা পৃথিবী জয় করে তাঁর সুখ হচ্ছে না, আর

একটা পৃথিবী যদি থাকত তবে তিনি জয়যাত্রায় বেরোতেন। দুবেলা যার অন্ন জোটে না সেও কুবেরের ভাণ্ডারের স্বপ্ন দেখে। মানুষের আকাঙক্ষা যে কোনো কল্পনাকেই অসম্ভব বলে মানে না এমন প্রমাণ অনেক আছে।

মানুষ জগদীশ্বরের সঙ্গে প্রেম করতে চায় এও কি তার সেই অত্যাকাঙক্ষারই একটা চরম উন্মত্ততা? তার অহংকারেরই একটা অশান্ত পরিচয়?

কিন্তু এর মধ্যে তো অহংকারের লক্ষণ নেই। তাঁর প্রেমের জন্যে যে লোক খেপেছে— সে যে নিজেকে দীন করে— সকলের পিছনে সে যে দাঁড়ায় এবং যাঁরা ঈশ্বরের প্রেমের দরবারের দরবারি তাঁদের পায়ের ধুলো পেলেও সে যে বাঁচে। কোনো ক্ষমতা কোনো ঐশ্বর্যের কাঙাল সে নয়— সমস্তই সে যে ত্যাগ করবার জন্যেই প্রস্তুত হয়েছে।

সেইজন্যেই জগৎসৃষ্টির মধ্যে এইটেই সকলের চেয়ে আশ্চর্য বলে আমার মনে হয় যে, মানুষ তাঁর প্রেম চায়— এবং সকল প্রেমের চেয়ে সেইটেকেই বড়ো সত্য, বড়ো লাভ বলে চায়। কেন চায়? কেননা মানুষ যে অধিকার পেয়েছে। এই প্রেমের দাবি যিনি জন্মিয়ে দিয়েছেন তাঁরই সঙ্গে যে প্রেম এতে আর ভয় লজ্জা কিসের।

তিনি যে আমাকে একটি বিশেষ আমি করে তুলে সমস্ত জগৎ থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন এইখানেই যে আমার সকলের চেয়ে বড়ো দাবি— সমস্ত সূর্য চন্দ্র তারার চেয়ে বড়ো দাবি। সর্বত্র বিশ্বের ভারাকর্ষণের টান আছে, আমার এই স্বাতন্ত্র্যটুকুর উপর তার কোনো টান নেই। যদি থাকত তা হলে সে যে একে ধূলিরাশির সঙ্গে মিশিয়ে এক করে দিত।

প্রকাণ্ড জগতের চাপ এই আমিটুকুর উপর নেই বলেই এই আমিটি নিজের গৌরব রক্ষা করে কেমন মাথা তুলে চলেছে। পুরাণে বলে কাশী সমস্ত পৃথিবীর বাইরে। বস্তুত আমিই সেই কাশী; আমি জগতের মাঝখান থেকে সমস্ত জগতের বাইরে।

সেইজন্যেই জগতের সঙ্গে নিজেকে ওজন করে ক্ষুদ্র বললে তো চলবে না। তার সঙ্গে আমি তো তুলনীয় নই।

আমি যে একজন বিশেষ আমি। আমাতে তাঁর শাসন নেই, আমাতে তাঁর বিশেষ আনন্দ। সেই আনন্দের উপরেই আমি আছি, বিশ্বনিয়মের উপরে নেই, এইজন্যেই এই আমির ব্যাপারটি একেবারে সৃষ্টিছাড়া। এইজন্যেই এই পরমাশ্চর্য আমির দিকেই তাকিয়ে উপনিষৎ বলে গিয়েছেন "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।" বলেছেন, এই আমি আর তিনি, সমান বৃক্ষের ডালে দুই পাখির মতো, দুই সখা একেবারে পাশাপাশি বসে আছেন।

তাঁর জগতের রাজ্যে আমাকে খাজনা দিতে হয়; এই জলস্থল আকাশ-বাতাসের অনেক রকমের ট্যাক্‌স আছে সমস্তই আমাকে কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিতে হয়— যেখানে কিছু দেনা পড়ে সেইখানেই প্রাণ বেরিয়ে যায়। কিন্তু আমার এই আমিটুকু একেবারে লাখেরাজ, ঐখানেই বন্ধুর মন্দির কিনা. আমার সঙ্গে তাঁর কথা এই যে, তুমি ইচ্ছা করে আমাকে যা দেবে তাই নেব— যদি না দাও তবু আমার যা দেবার তার থেকে বঞ্চিত করব না।

এমন যদি না হত তবে তাঁর জগৎরাজ্যের একলা রাজা হয়ে তাঁর আনন্দ কী হত। কোথাও যাঁর কোনো সমান নেই তিনি কী ভয়ংকর একলা, কী অনন্ত একলা। তিনি ইচ্ছা করে কেবল প্রেমের জোরে এই একাধিপত্য এক জায়গায় পরিত্যাগ করেছেন। তিনি আমার এই আমিটুকুর কুঞ্জবনে বিশেষ করে নেমে এসেছেন— বন্ধু হয়ে আপনি ধরা দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, "আমার চন্দ্র সূর্যের সঙ্গে তোমার নিজের দামের হিসাব করতে হবে না। কেননা ওজন দরে তোমার দাম নয়। তোমার দাম আমার আনন্দের মধ্যে— তোমার সঙ্গেই আমার বিশেষ প্রেম বলেই তুমি তুমি হয়েছ।"

এইখানেই আমার এত গৌরব যে তাঁকে সুদ্ধ আমি অস্বীকার করতে পারি। বলতে পারি আমি তোমাকে চাই নে। সে কথা তাঁর ধূলি জলকে বলতে গেলে তারা সহ্য করে না, তারা তখনই আমাকে মারতে আসে। কিন্তু তাঁকে যখন বলি, তোমাকে আমি চাই নে, আমি টাকা চাই, খ্যাতি চাই— তিনি

বলেন আচ্ছা বেশ। বলে চুপ করে সরে বসে থাকেন।

এ দিকে কখন এক সময়ে হুঁশ হয় যে আমার আত্মার যে নিভৃত নিকেতন, সেখানকার চাবি তো আমার খাতাঞ্জির হাতে নেই— টাকাকড়ি ধনদৌলত তো সেখানে কোনোমতে পৌঁছোয় না। ফাঁক থেকেই যায়। সেখানকার সেই একলা ঘরটি জগতের আর একটি মহান একলা ছাড়া কেউ কোনোমতেই ভরাতে পারে না। যেদিন বলতে পারব আমার টাকায় কাজ নেই, খ্যাতিতে কাজ নেই, কিছুতেই কাজ নেই, তুমি এসো ; যেদিন বলতে পারব চন্দ্রসূর্যহীন আমার এই একলা ঘরটিতে তুমি আমার আর আমি তোমার, সেই দিন আমার বরশয্যায় বর এসে বসবেন— সেই দিন আমার আমি সার্থক হবে।

সেদিন একটি আশ্চর্য ব্যাপার এই ঘটবে যে, নিজেকে যতই দীন বলে জানব তাঁর প্রেমকে ততই বড়ো করে বুঝব। তাঁর প্রেমের ঐশ্বর্যের উপলব্ধিতে তাঁর প্রেমকেই অনন্ত বলে জানব নিজেকে বড়ো করে দাঁড়াব না। জ্ঞান পেলে নিজেকে জ্ঞানী বলে গর্ব হয় কিন্তু প্রেম পেলে নিজেকে অধম বলে জেনেও আনন্দ হয়। পাত্র যতই গভীররূপে শূন্য হয় সুধারসে ভরে উঠলে ততই সে বেশি করে পূর্ণ হয়। এইজন্যে প্রেম যখন লাভ করি তখন নিজেকে বড়ো করে জানাবার কোনো ইচ্ছাই হয় না— বরঞ্চ নিজের অত্যন্ত দীনতা নিজেকে অত্যন্ত সুখ দেয়— তখন তাঁর লীলার ভিতরকার একটি মস্ত বিরোধের সার্থকতা বুঝতে পারি এবং সেই বিরোধকে স্বীকার করে আনন্দের সঙ্গে বলতে পারি যে, জগতে আমি যতই ক্ষুদ্র যতই দীন দুর্বল নিজের আমি-নিকেতনে তাঁর প্রেমের দ্বারা আমি ততই পরিপূর্ণ, ততই কৃতার্থ। আমি অনন্ত ভাবে দীন বলেই দুর্বল বলেই তাঁর অনন্ত প্রেমের দ্বারা ধন্য হয়েছি।

১৭ পৌষ

ইচ্ছা

সকালবেলা থেকেই আমার সংসারের কথা ভাবতে আরম্ভ করেছি কেননা, এ যে আমার সংসার। আমার ইচ্ছাটুকুই হচ্ছে এই সংসারের কেন্দ্র। আমি কী চাই কী না চাই, আমি কাকে রাখব কাকে ছাড়ব সেই কথাকে মাঝখানে নিয়েই আমার সংসার।

আমাকে বিশ্বভুবনের ভাবনা ভাবতে হয় না। আমার ইচ্ছার দ্বারা সূর্য উঠছে না, বায়ু বইছে না, অণুপরমাণুতে মিলন হয়ে বিচ্ছেদ হয়ে সৃষ্টিরক্ষা হচ্ছে না। কিন্তু আমি নিজের ইচ্ছাশক্তিকে মূলে রেখে যে সৃষ্টি গড়ে তুলছি তার ভাবনা আমাকে সকলের চেয়ে বড়ো ভাবনা করেই ভাবতে হয় কেননা সেটা যে আমারই ভাবনা।

তাই এত বড়ো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপারের ঠিক মাঝখানে থেকেও আমার এই অতি ছোটো সংসারের অতি ছোটো কথা আমার কাছে ছোটো বলে মনে হয় না। আমার প্রভাতের সামান্য আয়োজন চেষ্টা প্রভাতের সুমহৎ সূর্যোদয়ের সম্মুখে লেশমাত্র লজ্জিত হয় না ; এমন-কি, তাকে অনায়াসে বিস্মৃত হয়ে চলতে পারে।

এই তো দেখতে পাচ্ছি দুইটি ইচ্ছা পরস্পর সংলগ্ন হয়ে কাজ করছে। একটি হচ্ছে বিশ্ব-জগতের ভিতরকার ইচ্ছা, আর-একটি আমার এই ক্ষুদ্র জগতের ভিতরকার ইচ্ছা। রাজা তো রাজত্ব করেন আবার তাঁর অধীনস্থ তালুকদার, সেও সেই মহারাজ্যের মাঝখানেই আপনার রাজত্বটুকু বসিয়েছে। তার মধ্যেও রাজৈশ্বর্যের সমস্ত লক্ষণ আছে— কেননা ঐ ক্ষুদ্র সীমাটুকুর মধ্যে তার ইচ্ছা তার কর্তৃত্ব বিরাজমান।

এই যে আমাদের আমি জগতের মধ্যে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে রাজা করে দিয়েছেন— যে

একটা পৃথিবী যদি থাকত তবে তিনি জয়যাত্রায় বেরোতেন। দুবেলা যার অন্ন জোটে না সেও কুবেরের ভাণ্ডারের স্বপ্ন দেখে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা যে কোনো কল্পনাকেই অসম্ভব বলে মানে না এমন প্রমাণ অনেক আছে।

মানুষ জগদীশ্বরের সঙ্গে প্রেম করতে চায় এও কি তার সেই অত্যাকাঙ্ক্ষারই একটা চরম উন্মত্ততা? তার অহংকারেরই একটা অশান্ত পরিচয়?

কিন্তু এর মধ্যে তো অহংকারের লক্ষণ নেই। তাঁর প্রেমের জন্যে যে লোক খেপেছে— সে যে নিজেকে দীন করে— সকলের পিছনে সে যে দাঁড়ায় এবং যাঁরা ঈশ্বরের প্রেমের দরবারের দরবারি তাঁদের পায়ের ধুলো পেলেও সে যে বাঁচে। কোনো ক্ষমতা কোনো ঐশ্বর্যের কাঙাল সে নয়— সমস্তই সে যে ত্যাগ করবার জন্যেই প্রস্তুত হয়েছে।

সেইজন্যেই জগৎসৃষ্টির মধ্যে এইটেই সকলের চেয়ে আশ্চর্য বলে আমার মনে হয় যে, মানুষ তাঁর প্রেম চায়— এবং সকল প্রেমের চেয়ে সেইটেকেই বড়ো সত্য, বড়ো লাভ বলে চায়। কেন চায়? কেননা মানুষ যে অধিকার পেয়েছে। এই প্রেমের দাবি যিনি জন্মিয়ে দিয়েছেন তাঁরই সঙ্গে যে প্রেম এতে আর ভয় লজ্জা কিসের।

তিনি যে আমাকে একটি বিশেষ আমি করে তুলে সমস্ত জগৎ থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন এইখানেই যে আমার সকলের চেয়ে বড়ো দাবি— সমস্ত সূর্য চন্দ্র তারার চেয়ে বড়ো দাবি। সর্বত্র বিশ্বের ভারাকর্ষণের টান আছে, আমার এই স্বাতন্ত্র্যটুকুর উপর তার কোনো টান নেই। যদি থাকত তা হলে সে যে একে ধূলিরাশির সঙ্গে মিশিয়ে এক করে দিত।

প্রকাণ্ড জগতের চাপ এই আমিটুকুর উপর নেই বলেই এই আমিটি নিজের গৌরব রক্ষা করে কেমন মাথা তুলে চলেছে। পুরাণে বলে কাশী সমস্ত পৃথিবীর বাইরে। বস্তুত আমিই সেই কাশী। আমি জগতের মাঝখান থেকে সমস্ত জগতের বাইরে।

সেইজন্যেই জগতের সঙ্গে নিজেকে ওজন করে ক্ষুদ্র বললে তো চলবে না। তার সঙ্গে আমি তো তুলনীয় নই।

আমি যে একজন বিশেষ আমি। আমাতে তাঁর শাসন নেই, আমাতে তাঁর বিশেষ আনন্দ। সেই আনন্দের উপরেই আমি আছি, বিশ্বনিয়মের উপরে নেই, এইজন্যেই এই আমির ব্যাপারটি একেবারে সৃষ্টিছাড়া। এইজন্যেই এই পরমাশ্চর্য আমির দিকেই তাকিয়ে উপনিষৎ বলে গিয়েছেন "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।" বলেছেন, এই আমি আর তিনি, সমান বৃক্ষের ডালে দুই পাখির মতো, দুই সখা একেবারে পাশাপাশি বসে আছেন।

তাঁর জগতের রাজ্যে আমাকে খাজনা দিতে হয়; এই জলস্থল আকাশ-বাতাসের অনেক রকমের ট্যাক্স আছে সমস্তই আমাকে কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিতে হয়— যেখানে কিছু দেনা পড়ে সেইখানেই প্রাণ বেরিয়ে যায়। কিন্তু আমার এই আমিটুকু একেবারে লাখেরাজ, ঐখানেই বন্ধুর মন্দির কিনা, আমার সঙ্গে তাঁর কথা এই যে, তুমি ইচ্ছা করে আমাকে যা দেবে তাই নেব— যদি না দাও তবু আমার যা দেবার তার থেকে বঞ্চিত করব না।

এমন যদি না হত তবে তাঁর জগৎরাজ্যের একলা রাজা হয়ে তাঁর আনন্দ কী হত। কোথাও যাঁর কোনো সমান নেই তিনি কী ভয়ংকর একলা, কী অনন্ত একলা। তিনি ইচ্ছা করে কেবল প্রেমের জোরে এই একাধিপত্য এক জায়গায় পরিত্যাগ করেছেন। তিনি আমার এই আমিটুকুর কুঞ্জবনে বিশেষ করে নেমে এসেছেন— বন্ধু হয়ে আপনি ধরা দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, "আমার চন্দ্র সূর্যের সঙ্গে তোমার নিজের দামের হিসাব করতে হবে না। কেননা ওজন দরে তোমার দাম নয়। তোমার দাম আমার আনন্দের মধ্যে— তোমার সঙ্গেই আমার বিশেষ প্রেম বলেই তুমি তুমি হয়েছ।"

এইখানেই আমার এত গৌরব যে তাঁকে সুদ্ধ আমি অস্বীকার করতে পারি। বলতে পারি আমি তোমাকে চাই নে। সে কথা তাঁর ধূলি জলকে বলতে গেলে তারা সহ্য করে না, তারা তখনই আমাকে মারতে আসে। কিন্তু তাঁকে যখন বলি, তোমাকে আমি চাই নে, আমি টাকা চাই, খ্যাতি চাই— তিনি

বলেন আচ্ছা বেশ। বলে চুপ করে সরে বসে থাকেন।

এ দিকে কখন এক সময়ে হুঁশ হয় যে আমার আত্মার যে নিভৃত নিকেতন, সেখানকার চাবি তো আমার খাতাঞ্জির হাতে নেই— টাকাকড়ি ধনদৌলত তো সেখানে কোনোমতে পৌঁছোয় না। ফাঁক থেকেই যায়। সেখানকার সেই একলা ঘরটি জগতের আর একটি মহান একলা ছাড়া কেউ কোনোমতেই ভরাতে পারে না। যেদিন বলতে পারব আমার টাকায় কাজ নেই, খ্যাতিতে কাজ নেই, কিছুতেই কাজ নেই, তুমি এসো ; যেদিন বলতে পারব চন্দ্রসূর্যহীন আমার এই একলা ঘরটিতে তুমি আমার আর আমি তোমার, সেই দিন আমার বরশয্যায় বর এসে বসবেন— সেই দিন আমার আমি সার্থক হবে।

সেদিন একটি আশ্চর্য ব্যাপার এই ঘটবে যে, নিজেকে যতই দীন বলে জানব তাঁর প্রেমকে ততই বড়ো করে বুঝব। তাঁর প্রেমের ঐশ্বর্যের উপলব্ধিতে তাঁর প্রেমকেই অনন্ত বলে জানব নিজেকে বড়ো করে দাঁড়াব না। জ্ঞান পেলে নিজেকে জ্ঞানী বলে গর্ব হয় কিন্তু প্রেম পেলে নিজেকে অধম বলে জেনেও আনন্দ হয়। পাত্র যতই গভীররূপে শূন্য হয় সুধারসে ভরে উঠলে ততই সে বেশি করে পূর্ণ হয়। এইজন্যে প্রেম যখন লাভ করি তখন নিজেকে বড়ো করে জানাবার কোনো ইচ্ছাই হয় না— বরঞ্চ নিজের অত্যন্ত দীনতা নিজেকে অত্যন্ত সুখ দেয়— তখন তাঁর লীলার ভিতরকার একটি মস্ত বিরোধের সার্থকতা বুঝতে পারি এবং সেই বিরোধকে স্বীকার করে আনন্দের সঙ্গে বলতে পারি যে, জগতে আমি যতই ক্ষুদ্র যতই দীন দুর্বল নিজের আমি-নিকেতনে তাঁর প্রেমের দ্বারা আমি ততই পরিপূর্ণ, ততই কৃতার্থ। আমি অনন্ত ভাবে দীন বলেই দুর্বল বলেই তাঁর অনন্ত প্রেমের দ্বারা ধন্য হয়েছি।

১৭ পৌষ

ইচ্ছা

সকালবেলা থেকেই আমার সংসারের কথা ভাবতে আরম্ভ করেছি কেননা, এ যে আমার সংসার। আমার ইচ্ছাটুকুই হচ্ছে এই সংসারের কেন্দ্র। আমি কী চাই কী না চাই, আমি কাকে রাখব কাকে ছাড়ব সেই কথাকে মাঝখানে নিয়েই আমার সংসার।

আমাকে বিশ্বভুবনের ভাবনা ভাবতে হয় না। আমার ইচ্ছার দ্বারা সূর্য উঠছে না, বায়ু বইছে না, অণুপরমাণুতে মিলন হয়ে বিচ্ছেদ হয়ে সৃষ্টিরক্ষা হচ্ছে না। কিন্তু আমি নিজের ইচ্ছাশক্তিকে মূলে রেখে যে সৃষ্টি গড়ে তুলছি তার ভাবনা আমাকে সকলের চেয়ে বড়ো ভাবনা করেই ভাবতে হয় কেননা সেটা যে আমারই ভাবনা।

তাই এত বড়ো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপারের ঠিক মাঝখানে থেকেও আমার এই অতি ছোটো সংসারের অতি ছোটো কথা আমার কাছে ছোটো বলে মনে হয় না। আমার প্রভাতের সামান্য আয়োজন চেষ্টা প্রভাতের সুমহৎ সূর্যোদয়ের সম্মুখে লেশমাত্র লজ্জিত হয় না ; এমন-কি, তাকে অনায়াসে বিস্মৃত হয়ে চলতে পারে।

এই তো দেখতে পাচ্ছি দুইটি ইচ্ছা পরস্পর সংলগ্ন হয়ে কাজ করছে। একটি হচ্ছে বিশ্ব-জগতের ভিতরকার ইচ্ছা, আর-একটি আমার এই ক্ষুদ্র জগতের ভিতরকার ইচ্ছা। রাজা তো রাজত্ব করেন আবার তাঁর অধীনস্থ তালুকদার, সেও সেই মহারাজ্যের মাঝখানেই আপনার রাজত্বটুকু বসিয়েছে। তার মধ্যেও রাজৈশ্বর্যের সমস্ত লক্ষণ আছে— কেননা ঐ ক্ষুদ্র সীমাটুকুর মধ্যে তার ইচ্ছা তার কর্তৃত্ব বিরাজমান।

এই যে আমাদের আমি জগতের মধ্যে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে রাজা করে দিয়েছেন— যে

লোক রাস্তার ধুলো ঝাঁট দিচ্ছে সেও তার আমি-অধিকারের মধ্যে স্বয়ং সর্বশ্রেষ্ঠ— এ কথার আলোচনা পূর্বে হয়ে গেছে। যিনি ইচ্ছাময় তিনি আমাদের প্রত্যেককে একটি করে ইচ্ছার তালুক দান করেছেন— দানপত্রে আছে "যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ" আমরা একে ভোগ করতে পারব।

আমাদের এই চিরন্তন ইচ্ছার অধিকার নিয়ে আমরা এক-একবার অহংকারে উন্মত্ত হয়ে উঠি। বলি যে, আমার নিজের ইচ্ছা ছাড়া আর কাউকেই মানি নে— এই বলে সকলকে লঙ্ঘন করার দ্বারাই আমার ইচ্ছা যে স্বাধীন এইটে আমরা স্পর্ধার সঙ্গে অনুভব করতে চাই।

কিন্তু ইচ্ছার মধ্যে আর একটি তত্ত্ব আছে— স্বাধীনতায় তার চরম সুখ নয়। শরীর যেমন শরীরকে চায়, মন যেমন মনকে চায়, বস্তু যেমন বস্তুকে আকর্ষণ করে— ইচ্ছা তেমনি ইচ্ছাকে না চেয়ে থাকতে পারে না। অন্য ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত না হতে পারলে এই একলা ইচ্ছা আপনার সার্থকতা অনুভব করে না। যেখানে কেবলমাত্র প্রয়োজনের কথা সেখানে জোর খাটানো চলে— জোর করে খাবার কেড়ে খেয়ে ক্ষুধা মেটে। কিন্তু ইচ্ছা যেখানে প্রয়োজনহীন,যেখানে'অহেতুকভাবে সে নিজের বিশুদ্ধ স্বরূপে থাকে, সেখানে সে যা চায় তাতে একেবারেই জোর খাটে না, কারণ, সেখানে সে ইচ্ছাকেই চায়। সেখানে কোনো বস্তু, কোনো উপকরণ, কোনো স্বাধীনতার গর্ব, কোনো ক্ষমতা তার ক্ষুধা মেটাতে পারে না— সেখানে সে আর-একটি ইচ্ছাকে চায়। সেখানে সে যদি কোনো উপহার সামগ্রীকে গ্রহণ করে তবে সেটাকে সামগ্রী বলে গ্রহণ করে না— যে ব্যক্তি দান করেছে তারই ইচ্ছার নিদর্শন বলে গ্রহণ করে— তার ইচ্ছারই দামে এর দাম। মাতার সেবা যে ছেলের কাছে এত মূল্যবান সে তো কেবল সেবা বলেই মূল্যবান নয়, মাতার ইচ্ছা বলেই তার এত গৌরব; দাসের দাসত্ব নিয়ে আমার ইচ্ছার আকাঙ্ক্ষা মেটে না— বন্ধুর ইচ্ছাকৃত আত্মসমর্পণের জন্যেই সে পথ চেয়ে থাকি।

এমনি করে ইচ্ছা যেখানে অন্য ইচ্ছাকে চায় সেখানে সে আর স্বাধীন থাকে না। সেখানে নিজেকে তার খর্ব করতেই হয়। এমন-কি, তাকে আমরা বলি ইচ্ছা বিসর্জন দেওয়া। ইচ্ছার এই যে অধীনতা এমন অধীনতা আর নেই। দাসতম দাসকেও আমরা কাজে প্রবৃত্ত করতে পারি কিন্তু তার ইচ্ছাকে সমর্পণ করতে বাধ্য করতে পারি নে।

আমার যে সংসারে আমার ইচ্ছাই হচ্ছে মূল কর্তা সেখানে আমার একটা সর্বপ্রধান কাজ হচ্ছে অন্যের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা সম্মিলিত করা। যত তা করতে পারব ততই আমার ইচ্ছার রাজ্য বিস্তৃত হতে থাকবে— আমার সংসার ততই বৃহৎ হয়ে উঠবে। সেই গৃহিণীই হচ্ছে যথার্থ গৃহিণী যে পিতামাতা ভাইবোন স্বামীপুত্র দাসদাসী পাড়া প্রতিবেশী সকলের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে সুসংগত করে আপনার সংসারকে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য গঠিত করে তুলতে পারে। এমন গৃহিণীকে সর্বদাই নিজের ইচ্ছাকে খাটো করতে হয়, ত্যাগ করতে হয়, তবেই তার এই ইচ্ছাধিষ্ঠিত রাজ্যটি সম্পূর্ণ হয়। সে যদি সকলের সেবক না হয় তবে সে কর্ত্রী হতেই পারে না।

তাই বলছিলুম আমাদের যে ইচ্ছার মধ্যে স্বাধীনতার সকলের চেয়ে বিশুদ্ধ স্বরূপ, সেই ইচ্ছার মধ্যেই অধীনতারও সকলের চেয়ে বিশুদ্ধ মূর্তি। ইচ্ছা যে অহংকারের মধ্যে আপনাকে স্বাধীন বলে প্রকাশ করেই সার্থক হয় তা নয়, ইচ্ছা প্রেমের মধ্যে নিজেকে অধীন বলে স্বীকার করাতেই চরম সার্থকতা লাভ করে। ইচ্ছা আপনাকে উদ্যত করে নিজের যে ঘোষণা করে তাতেই তার শেষ কথা থাকে না, নিজেকে বিসর্জন করার মধ্যেই তার পরম শক্তি, চরম লক্ষ্য নিহিত।

ইচ্ছার এই যে স্বাভাবিক ধর্ম যে অন্য ইচ্ছাকে সে চায়, কেবল জোরের উপরে তার আনন্দ নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যেও সে ধর্ম আমরা দেখতে পাচ্ছি। তিনি ইচ্ছাকে চান। এই চাওয়াটুকু সত্য হবে বলেই তিনি আমার ইচ্ছাকে আমারই করে দিয়েছেন— বিশ্বনিয়মের জালে একে একেবারে নিঃশেষে বেঁধে ফেলেন নি— বিশ্বসাম্রাজ্যে আর সমস্তই তাঁর ঐশ্বর্য, কেবল ঐ একটি জিনিস তিনি নিজে রাখেন নি— সেটি হচ্ছে আমার ইচ্ছা— ঐটি তিনি কেড়ে নেন না— চেয়ে নেন, মন ভুলিয়ে নেন। ঐ একটি জিনিস আছে যেটি আমি তাঁকে সত্যই দিতে পারি। ফুল যদি দিই সে তাঁরই ফুল, জল যদি দিই সে তাঁরই জল— কেবল ইচ্ছা যদি সমর্পণ করি তো সে আমারই ইচ্ছা বটে।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর আমার সেই ইচ্ছাটুকুর জন্যে প্রতিদিন যে আমার দ্বারে আসছেন আর যাচ্ছেন তার নানা নিদর্শন আছে। এইখানে তিনি তাঁর ঐশ্বর্য খর্ব করেছেন, কেননা এখানেই তাঁর প্রেমের লীলা। এইখানে নেমে এসেই তাঁর প্রেমের সম্পদ প্রকাশ করেছেন— আমারও ইচ্ছার কাছে তাঁর ইচ্ছাকে সংগত করে তাঁর অনন্ত ইচ্ছাকে প্রকাশ করেছেন— কেননা ইচ্ছার কাছে ছাড়া, ইচ্ছার চরম প্রকাশ হবে কোথায়? তিনি বলছেন, রাজখাজনা নয়, আমাকে প্রেম দাও।

তোমাকে প্রেম দিতে হবে বলেই তো তুমি এত কাণ্ড করেছ। আমার মধ্যে এই এক অদ্ভুত আমির লীলা ফেঁদে বসেছ— এবং আমাকে এই একটি ইচ্ছার সম্পদ দিয়ে সেটি পাবার জন্যে আমার কাছেও হাত পেতে দাঁড়িয়েছ।

১৮ পৌষ

সৌন্দর্য

ঈশ্বর সত্যং। তাঁর সত্যকে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। সত্যকে এতটুকুমাত্র স্বীকার না করলে আমাদের নিষ্কৃতি নেই। সুতরাং অমোঘ সত্যকে আমরা জলে স্থলে আকাশে সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু তিনি তো শুধু সত্য নন— তিনি "আনন্দরূপমমৃতং"। তিনি আনন্দরূপ, অমৃতরূপ। সেই তাঁর আনন্দরূপকে দেখছি কোথায়?

আমি পূর্বেই আভাস দিয়েছি আনন্দ স্বভাবতই মুক্ত। তার উপরে জোর খাটে না, হিসাব চলে না। এই কারণে আমরা যেদিন আনন্দের উৎসব করি সেদিন প্রতিদিনের বাঁধা নিয়মকে শিথিল করে দিই— সেদিন স্বার্থকে শিথিল করি, প্রয়োজনকে শিথিল করি, আত্মপরের ভেদকে শিথিল করি, সংসারের কঠিন সংকোচকে শিথিল করি— তবেই ঘরের মাঝখানে এমন একটুখানি ফাঁকা জায়গা তৈরি হয় যেখানে আনন্দের প্রকাশ সম্ভবপর। সত্য বাঁধনকেই মানে, আনন্দ বাঁধন মানে না।

এইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিতে সত্যের মূর্তি দেখতে পাই নিয়মে, এবং আনন্দের মূর্তি দেখি সৌন্দর্যে। এইজন্য সত্যরূপের পরিচয় আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক, আনন্দরূপের পরিচয় আমাদের না হলেও চলে। প্রভাতে সূর্যোদয়ে আলো হয়, এই কথাটা জানা এবং এটাকে ব্যবহারে লাগানো আমাদের নিতান্ত দরকার; কিন্তু প্রভাত যে সুন্দর সুপ্রশান্ত, এটুকু না জানলে আমাদের কোনো কাজের কোনো ক্ষতিই হয় না।

জল স্থল আকাশ আমাদের নানা বন্ধনে বদ্ধ করছে কিন্তু এই জল স্থল আকাশে নানা বর্ণে গন্ধে গীতে সৌন্দর্যের যে বিপুল বিচিত্র আয়োজন সে আমাদের কিছুতে বাধ্য করে না, তার দিকে না তাকিয়ে চলে গেলে সে আমাদের অরসিক বলে গালিও দেয় না।

অতএব দেখতে পাচ্ছি, জগতের সত্যলোকে আমরা বদ্ধ, সৌন্দর্যলোকে আমরা স্বাধীন। সত্যকে যুক্তির দ্বারা অখণ্ডনীয়রূপে প্রমাণ করতে পারি, সৌন্দর্যকে আমাদের স্বাধীন আনন্দ ছাড়া আর কিছুর দ্বারাই প্রমাণ করবার জো নেই। যে ব্যক্তি তুড়ি দিয়ে বলে "ছাই তোমার সৌন্দর্য" মহাবিশ্বের লক্ষ্মীকেও তার কাছে একেবারে চুপ করে যেতে হয়। কোনো আইন নেই, কোনো পেয়াদা নেই যার দ্বারা এই সৌন্দর্যকে সে দায়ে পড়ে মেনে নিতে পারে।

অতএব জগতে ঈশ্বরের এই যে অপরূপ রহস্যময় সৌন্দর্যের আয়োজন, এ আমাদের কাছে কোনো মাসুল কোনো খাজনা আদায় করে না, এ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে চায়— বলে, আমাতে তোমার আনন্দ হোক; তুমি স্বত আমাকে গ্রহণ করো।

তাই আমি বলছিলুম, আমাদের অন্তরাত্মার আমি-ক্ষেত্রের একটা সৃষ্টিছাড়া নিকেতনে সেই আনন্দময়ের যে যাতায়াত আছে, জগৎ জুড়ে তার নিদর্শন পড়ে রয়েছে। আকাশের নীলিমায়, বনের

শ্যামলতায়, ফুলের গন্ধে সর্বত্রই তাঁর সেই পায়ের চিহ্ন ধরা পড়েছে যে। সেখানে যদি তিনি রাজবেশ ধরে আসতেন তা হলে জোড়হাত করে তাঁকে মানতুম— কিন্তু তিনি যে বন্ধুর বেশে ধীরপদে আসেন, একেবারে একলা আসেন, সঙ্গে তাঁর পদাতিকগুলো শাসনদণ্ড হাতে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে কেউ আসে না— সেইজন্যে পাপ ঘুম ভাঙতেই চায় না, দরজা বন্ধই থাকে।

কিন্তু এমন করলে তো চলবে না— শাসনের দায় নেই বলেই লক্ষ্মীছাড়া যদি প্রেমের দায় স্বেচ্ছার সঙ্গে স্বীকার না করে তবে জন্মজন্ম সে কেবল দাস, দাসানুদাস হয়েই ঘুরে মরবে। মানবজন্ম যে আনন্দের জন্ম, সে খবরটা সে যে একেবারে পাবেই না। ওরে, অন্তরের যে নিভৃততম আবাসে চন্দ্রসূর্যের দৃষ্টি পৌঁছোয় না, যেখানে কোনো অন্তরঙ্গ মানুষেরও প্রবেশপথ নেই, যেখানে কেবল একলা তাঁরই আসন পাতা সেইখানকার দরজাটা খুলে দে, আলো জ্বেলে তোল্। যেমন প্রভাতে সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তাঁর আলোক আমাকে সর্বাঙ্গে পরিবেষ্টন করে আছে, যেন ঠিক তেমনি প্রত্যক্ষ বুঝতে পারি, তাঁর আনন্দ, তাঁর ইচ্ছা, তাঁর প্রেম আমার জীবনকে সর্বত্র নীরন্ধ্র নিবিড়ভাবে পরিবৃত করে আছে। তিনিও পণ করে বসে আছেন তাঁর এই আনন্দমূর্তি তিনি আমাদের জোর করে দেখাবেন না— বরঞ্চ তিনি প্রতিদিনই ফিরে ফিরে যাবেন, বরঞ্চ তাঁর এই জগৎজোড়া সৌন্দর্যের আয়োজন প্রতিদিন আমার কাছে ব্যর্থ হবে তবু তিনি এতটুকু জোর করবেন না। যেদিন আমার প্রেম জাগবে সেদিন তাঁর প্রেম আর লেশমাত্র গোপন থাকবে না। কেন যে আমি "আমি" হয়ে এতদিন এত দুঃখে দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরেছি, সেদিন সেই বিরহদুঃখের রহস্য এক মুহূর্তেই ফাঁস হয়ে যাবে।

১৯ পৌষ

প্রার্থনার সত্য

কেউ কেউ বলেন, উপাসনায় প্রার্থনার কোনো স্থান নেই— উপাসনা কেবলমাত্র ধ্যান। ঈশ্বরের স্বরূপকে মনে উপলব্ধি করা।

সে কথা স্বীকার করতে পারতুম যদি জগতে আমরা ইচ্ছার কোনো প্রকাশ না দেখতে পেতুম। আমরা লোহার কাছে প্রার্থনা করি নে, পাথরের কাছে প্রার্থনা করি নে— যার ইচ্ছাবৃত্তি আছে তার কাছেই প্রার্থনা জানাই।

ঈশ্বর যদি কেবল সত্যস্বরূপ হতেন, কেবল অব্যর্থ নিয়মরূপে তাঁর প্রকাশ হত তা হলে তাঁর কাছে প্রার্থনার কথা আমাদের কল্পনাতেও উদিত হতে পারত না। কিন্তু তিনি নাকি "আনন্দরূপমমৃতং", তিনি নাকি ইচ্ছাময়, প্রেমময়, আনন্দময়, সেইজন্যে কেবলমাত্র বিজ্ঞানের দ্বারা তাঁকে আমরা জানি নে, ইচ্ছার দ্বারাই তাঁর ইচ্ছাস্বরূপকে আনন্দস্বরূপকে জানতে হয়।

পূর্বেই বলেছি জগতে ইচ্ছার একটি নিদর্শন পেয়েছি সৌন্দর্যে। এই সৌন্দর্য আমাদের ইচ্ছাকে জাগ্রত করে এবং ইচ্ছার উপরেই তার নির্ভর। এইজন্য আমরা সৌন্দর্যকে উপকরণরূপে ব্যবহার করি প্রেমের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নয়। এই জন্য আমাদের সজ্জা, সংগীত, সৌগন্ধ্য সেইখানেই, যেখানে ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার যোগ, আনন্দের সঙ্গে আনন্দের মিলন। জগদীশ্বর তাঁর জগতে এই অনাবশ্যক সৌন্দর্যের এমন বিপুল আয়োজন করেছেন বলেই আমাদের হৃদয় বুঝেছে, জগৎ একটি মিলনের ক্ষেত্র— নইলে এখানকার এত সাজসজ্জা একেবারেই বাহুল্য।

জগতে হৃদয়েরও একটা বোঝবার বিষয় আছে, সে কথা একেবারে উড়িয়ে দিলে চলবে কেন? একদিকে আলোক আছে বলেই আমাদের চক্ষু আছে; একদিকে সত্য আছে বলেই আমাদের চৈতন্য আছে— একদিকে জ্ঞান আছে বলেই আমাদের বুদ্ধি আছে; তেমনি আর একদিকে কী আছে আমাদের মধ্যে হৃদয় হচ্ছে যার প্রতিরূপ? উপনিষৎ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন— "রসো বৈ সঃ।"

তিনিই হচ্ছেন রস— তিনিই আনন্দ।

পূর্বেই আভাস দিয়েছি, আমরা শক্তির দ্বারা প্রয়োজন সাধন করতে পারি, যুক্তির দ্বারা জ্ঞান লাভ করতে পারি কিন্তু আনন্দের সম্বন্ধে শক্তি এবং যুক্তি কেবল দ্বার পর্যন্ত এসে ঠেকে যায়— তাদের বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এই আনন্দের সঙ্গে একেবারে অন্তঃপুরের সম্বন্ধ হচ্ছে ইচ্ছার। আনন্দে কোনোরকম জোর খাটে না— সেখানে কেবল ইচ্ছা, কেবল খুশি।

আমার মধ্যে এই ইচ্ছার নিকেতন হচ্ছে হৃদয়। আমার সেই ইচ্ছাময় হৃদয় কি শূন্যে প্রতিষ্ঠিত! তার পুষ্টি হচ্ছে মিথ্যায়, তার গম্য স্থান হচ্ছে ব্যর্থতার মধ্যে? তবে এই অদ্ভুত উপসর্গটা এল কোথা থেকে, এক মুহূর্ত আছে কোন্ উপায়ে। জগতের মধ্যে কি কেবল একটি মাত্রই ফাঁকি আছে। এবং সেই ফাঁকিটিই আমার এই হৃদয়?

কখনোই নয়। আমাদের এই ইচ্ছা-রসময় হৃদয়টি জগদ্‌ব্যাপী ইচ্ছারসের নাড়ির সঙ্গে বাঁধা— সেইখান থেকেই সে আনন্দরস পেয়ে বেঁচে আছে— না পেলে তার প্রাণ বেরিয়ে যায়— সে অন্নবস্ত্র চায় না, বিদ্যাসাধ্য চায় না, অমৃত চায়, প্রেম চায়। যা চায় তা ক্ষুদ্ররূপে সংসারে এবং চরমরূপে তাঁতে আছে বলেই চায়— নইলে কেবল রুদ্ধদ্বারে মাথা-খুঁড়ে মরবার জন্যে তার সৃষ্টি হয় নি।

অতএব হৃদয় আপনাকে জানে বলেই নিশ্চয় জানে তার একটি পরিপূর্ণ কৃতার্থতা অনন্তের মধ্যে আছে। ইচ্ছা কেবল তার দিকেই আছে তা নয়, অন্যদিকেও আছে— অন্যদিকে না থাকলে সে নিমেষকালও থাকত না— এতটুকু কণামাত্রও থাকত না যাতে নিশ্বাসপ্রশ্বাসরূপ প্রাণের ক্রিয়াটুকুও চলতে পারে। সেইজন্যেই উপনিষৎ এত জোর করে বলেছেন, "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ, এস হ্যেবানন্দয়তি" কেই বা শরীরের চেষ্টা করত, কেই বা প্রাণধারণ করত, যদি আকাশে এই আনন্দ না থাকতেন— ইনিই আনন্দ দেন।

ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার মাঝখানে দৌত্যসাধন করে প্রার্থনা। দুই ইচ্ছার মাঝখানে যে বিচ্ছেদ আছে সেই বিচ্ছেদের উপরে ব্যাকুলবেশে দাঁড়িয়ে আছে ঐ প্রার্থনা-দূতী। এইজন্যে অসাধারণ সাহসের সঙ্গে বৈষ্ণব বলেছেন যে, জগতের বিচিত্র সৌন্দর্যে ভগবানের বাঁশির যে নানা সুর বেজে উঠছে সে কেবল আমাদের জন্যে তাঁর প্রার্থনা— আমাদের হৃদয়কে তিনি এই অনির্বচনীয় সংগীতে ডাক দিয়ে চাচ্ছেন, সেইজন্যেই তো এই সৌন্দর্য-সংগীত আমাদের হৃদয়ের বিরহবেদনাকে জাগিয়ে তোলে।

সেই ইচ্ছাময় এমনি মধুরস্বরে যেখানে আমাদের ইচ্ছাকে চাচ্ছেন, সেখানে তাঁর সমস্ত জোরকে একেবারে সংবরণ করেছেন— যে প্রচণ্ড জোরে তিনি সৌরজগৎকে সূর্যের সঙ্গে অমোঘরূপে বেঁধে দিয়েছেন সেই জোরের লেশমাত্র এখানে নেই— সেইজন্যে এমন করুণ, এমন মধুর সুরে এমন নানা বিচিত্র রসে বাঁশি বাজছে— আহ্বানের আর অন্ত নেই।

তাঁর এমন আহ্বানে আমাদেরও মনের প্রার্থনা কি জাগবে না? সে কি তার বিরহের ধূলি-আসনে লুটিয়ে কেঁদে উঠবে না? অসত্য অন্ধকার এবং মৃত্যুর নিরানন্দ নির্বাসন থেকে অভিসারযাত্রার সময়ে এই প্রার্থনাদূতীই কি তার কম্পিত দীপশিখাটি নিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে চলবে না?

যতদিন আমাদের হৃদয়ে আছে, যতদিন প্রেমস্বরূপ ভগবান তাঁর নানাসৌন্দর্য দ্বারা এই জগৎকে আনন্দনিকেতন করে সাজাচ্ছেন, ততদিন তাঁর সঙ্গে মিলন না হলে মানুষের বেদনা ঘুচবে কী করে? ততদিন কোন্ সন্দেহকঠোর জ্ঞানাভিমান মানুষের প্রার্থনাকে অপমানিত করে ফিরিয়ে দিতে পারে।

এই আমাদের প্রার্থনাটি যে বিশ্বমানবের অন্তরের পঙ্কশয্যা থেকে ব্যাকুল শতদলের মতো তার সমস্ত জলরাশির আবরণ ঠেলে আলোকের অভিমুখে মুখ তুলছে— তার সমস্ত সৌগন্ধ্য এবং শিশিরাশ্রুসিক্ত সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে বলছে— "অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।" মানবহৃদয়ের এই পরিপূর্ণ প্রার্থনার পূজোপহারটিকে মোহ বলে তিরস্কৃত করতে পারে এত বড়ো নিদারুণ শুষ্কতা কার আছে?

২০ পৌষ

৭।।৩৭

বিধান

এই ইচ্ছা প্রেম আনন্দের কথাটা উঠলেই তার উলটো কথাটা এসে মনের মধ্যে আঘাত করতে থাকে। সে বলে, তবে এত শাসন বন্ধন কেন? যা চাই তা পাই নে কেন, যা চাই নে তা ঘাড়ে এসে পড়ে কেন?

এইখানে মানুষ তর্কের দ্বারা নয়, কেবলমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা এর উত্তর দিতে চেষ্টা করছে। সে বলছে, "স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা।"

অর্থাৎ যিনি আমাকে প্রকাশ করেছেন, "স এব বন্ধুঃ" তিনি তো আমার বন্ধু হবেনই। আমাতে যদি তাঁর আনন্দ না থাকত তবে তো আমি থাকতুমই না। আবার "স বিধাতা"। বিধাতা আর দ্বিতীয় কেউ নয়— যিনি জনিতা তিনিই বন্ধু, বিধানকর্তাও তিনি— অতএব বিধান যাই হোক, মূলে কোনো ভয় নেই।

কিন্তু বিধান জিনিসটা তো খামখেয়ালি হলে চলে না; আজ একরকম, কাল অন্যরকম— আমার পক্ষে একরকম, অন্যের পক্ষে অন্যরকম— কখন কী রকম তার কোনো স্থিরতা নেই, এ তো বিধান নয়। বিধান যে বিশ্ববিধান।

এই বিধানের অবিচ্ছিন্ন সূত্রে এই পৃথিবীর ধূলি থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত এক সঙ্গে গাঁথা রয়েছে। আমার সুখ সুবিধার জন্য যদি বলি, তোমার বিধানের সূত্র এক জায়গায় ছিন্ন করে দাও— এক জায়গায় অন্য সকলের সঙ্গে আমার নিয়মের বিশেষ পার্থক্য করে দাও, তা হলে বস্তুত বলা হয় যে, এই কাদাটুকু পার হতে আমার কাপড়ে দাগ লাগছে অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডের মনিহারের ঐক্যসূত্রটিকে ছিঁড়ে সমস্ত সূর্যতারাকে রাস্তায় ছড়িয়ে ফেলে দাও।

এই বিধান জিনিসটা কারও একলার নয় এবং কোনো একখণ্ড সময়ের নয়— এই বিশ্ববিধানের যোগেই সমষ্টির সঙ্গে আমরা প্রত্যেকে যুক্ত হয়ে আছি এবং কোনো কালে সে যোগের বিচ্ছেদ নেই। উপনিষৎ বলেছেন, যিনি বিশ্বের প্রভু, তিনি "যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ" তিনি নিত্যকাল হতে এবং নিত্যকালের জন্য সমস্তই যথাতথরূপে বিধান করছেন। এই বিধানের মূলে শাশ্বতকাল— এ বিধান অনাদি অনন্তকালের বিধান; তার পরে আবার, এই বিধান যাথাতথ্যতঃ বিহিত হচ্ছে— এর আদ্যোপান্তই যথাতথা— কোথাও ছেদ নেই, অসংগতি নেই। আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্র বিশ্ববিধান সম্বন্ধে এর চেয়ে জোর করে এবং পরিষ্কার করে কিছু বলে নি।

কিন্তু শুধু তাই যদি হয়, যদি কেবল অমোঘ নিয়মের লৌহ-সিংহাসনে তিনি কেবল বিধাতারূপেই বসে থাকেন তা হলে তো সেই বিধাতার সামনে আমরা কাঠ-পাথর ধূলি-বালিরই সমান হই। তা হলে তো আমরা শিকলে বাঁধা বন্দী।

কিন্তু তিনি শুধু তো বিধাতা নন, "স এব বন্ধুঃ"— তিনিই যে বন্ধু।

বিধাতার প্রকাশ তো বিশ্বচরাচরে দেখছি, বন্ধুর প্রকাশ কোন্‌খানে? বন্ধুর প্রকাশ তো নিয়মের ক্ষেত্র নয়— সে প্রকাশ আমার অন্তরের মধ্যে প্রেমের ক্ষেত্রে ছাড়া আর কোথায় হবে?

বিধাতার কর্মক্ষেত্র এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে— আর বন্ধুর আনন্দনিকেতন আমার জীবাত্মায়।

মানুষ একদিকে প্রকৃতি আর-একদিকে আত্মা— একদিকে রাজার খাজনা জোগায় আর-একদিকে বন্ধুর ডালি সাজায়। একদিকে সত্যের সাহায্যে তাকে মঙ্গল পেতে হয়, আর-একদিকে মঙ্গলের ভিতর দিয়ে তাকে সুন্দর হয়ে উঠতে হয়।

ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে নিয়মরূপে প্রকাশ পায় সেইদিকে প্রকৃতি— আর ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে আনন্দরূপে প্রকাশ পায় সেইদিকে আত্মা। এই প্রকৃতির ধর্ম বন্ধন— আর আত্মার ধর্ম মুক্তি। এই সত্য এবং আনন্দ, এই বন্ধন এবং মুক্তি তাঁর বাম এবং দক্ষিণ বাহু। এই দুই বাহু দিয়েই তিনি মানুষকে ধরে রেখেছেন।

যেদিকে আমি ইঁট কাঠ গাছ পাথরের সমান সেই সাধারণ দিকে ঈশ্বরের সর্বব্যাপী নিয়ম

কোনোমতেই আমাকে সাধারণ থেকে লেশমাত্র তফাত হতে দেয় না— আর যেদিকে আমি বিশেষ ভাবে আমি সেই স্বাতন্ত্র্যের দিকে ঈশ্বরের বিশেষ আনন্দ কোনোমতেই আমাকে সকলের সঙ্গে মিলে যেতে দেয় না। বিধাতা আমাকে সকলের করেছেন আর বন্ধু আমাকে আপনার করেছেন— সেই সকলের সামগ্রী আমার প্রকৃতি, আর সেই তাঁর আপনার সামগ্রী আমার জীবাত্মা।

২১ পৌষ

তিন

প্রকৃতির দিকে নিয়ম, আর আমাদের আত্মার দিকে আনন্দ। নিয়মের দ্বারাই নিয়মের সঙ্গে এবং আনন্দের দ্বারাই আনন্দের সঙ্গে আমাদের যোগ হতে পারে।

এইজন্যে যেদিকে আমি সর্বসাধারণের, যেদিকে আমি বিশ্বপ্রকৃতির, যেদিকে আমি মানবপ্রকৃতির, সেদিকে যদি আমি নিজেকে নিয়মের অনুগত না করি, তা হলে আমি কেবলই ব্যর্থ হই এবং অশান্তির সৃষ্টি করি। একটি ধূলিকণার কাছ থেকেও আমি ভুলিয়ে কাজ আদায় করতে পারি নে— তার নিয়ম আমি মানলে তবেই সে আমার নিয়ম মানে।

এইজন্যে আমাদের প্রথম শিক্ষা হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম শিক্ষা এবং নিজেকে নিয়মের অনুগত করতে শেখা। এই শিক্ষার দ্বারাই আমরা সত্যের পরিচয় লাভ করি।

এই শিক্ষাটির পরিণাম যিনি, তিনিই হচ্ছেন "শান্তম্"। যেখানেই নিয়মের ভ্রষ্টতা, যেখানেই নিয়মের সঙ্গে নিয়মের যোগ হয় নি, সেইখানেই অশান্তি। যেখানেই পরিপূর্ণ যোগ হয়েছে সেখানেই শান্তম্ যিনি, তাঁর পরিপূর্ণ উপলব্ধি।

প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের কোন্ স্বরূপ দেখতে পাই? তাঁর শান্তস্বরূপ। সেখানে, যারা ক্ষুদ্র করে দেখে তারা প্রয়াসকে দেখে, যারা বৃহৎ করে দেখে তারা শান্তিকেই দেখতে পায়। যদি নিয়ম ছিন্ন হত, যদি নিয়ম শাশ্বত এবং যথাতথ না হত, তা হলে মুহূর্তের মধ্যে এই বিপুল বিশ্বশান্তি ধ্বংস হয়ে একটি অর্থহীন পরিণামহীন প্রলয়ের প্রচণ্ড নৃত্য আরম্ভ হত, তা হলে বিশ্বসংসারে বিরোধই জয়ী হয়ে তার নখদন্ত দিয়ে সমস্ত ছিন্নভিন্ন করে ফেলত। কিন্তু চেয়ে দেখো, সূর্যনক্ষত্রলোকের প্রবল উত্তেজনার মধ্যে অটল নিয়মাসনে মহাশান্তি বিরাজ করছেন। সত্যের স্বরূপই হচ্ছে শান্তম্।

সত্য শান্তম্ বলেই শিবম্। শান্তম্ বলেই তিনি সকলকে ধারণ করেন, রক্ষা করেন, সকলেই তাঁতে ধ্রুব আশ্রয় পেয়েছে। আমরাও যেখানে সংযত না হয়েছি অর্থাৎ যেখানে সত্যকে জানি নি এবং সত্যের সঙ্গে সত্যরক্ষা করে চলি নি সেখানে আমাদের অন্তরে বাহিরে অশান্তি এবং সেই অশান্তিই অমঙ্গল— নিয়মের সঙ্গে নিয়মের বিচ্ছেদই অশিব।

যিনি শিবম্ তাঁর মধ্যেই অদ্বৈতম্ প্রকাশমান। সত্য যেখানে শিবস্বরূপ, সেইখানেই তিনি আনন্দময়, প্রেমময়, সেইখানেই তাঁর সকলের সঙ্গে মিলন। মঙ্গলের মধ্যে ছাড়া মিলন নেই— অমঙ্গলই হচ্ছে বিরোধ বিচ্ছেদের অপদেবতা।

একদিকে সত্য অন্যদিকে আনন্দ, মাঝখানে মঙ্গল। তাই এই মঙ্গলের মধ্যে দিয়েই আমাদের আনন্দলোকে যেতে হয়।

আমাদের দেশে যে তিন আশ্রম ছিল— ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ, তা ঈশ্বরের এই তিন স্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত। শান্তস্বরূপ, শিবস্বরূপ, অদ্বৈতস্বরূপ।

ব্রহ্মচর্যের দ্বারা জীবনে শান্তস্বরূপকে লাভ করলে তবে গৃহধর্মের মধ্যে শিবস্বরূপকে উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয়— নতুবা গার্হস্থ্য অকল্যাণের আকর হয়ে ওঠে। সংসারে সেই মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করতে হলেই স্বার্থবৃত্তিসকল সম্পূর্ণ পরাহত হয় এবং যথার্থ মিলনের ধর্ম যে কিরূপ নির্মল আত্মবিসর্জনের

উপরে স্থাপিত তা আমরা বুঝতে পারি। যখন তা সম্পূর্ণ বুঝি তখনই যিনি অদ্বৈতম্ সেই ঐক্যরূপী পরমাত্মার সঙ্গে সর্বপ্রকার বাধাহীন প্রেমের মিলন সম্ভবপর হয়। আরম্ভে সত্যের পরিচয়, মধ্যে মঙ্গলের পরিচয়, পরিণামে আনন্দের পরিচয়। প্রথমে জ্ঞান, পরে কর্ম, পরে প্রেম।

এইজন্যে যেমন আমাদের ধ্যানের মন্ত্র 'শান্তম শিবম অদ্বৈতম'— তেমনি আমাদের প্রার্থনার মন্ত্র "অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।" অসত্য হতে সত্যে, পাপ হতে পুণ্যে এবং আসক্তি হতে প্রেমে নিয়ে যাও। তবেই হে প্রকাশ, তুমি আমার প্রকাশ হবে, তবেই হে রুদ্র, আমার জীবনে তুমি প্রসন্ন হয়ে উঠবে।

সত্যে শেষ নয়, মঙ্গলে শেষ নয়, অদ্বৈতেই শেষ। জগৎপ্রকৃতিতে শেষ নয়, সমাজপ্রকৃতিতেও শেষ নয়, পরমাত্মাতেই শেষ, এই হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের বাণী— এই বাণীটিকে জীবনে যেন সার্থক করতে পারি এই আমাদের প্রার্থনা হোক।

২১ পৌষ

পার্থক্য

ঈশ্বর যে কেবল মানুষকেই পার্থক্য দান করেছেন আর প্রকৃতির সঙ্গে মিলে এক হয়ে রয়েছেন, একথা বললে চলবে কেন? প্রকৃতির সঙ্গেও তাঁর একটি স্বাতন্ত্র্য আছে নইলে প্রকৃতির উপরে তাঁর যে কোনো ক্রিয়া চলত না।

তফাত এই যে, মানুষ জানে সে স্বতন্ত্র— শুধু তাই নয়, সে এও জানে যে ঐ স্বাতন্ত্র্যে তার অপমান নয়, তার গৌরব। বাপ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেকে নিজের তহবিল থেকে একটি স্বতন্ত্র তহবিল করে দেন তখন এই পার্থক্যের দ্বারা তাকে তিরস্কৃত করেন না— বস্তুত এই পার্থক্যেই তাঁর একটি বিশেষ স্নেহ প্রকাশ পায় এবং এই পার্থক্যের মহাগৌরবটুকু মানুষ কোনোমতেই ভুলতে পারে না।

মানুষ নিজের সেই স্বাতন্ত্র্য-গৌরবের অধিকারটি নিয়ে নিজে ব্যবহার করছে। প্রকৃতির মধ্যে সেই অহংকার নেই, সে জানে না সে কী পেয়েছে।

ঈশ্বর এই প্রকৃতিকে কী দিয়ে পৃথক করে দিয়েছেন। নিয়ম দিয়ে।

নিয়ম দিয়ে না যদি পৃথক করে দিতেন তা হলে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর ইচ্ছার যোগ থাকত না। একাকার হয়ে থাকলে ইচ্ছার গতিবিধির পথ থাকে না।

যে লোক দাবাবড়ে খেলায় নিজের ইচ্ছাকে প্রয়োগ করতে চায় সে প্রথমে নিজের ইচ্ছাকে বাধা দেয়। কেমন করে? নিয়ম রচনা করে। প্রত্যেক ঘুঁটিকে সে নিয়মে বদ্ধ করে দেয়। এই যে নিয়ম, এ বস্তুত ঘুঁটির মধ্যে নেই— যে খেলবে তারই ইচ্ছার মধ্যে। ইচ্ছা নিজেই নিয়ম স্থাপন করে সেই নিয়মের উপরে নিজেকে প্রয়োগ করতে থাকে তবেই খেলা সম্ভব হয়।

বিশ্বজগতে ঈশ্বর জলের নিয়ম, স্থলের নিয়ম, বাতাসের নিয়ম, আলোর নিয়ম, মনের নিয়ম, নানা প্রকার নিয়ম বিস্তার করে দিয়েছেন। এই নিয়মকেই আমরা বলি সীমা। এই সীমা, প্রকৃতি কোথাও থেকে মাথায় করে এনেছে, তা তো নয়। তার ইচ্ছাই নিজের মধ্যে এই নিয়মকে এই সীমাকে স্থাপন করেছে— নতুবা, ইচ্ছা বেকার থাকে, কাজ পায় না। এইজন্যেই যিনি অসীম তিনিই সীমার আকর হয়ে উঠেছেন— কেবলমাত্র ইচ্ছার দ্বারা, আনন্দের দ্বারা। সেই কারণেই উপনিষৎ বলেন, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।" সেইজন্যেই বলেন, "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" যিনি প্রকাশ পাচ্ছেন তাঁর যা কিছু রূপ তা আনন্দরূপ— অর্থাৎ মূর্তিমান ইচ্ছা— ইচ্ছা আপনাকে সীমায় বেঁধেছে, রূপে বেঁধেছে।

প্রকৃতিতে ঈশ্বর নিয়মের দ্বারা সীমার দ্বারা যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন সে যদি কেবলমাত্রই

পার্থক্য হত তা হলে জগৎ তো সমষ্টিরূপ ধারণ করত না। তা হলে অসংখ্য বিচ্ছিন্নতা এমনি বিচ্ছিন্ন হত যে, কেবলমাত্র সংখ্যাসূত্রেও তাদের এক করে জানবার কিছুই থাকত না।

অতএব এর মধ্যে আর একটি জিনিস আছে যা এই চিরন্তন পার্থক্যকে চিরকালই অতিক্রম করছে। সেটি কী? সেটি হচ্ছে শক্তি। ঈশ্বরের শক্তি এই সমস্ত পার্থক্যের উপর কাজ করে একে এক অভিপ্রায়ে বাঁধছে। সমস্ত স্বতন্ত্র নিয়মবদ্ধ দাবাবড়ের ঘুঁটির মধ্যে একই খেলোয়াড়ের শক্তি একটি এক-তাৎপর্যবিশিষ্ট খেলাকে অভিব্যক্ত করে তুলছে।

এইজন্যই তাঁকে ঋষিরা বলেছেন "কবিঃ"। কবি যেমন ভাষার স্বাতন্ত্র্যকে নিজের ইচ্ছার অধীনে নিজের শক্তির অনুগত করে সুন্দর ছন্দোবিন্যাসের ভিতর দিয়ে একটি আশ্চর্য অর্থ উদ্ভাবিত করে তুলছে— তিনিও তেমনি "বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি" অর্থাৎ শক্তিকে বহুর মধ্যে চালিত করে বহুর সঙ্গে যুক্ত করে অনেক বর্ণের ভিতর থেকে একটি নিহিত অর্থ ফুটিয়ে তুলছেন— নইলে সমস্তই অর্থহীন হত।

"শক্তিযোগাৎ" শক্তি যোগের দ্বারা। শক্তি একটি যোগ। এই যোগের দ্বারাই ঈশ্বর সীমাদ্বারা পৃথককৃত প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন— নিয়মের সীমারূপ পার্থক্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁর শক্তি দেশের সঙ্গে দেশান্তরের, রূপের সঙ্গে রূপান্তরের, কালের সঙ্গে কালান্তরের বহুবিচিত্রসংযোগ সাধন করে এক অপূর্ব বিশ্বকাব্য সৃজন করে চলেছে।

এমনি করে যিনি অসীম তিনি সীমার দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করছেন, যিনি অকাল-স্বরূপ খণ্ডকালের দ্বারা তাঁর প্রকাশ চলেছে। এই পরমাশ্চর্য রহস্যকেই বিজ্ঞানশাস্ত্রে বলে পরিণামবাদ। যিনি আপনাতেই আপনি পর্যাপ্ত তিনি ক্রমের ভিতর দিয়ে নিজের ইচ্ছাকে বিচিত্ররূপে মূর্তিমান করছেন— জগৎ-রচনায় করছেন, মানবসমাজের ইতিহাসে করছেন।

প্রকৃতির মধ্যে নিয়মের সীমাই হচ্ছে পার্থক্য, আর আত্মার মধ্যে অহংকারের সীমাই হচ্ছে পার্থক্য। এই সীমা যদি তিনি স্থাপিত না করতেন তা হলে তাঁর প্রেমের লীলা কোনোমতে সম্ভবপর হত না। জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়ে তাঁর প্রেম কাজ করছে। তাঁর শক্তির ক্ষেত্র হচ্ছে নিয়মবদ্ধ প্রকৃতি, আর তাঁর প্রেমের ক্ষেত্র হচ্ছে অহংকারবদ্ধ জীবাত্মা। এই অহংকারকে জীবাত্মার সীমা বলে তাকে তিরস্কার করলে চলবে না। জীবাত্মার এই অহংকারে পরমাত্মা নিজের আনন্দের মধ্যে সীমা স্থাপন করেছেন— নতুবা তাঁর আনন্দের কোনো কর্ম থাকে না।

এই অহংকারে যদি কেবল পার্থক্যই সর্বপ্রধান হত তা হলে আত্মায় আত্মায় বিরোধ হবার মতোও সংঘাত ঘটতে পারত না— আত্মার সঙ্গে আত্মার কোনো দিক থেকে কোনো সংস্পর্শই থাকতে পারত না। কিন্তু তাঁর প্রেম সমস্ত আত্মাকে আত্মীয় করবার পথে চলেছে, পরস্পরকে যোজনা করে প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্যের নিহিতার্থটিকে জাগ্রত করে তুলছে। নতুবা জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্য ভয়ংকর নিরর্থক হত।

এখানেও সেই আশ্চর্য রহস্য। পরিপূর্ণ আনন্দ অপূর্ণের দ্বারাই আপনার আনন্দলীলা বিকশিত করে তুলছেন। বহুতর দুঃখ সুখ বিচ্ছেদ মিলনের ভিতর দিয়ে ছায়ালোক-বিচিত্র এই প্রেমের অভিব্যক্তি কেবলই অগ্রসর হচ্ছে। স্বার্থ ও অভিমানের ঘাত প্রতিঘাতে কত আঁকা বাঁকা পথ নিয়ে, কত বিস্তারের মধ্যে দিয়ে, ছোটোবড়ো কত আসক্তি অনুরক্তিকে বিদীর্ণ করে জীবাত্মার প্রেমের নদী প্রেমসমুদ্রের দিকে গিয়ে মিলছে। প্রেমের শতদল পদ্ম অহংকারের বৃন্ত আশ্রয় করে আত্ম হতে গৃহে, গৃহ হতে সমাজে, সমাজ হতে দেশে, দেশ হতে মানবে, মানব হতে বিশ্বাত্মায় ও বিশ্বাত্মা হতে পরমাত্মায় একটি একটি করে পাপড়ি খুলে দিয়ে বিকাশের লীলা সমাধান করছে।

২৩ পৌষ

প্রকৃতি

প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তির ক্ষেত্র, আর জীবাত্মা তাঁর প্রেমের ক্ষেত্র, একথা বলা হয়েছে। প্রকৃতিতে শক্তির দ্বারা তিনি নিজেকে 'প্রচার' করছেন, আর জীবাত্মায় প্রেমের দ্বারা তিনি নিজেকে 'দান' করছেন।

অধিকাংশ মানুষ এই দুই দিকে ওজন সমান রেখে চলতে পারে না। কেউ বা প্রাকৃতিক দিকে সাধনা প্রয়োগ করে, কেউ বা আধ্যাত্মিক দিকে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যেও এসম্বন্ধে ভিন্নতা প্রকাশ পায়।

প্রকৃতির ক্ষেত্রে যাদের সাধনা তারা শক্তি লাভ করে, তারা ঐশ্বর্যশালী হয়, তারা রাজা সাম্রাজ্য বিস্তার করে। তারা অন্নপূর্ণার বরলাভ করে পরিপুষ্ট হয়।

তারা সর্ববিষয়ে বড়ো হয়ে ওঠবার জন্য পরস্পর ঠেলাঠেলি করতে করতে একটা খুব বড়ো জিনিস লাভ করে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ তাঁদের শ্রেষ্ঠ লাভ হচ্ছে ধর্মনীতি।

কারণ, বড়ো হয়ে উঠতে গেলে, শক্তিশালী হয়ে উঠতে গেলেই অনেকের সঙ্গে মিলতে হয়। এই মিলন-সাধনের উপরেই শক্তির সার্থকতা নির্ভর করে। কিন্তু বড়ো রকমে, স্থায়ী রকমে, সকলের চেয়ে সার্থক রকমে মিলতে গেলেই এমন একটি নিয়মকে স্বীকার করতে হয় যা মঙ্গলের নিয়ম— অর্থাৎ বিশ্বের নিয়ম— অর্থাৎ ধর্মনীতি। এই নিয়মকে স্বীকার করলেই সমস্ত বিশ্ব আনুকূল্য করে— যেখানে অস্বীকার করা যায় সেইখানেই সমস্ত বিশ্বের আঘাত লাগতে থাকে— সেই আঘাত লাগতে লাগতে কোন্ সময়ে যে ছিদ্র দেখা দেয় তা চোখেই পড়ে না— অবশেষে বহুদিনের কীর্তি দেখতে দেখতে ভূমিসাৎ হয়ে যায়।

যাঁরা শক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে কাজ করেন তাঁদের বড়ো বড়ো সাধকেরা এই নিয়মকে বিশেষ করে আবিষ্কার করেন। তাঁরা জানেন, নিয়মই শক্তির প্রতিষ্ঠাস্থল, তা ঈশ্বরের সম্বন্ধেও যেমন মানুষের সম্বন্ধেও তেমনি। নিয়মকে যেখানে লঙ্ঘন করব শক্তিকে সেইখানেই নিরাশ্রয় করা হবে। যার আপিসে নিয়ম নেই সে অশক্ত কর্মী। যার গৃহে নিয়ম নেই সে অশক্ত গৃহী। যে রাষ্ট্রব্যাপারে নিয়ম লঙ্ঘন হয় সেখানে অশক্ত শাসনতন্ত্র। যার বুদ্ধি বিশ্বব্যাপারে নিয়মকে দেখতে পায় না সে জীবনের সর্ব বিষয়েই অশক্ত, অকৃতার্থ, পরাভূত।

এইজন্যে যথার্থ শক্তির সাধকেরা নিয়মকে বুদ্ধিতে স্বীকার করেন, বিশ্বে স্বীকার করেন, নিজের কর্মে স্বীকার করেন। এইজন্যেই তাঁরা যোজনা করতে পারেন, রচনা করতে পারেন, লাভ করতে পারেন। এইরূপে তাঁরা যে পরিমাণে সত্যশালী হন সেই পরিমাণেই ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠতে থাকেন।

কিন্তু এর-একটি মুশকিল হচ্ছে এই যে, অনেক সময়ে তাঁরা এই ধর্মনীতিকেই মানুষের শেষ সম্বল বলে জ্ঞান করেন। যার সাহায্যে কেবলই কর্ম করা যায়, কেবলই শক্তি, কেবলই উন্নতি লাভ করা যায় সেইটেকেই তাঁরা চরম শ্রেয় বলে জানেন। এইজন্যে বৈজ্ঞানিক সত্যকেই তাঁরা চরম সত্য বলে জ্ঞান করেন এবং সকল কর্মের আশ্রয়ভূত ধর্মনীতিকেই তাঁরা পরম পদার্থ বলে অনুভব করেন।

কিন্তু যারা শক্তির ক্ষেত্রেই তাদের সমস্ত পাওয়াকে সীমাবদ্ধ করে রাখে তারা ঐশ্বর্যকে পায়, ঈশ্বরকে পায় না। কারণ ঈশ্বর সেখানে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে নিজের ঐশ্বর্যকে উদ্‌ঘাটন করেছেন।

এই অনন্ত ঐশ্বর্যসমুদ্র পার হয়ে ঈশ্বরে গিয়ে পৌঁছোবে এমন সাধ্য কার আছে। ঐশ্বর্যের তো অন্ত নেই, শক্তিরও শেষ নেই। সেইজন্যে ওপথে ক্রমাগতই অন্তহীন একের থেকে আরের দিকে চলতে হয়। সেইজন্যেই মানুষ এই রাস্তায় চলতে চলতে বলতে থাকে— ঈশ্বর নেই, কেবলই এই আছে, এবং এই আছে ; আর আছে, এবং আরো আছে।

ঈশ্বরের সমান না হতে পারলে তাঁকে উপলব্ধি করব কী করে ? আমরা যতই রেলগাড়ি চালাই আর টেলিগ্রাফের তার বসাই শক্তিক্ষেত্রে আমরা ঈশ্বর হতে অনন্ত দূরে থেকে যাই। যদি স্পর্ধা করে তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার চেষ্টা করি তা হলে আমাদের চেষ্টা আপন অধিকারকে লঙ্ঘন করে ব্যাসকাশীর মতো অভিশপ্ত এবং বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট জগতের মতো বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

এইজন্যেই জগতের সমস্ত ধর্মসাধকেরা বারংবার বলেছেন, ঐশ্বর্যপথের পথিকদের পক্ষে ঈশ্বরদর্শন অত্যন্ত দুঃসাধ্য। অন্তহীন চেষ্টা চরমতাহীন পথে তাদের কেবলই ভুলিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যায়।

অতএব ঈশ্বরকে বাহিরে অর্থাৎ তাঁর শক্তির ক্ষেত্রে কোনো জায়গায় আমরা লাভ করতে পারি নে। সেখানে যে বালুকণাটির অন্তরালে তিনি রয়েছেন সেই বালুকণাটিকে নিঃশেষে অতিক্রম করে এমন সাধ্য কোনো বৈজ্ঞানিকের, কোনো যান্ত্রিকের নেই। অতএব শক্তির ক্ষেত্রে যে লোক ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে যায় সে অর্জুনের মতো ছদ্মবেশী মহাদেবকে বাণ মারে— সে বাণ তাঁকে স্পর্শ করে না— সেখানে না হেরে উপায় নেই।

এই শক্তির ক্ষেত্রে আমরা ঈশ্বরের দুই মূর্তি দেখতে পাই— এক হচ্ছে অন্নপূর্ণা মূর্তি— এই মূর্তি ঐশ্বর্যের দ্বারা আমাদের শক্তিকে পরিপুষ্ট করে তোলে। আর-এক হচ্ছে করালী কালী মূর্তি— এই মূর্তি আমাদের সীমাবদ্ধ শক্তিকে সংহরণ করে নেয় ; আমাদের কোনো দিক দিয়ে শক্তির চরমতায় যেতে দেয় না— না টাকায়, না খ্যাতিতে, না অন্য কোনো বাসনার বিষয়ে। বড়ো বড়ো রাজ্যসাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হয়ে যায়— বড়ো বড়ো ঐশ্বর্যভাণ্ডার ভুক্তশেষ নারিকেলের খোলার মতো পড়ে থাকে। এখানে পাওয়ার মূর্তি খুব সুন্দর উজ্জ্বল এবং মহিমান্বিত, কিন্তু যাওয়ার মূর্তি, হয় বিষাদে পরিপূর্ণ নয় ভয়ংকর। তা শূন্যতার চেয়ে শূন্যতর, কারণ, তা পূর্ণতার অন্তর্ধান।

কিন্তু যেমনই হোক, এখানে পাওয়াও চরম নয়, যাওয়াও চরম নয়— এখানে পাওয়া এবং যাওয়ার আবর্তন কেবলই চলেছে। সুতরাং এই শক্তির ক্ষেত্র মানুষের স্থিতির ক্ষেত্র নয়। এর কোনোখানে এসে মানুষ চিরদিনের মতো বলে না যে, এইখানে পৌঁছোনো গেল।

২৪ পৌষ

৪

পাওয়া

শক্তির ক্ষেত্রে যারা কাজ করে তারা অনন্ত উন্নতির কথা বলে। অর্থাৎ অনন্ত গতির উপরেই তারা জোর দেয়, অনন্ত স্থিতির উপর নয়। তারা অনন্ত চেষ্টার কথাই বলে, অনন্ত লাভের কথা বলে না।

এইজন্য ধর্মনীতিই তাদের শেষ সম্বল। নীতি কিনা নিয়ে যাবার জিনিস— তা পথের পাথেয়। যারা পথকেই মানে তারা নীতিকেই চরমরূপে মানে— তারা গৃহের সম্বলের কথা চিন্তা করে না। কারণ, যে গৃহে কোনোকালেই মানুষ পৌঁছবে না, সে গৃহকে মানলেও হয়, না মানলেও হয়। যে উন্নতি অনন্ত উন্নতি, তাকে উন্নতি না বললে ক্ষতি হয় না।

কিন্তু শক্তিভক্তেরা বলে চলাটাই আনন্দ— কারণ, তাতে শক্তির চালনা হয় ; লাভে শক্তির কর্ম শেষ হয়ে গিয়ে নিশ্চেষ্ট তামসিকতায় নিয়ে গিয়ে ফেলে ; বস্তুত ঐশ্বর্য-পদার্থের গৌরবই এই যে, সে আমাদের কোনো লাভের মধ্যে এনে ধরে রাখে না, সে আমাদের অগ্রসর করতে থাকে।

যতক্ষণ আমাদের শক্তি থাকে ততক্ষণ ঐশ্বর্য আমাদের থামতে দেয় না ; কিন্তু দুর্গতির পূর্বে দেখতে পাই মানুষ বলতে থাকে, এইটেই আমি চেয়েছিলুম এবং এইটেই আমি পেয়েছি। তখন পথিকধর্ম সে বিসর্জন দিয়ে সঞ্চয়ীর ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে— তখন সে আর সম্মুখের দিকে তাকায় না, যা পেয়েছে সেইটেকে কী করলে আটেঘাটে বাঁধা যায়, রক্ষা করা যায়, সেই কথাই সে ভাবতে থাকে।

কিন্তু সংসার জিনিসটা যে কেবলই সরে, কেবলই সরায়। এখানে হয় সরতে থাকো, নয় মরতে থাকো। এখানে যে বলেছে 'আমার যথেষ্ট হয়েছে— এইবার যথেষ্টের মধ্যে বাসা বাঁধব', সেই ডুবেছে।

ইতিহাসে বড়ো বড়ো জাতির মধ্যেও দেখতে পাই যে, তারা এক জায়গায় এসে বলে 'এইবার আমার পূর্ণতা হয়েছে— এইবার আমি সঞ্চয় করব, রক্ষা করব, বাঁধাবাঁধি হিসাব বরাদ্দ করব, এইবার আমি ভোগ করব'— তখন আর সে নূতন তত্ত্বকে বিশ্বাস করে না— তখন তার এতদিনের পথের সম্বল ধর্মনীতিকে দুর্বলতা বলে উপহাস ও অপমান করতে থাকে, মনে করে এখন আর এর প্রয়োজন নেই— 'এখন আমি বলী, আমি জয়ী, আমি প্রতিষ্ঠিত।'

কিন্তু প্রবাহের উপরে যে লোক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করতে চায় তার যে দশা হয় সে কারও অগোচর নেই। তাকে ডুবতেই হয়। এমন কত জাতি ডুবে গেছে।

কেবলই উন্নতি, কেবলই গতি, পরিণাম কোথাও নেই, এমন একটা অদ্ভুত কথার উৎপত্তি হয়েছে এই কারণেই। কারণ, মানুষ দেখেছে সংসারে থামতে গেলেই মরতে হয়। এই নিয়মকে যারা উপলব্ধি করেছে তারা স্থিতি ও লাভকে অস্বীকার করে।

স্থিতিহীন গতি, লাভহীন চেষ্টাই যদি মানুষের ভাগ্য হয় তবে এমন ভয়ানক দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে। এ কথা ঐশ্বর্যগর্বের উন্মত্ততায় অন্ধ হয়ে বলা চলে কিন্তু এ কথা আমাদের অন্তরাত্মা কখনোই সম্পূর্ণ সম্মতির সঙ্গে বলতে পারে না।

তার কারণ, একটা জায়গায় আমাদের পাওয়ার পন্থা আছে। সে হচ্ছে যেখানে ঈশ্বর স্বয়ং নিজেকে ধরা দিয়েছেন। সেখানে আমরা তাঁকে পাই কেন, না তিনি নিজেকে দিতে চান বলেই পাই।

কোথায় পাই? বাহিরে নয়, প্রকৃতিতে নয়, বিজ্ঞানতত্ত্বে নয়, শক্তিতে নয়— পাই জীবাত্মায়। কারণ, সেখানে তাঁর আনন্দ, তাঁর প্রেম। সেখানে তিনি নিজেকে দিতেই চান। যদি কোনো বাধা থাকে তো সে আমাদেরই দিকে— তাঁর দিকে নয়।

এই প্রেমে পাওয়ার মধ্যে তামসিকতা নেই, জড়ত্ব নেই। এই যে লাভ এ চরম লাভ বটে, কিন্তু পঞ্চত্বলাভের মতো এতে আমরা বিনষ্ট হই নে। তার কারণ, আমরা পূর্বেই একদিন আলোচনা করেছি। শক্তির পাওয়া ব্যাপারে পেলেই শক্তি নিশ্চেষ্ট হয়, কিন্তু প্রেমের পাওয়ায় পেলে প্রেম নিশ্চেষ্ট হয় না— বরঞ্চ তার চেষ্টা আরো গভীররূপে জাগ্রত হয়।

এইজন্যে এই যে প্রেমের ক্ষেত্রে ঈশ্বর আমাদের কাছে ধরা দেন— এই ধরা দেওয়ার দরুন তিনি আমাদের কাছে ছোটো হয়ে যান না— তাঁর পাওয়ার আনন্দ নিরন্তর প্রবাহিত হয়— সেই পাওয়া নিত্য নূতন থাকে।

মানুষের মধ্যেও যখন আমাদের সত্য প্রেম জাগ্রত হয়ে ওঠে তখন সেই প্রেমের বিষয়কে লাভ করেও লাভের অন্ত থাকে না— এমন স্থলে ব্রহ্মের কথা কী বলব? সেই কথা উপনিষৎ বলেছেন—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন।

ব্রহ্মের আনন্দ ব্রহ্মের প্রেম যিনি জেনেছেন তিনি কোনোকালেই আর ভয় পান না।

অতএব মানুষের একটা এমন পাওয়া আছে যার সম্বন্ধে চিরকালের কথাটা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ভারতবর্ষ এই পাওয়ার দিকেই খুব করে মন দিয়েছিলেন। সেইজন্যেই ভারতবর্ষের হৃদয় মৈত্রেয়ীর মুখ দিয়ে বলেছেন— যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্? সেইজন্যে মৃত্যুর দিক থেকে অমৃতের দিকে ভারতবর্ষ আপনার আকাঙ্ক্ষা প্রেরণ করেছিলেন।

সে দিকে যারা মন দিয়েছে বাইরে থেকে দেখে তাদের বড়ো বলে তো বোধ হয় না। তাদের উপকরণ কোথায়? ঐশ্বর্য কোথায়?

শক্তির ক্ষেত্রে যারা সফল হয় তারা আপনাকে বড়ো করে সফল হয়— আর অধ্যাত্মক্ষেত্রে যারা

সফল হয় তারা আপনাকে ত্যাগ করে সফল হয়। এইজন্য দীন যে, সে সেখানে ধন্য। যে অহংকার করবার কিছুই রাখে নি, সেই ধন্য— কেননা, ঈশ্বর স্বয়ং যেখানে নত হয়ে আমার কাছে এসেছেন, সেখানে যে নত হতে পারবে সেই তাঁকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারবে। এইজন্যেই প্রতিদিন প্রার্থনা করি : নমস্তেঽস্তু— তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি, যেন নত হতে পারি, নিজের অভিমান কোথাও কিছু যেন না থাকে।

জগতে তুমি রাজা অসীমপ্রতাপ,
হৃদয়ে তুমি হৃদয়নাথ হৃদয়হরণ রূপ।
নীলাম্বর জ্যোতিখচিত চরণপ্রান্তে প্রসারিত,
ফিরে সভয়ে নিয়মপথে অনন্তলোক।
নিভৃত হৃদয়-মাঝে কিবা প্রসন্ন মুখচ্ছবি,
প্রেমপরিপূর্ণ মধুরভাতি।
ভকতহৃদয়ে তব করুণারস সতত বহে,
দীনজনে সতত কর অভয়দান।

২৫ পৌষ

সমগ্র

এই প্রাতঃকালে যিনি আমাদের জাগালেন তিনি আমাদের সব দিক দিয়েই জাগালেন। এই যে আলোটি ফুটে পড়েছে এ আমাদের কর্মের ক্ষেত্রেও আলো দিচ্ছে, জ্ঞানের ক্ষেত্রেও আলো দিচ্ছে— সৌন্দর্যক্ষেত্রকেও আলোকিত করছে। এই ভিন্ন ভিন্ন পথের জন্যে তিনি ভিন্ন ভিন্ন দূত পাঠান নি— তাঁর একই দূত সকল পথেরই দূত হয়ে হাস্যমুখে আমাদের সম্মুখে অবতীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু আমাদের বোঝবার প্রক্রিয়াই এই যে, সত্যকে আমরা এক মুহূর্তে সমগ্র করে দেখতে পাই নে। প্রথমে খণ্ড খণ্ড করে, তার পরে জোড়া দিয়ে দেখি। এই উপায়ে খণ্ডের হিসাবে সত্য করে দেখতে গিয়ে সমগ্রের হিসাবে ভুল করে দেখি। ছবিতে একটি পরিপ্রেক্ষণতত্ত্ব আছে— তদনুসারে দূরকে ছোটো করে এবং নিকটকে বড়ো করে আঁকতে হয়। তা যদি না করি তবে ছবিটি আমাদের কাছে সত্য বলে মনে হয় না। কিন্তু সমগ্র সত্যের কাছে দূর নিকট নেই, সবই সমান নিকট। এইজন্যে নিকটকে বড়ো করে ও দূরকে ছোটো করে দেখা সারা হলে তার পরে সমগ্র সত্যের মধ্যে তাকে সংশোধন করে নিতে হয়।

মানুষ একসঙ্গে সমস্তকে দেখবার চেষ্টা করলে সমস্তকেই ঝাপসা দেখে বলেই প্রথমে খণ্ড খণ্ড করে তার পরে সমস্তর মধ্যে সেটা মিলিয়ে নেয়। এইজন্য কেবল খণ্ডকে দেখে সমগ্রকে যদি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, তবে তার ভয়ংকর জবাবদিহি আছে ; আবার কেবল সমগ্রকে লক্ষ্য করে খণ্ডকে যদি বিলুপ্ত করে দেখে তবে সেই শূন্যতা তার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হয়।

এ কয়দিন আমরা প্রাকৃতিক ক্ষেত্র এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রকে স্বতন্ত্র করে দেখছিলুম। এরকম না করলে তাদের সুস্পষ্ট চিত্র আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেকটিকে যখন সুস্পষ্টভাবে জানা সারা হয়ে যায় তখন একটা মস্ত ভুল সংশোধনের সময় আসে। তখন পুনর্বার এই দুটিকে একের মধ্যে যদি না দেখি তা হলে বিপদ ঘটে।

এই প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক যেখানে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করেছে সেখান থেকে আমাদের লক্ষ যেন একান্ত স্খলিত না হয়। যেখানে সত্যের মধ্যে উভয়ের আত্মীয়তা আছে সেখানে মিথ্যার দ্বারা আত্মবিচ্ছেদ না ঘটাই। কেবলমাত্র ভাষা, কেবল তর্ক, কেবল মোহের দ্বারা প্রাচীর গেঁথে তুলে সেইটেকেই সত্য পদার্থ বলে যেন ভুল না করি।

পূর্ব এবং পশ্চিম দিক যেমন একটি অখণ্ড গোলকের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে— প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক তেমনি একটি অখণ্ডতার দ্বারা বিধৃত। এর মধ্যে একটিকে পরিহার করতে গেলেই আমরা সমগ্রতার কাছে অপরাধী হব— এবং সে অপরাধের দণ্ড অবশ্যম্ভাবী।

ভারতবর্ষ যে পরিমাণে আধ্যাত্মিকতার দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়ে প্রকৃতির দিকে ওজন হারিয়েছে, সেই পরিমাণে তাকে আজ পর্যন্ত জরিমানার টাকা গুনে দিয়ে আসতে হচ্ছে। এমন-কি, তার যথাসর্বস্ব বিকিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। ভারতবর্ষ যে আজ শ্রীভ্রষ্ট হয়েছে তার কারণ এই যে, সে একচক্ষু হরিণের মতো জানত না যে, যে দিকে তার দৃষ্টি থাকবে না সেই দিক থেকেই ব্যাধের মৃত্যুবাণ এসে তাকে আঘাত করবে। প্রাকৃতিক দিকে সে নিশ্চিন্তভাবে কানা ছিল— প্রকৃতি তাকে মৃত্যুবাণ মেরেছে।

এ কথা যদি সত্য হয় যে পাশ্চাত্য জাতি প্রাকৃতিক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ জয়লাভ করবার জন্যে একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তা হলে এ কথা নিশ্চয় জানতে হবে একদিন তার পরাজয়ের ব্রহ্মাস্ত্র অন্য দিক থেকে এসে তার মর্মস্থানে বাজবে।

মূলে যাদের ঐক্য আছে, সেই ঐক্যমূল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে তারা যে কেবল পৃথক হয় তা নয়, তারা পরস্পরের বিরোধী হয়। ঐক্যের সহজ টানে যারা আত্মীয়রূপে থাকে, বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিয়ে তারা প্রলয়সংঘাতে আকৃষ্ট হয়।

অর্জুন এবং কর্ণ সহোদর ভাই। মাঝখানে কুন্তীর বন্ধন তারা যদি না হারিয়ে ফেলত তা হলে পরস্পরের যোগে তারা প্রবল বলী হত; সেই মূল বন্ধনটি বিস্মৃত হওয়াতেই তারা কেবলই বলেছে, 'হয় আমি মরব নয় তুমি মরবে।'

তেমনি আমাদের সাধনাকে যদি অত্যন্ত ভাবে প্রকৃতি অথবা আত্মার দিকে স্থাপন করি, তা হলে আমাদের ভিতরকার প্রকৃতি এবং আত্মার মধ্যে লড়াই বেধে যায়। তখন প্রকৃতি বলে 'আত্মা মরুক আমি থাকি', আত্মা বলে 'প্রকৃতিটা নিঃশেষে মরুক আমি একাধিপত্য করি'। তখন প্রকৃতির দলের লোকেরা কর্মকেই প্রচণ্ড এবং উপকরণকেই প্রকাণ্ড করে তুলতে চেষ্টা করে; এর মধ্যে আর দয়ামায়া নেই, বিরাম বিশ্রাম নেই। ও দিকে আত্মার দলের লোকেরা প্রকৃতির রসদ একেবারে বন্ধ করে বসে, কর্মের পাট একেবারে তুলে দেয়, নানাপ্রকার উৎকট কৌশলের দ্বারা প্রকৃতিকে একেবারে নির্মূল করতে চেষ্টা করে— জানে না সেই একই মূলের উপরে তার আত্মার কল্যাণও অবস্থিত।

এইরূপে যে দুইটি পরস্পরের পরমাত্মীয়, পরম সহায়, মানুষ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন করে তাদের পরম শত্রু করে তোলে। এমন নিদারুণ শত্রুতা আর নেই— কারণ, এই দুই পক্ষই পরম ক্ষমতাশালী।

অতএব, প্রকৃতি এবং আত্মা, মানুষের এই দুই দিককে আমরা যখন স্বতন্ত্র করে দেখেছি তখন যত শীঘ্র সম্ভব এদের দুটিকে পরিপূর্ণ অখণ্ডতার মধ্যে সম্মিলিতরূপে দেখা আবশ্যক। আমরা যেন এই দুটি অনন্তবন্ধুর বন্ধুত্ব-সূত্রে অন্যায় টান দিতে গিয়ে উভয়কে কুপিত করে না তুলি।

২৬ পৌষ

কর্ম

আমাদের দেশের জ্ঞানীসম্প্রদায় কর্মকে বন্ধন বলে থাকেন। এই বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নিষ্ক্রিয় হওয়াকেই তাঁরা মুক্তি বলেন। এইজন্য কর্মক্ষেত্র প্রকৃতিকে তাঁরা ধ্বংস করে নিশ্চিন্ত হতে চান।

এইজন্য ব্রহ্মকেও তাঁরা নিষ্ক্রিয় বলেন এবং যা-কিছু জাগতিক ক্রিয়া, এ'কে মায়া বলে একেবারে অস্বীকার করেন।

কিন্তু উপনিষৎ বলেন—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্‌ব্রহ্ম।
যাঁর থেকে সমস্তই জন্মাচ্ছে, যাঁর দ্বারা জীবন ধারণ করছে, যাঁতে প্রয়াণ ও প্রবেশ করছে, তাঁকে জানতে ইচ্ছা করো, তিনিই ব্রহ্ম।

অতএব উপনিষদের ব্রহ্মবাদী বলেন, ব্রহ্মই সমস্ত ক্রিয়ার আধার।

তা যদি হয় তবে কি তিনি এই-সকল কর্মের দ্বারা বদ্ধ ?

এক দিকে কর্ম আপনিই হচ্ছে, আর-এক দিকে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র হয়ে রয়েছেন, পরস্পরে কোনো যোগ নেই, এ কথাও যেমন আমরা বলতে পারি নে, তেমনি তাঁর কর্ম মাকড়সার জালের মতো, শামুকের খোলার মতো, তাঁর নিজেকে বদ্ধ করছে এ কথাও বলা চলে না। এইজন্যই পরক্ষণে ব্রহ্মবাদী বলছেন—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।
ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। সেই আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন, জীবিত, সচেষ্ট এবং রূপান্তরিত হচ্ছে।

কর্ম দুই রকমে হয়— এক অভাবের থেকে হয়, আর প্রাচুর্য থেকে হয়। অর্থাৎ, প্রয়োজন থেকে হয় বা আনন্দ থেকে হয়।

প্রয়োজন থেকে, অভাব থেকে, আমরা যে কর্ম করি সেই কর্মই আমাদের বন্ধন ; আনন্দ থেকে যা করি সে তো বন্ধন নয়, বস্তুত সেই কর্মই মুক্তি।

এইজন্য আনন্দের স্বভাবই হচ্ছে ক্রিয়া— আনন্দ স্বতই নিজেকে বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে মুক্তিদান করতে থাকে। সেইজন্যই অনন্ত আনন্দের অনন্ত প্রকাশ। ব্রহ্ম যে আনন্দ সে এই অনিঃশেষ প্রকাশধর্মের দ্বারাই অহরহ প্রমাণ হচ্ছে। তাঁর ক্রিয়ার মধ্যেই তিনি আনন্দ, এইজন্য তাঁর কর্মের মধ্যেই তিনি মুক্তস্বরূপ।

আমরাও দেখেছি আমাদের আনন্দের কর্মের মধ্যেই আমরা মুক্ত। আমরা প্রিয়বন্ধুর যে কাজ করি সে কাজ আমাদের দাসত্বে বদ্ধ করে না। শুধু বদ্ধ করে না তা নয়, সেই কর্মই আমাদের মুক্ত করে। কারণ, আনন্দের নিষ্ক্রিয়তাই তার বন্ধন, কর্মই তার মুক্তি।

তবে কর্ম কখন বন্ধন ? যখন তার মূল আনন্দ থেকে সে বিচ্যুত হয়। বন্ধুর বন্ধুত্বটুকু যদি আমাদের অগোচর থাকে, যদি কেবল তার কাজমাত্রই আমাদের চোখে পড়ে, তবে সেই বিনা বেতনের প্রাণপণ কাজকে তার প্রতি একটা ভয়ংকর অত্যাচার বলে আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে। কিন্তু বস্তুত তার প্রতি অত্যাচার কোনটা হবে ? যদি তার কাজ বন্ধ করে দিই। কারণ, কর্মের মুক্তি আনন্দের মধ্যে এবং আনন্দের মুক্তি কর্মে। সমস্ত কর্মের লক্ষ্য আনন্দের দিকে এবং আনন্দের লক্ষ্য কর্মের দিকে।

এইজন্য উপনিষৎ আমাদের কর্ম নিষেধ করেন নি। ঈশোপনিষৎ বলেছেন, মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হবে না এ কোনোমতেই হতে পারে না।

এইজন্য তিনি পুনশ্চ বলেছেন যারা কেবল অবিদ্যায় অর্থাৎ সংসারের কর্মে রত তারা অন্ধকারে পড়ে, আর যারা বিদ্যায় অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মজ্ঞানে রত তারা ততোধিক অন্ধকারে পড়ে।

এই সমস্যার মীমাংসাস্বরূপ বলেছেন কর্ম এবং ব্রহ্মজ্ঞান উভয়েরই প্রয়োজন আছে।

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।
কর্মের দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যাদ্বারা জীব অমৃত লাভ করে।

ব্রহ্মহীন কর্ম অন্ধকার এবং কর্মহীন ব্রহ্ম ততোধিক শূন্যতা। কারণ, তাকে নাস্তিকতা বললেও হয়। যে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হতে সমস্ত কিছুই হচ্ছে সেই ব্রহ্মকে এইসমস্ত কিছু-বিবর্জিত করে দেখলে সমস্তকে ত্যাগ করা হয়, সেইসঙ্গে তাঁকেও ত্যাগ করা হয়।

যাই হোক, আনন্দের ধর্ম যদি কর্ম হয় তবে কর্মের দ্বারাই সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের যোগ হতে পারে। গীতায় একেই বলে কর্মযোগ।

কর্মযোগের একটি লৌকিক রূপ পৃথিবীতে আমরা দেখেছি। সে হচ্ছে পতিব্রতা স্ত্রীর সংসারযাত্রা। সতী স্ত্রীর সমস্ত সংসারকর্মের মূলে আছে স্বামীর প্রতি প্রেম ; স্বামীর প্রতি আনন্দ। এইজন্য সংসারকর্মকে তিনি স্বামীর কর্ম জেনেই আনন্দ বোধ করেন— কোনো ক্রীতদাসীও তাঁর মতো এমন করে কাজ করতে পারে না। এই কাজ যদি একান্ত তাঁর নিজের প্রয়োজনের কাজ হত, তা হলে এর ভার বহন করা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হত। কিন্তু এই সংসারকর্ম তাঁর পক্ষে কর্মযোগ। এই কর্মের দ্বারাই তিনি স্বামীর সঙ্গে বিচিত্রভাবে মিলিত হচ্ছেন।

আমাদের কর্মক্ষেত্র এই কর্মযোগের যদি তপোবন হয় তবে কর্ম আমাদের পক্ষে বন্ধন হয় না। তা হলে, সতী স্ত্রী যেমন কর্মের দ্বারাই কর্মকে উত্তীর্ণ হয়ে প্রেমকে লাভ করেন, আমরাও তেমনি কর্মের দ্বারাই কর্মের সংসারকে উত্তীর্ণ হয়ে— মৃত্যুং তীর্ত্বা— অমৃতকে লাভ করি।

এইজন্যই গৃহস্থের প্রতি উপদেশ আছে, তিনি যে যে কাজ করবেন তা নিজেকে যেন নিবেদন না করেন— তা করলেই কর্ম তাঁকে নাগপাশে বাঁধবে এবং ঈর্ষাদ্বেষ লোভক্ষোভের বিষনিশ্বাসে তিনি জর্জরিত হতে থাকবেন, তিনি— যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ— যে যে কর্ম করবেন সমস্ত ব্রহ্মকে সমর্পণ করবেন। তা হলে, সতী গৃহিণী যেমন সংসারের সমস্ত ভোগের অংশ পরিত্যাগ করেন অথচ সংসারের সমস্ত ভার অশ্রান্ত যত্নে বহন করেন— কারণ, কর্মকে তিনি স্বার্থসাধনরূপে জানেন না, আনন্দসাধনরূপেই জানেন— আমরাও তেমনি কর্মের আসক্তি দূর করে, কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন করে কর্মকে বিশুদ্ধ আনন্দময় করে তুলতে পারব— এবং যে আনন্দ আকাশে না থাকলে— কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ— কেই বা কিছুমাত্র চেষ্টা করত, কেই বা প্রাণ ধারণ করত, জগতের সেই-সকল চেষ্টার আকর পরমানন্দের সঙ্গে আমাদের সকল চেষ্টাকে যুক্ত করে জেনে আমরা কোনোকালেও এবং কাহা হতেও ভয়প্রাপ্ত হব না।

২৭ পৌষ

শক্তি

জ্ঞান প্রেম ও শক্তি এই তিন ধারা যেখানে একত্র সংগত সেইখানেই আনন্দতীর্থ। আমাদের মধ্যে জ্ঞান প্রেম ও কর্মের যে পরিমাণে পূর্ণ মিলন, সেই পরিমাণেই আমাদের পূর্ণ আনন্দ। বিচ্ছেদ ঘটলেই পীড়া উৎপন্ন হয়।

এইজন্যে কোনো একটা সংক্ষেপ উপায়ের প্রলোভনে যেখানে আমরা ফাঁকি দেব সেখানে আমরা নিজেকেই ফাঁকি দেব। যদি মনে করি দ্বারীকে ডিঙিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করব তা হলে দেউড়িতে এমনি আমাদের লাঞ্ছনা হবে যে, রাজদর্শনই দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। যদি মনে করি নিয়মকে বর্জন করে নিয়মের ঊর্ধ্বে উঠব তা হলে কুপিত নিয়মের হাতে আমাদের দুঃখের একশেষ হবে।

বিধানকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে তবেই বিধানের মধ্যে আমাদের কর্তৃত্ব জন্মে। গৃহের যে কর্তা হতে চায় গৃহের সমস্ত নিয়ম সংযম তাকেই সকলের চেয়ে বেশি মানতে হয়— সেই স্বীকারের দ্বারাই সেই কর্তৃত্বের অধিকার লাভ করে।

এই কারণেই বলছিলুম, সংসারের মধ্যে থেকেই আমরা সংসারের ঊর্ধ্বে উঠতে পারি— কর্মের মধ্যে থেকেই আমরা কর্মের চেয়ে বড়ো হতে পারি। পরিত্যাগ করে পলায়ন করে কোনোমতেই তা সম্ভব হয় না।

কারণ, আমাদের যে মুক্তি, সে স্বভাবের দ্বারা হলেই সত্য হয়, অভাবের দ্বারা হলে হয় না।

পূর্ণতার দ্বারা হলেই তবে সে সার্থক হয়, শূন্যতার দ্বারা সে শূন্য ফলই লাভ করে।

অতএব যিনি মুক্তস্বরূপ সেই ব্রহ্মের দিকে লক্ষ করো। তিনি না-রূপেই মুক্ত নন, তিনি হাঁ-রূপেই মুক্ত। তিনি ওঁ। অর্থাৎ, তিনি হাঁ।

এইজন্য ব্রহ্মর্ষি তাঁকে নিষ্ক্রিয় বলেন নি, অত্যন্ত স্পষ্ট করেই তাঁকে সক্রিয় বলেছেন। তাঁরা বলেছেন—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।

শুনেছি এঁর পরমা শক্তি এবং এঁর বিবিধা শক্তি এবং এঁর জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া স্বাভাবিকী।

ব্রহ্মের পক্ষে ক্রিয়া হচ্ছে স্বাভাবিক— অর্থাৎ তাঁর স্বভাবেই সেই ক্রিয়ার মূল, বাইরে নয়। তিনি করছেন, তাঁকে কেউ করাচ্ছে না।

এইরূপে তিনি তাঁর কর্মের মধ্যেই মুক্ত— কেননা এই কর্ম তাঁর স্বাভাবিক। আমাদের মধ্যেও কর্মের স্বাভাবিকতা আছে। আমাদের শক্তি কর্মের মধ্যে উন্মুক্ত হতে চায়। কেবল বাইরের প্রয়োজনবশত নয়, অন্তরের স্ফূর্তিবশত।

সেই কারণে কর্মেই আমাদের স্বাভাবিক মুক্তি। কর্মেই আমরা বাহির হই, প্রকাশ পাই। কিন্তু যাতে মুক্তি তাতেই বন্ধন ঘটতে পারে। নৌকোর যে গুণ দিয়ে তাকে টেনে নেওয়া যায় সেই গুণ দিয়েই তাকে বাঁধা যেতে পারে। গুণ যখন তাকে বাইরের দিকে টানে তখনই সে চলে, যখন নিজের দিকেই বেঁধে রাখে তখনই সে পড়ে থাকে।

আমাদেরও কর্ম যখন স্বার্থের সংকীর্ণতার মধ্যেই কেবল পাক দিতে থাকে তখন কর্ম ভয়ংকর বন্ধন। তখন আমাদের শক্তি সেই পরাশক্তির বিরুদ্ধে চলে, বিবিধা শক্তির বিরুদ্ধে চলে। তখন সে ভূমারদিকে চলে না, বহুর দিকে চলে না, নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যেই আবদ্ধ হয়। তখন এই শক্তিতে আমাদের মুক্তি দেয় না, আনন্দ দেয় না, তার বিপরীতেই আমাদের নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি কর্মহীন অলস সেই রুদ্ধ। যে ব্যক্তি ক্ষুদ্রকর্মা, স্বার্থপর, জগৎসংসারে তার সশ্রম কারাবাস। সে স্বার্থের কারাগারে অহোরাত্র একটা ক্ষুদ্র পরিধির কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে ঘানি টানছে এবং এই পরিশ্রমের ফলকে সে যে চিরদিনের মতো আয়ত্ত করে রাখবে এমন সাধ্য তার নেই ; এ তাকে পরিত্যাগ করতেই হয়, তার কেবল পরিশ্রমই সার।

অতএব কর্মকে স্বার্থের দিক থেকে পরমার্থের দিকে নিয়ে যাওয়াই মুক্তি— কর্ম ত্যাগ করা মুক্তি নয়। আমরা যে-কোনো কর্মই করি— তা ছোটোই হোক আর বড়োই হোক, সেই পরমাত্মার স্বাভাবিকী বিশ্বক্রিয়ার সঙ্গে তাকে যোগযুক্ত করে দেখলে সেই কর্ম আমাদের আর বদ্ধ করতে পারবে না— সেই কর্ম সত্যকর্ম, মঙ্গলকর্ম এবং আনন্দের কর্ম হয়ে উঠবে।

১৮ পৌষ

প্রাণ

আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।

ব্রহ্মবিদদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, পরমাত্মায় তাঁদের ক্রীড়া, পরমাত্মায় তাঁদের আনন্দ এবং তাঁরা ক্রিয়াবান।

শুধু তাঁদের আনন্দ নয়, তাঁদের কর্মও আছে।

এই শ্লোকটির প্রথমার্ধটুকু তুললেই কথাটার অর্থ স্পষ্টতর হবে—

প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন বিদ্বান ভবতে নাতিবাদী।

এই যিনি প্রাণরূপে সকলের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছেন— এঁকে যিনি জানেন তিনি এঁকে অতিক্রম করে কোনো কথা বলেন না।

প্রাণের মধ্যে আনন্দ এবং কর্ম এই দুটো জিনিস একত্র মিলিত হয়ে রয়েছে। প্রাণের সচেষ্টতাতেই প্রাণের আনন্দ— প্রাণের আনন্দেই তার সচেষ্টতা।

অতএব, ব্রহ্মই যদি সমস্ত সৃষ্টির প্রাণস্বরূপ হন, তিনিই যদি সৃষ্টির মধ্যে গতির দ্বারা আনন্দ ও আনন্দের দ্বারা গতি সঞ্চার করছেন, তবে যিনি ব্রহ্মবাদী তিনি শুধু ব্রহ্মকে নিয়ে আনন্দ করবেন না তো, তিনি ব্রহ্মকে নিয়ে কর্মও করবেন।

তিনি যে ব্রহ্মবাদী। তিনি তো শুধু ব্রহ্মকে জানেন তা নয়, তিনি যে ব্রহ্মকে বলেন। না বললে তাঁর আনন্দ বাঁধ মানবে কেন? তিনি বিশ্বের প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাণের মধ্যে নিয়ে 'ভবতে নাতিবাদী' অর্থাৎ, ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে কোনো কথা বলতে চান না— তিনি ব্রহ্মকেই বলতে চান।

মানুষ ব্রহ্মকে কেমন করে বলে? সেতারের তার যেমন করে গানকে বলে। সে নিজের সমস্ত গতির দ্বারা, স্পন্দনের দ্বারা, ক্রিয়ার দ্বারাই বলে— সর্বতোভাবে গানকে প্রকাশের দ্বারাই সে নিজের সার্থকতা সাধন করে।

ব্রহ্ম নিজেকে কেমন করে বলছেন? নিজের ক্রিয়ার দ্বারা অনন্ত আকাশকে আলোকে ও আকারে পরিপূর্ণ করে, স্পন্দিত করে, ঝংকৃত করে তিনি বলছেন— আনন্দরূপমমৃতং যদবিভাতি— তিনি কর্মের মধ্যেই আপন আনন্দবাণী বলছেন, আপন অমৃতসংগীত বলছেন। তাঁর সেই আনন্দ এবং তাঁর কর্ম একেবারে একাকার হয়ে দ্যুলোকে ভূলোকে বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

ব্রহ্মবাদীও যখন ব্রহ্মকে বলবেন তখন আর কেমন করে বলবেন? তাঁকে কর্মের দ্বারাই বলতে হবে। তাঁকে ক্রিয়াবান হতে হবে।

সে কর্ম কেমন কর্ম? না, যে কর্মদ্বারা প্রকাশ পায় তিনি 'আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ', পরমাত্মায় তাঁর ক্রীড়া, পরমাত্মায় তাঁর আনন্দ। যে কর্মে প্রকাশ পায় তাঁর আনন্দ নিজের স্বার্থসাধনে নয়, নিজের গৌরববিস্তারে নয়। তিনি যে, 'নাতিবাদী'— তিনি পরমাত্মাকে ছাড়া নিজের কর্মে আর কাউকেই প্রকাশ করতে চান না।

তাই সেই 'ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ' তাঁর জীবনের প্রত্যেক কাজে নানা ভাষায় নানা রূপে এই সংগীত ধ্বনিত করে তুলছেন— শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্। জগৎক্রিয়ার সঙ্গে তাঁর জীবনক্রিয়া এক ছন্দে এক রাগিণীতে গান করছে।

অন্তরের মধ্যে যা আত্মক্রীড়া, যা পরমাত্মার সঙ্গে ক্রীড়া, বাহিরে সেইটিই যে জীবনের কর্ম। অন্তরের সেই আনন্দ বাহিরের সেই কর্মে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে, বাহিরের সেই কর্ম অন্তরের সেই আনন্দে আবার ফিরে ফিরে যাচ্ছে। এমনি করে অন্তরে বাহিরে আনন্দ ও কর্মের অপূর্ব সুন্দর আবর্তন চলছে এবং সেই আবর্তনবেগে নব নব মঙ্গললোকের সৃষ্টি হচ্ছে। সেই আবর্তনবেগে জ্যোতি উদ্দীপ্ত হচ্ছে, প্রেম উৎসারিত হয়ে উঠছে।

এমনি করে যিনি চরাচর নিখিলে প্রাণরূপে অর্থাৎ একই কালে আনন্দ ও কর্ম -রূপে প্রকাশমান, সেই প্রাণকে ব্রহ্মবিৎ আপনার প্রাণের দ্বারাই প্রকাশ করেন।

সেইজন্যে আমার প্রার্থনা এই যে, হে প্রাণস্বরূপ, আমার সেতারের তারে যেন মরচে না পড়ে, যেন ধুলো না জমে— বিশ্বপ্রাণের স্পন্দনাভিঘাতে সে দিনরাত বাজতে থাকুক— কর্মসংগীতে বাজতে থাকুক— তোমারই নামে বাজতে থাকুক। প্রবল আঘাতে মাঝে মাঝে যদি তার ছিঁড়ে যায় তো সেও ভালো, কিন্তু শিথিল না হয়, মলিন না হয়, ব্যর্থ না হয়। ক্রমেই তার সুর প্রবল হোক, গভীর হোক, সমস্ত অস্পষ্টতা পরিহার করে সত্য হয়ে উঠুক— প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত এবং মানবাত্মার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হোক— হে আবিঃ, তোমার আবির্ভাবের দ্বারা সে ধন্য হোক!

২৯ পৌষ

জগতে মুক্তি

ভারতবর্ষে একদিন অদ্বৈতবাদ কর্মকে অজ্ঞানের— অবিদ্যার কোঠায় নির্বাসিত করে অত্যন্ত বিশুদ্ধ হতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন ব্রহ্ম যখন নিষ্ক্রিয়, তখন ব্রহ্মলাভ করতে গেলে কর্মকে সমূলে ছেদন করা আবশ্যক।

সেই অদ্বৈতবাদের ধারা ক্রমে যখন দ্বৈতবাদের নানা শাখাময়ী নদীতে পরিণত হল, তখন ব্রহ্ম এবং অবিদ্যাকে নিয়ে একটা দ্বিধা উৎপন্ন হল।

তখন দ্বৈতবাদী ভারত জগৎ এবং জগতের মূলে দুইটি তত্ত্ব স্বীকার করলেন— প্রকৃতি ও পুরুষ।

অর্থাৎ, ব্রহ্মকে তাঁরা নিষ্ক্রিয় নির্গুণ বলে এক পাশে সরিয়ে রেখে দিলেন এবং শক্তিকে জগৎক্রিয়ার মূলে যেন স্বতন্ত্র সত্তারূপে স্বীকার করলেন। এইরূপে ব্রহ্ম যে কর্মদ্বারা বদ্ধ নন এ কথাও বললেন, অথচ কর্ম যে একেবারে কিছুই নয় তাও বলা হল না। শক্তি ও শক্তির কার্য থেকে শক্তিমানকে দূরে বসিয়ে তাঁকে একটা খুব বড়ো পদ দিয়ে তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করলেন।

শুধু তাই নয়, এই ব্রহ্মই যে পরাস্ত, তিনিই যে ছোটো, সে কথাও নানা রূপকের দ্বারা প্রচার করতে লাগলেন।

এমনটি যে ঘটল তার মূলে একটি সত্য আছে।

মুক্তির মধ্যে একই কালে একটি নির্গুণ দিক এবং একটি সগুণ দিক দেখা যায়। তারা একত্র বিরাজিত। আমরা সেটা আমাদের নিজের মধ্যে থেকেই বুঝতে পারি। সেই কথাটার আলোচনা করবার চেষ্টা করা যাক।

একদিন জগতের মধ্যে একটি অখণ্ড নিয়মকে আমরা আবিষ্কার করি নি। তখন মনে হয়েছে জগতে কোনো এক বা অনেক শক্তির কৃপা আছে, কিন্তু বিধান নেই। যখন তখন যা খুশি তাই হতে পারে। অর্থাৎ, যা-কিছু হচ্ছে তা এমনি একতরফা হচ্ছে যে আমার দিক থেকে তার দিকে যে যাব এমন রাস্তা বন্ধ— সমস্ত রাস্তাই হচ্ছে তার দিক থেকে আমার দিকে— আমার পক্ষে কেবল ভিক্ষার রাস্তাটি খোলা।

এমন অবস্থায় মানুষকে কেবলই সকলের হাতে পায়ে ধরে বেড়াতে হয়। আগুনকে বলতে হয় 'তুমি দয়া করে জ্বলো', বাতাসকে বলতে হয় 'তুমি দয়া করে বও', সূর্যকে বলতে হয় 'তুমি যদি কৃপা করে না উদয় হও তবে আমার রাত্রি দূর হবে না'।

ভয় কিছুতেই ঘোচে না। অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ংকরঃ— যেখানে ব্যবস্থা দেখতে পাই নে সেখানে প্রসাদেও মন নিশ্চিন্ত হয় না। কারণ, সেই প্রসাদের উপর আমার নিজের কোনো দাবি নেই, সেটা একেবারেই একতরফা জিনিস।

অথচ যার সঙ্গে এতবড়ো কারবার তার সঙ্গে মানুষ নিজের একটা যোগের পথ না খুলে যে বাঁচতে পারে না। কিন্তু তার মধ্যে যদি কোনো নিয়ম না থাকে তবে তার সঙ্গে যোগেরও তো কোনো নিয়ম থাকতে পারে না।

এমন অবস্থায় যে লোকই তাকে যেরকমই তুকতাক বলে তাই সে আঁকড়ে থাকতে চায়, সেই তুকতাক যে মিথ্যে তাও তাকে বোঝানো অসম্ভব— কারণ, বোঝাতে গেলেও নিয়মের দোহাই দিয়েই তো বোঝাতে হয়। কাজেই মানুষ মন্ত্রতন্ত্র তাগা-তাবিজ এবং অর্থহীন বিচিত্র বাহ্যপ্রক্রিয়া নিয়ে অস্থির হয়ে বেড়াতে থাকে।

জগতে এরকম করে থাকা ঠিক পরের বাড়ি থাকা। সেও আবার এমন পর যে খামখেয়ালিতার অবতার। হয়তো পাত পেড়ে দিয়ে গেল কিন্তু অন্ন আর দিলই না, হয়তো হঠাৎ হুকুম হল আজই এখনই ঘর ছেড়ে বেরোতে হবে।

এইরকম জগতে, পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী হয়ে মানুষ পীড়িত এবং অবমানিত হয়। সে

নিজেকে বদ্ধ বলেই জানে ও দীন বলে শোক করতে থাকে।

এর থেকে মুক্তি কখন পাই ? এর থেকে পালিয়ে গিয়ে নয়— কারণ, পালিয়ে যাব কোথায় ? মরবার পথও যে এ আগলে বসে আছে।

জ্ঞান যখন বিশ্বজগতে অখণ্ড নিয়মকে আবিষ্কার করে— যখন দেখে কার্যকারণের কোথাও ছেদ নেই, তখন সে মুক্তিলাভ করে।

কেননা, জ্ঞান তখন জ্ঞানকেই দেখে। এমন কিছুকে পায় যার সঙ্গে তার যোগ আছে, যা তার আপনারই। তার নিজের যে আলোক সর্বত্রই সেই আলোক। এমন-কি, সর্বত্রই সেই আলোক অখণ্ডরূপে না থাকলে সে নিজেই বা কোথায় থাকত।

এতদিনে জ্ঞান মুক্তি পেলে। সে আর তো বাধা পেল না। সে বলল, আঃ, বাঁচা গেল, এ যে আমাদেরই বাড়ি— এ যে আমার পিতৃভবন। আর তো আমাকে সংকুচিত হয়ে অপমানিত হয়ে থাকতে হবে না। এতদিন স্বপ্ন দেখছিলুম যেন কোন্ পাগলাগারদে আছি— আজ স্বপ্ন ভেঙেই দেখি— শিয়রের কাছে পিতা বসে আছেন, সমস্তই আমার আপনার।

এই তো হল জ্ঞানের মুক্তি। বাইরের কিছু থেকে নয়— নিজেরই কল্পনা থেকে।

কিন্তু এই মুক্তির মধ্যেই জ্ঞান চুপচাপ বসে থাকে না। তার মন্ত্রতন্ত্র তাগা-তাবিজের শিকল ছিন্নভিন্ন করে এই মুক্তির ক্ষেত্রে তার শক্তিকে প্রয়োগ করে।

যখন আমরা আত্মীয়ের পরিচয় পাই তখন সেই পরিচয়ের উপরেই তো চুপচাপ করে বসে থাকতে পারি নে, তখন আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়তার আদান-প্রদান করবার জন্য উদ্যত হয়ে উঠি।

জ্ঞান যখন জগতে জ্ঞানের পরিচয় পায় তখন তার সঙ্গে কাজে যোগ দিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন পূর্বের চেয়ে তার কাজ ঢের বেড়ে যায়— কারণ, মুক্তির ক্ষেত্রে শক্তির অধিকার বহুবিস্তৃত হয়ে পড়ে। তখন জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের যোগে জাগ্রত শক্তি বহুধা হয়ে প্রসারিত হতে থাকে।

তবেই দেখা যাচ্ছে জ্ঞান বিশ্বজ্ঞানের মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করে আর চুপ করে থাকতে পারে না। তখন শক্তিযোগে কর্মদ্বারা নিজেকে সার্থক করতে থাকে।

প্রথমে অজ্ঞান থেকে মুক্তির মধ্যে জ্ঞান নিজেকে লাভ করে— তার পরে নিজেকে দান করা তার কাজ। কর্মের দ্বারা সে নিজেকে দান করে, সৃষ্টি করে, অর্থাৎ সর্জন করে, অর্থাৎ যে শক্তিকে পরের ঘরে বন্দীর মতো থেকে কেবলই বদ্ধ করে রেখেছিল সেই শক্তিকেই আত্মীয়-ঘরে নিয়তই ত্যাগ করে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

অতএব দেখা যাচ্ছে মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই কর্মের বৃদ্ধি বৈ হ্রাস নয়।

কিন্তু কর্ম যে অধীনতা। সে কথা স্বীকার করতেই হবে। কর্মকে সত্যের অনুগত হতেই হবে, নিয়মের অনুগত হতেই হবে, নইলে সে কর্মই হতে পারবে না।

তা, কী করা যাবে ? নিন্দাই করো আর যাই করো, আমাদের ভিতরকার শক্তি সত্যের অধীন হতেই চাচ্ছেন। সেই তাঁর প্রার্থনা। সেইজন্যই মহাদেবের প্রসাদপ্রার্থী পার্বতীর মতো তিনি তপস্যা করছেন।

জ্ঞান যেদিন পুরোহিত হয়ে সত্যের সঙ্গে আমাদের শক্তির পরিণয় সাধন করিয়ে দেন, তখনই আমাদের শক্তি সতী হন— তখন তাঁর বন্ধ্যাদশা আর থাকে না। তিনি সত্যের অধীন হওয়াতেই সত্যের ঘরে কর্তৃত্বলাভ করতে পারেন।

অতএব, কেবল মুক্তির দ্বারা সাফল্য নয়— তারও পরের কথা হচ্ছে অধীনতা। দানের দ্বারা অর্জন যেমন, তেমনি এই অধীনতার দ্বারাই মুক্তি সম্পূর্ণ সার্থক হয়। এইজন্যই দ্বৈতশাস্ত্রে নির্গুণ ব্রহ্মের উপরে সগুণ ভগবানকে ঘোষণা করেন। আমাদের প্রেম জ্ঞান ও শক্তি এই তিনকেই পূর্ণভাবে ছাড়া দিতে পারলেই, তবেই তো তাকে মুক্তি বলব— নির্গুণ ব্রহ্মে তার-যে কোনো স্থান নেই।

১ মাঘ

সমাজে মুক্তি

মানুষের কাছে কেবল জগৎপ্রকৃতি নয়, সমাজপ্রকৃতি বলে আর-একটি আশ্রয় আছে। এই সমাজের সঙ্গে মানুষের কোন্ সম্বন্ধটা সত্য সে কথা ভাবতে হয়। কারণ, সেই সত্য সম্বন্ধেই মানুষ সমাজে মুক্তিলাভ করে— মিথ্যাকে সে যতখানি আসন দেয় ততখানিই বদ্ধ হয়ে থাকে।

আমরা অনেক সময় বলেছি ও মনে করেছি প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সমাজে বদ্ধ হয়েছে। আমরা একত্রে দল বাঁধলে বিস্তর সুবিধা আছে। রাজা আমার বিচার করে, পুলিস আমার পাহারা দেয়, পৌরপরিষৎ আমার রাস্তা ঝাঁট দিয়ে যায়, ম্যাঞ্চেস্টার আমার কাপড় জোগায় এবং জ্ঞানলাভ প্রভৃতি আরো বড়ো বড়ো উদ্দেশ্যও এই উপায়ে সহজ হয়ে আসে। অতএব মানুষের সমাজ সমাজস্থ প্রত্যেকের স্বার্থসাধনের প্রকৃষ্ট উপায়।

এই প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সমাজে আবদ্ধ হয়েছে এই কথাকেই অন্তরের সঙ্গে যদি সত্য বলে জানি, তা হলে সমাজকে মানবহৃদয়ের কারাগার বলতে হয়— সমাজকে একটা প্রকাণ্ড-এঞ্জিন-ওআলা কারখানা বলে মানতে হয়— ক্ষুধানলদীপ্ত প্রয়োজনই সেই কলের কয়লা জোগাচ্ছে।

যে হতভাগ্য এইরকম অত্যন্ত-প্রয়োজন-ওআলা হয়ে সংসারের খাটুনি খেটে মরে সে তো কৃপাপাত্র সন্দেহ নেই।

সংসারের এই বন্দিশাল-মূর্তি দেখেই তো সন্ন্যাসী বিদ্রোহ করে ওঠে— সে বলে, 'প্রয়োজনের তাড়ায় আমি সমাজের হরিণবাড়িতে পাথর ভেঙে মরব? কোনোমতেই না। জানি আমি প্রয়োজনের অনেক বড়ো। ম্যাঞ্চেস্টার আমার কাপড় জোগাবে? দরকার কী। আমি কাপড় ফেলে দিয়ে বনে চলে যাব। বাণিজ্যের জাহাজ দেশ বিদেশ থেকে আমার খাদ্য এনে দেবে? দরকার নেই— আমি বনে গিয়ে ফল মূল খেয়ে থাকব।'

কিন্তু বনে গেলেও যখন প্রয়োজন আমার পিছনে পিছনে নানা আকারে তাড়া করে, তখন এতবড়ো স্পর্ধা আমাদের মুখে সম্পূর্ণ শোভা পায় না।

তবে সংসারের মধ্যে আমাদের মুক্তি কোন্‌খানে? প্রেমে। যখনই জানব প্রয়োজনই মানবসমাজের মূলগত নয়— প্রেমই এর নিগূঢ় এবং চরম আশ্রয়— তখনই এক মুহূর্তে আমরা বন্ধনমুক্ত হয়ে যাব। তখনই বলে উঠব— 'প্রেম! আঃ বাঁচা গেল। তবে আর কথা নেই।' কেননা, প্রেম যে আমারই জিনিস। এ তো আমাকে বাহির থেকে তাড়া লাগিয়ে বাধ্য করে না। প্রেমই যদি মানব সমাজের তত্ত্ব হয় তবে সে তো আমারই তত্ত্ব। অতএব প্রেমের দ্বারা মুহূর্তেই আমি প্রয়োজনের সংসার থেকে মুক্ত আনন্দের সংসারে উত্তীর্ণ হলুম। যেন পলকে স্বপ্ন ভেঙে গেল।

এই তো গেল মুক্তি। তার পরে? তার পরে অধীনতা। প্রেম মুক্তি পাবামাত্রই সেই মুক্তিক্ষেত্রে আপনার শক্তিকে চরিতার্থ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন তার কাজ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে ওঠে। তখন সে পৃথিবীর দীন দরিদ্রেরও দাস, তখন সে মূঢ় অধমেরও সেবক। এই হচ্ছে মুক্তির পরিণাম।

যে মুক্ত তার তো ওজর নেই। সে তো বলতে পারবে না, 'আমার আপিস আছে, আমার মনিব আছে, বাইরে থেকে তাড়া আছে।' কাজেই, যেখান থেকেই ডাক পড়ে, তার আর না বলবার জো নেই। মুক্তির এত বড়ো দায়। আনন্দের দায়ের মতো দায় আর কোথায় আছে।

যদি বলি মানুষ মুক্তি চায় তবে মিথ্যা কথা বলা হয়। মানুষ মুক্তির চেয়ে ঢের বেশি চায়, মানুষ অধীন হতেই চায়। যার অধীন হলে অধীনতার অন্ত থাকে না, তারই অধীন হবার জন্য সে কাঁদছে। সে বলছে, 'হে পরম প্রেম, তুমি যে আমার অধীন, আমি কবে তোমার অধীন হব! অধীনতার সঙ্গে অধীনতার পূর্ণ মিলন হবে কবে! যেখানে আমি উদ্ধত, গর্বিত, স্বতন্ত্র, সেইখানেই আমি পীড়িত, আমি ব্যর্থ। হে নাথ, আমাকে অধীন করে নত করে বাঁচাও। যতদিন আমি এই মিথ্যেটাকে অত্যন্ত করে জেনেছিলুম যে আমিই হচ্ছে আমি, তার অধিক আমি আর নেই, ততদিন আমি কী ঘোরাই ঘুরেছি।

আমার ধন আমার মনের বোঝা নিয়ে মরেছি। যখনই স্বপ্ন ভেঙে যায় বুঝতে পারি তুমি পরম-আমি আছ— আমার আমি তারই জোরে আমি— তখনই এক মুহূর্তে মুক্তিলাভ করি।' কিন্তু শুধু তো মুক্তিলাভ নয়। তার পরে পরম অধীনতা। পরম-আমির কাছে সমস্ত আমিত্বর অভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে একেবারে অনন্ত পরিপূর্ণ অধীনতার পরমানন্দ।

১ মাঘ

মত

আত্মা যে শরীরকে আশ্রয় করে সেই শরীর তাকে ত্যাগ করতে হয়। কারণ আত্মা শরীরের চেয়ে বড়ো। কোনো বিশেষ এক শরীর যদি আত্মাকে বরাবর ধারণ করে থাকতে পারত, তা হলে আত্মা যে শরীরের মধ্যে থেকেও শরীরকে অতিক্রম করে তা আমরা জানতেই পারতুম না। এই কারণেই আমরা মৃত্যুর দ্বারা আত্মার মহত্ত্ব অবগত হই।

আত্মা এই হ্রাসবৃদ্ধিমরণশীল শরীরের মধ্যে নিজেকে ব্যক্ত করে। তার এই প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত প্রকাশ, সম্পূর্ণ প্রকাশ নয়; এইজন্যে শরীরকেই আত্মা বলে যে জানে সে সম্পূর্ণ সত্য জানে না।

মানুষের সত্যজ্ঞান এক-একটি মতবাদকে আশ্রয় করে নিজেকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেই মতবাদটি সত্যের শরীর, সুতরাং এক হিসেবে সত্যের চেয়ে অনেক ছোটো এবং অসম্পূর্ণ।

এইজন্যে সত্যকে বারংবার মতদেহ পরিবর্তন করতে হয়। বৃহৎ সত্য তার অসম্পূর্ণ মতদেহের সমস্ত শক্তিকে শেষ করে ফেলে, তাকে জীর্ণ করে, বৃদ্ধ করে, অবশেষে যখন কোনো দিকেই আর কুলোয় না, নানা প্রকারেই সে অপ্রয়োজনীয় বাধাস্বরূপ হয়ে আসে, তখন তার মৃত্যুর সময় আসে। তখন তার নানাপ্রকার বিকার ও ব্যাধি ঘটতে থাকে ও শেষে মৃত্যু হয়।

আত্মা যে কোনো-একটা বিশেষ শরীর নয় এবং সমস্ত বিশেষ শরীরকেই সে অতিক্রম করে এই কথাটা যেমন উপলব্ধি করা আমাদের দরকার এবং এই উপলব্ধি জন্মালে যেমন আত্মার বিকার ও মৃত্যুর কল্পনায় আমরা ভীত ও পীড়িত হই নে— সেইরকম, মানুষ যে-সকল মহৎ সত্যকে নানা দেশে নানা কালে নানা রূপে প্রকাশ করতে চেষ্টা করছে এক-একবার তাকে তার মতদেহ থেকে স্বতন্ত্র করে সত্য-আত্মাকে স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। তা হলেই সত্যের অমৃতস্বরূপ জানতে পেরে আমরা আনন্দিত হই।

নইলে কেবলই মত এবং বাক্য নিয়ে বিবাদ করে আমরা অধীর হতে থাকি, এবং আমার মত স্থাপন করব ও অন্যের মত খণ্ডন করব এই অহংকার সুতীব্র হয়ে উঠে জগতে পীড়ার সৃষ্টি করে। এইরূপ বিবাদের সময় মতই প্রবল হয়ে উঠে সত্যকে যতই দূরে ফেলতে থাকে বিরোধের বিষও ততই তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই কারণে, মতের অত্যাচার যেমন নিষ্ঠুর ও মতের উন্মত্ততা যেমন উদ্দাম, এমন আর কিছুই না। এই কারণেই সত্য আমাদের ধৈর্যদান করে কিন্তু মত আমাদের ধৈর্যহরণ করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপে বলতে পারি অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ নিয়ে যখন আমরা বিবাদ করি তখন আমরা মত নিয়েই বিবাদ করি, সত্য নিয়ে নয়— সুতরাং সত্যকে আচ্ছন্ন করে বিস্মৃত হয়ে আমরা এক দিকে ক্ষতিগ্রস্ত হই, আর-এক দিকে বিরোধ করে আমাদের দুঃখ ঘটে।

আমাদের মধ্যে যাঁরা নিজেকে দ্বৈতবাদী বলে ঘোষণা করেন তাঁরা অদ্বৈতবাদকে বিভীষিকা বলে কল্পনা করেন। সেখানে তাঁরা মতের সঙ্গে রাগারাগি করে সত্যকে পর্যন্ত একঘরে করতে চান।

যাঁরা 'অদ্বৈতম্' এই সত্যটিকে লাভ করেছেন, তাঁদের সেই লাভটির মধ্যে প্রবেশ করো। তাঁদের কথায় যদি এমন-কিছু থাকে যা তোমাকে আঘাত করে সে দিকে মন দেবার দরকার নেই।

মায়াবাদ! শুনলেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠ কেন। মিথ্যা কি নেই? নিজের মধ্যে তার কি কোনো

পরিচয় পাওয়া যায় নি ? সত্য কি আমাদের কাছে একেবারেই উন্মুক্ত ? আমরা কি এককে আর বলে জানি নে ? কাঠকে দগ্ধ করে যেমন আগুন জ্বলে আমাদের অজ্ঞানকে, অবিদ্যাকে, মায়াকে দগ্ধ করেই কি আমাদের সত্যের জ্ঞান জ্বলছে না ? আমাদের পক্ষে সেই মায়ার ইন্ধন জ্ঞানের জ্যোতি-লাভের জন্য প্রয়োজনীয় হতে পারে, কিন্তু এই মিথ্যা কি ব্রহ্মে আছে ?

অনন্তের মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান যে একেবারে পর্যবসিত হয়ে আছে, অথচ আমার কাছে খণ্ডভাবে তা পরিবর্তনপরম্পরারূপে চলেছে, কোথাও তার পর্যাপ্তি নেই। এক জায়গায় ব্রহ্মের মধ্যে যদি কোনো পরিসমাপ্তি না থাকে, তবে আমরা এই-যে খণ্ড কালের ক্রিয়াকে অসমাপ্ত বলছি, একে অসমাপ্ত আখ্যা দেবারও কোনো তাৎপর্য থাকত না।

এই খণ্ডকালের অসমাপ্তি এক দিকে অনন্তকে প্রকাশও করছে, এক দিকে আচ্ছন্নও করছে। যে দিকে আচ্ছন্ন করছে সে দিকে তাকে কী বলব ? তাকে মায়া বলব না কি ? মিথ্যা বলব না কি ? তবে 'মিথ্যা' শব্দটার স্থান কোথায় ?

যিনি খণ্ড কালের সমস্ত খণ্ডতা সমস্ত ক্রমিকতার আক্রমণ থেকে ক্ষণকালের জন্যও বিমুক্ত হয়ে অনন্ত পরিসমাপ্তির নির্বিকার নিরঞ্জন অতলস্পর্শ-মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে নিমজ্জিত করে দিয়ে সেই স্তব্ধ শান্ত গভীর অদ্বৈতরসসমুদ্রে নিবিড়ানন্দের নিশ্চল স্থিতিলাভ করেছেন তাঁকে আমি ভক্তির সঙ্গে নমস্কার করি। আমি তাঁর সঙ্গে কোনো কথা নিয়ে বাদপ্রতিবাদ করতে চাই নে।

কেননা, আমি যে অনুভব করছি, মিথ্যার বোঝায় আমার জীবন ক্লান্ত। আমি যে দেখতে পাচ্ছি, যে পদার্থটাকে 'আমি' বলে ঠিক করে বসে আছি তারই থালা ঘটি বাটি তারই স্থাবর অস্থাবরের বোঝাকে সত্য পদার্থ বলে ভ্রম করে সমস্ত জীবন টেনে বেড়াচ্ছি— যতই দুঃখ পাই কোনোমতেই তাকেই ফেলতে পারি নে। অথচ অন্তরাত্মার ভিতরে একটা বাণী আছে— ও সমস্ত মিথ্যা, ও সমস্ত তোমাকে ত্যাগ করতেই হবে। মিথ্যার বস্তাকে সত্য বলে বহন করতে গেলে তুমি বাঁচবে না— তা হলে তোমার 'মহতী বিনষ্টিঃ'।

নিজের অহংকারকে, নিজের দেহকে, টাকাকড়িকে, খ্যাতি-প্রতিপত্তিকে একান্ত সত্য বলে জেনে অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছি এই যদি হয়, তবে এই মিথ্যার সীমা কোথায় টানব ? বুদ্ধির মূলে যে ভ্রম থাকাতে আমি নিজেকে ভুল জানছি, সেই ভ্রমই কি সমস্ত জগৎসম্বন্ধেও আমাদের ভোলাচ্ছে না ? সেই ভ্রমই কি আমার জগতের কেন্দ্রস্থলে আমার 'আমি'টিকে স্থাপন করে মরীচিকা রচনা করছে না ? তাই, ইচ্ছা কি করে না এই মাকড়সার জাল একেবারে ছিন্নভিন্ন পরিষ্কার করে দিয়ে সেই পরমাত্মার, সেই পরম-আমির, সেই একটিমাত্র আমির মাঝখানে অহংকারের সমস্ত আবরণ-বিবর্জিত হয়ে অবগাহন করি— ভারমুক্ত হয়ে, বাসনামুক্ত হয়ে, মলিনতামুক্ত হয়ে একেবারে সুবৃহৎ পরিত্রাণ লাভ করি ?

এই ইচ্ছা যে অন্তরে আছে, এই বৈরাগ্য যে সমস্ত উপকরণের ধাঁধার মাঝখানে পথভ্রষ্ট বালকের মতো থেকে থেকে কেঁদে উঠছে। তবে আমি মায়াবাদকে গাল দেব কোন্ মুখে। আমার মনের মধ্যে যে এক শ্মশানবাসী বসে আছে, সে যে আর কিছুই জানে না, সে যে কেবল জানে— একমেবাদ্বিতীয়ম্।

২ মাঘ

নির্বিশেষ

সংসার পদার্থটা আলো-আঁধার ভালোমন্দ জন্মমৃত্যু প্রভৃতি দ্বন্দ্বের নিকেতন এ কথা অত্যন্ত পুরাতন। এই দ্বন্দ্বের দ্বারাই সমস্ত খণ্ডিত। আকর্ষণ-শক্তি, বিপ্রকর্ষণশক্তি— কেন্দ্রানুগ শক্তি, কেন্দ্রাতিগ শক্তি— কেবলই বিরুদ্ধতা-দ্বারাই সৃষ্টিকে জাগ্রত করে রেখেছে।

কিন্তু এই বিরুদ্ধতাই যদি একান্ত সত্য হত তা হলে জগতের মধ্যে আমরা যুদ্ধকেই দেখতুম— শান্তিকে কোথাও কিছুমাত্র দেখতুম না।

অথচ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সমস্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধের উপরে অখণ্ড শান্তি বিরাজমান। তার কারণ, এই বিরোধ সংসারেই আছে, ব্রহ্মে নেই।

আমরা তর্কের জোরে সোজা লাইনকে অনন্তকাল সোজা করে টেনে নিয়ে চলতে পারি। আমরা মনে করি অন্ধকারকে সোজা করে টেনে চললে সে অনন্তকাল অন্ধকারই থাকবে— কারণ, অন্ধকারের একটা বিশিষ্টতা আছে, সেই বিশিষ্টতার কুত্রাপি অবসান নেই।

তর্কে এই প্রকার সোজা লাইন থাকতে পারে, কিন্তু সত্যে নেই। সত্যে গোল লাইন। অন্ধকারকে টেনে চলতে গেলে ধীরে ধীরে বেঁকে বেঁকে এক জায়গায় সে আলোয় গোল হয়ে ওঠে। সুখকে সোজা লাইনে টানতে গেলে সে দুঃখে এসে বেঁকে দাঁড়ায়— ভ্রমকে ঠেলে চলতে চলতে এক জায়গায় সে সংশোধনের রেখায় আপনি এসে পড়ে।

এর একটিমাত্র কারণ— অনন্তের মধ্যে বিরুদ্ধতার পক্ষপাত নেই। অখণ্ড আকাশ-গোলকের মধ্যে পূর্ব দিকের পূর্বত্ব নেই, পশ্চিমের পশ্চিমত্ব নেই— পূর্ব পশ্চিমের মাঝখানে কোনো বিরোধ নেই, এমন-কি, বিচ্ছেদও নেই। পূর্ব পশ্চিমের বিশেষত্ব খণ্ডআমির বিশেষত্বকে আশ্রয় করেই আছে।

এই-যে জিনিসটা ব্রহ্মের স্বরূপে নেই অথচ আছে, তাকে কী নাম দেওয়া যেতে পারে? বেদান্ত তাকে মায়া নাম দিয়েছেন— অর্থাৎ ব্রহ্ম যে সত্য, এ সে সত্য নয়। এ মায়া। যখনই ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে যাই তখনই একে আর দেখা যায় না। ব্রহ্মের দিক থেকে দেখতে গেলেই এ-সমস্ত অখণ্ড গোলকে অনন্তভাবে পরিসমাপ্ত। আমার দিক দিয়ে দেখতে গেলেই বিরোধের মধ্যে, প্রভেদের মধ্যে, বহুর মধ্যে বিচিত্র বিশেষে বিভক্ত।

এইজন্য যাঁরা সেই অখণ্ড অদ্বৈতের সাধনা করেন তাঁরা ব্রহ্মকে বিশেষ হতে মুক্ত করে বিশুদ্ধভাবে জানেন। ব্রহ্মকে নির্বিশেষ জানেন। এবং এই নির্বিশেষকে উপলব্ধি করাকেই তাঁরা জ্ঞানের চরম লক্ষ্য করেন।

এই-যে অদ্বৈতের বিরাট সাধনা, ছোটো বড়ো নানা মাত্রায় মানুষ এতে প্রবৃত্ত আছে। একেই মানুষ মুক্তি বলে। আপেল ফল পড়াকে মানুষ এক সময়ে একটা স্বতন্ত্র বিশেষ ঘটনা বলেই জানত। তার পরে তাকে একটা বিশ্বব্যাপী অতিবিশেষের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে জ্ঞানের বন্ধনমোচন করে দিলে। এইটি করাতেই মানুষ জ্ঞানের সার্থকতা লাভ করলে।

মানুষ অহংকারকে যখন একান্ত বিশেষ করে জানে তখন সে নিজের সেই আমিকে নিয়ে সকল দুষ্কর্মই করতে পারে। মানুষের ধর্মবোধ তাকে নিয়তই শিক্ষা দিচ্ছে, 'তোমার আমিই একান্ত নয়। তোমার আমিকে সমাজ-আমির মধ্যে মুক্তি দাও।' অর্থাৎ, তোমার বিশেষত্বকে অতিবিশেষের অভিমুখে নিয়ে চলো।

এই অতিবিশেষের অভিমুখে যদি বিশেষত্বকে না নিয়ে যাই তা হলে সংসার নিদারুণ বিশিষ্ট মূর্তি ধারণ করে আমাদের ঘাড়ের উপর চেপে বসে— তার সমস্ত পদার্থই একান্ত বোঝা হয়ে ওঠে। টাকা তখন অত্যন্ত একান্ত হয়ে উঠে অ-টাকাকে এমনি বিরুদ্ধ করে তোলে যে টাকার বোঝা কিছুতেই আর আমরা নামাতে পারি নে।

এই বন্ধন এই বোঝা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে মানুষের মধ্যে বড়ো বড়ো ভাব, মঙ্গলভাব, ধর্মভাব, কতরকম করে কাজ করছে। বড়োর মধ্যে ছোটোর বিশেষত্বগুলি নিজের ঐকান্তিকতা ত্যাগ করে :

এইজন্যে বড়োর মধ্যে বিশেষের দৌরাত্ম্য কম পড়াতে মানুষ বড়ো ভাবের আনন্দে ছোটোর বন্ধন, টাকার বন্ধন, খ্যাতির বন্ধন ত্যাগ করতে পারে।

তাই দেখা যাচ্ছে নির্বিশেষের অভিমুখেই মানুষের সমস্ত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা সমস্ত উন্নতির চেষ্টা কাজ করছে।

অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, বৈরাগ্যবাদ মানুষের এই ভাবকে এই সত্যকে সমুজ্জ্বল করে দেখেছে। সুতরাং মানুষকে অদ্বৈতবাদ একটা বৃহৎ সম্পদ দান করেছে। তার মধ্যে নানা অব্যক্ত অর্ধব্যক্ত ভাবে যে-সত্য কাজ করছিল, সমস্ত আবরণ সরিয়ে দিয়ে তারই সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়েছে।

কিন্তু যেখানেই হোক, বিশিষ্টতা বলে একটা পদার্থ এসেছে। তাকে মিথ্যাই বলি, মায়াই বলি, তার মস্ত একটা জোর সে আছে। এই জোর সে পায় কোথা থেকে?

ব্রহ্ম ছাড়া আর কোনো শক্তি (তাকে শয়তান বলো বা আর কোনো নাম দাও) কি বাইরে থেকে জোর করে এই মায়াকে আরোপ করে দিয়েছে? সে তো কোনোমতে মনেও করতে পারি নে।

উপনিষদে এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে— ব্রহ্মের আনন্দ থেকেই এ সমস্ত যা-কিছু হচ্ছে। এ তাঁর ইচ্ছা— তাঁর আনন্দ। বাইরের জোর নয়।

এমনি করে বিশেষের পথ পার হয়ে সেই নির্বিশেষে আনন্দের মধ্যে যেমনি পৌঁছানো যায়, অমনি লাইন ঘুরে আবার বিশেষের দিকে ফিরে আসে। কিন্তু তখন এই-সমস্ত বিশেষকে আনন্দের ভিতর দিয়ে দেখতে পাই— আর সে আমাদের বদ্ধ করতে পারে না। কর্ম তখন আনন্দের কর্ম হয়ে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে বেঁচে যায়— সংসার তখন আনন্দময় হয়ে ওঠে। কর্মই তখন চরম হয় না, সংসারই তখন চরম হয় না, আনন্দই তখন চরম হয়।

এমনি করে মুক্তি আমাদের যোগে নিয়ে আসে, বৈরাগ্য আমাদের প্রেমে উত্তীর্ণ করে দেয়।

৩ মাঘ

দুই

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যাতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।

উপনিষদের এই মন্ত্রটিকে আমি অনেকদিন অবজ্ঞা করে এসেছি। নানা কারণেই এই মন্ত্রটিকে খাপছাড়া এবং অদ্ভুত মনে হত।

বাল্যকাল থেকে আমরা এই মন্ত্রের অর্থ এইভাবে শুনে আসছি—

তিনি সর্বব্যাপী, নির্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণ -রহিত, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। তিনি সর্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ, তিনি সর্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থসকল বিধান করিতেছেন।

ঈশ্বরের নাম এবং স্বরূপের তালিকা নানা স্থানে শুনে শুনে আমাদের অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন এগুলি আবৃত্তি করা এত সহজ হয়ে পড়েছে যে, এজন্য আর চিন্তা করতে হয় না— সুতরাং যে শোনে তারও চিন্তা উদ্রেক করে না।

বাল্যকালে উল্লিখিত মন্ত্রটিকে আমি চিন্তার দ্বারা গ্রহণ করি নি, বরঞ্চ আমার চিন্তার মধ্যে একটি বিদ্রোহ ছিল। প্রথমত এর ব্যাকরণ এবং রচনাপ্রণালীতে ভারি একটা শৈথিল্য দেখতে পেতুম— তিনি সর্বব্যাপী এই কথাটাকে একটা ক্রিয়াপদের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে— যথা— স পর্যগাৎ; তার পরে তাঁর অন্য সংজ্ঞাগুলি শুক্রম্ অকায়ম্ প্রভৃতি বিশেষণ পদের দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে। দ্বিতীয়ত শুক্রম্ অকায়ম এগুলি ক্লীবলিঙ্গ, তার পরেই হঠাৎ কবির্মনীষী প্রভৃতি পুংলিঙ্গ বিশেষণের প্রয়োগ হয়েছে। তৃতীয়ত ব্রহ্মের শরীর নেই এই পর্যন্তই সহ্য করা যায়, কিন্তু ব্রণ নেই, স্নায়ু নেই বললে এক তো

বাহুল্য বলা হয়, তার পরে আবার কথাটাকে অত্যন্ত নামিয়ে নিয়ে আসা হয়। এই-সকল কারণে আমাদের উপাসনার এই মন্ত্রটি দীর্ঘকাল আমাকে পীড়িত করেছে।

অন্তঃকরণ যখন ভাবকে গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত থাকে না তখন শ্রদ্ধাহীন শ্রোতার কাছে কথাগুলি তার সমস্ত অর্থটা উদ্‌ঘাটিত করে দেয় না। অধ্যাত্মমন্ত্রকে যখন সাহিত্য-সমালোচকের কান দিয়ে শুনেছি তখন সাহিত্যের দিক দিয়েও তার ঠিক বিচার করতে পারি নি।

আমি সেজন্যে অনুতপ্ত নই, বরঞ্চ আনন্দিত। মূল্যবান জিনিসকে তখনই লাভ করা সৌভাগ্য, যখন তার মূল্য বোঝবার শক্তি কিছু পরিমাণে হয়েছে— যথার্থ অভাবের পূর্বে পেলে পাওয়ার আনন্দ ও সফলতা থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

পূর্বে আমি দেখতে পাই নি যে, এই মন্ত্রের দুটি ছত্রে দুটি ক্রিয়াপদ প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। একটি হচ্ছে পর্যগাৎ— তিনি সর্বত্রই গিয়েছেন, সর্বত্রই আছেন। আর-একটি হচ্ছে ব্যদধাৎ— তিনি সমস্তই করেছেন। এই মন্ত্রের এক অর্ধে তিনি আছেন, অন্য অর্ধে তিনি করছেন।

যেখানে আছেন সেখানে ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণ-পদ, যেখানে করছেন সেখানে পুংলিঙ্গ বিশেষণ। অতএব বাহুল্য কোনো কথা না বলে একটি ব্যাকরণের ইঙ্গিতের দ্বারা এই মন্ত্র একটি গভীর সার্থকতা লাভ করেছে।

তিনি সর্বত্র আছেন, কেননা তিনি মুক্ত, তাঁর কোথাও কোনো বাধা নেই। না আছে শরীরের বাধা, না আছে পাপের বাধা। তিনি আছেন এই ধ্যানটিকে সম্পূর্ণ করতে গেলে তাঁর সেই মুক্ত বিশুদ্ধ স্বরূপকে মনে উজ্জ্বল করে দেখতে হয়। তিনি যে কিছুতেই বদ্ধ নন এইটিই সর্বব্যাপিত্বের লক্ষণ।

শরীর যার আছে সে সর্বত্র নেই। শুধু সর্বত্র নেই তা নয় সে সর্বত্র নির্বিকারভাবে থাকতে পারে না, কারণ শরীরের ধর্মই বিকার। তাঁর শরীর নেই, সুতরাং তিনি নির্বিকার, তিনি অব্রণ। যার শরীর আছে সে ব্যক্তি স্নায়ু প্রভৃতির সাহায্যে নিজের প্রয়োজনসাধন করে— সেরকম সাহায্য তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। শরীর নেই বলার দরুন কী বলা হল তা ঐ অব্রণ ও অস্নাবিক বিশেষণের দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে— তাঁর শারীরিক সীমা নেই, সুতরাং তাঁর বিকার নেই এবং খণ্ডভাবে খণ্ড উপকরণের দ্বারা তাঁকে কাজ করতে হয় না। তিনি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং— কোনো প্রকার পাপ প্রবৃত্তি তাঁকে এক দিকে হেলিয়ে এক দিকে বেঁধে রাখে না। সুতরাং তিনি সর্বত্রই সম্পূর্ণ সমান। এই তো গেল— স পর্যগাৎ।

তার পরে— স ব্যদধাৎ। যেমন অনন্ত দেশে তিনি পর্যগাৎ, তেমনি অনন্তকালে তিনি ব্যদধাৎ। ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। নিত্যকাল হতে বিধান করেছেন এবং নিত্যকালের জন্য বিধান করছেন। সে বিধান কিছুমাত্র এলোমেলো নয়— যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ— যেখানকার যেটি অর্থ ঠিক সেইটেই একেবারে যথাতথরূপে বিধান করছেন। তার আর লেশমাত্র ব্যত্যয় হবার জো নেই।

এই যিনি বিধান করেন তাঁর স্বরূপ কী? তিনি কবি। এ স্থলে কবি শব্দের প্রতিশব্দস্বরূপ সর্বদর্শী কথাটা ঠিক চলে না। কেননা, এখানে তিনি যে কেবল দেখছেন তা নয়, তিনি করছেন। কবি শুধু দেখেন জানেন তা নয়, তিনি প্রকাশ করেন। তিনি যে কবি, অর্থাৎ তাঁর আনন্দ যে একটি সুশৃঙ্খল সুষমার মধ্যে সুবিহিত ছন্দে নিজেকে প্রকাশ করছে, তা তাঁর এই জগৎ-মহাকাব্য দেখলেই টের পাওয়া যায়। জগৎপ্রকৃতিতে তিনি কবি, মানুষের মনঃপ্রকৃতিতে তিনি অধীশ্বর। বিশ্বমানবের মন যে আপনা আপনি যেমন-তেমন করে একটা কাণ্ড করছে তা নয়, তিনি তাকে নিগূঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে ক্ষুদ্র থেকে ভূমার দিকে, স্বার্থ থেকে পরমার্থের দিকে নিয়ে চলেছেন। তিনিই হচ্ছেন পরিভূঃ। কী জগৎপ্রকৃতি কী মানুষের মন সর্বত্র তাঁর প্রভুত্ব। কিন্তু তাঁর কবিত্ব ও প্রভুত্ব বাইরের কিছু থেকে নিয়মিত হচ্ছে না, তিনি স্বয়ম্ভু— তিনি নিজেকেই নিজে প্রকাশ করেন। এইজন্যে তাঁর কর্মকে, তাঁর বিধানকে বাইরে থেকে দেশে বা কালে বাধা দেবার কিছুই নেই— এবং এই কারণেই শাশ্বতকালে তাঁর বিধান এবং যথাতথরূপে তাঁর বিধান।

আমাদের স্বভাবেও এইরকম ভাববাচ্য ও কর্মবাচ্য দুই বাচ্য আছে। আমরাও হই এবং করি। আমাদের হওয়া যতই বাধামুক্ত ও সম্পূর্ণ হবে আমাদের করাও ততই সুন্দর ও যথাযথ হয়ে উঠবে।

আমাদের হওয়ার পূর্ণতা কিসে ? না, পাপশূন্য বিশুদ্ধতায়। বৈরাগ্যদ্বারা আসক্তিবন্ধন থেকে মুক্ত হও— পবিত্র হও, নির্বিকার হও। সেই ব্রহ্মচর্যসাধনায় তোমার হওয়া যেমন সম্পূর্ণ হতে থাকবে, যতই তুমি তোমার বাধামুক্ত নিষ্পাপ চিত্তের দ্বারা সর্বত্র ব্যাপ্ত হতে থাকবে, যতই সকলের মধ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করবে— ততই তুমি সংসারকে কাব্য করে তুলবে, মনকে রাজ্য করে তুলবে, বাহিরে এবং অন্তরে প্রভুত্ব লাভ করবে। অর্থাৎ আত্মার স্বয়ম্ভুত্ব সুস্পষ্ট হবে, অনুভব করবে তোমার মধ্যে একটি মুক্তির অধিষ্ঠান আছে।

একই অনন্তচক্রে ভাব এবং কর্ম কেমন মিলিত হয়েছে, হওয়া থেকে করা স্বতই নিজের স্বয়ম্ভু আনন্দে কেমন করে সৌন্দর্যে ও ঐশ্বর্যে বহুধা হয়ে উঠেছে, বিশুদ্ধ-নির্বিশেষ বিচিত্র-বিশেষের মধ্যে কেমন ধরা দিয়েছেন, যিনি অকায় তিনি কায়ের কাব্যরচনা করছেন, যিনি অপাপবিদ্ধ তিনি পাপপুণ্যময় মনের অধিপতি হয়েছেন— কোনোখানে এর আর ছেদ পাওয়া যায় না— উপনিষদের ঐ একটি ছোটো মন্ত্রে সে কথা সমস্তটা বলা হয়েছে।

৪ মাঘ। কলিকাতা

বিশ্বব্যাপী

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপসু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষুধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।

ঈশ্বর সর্বত্র আছেন এ কথাটা আমাদের কাছে অত্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এইজন্য এই মন্ত্র আমাদের কাছে অনাবশ্যক ঠেকে। অর্থাৎ, এই মন্ত্রে আমাদের মনের মধ্যে কোনো চিন্তা জাগ্রত হয় না।

অথচ এ কথাও সত্য যে ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব সম্বন্ধে আমরা যতই নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি না কেন, তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ— এ আমাদের অভিজ্ঞতার কথা নয়, আমরা সেই দেবতাকে নমস্কার করতে পারি নে। ঈশ্বর সর্বব্যাপী এ আমাদের শোনা কথা মাত্র। শোনা কথা পুরাতন হয়ে যায়, মৃত হয়ে যায়। এ কথাও আমাদের পক্ষে মৃত।

কিন্তু এ কথা যাঁরা কানে শুনে বলেন নি— যাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা, মন্ত্রটিকে যাঁরা দেখেছেন তবে বলতে পেরেছেন— তাঁদের সেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বাণীকে অন্যমনস্ক হয়ে শুনলে চলে না। এ বাক্য যে কতখানি সত্য তা আমরা যেন সম্পূর্ণ সচেতন ভাবে গ্রহণ করি।

যে জিনিসকে আমরা সর্বদাই ব্যবহার করি, যাতে আমাদের প্রয়োজনসাধন হয়, আমাদের কাছে তার তাৎপর্য অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে যায়। স্বার্থ জিনিসটা যে কেবল নিজে ক্ষুদ্র তা নয়, যার প্রতি সে হস্তক্ষেপ করে তাকেও ক্ষুদ্র করে তোলে। এমন-কি, যে মানুষকে আমরা বিশেষভাবে প্রয়োজনে লাগাই, সে আমাদের কাছে তার মানবত্ব পরিহার করে বিশেষ যন্ত্রের শামিল হয়ে ওঠে। কেরানি তার আপিসের মনিবের কাছে প্রধানত যন্ত্র, রাজার কাছে সৈন্যরা যন্ত্র, যে চাষা আমাদের অন্নের সংস্থান করে দেয় সে সজীব লাঙল বললেই হয়। কোনো দেশের অধিপতি যদি এ কথা অত্যন্ত করে জানেন যে সেই দেশ থেকে তাঁদের নানাপ্রকার সুবিধা ঘটছে, তবে সেই দেশকে তারা সুবিহার কঠিন জড় আবরণে বেষ্টিত করে দেখেন— প্রয়োজন সম্বন্ধের অতীত যে চিত্ত তাকে তাঁরা দেখতে পারেন না।

জগৎকে আমরা অত্যন্ত ব্যবহারের সামগ্রী করে তুলেছি। এইজন্য তার জলস্থল-বাতাসকে আমরা অবজ্ঞা করি— তাদের আমরা অহংকৃত হয়ে ভৃত্য বলি এবং জগৎ আমাদের কাছে একটা যন্ত্র হয়ে ওঠে।

এই অবজ্ঞার দ্বারা আমরা নিজেকেই বঞ্চিত করি। যাকে আমরা বড়ো করে পেতুম তাকে ছোটো করে পাই, যাতে আমাদের চিত্তও পরিতৃপ্ত হত তাতে আমাদের কেবল পেট ভরে মাত্র।

যাঁরা জল স্থল বাতাসকে কেবল প্রতিদিনের ব্যবহারের দ্বারা জীর্ণ সংকীর্ণ করে দেখেন নি, যাঁরা নিত্য নবীন দৃষ্টি ও উজ্জ্বল জাগ্রত চৈতন্যের দ্বারা বিশ্বকে অন্তরের মধ্যে সমাদৃত অতিথির মতো গ্রহণ করেছেন এবং চরাচর সংসারের মাঝখানে জোড়হস্তে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছেন—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

তাঁদের উচ্চারিত এই সজীব মন্ত্রটিকে জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে ঈশ্বর যে সর্বব্যাপী এই জ্ঞানকে সর্বত্র সার্থক করো। যিনি সর্বত্র প্রত্যক্ষ, তাঁর প্রতি তোমার ভক্তি সর্বত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠুক।

বোধশক্তিকে আর অলস রেখো না, দৃষ্টির পশ্চাতে সমস্ত চিত্তকে প্রেরণ করো। দক্ষিণে বামে, অধোতে ঊর্ধ্বে, সম্মুখে পশ্চাতে চেতনার দ্বারা চেতনার স্পর্শলাভ করো। তোমার মধ্যে অহোরাত্র যে ধীশক্তি বিকীর্ণ হচ্ছে, সেই ধীশক্তি যোগে ভুরভুবঃস্বর্লোকে সর্বব্যাপী ধীকে ধ্যান করো— নিজের তুচ্ছতা-দ্বারা অগ্নি জলকে তুচ্ছ কোরো না। সমস্তই আশ্চর্য, সমস্তই পরিপূর্ণ। নমোনমঃ, নমোনমঃ— সর্বত্রই মাথা নত হোক, হৃদয় নম্র হোক এবং আত্মীয়তা প্রসারিত হয়ে যাক। যাকে বিনা মূল্যে পেয়েছ তাকে সচেতন সাধনার মূল্যে লাভ করো, যে অজস্র অক্ষয় সম্পদ বাহিরে রয়েছে তাকে অন্তরে গ্রহণ করে ধন্য হও।

য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ। পূর্বছত্রে আছে যিনি অগ্নিতে, জলে, যিনি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন— তারপরে আছে যিনি ওষধিতে বনস্পতিতে তাঁকে বার বার নমস্কার করি।

হঠাৎ মনে হতে পারে প্রথম ছত্রেই কথাটা নিঃশেষ হয়ে গেছে— তিনি বিশ্বভুবনেই আছেন। তবে কেন শেষের দিকে কথাটাকে এত ছোটো করে ওষধি বনস্পতির নাম করা হল!

বস্তুত মানুষের কাছে এইটেই শেষের কথা। ঈশ্বর বিশ্বভুবনে আছেন এ কথা বলা শক্ত নয় এবং আমরা অনায়াসেই বলে থাকি, এ কথা বলতে গেলে আমাদের উপলব্ধিকে অত্যন্ত সত্য করে তোলার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তার পরেও যে-ঋষি বলেছেন তিনি এই ওষধিতে এই বনস্পতিতে আছেন, সে-ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা। মন্ত্রকে তিনি কেবল মননের দ্বারা পান নি, দর্শনের দ্বারা পেয়েছেন। তিনি তাঁর তপোবনের তরুলতার মধ্যে কেমন পরিপূর্ণ চেতনভাবে ছিলেন, তিনি যে নদীর জলে স্নান করতেন সে স্নান কী পবিত্র স্নান, কী সত্য স্নান, তিনি যে-ফল ভক্ষণ করেছিলেন তার স্বাদের মধ্যে কী অমৃতের স্বাদ ছিল, তাঁর চক্ষে প্রভাতের সূর্যোদয় কী গভীর গম্ভীর কী অপরূপ প্রাণময় চৈতন্যময় সূর্যোদয়— সে কথা মনে করলে হৃদয় পুলকিত হয়।

তিনি বিশ্বভুবনে আছেন এ কথা বলে তাঁকে সহজে বিদায় করে দিলে চলবে না— কবে বলতে পারব তিনি এই ওষধিতে আছেন, এই বনস্পতিতে আছেন।

৫ মাঘ

মৃত্যুর প্রকাশ

আজ পিতৃদেবের মৃত্যুর বাৎসরিক।

তিনি একদিন ৭ই পৌষে ধর্মদীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের আশ্রমে সেই তাঁর দীক্ষাদিনের বার্ষিক উৎসব আমরা সমাধা করে এসেছি।

সেই ৭ই পৌষে তিনি যে-দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, ৬ই মাঘ মৃত্যুর দিনে সেই দীক্ষাকে সম্পূর্ণ করে তাঁর মহৎ জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করে গেছেন।

শিখা থেকে শিখা জ্বালাতে হয়। তাঁর সেই পরিপূর্ণ জীবন থেকে আমাদের অগ্নি গ্রহণ করতে হবে।

এইজন্য ৭ই পৌষে যদি তাঁর দীক্ষা হয়, ৬ই মাঘ আমাদের দীক্ষার দিন। তাঁর জীবনের সমাপ্তি আমাদের জীবনকে দীক্ষা দান করে— জীবনের দীক্ষা।

জীবনের ব্রত অতি কঠিন ব্রত, এই ব্রতের ক্ষেত্র অতি বৃহৎ, এর মন্ত্র অতি দুর্লভ, এর কর্ম অতি বিচিত্র, এর ত্যাগ অতি দুঃসাধ্য। যিনি দীর্ঘজীবনের নানা সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, মানে অপমানে তাঁর একটি মন্ত্র কোনোদিন বিস্মৃত হন নি, তাঁর একটি লক্ষ্য হতে কোনোদিন বিচলিত হন নি, যাঁর জীবনে এই প্রার্থনা সত্য হয়ে উঠেছিল— মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাম, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অনিরাকরণমস্তু— আমাকে ব্রহ্ম ত্যাগ করেন নি, আমি যেন তাঁকে ত্যাগ না করি, যেন তাঁকে পরিত্যাগ না হয়— তাঁরই কাছ থেকে আজ আমরা বিক্ষিপ্ত জীবনকে এক পরমলক্ষ্যে সার্থকতা দান করবার মন্ত্র গ্রহণ করব।

পরিপক্ক ফল যেমন বৃন্তচ্যুত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ দান করে— তেমনি মৃত্যুর দ্বারাই তিনি তাঁর জীবনকে আমাদের দান করে গেছেন। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে না পেলে এমন সম্পূর্ণ করে পাওয়া যায় না। জীবন নানা সীমার দ্বারা আপনাকে বেষ্টিত করে রক্ষা করে— সেই সীমা কিছু-না-কিছু বাধা রচনা করে।

মৃত্যুর দ্বারাই সেই মহাপুরুষ তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছেন— তার সমস্ত বাধা দূর হয়ে গেছে— এই জীবনকে নিয়ে আমাদের কোনো সাংসারিক প্রয়োজনের তুচ্ছতা নেই, কোনো লৌকিক ও সাময়িক সম্বন্ধের ক্ষুদ্রতা নেই। তার সঙ্গে কেবল একটি মাত্র সম্পূর্ণ যোগ হয়েছে, সে হচ্ছে অমৃতের যোগ। মৃত্যুই এই অমৃতকে প্রকাশ করে।

মৃত্যু আজ তাঁর জীবনকে আমাদের প্রত্যেকের নিকটে এনে দিয়েছে, প্রত্যেকের অন্তরে এনে দিয়েছে। এখন আমরা যদি প্রস্তুত থাকি, যদি তাঁকে গ্রহণ করি, তবে তাঁর জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনের রাসায়নিক সম্মিলনের কোনো ব্যাঘাত থাকে না। তাঁর পার্থিব জীবনের উৎসর্গ আজ কিনা ব্রহ্মের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে, সেইজন্যে তিনি আজ সম্পূর্ণরূপে আমাদের সকলের হয়েছেন। বনের ফুল পূজা-অবসানে প্রসাদীফুল হয়ে আজ বিশেষরূপেই সকলের সামগ্রী হয়েছেন। আজ সেই ফুলে তাঁর পূজার পুণ্য সম্পূর্ণ হয়েছে, আজ সেই ফুলে তাঁর দেবতার আশীর্বাদ মূর্তিমান হয়েছে। সেই পবিত্র নির্মাল্যটি মাথায় করে নিয়ে আজ আমরা বাড়ি চলে যাব, এইজন্য তাঁর মৃত্যুদিনের উৎসব। বিশ্বপাবন মৃত্যু আজ স্বয়ং সেই মহৎজীবনকে আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটন করে দাঁড়িয়েছেন— অদ্যকার দিন আমাদের পক্ষে যেন ব্যর্থ না হয়।

একদিন কোন্ ৭ই পৌষে তিনি একলা অমৃতজীবনের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, সেদিনকার সংবাদ খুব অল্প লোকেই জেনেছিল। ৬ই মাঘে মৃত্যু যখন যবনিকা উদ্‌ঘাটন করে দাঁড়াল তখন কিছুই আর প্রচ্ছন্ন রইল না। তাঁর একদিনের সেই একলার দীক্ষা আজ আমরা সকলে মিলে গ্রহণ করবার অধিকারী হয়েছি। সেই অধিকারকে আমরা সার্থক করে যাব।

৬ মাঘ। কলিকাতা

৫

নবযুগের উৎসব

নিজের অসম্পূর্ণতার মধ্যে সম্পূর্ণ সত্যকে আবিষ্কার করতে সময় লাগে। আমরা যে যথার্থ কী, আমরা যে কী করছি, তার পরিণাম কী, তার তাৎপর্য কী, সেইটি স্পষ্ট বোঝা সহজ কথা নয়।

বালক নিজেকে ঘরের ছেলে বলেই জানে। তার ঘরের সম্বন্ধকেই সে চরম সম্বন্ধ বলে জ্ঞান করে। সে জানে না সে ঘরের চেয়ে অনেক বড়ো। সে জানে না মানবজীবনে সকলের চেয়ে বড়ো সম্বন্ধ তার ঘরের বাইরেই।

সে মানুষ, সুতরাং সে সমস্ত মানবের। সে যদি ফল হয় তবে তার বাপ মা কেবল বৃন্তমাত্র ; সমস্ত মানববৃক্ষের সঙ্গে একেবারে শিকড় থেকে ডাল পর্যন্ত তার মজ্জাগত যোগ।

কিন্তু সে যে একান্তভাবে ঘরেরই নয়, সে যে মানুষ এ কথা শিশু অনেকদিন পর্যন্ত একেবারেই জানে না। তবু এ কথা একদিন তাকে জানতেই হবে যে, ঘর তাকে ঘরের মধ্যেই সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করবার জন্যে পালন করছে না, সে মানবসমাজের জন্যেই বেড়ে উঠছে।

আমরা আজ পঞ্চাশবৎসরের ঊর্ধ্বকাল এই ১১ই মাঘের উৎসব করে আসছি। আমরা কী করছি, এ উৎসব কিসের উৎসব, সে কথা আমাদের বোঝবার সময় হয়েছে ; আর বিলম্ব করলে চলবে না।

আমরা মনে করেছিলুম আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের উৎসব। ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের সম্বৎসরের ক্লান্তি ও অবসাদকে উৎসবের আনন্দে বিসর্জন দেবেন, তাঁদের ক্ষয়গ্রস্ত জীবনের ক্ষতিপূরণ করবেন, প্রতিদিনের সঞ্চিত মলিনতা ধৌত করে নেবেন, মহোৎসবক্ষেত্রে চিরনবীনতার যে অমৃত-উৎস আছে তারই জল পান করবেন এবং তাতেই স্নান করে নবজীবনে সদ্যোজাত শিশুর মতো প্রফুল্ল হয়ে উঠবেন।

এই লাভ এই আনন্দ ব্রাহ্মসমাজ উৎসবের থেকে গ্রহণ যদি করতে পারেন তবে ব্রাহ্মসম্প্রদায় ধন্য হবেন, কিন্তু এইটুকুতেই উৎসবের শেষ পরিচয় আমরা লাভ করতে পারি নে। আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের চেয়ে অনেক বড়ো ; এমন-কি, একে যদি ভারতবর্ষের উৎসব বলি তা হলেও একে ছোটো করা হবে।

আমি বলছি আমাদের এই উৎসব মানবসমাজের উৎসব। এ কথা যদি সম্পূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে আজ না বলতে পারি তা হলে চিত্তের সংকোচ দূর হবে না ; তা হলে এই উৎসবের ঐশ্বর্যভাণ্ডার আমাদের কাছে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হবে না ; আমরা ঠিক জেনে যাব না কিসের যজ্ঞে আমরা আহূত হয়েছি।

আমাদের উৎসবকে ব্রহ্মোৎসব বলব কিন্তু ব্রাহ্মোৎসব বলব না এই সংকল্প মনে নিয়ে আমি এসেছি ; যিনি সত্যম্ তাঁর আলোকে এই উৎসবকে সমস্ত পৃথিবীতে আজ প্রসারিত করে দেখব ; আমাদেব এই প্রাঙ্গণ আজ পৃথিবীর মহাপ্রাঙ্গণ— এর ক্ষুদ্রতা নেই।

একদিন ভারতবর্ষ তাঁর তপোবনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—

> শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
> আ যে দিব্যধামানি তস্থুঃ।
> বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
> আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

হে অমৃতের পুত্রগণ যারা দিব্যধামে আছ সকলে শোনো— আমি জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে জেনেছি।

প্রদীপ আপনার আলোককে কেবল আপনার মধ্যে গোপন করে রাখতে পারে না। মহান্তং পুরুষম্— মহান পুরুষকে, মহৎ সত্যকে যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা আর তো দরজা বন্ধ করে থাকতে পারে না ; এক মুহূর্তেই তাঁরা একেবারে বিশ্বলোকের মাঝখানে এসে দাঁড়ান ; নিত্যকাল তাঁদের কণ্ঠকে আশ্রয় করে আপন মহাবাণী ঘোষণা করেন ; দিব্যধামকে তাঁরা তাঁদের চারি দিকেই প্রসারিত দেখেন ;

আর, যে মানুষের মুখেই দৃষ্টিপাত করেন— সে মূর্খই হোক আর পণ্ডিতই হোক, সে রাজচক্রবর্তী হোক আর দীন দরিদ্রই হোক— অমৃতের পুত্র বলে তার পরিচয় প্রাপ্ত হন।

সেই যেদিন ভারতবর্ষের তপোবনে অনন্তের বার্তা এসে পৌঁচেছিল, সেদিন ভারতবর্ষ আপনাকে দিব্যধাম বলে জানতেন, সেদিন তিনি অমৃতের পুত্রদের সভায় অমৃতমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন ; সেদিন তিনি বলেছিলেন—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানাং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

যিনি সর্বভূতকেই পরমাত্মার মধ্যে এবং পরমাত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি কাউকেই আর ঘৃণা করেন না।

ভারতবর্ষ বলেছিলেন—

তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

যিনি সর্বব্যাপী, তাঁকে সর্বত্রই প্রাপ্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত ধীরেরা সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।

সেদিন ভারতবর্ষ নিখিল লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন ; জলস্থল-আকাশকে পরিপূর্ণ দেখেছিলেন, ঊর্ধ্বপূর্ণংমধ্যপূর্ণমধঃপূর্ণং দেখেছিলেন। সেদিন সমস্ত অন্ধকার তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন— বেদাহং, আমি জেনেছি, আমি পেয়েছি।

সেইদিনই ভারতবর্ষের উৎসবের দিন ছিল ; কেননা সেইদিনই ভারতবর্ষ তাঁর অমৃতযজ্ঞে সর্বমানবকে অমৃতের পুত্র বলে আহ্বান করেছিলেন— তাঁর ঘৃণা ছিল না, অহংকার ছিল না। তিনি পরমাত্মার যোগে সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছিলেন। সেদিন তাঁর আমন্ত্রণধ্বনি জগতের কোথাও সংকুচিত হয় নি ; তাঁর ব্রহ্মমন্ত্র বিশ্বসংগীতের সঙ্গে একতানে মিলিত হয়ে নিত্যকালের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল— সেই তাঁর ছিল উৎসবের দিন।

তার পরে বিধাতা জানেন কোথা হতে অপরাধ প্রবেশ করল। বিশ্বলোকের দ্বার চারি দিক হতে বন্ধ হতে লাগল, নির্বাপিত প্রদীপের মতো ভারতবর্ষ আপনার মধ্যে আপনি অবরুদ্ধ হল। প্রবল স্রোতস্বিনী যখন মরে আসতে থাকে তখন যেমন দেখতে দেখতে পদে পদে বালির চর জেগে উঠে তার সমুদ্রগামিনী ধারার গতিরোধ করে দেয়, তাকে বহুতর ছোটো ছোটো জলাশয়ে বিভক্ত করে— যে ধারা দূরদূরান্তরের প্রাণদায়িনী ছিল, যা দেশদেশান্তরের সম্পদ বহন করে নিয়ে যেত, যে অশ্রান্ত ধারার কলধ্বনি জগৎসংগীতের তানপুরার মতো পর্বতশিখর থেকে মহাসমুদ্র পর্যন্ত নিরন্তর বাজতে থাকত, সেই বিশ্বকল্যাণীধারাকে কেবল খণ্ড খণ্ড ভাবে এক-একটা ক্ষুদ্র গ্রামের সামগ্রী করে তোলে, সেই খণ্ডতাগুলি আপন পূর্বতন ঐক্যটিকে বিস্মৃত হয়ে বিশ্বনৃত্যে আর যোগ দেয় না, বিশ্বগীতসভায় আর স্থান পায় না— সেইরকম করেই নিখিল মানবের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধের পুণ্যধারা সহস্র সাম্প্রদায়িক বালুর চরে খণ্ডিত হয়ে গতিহীন হয়ে পড়ল। তার পরে, হায়, সেই বিশ্ববাণী কোথায় ? কোথায় সেই বিশ্বপ্রাণের তরঙ্গদোলা ? রুদ্ধ জল যেমন কেবলই ভয় পায় অল্পমাত্র অশুচিতায় পাছে তাকে কলুষিত করে, এইজন্যে সে যেমন স্নান পানের নিষেধের দ্বারা নিজের চারি দিকে বেড়া তুলে দেয়, তেমনি আজ বদ্ধ ভারতবর্ষ কেবলই কলুষের আশঙ্কায় বাহিরের বৃহৎ সংস্রবকে সর্বতোভাবে দূরে রাখবার জন্যে নিষেধের প্রাচীর তুলে দিয়ে সূর্যালোক এবং বাতাসকে পর্যন্ত তিরস্কৃত করেছেন— কেবলই বিভাগ, কেবলই বাধা। বিশ্বের লোক গুরুর কাছে বসে যে দীক্ষা নেবে সে দীক্ষার মন্ত্র কোথায়, সে দীক্ষার অবারিত মন্দির কোথায়। সে আহ্বানবাণী কোথায় যে বাণী একদিন চারি দিকে এই বলে ধ্বনিত হয়েছিল—

যথাপঃ প্রবতা যন্তি যথা মাসা অহর্জরম্ এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাতর্ আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।

জল যেমন স্বভাবতই নিম্নদেশে গমন করে, মাসসকল যেমন স্বভাবতই সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক হইতেই ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট আসুন, স্বাহা।

কিন্তু সেই স্বভাবের পথ যে আজ রুদ্ধ। ধর্ম জ্ঞান সমাজ তাদের সিংহদ্বার বন্ধ করে বসে আছে—

কেবল অন্তঃপুরের যাতায়াতের জন্যে খিড়কির দরজার ব্যবহার চলছে মাত্র।

সত্যসম্পদের দারিদ্র্য না ঘটলে এমন দুর্গতি কখনোই হয় না। যে বলতে পেরেছে বেদাহং, আমি জেনেছি, তাকে বেরিয়ে আসতেই হবে— তাকে বলতেই হবে ; শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।

এইরকম দৈন্যের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত দ্বার জানলা বন্ধ করে যখন ঘুমোচ্ছিলুম এমন সময় একটি ভোরের পাখির কণ্ঠ থেকে আমাদের রুদ্ধ ঘরের মধ্যে বিশ্বের নিত্যসংগীতের সুর এসে পৌঁছল— যে সুরে লোকলোকান্তর যুগযুগান্তর সুর মিলিয়েছে, যে সুরে পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে সূর্য তারা একই আত্মীয়তার আনন্দে ঝংকৃত হয়েছে— সেই সুর একদিন শোনা গেল।

আবার যেন কে বললে— বেদাহমেতং, আমি একে জেনেছি। কাকে জেনেছ ? আদিত্যবর্ণং— জ্যোতির্ময়কে জেনেছি, যাঁকে কেউ গোপন করতে পারে না। জ্যোতির্ময় ? কই তাঁকে তো আমার গৃহসামগ্রীর মধ্যে দেখছি নে। না, তোমার অন্ধকার দিয়ে ঢেকে তাঁকে তোমার ঘরের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখ নি। তাঁকে দেখছি তমসঃ পরস্তাৎ— তোমাদের সমস্ত রুদ্ধ অন্ধকারের পরপার হতে। তুমি যাকে তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে ধরে রেখেছ, পাছে আর কেউ সেখানে প্রবেশ করে বলে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছ, সে যে অন্ধকার। নিখিল মানব সেখান থেকে ফিরে ফিরে যায়, সূর্য চন্দ্র সেখানে দৃষ্টিপাত করে না। সেখানে জ্ঞানের স্থানে শাস্ত্রের বাক্য, ভক্তির স্থানে পূজাপদ্ধতি, কর্মের স্থানে অভ্যস্ত আচার। সেখানে দ্বারে একজন ভয়ংকর 'না' বসে আছে ; সে বলছে, 'না, না, এখানে না দূরে যাও দূরে যাও।' সে বলছে কান বন্ধ করো পাছে মন্ত্র কানে যায়, সরে বসো পাছে স্পর্শ লাগে, দরজা ঠেলো না পাছে তোমার দৃষ্টি পড়ে। এত 'না' দিয়ে তুমি যাকে ঢেকে রেখেছ আমি সেই অন্ধকারের কথা বলছি নে। কিন্তু— বেদাহমেতং, আমি তাঁকে জেনেছি যিনি নিখিলের, যাঁকে জানলে আর কাউকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না, কাউকে ঘৃণা করা যায় না— যাঁকে জানলে নিম্নদেশ যেমন জলসকলকে স্বভাবতই আহ্বান করে, সংবৎসর যেমন মাসসকলকে স্বভাবতই আহ্বান করে, তেমনি স্বভাবত সকলকেই অবাধে আহ্বান করবার অধিকার জন্মে— তাঁকেই জেনেছি।

ঘরের লোক ক্রুদ্ধ হয়ে ভিতর থেকে গর্জন করে উঠল— 'দূর করো, দূর করো, একে বের করে দাও। এ তো আমার ঘরের সামগ্রী নয়। এ তো আমার নিয়মকে মানবে না।'

না, এ তোমার ঘরের না, এ তোমার নিয়মের বাধ্য নয়। কিন্তু পারবে না— আকাশের আলোককে গায়ের জোর দিয়ে ঠেলে ফেলতে পারবে না। তার সঙ্গে বিরোধ করতে গেলেও তাকে স্বীকার করতে হবে। প্রভাত এসেছে।

প্রভাত এসেছে, আমাদের উৎসব এই কথা বলছে। আমাদের এই উৎসব ঘরের উৎসব নয়, ব্রাহ্মসমাজের উৎসব নয়, মানবের চিত্তগগনে যে প্রভাতের উদয় হচ্ছে এ যে সেই সুমহৎ প্রভাতের উৎসব।

বহু যুগ পূর্বে এই প্রভাত-উৎসবের পবিত্র গম্ভীর মন্ত্র এই ভারতবর্ষের তপোবনে ধ্বনিত হয়েছিল— একমেবাদ্বিতীয়ম্। অদ্বিতীয় এক। পৃথিবীর এই পূর্বদিগন্তে আবার কোন্ জাগ্রত মহাপুরুষ অন্ধকার রাত্রির পরপার হতে সেই মন্ত্র বহন করে এনে স্তব্ধ আকাশের মধ্যে স্পন্দন সঞ্চার করে দিলেন— একমেবাদ্বিতীয়ম্। অদ্বিতীয় এক।

এই যে প্রভাতের মন্ত্র উদয়শিখরের উপরে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিলে যে, একসূর্য উদয় হচ্ছেন, এবার ছোটো ছোটো অসংখ্য প্রদীপ নেবাও। এ মন্ত্র কোনো এক ঘরের মন্ত্র নয়, এই প্রভাত কোনো একটি দেশের প্রভাত নয়— হে পশ্চিম, তুমিও শোনো, তুমি জাগ্রত হও। শৃণ্বন্তু বিশ্বে। হে বিশ্ববাসী, সকলে শোনো। পূর্বগগনের প্রান্তে একটি বাণী জেগে উঠেছে— বেদাহমেতং, আমি জানতে পারছি। তমসঃ পরস্তাৎ, অন্ধকারের পরপার থেকে আমি জানতে পারছি। নিশাবসানের আকাশ উদয়োন্মুখ আদিত্যের আসন্ন আবির্ভাবকে যেমন করে জানতে পারে তেমনি করে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ

এই নূতন যুগে পৃথিবীর মানবচিত্তে যে প্রভাত আসছে সেই নব প্রভাতের বার্তা বাংলাদেশে আজ

আশি বৎসর হল প্রথম এসে উপস্থিত হয়েছিল। তখন পৃথিবীতে দেশের সঙ্গে দেশের বিরোধ, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের সংগ্রাম ; তখন শাস্ত্রবাক্য এবং বাহ্য প্রথার লৌহসিংহাসনে বিভাগই ছিল রাজা— সেই ভেদবুদ্ধির প্রাচীররুদ্ধ অন্ধকারের মধ্যে রাজা রামমোহন যখন অদ্বিতীয় একের আলোক তুলে ধরলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, যে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান ও খ্রীস্টানধর্ম আজ একত্র সমাগত হয়েছে সেই ভারতবর্ষেই বহু পূর্ব যুগে এই বিচিত্র অতিথিদের এক সভায় বসাবার জন্যে আয়োজন হয়ে গেছে। মানবসভ্যতা যখন দেশে দেশে নব নব বিকাশের শাখা-প্রশাখায় ব্যাপ্ত হতে চলেছিল তখন এই ভারতবর্ষ বারংবার মন্ত্র জপ করছিলেন— এক এক এক। তিনি বলছিলেন— ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি— এই একেকেই যদি মানুষ জানে তবে সে সত্য হয়। ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ— এই একেকে যদি না জানে তবে তার মহতী বিনষ্টি। এ-পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হয়েছে সে কেবল এই মহান্ একের উপলব্ধি-অভাবে। যত ক্ষুদ্রতা নিষ্ফলতা দৌর্বল্য সে এই একের থেকে বিচ্যুতিতে। যত মহাপুরুষের আবির্ভাব সে এই একেকে প্রচার করতে। যত মহাবিপ্লবের আগমন সে এই একেকে উদ্ধার করবার জন্যে।

যখন ঘোরতর বিভাগ বিরোধ বিক্ষিপ্ততার দুর্দিনের মধ্যে এই বাংলাদেশে অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় রূপে এই বিশ্বব্যাপী একের মন্ত্র 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' দ্বিধাবিহীন সুস্পষ্ট স্বরে উচ্চারিত হয়ে উঠল তখন এ কথা নিশ্চয় জানতে হবে, সমস্ত মানবচিত্তে কোথা হতে একটি নিগূঢ় জাগরণের বেগ সঞ্চারিত হয়েছে, এই বাংলাদেশে তার প্রথম সংবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

আমাদের দেশে আজ বিরাট মানবের আগমন হয়েছে। এখানে আমাদের রাজ্য নেই, বাণিজ্য নেই, গৌরব নেই, পৃথিবীতে আমরা সকলের চেয়ে মাথা নিচু করে রয়েছি— আমাদেরই এই দরিদ্র ঘরের অপমানিত শূন্যতার মাঝখানে বিরাট মানবের অভ্যুদয় হয়েছে। তিনি আজ আমাদেরই কাছে কর গ্রহণ করবেন বলে এসেছেন। সকল মানুষের কাছে নিত্যকালের ডালায় সাজিয়ে ধরতে পারি এমন কোনো রাজদুর্লভ অর্ঘ্য আমাদের এখানে সংগ্রহ হয়েছে, নইলে আমাদের এ সৌভাগ্য হত না। আমাদের এই উৎসর্গ বটের তলায় নয়, ঘরের দালানে নয়, গ্রামের মণ্ডপে নয়, এ উৎসর্গ বিশ্বের প্রাঙ্গণে। এইখানেই তাঁর প্রাপ্য নেবেন বলে বিশ্বমানব তাঁর দূতকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ; তিনি আমাদের মন্ত্র দিয়ে গিয়েছেন— একমেবাদ্বিতীয়ম্। বলে গিয়েছেন, 'মনে রাখিস, সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে মনে রাখিস অদ্বিতীয় এক। সকল বিরোধের মধ্যে ধরে রাখিস অদ্বিতীয় এক।'

সেই মন্ত্রের পর থেকেই আর আমাদের নিদ্রা নেই দেখছি। 'এক' আমাদের স্পর্শ করেছেন, আর আমরা সুস্থির থাকতে পারছি নে। আজ আমরা ঘর ছেড়ে, দল ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে বিশ্বপথের পথিক হব বলে চঞ্চল হয়ে উঠেছি। এ পথের পাথেয় আছে বলে জানতুম না— এখন দেখছি অভাব নেই। ঘরে বাহিরে অনৈক্যের দ্বারা যারা নিতান্ত বিচ্ছিন্ন, সমস্ত মানুষের মধ্যে তারাই 'এক'কে প্রচার করবার হুকুম পেয়েছে। এক জায়গায় সম্বল আছে বলেই এমন হুকুম এসে পৌঁছল।

তার পর থেকে আনাগোনা তো চলেইছে ; একে একে দূত আসছে। এই দেশে এমন একটি বাণী তৈরি হচ্ছে যা পূর্বপশ্চিমকে এক দিব্যধামে আহ্বান করবে, যা একের আলোকে অমৃতের পুত্রগণকে অমৃতের পরিচয়ে মিলিত করবে। রামমোহন রায়ের আগমনের পর থেকে আমাদের দেশের চিন্তা বাক্য ও কর্ম, সম্পূর্ণ না জেনেও, একটি চিরন্তনের অভিমুখে চলেছে। আমরা কোনো একটি জায়গায় নিত্যকে লাভ করব এবং প্রকাশ করব এমন একটি গভীর আবেগ আমাদের অন্তরের মধ্যে জোয়ারের প্রথম টানের মতো স্ফীত হয়ে উঠেছে। আমরা অনুভব করছি— সমাজের সঙ্গে সমাজ, বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞান, ধর্মের সঙ্গে ধর্ম যে এক পরমতীর্থে এক সাগরসংগমে পুণ্যস্নান করতে পারে তারই রহস্য আমরা আবিষ্কার করব। সেই কাজ যেন ভিতরে ভিতরে আরম্ভ হয়ে গেছে ; আমাদের দেশে পৃথিবীর যে একটি প্রাচীন গুরুকুল ছিল সেই গুরুকুলের দ্বার আবার যেন এখনই খুলবে এমনি আমাদের মনে হচ্ছে। কেননা কিছুকাল পূর্বে যেখানে একেবারে নিঃশব্দ ছিল এখন যে সেখানে কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। আর ঐ যে দেখছি বাতায়নে এক-একজন মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াচ্ছেন, তাঁদের মুখ দেখে চেনা

যাচ্ছে তাঁরা মুক্ত পৃথিবীর লোক, তাঁরা নিখিল মানবের আত্মীয়। পৃথিবীতে কালে কালে যে-সকল মহাপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন দেশে আগমন করেছেন সেই যাজ্ঞবল্ক্য বিশ্বামিত্র বুদ্ধ খ্রীস্ট মহম্মদ সকলকেই তাঁরা ব্রহ্মের বলে চিনেছেন ; তাঁরা মৃত বাক্য মৃত আচারের গোরস্থানে প্রাচীর তুলে বাস করেন না ; তাঁদের বাক্য প্রতিধ্বনি নয়, কার্য অনুকরণ নয়, গতি অনুবৃত্তি নয় ; তাঁরা মানবাত্মার মাহাত্ম্য-সংগীতকে এখনই বিশ্বলোকের রাজপথে ধ্বনিত করে তুলবেন। সেই মহাসংগীতের মূল ধুয়াটি আমাদের গুরু ধরিয়ে দিয়ে গেছেন— একমেবাদ্বিতীয়ম্। সকল বিচিত্র তানকেই এই ধুয়াতেই বারংবার ফিরিয়ে আনতে হবে— একমেবাদ্বিতীয়ম্।

আর আমাদের লুকিয়ে থাকবার জো নেই। এবার আমাদের প্রকাশিত হতে হবে— ব্রহ্মের আলোকে সকলের সামনে প্রকাশিত হতে হবে। বিশ্ববিধাতার নিকট থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে সমুদয় মানুষের কাছে এসে দাঁড়াতে হবে। সেই পরিচয়পত্রটি তিনি তাঁর দূতকে দিয়ে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কোন্ পরিচয় আমাদের ? আমাদের পরিচয় এই যে, আমরা তারা, যারা বলে না যে, ঈশ্বর বিশেষ স্থানে বিশেষ স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত। আমরা তারাই যারা বলে— একোবশী সর্বভূতান্তরাত্মা। সেই এক প্রভুই সর্বভূতের অন্তরাত্মা। আমরা তারাই যারা বলে না যে, বাহিরের কোনো প্রক্রিয়া-দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায় অথবা কোনো বিশেষ শাস্ত্রে ঈশ্বরের জ্ঞান বিশেষ লোকের জন্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। আমরা বলি— হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তঃ, হৃদয়স্থিত সংশয়রহিত বুদ্ধির দ্বারাই তাঁকে জানা যায়। আমরা তারাই যারা ঈশ্বরকে কোনো বিশেষ জাতির বিশেষ লভ্য বলি নে। আমরা বলি তিনি অবর্ণঃ এবং— বর্ণামনেকান্নিহিতার্থো দধাতি, সর্ব বর্ণেরই প্রয়োজন বিধান করেন, কোনো বর্ণকে বঞ্চিত করেন না। আমরা তারাই যারা এই বাণী ঘোষণার ভার নিয়েছি— এক, এক, অদ্বিতীয় এক। তবে আমরা আর স্থানীয় ধর্ম এবং সাময়িক লোকাচারের মধ্যে বাঁধা পড়ে থাকব কেমন করে। আমরা একের আলোকে সকলের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে প্রকাশ পাব। আমাদের উৎসব সেই প্রকাশের উৎসব, সেই বিশ্বলোকের মধ্যে প্রকাশের উৎসব, সেই কথা মনে রাখতে হবে। এই উৎসবে, সেই প্রভাতের প্রথম রশ্মিপাত হয়েছে যে প্রভাত একটি মহাদিনের অভ্যুদয় সূচনা করছে।

সেই মহাদিন এসেছে, অথচ এখনো সে আসে নি। অনাগত মহাভবিষ্যতে তার মূর্তি দেখতে পাচ্ছি। তার মধ্যে যে সত্য বিরাজ করছে সে তো এমন সত্য নয় যাকে আমরা একেবারে লাভ করে আমাদের সম্প্রদায়ের লোহার সিন্দুকে দলিল-দস্তাবেজের সঙ্গে চাবি বন্ধ করে বসে আছি, যাকে বলব এ আমাদের ব্রাহ্মসমাজের, ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের। না। আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি নি ; আমরা যে কিসের জন্য এই উৎসবকে বর্ষে বর্ষে বহন করে আসছি তা ভালো করে বুঝতে পারি নি। আমরা স্থির করেছিলুম এই দিনে একদা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়েছিল, আমরা ব্রাহ্মরা তাই উৎসব করি। কথাটা এমন ক্ষুদ্র নয়। এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ, এই যে মহান আত্মা, এই যে বিশ্বকর্মা দেবতা, যিনি সর্বদা জনগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন, তিনিই আজ বর্তমান যুগে জগতে ধর্মসমন্বয় জাতিসমন্বয়ের আহ্বান এই অখ্যাত বাংলাদেশের দ্বার হতে প্রেরণ করেছেন। আমরা তাই বলছি ধন্য, ধন্য, আমরা ধন্য। এই আশ্চর্য ইতিহাসের আনন্দকে আমরা মাঘোৎসবে জাগ্রত করছি। এই মহৎসত্যে আজ আমাদের উদ্‌বোধিত হতে হবে, বিধাতার এই মহতী কৃপায় যে গম্ভীর দায়িত্ব তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। বুদ্ধিকে প্রশস্ত করো, হৃদয়কে প্রসারিত করো, নিজেকে দরিদ্র বলে জেনো না, দুর্বল বলে মেনো না। তপস্যায় প্রবৃত্ত হও, দুঃখকে বরণ করো, ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে আরাম ভোগ করবার জন্যে জ্ঞানকে মৃতপ্রায় এবং কর্মকে যন্ত্রবৎ কোরো না— সত্যকে সকলের ঊর্ধ্বে স্বীকার করো এবং ব্রহ্মের আনন্দে জীবনকে পরিপূর্ণ করে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করো।

হে জনগণের হৃদয়াসন-সন্নিবিষ্ট বিশ্বকর্মা, তুমি যে আজ আমাদের নিয়ে তোমার কোন মহৎকর্ম রচনা করছ, হে মহান্ আত্মা, তা এখনো আমরা সম্পূর্ণ বুঝতে পারি নি। তোমার ভগবৎশক্তি আমাদের বুদ্ধিকে কোনখানে স্পর্শ করেছে, সেখানে কোথায় তোমার সৃষ্টিলীলা চলছে, তা এখনো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। জগৎ-সংসারে আমাদের গৌরবান্বিত ভাগ্য যে কোন্ দিগন্তরালে

আমাদের জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে তা বুঝতে পারছি নে বলে আমাদের চেষ্টা ক্ষণে ক্ষণে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে, আমাদের দৈন্যবুদ্ধি ঘুচছে না, আমাদের সত্য উজ্জ্বল হয়ে উঠছে না, আমাদের দুঃখ এবং ত্যাগ মহত্ত্ব লাভ করছে না। সমস্তই ছোটো হয়ে পড়ছে, স্বার্থ আরাম অভ্যাস এবং লোকভয়ের চেয়ে বড়ো কিছুকেই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি নে। এ কথা বলবার বল পাচ্ছি নে যে, সমস্ত সংসার যদি আমার বিরুদ্ধ হয় তবু আমার পক্ষে তুমি আছ, কেননা তোমার সংকল্প আমাতে সিদ্ধ হচ্ছে, আমার মধ্যে তোমার জয় হবে। হে পরমাত্মন্, এই আত্ম-অবিশ্বাসের আশাহীন অন্ধকার থেকে, এই জীবনযাত্রায় নাস্তিকতার নিদারুণ কর্তৃত্ব থেকে আমাদের উদ্ধার করো, উদ্ধার করো, আমাদের সচেতন করো। তোমার যে অভিপ্রায়কে আমরা বহন করছি তার মহত্ত্ব উপলব্ধি করাও, তোমার আদেশে জগতে আমরা যে নবযুগের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটন করবার জন্যে যাত্রা করেছি সে পথের লক্ষ্য কী তা যেন সাম্প্রদায়িক মূঢ়তায় আমরা পথিমধ্যে বিস্মৃত হয়ে না বসে থাকি। জগতে তোমার বিচিত্র আনন্দরূপের মধ্যে এক অপরূপ অরূপকে নমস্কার করি, নানা দেশে নানা কালে তোমার নানা বিধানের মধ্যে এক শাশ্বত বিধানকে আমরা মাথা পেতে নিই— ভয় দূর হোক, অশ্রদ্ধা দূর হোক, অহংকার দূর হোক। তোমার থেকে কিছুই বিচ্ছিন্ন নেই, সমস্তই তোমার এক অমোঘ শক্তিতে বিধৃত এবং এক মঙ্গলসংকল্পের বিশ্বব্যাপী আকর্ষণে চালিত এই কথা নিঃসংশয়ে জেনে সর্বত্রই ভক্তিকে প্রসারিত করে নতমস্তকে জোড়হাতে তোমারই সেই নিগূঢ় সংকল্পকে দেখবার চেষ্টা করি। তোমার সেই সংকল্প কোনো দেশে বদ্ধ নয়, কোনো কালে খণ্ডিত নয়, পণ্ডিতেরা তাকে ঘরে বসে গড়তে পারে না, রাজা তাকে কৃত্রিম নিয়মে বাঁধতে পারে না, এই কথা নিশ্চিত জেনে এবং সেই মহাসংকল্পের সঙ্গে আমাদের সমুদয় সংকল্পকে স্বেচ্ছাপূর্বক সম্মিলিত করে দিয়ে তোমার রাজধানীর রাজপথে যাত্রা করে বেরোই; আশার আলোকে আমাদের আকাশ প্লাবিত হয়ে যাক, হৃদয় বলতে থাক— আনন্দং পরমানন্দং, এবং আমাদের এই দেশ আপনার বেদীর উপরে আর-একবার দাঁড়িয়ে উঠে মানবসমাজের সমস্ত ভেদবিভেদের উপরে এই বাণী প্রচার করে দিক—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে দিব্যধামানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

[১১ মাঘ ১৩১৫]

ভাবুকতা ও পবিত্রতা

ভাবরসের জন্যে আমাদের হৃদয়ের একটা লোভ রয়েছে। আমরা কাব্য থেকে, শিল্পকলা থেকে, গল্প গান অভিনয় থেকে নানা উপায়ে ভাবরস সম্ভোগ করবার জন্যে নানা আয়োজন করে থাকি।

অনেক সময় আমরা উপাসনাকে সেই প্রকার ভাবের তৃপ্তিস্বরূপে অবলম্বন করতে ইচ্ছা করি। কিছুক্ষণের জন্যে একটা বিশেষ রস ভোগ করে আমরা মনে করি যেন আমরা একটা কিছু লাভ করলুম। ক্রমে এই ভোগের অভ্যাসটি একটি নেশার মতো হয়ে দাঁড়ায়। তখন মানুষ অন্যান্য রসলাভের জন্যে যেমন নানা আয়োজন করে, নানা লোক নিযুক্ত করে, নানা পণ্যদ্রব্য বিস্তার করে, এই রসের অভ্যস্ত নেশার জন্যেও সেইরকম নানাপ্রকার আয়োজন করে। যাঁরা ভালো করে বলতে পারেন সেইরকম লোক সংগ্রহ করে রসোদ্রেক করবার জন্যে নিয়মিত বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা হয়— ভগবৎ-রস নিয়মিত জোগান দেবার নানা দোকান তৈরি হয়ে ওঠে।

এইরকম ভাবের পাওয়াকেই পাওয়া বলে ভুল করা মানুষের দুর্বলতার একটা লক্ষণ। সংসারে নানাপ্রকারে আমরা তার পরিচয় পাই। এমন লোক দেখা যায় যারা অতি সহজেই গদ্‌গদ হয়ে ওঠে,

সহজেই গলা জড়িয়ে ধরে মানুষকে ভাই বলতে পারে— যাদের দয়া সহজেই প্রকাশ পায়, অশ্রু সহজেই নিঃসারিত হয় এবং সেইরূপ ভাব-অনুভব ও ভাব-প্রকাশকেই তারা ফললাভ বলে গণ্য করে। সুতরাং ঐখানেই থেমে পড়ে, আর বেশিদূর যায় না।

এই ভাবের রসকে আমি নিরর্থক বলি নে। কিন্তু একেই যদি লক্ষ্য বলে ভুল করি তা হলে এই জিনিসটি যে কেবল নিরর্থক হয় তা নয়, এ অনিষ্টকর হয়ে ওঠে। এইভাবকেই লক্ষ্য বলে ভুল মানুষ সহজেই করে, কারণ এর মধ্যে একটা নেশা আছে।

ঈশ্বরের আরাধনা-উপাসনার মধ্যে দুটি পাবার পন্থা আছে।

গাছ দুরকম করে খাদ্য সংগ্রহ করে। এক তার পল্লবগুলি দিয়ে বাতাস ও আলোক থেকে নিজের পুষ্টি গ্রহণ করে— আর এক তার শিকড় থেকে সে নিজের খাদ্য আকর্ষণ করে নেয়।

কখনো বৃষ্টি হচ্ছে, কখনো রৌদ্র উঠছে, কখনো শীতের বাতাস দিচ্ছে, কখনো বসন্তের হাওয়া বইছে— পল্লবগুলি চঞ্চল হয়ে উঠে তারই থেকে আপনার যা নেবার তা নিচ্ছে। তার পরে আবার শুকিয়ে ঝরে পড়ছে— আবার নতুন পাতা উঠছে।

কিন্তু শিকড়ের চাঞ্চল্য নেই। সে নিয়ত স্তব্ধ হয়ে, দৃঢ় হয়ে, গভীরতার মধ্যে নিজেকে বিকীর্ণ করে দিয়ে নিয়ত আপনার খাদ্য নিজের একান্ত চেষ্টায় গ্রহণ করছে।

আমাদেরও শিকড় এবং পল্লব এই দুটো দিক আছে। আমাদের আধ্যাত্মিক খাদ্য এই দুই দিক থেকেই নিতে হবে।

শিকড়ের দিক থেকে নেওয়া হচ্ছে প্রধান ব্যাপার। এইটিই হচ্ছে চরিত্রের দিক, এটা ভাবের দিক নয়। উপাসনার মধ্যে এই চরিত্র দিয়ে যা আমরা গ্রহণ করি তাই আমাদের প্রধান খাদ্য। সেখানে চাঞ্চল্য নেই, সেখানে বৈচিত্র্যের অন্বেষণ নেই— সেইখানেই আমরা শান্ত হই, স্তব্ধ হই, ঈশ্বরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হই। সেই জায়গাটির কাজ বড়ো অলক্ষ্য, বড়ো গভীর। সে ভিতরে ভিতরে শক্তি ও প্রাণ সঞ্চয় করে কিন্তু ভাবব্যক্তির দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করে না। সে ধারণ করে, পোষণ করে এবং গোপনে থাকে।

এই চরিত্র যে-শক্তির দ্বারা প্রাণ বিস্তার করে তাকে বলে নিষ্ঠা। সে অশ্রুপূর্ণ ভাবের আবেগ নয়, সে নিষ্ঠা। সে নড়তে চায় না, সে যেখানে ধরে আছে সেখানে ধরেই আছে, কেবলই গভীর থেকে গভীরতরে গিয়ে নাবছে। সে শুদ্ধচারিণী স্নাত পবিত্র সেবিকার মতো সকলের নীচে জোড়হাতে ভগবানের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে— দাঁড়িয়েই আছে।

হৃদয়ের কত পরিবর্তন। আজ তার যে-কথায় তৃপ্তি, কাল তার তাতে বিতৃষ্ণা। তার মধ্যে জোয়ার ভাঁটা খেলছে, কখনো তার উল্লাস কখনো অবসাদ। গাছের পল্লবের মতো তার বিকাশ আজ নূতন হয়ে উঠছে, কাল জীর্ণ হয়ে পড়ছে। এই পল্লবিত চঞ্চল হৃদয় নব নব ভাব-সংস্পর্শের জন্য ব্যাকুলতায় স্পন্দিত।

কিন্তু মূলের সঙ্গে, চরিত্রের সঙ্গে, যদি তার অবিচলিত অবিচ্ছিন্ন যোগ না থাকে তা হলে এই-সকল ভাবসংস্পর্শ তার পক্ষে আঘাত ও বিনাশেরই কারণ হয়। যে গাছের শিকড় কেটে দেওয়া হয়েছে, সূর্যের আলো তাকে শুকিয়ে ফেলে, বৃষ্টির জল তাকে পচিয়ে দেয়।

আমাদের চরিত্রের ভিতরকার নিষ্ঠা যদি যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য জোগানো বন্ধ করে দেয় তা হলে ভাবের ভোগ আমাদের পুষ্টিসাধন করে না, কেবল বিকৃতি জন্মাতে থাকে। দুর্বল ক্ষীণ চিত্তের পক্ষে ভাবের খাদ্য কুপথ্য হয়ে ওঠে।

চরিত্রের মূল থেকে প্রত্যহ আমরা পবিত্রতা লাভ করলে তবেই ভাবুকতা আমাদের সহায় হয়। ভাবরসকে খুঁজে বেড়াবার দরকার নেই, সংসারে ভাবের বিচিত্র প্রবাহ নানা দিক থেকে আপনিই এসে পড়ছে। পবিত্রতাই সাধনার সামগ্রী। সেটা বাইরের থেকে বর্ষিত হয় না— সেটা নিজের থেকে আকর্ষণ করে নিতে হয়। এই পবিত্রতাই আমাদের মূলের জিনিস, আর ভাবুকতা পল্লবের।

প্রত্যহ আমাদের উপাসনায় আমরা সুগভীর নিস্তব্ধ -ভাবে সেই পবিত্রতা গ্রহণের দিকেই আমাদের

চেতনাকে যেন উদ্‌বোধিত করে দিই। আর বেশি কিছু নয়, আমরা প্রতিদিন প্রভাতে সেই যিনি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করব। তাঁকে নত হয়ে প্রণাম করে বলব, 'তোমার পায়ের ধুলো নিলুম, আমার ললাট নির্মল হয়ে গেল। আজ আমার সমস্ত দিনের জীবনযাত্রার পাথেয় সঞ্চিত হল। প্রাতে তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছি, তোমাকে প্রণাম করেছি, তোমার পদধূলি মাথায় তুলে সমস্ত দিনের কর্মে নির্মল সতেজভাবে তার পরিচয় বহন করব।'

২ ফাল্গুন ১৩১৫

অন্তর বাহির

আমরা মানুষ, মানুষের মধ্যে জন্মেছি। এই মানুষের সঙ্গে নানাপ্রকার মেলবার জন্যে, তাদের সঙ্গে নানাপ্রকার আবশ্যকের ও আনন্দের আদানপ্রদান চালাবার জন্যে আমাদের অনেকগুলি প্রবৃত্তি আছে।

আমরা লোকালয়ে যখন থাকি তখন মানুষের সংসর্গে উত্তেজিত হয়ে সেই-সমস্ত প্রবৃত্তি নানা দিকে নানা প্রকারে নিজেকে প্রয়োগ করতে থাকে। কত দেখাশোনা, কত হাস্যালাপ, কত নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ, কত লীলাখেলায় সে যে নিজেকে ব্যাপৃত করে তার সীমা নেই।

মানুষের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রেমবশতই যে আমাদের এই চাঞ্চল্য এবং উদ্যম প্রকাশ পায় তা নয়। সামাজিক এবং প্রেমিক একই লোক নয়— অনেক সময় তার বিপরীতই দেখতে পাই। অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় সামাজিক ব্যক্তির মনে গভীরতর প্রেম ও দয়ার স্থান নেই।

সমাজ আমাদের ব্যাপৃত রাখে ; নানাপ্রকার সামাজিক আলাপ, সামাজিক কাজ, সামাজিক আমোদ সৃষ্টি করে আমাদের মনের উদ্যমকে আকর্ষণ করে নেয়। এই উদ্যমকে কোন্ কাজে লাগিয়ে কেমন করে মনকে শান্ত করব সে কথা আর চিন্তা করতেই হয় না— লোকলৌকিকতার বিচিত্র কৃত্রিম নালায় আপনি সে প্রবাহিত হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি অমিতব্যয়ী সে যে লোকের দুঃখ দূর করবার জন্যে দান করে নিজেকে নিঃস্ব করে তা নয়— ব্যয় করবার প্রবৃত্তিকে সে সংবরণ করতে পারে না। নানা রকমের খরচ করে তার উদ্যম ছাড়া পেয়ে খেলা করে খুশি হয়।

সমাজে আমাদের সামাজিকতা বহুলাংশে সেই ভাবে নিজের শক্তিকে খরচ করে, সে যে সমাজের লোকের প্রতি বিশেষ প্রীতিবশত তা নয়, কিন্তু নিজেকে খরচ করে ফেলবার একটা প্রবৃত্তি-বশত।

চর্চাদ্বারা এই প্রবৃত্তি কিরকম অপরিমিতিরূপে বেড়ে উঠতে পারে তা য়ুরোপে যারা সমাজবিলাসী তাদের জীবন দেখলে বোঝা যায়। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত তাদের বিশ্রাম নেই— উত্তেজনার পর উত্তেজনার আয়োজন। কোথায় শিকার, কোথায় নাচ, কোথায় খেলা, কোথায় ভোজ, কোথায় ঘোড়দৌড়, এই নিয়ে তারা উন্মত্ত। তাদের জীবন কোনো লক্ষ্য স্থির করে কোনো পথ বেয়ে চলছে না ; কেবল দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, এই উন্মাদনার রাশিচক্রে ঘুরছে।

আমাদের জীবনীশক্তির মধ্যে এত বেশি বেগ নেই বলে আমরা এতদূর যাই নে, কিন্তু আমরাও সমস্ত দিন অপেক্ষাকৃত মৃদুতরভাবে সামাজিক বাঁধা পথে কেবলমাত্র মনের শক্তিকে খরচ করবার জন্যেই খরচ করে থাকি। মনকে মুক্তি দেবার, শক্তিকে খাটিয়ে নেবার আর কোনো উপায় আমরা জানি নে।

দানে এবং ব্যয়ে অনেক তফাত। আমরা মানুষের জন্যে যা দান করি তা এক দিকে খরচ হয়ে অন্য দিকে মঙ্গলে পূর্ণ হয়ে ওঠে, কিন্তু মানুষের কাছে যা ব্যয় করি তা কেবলমাত্রই খরচ। তাতে দেখতে পাই আমাদের গভীরতর চিত্ত কেবলই নিঃস্ব হতে থাকে, সে ভরে ওঠে না। তার শক্তি হ্রাস হয়, তার ক্লান্তি আসে, অবসাদ আসে— নিজের রিক্ততা ও ব্যর্থতার ধিক্কারকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে

কেবলই তাকে নূতন নূতন কৃত্রিমতা রচনা করে চলতে হয়, কোথাও থামতে গেলেই তার প্রাণ বেরিয়ে যায়।

এইজন্যে যাঁরা সাধক, পরমার্থ লাভের জন্যে নিজের শক্তিকে যাঁদের খাটানো আবশ্যক, তাঁরা অনেক সময়ে পাহাড়ে পর্বতে নির্জনে লোকালয় থেকে দূরে চলে যান। শক্তির নিরন্তর অজস্র অপব্যয়কে তাঁরা বাঁচাতে চান।

কিন্তু বাইরে এই নির্জনতা, এই পর্বতগুহা কোথায় খুঁজে বেড়াব ? সে তো সব সময় জোটে না এবং মানুষকে একেবারে ত্যাগ করে যাওয়াও তো মানুষের ধর্ম নয়।

এই নির্জনতা, এই পর্বতগুহা, এই সমুদ্রতীর আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে— আমাদের অন্তরের মধ্যেই আছে। যদি না থাকত তা হলে নির্জনতায় পর্বতগুহায় সমুদ্রতীরে তাকে পেতুম না।

সেই অন্তরের নিভৃত আশ্রমের সঙ্গে আমাদের পরিচয়সাধন করতে হবে। আমরা বাইরেকেই অত্যন্ত বেশি করে জানি, অন্তরের মধ্যে আমাদের যাতায়াত প্রায় নেই, সেইজন্যেই আমাদের জীবনের ওজন নষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ, আমরা নিজের সমস্ত শক্তিকে বাইরেই অহরহ এই-যে নিঃশেষ করে ফতুর হয়ে যাচ্ছি, বাইরের সংস্রব পরিহার করাই তার প্রতিকার নয়— কারণ, মানুষকে ছেড়ে মানুষকে চলে যেতে বলা, রোগের চেয়ে চিকিৎসাকে গুরুতর করে তোলা। এর যথার্থ প্রতিকার হচ্ছে ভিতরের দিকেও আপনার প্রতিষ্ঠা লাভ করে অন্তরে বাহিরে নিজের সামঞ্জস্য স্থাপন করা। তা হলেই জীবন সহজেই নিজেকে উন্মত্ত অপব্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে।

নইলে একদল ধর্মলুব্ধ লোককে দেখতে পাই তারা নিজের কথাকে, হাসিকে, উদ্যমকে কেবলই মানদণ্ড হাতে করে হিসাবি কৃপণের মতো খর্ব করছে। তারা নিজের বরাদ্দ যতদূর কমানো সম্ভব তাই কমিয়ে নিজের মনুষ্যত্বকে কেবলই শুষ্ক কৃশ আনন্দহীন করাকেই সিদ্ধির লক্ষণ বলে মনে করছে।

কিন্তু এমন করলে চলবে না। আর যাই হোক, মানুষকে সম্পূর্ণ সহজ হতে হবে ; উদ্দামভাবে বেহিসাবি হলেও চলবে না, কৃপণভাবে হিসাবি হলেও চলবে না।

এই মাঝখানের রাস্তায় দাঁড়াবার উপায় হচ্ছে— বাহিরের লোকালয়ের মধ্যে থেকেও অন্তরের নিভৃত নিকেতনের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করা। বাহিরই আমাদের একমাত্র নয় অন্তরেই আমাদের গোড়াকার আশ্রয় রয়েছে তা বারংবার সকল আলাপের মধ্যে,আমোদের মধ্যে, কাজের মধ্যে অনুভব করতে হবে। সেই নিভৃত ভিতরের পথটিকে এমনি সরল করে তুলতে হবে যে, যখন-তখন ঘোরতর কাজকর্মের গোলযোগেও ধাঁ করে সেইখানে একবার ঘুরে আসা কিছুই শক্ত হবে না।

সেই-যে আমাদের ভিতরের মহলটি আমাদের জনতাপূর্ণ কলরবমুখর কাজের ক্ষেত্রের মাঝখানে একটি অবকাশকে সর্বদা ধারণ করে আছে, বেষ্টন করে আছে, এই অবকাশ তো কেবল শূন্যতা নয়। তা স্নেহে প্রেমে আনন্দে কল্যাণে পরিপূর্ণ। সেই অবকাশটিই হচ্ছেন তিনি যাঁর দ্বারা উপনিষৎ জগতের সমস্ত কিছুকেই আচ্ছন্ন দেখতে বলেছেন। ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। সমস্ত কাজকে বেষ্টন করে, সমস্ত মানুষকে বেষ্টন করে, সর্বত্রই সেই পরিপূর্ণ অবকাশটি আছেন ; তিনিই পরস্পরের যোগসাধন করছেন এবং পরস্পরের সংঘাত নিবারণ করছেন। সেই তাঁকেই নিভৃত চিত্তের মধ্যে নির্জন অবকাশরূপে নিরন্তর উপলব্ধি করবার অভ্যাস করো, শান্তিতে মঙ্গলে ও প্রেমে নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ অবকাশরূপে তাঁকে হৃদয়ের মধ্যে সর্বদাই জানো। যখন হাসছ খেলছ কাজ করছ তখনো একবার সেখানে যেতে যেন কোনো বাধা না থাকে— বাহিরের দিকেই একেবারে কাত হয়ে উলটে পড়ে তোমার সমস্ত-কিছুকেই নিঃশেষ করে ঢেলে দিয়ো না। অন্তরের মধ্যে সেই প্রগাঢ় অমৃতময় অবকাশকে উপলব্ধি করতে থাকলে তবেই সংসার আর সংকটময় হয়ে উঠবে না, বিষয়ের বিষ আর জমে উঠতে পারবে না— বায়ু দূষিত হবে না, আলোক মলিন হবে না, তাপে সমস্ত মন তপ্ত হয়ে উঠবে না।

ভাবো তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে, অন্য কথা ছাড়ো না।
সংসারসংকটে ত্রাণ নাহি কোনোমতে বিনা তাঁর সাধনা।

৩ ফাল্গুন

তীর্থ

আজ আবার বলছি— ভাবো তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে ! এই কথা যে প্রতিদিন বলার প্রয়োজন আছে। আমাদের অন্তরের মধ্যেই যে আমাদের চির আশ্রয় আছেন এ কথা বলার প্রয়োজন কবে শেষ হবে ?

কথা পুরাতন হয়ে ম্লান হয়ে আসে, তার ভিতরকার অর্থ ক্রমে আমাদের কাছে জীর্ণ হয়ে ওঠে, তখন তাকে আমরা অনাবশ্যক বলে পরিহার করি। কিন্তু প্রয়োজন দূর হয় কই ?

সংসারে এই বাহিরটাই আমাদের সুপরিচিত, এইজন্যে বাহিরকেই আমাদের মন একমাত্র আশ্রয় বলে জানে। আমাদের অন্তরে যে অনন্ত জগৎ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে সেটা যেন আমাদের পক্ষে একেবারেই নেই। যদি তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় বেশ সুস্পষ্ট হত তা হলে বাহিরের একাধিপত্য আমাদের পক্ষে এমন উদগ্র হয়ে উঠত না ; তা হলে বাহিরে একটা ক্ষতি হবামাত্র সেটাকে এমন একান্ত ক্ষতি বলে মনে করতে পারতুম না, এবং বাহিরের নিয়মকেই চরম নিয়ম মনে করে তার অনুগত হয়ে চলাকেই আমাদের একমাত্র গতি বলে স্থির করতুম না।

আজ আমাদের মানদণ্ড, তুলাদণ্ড, কষ্টিপাথর সমস্তই বাইরে। লোকে কী বলবে, লোকে কী করবে, সেই অনুসারেই আমাদের ভালোমন্দ সমস্ত ঠিক করে বসে আছি— এজন্য লোকের কথা আমাদের মর্মে বাজে, লোকের কাজ আমাদের এমন করে বিচলিত করে, লোকভয় এমন চরম ভয়, লোকলজ্জা এমন একান্ত লজ্জা। এইজন্যে লোকে যখন আমাদের ত্যাগ করে তখন মনে হয় জগতে আমার আর কেউ নেই। তখন আমরা এ কথা বলবার ভরসা পাই নে যে—

সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ,
তুমি আছ তার, আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ
সেও আছে তব ভবনে।

সবাই যাকে পরিত্যাগ করেছে তার আত্মার মধ্যে সে যে এক মুহূর্তের জন্যে পরিত্যক্ত নয় ; পথ যার গৃহ তার অন্তরের আশ্রয় যে কোনো মহাশক্তি অত্যাচারীও এক মুহূর্তের জন্যে কেড়ে নিতে পারে না ; অন্তর্যামীর কাছে যে ব্যক্তি অপরাধ করে নি বাইরের লোক যে তাকে জেলে দিয়ে, ফাঁসি দিয়ে, কোনোমতেই দণ্ড দিতে পারে না।

অরাজক রাজত্বের প্রজার মতো আমরা সংসারে আছি, আমাদের কেউ রক্ষা করছে না, আমরা বাইরে পড়ে রয়েছি, আমাদের নানা শক্তিকে নানা দিকে কেড়েকুড়ে নিচ্ছে, কত অকারণ লুটপাট হয়ে যাচ্ছে তার ঠিকানা নেই। যার অস্ত্র শাণিত সে আমাদের মর্ম বিদ্ধ করছে, যার শক্তি বেশি সে আমাদের পায়ের তলায় রাখছে। সুখসমৃদ্ধির জন্যে, আত্মরক্ষার জন্যে দ্বারে দ্বারে নানা লোকের শরণাপন্ন হয়ে বেড়াচ্ছি। একবার খবরও রাখি নে যে, অন্তরাত্মার অচল সিংহাসনে আমাদের রাজা বসে আছেন।

সেই খবর নেই বলেই তো সমস্ত বিচারের ভার বাইরের লোকের উপর দিয়ে বসে আছি, এবং আমিও অন্য লোককে বাইরে থেকে বিচার করছি। কাউকে সত্যভাবে ক্ষমা এবং নিত্যভাবে প্রীতি করতে পারছি নে, মঙ্গল-ইচ্ছা কেবলই সংকীর্ণ ও প্রতিহত হয়ে যাচ্ছে।

যতদিন সেই সত্যকে, সেই মঙ্গলকে, সেই প্রেমকে সম্পূর্ণ সহজভাবে না পাই, ততদিন প্রত্যহই বলতে হবে— ভাবো তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে। নিজের অন্তরাত্মার মধ্যে সেই সত্যকে যথার্থ উপলব্ধি করতে না পারলে অন্যের মধ্যেও সেই সত্যকে দেখতে পাব না এবং অন্যের সঙ্গে আমাদের সত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হবে না। যখন জানব যে পরমাত্মার মধ্যে আমি আছি এবং আমার মধ্যে পরমাত্মা রয়েছেন, তখন অন্যের দিকে তাকিয়ে নিশ্চয় দেখতে পাব সেও পরমাত্মার মধ্যে রয়েছে এবং পরমাত্মা তার মধ্যে রয়েছেন— তখন তার প্রতি ক্ষমা প্রীতি সহিষ্ণুতা আমার পক্ষে সহজ হবে, তখন সংযম

কেবল বাহিরের নিয়মপালনমাত্র হবে না। যে-পর্যন্ত তা না হয়, যে-পর্যন্ত বাহিরই আমাদের কাছে একান্ত, যে-পর্যন্ত বাহিরই সমস্তকে অত্যন্ত আড়াল করে দাঁড়িয়ে সমস্ত অবকাশ রোধ করে ফেলে— সে-পর্যন্ত কেবলই বলতে হবে—

ভাবো তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে অন্য কথা ছাড়ো না।
সংসারসংকটে ত্রাণ নাহি কোনোমতে বিনা তাঁর সাধনা।

কেননা, সংসারকে একমাত্র জানলেই সংসার সংকটময় হয়ে ওঠে— তখনই সে অরাজ অনাথকে পেয়ে বসে, তার সর্বনাশ করে ছাড়ে।

প্রতিদিন এসো, অন্তরে এসো। সেখানে সব কোলাহল নিরস্ত হোক, কোনো আঘাত না পৌঁছোক, কোনো মলিনতা না স্পর্শ করুক। সেখানে ক্রোধকে পালন কোরো না, ক্ষোভকে প্রশ্রয় দিয়ো না, বাসনাগুলিকে হাওয়া দিয়ে জ্বালিয়ে রেখো না, কেননা সেইখানেই তোমার তীর্থ, তোমার দেবমন্দির। সেখানে যদি একটু নিরালা না থাকে তবে জগতে কোথাও নিরালা পাবে না, সেখানে যদি কলুষ পোষণ কর তবে জগতে তোমার সমস্ত পুণ্যস্থানের ফটক বন্ধ। এসো সেই অক্ষুব্ধ নির্মল অন্তরের মধ্যে এসো, সেই অনন্তের সিন্ধুতীরে এসো, সেই অত্যচ্চের গিরিশিখরে এসো। সেখানে করজোড়ে দাঁড়াও, সেখানে নত হয়ে নমস্কার করো। সেই সিন্ধুর উদার জলরাশি থেকে, সেই গিরিশৃঙ্গের নিত্যবহমান নির্ঝরধারা থেকে, পুণ্যসলিল প্রতিদিন উপাসনান্তে বহন করে নিয়ে তোমার বাহিরের সংসারের উপর ছিটিয়ে দাও; সব পাপ যাবে, সব দাহ দূর হবে।

৪ ফাল্গুন

বিভাগ

ভিতরের সঙ্গে বাহিরের যে একটি সুনির্দিষ্ট বিভাগ থাকলে আমাদের জীবন সুবিহিত সুশৃঙ্খল সুসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, সেইটে আমাদের ঘটে নি।

বিভাগটি ভালোরকম না হলে ঐক্যটিও ভালোরকম হয় না। অপরিণতি যখন পিণ্ডাকারে থাকে, যখন তার কলেবর বৈচিত্র্যে বিভক্ত না হয়েছে, তখন তার মধ্যে একের মূর্তি পরিস্ফুট হয় না।

আমাদের মধ্যে খুব একটি বড়ো বিভাগের স্থান আছে, সেটি হচ্ছে অন্তর এবং বাহিরের বিভাগ। যতদিন সেই বিভাগটি বেশ সুনির্দিষ্ট না হবে ততদিন অন্তর ও বাহিরের ঐক্যটিও পরিপূর্ণ তাৎপর্যে সুন্দর হয়ে উঠবে না।

এখন আমাদের এমনি হয়েছে আমাদের একটিমাত্র মহল; স্বার্থপরমার্থ নিত্যঅনিত্য সমস্তই আমাদের ঐ এক জায়গায় যেমন-তেমন করে রাখা ছাড়া উপায় নেই। সেইজন্যে একটা অন্যটাকে আঘাত করে, বাধা দেয়, একের ক্ষতি অন্যের ক্ষতি হয়ে ওঠে।

যে-জিনিসটা বাহিরের তাকে বাহিরেই রাখতে হবে, তাকে অন্তরে নিয়ে গিয়ে তুললে সেখানে সেটা জঞ্জাল হয়ে ওঠে। সেখানে যার স্থান নয় সেখানে সে যে অনাবশ্যক তা নয়, সেখানে সে অনিষ্টকর।

অতএব আমাদের জীবনের প্রধান সাধনাই এই— বাহিরের জিনিস যাতে বাহিরেই থাকতে পারে, ভিতরে গিয়ে যাতে সে বিকারের সৃষ্টি না করে।

সংসারে আমাদের পদে পদে ক্ষতি হয়, আজ যা আছে কাল তা থাকে না। সেই ক্ষতিকে আমরা বাহিরের সংসারেই কেন রাখি না? তাকে আমরা ভিতরে নিয়ে গিয়ে তুলি কেন?

গাছের পাতা আজ কিশলয়ে উদ্‌গত হয়ে কাল জীর্ণ হয়ে ঝরে পড়ে। কিন্তু সে তো বাইরেই ঝরে পড়ে যায়। সেই তার বাহিরের অনিবার্য ক্ষতিকে গাছ তার মজ্জার ভিতরে তো পোষণ করে না। বাহিরের ক্ষতি বাইরেই থাকে, অন্তরের পুষ্টি অন্তরেই অব্যাহতভাবে চলে।

কিন্তু আমরা সেই ভেদটুকুকে রক্ষা করি নে। আমরা বাইরের সমস্ত জমাখরচ ভিতরের খাতাতে পাকা করে লিখে অমন সোনার জলে বাঁধানো দামি বইটাকে নষ্ট করি। বাইরের বিকারকে ভিতরে পাপকল্পনারূপে চিহ্নিত করি, বাইরের আঘাতকে ভিতরে বেদনায় জমা করে রাখতে থাকি।

আমাদের ভিতরের মহালে একটা স্থায়িত্বের ধর্ম আছে— সেখানে জমা করবার জায়গা। এইজন্যে সেখানে এমন-কিছু নিয়ে গিয়ে ফেলা ঠিক নয় যা জমাবার জিনিস নয়। তা নিয়ে গেলেই বিকারকে স্থায়ী করে তোলা হয়। মৃতদেহকে কেউ অন্তঃপুরের ভাণ্ডারে তুলে রাখে না, তাকে বাইরে মাটিতে জলে বা আগুনেই সমর্পণ করে দিতে হয়।

মানুষের মধ্যে এই দুটি কক্ষ আছে, স্থায়িত্বের এবং অস্থায়িত্বের— অন্তরের এবং সংসারের। অন্য জন্তুদের মধ্যেও সেটা অস্ফুটভাবে আছে— তেমন গভীরভাবে নেই। সেইজন্যে অন্য জন্তুরা একটা বিপদ থেকে বেঁচে গেছে। তারা, যেটা স্থায়ী নয়, সেটাকে স্থায়ী করবার চেষ্টাও করে না; কারণ, স্থায়ী করবার উপায় তাদের হাতে নেই।

মানুষও অস্থায়ীকে একেবারে চিরস্থায়িত্ব দান করতে পারে না বটে, কিন্তু অন্তরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তার উপরে স্থায়িত্বের মালমসলা প্রয়োগ করে তাকে যতদিন পারে টিকিয়ে রাখতে ত্রুটি করে না। তার অন্তরপ্রকৃতি নাকি স্থায়িত্বের নিকেতন, এইজন্যেই তার এই সুবিধাটা ঘটেছে।

তার ফল হয়েছে এই যে, জন্তুদের মধ্যে যে-সকল প্রবৃত্তি প্রয়োজনের অনুগত হয়ে আপন স্বাভাবিক কর্ম সমাধা করে একেবারে নিরস্ত হয়ে যায়, মানুষ তাকে নিজের অন্তরের মধ্যে নিজের কল্পনার রসে ডুবিয়ে তাকে সঞ্চিত করে রাখে। প্রয়োজনসাধনের সঙ্গে সঙ্গে তাকে মরতে দেয় না। এইজন্যে বাইরে যথাস্থানে যার একটি যাথার্থ্য আছে, অন্তরের মধ্যে সে পাপরূপে স্থায়ী হয়ে বসে। বাইরে যে-জিনিসটা অন্নসংগ্রহচেষ্টারূপে প্রাণ রক্ষা করবার উপায়, তাকেই যদি ভিতরে টেনে নিয়ে সঞ্চিত কর তবে সেইটেই তৃপ্তিহীন ঔদরিকতার নিত্যমূর্তি ধারণ করে স্বাস্থ্যকে নষ্ট করতেই থাকে।

তাই দেখতে পাচ্ছি আমাদের মধ্যে এই নিত্যের নিকেতন, পুণ্যের নিকেতন আছে বলেই আমাদের মধ্যে পাপের স্থান আছে। যা অনিত্য, বিশেষ সাময়িক প্রয়োজনে বিশেষ স্থানে যার প্রয়োগ এবং তার পরে যার শান্তি, তাকেই আমাদের অন্তরের নিত্যনিকেতনে নিয়ে বাঁচিয়ে রাখা এবং প্রত্যহই তার অনাবশ্যক খাদ্য জোগানোর জন্যে ঘুরে মরা, এইটেই হচ্ছে পাপ।

পুরাণে বলেছে অমৃত দেবতারই ভোগ্য, তা দৈত্যের খাদ্য নয়। যে দৈত্য চুরি করে সেই অমৃত পান করেছিল তারই মাথাটা রাহু এবং লেজটা কেতু -আকারে বৃথা বেঁচে থেকে নিদারুণ অমঙ্গলরূপে সমস্ত জগৎকে দুঃখ দিচ্ছে।

আমাদের যে-অন্তরভাণ্ডার দেবভোগ্য অমৃতের পাত্র রক্ষা করবার আগার, সেইখানে যদি দৈত্যকে গোপনে প্রবেশ করবার অধিকার দিই, তবে সে চুরি করে অমৃত পান করে অমর হয়ে ওঠে। তার পর থেকে প্রতিদিন সেই বিকট অমঙ্গলটার খোরাক জোগাতে আমাদের স্বাস্থ্য সুখ সম্বল সংগতি নিঃশেষ হয়ে যায়। অমৃতের ভাণ্ডার আছে বলেই আমাদের এই দুর্গতি।

এই অমৃতের নিত্যনিকেতনে দৈত্যের কোনো অধিকার নেই বটে, কিন্তু বাহিরে কর্মের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন যথেষ্ট। সে দুর্গম পথে ভার বহন করতে পারে, সে পর্বত বিদীর্ণ করে পথ করে দিতে পারে। তাকে দাসের বেতন যদি দাও তবে সে প্রভুর কাজ উদ্ধার করে দিয়ে কৃতার্থ হয়। কিন্তু অমৃত তো দাসের বেতন নয়, সে যে দেবতার পূজার ভোগসামগ্রী। তাকে অপাত্রে উৎসর্গ করাই পাপ। যাকে যথাকালে বাইরে থেকে মরতে দেওয়াই উচিত, তাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বাঁচিয়ে রাখলেই নিজের হাতে পাপকে সৃষ্টি করা হয়।

তাই বলছিলুম, যেটা বাইরের সেটাকে বাইরে রাখবার সাধনাই জীবনযাত্রার সাধনা।

৫ ফাল্গুন ১৩১৫

দ্রষ্টা

অন্তরকে বাইরের আক্রমণ থেকে বাঁচাও। দুইকে মিশিয়ে এক করে দেখো না। সমস্তটাকেই কেবলমাত্র সংসারের অন্তর্গত করে জেনো না। তা যদি কর তবে সংসারসংকট থেকে উদ্ধার পাবার কোনো রাস্তা খুঁজে পাবে না।

থেকে থেকে ঘোরতর কর্মসংঘাতের মাঝখানেই নিজের অন্তরকে নির্লিপ্ত বলে অনুভব করো। এইরকম ক্ষণে ক্ষণে বারংবার উপলব্ধি করতে হবে। খুব কোলাহলের ভিতরে থেকে একবার চকিতের মতো দেখে নিতে হবে— সেই অন্তরের মধ্যে কোনো কোলাহল পৌঁচচ্ছে না। সেখানে শান্ত, স্তব্ধ, নির্মল। না, কোনোমতেই সেখানে বাহিরের কোনো চাঞ্চল্যকে প্রবেশ করতে দেব না। এই-যে আনাগোনা, লোকলৌকিকতা, হাসিখেলার মহা জনতা, এর মধ্যে বিদ্যুদ্‌বেগে একবার অন্তরের অন্তরে ঘুরে এসো— দেখে এসো সেখানে নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপটি জ্বলছে, অনুত্তরঙ্গ সমুদ্র আপন অতলস্পর্শ গভীরতায় স্থির হয়ে রয়েছে, শোকের ক্রন্দন সেখানে পৌঁছয় না, ক্রোধের গর্জন সেখানে শান্ত।

এই বিশ্বসংসারে এমন কিছুই নেই, একটি কণাও নেই, যার মধ্যে পরমাত্মা ওতপ্রোত হয়ে না রয়েছেন, কিন্তু তবু তিনি দ্রষ্টা— কিছুর দ্বারা তিনি অধিকৃত নন। এই জগৎ তাঁরই বটে, তিনি এর সর্বত্রই আছেন বটে, কিন্তু তবু তিনি এর অতীত হয়ে আছেন।

আমাদের অন্তরাত্মাকেও সেইরকম করেই জানবে— সংসার তাঁর, শরীর তাঁর, বুদ্ধি তাঁর, হৃদয় তাঁর। এই সংসারে শরীরে বুদ্ধিতে হৃদয়ে তিনি পরিব্যাপ্ত হয়েই আছেন, কিন্তু তবু আমাদের অন্তরাত্মা এই সংসার শরীর বুদ্ধি ও হৃদয়ের অতীত। তিনি দ্রষ্টা। এই যে-আমি সংসারে জন্মলাভ করে বিশেষ নাম ধরে নানা সুখ দুঃখ ভোগ করছে, এই তাঁর বহিরংশকে তিনি সাক্ষীরূপেই দেখে যাচ্ছেন। আমরা যখন আত্মবিৎ হই, এই অন্তরাত্মাকে যখন সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি, তখন আমরা নিজের নিত্য স্বরূপকে নিশ্চয় জেনে সমস্ত সুখ-দুঃখের মধ্যে থেকেও সুখ-দুঃখের অতীত হয়ে যাই, নিজের জীবনকে সংসারকে দ্রষ্টারূপে জানি।

এমনি করে সমস্ত কর্ম থেকে, সংসার থেকে, সমস্ত ক্ষোভ থেকে, বিবিক্ত করে আত্মাকে যখন বিশুদ্ধ স্বরূপে জানি তখন দেখতে পাই তা শূন্য নয়; তখন নিজের অন্তরে সেই নির্মল নিস্তব্ধ পরম ব্যোমকে, সেই চিদাকাশকে দেখি যেখানে— সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম নিহিতং গুহায়াম্‌। নিজের মধ্যে সেই আশ্চর্য জ্যোতির্ময় পরমকোষকে জানতে পারি যেখানে সেই অতি শুভ্র জ্যোতির জ্যোতি বিরাজমান।

এইজন্যই উপনিষৎ বারংবার বলেছেন, অন্তরাত্মাকে জানো, তা হলেই অমৃতকে জানবে, তা হলেই পরমকে জানবে। তা হলে সমস্তের মাঝখানে থেকেই, সকলের মধ্যে প্রবেশ করেই, কিছুই পরিত্যাগ না করে মুক্তি পাবে— নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

৬ ফাল্গুন

নিত্যধাম

উপনিষৎ বলেছেন—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্‌ ন বিভেতি কদাচন।

ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জেনেছেন তিনি কদাচই ভয় পান না।

সেই ব্রহ্মের আনন্দকে কোথায় দেখব, তাকে জানব কোন্‌খানে? অন্তরাত্মার মধ্যে।

আত্মাকে একবার অন্তরনিকেতনে, তার নিত্যনিকেতনে দেখো— যেখানে আত্মা বাহিরের হর্ষশোকের অতীত, সংসারের সমস্ত চাঞ্চল্যের অতীত, সেই নিভৃত অন্তরতম গুহার মধ্যে প্রবেশ করে

দেখো— দেখতে পাবে আত্মার মধ্যে পরমাত্মার আনন্দ নিশিদিন আবির্ভূত হয়ে রয়েছে, এক মুহূর্ত তার বিরাম নেই। পরমাত্মা এই জীবাত্মায় আনন্দিত। যেখানে সেই প্রেমের নিরন্তর মিলন সেইখানে প্রবেশ করো, সেইখানে তাকাও। তা হলেই ব্রহ্মের আনন্দ যে কী, তা নিজের অন্তরের মধ্যেই উপলব্ধি করবে, এবং তা হলেই কোনোদিন কিছু হতেই তোমার আর ভয় থাকবে না।

ভয় তোমার কোথায় ? যেখানে আধিব্যাধি জরামৃত্যু বিচ্ছেদমিলন, যেখানে আনাগোনা, যেখানে সুখদুঃখ। আত্মাকে কেবলই যদি সেই বাহিরের সংসারেই দেখ— যদি তাকে কেবলই কার্য থেকে কার্যান্তরে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরেই উপলব্ধি করতে থাক, তাকে বিচিত্রের সঙ্গে চঞ্চলের সঙ্গেই একেবারে জড়িত মিশ্রিত করে এক করে জান, তা হলেই তাকে নিতান্ত দীন করে মলিন করে দেখবে, তা হলেই তাকে মৃত্যুর দ্বারা বেষ্টিত দেখে কেবলই শোক করতে থাকবে, যা সত্য নয় স্থায়ী নয় তাকেই আত্মার সঙ্গে জড়িত করে সত্য বলে স্থায়ী বলে ভ্রম করবে এবং শেষকালে সে-সমস্ত যখন সংসারের নিয়মে খসে পড়তে থাকবে তখন মনে হবে যেন আত্মারই ক্ষয় হচ্ছে, বিনাশ হচ্ছে— এমনি করে বারংবার শোকে নৈরাশ্যে দগ্ধ হতে থাকবে। সংসারকেই তুমি ইচ্ছা করে বড়ো পদ দেওয়াতে সংসার তোমার দত্ত সেই জোরে তোমার আত্মাকে পদে পদে অভিভূত পরাস্ত করে দেবে। কিন্তু আত্মাকে অন্তরধামে নিত্যের মধ্যে ব্রহ্মের মধ্যে দেখো, তা হলেই হর্ষশোকের সমস্ত জোর চলে যাবে। তা হলে ক্ষতিতে নিন্দাতে পীড়াতে মৃত্যুতে কিসেই বা ভয় ? জয়ী, আত্মা জয়ী। আত্মা ক্ষণিক সংসারের দাসানুদাস নয়— আত্মা অনন্তে অমরতায় প্রতিষ্ঠিত। আত্মায় ব্রহ্মের আনন্দ আবির্ভূত। সেইজন্য আত্মাকে যাঁরা সত্যরূপে জানেন তাঁরা ব্রহ্মের আনন্দকে জানেন এবং ব্রহ্মের আনন্দকে যাঁরা জানেন তাঁরা— ন বিভেতি কদাচন।

পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তঃ
নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব।

পরমব্রহ্মের মধ্যে যাঁরা আপনাকে যুক্ত করে দেখেছেন তাঁরা নন্দিত হন, নন্দিত হন, নন্দিতই হন। আর, সংসারে যাঁরা নিজেকে যুক্ত করে জানেন তাঁরা শোচতি শোচতি শোচত্যেব।

৭ ফাল্গুন ১৩১৫

পরিণয়

চারি দিকে সংসারে আমরা দেখছি— সৃষ্টিব্যাপার চলছেই। যা ব্যাপ্ত তা সংহত হচ্ছে, যা সংহত তা ব্যাপ্ত হচ্ছে। আঘাত হতে প্রতিঘাত, রূপ হতে রূপান্তর চলেইছে— এক মুহূর্ত তার কোথাও বিরাম নেই। সকল জিনিসই পরিণতির পথে চলেছে, কিন্তু কোনো জিনিসেরই পরিসমাপ্তি নেই। আমাদের শরীর-বুদ্ধি-মনও প্রকৃতির এই চক্রে ঘুরছে, ক্রমাগতই তার সংযোগবিয়োগ হ্রাসবৃদ্ধি তার অবস্থান্তর চলেছে।

প্রকৃতির এই সূর্যতারাময় লক্ষকোটি চাকার রথ ধাবিত হচ্ছে— কোথাও এর শেষ গম্যস্থান দেখি নে, কোথাও এর স্থির হবার নেই। আমরাও কি এই রথে চড়েই এই লক্ষ্যহীন অনন্তপথেই চলেছি, যেন এক জায়গায় যাবার আছে এইরকম মনে হচ্ছে অথচ কোনোকালে কোথাও পৌঁছতে পারছি নে ? আমাদের অস্তিত্বই কি এইরকম অবিশ্রাম চলা, এইরকম অনন্ত সন্ধান ? এর মধ্যে কোথাও কোনোরকম প্রাপ্তির, কোনোরকম স্থিতির তত্ত্ব নেই ?

এই যদি সত্য হয়, দেশকালের বাইরে আমাদের যদি কোনো গতিই না থাকে, তা হলে যিনি দেশকালের অতীত, যিনি অভিব্যজ্যমান নন, যিনি আপনাতে পরিসমাপ্ত, তিনি আমাদের পক্ষে একেবারেই নেই। সেই পূর্ণতার স্থিতিধর্ম যদি আমাদের মধ্যে একান্তই না থাকে, তবে অনন্তস্বরূপ

পরব্রহ্মের প্রতি আমরা যা-কিছু বিশেষণ প্রয়োগ করি সে কেবল কতকগুলি কথা মাত্র, আমাদের কাছে তার কোনো অর্থই নেই।

তা যদি হয় তবে এই ব্রহ্মের কথাটাকে একেবারেই ত্যাগ করতে হয়। যাঁকে কোনোকালেই পাব না তাঁকে অনন্তকাল খোঁজার মতো বিড়ম্বনা আর কী আছে? তা হলে এই কথাই বলতে হয় সংসারকেই পাওয়া যায়, সংসারই আমার আপনার, ব্রহ্ম আমার কেউ নন।

কিন্তু সংসারকে তো পাওয়া যায় না। সংসার তো মায়ামৃগের মতো আমাদের কেবলই এগিয়ে নিয়ে দৌড় করায়, শেষ ধরা তো দেয় না। কেবলই খাটিয়ে মারে, ছুটি দেয় না— ছুটি যদি দেয় তো একেবারে বরখাস্ত করে। এমন কোনো সম্বন্ধ স্বীকার করে না যা চরম সম্বন্ধ। শ্যাকরা গাড়ির গাড়োয়ানের সঙ্গে ঘোড়ার যে সম্বন্ধ তার সঙ্গে আমাদেরও সেই সম্বন্ধ। অর্থাৎ, সে কেবলই আমাদের চালাবে, খাওয়াবে সেও চালাবার জন্যে, মাঝে মাঝে যেটুকু বিশ্রাম করাবে সেও কেবল চালাবার জন্যে, চাবুক লাগাম সমস্তই চালাবার উপকরণ। যখন না চলব তখন খাওয়াবে না, আস্তাবলেও রাখবে না, ভাগাড়ে ফেলে দেবে। অথচ এই চালাবার ফল ঘোড়া পায় না। ঘোড়া স্পষ্ট করে জানেও না সে ফল কে পাচ্ছে। ঘোড়া কেবল জানে যে তাকে চলতেই হবে; সে মূঢ়ের মতো কেবলই নিজেকে প্রশ্ন করছে, 'কোনো কিছুই পাচ্ছি নে, কোথাও গিয়ে পৌঁচচ্ছি নে, তবু দিনরাত কেবলই চলছি কেন?' পেটের মধ্যে অগ্নিময় ক্ষুধার চাবুক পড়ছে, হৃদয় মনের মধ্যে কত শত জ্বালাময় ক্ষুধার চাবুক পড়ছে, কোথাও স্থির থাকতে দিচ্ছে না। এর অর্থ কী?

যাই হোক, কথা হচ্ছে এই যে, সংসারকে তো কোনোখানেই পাচ্ছি নে, তার কোনোখানে এসেই থামছি নে— ব্রহ্মও কি সেই সংসারেরই মতো? তাঁকেও কি কোনোখানেই পাওয়া যাবে না? তিনিও কি আমাদের অনন্তকালই চালাবেন এবং সেই পাওয়াহীন চলাকেই অনন্ত উন্নতি বলে আমরা নিজের মনকে কেবলই কোনোমতে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করব?

তা নয়, ব্রহ্মকেই পাওয়া যায়, সংসারকে পাওয়া যায় না। কারণ, সংসারের মধ্যে পাওয়ার তত্ত্ব নেই— সংসারের তত্ত্বই হচ্ছে সরে যাওয়া, সুতরাং তাকেই চরমভাবে পাবার চেষ্টা করলে কেবল দুঃখই পাওয়া হবে। কিন্তু ব্রহ্মকেও চরমভাবে পাবার চেষ্টা করলে কেবল চেষ্টাই সার হবে এ কথা বলা কোনোমতেই চলবে না। পাওয়ার তত্ত্ব কেবল একমাত্র ব্রহ্মেই আছে। কেননা, তিনিই হচ্ছেন সত্য।

আমাদের অন্তরাত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে পাওয়া পরিসমাপ্ত হয়ে আছে। আমরা যেমন যেমন বুদ্ধিতে হৃদয়ে উপলব্ধি করছি তেমনি তেমনি তাঁকে পাচ্ছি— এ হতেই পারে না। অর্থাৎ যেটা ছিল না সেইটেকে আমরা গড়ে তুলছি, তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধটা আমাদের নিজের এই ক্ষুদ্র হৃদয় ও বুদ্ধির দ্বারা সৃষ্টি করছি, এ ঠিক নয়। এই সম্বন্ধ যদি আমাদেরই দ্বারা গড়া হয় তবে তার উপরে আস্থা রাখা চলে না, তবে সে আমাদের আশ্রয় দিতে পারবে না। আমাদের মধ্যেই একটি নিত্যধাম আছে। সেখানে দেশকালের রাজত্ব নয়, সেখানে ক্রমশসৃষ্টির পালা নেই। সেই অন্তরাত্মার নিত্যধামে পরমাত্মার পূর্ণ আবির্ভাব পরিসমাপ্ত হয়েই আছে। তাই উপনিষৎ বলছেন—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্, সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।

সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যোম, যে পরম ব্যোম, যে চিদাকাশ, অন্তরাকাশ, সেইখানে আত্মার মধ্যে যিনি সত্যজ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মকে গভীরভাবে অবস্থিত জানেন, তার সমস্ত বাসনা পরিপূর্ণ হয়।

ব্রহ্ম কোনো একটি অনির্দেশ্য অনন্তের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে আছেন, এ কথা বলবার কোনো মানে নেই। তিনি আমাদেরই অন্তরাকাশে আমাদেরই অন্তরাত্মায় সত্যং জ্ঞানমনন্তং রূপে সুগভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এইটি ঠিকমত জানলে বাসনায় আমাদের আর বৃথা ঘুরিয়ে মারে না— পরিপূর্ণতার উপলব্ধিতে আমরা স্থির হতে পারি।

সংসার আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু ব্রহ্ম আমাদের মধ্যেই আছেন। এইজন্য সংসারকে সহস্র চেষ্টায় আমরা পাই নে, ব্রহ্মকে আমরা পেয়ে বসে আছি।

পরমাত্মা আমাদের আত্মাকে বরণ করে নিয়েছেন— তাঁর সঙ্গে এর পরিণয় একেবারে সমাধা হয়ে গেছে। তার আর কোনো কিছু বাকি নেই, কেননা তিনি একে স্বয়ং বরণ করেছেন। কোন্ অনাদিকালে সেই পরিণয়ের মন্ত্র পড়া হয়ে গেছে। বলা হয়ে গেছে— যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। এর মধ্যে আর ক্রমাভিব্যক্তির পৌরোহিত্য নেই। তিনি 'অস্য' 'এষঃ' হয়ে আছেন। তিনি এর এই রয়ে বসেছেন, নাম করবার জো নেই। তাই তো ঋষি কবি বলেন—

এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোঽস্য পরমোলোকঃ, এষোঽস্য পরম আনন্দঃ।

পরিণয় তো সমাপ্তই হয়ে গেছে, সেখানে আর কোনো কথা নেই। এখন কেবল অনন্ত প্রেমের লীলা। যাঁকে পাওয়া হয়ে গেছে তাঁকেই নানারকম করে পাচ্ছি— সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, লোকে লোকান্তরে। বধূ যখন সেই কথাটা ভালো করে বোঝে তখন তার আর কোনো ভাবনা থাকে না। তখন সংসারকে তার স্বামীর সংসার বলে জানে, সংসার তাকে আর পীড়া দিতে পারে না— সংসারে তার আর ক্লান্তি নেই, সংসারে তার প্রেম। তখন সে জানে যিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং হয়ে অন্তরাত্মাকে চিরদিনের মতো গ্রহণ করে আছেন, সংসারে তাঁরই আনন্দরূপমমৃতং বিভাতি— সংসারে তাঁরই প্রেমের লীলা এইখানেই নিত্যের সঙ্গে অনিত্যের চিরযোগ— আনন্দের, অমৃতের যোগ। এইখানেই আমাদের সেই বরকে, সেই চিরপ্রাপ্তকে, সেই একমাত্র প্রাপ্তকে বিচিত্র বিচ্ছেদ মিলনের মধ্যে দিয়ে, পাওয়া না-পাওয়ার বহুতর ব্যবধান-পরম্পরার ভিতর দিয়ে, নানা রকমে পাচ্ছি; যাঁকে পেয়েছি তাঁকেই আবার হারিয়ে হারিয়ে পাচ্ছি, তাঁকেই নানা রসে পাচ্ছি। যে বধূর মূঢ়তা ঘুচেছে, এই কথাটা যে জেনেছে, এই রস যে বুঝেছে, সেই আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন। যে না জেনেছে, যে সেই বরকে ঘোমটা খুলে দেখে নি, বরের সংসারকেই কেবল দেখেছে, সে, যেখানে তার রানীর পদ সেখানে দাসী হয়ে থাকে— ভয়ে মরে, দুঃখে কাঁদে, মলিন হয়ে বেড়ায়—

দৌর্ভিক্ষ্যাৎ যাতি দৌর্ভিক্ষ্যং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াৎ ভয়ম্।

৯ ফাল্গুন ১৩১৫

৬

তিনতলা

আমাদের তিনটে অবস্থা দেখতে পাই। তিনটে বড়ো বড়ো স্তরে মানবজীবন গড়ে তুলছে— একটা প্রাকৃতিক, একটা ধর্মনৈতিক, একটা আধ্যাত্মিক।

প্রথম অবস্থায় প্রকৃতিই আমাদের সব। তখন আমরা বাইরেই থাকি। তখন প্রকৃতিই আমাদের সমস্ত উপলব্ধির ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। তখন বাইরের দিকেই আমাদের সমুদয় প্রবৃত্তি, সমুদয় চিন্তা, সমুদয় প্রয়াস। এমন-কি, আমাদের মনের মধ্যে যা গড়ে ওঠে তাকেও আমরা বাইরে স্থাপন না করে থাকতে পারি না— আমাদের মনের জিনিসগুলিও আমাদের কল্পনায় বাহ্যরূপ গ্রহণ করতে থাকে। আমরা সত্য তাকেই বলি যাকে দেখতে ছুঁতে পাওয়া যায়। এইজন্য আমাদের দেবতাকেও আমরা কোনো বাহ্য পদার্থের মধ্যে বদ্ধ করে অথবা তাঁকে কোনো বাহ্যরূপ দান করে, আমরা তাঁকে প্রাকৃতিক বিষয়েরই সামিল করে দিই। বাহিরের এই দেবতাকে আমরা বাহ্য প্রক্রিয়া -দ্বারা শান্ত করবার চেষ্টা করি। তাঁর সম্মুখে বলি দিই, খাদ্য দিই, তাঁকে কাপড় পরাই। তখন দেবতার অনুশাসনগুলিও বাহ্য

অনুশাসন। কোন্ নদীতে স্নান করলে পুণ্য, কোন্ খাদ্য আহার করলে পাপ, কোন্ দিকে মাথা রেখে শুতে হবে, কোন্ মন্ত্র কিরকম নিয়মে কোন্ তিথিতে কোন্ দণ্ডে উচ্চারণ করা আবশ্যক, এই সমস্তই তখন ধর্মানুষ্ঠান।

এমনি করে দৃষ্টি ঘ্রাণ স্পর্শাদি -দ্বারা, মনের দ্বারা, কল্পনার দ্বারা, ভয়ের দ্বারা, ভক্তির দ্বারা বাহিরকে নানারকম করে নেড়েচেড়ে তাকে নানারকমে আঘাত করে এবং তার দ্বারা আঘাত খেয়ে আমরা বাহিরের পরিচয়ের সীমায় এসে ঠেকি। তখন বাহিরকেই আর পূর্বের মতো একমাত্র বলে মনে হয় না। তখন তাকেই আমাদের একমাত্র গতি, একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র সম্পদ বলে আর জানি নে। সে আমাদের সম্পূর্ণ আশাকে জাগিয়ে তুলে একদিন আমাদের সমস্ত মনকে টেনে নিয়েছিল বলেই, যখন আমরা তার সীমা দেখতে পেলুম তখন তার উপরে আমাদের একান্ত অশ্রদ্ধা জন্মাল। তখন প্রকৃতিকে মায়াবিনী বলে গাল দিতে লাগলুম, সংসারকে একেবারে সর্বতোভাবে অস্বীকার করবার জন্যে মনে বিদ্রোহ জন্মাল। তখন বলতে লাগলুম— যার মধ্যে কেবলই আধিব্যাধি মৃত্যু, কেবলই ঘানির বলদের চলার মতো অনন্ত প্রদক্ষিণ, তাকে আমরা সত্য বলে, তারই কাছে আমরা সমস্ত আত্মসমর্পণ করেছিলুম— আমাদের এই মূঢ়তাকে ধিক্।

তখন বাহিরকে নিঃশেষে নিরস্ত করে দিয়ে আমরা অন্তরেই বাসা বাঁধবার চেষ্টা করলুম। যে-বাহিরকে একদিন রাজা বলে মেনেছিলুম, তাকে কঠোর যুদ্ধে পরাস্ত করে দিয়ে ভিতরকেই জয়ী বলে প্রচার করলুম। যে-প্রবৃত্তিগুলি এতদিন বাহিরের পেয়াদা হয়ে আমাদের সর্বদাই বাহিরের তাগিদেই ঘুরিয়ে মেরেছিল তাদের জেলে দিয়ে, শূলে চড়িয়ে, ফাঁসি দিয়ে, একেবারে নির্মূল করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলুম। যে-সমস্ত কষ্ট ও অভাবের ভয় দেখিয়ে বাহির আমাদের দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়েছিল, সেই-সকল কষ্ট ও অভাবকে আমরা একেবারে তুচ্ছ করে দিলুম। রাজসূয় যজ্ঞ করে উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে বাহিরের সমস্ত দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজাকে হার মানিয়ে জয়পতাকা আমাদের অন্তররাজধানীর উচ্চ প্রাসাদচূড়ায় উড়িয়ে দিলুম। বাসনার পায়ে শিকল পরিয়ে দিলুম। সুখ-দুঃখকে কড়া পাহারায় রাখলুম, পূর্বতন রাজত্বকে আগাগোড়া বিপর্যস্ত করে তবে ছাড়লুম।

এমনি করে বাহিরের একান্ত প্রভুত্বকে খর্ব করে যখন আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করলুম তখন অন্তরতম গুহার মধ্যে এ কী দেখি? এ তো জয়গর্ব নয়। এ তো কেবল আত্মশাসনের অতিবিস্তারিত সুব্যবস্থা নয়। বাহিরের বন্ধনের স্থানে এ তো কেবল অন্তরের নিয়মবন্ধন নয়। শান্তদান্ত সমাহিত নির্মল চিদাকাশে এমন আনন্দজ্যোতি দেখলুম যা অন্তর এবং বাহির উভয়কেই উদ্‌ভাসিত করেছে, অন্তরের নিগূঢ় কেন্দ্র থেকে নিখিল বিশ্বের অভিমুখে যার মঙ্গলরশ্মিরাজি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

তখন ভিতর বাহিরের সমস্ত দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেল। তখন জয় নয়, তখন আনন্দ; তখন সংগ্রাম নয়, তখন লীলা; তখন ভেদ নয়, তখন মিলন; তখন আমি নয়, তখন সব— তখন বাহিরও নয়, ভিতরও নয়, তখন ব্রহ্ম— তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ। তখন আত্মা-পরমাত্মার পরম মিলনে বিশ্বজগৎ সম্মিলিত। তখন স্বার্থবিহীন করুণা, ঔদ্ধত্যবিহীন ক্ষমা, অহংকারবিহীন প্রেম— তখন জ্ঞানভক্তিকর্মে বিচ্ছেদবিহীন পরিপূর্ণতা।

১০ ফাল্গুন ১৩১৫

বাসনা ইচ্ছা মঙ্গল

আমাদের সমস্ত কর্মচেষ্টাকে উদ্‌বোধিত করে তোলবার ভার সব-প্রথমে বাহিরের উপরেই ন্যস্ত থাকে। সে আমাদের নানা দিক দিয়ে নানা প্রকারে সজাগ চঞ্চল করে তোলে।

সে আমাদের জাগাবে, অভিভূত করবে না, এই ছিল কথা। জাগব এইজন্যে যে নিজের চৈতন্যময় কর্তৃত্বকে অনুভব করব— দাসত্বের বোঝা বহন করব বলে নয়।

রাজার ছেলেকে মাস্টারের হাতে দেওয়া হয়েছে। মাস্টার তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে তার মূঢ়তা জড়তা দূর করে তাকে রাজত্বের পূর্ণ অধিকারের যোগ্য করে দেবে, এই ছিল তার সঙ্গে বোঝাপড়া। রাজা যে কারও দাস নয়, এই শিক্ষাই হচ্ছে তার সকল শিক্ষার শেষ।

কিন্তু মাস্টার অনেক সময় তার ছাত্রকে এমনি নানা প্রকারে অভিভূত করে ফেলে, মাস্টারের প্রতিই একান্ত নির্ভর করার মুগ্ধ সংস্কারে এমনি জড়িত করে যে, বড়ো হয়ে সে নামমাত্র সিংহাসনে বসে, সেই মাস্টারই রাজার উপর রাজত্ব করতে থাকে।

তেমনি বাহিরও যখন শিক্ষাদানের চেয়ে বেশি দূরে গিয়ে পৌঁছয়, যখন সে আমাদের উপর চেপে পড়বার জো করে, তখন তাকে একেবারে বরখাস্ত করে দিয়ে তার জাল কাটাবার পন্থাই হচ্ছে শ্রেয়ের পন্থা।

বাহির যে শক্তি দ্বারা আমাদের চেষ্টাকে বাইরের দিকে টেনে নিয়ে যায়, তাকে আমরা বলি বাসনা। এই বাসনায় আমাদের বাইরের বিচিত্র বিষয়ের অনুগত করে। যখন যেটা সামনে এসে দাঁড়ায় তখন সেইটেই আমাদের মনকে কাড়ে— এমনি করে আমাদের মন নানার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে বেড়ায়। নানার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের এই হচ্ছে সহজ উপায়।

এই বাসনা যদি ঠিক জায়গায় না থামে— এই বাসনার প্রবলতাই যদি জীবনের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে, তা হলে আমাদের জীবন তামসিক অবস্থাকে ছাড়াতে পারে না, আমরা নিজের কর্তৃত্বকে অনুভব ও সপ্রমাণ করতে পারি না। বাহিরই কর্তা হয়ে থাকে, কোনোপ্রকার ঐশ্বর্যলাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়। উপস্থিত অভাব, উপস্থিত আকর্ষণই আমাদের এক ক্ষুদ্রতা থেকে আর-এক ক্ষুদ্রতায় ঘুরিয়ে মারে। এমন অবস্থায় কোনো স্থায়ী জিনিসকে মানুষ গড়ে তুলতে পারে না।

এই বাসনা কোন্ জায়গায় গিয়ে থামে? ইচ্ছায়। বাসনার লক্ষ্য যেমন বাইরের বিষয়ে, ইচ্ছার লক্ষ্য তেমনি ভিতরের অভিপ্রায়ে। উদ্দেশ্য জিনিসটা অন্তরের জিনিস। ইচ্ছা আমাদের বাসনাকে বাইরের পথে পথে যেমন-তেমন করে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে দেয় না— সমস্ত চঞ্চল বাসনাকে সে একটা কোনো আন্তরিক উদ্দেশ্যের চারি দিকে বেঁধে ফেলে।

তখন কী হয়? না, যে-সকল বাসনা নানা প্রভুর আহ্বানে বাইরে ফিরত, তারা এক প্রভুর শাসনে ভিতরে স্থির হয়ে বসে। অনেক থেকে একের দিকে আসে।

টাকা করতে হবে এই উদ্দেশ্য যদি মনের ভিতরে রাখি তা হলে আমাদের বাসনাকে যেমন-তেমন করে ঘুরে বেড়াতে দিলে চলে না। অনেক লোভ সংবরণ করতে হয়, অনেক আরামের আকর্ষণকে বিসর্জন দিতে হয়, কোনো বাহ্য বিষয় যাতে আমাদের বাসনাকে এই উদ্দেশ্যের আনুগত্য থেকে ভুলিয়ে না নিতে পারে সেজন্যে সর্বদাই সতর্ক থাকতে হয়। কিন্তু বাসনাই যদি আমাদের ইচ্ছার চেয়ে প্রবল হয়, সে যদি উদ্দেশ্যকে না মানতে চায়, তা হলেই বাহিরের কর্তৃত্ব বড়ো হয়ে ভিতরের কর্তৃত্বকে খাটো করে দেয় এবং উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যায়। তখন মানুষের সৃষ্টিকার্য চলে না। বাসনা যখন তার ভিতরের কূল পরিত্যাগ করে তখন সে সমস্ত ছারখার করে দেয়।

যেখানে ইচ্ছাশক্তি বলিষ্ঠ, কর্তৃত্ব যেখানে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে তামসিকতার আকর্ষণ এড়িয়ে মানুষ রাজসিকতার উৎকর্ষ লাভ করে। সেইখানে বিদ্যায় ঐশ্বর্যে প্রতাপে মানুষ ক্রমশই বিস্তার প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু বাসনার বিষয় যেমন বহির্জগতে বিচিত্র, তেমনি ইচ্ছার বিষয়ও তো অন্তর্জগতে একটি আধটি

নয়। কত অভিপ্রায় মনে জাগে তার ঠিক নেই। বিদ্যার অভিপ্রায়, ধনের অভিপ্রায়, খ্যাতির অভিপ্রায় প্রভৃতি সকলেই স্ব-সব-প্রধান হয়ে উঠতে চায়। সেই ইচ্ছার অরাজক বিক্ষিপ্ততাও বাসনার বিক্ষিপ্ততার চেয়ে তো কম নয়।

তা ছাড়া আর-একটা জিনিস দেখতে পাই। যখন বাসনার অনুগামী হয়ে বাহিরের সহস্র রাজাকে প্রভু করেছিলুম তখন যে বেতন মিলত তাতে তো পেট ভরত না। সেইজন্যেই মানুষ বারংবার আক্ষেপ করে বলেছে বাসনার চাকরি বড়ো দুঃখের চাকরি। এতে যে খাদ্য পাই তাতে ক্ষুধা কেবল বাড়িয়ে তোলে এবং সহস্রের টানে ঘুরিয়ে মেরে কোনো জায়গায় শান্তি পেতে দেয় না।

আবার ইচ্ছার অনুগত হয়ে ভিতরের এক-একটি অভিপ্রায়ের পশ্চাতে যখন ঘুরে বেড়াই, তখন তো অনেক সময়ে মেকি টাকায় বেতন মেলে। শ্রান্তি আসে, অবসাদ আসে, দ্বিধা আসে। কেবলই উত্তেজনার মদিরার প্রয়োজন হয়— শান্তিরও অভাব ঘটে। বাসনা যেমন বাহিরের ধন্দায় ঘোরায়, ইচ্ছা তেমনি ভিতরের ধন্দায় ঘুরিয়ে মারে এবং শেষকালে মজুরি দেবার বেলায় ফাঁকি দিয়ে সারে।

এইজন্য, বাসনাগুলোকে ইচ্ছার শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ করা যেমন মানুষের ভিতরকার কামনা, সেরকম না করতে পারলে সে যেমন কোনো সফলতা দেখতে পায় না, তেমনি ইচ্ছাগুলিকেও কোনো-এক প্রভুর অনুগত করা তার মূলগত প্রার্থনার বিষয়। এ না হলে সে বাঁচে না। বাহিরের শত্রুকে জয় করবার জন্যে ভিতরের যে সৈন্যদল সে জড়ো করলে, নায়কের অভাবে সেই দুর্দান্ত সৈন্যগুলার হাতেই সে মারা পড়বার জো হয়। সৈন্যনায়ক রাজ্য দস্যুবিজিত রাজ্যের চেয়ে ভালো বটে, কিন্তু সেও সুখের রাজ্য নয়। তামসিকতায় প্রবৃত্তির প্রাধান্য, রাজসিকতায় শক্তির প্রাধান্য— এখানে সৈন্যের রাজত্ব।

কিন্তু রাজার রাজত্ব চাই। সেই সরাজকতার পরম কল্যাণ কখন উপভোগ করি ? যখন বিশ্বইচ্ছার সঙ্গে নিজের সমস্ত ইচ্ছাকে সংগত করি।

সেই ইচ্ছাই জগতের এক ইচ্ছা, মঙ্গল-ইচ্ছা। সে কেবল আমার ইচ্ছা নয়, কেবল তোমার ইচ্ছা নয়, সে নিখিলের মূলগত নিত্যকালের ইচ্ছা। সেই সকলের প্রভু। সেই এক প্রভুর মহারাজ্যে যখন আমার ইচ্ছার সৈন্যদলকে দাঁড় করাই, তখনই তারা ঠিক জায়গায় দাঁড়ায়। তখন ত্যাগে ক্ষতি হয় না, ক্ষমায় বীর্যহানি হয় না, সেবায় দাসত্ব হয় না। তখন বিপদ ভয় দেখায় না, শাস্তি দণ্ড দিতে পারে না, মৃত্যু বিভীষিকা পরিহার করে। একদিন সকলে আমাকে পেয়েছিল, অবশেষে রাজাকে যখন পেলুম তখন আমি সকলকে পেলুম। যে বিশ্ব থেকে নিজের অন্তরের দুর্গে আত্মরক্ষার জন্যে প্রবেশ করেছিলুম, সেই বিশ্বেই আবার নির্ভয়ে বাহির হলুম, রাজার ভৃত্যকে সেখানে সকলে সমাদর করে গ্রহণ করলে।

১১ ফাল্গুন

স্বাভাবিকী ক্রিয়া

যে এক ইচ্ছা বিশ্বজগতের মূলে বিরাজ করছে তারই সম্বন্ধে উপনিষৎ বলেছেন— স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। সেই একেরই জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়া স্বাভাবিকী। তা সহজ, তা স্বাধীন, তার উপরে বাইরের কোনো কৃত্রিম তাড়না নেই।

আমাদের ইচ্ছা যখন সেই মূল মঙ্গল-ইচ্ছার সঙ্গে সংগত হয়, তখন তারও সমস্ত ক্রিয়া স্বাভাবিকী হয়। অর্থাৎ, তার সমস্ত কাজকে কোনো প্রবৃত্তির তাড়নার দ্বারা ঘটায় না— অহংকার তাকে ঠেলা দেয় না, লোকসমাজের অনুকরণ তাকে সৃষ্টি করে না, লোকের খ্যাতিই তাকে কোনোরকমে জীবিত

করে রাখে না, সাম্প্রদায়িক দলবদ্ধতার উৎসাহ তাকে শক্তি জোগায় না, নিন্দা তাকে আঘাত করে না, উৎপীড়ন তাকে বাধা দেয় না, উপকরণের দৈন্য তাকে নিরস্ত করে না।

মঙ্গল-ইচ্ছার সঙ্গে যাঁদের ইচ্ছা সম্মিলিত হয়েছে তাঁরা যে বিশ্বজগতের সেই অমর শক্তি সেই স্বাভাবিকী ক্রিয়াশক্তিকে লাভ করেন ইতিহাসে তার অনেক প্রমাণ আছে। বুদ্ধদেব কপিলবস্তুর সুখসমৃদ্ধি পরিহার করে যখন বিশ্বের মঙ্গল প্রচার করতে বেরিয়েছিলেন তখন কোথায় তাঁর রাজকোষ, কোথায় তাঁর সৈন্যসামন্ত। তখন বাহ্য উপকরণে তিনি তাঁর পৈতৃক রাজ্যের দীনতম অক্ষমতম প্রজার সঙ্গে সমান। কিন্তু তিনি যে বিশ্বের মঙ্গল-ইচ্ছার সঙ্গে তাঁর ইচ্ছাকে যোজিত করেছিলেন, সেইজন্য তাঁর ইচ্ছা সেই পরাশক্তির স্বাভাবিকী ক্রিয়াকে লাভ করেছিল। সেইজন্যে কত শত শতাব্দী হল তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার স্বাভাবিকী ক্রিয়া আজও চলছে। আজও বুদ্ধগয়ার নিভৃত মন্দিরে গিয়ে দেখি সুদূর জাপানের সমুদ্রতীর থেকে সংসার-তাপতাপিত জেলে এসে অন্ধকার অর্ধরাত্রে বোধিদ্রুমের সম্মুখে বসে সেই বিশ্বকল্যাণী ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে দিয়ে জোড়হাতে বলছে— বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। আজও তাঁর জীবন মানুষকে জীবন দিচ্ছে, তাঁর বাণী মানুষকে অভয় দান করছে— তাঁর সেই বহু সহস্র বৎসর পূর্বেই ইচ্ছার ক্রিয়ার আজও ক্ষয় হল না।

যিশু কোন অখ্যাত গ্রামের প্রান্তে কোন্‌ এক পশুরক্ষণশালায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কোনো পণ্ডিতের ঘরে নয়, কোনো রাজার প্রাসাদে নয়, কোনো মহৈশ্বর্যশালী রাজধানীতে নয়, কোনো মহাপুণ্যক্ষেত্র তীর্থস্থানে নয়। যারা মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করত এমন কয়েকজন মাত্র ইহুদি যুবক তাঁর শিষ্য হয়েছিল। যেদিন তাঁকে রোমরাজের প্রতিনিধি অনায়াসেই ক্রুসে বিদ্ধ করবার আদেশ দিলেন সেই দিনটি জগতের ইতিহাসে যে চিরদিন ধন্য হবে এমন কোনো লক্ষণ সেদিন কোথাও প্রকাশ পায় নি। তাঁর শত্রুরা মনে করলে সমস্তই চুকে-বুকে গেল— এই অতিক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গটিকে একেবারে দলন করে নিবিয়ে দেওয়া গেল। কিন্তু কার সাধ্য নেবায়। ভগবান যিশু তাঁর ইচ্ছাকে তাঁর পিতার ইচ্ছার সঙ্গে যে মিলিয়ে দিয়েছিলেন— সেই ইচ্ছার মৃত্যু নেই, তার স্বাভাবিকী ক্রিয়ার ক্ষয় নেই; অত্যন্ত কৃশ এবং দীনভাবে যা নিজেকে প্রকাশ করেছিল তাই আজ দুই সহস্র বৎসর ধরে বিশ্বজয় করছে।

অখ্যাত অজ্ঞাত দৈন্যদারিদ্র্যের মধ্যেই সেই পরম মঙ্গলশক্তি যে আপনার স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াকে প্রকাশ করেছেন ইতিহাসে বারংবার তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। হে অবিশ্বাসী, হে ভীরু, হে দুর্বল, সেই শক্তিকে আশ্রয় করো, সেই ক্রিয়াকে লাভ করো— নিজেকে শক্তিহীন বলে বাইরের দিকে ভিক্ষাপাত্র তুলে ধরে বৃথা আক্ষেপে কাল হরণ কোরো না— তোমার সামান্য যা সম্বল আছে তা রাজার ঐশ্বর্যকে লজ্জা দেবে।

১১ ফাল্গুন

পরশরতন

তাঁর নাম পরশরতন
পাপিহৃদয় তাপহরণ—
প্রসাদ তাঁর শান্তিরূপ ভকতহৃদয়ে জাগে।

সেই পরশরতনটি প্রাতঃকালের এই উপাসনায় কি আমরা লাভ করি? যদি তার একটি কণামাত্রও লাভ করি তবে কেবল মনের মধ্যে একটি ভাবরসের উপলব্ধির মধ্যেই তাকে আবদ্ধ করে যেন না রাখি। তাকে স্পর্শ করাতে হবে— তার স্পর্শে আমার সমস্ত দিনটিকে সোনা করে তুলতে হবে।

দিনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে সেই পরশরতনটি দিয়ে আমার মুখের কথাকে স্পর্শ করাতে হবে, আমার

মনের চিন্তাকে স্পর্শ করাতে হবে— আমার সংসারের কর্মকে স্পর্শ করাতে হবে।

তা হলে, যা হাল্কা ছিল এক মুহূর্তে তাতে গৌরবসঞ্চার হবে, যা মলিন ছিল তা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, যার কোনো দাম ছিল না তার মূল্য অনেক বেড়ে যাবে।

আমাদের সকালবেলাকার এই উপাসনাটিকে ছোঁয়াব, সমস্তদিন সব-তাতে ছোঁয়াব— তাঁর নামকে ছোঁয়াব, তাঁর ধ্যানকে ছোঁয়াব, "শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্" এই মন্ত্রটিকে ছোঁয়াব উপাসনাকে কেবল হৃদয়ের ধন করব না— তাকে চরিত্রের সম্বল করব, তার দ্বারা কেবল স্নিগ্ধতা লাভ করব না— প্রতিষ্ঠালাভ করব।

লোকে প্রচলিত আছে প্রভাতের মেঘ ব্যর্থ হয়, তাতে বৃষ্টি দেয় না। আমাদের এই প্রভাতের উপাসনা যেন তেমনি ক্ষণকালের জন্য আবির্ভূত হয়ে সকালবেলাকার হাওয়াতেই উড়ে চলে না যায়।

কেননা, যখন রৌদ্র প্রখর তখনই স্নিগ্ধতার দরকার, যখন তৃষ্ণা প্রবল তখনই বর্ষণ কাজে লাগে। সংসারের ঘোরতর কাজের মাঝখানেই শুষ্কতা আসে, দাহ জন্মায়। ভিড় যখন খুব জমেছে, কোলাহল যখন খুব জেগেছে, তখনই আপনাকে হারিয়ে ফেলি। আমাদের প্রভাতের সঞ্চয়কে সেই সময়েই যদি কোনো কাজে লাগাতে না পারি, সে যদি দেবত্র সম্পত্তির মতো মন্দিরেরই পূজার্চনার কাজে নিযুক্ত থাকে, সংসারের প্রয়োজনে তাকে খাটাবার জো না থাকে— তা হলে কোনো কাজ হল না।

দিনের মধ্যে এক-একটা সময় আছে যে সময়টা অত্যন্ত নীরস, অত্যন্ত অনুদার। যে সময়ে ভূমা সকলের চেয়ে প্রচ্ছন্ন থাকেন— যে সময়ে, হয় আমরা একান্তই আপিসের জীব হয়ে উঠি, নয়তো আহার-পরিপাকের জড়তায় আমাদের অন্তরাত্মার উজ্জ্বলতা অত্যন্ত ম্লান হয়ে আসে— সেই শুষ্কতা ও জড়ত্বের আবেশকালে তুচ্ছতার আক্রমণকে আমরা যেন প্রশ্রয় না দিই— আত্মার মহিমাকে তখনো যেন প্রত্যক্ষগোচর করে রাখি। যেন তখনই মনে পড়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি ভূর্ভুবঃস্বর্লোকে, মনে পড়ে যে অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ এই মুহূর্তে আমাদের অন্তরে চৈতন্য বিকীর্ণ করছেন, মনে পড়ে যে সেই শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং এই মুহূর্তে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। সমস্ত হাস্যালাপ, সমস্ত কাজকর্ম, সমস্ত চাঞ্চল্যের অন্তরতম মূলে যেন একটি অবিচলিত পরিপূর্ণতার উপলব্ধি কখনো না সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

তাই বলে এ কথা যেন কেউ না মনে করেন যে, সংসারের সমস্ত হাসিগল্প সমস্ত আমোদ-আহ্লাদকে একেবারেই বিসর্জন দেওয়াই সাধনা। যার সঙ্গে আমাদের যেটুকু স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে তাকে রক্ষা না করলেই সে আমাদের অস্বাভাবিক রকম করে পেয়ে বসে— ত্যাগ করবার কৃত্রিম চেষ্টাতেই ফাঁস আরো বেশি করে আঁট হয়ে ওঠে। স্বভাবত যে জিনিসটা বাইরের ক্ষণিক জিনিস, ত্যাগের চেষ্টায় অনেক সময় সেইটাই আমাদের অন্তরের ধ্যানের সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায়।

ত্যাগ করব না, রক্ষা করব, কিন্তু ঠিক জায়গায় রক্ষা করব। ছোটোকে বড়ো করে তুলব না, শ্রেয়কে প্রেয়ের আসনে বসতে দেব না এবং সকল সময়ে সকল কর্মেই অন্তরের গূঢ় কক্ষের অচল দরবারে উপাসনাকে চলতে দেব। তিনি নেই এমন কথাটাকে কোনো সময়েই কোনোমতেই মনকে বুঝতে দেব না— কেননা সেটা একেবারেই মিথ্যা কথা।

প্রভাতে একান্ত ভক্তিতে তাঁর চরণের ধূলি মনের ভিতরে তুলে নিয়ে যাও— সেই আমাদের পরশরতন। আমাদের হাসিখেলা আমাদের কাজকর্ম আমাদের বিষয়-আশয় যা-কিছু আছে তার উপর সেই ভক্তি ঠেকিয়ে দাও। আপনিই সমস্ত বড়ো হয়ে উঠবে, সমস্ত পবিত্র হয়ে উঠবে, সমস্তই তাঁর সম্মুখে উৎসর্গ করে দেবার যোগ্য হয়ে দাঁড়াবে।

১২ ফাল্গুন

অভ্যাস

যিনি পরম চৈতন্যস্বরূপ তাঁকে আমরা নির্মল চৈতন্যের দ্বারাই অন্তরাত্মার মধ্যে উপলব্ধি করব এই রয়েছে কথা। তিনি আর কোনোরকমে সস্তায় আমাদের কাছে ধরা দেবেন না— এতে যতই বিলম্ব হোক। সেইজন্যেই তাঁর দেখা দেওয়ার অপেক্ষায় কোনো কাজ বাকি নেই— আমাদের আহার ব্যবহার প্রাণন-মনন সমস্তই চলছে। আমাদের জীবনের যে বিকাশ তাঁর দর্শনে গিয়ে পরিসমাপ্ত সে ধীরে ধীরে হোক, বিলম্বে হোক, সেজন্যে তিনি কোনো অস্ত্রধারী পেয়াদাকে দিয়ে তাগিদ পাঠাচ্ছেন না। সেটি একটি পরিপূর্ণ সামগ্রী কি না, অনেক রৌদ্রবৃষ্টির পরম্পরায়— অনেক দিন ও রাত্রির শুশ্রূষায় তার হাজারটি দল একটি বৃন্তে ফুটে উঠবে।

সেইজন্যে মাঝে মাঝে আমার মনে এই সংশয়টি আসে যে, এই যে আমরা প্রাতঃকালে উপাসনার জন্যে অনেকে সমবেত হয়েছি, এখানে আমরা অনেক সময়েই অনেকেই আমাদের সম্পূর্ণ চিত্তটিকে তো আনতে পারি নে— তবে এ কাজটি কি আমাদের ভালো হচ্ছে? নির্মল চৈতন্যের স্থানে অচেতনপ্রায় অভ্যাসকে নিযুক্ত করায় আমরা কি অন্যায় করছি নে?

আমার মনে এক-এক সময় অত্যন্ত সংকোচ বোধ হয়। মনে ভাবি যিনি আপনাকে প্রকাশ করবার জন্যে আমাদের ইচ্ছার উপর কিছুমাত্র জবরদস্তি করেন না তাঁর উপাসনায় পাছে আমরা লেশমাত্র অনিচ্ছাকে নিয়ে আসি, পাছে এখানে আসবার সময় কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ করি, কিছুমাত্র আলস্যের বাধা ঘটে, পাছে তখন কোনো আমোদের বা কাজের আকর্ষণে আমাদের ভিতরে ভিতরে একটা বিমুখতার সৃষ্টি করে। উপাসনায় শৈথিল্য করলে, অন্য যাঁরা উপাসনা করেন তাঁরা যদি কিছু মনে করেন, যদি কেউ নিন্দা করেন বা বিরক্ত হন, পাছে এই তাদিগটাই সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। সেইজন্যে এক-এক সময়ে বলতে ইচ্ছা করে মন সম্পূর্ণ অনুকূল সম্পূর্ণ ইচ্ছুক না হলে এ জায়গায় কেউ এসো না।

কিন্তু সংসারটা যে কী জিনিস তা যে জানি। এ সংসারের অনেকটা পথ মাড়িয়ে আজ বার্ধক্যের দ্বারে এসে উত্তীর্ণ হয়েছি। জানি দুঃখ কাকে বলে, আঘাত কী প্রচণ্ড, বিপদ কেমন অভাবনীয়। যে-সময়ে আশ্রয়ের প্রয়োজন সকলের বেশি সেই সময়ে আশ্রয় কিরূপ দুর্লভ। তিনিহীন জীবন যে অত্যন্ত গৌরবহীন, চার দিকেই তাকে টানাটানি করে মারে। দেখতে দেখতে তার সুর নেবে যায়, তার কথা চিন্তা কাজ তুচ্ছ হয়ে আসে। সে জীবন যেন অনাবৃত— সে এবং তার বাইরের মাঝখানে কেউ যেন তাকে ঠেকাবার নেই। ক্ষতি একেবারেই তার গায়ে এসে লাগে, নিন্দা একেবারেই তার মর্মে এসে আঘাত করে, দুঃখ কোনো ভাবরসের মাঝখান দিয়ে সুন্দর বা মহৎ হয়ে ওঠে না। সুখ একেবারে মত্ততা এবং শোকের কারণ একেবারে মৃত্যুবাণ হয়ে এসে তাকে বাজে। এ কথা যখন চিন্তা করে দেখি তখন সমস্ত সংকোচ মন হতে দূর হয়ে যায়— তখন ভীত হয়ে বলি, না, শৈথিল্য করলে চলবে না। একদিনও ভুলব না, প্রতিদিনই তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতেই হবে, প্রতিদিন কেবল সংসারকেই প্রশ্রয় দিয়ে তাকেই কেবল বুকের সমস্ত রক্ত খাইয়ে প্রবল করে তুলে নিজেকে এমন অসহায়ভাবে একান্তই তার হাতে আপাদমস্তক সমর্পণ করে দেব না, দিনের মধ্যে অন্তত একবার এই কথাটা প্রত্যহই বলে যেতে হবে— "তুমি সংসারের চেয়ে বড়ো— তুমি সকলের চেয়ে বড়ো।"

যেমন করে পারি তেমনি করেই বলব। আমাদের শক্তি ক্ষুদ্র অন্তর্যামী তা জানেন। কোনোদিন আমাদের মনে কিছু জাগে কোনোদিন একেবারেই জাগে না— মনে বিক্ষেপ আসে, মনে ছায়া পড়ে। উপাসনার যে-মন্ত্র আবৃত্তি করি প্রতিদিন তার অর্থ উজ্জ্বল থাকে না। কিন্তু তবু নিষ্ঠা হারাব না। দিনের পর দিন এই দ্বারে এসে দাঁড়াব, দ্বার খুলুক আর নাই খুলুক। যদি এখানে আসতে কষ্ট বোধ হয় তবে সেই কষ্টকে অতিক্রম করেই আসব। যদি সংসারের কোনো বন্ধন মনকে টেনে রাখতে চায় তবে ক্ষণকালের জন্যে সেই সংসারকে এক পাশে ঠেলে রেখেই আসব।

কিছু না-ই জোটে যদি তবে এই অভ্যাসটুকুকেই প্রত্যহ তাঁর কাছে এনে উপস্থিত করব। সকলের

চেয়ে যেটা কম দেওয়া অন্তত সেই দেওয়াটাও তাঁকে দেব। সেইটুকু দিতেও যে বাধাটা অতিক্রম করতে হয়, যে জড়তা মোচন করতে হয়, সেটাতেও যেন কুণ্ঠিত না হই। অত্যন্ত দরিদ্রের যে রিক্তপ্রায় দান সেও যেন প্রত্যহই নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর কাছে এনে দিতে পারি। যাঁকে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করবার কথা, দিনের সকল কর্মে সকল চিন্তায় যাঁকে রাজা করে বসিয়ে রাখতে হবে, তাঁকে কেবল মুখের কথা দেওয়া, কিন্তু তাও দিতে হবে। আগাগোড়া সমস্তই কেবল সংসারকে দেব আর তাঁকে কিছুই দেব না, তাঁকে প্রত্যেক দিনের মধ্যে একান্তই "না" করে রেখে দেব, এ তো কোনোমতেই হতে পারে না।

দিনের আরম্ভে প্রভাতের অরুণোদয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই কথাটা একবার স্বীকার করে যেতেই হবে যে, পিতা নোঽসি— তুমি পিতা, আছ। আমি স্বীকার করছি তুমি পিতা। আমি স্বীকার করছি তুমি আছ। একবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেবল এই কথাটি বলে যাবার জন্যে তোমাদের সংসার ফেলে চলে আসতে হবে। কেবল সেইটুকু সময় থাক্ তোমাদের কাজকর্ম, থাক্ তোমাদের আমোদপ্রমোদ। আর সমস্ত কথার উপরে এই কথাটি বলে যাও— পিতা নোঽসি।

তাঁর জগৎসংসারের কোলে জন্মে, তাঁর চন্দ্রসূর্যের আলোর মধ্যে চোখ মেলে, জাগরণের প্রথম মুহূর্তে এই কথাটি তোমাদের জোড়হাতে প্রত্যহ বলে যেতে হবে : ওঁ পিতা নোঽসি। এ আমি তোমাদের জোর করেই বলে রাখছি। এতবড়ো বিশ্বে এবং এমন মহৎ মানবজীবনে তাঁকে কোনো জায়গাতেই একটুও স্বীকার করবে না— এ তো কিছুতেই হতে পারবে না। তোমার অপরিস্ফুট চেতনাকেও উপহার দাও, তোমার শূন্য হৃদয়কেও দান করো, তোমার শুষ্কতা রিক্ততাকেই তাঁর সম্মুখে ধরো, তোমার সুগভীর দৈন্যকেই তাঁর কাছে নিবেদন করো। তা হলেই যে দয়া অযাচিতভাবে প্রতি মুহূর্তেই তোমার উপরে বর্ষিত হচ্ছে সেই দয়া ক্রমশই উপলব্ধি করতে থাকবে। এবং প্রত্যহ ঐ যে অল্প একটু বাতায়ন খুলবে সেইটুকু দিয়েই অন্তর্যামীর প্রেমমুখের প্রসন্ন হাস্য প্রত্যহই তোমার অন্তরকে জ্যোতিতে অভিষিক্ত করতে থাকবে।

১৩ ফাল্গুন

প্রার্থনা

হে সত্য, আমার এই অন্তরাত্মার মধ্যেই যে তুমি অন্তহীন সত্য— তুমি আছ। এই আত্মায় তুমি যে আছ, দেশে কালে গভীরতায় নিবিড়তায় তার আর সীমা নাই। এই আত্মা অনন্তকাল এই মন্ত্রটি বলে আসছে— সত্যং। তুমি আছ, তুমিই আছ। আত্মার অতলস্পর্শ গভীরতা হতে এই যে মন্ত্রটি উঠছে, তা যেন আমার মনের এবং সংসারের অন্যান্য সমস্ত শব্দকে ভরে সকলের উপরে জেগে ওঠে— সত্যং সত্যং সত্যং। সেই সত্যে আমাকে নিয়ে যাও— সেই আমার অন্তরাত্মার গূঢ়তম অনন্ত সত্যে— যেখানে "তুমি আছ" ছাড়া আর কোনো কথাটি নেই।

হে জ্যোতির্ময়, আমার চিদাকাশে তুমি জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ। তোমার অনন্ত আকাশের কোটি সূর্যলোকে যে জ্যোতি কুলোয় না, সেই জ্যোতিতে আমার অন্তরাত্মা চৈতন্যে সমুদ্ভাসিত। সেই আমার অন্তরাকাশের মাঝখানে আমাকে দাঁড় করিয়ে আমাকে আদ্যোপান্ত প্রদীপ্ত পবিত্রতায় ক্ষালন করে ফেলো, আমাকে জ্যোতির্ময় করো, আমার অন্য সমস্ত পরিবেষ্টনকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সেই শুভ্র শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ জ্যোতিঃশরীরকে লাভ করি।

হে অমৃতস্বরূপ, আমার অন্তরাত্মার নিভৃত ধামে তুমি আনন্দং পরমানন্দং। সেখানে কোনোকালেই তোমার মিলনের অন্ত নেই। সেখানে তুমি কেবল আছ না, তুমি মিলেছ ; সেখানে তোমার কেবল সত্য নয়, সেখানে তোমার আনন্দ। সেই তোমার অনন্ত আনন্দকে তোমার জগৎসংসারে ছড়িয়ে

দিয়েছ। গতিতে প্রাণে সৌন্দর্যে সে আর কিছুতে ফুরোয় না, অনন্ত আকাশে তাকে আর কোথাও ধরে না। সেই তোমার সীমাহীন আনন্দকেই আমার অন্তরাত্মার উপরে স্তব্ধ করে রেখেছি। সেখানে তোমার সৃষ্টির কাউকে প্রবেশ করতে দাও নি, সেখানে আলোক নেই, রূপ নেই, গতি নেই ; কেবল নিস্তব্ধ নিবিড় তোমার আনন্দ রয়েছে। সেই আনন্দধামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার ডাক দাও প্রভু। আমি যে চার দিকে ছড়িয়ে পড়েছি, তোমার অমৃত-আহ্বান আমার সংসারের সর্বত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হোক, অতি দূরে চলে যাক, অতি গোপনে প্রবেশ করুক। সকল দিক থেকেই আমি যেন যাই যাই বলে সাড়া দিই। ডাক দাও— ওরে আয় আয়, ওরে ফিরে আয়, চলে আয়। এই অন্তরাত্মার অনন্ত আনন্দধামে আমার যা-কিছু সমস্তই এক জায়গায় এক হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে চুপ করে বসুক, খুব গভীরে, খুব গোপনে।

হে প্রকাশ, তোমার প্রকাশের দ্বারা আমাকে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলো— আমার আর কিছুই বাকি রেখো না, কিছুই না, অহংকারের লেশমাত্র না। আমাকে একেবারেই তুমিময় করে তোলো। কেবলই তুমি, তুমি, তুমিময়। কেবলই তুমিময় জ্যোতি, কেবলই তুমিময় আনন্দ।

হে রুদ্র, পাপ দগ্ধ হয়ে ভস্ম হয়ে যাক। তোমার প্রচণ্ড তাপ বিকীর্ণ করো। কোথাও কিছু লুকিয়ে না থাকুক, শিকড় থেকে বীজভরা ফল পর্যন্ত সমস্ত দগ্ধ হয়ে যাক। এ যে বহুদিনের বহু দুশ্চেষ্টার ফল, শাখার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে পাতার আড়ালে আড়ালে ফলে রয়েছে। শিকড় হৃদয়ের রসাতল পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। তোমার রুদ্রতাপের এমন ইন্ধন আর নেই। যখন দগ্ধ হবে তখনই এ সার্থক হতে থাকবে। তখন আলোকের মধ্যে তার অন্ত হবে।

তার পরে, হে প্রসন্ন, তোমার প্রসন্নতা আমার সমস্ত চিন্তায় বাক্যে কর্মে বিকীর্ণ হতে থাক্। আমার সমস্ত শরীরের রোমে রোমে সেই তোমার পরমপুলকময় প্রসন্নতা প্রবেশ করে এই শরীরকে ভাগবতী তনু করে তুলুক। জগতে এই শরীর তোমার প্রসাদঅমৃতের পবিত্র পাত্র হয়ে বিরাজ করুক। তোমার সেই প্রসন্নতা আমার বুদ্ধিকে প্রশান্ত করুক, হৃদয়কে পবিত্র করুক, শক্তিকে মঙ্গল করুক। তোমার প্রসন্নতা তোমার বিচ্ছেদসংকট থেকে আমাকে চিরদিন রক্ষা করুক। তোমার প্রসন্নতা আমার চিরন্তন অন্তরের ধন হয়ে আমার চিরজীবনপথের সম্বল হয়ে থাক্। আমারই অন্তরাত্মার মধ্যে তোমার যে সত্য, যে জ্যোতি, যে অমৃত, যে প্রকাশ রয়েছে তোমার প্রসন্নতা দ্বারা যখন তাকে উপলব্ধি করব তখনই রক্ষা পাব।

১৪ ফাল্গুন

বৈরাগ্য

যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন—

ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি— আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।

অর্থাৎ—

পুত্রকে কামনা করছ বলেই যে পুত্র তোমার প্রিয় হয় তা নয়, কিন্তু আত্মাকেই কামনা করছ বলে পুত্র প্রিয় হয়।

এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, আত্মা পুত্রের মধ্যে আপনাকেই অনুভব করে বলেই পুত্র তার আপন হয়, এবং সেইজন্যেই পুত্রে তার আনন্দ।

আত্মা যখন স্বার্থ এবং অহংকারের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে নিরবচ্ছিন্ন একলা হয়ে থাকে তখন সে বড়োই ম্লান হয়ে থাকে, তখন তার সত্য স্ফূর্তি পায় না। এইজন্যেই আত্মা পুত্রের মধ্যে, মিত্রের মধ্যে,

নানা লোকের মধ্যে, নিজেকে উপলব্ধি করে আনন্দিত হতে থাকে, কারণ তার সত্য পূর্ণতর হয়ে উঠতে থাকে।

ছেলেবেলায় বর্ণপরিচয়ে যখন ক খ গ প্রত্যেক অক্ষরকে স্বতন্ত্র করে শিখছিলুম তখন তাতে আনন্দ পাই নি। কারণ, এই স্বতন্ত্র অক্ষরগুলির কোনো সত্য পাচ্ছিলুম না। তার পরে অক্ষরগুলি যোজনা করে যখন "কর" "খল" প্রভৃতির পদ পাওয়া গেল তখন অক্ষর আমার কাছে তার তাৎপর্য প্রকাশ করাতে আমার মন কিছু কিছু সুখ অনুভব করতে লাগল। কিন্তু এরকম বিচ্ছিন্ন পদগুলি চিত্তকে যথেষ্ট রস দিতে পারে না— এতে ক্লেশ এবং ক্লান্তি এসে পড়ে। তার পরে আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে যেদিন "জল পড়ে" "পাতা নড়ে" বাক্যগুলি পড়েছিলুম সেদিন ভারি আনন্দ হয়েছিল, কারণ, শব্দগুলি তখন পূর্ণতর অর্থে ভরে উঠল। এখন শুদ্ধমাত্র "জল পড়ে" "পাতা নড়ে" আবৃত্তি করতে মনে সুখ হয় না, বিরক্তিবোধ হয়, এখন ব্যাপক অর্থযুক্ত বাক্যাবলীর মধ্যেই শব্দবিন্যাসকে সার্থক বলে উপলব্ধি করতে চাই।

বিচ্ছিন্ন আত্মা তেমনি বিচ্ছিন্ন পদের মতো। তার একার মধ্যে তার তাৎপর্যকে পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। এইজন্যেই আত্মা নিজের সত্যকে নানার মধ্যে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে। সে যখন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন সে নিজের সার্থকতার একটা রূপ দেখতে পায়— সে যখন আত্মীয় পরকীয় বহুতর লোককে আপন করে জানে তখন সে আর ছোটো আত্মা থাকে না, তখন সে মহাত্মা হয়ে ওঠে।

এর একমাত্র কারণ, আত্মার পরিপূর্ণ সত্যটি আছে পরমাত্মার মধ্যে। আমার আমি সেই একমাত্র মহা-আমিতেই সার্থক। এইজন্যে সে জেনে এবং না জেনেও সেই পরম আমিকেই খুঁজছে। আমার আমি যখন পুত্রের আমিতে গিয়ে সংযুক্ত হয় তখন কী ঘটে? তখন, যে পরম আমি আমার আমির মধ্যেও আছেন, পুত্রের আমির মধ্যেও আছেন, তাঁকে উপলব্ধি করে আমার আনন্দ হয়।

কিন্তু তখন মুশকিল হয় এই যে, আমার আমি এই উপলক্ষে যে সেই বড়ো আমির কাছেই একটুখানি এগোল তা সে স্পষ্ট বুঝতে পারে না। সে মনে করে সে পুত্রকেই পেল এবং পুত্রের কোনো বিশেষ গুণ-বশতই পুত্র আনন্দ দেয়। সুতরাং এই আসক্তির বন্ধনেই সে আটকা পড়ে যায়। তখন সে পুত্র-মিত্রকে কেবলই জড়িয়ে বসে থাকতে চায়। তখন সে এই আসক্তির টানে অনেক পাপেও লিপ্ত হয়ে পড়ে।

এইজন্য সত্যজ্ঞানের দ্বারা বৈরাগ্য উদ্রেক করবার জন্যেই যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন আমরা যথার্থত পুত্রকে চাই নে, আত্মাকেই চাই। এ কথাটিকে ঠিকমত বুঝলেই পুত্রের প্রতি আমাদের মুগ্ধ আসক্তি দূর হয়ে যায়। তখন উপলক্ষই লক্ষ্য হয়ে আমাদের পথরোধ করতে পারে না।

যখন আমরা সাহিত্যের বৃহৎ তাৎপর্য বুঝে আনন্দ বোধ করতে থাকি, তখন প্রত্যেক কথাটি স্বতন্ত্রভাবে আমি আমি করে আমাদের মনকে আর বাধা দেয় না— প্রত্যেক কথা অর্থকেই প্রকাশ করে, নিজেকে নয়। তখন কথা আপনার স্বাতন্ত্র্য যেন বিলুপ্ত করে দেয়।

তেমনি যখন আমরা সত্যকে জানি তখন সেই অখণ্ড সত্যের মধ্যেই সমস্ত খণ্ডতাকে জানি— তারা স্বতন্ত্র হয়ে উঠে আর আমার জ্ঞানকে আটক করে না। এই অবস্থাই বৈরাগ্যের অবস্থা। এই অবস্থায় সংসার আপনাকেই চরম বলে আমাদের সমস্ত মনকে কর্মকে গ্রাস করতে থাকে না।

কোনো কাব্যের তাৎপর্যের উপলব্ধি যখন আমাদের কাছে গভীর হয়, উজ্জ্বল হয়, তখনই তার প্রত্যেক শব্দের সার্থকতা সেই সমগ্র ভাবের মাধুর্যে আমাদের কাছে বিশেষ সৌন্দর্যময় হয়ে ওঠে। তখন, যখন ফিরে দেখি দেখতে পাই কোনো শব্দটিই নিরর্থক নয়, সমগ্রের রসটি প্রত্যেক পদের মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে। তখন সেই কাব্যের প্রত্যেক পদটিই আমাদের কাছে বিশেষ আনন্দ ও বিস্ময়ের কারণ হয়ে ওঠে। তখন তার পদগুলি সমগ্রের উপলব্ধিতে আমাদের বাধা না দিয়ে সহায়তা করে বলেই আমাদের কাছে বড়োই মূল্যবান হয়ে ওঠে।

তেমনি বৈরাগ্যে যখন স্বাতন্ত্র্যের মোহ কাটিয়ে ভূমার মধ্যে আমাদের মহাসত্যের পরিচয় সাধন

করিয়ে দেয়, তখন সেই বৃহৎ পরিচয়ের ভিতর দিয়ে ফিরে এসে প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্য সেই ভূমার রসে রসপরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। একদিন যাদের বানান করে পড়তে হচ্ছিল, যারা পদে পদে আমাদের পথরোধ করছিল, তারা প্রত্যেকে সেই ভূমার প্রতিই আমাদের বহন করে, রোধ করে না।

তখন যে আনন্দ সেই আনন্দই প্রেম। সেই প্রেমে বেঁধে রাখে না— সেই প্রেমে টেনে নিয়ে যায়। নির্মল নির্বাধ প্রেম। সেই প্রেমই মুক্তি— সমস্ত আসক্তির মৃত্যু এই মৃত্যুরই সংকারমন্ত্র হচ্ছে—

মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ।
মধু নক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্যঃ।

বায়ু মধু বহন করছে, নদীসিন্ধুসকল মধু ক্ষরণ করছে। ওষধিবনস্পতিসকল মধুময় হোক, রাত্রি মধু হোক, উষা মধু হোক, পৃথিবীর ধূলি মধুমৎ হোক, সূর্য মধুমান হোক।

যখন আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে তখন জলস্থল আকাশ, জড়জন্তু মনুষ্য, সমস্তই অমৃতে পরিপূর্ণ— তখন আনন্দের অবধি নেই।

আসক্তি আমাদের চিত্তকে বিষয়ে আবদ্ধ করে। চিত্ত যখন সেই বিষয়ের ভিতরে বিষয়াতীত সত্যকে লাভ করে তখন প্রজাপতি যেমন গুটি কেটে বের হয় তেমনি সে বৈরাগ্য-দ্বারা আসক্তিবন্ধন ছিন্ন করে ফেলে। আসক্তি ছিন্ন হয়ে গেলেই পূর্ণ সুন্দর প্রেম আনন্দরূপে সর্বত্রই প্রকাশ পায়। তখন, আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি— এই মন্ত্রের অর্থ বুঝতে পারি। যা-কিছু প্রকাশ পাচ্ছে সমস্তই সেই আনন্দরূপ, সেই অমৃতরূপ। কোনো বস্তুই তখন আমি প্রকাশ হচ্ছি বলে আর অহংকার করে না, প্রকাশ হচ্ছেন কেবল আনন্দ, কেবল আনন্দ। সেই প্রকাশের মৃত্যু নেই। মৃত্যু অন্য সমস্তের, কিন্তু সেই প্রকাশই অমৃত।

১৫ ফাল্গুন ১৩১৫

বিশ্বাস

সাধনা-আরম্ভে প্রথমেই সকলের চেয়ে একটি বড়ো বাধা আছে— সেইটি কাটিয়ে উঠতে পারলে অনেকটা কাজ এগিয়ে যায়।

সেটি হচ্ছে প্রত্যয়ের বাধা। অজ্ঞাতসমুদ্র পার হয়ে একটি কোনো তীরে গিয়ে ঠেকবই এই নিশ্চিত প্রত্যয়ই হচ্ছে কলম্বসের সিদ্ধির প্রথম এবং মহৎ সম্বল। আরো অনেকেই আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় পৌঁছোতে পারত, কিন্তু তাদের দীনচিত্তে ভরসা ছিল না ; তাদের বিশ্বাস উজ্জ্বল ছিল না যে, কূল আছে ; এইখানেই কলম্বসের সঙ্গে তাদের পার্থক্য।

আমরাও অধিকাংশ লোক সাধনাসমুদ্রে যে পাড়ি জমাই নে তার প্রধান কারণ— আমাদের অত্যন্ত নিশ্চিত প্রত্যয় জন্মে নি যে, সে সমুদ্রের পার আছে। শাস্ত্র পড়েছি, লোকের কথাও শুনেছি, মুখে বলি হাঁ-হাঁ বটে-বটে, কিন্তু মানবজীবনের যে একটা চরম লক্ষ্য আছে সে-প্রত্যয় নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হয় নি। এইজন্য ধর্মসাধনটা নিতান্তই বাহ্যব্যাপার, নিতান্তই দশজনের অনুকরণ মাত্র হয়ে পড়ে। আমাদের সমস্ত আন্তরিক চেষ্টা তাতে উদ্‌বোধিত হয় নি।

এই বিশ্বাসের জড়তা-বশতই লোককে ধর্মসাধনে প্রবৃত্ত করতে গেলে আমরা তাকে প্রতারণা করতে চেষ্ট করি, আমরা বলি এতে পুণ্য হবে। পুণ্য জিনিসটা কী ? না, পুণ্য হচ্ছে একটি হ্যাণ্ড্‌নোট যাতে ভগবান আমাদের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন, কোনো একরকম টাকায় তিনি কোনো এক সময়ে সেটা পরিশোধ করে দেবেন।

এইরকম একটা সুস্পষ্ট পুরস্কারের লোভ আমাদের স্থূল প্রত্যয়ের অনুকূল। কিন্তু সাধনার লক্ষ্যকে এইরকম বহির্বিষয় করে তুললে তার পথও ঠিক অন্তরের পথ হয় না, তার লাভও অন্তরের লাভ হয় না। সে একটা পারলৌকিক বৈষয়িকতার সৃষ্টি করে। সেই বৈষয়িকতা অন্যান্য বৈষয়িকতার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

কিন্তু সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। সে লক্ষ্য কখনোই বাহিরের কোনো স্থান নয়, যেমন স্বর্গ ; বাহিরের কোনো পদ নয়, যেমন ইন্দ্রপদ ; এমন কিছুই নয় যাকে দূরে গিয়ে সন্ধান করে বের করতে হবে, যার জন্যে পাণ্ডা পুরোহিতের শরণাপন্ন হতে হবে। এ কিছুতে হতেই পারে না।

মানবজীবনের চরম লক্ষ্য কী এই প্রশ্নটি নিজেকে জিজ্ঞাসা করে নিজের কাছ থেকে এর একটি স্পষ্ট উত্তর বের করে নিতে হবে। কারও কোনো শোনা কথায় এখানে কাজ চলবে না— কেননা এটি কোনো ছোটো কথা নয়, এটি একেবারে শেষ কথা। এটিকে যদি নিজের অন্তরাত্মার মধ্যে না পাই তবে বাইরে খুঁজে পাব না।

এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে আমি এসে দাঁড়িয়েছি এটি একটি মহাশ্চর্য ব্যাপার। এর চেয়ে বড়ো ব্যাপার আর কিছু নেই। আশ্চর্য এই আমি এসেছি— আশ্চর্য এই চারি দিক।

এই যে আমি এসে দাঁড়িয়েছি, কেবল খেয়ে ঘুমিয়ে গল্প করে কি এই আশ্চর্যটাকে ব্যাখ্যা করা যায় ? প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই কি একে প্রতিমুহূর্তে অপমানিত করবে এবং শেষ মুহূর্তে মৃত্যু এসে একে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে ?

এই ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে নিজের অন্তরাকাশের চৈতন্যলোকের মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করো— কেন ? এ-সমস্ত কী জন্যে ? এ প্রশ্নের উত্তর জল-স্থল-আকাশের কোথাও নেই— এ প্রশ্নের উত্তর নিজের অন্তরের মধ্যে নিহিত হয়ে রয়েছে।

এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে আত্মাকে পেতে হবে। এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো কথা নেই। আত্মাকেই সত্য করে, পূর্ণ করে জানতে হবে।

আত্মাকে যেখানে জানলে সত্য জানা হয় সেখানে আমরা দৃষ্টি দিচ্ছি নে। এইজন্যে আত্মাকে জানা বলে যে একটা পদার্থ আছে এই কথাটা আমাদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই এসে পৌঁছোয় না।

আত্মাকে আমরা সংসারের মধ্যেই জানতে চাচ্ছি। তাকে কেবলই ঘর-দুয়োর ঘটিবাটির মধ্যেই জানছি। তার বেশি তাকে আমরা জানিই নে— এইজন্যে তাকে পাচ্ছি আর হারাচ্ছি, কেবল কাঁদছি আর ভয় পাচ্ছি। মনে করছি এটা না পেলেই আমি মলুম, আর ওটা পেলেই একেবারে ধন্য হয়ে গেলুম। এটাকে এবং ওটাকেই প্রধান করে জানছি, আত্মাকে তার কাছে খর্ব করে সেই প্রকাণ্ড দৈন্যের বোঝাকেই ঐশ্বর্যের গর্বে বহন করছি।

আত্মাকে সত্য করে জানলেই আত্মার সমস্ত ঐশ্বর্য লাভ হয়। মৃত্যুর সামগ্রীর মধ্যে অহরহ তাকে জড়িত করে তাকে শোকের বাষ্পে ভয়ের অন্ধকারে লুপ্তপ্রায় করে দেখার দুর্দিন কেটে যায়। পরমাত্মার মধ্যেই তার পরিপূর্ণ সত্য পরিপূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ পায়— সংসারের মধ্যে নয়, বিষয়ের মধ্যে নয়, তার নিজের অহংকারের মধ্যে নয়।

আত্মা সত্যের পরিপূর্ণতার মধ্যে নিজেকে জানবে, সেই পরম উপলব্ধি -দ্বারা সে বিনাশকে একেবারে অতিক্রম করবে। সে জ্ঞানজ্যোতির নির্মলতার মধ্যেই নিজেকে জানবে। কামক্রোধলোভ যে-সমস্ত বিকারের অন্ধকার রচনা করে, তার থেকে আত্মা বিশুদ্ধ শুভ্র নির্মুক্ত পবিত্রতার মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে এবং সর্বপ্রকার আসক্তির মৃত্যুবন্ধন থেকে প্রেমের অমৃতলোকে মুক্তিলাভ করে সে নিজেকে অমর বলেই জানবে। সে জানবে কার প্রকাশের মধ্যে তার প্রকাশ সত্য— সেই আবিঃ সেই প্রকাশস্বরূপকেই সে আত্মার পরম প্রকাশ বলে নিজের সমস্ত দৈন্য দূর করে দেবে এবং অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই একটি প্রসন্নতা লাভ করে সে স্পষ্ট জানতে পারবে সে চিরদিনের জন্যে রক্ষা পেয়েছে। সমস্ত ভয় হতে, সমস্ত শোক হতে, সমস্ত ক্ষুদ্রতা হতে রক্ষা পেয়েছে।

আত্মাকে পরমাত্মার মধ্যে লাভ করাই যে জীবনের চরম লক্ষ্য, এই লক্ষ্যটিকে একান্ত প্রত্যয়ের

সঙ্গে একাগ্রচিত্তে স্থির করে নিতে হবে। দেখো, দেখো, নিরীক্ষণ করে দেখো, সমস্ত চেষ্টাকে স্তব্ধ করে সমস্ত মনকে নিবিষ্ট করে নিরীক্ষণ করে দেখো। একটি চাকা কেবলই ঘুরছে, তারই মাঝখানে একটি বিন্দু স্থির হয়ে আছে। সেই বিন্দুটিকে অর্জুন বিদ্ধ করে দ্রৌপদীকে পেয়েছিলেন। তিনি চাকার দিকে মন দেন নি, বিন্দুর দিকেই সমস্ত মন সংহত করেছিলেন। সংসারের চাকা কেবলই ঘুরছে, লক্ষ্যটি তার মাঝখানে ধ্রুব হয়ে আছে। সেই ধ্রুবের দিকেই মন দিয়ে লক্ষ্য স্থির করতে হবে, চলার দিকে নয়। লক্ষ্যটি যে আছে সেটা নিশ্চয় করে দেখে নিতে হবে— চাকার ঘূর্ণাগতির মধ্যে দেখা বড়ো শক্ত— কিন্তু সিদ্ধি যদি চাই প্রথমে লক্ষ্যটিকে স্থির যেন দেখতে পারি।

১৬ ফাল্গুন ১৩১৫

সংহরণ

আমাদের সাধনার দ্বিতীয় বড়ো বাধা হচ্ছে সাধনার অনভ্যাস। কোনোরকম সাধনাতেই হয়তো আমাদের অভ্যাস হয় নি। যখন যেটা আমাদের সমুখে এসেছে সেইটের মধ্যেই হয়তো আমরা আকৃষ্ট হয়েছি, যেমন-তেমন করে ভাসতে ভাসতে যেখানে-সেখানে ঠেকতে ঠেকতে আমরা চলে যাচ্ছি। সংসারের স্রোত আমাদের বিনা চেষ্টাতেই চলছে বলেই আমরা চলছি— আমাদের দাঁড়ও নেই, হালও নেই, পালও নেই।

কোনো-একটি উদ্দেশ্যের একান্ত অনুগত করে শক্তিকে প্রবৃত্তিকে চতুর্দিক হতে সংগ্রহ করে আনা আমরা চর্চাই করি নি। এইজন্যে তারা সকলেই হাতের বার হয়ে যাবার জো হয়েছে। কে কোথায় যে আছে তার ঠিকানা নেই— ডাক দিলেই যে ছুটে আসবে এমন সম্ভাবনা নেই। যে-সব খাদ্য তাদের অভ্যস্ত এবং রুচিকর তারই প্রলোভন পেলে তবেই তারা আপনি জড় হয়, নইলে কিছুতেই নয়।

নিজেকে চারি দিকে কেবল ছড়াছড়ি করাটাই অভ্যাস হয়ে গেছে। চিন্তাও ছড়িয়ে পড়ে, কর্মও এলিয়ে যায়, কিছুই আঁট বাঁধে না।

এরকম অবস্থায় যে কেবল সিদ্ধি নেই তা নয়, সত্যকার সুখও নেই। এতে কেবল জড়তার তামসিক আবেশমাত্র।

কারণ, যখন আমাদের শক্তিকে প্রবৃত্তিকে কোনো উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত করে দিই তখন সেই উদ্দেশ্যই তাদের বহন করে নিয়ে চলে। তখন তাদের ভার আর আমাদের নিজের ঘাড়ে পড়ে না। নতুবা তাদের বহন করে একবার এর উপর রাখছি, একবার তার উপর রাখছি, এমনি করে কেবলই টানাটানি করে নিয়ে বেড়াতে হয়। যখন কোথাও নামিয়ে রাখবার কোনো উপায় না পাই তখন কৃত্রিম উপায় সৃষ্টি করতে থাকি। কতই বাজে খেলা, বাজে আমোদ, বাজে উপকরণ। অবশেষে সেই কৃত্রিম আয়োজনগুলোও দ্বিতীয় বোঝা হয়ে আমাদের চতুর্দিকে চেপে ধরে। এমনি করে জীবনের ভার কেবলই জমে উঠতে থাকে, জীবনান্তকাল পর্যন্ত কোনোমতেই তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই নে।

তাই বলছিলুম কেবলমাত্র সাধনার অবস্থাতেই একটা আনন্দ আছে, সিদ্ধির কথা দূরে থাক্। মহৎলক্ষ্য-অনুসরণে নিজের বিক্ষিপ্ততাকে একাগ্র করে এনে তাকে এক পথে চালনা করলে তাতেই যেন প্রাণ বেঁচে যায়। যেটুকু সচেষ্টতা থাকলে আমরা সাধনাকে আনন্দ বলে কোমর বেঁধে বক্ষ প্রসারিত করে প্রবৃত্ত হতে পারি সেটুকুও যদি আমাদের ভিতর থেকে ক্ষয়ে গিয়ে থাকে তবে বড়ো বিপদ। যেমন করে হোক, বারংবার স্খলিত হয়েও সেই সমস্ত শক্তিকে একাগ্র করবার চেষ্টাকে শক্ত করে তুলতে হবে। শিশু যেমন পড়তে পড়তে আঘাত পেতে পেতে চলতে শেখে, তেমনি করেই তাকে চলতে শেখাতে হবে। কেননা সিদ্ধিলাভে প্রথমে লক্ষ্যটা যে সত্য সেই বিশ্বাসটি জাগানো চাই ;

তার পরে লক্ষ্যটি বাইরে না ভিতরে, পরিধিতে না কেন্দ্রে, সেটি জানা চাই ; তার পরে চাই সোজা পথ বেয়ে চলতে শেখা। স্থৈর্য এবং গতি দুই চাই। বিশ্বাসে চিত্ত স্থির হবে— এবং সাধনায় চেষ্টা গতি লাভ করবে।

১৬ ফাল্গুন ১৩১৫

নিষ্ঠা

যখন সিদ্ধির মূর্তি কিছু পরিমাণে দেখা দেয় তখন আনন্দে আমাদের আপনি টেনে নিয়ে চলে— তখন থামায় কার সাধ্য। তখন শ্রান্তি থাকে না, দুর্বলতা থাকে না।

কিন্তু সাধনার আরম্ভেই সেই সিদ্ধির মূর্তি তো নিজেকে এমন করে দূর থেকেও প্রকাশ করে না। অথচ পথটিও তো সুগম পথ নয়। চলি কিসের জোরে ?

এই সময়ে আমাদের চালাবার ভার যিনি নেন তিনিই নিষ্ঠা। ভক্তি যখন জাগে, হৃদয় যখন পূর্ণ হয়, তখন তো আর ভাবনা থাকে না ; তখন তো পথকে আর পথ বলেই জ্ঞান হয় না, তখন একেবারে উড়ে চলি। কিন্তু ভক্তি যখন দূরে, হৃদয় যখন শূন্য, সেই অত্যন্ত দুঃসময়ে আমাদের সহায় কে ?

তখন আমাদের একমাত্র সহায় নিষ্ঠা। শুষ্ক চিত্তের মৃতভারকে সেই বহন করতে পারে।

মরুভূমির পথে যাদের চলতে হয় তাদের বাহন হচ্ছে উট। অত্যন্ত শক্ত সবল বাহন— এর কিছুমাত্র শৌখিনতা নেই। খাদ্য পাচ্ছে না তবু চলছে। পানীয় রস পাচ্ছে না তবু চলছে। বালি তপ্ত হয়ে উঠেছে তবু চলছে, নিঃশব্দে চলছে। যখন মনে হয় সামনে বুঝি এ মরুভূমির অন্ত নেই, বুঝি মৃত্যু ছাড়া আর গতি নেই, তখনো তার চলা বন্ধ হয় না।

তেমনি শুষ্কতা রিক্ততার মরুপথে কিছু না খেয়ে, কিছু না পেয়েও, আমাদের চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে সে কেবল নিষ্ঠা— তার এমনি শক্ত প্রাণ যে নিন্দাগ্লানির ভিতর থেকে, কাঁটাগুল্মের মধ্যে থেকেও, সে নিজের খাদ্য সংগ্রহ করে নিতে পারে। যখন মরুবায়ুর মৃত্যুময় ঝঞ্ঝা উন্মত্তের মতো ছুটে আসে, তখন সে ধুলোর উপর মাথা সম্পূর্ণ নত করে ঝড়কে মাথার উপর দিয়ে চলে যেতে দেয়। তার মতো এমন ধীর সহিষ্ণু এমন অধ্যবসায়ী কে আছে ?

একঘেয়ে একটানা প্রান্তর। মাঝে মাঝে কেবল কল্পনার মরীচিকা পথ ভোলাতে আসে— সার্থকতার বিচিত্র রূপ ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয় না। মনে হয় যেন কালও যেখানে ছিলুম আজও সেখানেই আছি। মন দিতে চাই, মন ঘুরে বেড়ায় ; হৃদয়কে ডাঁকাডাকি করি, হৃদয় সাড়া দেয় না। কেবলই মনে হয় ব্যর্থ উপাসনার চেষ্টায় ক্লিষ্ট হচ্ছি। কিন্তু সেই ব্যর্থ উপাসনার ভয়ানক ভার বহন করে নিষ্ঠা প্রত্যেক দিনই চলতে পারে— দিনের পর দিন, দিনের পর দিন।

অগ্রসর হচ্ছেই, অগ্রসর হচ্ছেই— প্রতিদিন যে গম্যস্থানের কিছু কিছু করে কাছে আসছে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। ঐ দেখো হঠাৎ একদিন কোথা হতে ভক্তির ওয়েসিস দেখা দেয়— সুদূরপ্রসারিত দগ্ধ পাণ্ডুরতার মধ্যে মধুফলগুচ্ছপূর্ণ খর্জুরকুঞ্জের সুস্নিগ্ধ শ্যামলতা ; সেই নিভৃত ছায়াতলে শীতল জলের উৎস বয়ে যাচ্ছে। সেই জল পান করে তাতে স্নান করে ছায়ায় বিশ্রাম করে আবার পথে যাত্রা করি। কিন্তু ভক্তির সেই মধুরতা সেই শীতল সরসতা তো বরাবর সঙ্গে সঙ্গে চলে না। তখন আবার সেই কঠিন শুষ্ক অশ্রান্ত নিষ্ঠা। তার একটি গুণ আছে, ভক্তির জল যদি সে কোনো সুযোগে একদিন পান করতে পায় তবে সে অনেকদিন পর্যন্ত তাকে ভিতরের গোপন আধারে জমিয়ে রাখতে পারে। ঘোরতর নীরসতার দিনেও সেই তার পিপাসার সম্বল।

সাধনায় যাঁকে পাওয়া যায় তাঁর প্রতি ভক্তিকেই আমরা ভক্তি বলি, কিন্তু নিষ্ঠা হচ্ছে সাধনারই প্রতি ভক্তি। এই কঠোর কঠিন শুষ্ক সাধনাই হচ্ছে নিষ্ঠার প্রাণের ধন। এতে তার একটি গভীরতর আনন্দই

আছে। সে একটি অহেতুক পবিত্র আনন্দ। এই বজ্রসার আনন্দে সে নৈরাশ্যকে দূরে রেখে দেয়— সে মৃত্যুকেও ভয় করে না। এই আমাদের মরুপথের একমাত্র সঙ্গিনী নিষ্ঠা যেদিন পথের অন্তে এসে পৌঁছোয় সেদিন সে ভক্তির হাতে আমাদের সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়ে নিজেকে তার দাসীশালায় লুকিয়ে রেখে দেয়; কোনো অহংকার করে না, কোনো দাবি করে না— সার্থকতার দিনে আপনাকে অন্তরালে প্রচ্ছন্ন-করেই তার সুখ।

১৭ ফাল্গুন

নিষ্ঠার কাজ

নিষ্ঠা যে কেবল আমাদের শুষ্ক কঠিন পথের উপর দিয়ে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে চালন করে নিয়ে যায় তা নয়, সে আমাদের কেবলই সতর্ক করে দেয়। রোজই একভাবে চলতে চলতে আমাদের শৈথিল্য এবং অমনোযোগ আসতে থাকে। নিষ্ঠা কখনো ভুলতে চায় না— সে আমাদের ঠেলে দিয়ে বলে এ কী হচ্ছে! এ কী করছ! সে মনে করিয়ে দেয় ঠাণ্ডার সময় যদি এগিয়ে না থাক তবে রৌদ্রের সময় যে কষ্ট পাবে। সে দেখিয়ে দেয় তোমার জলাধারের ছিদ্র দিয়ে জল পড়ে যাচ্ছে, পিপাসার সময় উপায় কী হবে!

আমরা সমস্ত দিন কতরকম করে যে শক্তির অপব্যয় করে চলি তার ঠিকানা নেই— কত বাজে কথায়, কত বাজে কাজে। নিষ্ঠা হঠাৎ স্মরণ করিয়ে দেয়, 'এই যে-জিনিসটা এমন করে ফেলাছড়া করছ এটার যে খুব প্রয়োজন আছে। একটু চুপ করো, একটু স্থির হও, অত বাড়িয়ে বোলো না, অমন মাত্রা ছাড়িয়ে চোলো না, যে জল পান করবার জন্যে যত্নে সঞ্চিত করা দরকার সে জলে খামকা পা ডুবিয়ে বোসো না।' আমরা যখন খুব আত্মবিস্মৃত হয়ে একটা তুচ্ছতার ভিতরে একেবারে গলা পর্যন্ত নেবে গিয়েছি তখনো সে আমাদের ভোলে না— বলে, 'ছি, এ কী কাণ্ড!' বুকের কাছেই সে বসে আছে, কিছুই তার দৃষ্টি এড়াতে চায় না।

সিদ্ধিলাভের কাছাকাছি গেলে প্রেমের সহজ প্রাজ্ঞতা লাভ হয়, তখন মাত্রাবোধ আপনি ঘটে। সহজ কবি যেমন সহজেই ছন্দোরক্ষা করে চলে আমরা তেমনি সহজেই জীবনকে আগাগোড়া সৌন্দর্যের মধ্যে বিশুদ্ধরূপে নিয়মিত করতে পারি। তখন স্খলন হওয়াই শক্ত হয়। কিন্তু রিক্ততার দিনে সেই আনন্দের সহজ শক্তি যখন থাকে না, তখন পদে পদে যতিপতন হয়; যেখানে থামবার নয় সেখানে আলস্য করি, যেখানে থামবার সেখানে বেগ সামলাতে পারি নে। তখন এই কঠোর নিষ্ঠাই আমাদের একমাত্র সহায়। তার ঘুম নেই, সে জেগেই আছে। সে বলে, 'ও কী! ঐ যে একটা রাগের রক্ত আভা দেখা দিল। ঐ যে নিজেকে একটু বেশি করে বাড়িয়ে দেখবার জন্যে তোমার চেষ্টা আছে। ঐ যে শত্রুতার কাঁটা তোমার স্মৃতিতে বিঁধেই রইল। কেন, হঠাৎ গোপনে তোমার এত ক্ষোভ দেখি কেন! এই যে রাত্রে শুতে যাচ্ছ, এই পবিত্র নির্মল নিদ্রার কক্ষে প্রবেশ করতে যাবার মতো শান্তি তোমার অন্তরে কোথায়!'

সাধনার দিনে নিষ্ঠার এই নিত্য সতর্কতার স্পর্শই আমাদের সকলের চেয়ে প্রধান আনন্দ। এই নিষ্ঠা যে জেগে আছেন এইটে যতই জানতে পাই ততই বক্ষের মধ্যে নির্ভর অনুভব করি। যদি কোনোদিন কোনো আত্মবিস্মৃতির দুর্যোগে এঁর দেখা না পাই তবেই বিপদ গনি। যখন চরম সুহৃদকে না পাই তখন এই নিষ্ঠাই আমাদের পরম সুহৃদরূপে থাকেন। তাঁর কঠোর মূর্তি প্রতিদিন আমাদের কাছে শুভ্র সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। এই চাঞ্চল্যবর্জিত ভোগবিরত পুণ্যশ্রী তাপসিনী আমাদের রিক্ততার মধ্যে শক্তি শান্তি এবং জ্যোতি বিকীর্ণ করে দারিদ্র্যকে রমণীয় করে তোলেন।

গম্যস্থানের প্রতি কলম্বসের বিশ্বাস যখন সুদৃঢ় হল তখন নিষ্ঠাই তাঁকে পথচিহ্নহীন অপরিচিত সমুদ্রের পথে প্রত্যহ ভরসা দিয়েছিল। তাঁর নাবিকদের মনে সে বিশ্বাস দৃঢ় ছিল না, তাদের সমুদ্রযাত্রায় নিষ্ঠাও ছিল না। তারা প্রতিদিনই বাইরে থেকে একটা কিছু সফলতার মূর্তি দেখবার জন্যে ব্যস্ত ছিল ; কিছু একটা না পেলে তাদের শক্তি অবসন্ন হয়ে পড়ে ; এইজন্যে দিন যতই যেতে লাগল, সমুদ্র যতই শেষ হয় না, তাদের অধৈর্য ততই বেড়ে উঠতে থাকে। তারা বিদ্রোহ করবার উপক্রম করে, তারা ফিরে যেতে চায়। তবু কলম্বসের নিষ্ঠা বাইরে থেকে কোনো নিশ্চয় চিহ্ন না দেখতে পেয়েও নিঃশব্দে চলতে থাকে। কিন্তু এমন হয়ে এসেছে নাবিকদের আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না, তারা জাহাজ ফেরায় বা ! এমন সময় চিহ্ন দেখা দিল, তীর যে আছে তার আর কোনো সন্দেহ রইল না। তখন সকলেই আনন্দিত, সকলেই উৎসাহে এগিয়ে যেতে চায়। তখন কলম্বসকে সকলেই বন্ধু জ্ঞান করে, সকলেই তাকে ধন্যবাদ দেয়।

সাধনার প্রথমাবস্থায় সহায় কেউ নেই— সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করে, সকলেই বাধা দেয়। বাইরেও এমন কোনো স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাই নে যাকে আমরা সত্যবিশ্বাসের স্পষ্ট প্রমাণ বলে নিজের ও সকলের কাছে ধরে দেখাতে পারি। তখন সেই সমুদ্রের মাঝখানে সন্দেহ ও বিরুদ্ধতার মধ্যে নিষ্ঠা যেন এক মুহূর্ত সঙ্গ ত্যাগ না করে। যখন তীর কাছে আসবে, যখন তীরের পাখি তোমার মাস্তুলের উপর উড়ে বসবে, যখন তীরের ফুল সমুদ্রের তরঙ্গের উপর নৃত্য করবে, তখন সাধুবাদ ও আনুকূল্যের অভাব থাকবে না ; কিন্তু ততকাল প্রতিদিনই কেবল নিষ্ঠা— নৈরাশ্যজয়ী নিষ্ঠা, আঘাতসহিষ্ণু নিষ্ঠা, বাহিরের-উৎসাহ-নিরপেক্ষ নিষ্ঠা, নিন্দায় অবচলিত নিষ্ঠা— কোনোমতে কোনো কারণেই সে নিষ্ঠা যেন ত্যাগ না করে— সে যেন কম্পাসের দিকে চেয়েই থাকে, সে যেন হাল আঁকড়ে বসেই থাকে।

১৭ ফাল্গুন

বিমুখতা

সেই বিশ্বকর্মা মহাত্মা যিনি জনগণের হৃদয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়ে কাজ করছেন— তিনি বড়ো প্রচ্ছন্ন হয়েই কাজ করেন। তাঁর কাজ অগ্রসর হচ্ছেই সন্দেহ নেই— কেবল সে কাজ যে চলছে তা আমরা জানি নে বলেই নিরানন্দ আছে। সেই কাজে আমাদের যেটুকু যোগ দেবার আছে তা দিই নি বলেই আমাদের জীবন যেন তাৎপর্যহীন হয়ে রয়েছে। কিন্তু তবু বিশ্বকর্মা তাঁর স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়ার আনন্দে প্রতিদিনই প্রতি মুহূর্তেই কাজ করছেন। তিনি আমার জীবনের একটি সূর্যকরোজ্জ্বল দিনকে চন্দ্রতারাখচিত রাত্রির সঙ্গে গাঁথছেন, আবার সেই জ্যোতিষ্কপুঞ্জখচিত রাত্রিকে জ্যোতির্ময় আর-একটি দিনের সঙ্গে গেঁথে চলেছেন। আমার এই জীবনের মণিহার-রচনায় তাঁর বড়ো আনন্দ। আমি যদি তাঁর সঙ্গে যোগ দিতুম তবে সেই আনন্দ আমারও হত। এই আশ্চর্য শিল্পরচনায় কত ছিদ্র করতে হচ্ছে, কত বিদ্ধ করতে হচ্ছে, কত দগ্ধ করতে হচ্ছে, কত আঘাত করতে হচ্ছে— সেই সমস্ত আঘাতের মধ্যেই বিশ্বকর্মার সৃজনের আনন্দে আমার অধিকার জন্মাত।

কিন্তু যে অন্তরের গুহার মধ্যে আনন্দিত বিশ্বকর্মা দিন রাত্রি বসে কাজ করছেন সে দিকে আমি তো তাকালুম না— আমি সমস্ত জীবন বাইরের দিকেই হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম। দশজনের সঙ্গে মিলছি মিশছি, হাসি গল্প করছি, আর ভাবছি কোনোমতে দিন কেটে যাচ্ছে— যেন দিনটা কাটানোই হচ্ছে দিনটা পাবার উদ্দেশ্য। যেন দিনের কোনো অর্থ নেই।

আমরা যেন মানবজীবনের নাট্যশালায় প্রবেশ করে যে দিকে অভিনয় হচ্ছে সে দিকে মূঢ়ের মতো পিঠ ফিরিয়ে বসে আছি। নাট্যশালার থামগুলো চৌকিগুলো এবং লোকজনের ভিড়ই দেখছি। তার পরে যখন আলো নিবে গেল, যবনিকা পড়ে গেল, আর-কিছুই দেখতে পাই নে, অন্ধকার নিবিড়—

তখন হয়তো নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, কী করতে এসেছিলুম, কেনই বা টিকিটের দাম দিলুম, এই থাম চৌকির অর্থ কী, এতগুলো লোকই বা এখানে জড় হয়েছে কী করতে ? সমস্তই ফাঁকি, সমস্তই অর্থহীন ছেলেখেলা। হায়, আনন্দের অভিনয় যে নাট্যমঞ্চে হচ্ছে সে দিকের কোনো খবরই পাওয়া গেল না।

জীবনের আনন্দলীলা যিনি করছেন তিনি যে এই ভিতরে বসেই করছেন— ঐ থাম চৌকিগুলো যে বহিরঙ্গ মাত্র। ঐগুলিই প্রধান সামগ্রী নয়। একবার অন্তরের দিকে চোখ ফেরাও— তখনই সমস্ত মানে বুঝতে পারবে।

যে কাণ্ডটা হচ্ছে সমস্তই যে অন্তরে হচ্ছে। এই যে অন্ধকার কেটে গিয়ে এখনই ধীরে ধীরে সূর্যোদয় হচ্ছে একি কেবলই তোমার বাইরে ? বাইরেই যদি হত তবে তুমি সেখানে কোন্ দিক দিয়ে প্রবেশ করতে ? বিশ্বকর্মা যে তোমার চৈতন্যাকাশকে এই মুহূর্তে একেবারে অরুণরাগে প্লাবিত করে দিলেন। চেয়ে দেখো তোমারই অন্তরে তরুণ সূর্য সোনার পদ্মের কুঁড়ির মতো মাথা তুলে উঠছে, একটু একটু করে জ্যোতির পাপড়ি চারি দিকে ছড়িয়ে দেবার উপক্রম করছে— তোমারই অন্তরে। এই তো বিশ্বকর্মার আনন্দ। তোমারই এই জীবনের জমিতে তিনি এত সোনার সুতো রুপোর সুতো এত রঙ-বেরঙের সুতো দিয়ে অহরহ এতবড়ো একটা আশ্চর্য বুনানি বুনছেন— এ যে তোমার ভিতরেই— যা একেবারে বাইরে সে যে তোমার নয়।

তবে এখনই দেখো। এই প্রভাতকে তোমারই অন্তরের প্রভাত বলে দেখো, তোমারই চৈতন্যের মধ্যে তাঁর আনন্দ-সৃষ্টি বলে দেখো। এ আর কারও নয়, এ আর কোথাও নেই— তোমার এই প্রভাতটি একমাত্র তোমারই মধ্যে রয়েছে এবং সেখানে একলামাত্র তিনিই রয়েছেন। তোমার এই সুগভীর নির্জনতার মধ্যে তোমার এই অন্তহীন চিদাকাশের মধ্যে তাঁর এই অদ্ভুত বিরাট লীলা— দিনে রাত্রে অবিশ্রাম। এই আশ্চর্য প্রভাতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে একে কেবলই বাইরের দিকে দেখতে গেলে এতে আনন্দ পাবে না, অর্থ পাবে না।

যখন আমি ইংলণ্ডে ছিলুম আমি তখন বালক। লণ্ডন থেকে কিছু দূরে এক জায়গায় আমার নিমন্ত্রণ ছিল। আমি সন্ধ্যার সময় রেলগাড়িতে চড়লুম। তখন শীতকাল। সেদিন কুহেলিকায় চারি দিক আচ্ছন্ন, বরফ পড়ছে। লণ্ডন ছাড়িয়ে স্টেশনগুলি বাম দিকে আসতে লাগল। যখন গাড়ি থামে আমি জানলা খুলে বাম দিকে মুখ বাড়িয়ে সেই কুয়াশালিপ্ত অস্পষ্টতার মধ্যে কোনো এক ব্যক্তিকে ডেকে স্টেশনের নাম জেনে নিতে লাগলুম। আমার গম্য স্টেশনটি শেষ স্টেশন। সেখানে যখন গাড়ি থামল আমি বাম দিকেই তাকালুম— সে দিকে আলো নেই প্ল্যাটফর্ম নেই দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইলুম। ক্ষণকাল পরেই গাড়ি আবার লণ্ডনের অভিমুখে পিছোতে আরম্ভ করল। আমি বলি, এ কী হল ! পরের স্টেশনে যখন থামল, জিজ্ঞাসা করলুম অমুক স্টেশন কোথায় ? উত্তর শুনলুম, 'সেখান থেকে তুমি যে এইমাত্র আসছ।' তাড়াতাড়ি নেবে পড়ে জিজ্ঞাসা করলুম এর পরের গাড়ি কখন পাওয়া যাবে ? উত্তর পেলুম— অর্ধরাত্রে। গম্য স্টেশনটি ডান দিকে ছিল।

আমার জীবনযাত্রায় কেবল বাঁ দিকের স্টেশনগুলিরই খোঁজ নিয়ে চলেছি। ডান দিকে কিছুই নেই বলে একেবারে নিশ্চিন্ত। একটার পর একটা পার হয়েই গেলুম। যে-স্থানে নামবার ছিল সেখানেও সংসারের দিকেই— ঐ বাম দিকেই— চেয়ে দেখলুম। দেখলুম সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত কুয়াশায় অস্পষ্ট। যে সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল সে সুযোগ কেটে গেল— গাড়ি ফিরে চলেছে। যেখানে নিমন্ত্রণ ছিল সেখানে আমোদ আহ্লাদ অতীত হতে চলল। আবার গাড়ি কখন পাওয়া যাবে ? এই যে সুযোগ পেয়েছিলুম ঠিক এমন সুযোগ কখন পাব— কোন্ অর্ধরাত্রে !

মানবজীবনের ভিতর দিয়েই যে চরম স্থানে যাওয়া যেতে পারে, এমন একটা স্টেশন আছে। সেখানে যদি না নামি— সেখানকার প্ল্যাটফর্ম যে দিকে সে দিকে যদি না তাকাই তবে সমস্ত যাত্রাই যে আমার কাছে একটা নিতান্ত কুহেলিকাবৃত নিরর্থক ব্যাপার বলে ঠেকবে তাতে সন্দেহ কী আছে। কেন যে টিকিটের দাম দিলুম, কেন যে গাড়িতে উঠলুম, অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়ে কেন যে চললুম, কী যে হল কিছুই বোঝা গেল না। নিমন্ত্রণ আমার কোথায় ছিল, ভোজের আয়োজনটা কোথায় হয়েছে,

ক্ষুধা আমার কোন্‌খানে মিটবে, আশ্রয় আমি কোন্‌খানে পাব— সে প্রশ্নের কোনো উত্তর না পেয়েই হতবুদ্ধি হয়ে যাত্রা শেষ করতে হল।

হে সত্য, আর কিছু নয়, যে দিকে তুমি, যে দিকে সত্য, সেই দিকে আমার মুখ ফিরিয়ে দাও— আমি যে কেবল অসত্যের দিকে তাকিয়ে আছি। তোমার আনন্দলীলামঞ্চে তুমি সারি সারি আলো জ্বালিয়ে দিয়েছ— আমি তার উলটো দিকের অন্ধকারে তাকিয়ে ভেবে মরছি এ সমস্ত কী। তোমার জ্যোতির দিকে আমাকে ফেরাও। আমি কেবলই দেখছি মৃত্যু— তার কোনো মানেই ভেবে পাচ্ছি নে, ভয়ে সারা হয়ে যাচ্ছি। ঠিক তার ওপাশেই যে অমৃত রয়েছে, তার মধ্যে সমস্ত মানে রয়েছে সে কথা আমাকে কে বুঝিয়ে দেবে? হে আবিঃ— তুমি যে প্রকাশরূপে নিরন্তর রয়েছ— সেই প্রকাশের দিকেই আমার দৃষ্টি নেই। আমি হতভাগা। সেইজন্যে আমি কেবল তোমাকে রুদ্রই দেখছি, তোমার প্রসন্নতা যে আমার আত্মাকে নিয়ত পরিবেষ্টিত করে রয়েছে তা জানতেই পারছি নে। মার দিকে পিঠ করে শিশু অন্ধকার দেখে কেঁদে মরে— একবার পাশ ফিরলেই জানতে পারে মা যে তাকে আলিঙ্গন করেই রয়েছেন। তোমার প্রসন্নতার দিকেই তুমি আমাদের পাশ ফিরিয়ে নাও হে জননী, তা হলেই এক মুহূর্তে জানতে পারব আমি রক্ষা পেয়েই আছি, অনন্তকাল আমার রক্ষা— নইলে অরক্ষাভয়ের কান্না কোনোমতেই থামবে না।

১৮ ফাল্গুন

মরণ

ঈশ্বরের সঙ্গে খুব একটা শৌখিন রকমের যোগ রক্ষা করার মতলব মানুষের দেখতে পাই। যেখানে যা যেমন আছে তা ঠিক সেইরকম রেখে সেইসঙ্গে অমনি ঈশ্বরকেও রাখবার চেষ্টা। তাতে কিছুই নাড়ানাড়ি করতে হয় না। ঈশ্বরকে বলি, তুমি ঘরের মধ্যে এসো কিন্তু সমস্ত বাঁচিয়ে এসো— দেখো আমার কাঁচের ফুলদানিটা যেন না পড়ে যায়, ঘরের নানাস্থানে যে নানা পুতুল সাজিয়ে রেখেছি তার কোনোটা যেন ঘা লেগে ভেঙে না যায়। এ আসনটায় বোসো না, এটাতে আমার অমুক বসে; এ জায়গায় নয়, এখানে আমি অমুক কাজ করে থাকি; এ ঘর নয়, এ আমার অমুকের জন্যে সাজিয়ে রাখছি। এই করতে করতে সব চেয়ে কম জায়গা এবং সব চেয়ে অনাবশ্যক স্থানটাই আমরা তাঁর জন্যে ছেড়ে দিই।

মনে আছে আমার পিতার কোনো ভৃত্যের কাছে ছেলেবেলায় আমরা গল্প শুনেছি যে, সে যখন পুরীতীর্থে গিয়েছিল তার মহা ভাবনা পড়েছিল জগন্নাথকে কী দেবে। তাঁকে যা দেবে সে তো কখনো সে আর ভোগ করতে পারবে না, সেইজন্যে সে যে জিনিসের কথাই মনে করে কোনোটাই তার দিতে মন সরে না— যাতে তার অল্পমাত্রও লোভ আছে সেটাও, চিরদিনের মতো দেবার কথায়, মন আকুল করে তুলতে লাগল। শেষকালে বিস্তর ভেবে সে জগন্নাথকে বিলিতি বেগুন দিয়ে এল। এই ফলটিতেই সে লোকের সব চেয়ে কম লোভ ছিল।

আমরাও ঈশ্বরের জন্যে কেবলমাত্র সেইটুকুই ছাড়তে চাই যেটুকুতে আমাদের সব চেয়ে কম লোভ— যেটুকু আমাদের নিতান্ত উদ্‌বৃত্তের উদ্‌বৃত্ত। ঈশ্বরের-নাম-গাঁথা দুটো-একটা মন্ত্র পাঠ করা গেল, দুটি-একটি সংগীত শোনা গেল, যাঁরা বেশ ভালো বক্তৃতা করতে পারেন তাঁদের কাছ থেকে নিয়মিত বক্তৃতা শোনা গেল। বললুম বেশ হল, বেশ লাগল, মনটা এখন বেশ পবিত্র ঠেকছে— আমি ঈশ্বরের উপাসনা করলুম।

একেই আমরা বলি উপাসনা। যখন বিদ্যার ধনের বা মানুষের উপাসনা করি তখন সেটা এত সহজ

উপাসনা হয় না, তখন উপাসনা যে কাকে বলে তা বুঝতে বাকি থাকে না। কেবল ঈশ্বরের উপাসনাটাই হচ্ছে উপাসনার মধ্যে সব চেয়ে ফাঁকি।

এর মানে আর কিছুই নয়, নিজের অংশটাকেই সব চেয়ে বড়ো করে ঘের দিয়ে নিয়ে ঈশ্বরকে এক পাই অংশের শরিক করি এবং মনে করি আমার সকল দিক রক্ষা হল।

আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে "যা দ্বয়লোকসাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী"— যাতে দুই লোকেরই সাধনা হয় মানুষের সেই চাতুরীই চাতুরী।

কিন্তু যে-চাতুরী দুইলোক রক্ষার ভার নেয় শেষকালে সে ঐ দুই লোকের মধ্যে একটা লোকের কথা ভুলতে থাকে, তার চাতুরী ঘুচে যায়। যে-লোকটি আমার দিকের লোক অধিকাংশ স্থলে সেই দিকের সীমানাই অজ্ঞাতসারে এবং জ্ঞাতসারে বেড়ে চলতে থাকে। ঈশ্বরের জন্যে ঐ যে এক পাই জমি রেখেছিলুম, যদি তাতে কোনো পদার্থ থাকে, যদি সেটা নিতান্তই বালিচাপা মরুভূমি না হয়, তবে একটু একটু করে লাঙল ঠেলে ঠেলে সেটা আত্মসাৎ করে নেবার চেষ্টা করি। "আমি" জিনিসটা যে একটা মস্ত পাথর, তার ভার যে ভয়ানক ভার। যে দিকটাতে সেই আমিটাকেই চাপাই সেই দিকটাতেই যে ধীরে ধীরে সমস্তটাই কাত হয়ে পড়তে চায়। যদি রক্ষা পেতে চাও, তবে ঐটেকেই একেবারে জলের মধ্যে ফেলে দিতে পারলেই ভালো হয়।

আসল কথা, সবটাই যদি ঈশ্বরকে দিতে পারি তা হলেই দুই লোক রক্ষা হয়—চাতুরী করতে গেলে হয় না। তাঁর মধ্যেই দুই লোক আছে। তাঁর মধ্যেই যদি আমাকে পাই তবে একসঙ্গেই তাঁকেও পাই আমাকেও পাই। আর তাঁর সঙ্গে যদি ভাগ বিভাগ করে সীমানা টেনে পাকা দলিল করে নিয়ে কাজ চালাতে চাই তা হলে সেটা একেবারেই পাকা কাজ হয় না, সেটা বিষয়কর্মের নামান্তর হয়। বিষয়কর্মের যে গতি তারও সেই গতি— অর্থাৎ তার মধ্যে নিত্যতার লক্ষণ নেই— তার মধ্যে বিকার আসে এবং ক্রমে মৃত্যু দেখা দেয়।

ও-সমস্ত চাতুরী ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণই আত্মসমর্পণ কতে হবে এই কথাটাকেই পাকা করা যাক। আমার দুইয়ে কাজ নেই, আমার একই ভালো। আমার অন্তরাত্মার মধ্যে একটি সতীর লক্ষণ আছে, সে চতুরা নয়, সে যথার্থই দুইকে চায় না, সে একেকেই চায় ; যখন সে একেকে পায় তখনই সে সমস্তকেই পায়।

একাগ্র হয়ে সেই একের সাধনাই করব কিন্তু কঠিন সংকট এই যে, আজ পর্যন্ত সেজন্যে কোনো আয়োজন করা হয় নি। সেই পরমকে বাদ দিয়েই সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে। জীবন এমনি ভাবে তৈরি হয়ে গেছে যে, কোনোমতে ঠেলে ঠুলে তাঁকে জায়গা করে দেওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে এসেছে।

পৃথিবীতে আর সমস্তই গোঁজামিলন দেওয়া যায়, যেখানে পাঁচজনের বন্দোবস্ত সেখানে ছজনকে ঢুকিয়ে দেওয়া খুব বেশি শক্ত নয়, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সেরকম গোঁজামিলন চালাতে গেলে একেবারেই চলে না। তিনি "পুনশ্চ নিবেদনের" সামগ্রী নন। তাঁর কথা যদি গোড়া থেকে ভুলেই থাকি, তবে গোড়াগুড়ি সে ভুলটা সংশোধন না করে নিলে উপায় নেই। যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে এখন অমনি একরকম করে কাজ সেরে নেও, এ কথা তাঁর সম্বন্ধে কোনোমতেই খাটবে না।

ঈশ্বরবিবর্জিত যে জীবনটা গড়ে তুলেছি তার আকর্ষণ যে কত প্রবল তা তখনই বুঝতে পারি যখন তাঁর দিকে যেতে চাই। যখন তার মধ্যেই বসে আছি তখন সে যে আমাকে বেঁধেছে তা বুঝতেই পারি নে। কিন্তু প্রত্যেক অভ্যাস প্রত্যেক সংস্কারটিই কী কঠিন গ্রন্থি। জ্ঞানে তাকে যতই তুচ্ছ বলে জানি নে কেন, কাজে তাকে ছাড়াতে পারি নে। একটা ছাড়ে তো দেখতে পাই তার পিছনে আরো পাঁচটা আছে।

সংসারকে চরম আশ্রয় বলে জেনে এতদিন বহুযত্নে দিনে দিনে একটি একটি করে অনেক জিনিস সংগ্রহ করেছি— তাদের প্রত্যেকটির ফাঁকে ফাঁকে আমার কত শিকড় জড়িয়ে গেছে তার ঠিকানা নেই— তারা সবাই আমার। তাদের কোনোটাকেই একটুমাত্র স্থানচ্যুত করতে গেলেই মনে হয় তবে

আমি বাঁচব কী করে। তারা যে বাঁচবার জিনিস নয় তা বেশ জানি, তবু চিরজীবনের সংস্কার তাদের প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে বলতে থাকে এদের না হলে আমার চলবে না যে। ধনকে আপনার বলে জানা যে নিতান্তই অভ্যাস হয়ে গেছে। সেই ধনের ঠিক ওজনটি যে আজ বুঝব সে শক্তি কোথায় পাই। বহুদীর্ঘকাল ধরে আমির ভারে সেই ধন যে পর্বতসমান ভারী হয়ে উঠেছে, তাকে একটুও নড়াতে গেলে যে বুকের পাঁজরে বেদনা ধরে।

এইজন্যেই ভগবান যিশু বলেছেন যে-ব্যক্তি ধনী তার পক্ষে মুক্তি অত্যন্ত কঠিন। ধন এখানে শুধু টাকা নয়, জীবন যা-কিছুকেই দিনে দিনে আপনার বলে সঞ্চয় করে তোলে, যাকেই সে নিজের বলে মনে করে এবং নিজের দিকেই আঁকড়ে রাখে— সে ধনই হোক আর খ্যাতিই হোক, এমন-কি, পুণ্যই হোক।

এমন-কি, ঐ পুণ্যের সঞ্চয়টা কম ঠকায় না। ওর একটি ভাব আছে যেন ও যা নিচ্ছে তা সব ঈশ্বরকেই দিচ্ছে। লোকের হিত করছি, ত্যাগ করছি, কষ্টস্বীকার করছি, অতএব আর ভাবনা নেই। আমার সমস্ত উৎসাহ ঈশ্বরের উৎসাহ, সমস্ত কর্ম ঈশ্বরের কর্ম। কিন্তু এর মধ্যে যে অনেকখানি নিজের দিকেই জমাচ্ছি সে খেয়ালমাত্র নেই।

যেমন মনে করো আমাদের এই বিদ্যালয়। যেহেতু এটা মঙ্গলকাজ সেই হেতু এর যেন আর হিসেব দেখবার দরকার নেই, যেন এর সমস্তই ঈশ্বরের খাতাতেই জমা হচ্ছে। আমরা যে প্রতিদিন তহবিল ভাঙছি তার খোঁজও রাখি নে। এ বিদ্যালয় আমাদের বিদ্যালয়, এর সফলতা আমাদের সফলতা, এর দ্বারা আমরাই হিত করছি, এমনি করে এ বিদ্যালয় থেকে আমার দিকে কিছু কিছু করে জমা হচ্ছে। সেই সংগ্রহ আমার অবলম্বন হয়ে উঠছে, সেটা একটা বিষয়সম্পত্তির মতো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই কারণে তার জন্যে রাগারাগি টানাটানি হতে পারে, তার জন্যে মিথ্যে সাক্ষী সাজাতেও ইচ্ছা করে। পাছে কেউ কোনো ত্রুটি ধরে ফেলে এই ভয় হয়— লোকের কাছে এর অনিন্দনীয়তা প্রমাণ করে তোলবার জন্যে একটু বিশেষভাবে ঢাকাঢুকি দেবার আগ্রহ জন্মে। কেননা এ-সব যে আমার অভ্যাস, আমার নেশা, আমার খাদ্য হয়ে উঠছে। এর থেকে যদি ঈশ্বর আমাকে একটু বঞ্চিত করতে চান আমার সমস্ত প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। প্রতিদিনের অভ্যাসে বিদ্যালয় থেকে এই যে-অংশটুকু নিজের ভাগেই সঞ্চয় করে তুলছি সেইটে সরিয়ে দাও দেখি, মনে হবে এর কোথাও যেন আর আশ্রয় পাচ্ছি নে। তখন ঈশ্বরকে আর আশ্রয় বলে মনে হবে না।

এইজন্যে সঞ্চয়ীর পক্ষে বড়ো শক্ত সমস্যা। সে ঐ সঞ্চয়কেই চরম আশ্রয় বলে একেবারে অভ্যাস করে বসে আছে, ঈশ্বরকে তাই সে চারি দিকে সত্য করে অনুভব করতে পারে না, শেষ পর্যন্তই সে নিজের সঞ্চয়কে আঁকড়ে বসে থাকে।

অনেকদিন থেকে অনেক সঞ্চয় করে যে বসেছি— সে-সমস্তর কিছু বাদ দিতে মন সরে না। সেইজন্যে মনের মধ্যে যে চতুর হিসাবি কানে কলম গুঁজে বসে আছে সে কেবলই পরামর্শ দিচ্ছে— কিছু বাদ দেবার দরকার নেই, এরই মধ্যে কোনোরকম করে ঈশ্বরকে একটুখানি জায়গা করে দিলেই হবে।

না, তা হবে না— তার চেয়ে অসাধ্য আর কিছুই হতে পারে না। তবে কী করা কর্তব্য?

একবার সম্পূর্ণ মরতে হবে— তবেই নতুন করে ভগবানে জন্মানো যাবে। একেবারে গোড়াগুড়ি মরতে হবে।

এটা বেশ করে জানতে হবে, যে-জীবন আমার ছিল, সেটা সম্বন্ধে আমি মরে গেছি। আমি সে-লোক নই, আমার যা ছিল তার কিছুই নেই। আমি ধনে মরেছি, খ্যাতিতে মরেছি, আরামে মরেছি, আমি কেবলমাত্রই ভগবানে বেঁচেছি। নিতান্ত সদ্যোজাত শিশুটির মতো নিরুপায় অসহায় অনাবৃত হয়ে তাঁর কোলে জন্মগ্রহণ করেছি। তিনি ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। তার পরে তাঁর সন্তানজন্ম সম্পূর্ণভাবে শুরু করে দাও, কিছুর পরে কোনো মমতা রেখো না।

পুনর্জন্মের পূর্বে এখন সেই মৃত্যুবেদনা। যাকে নিশ্চিত চরম বলে অত্যন্ত সত্য বলে জেনেছিলুম

একটি একটি করে একটু একটু করে তার থেকে মরতে হবে। এসো মৃত্যু এসো— এসো অমৃতের দূত এসো—

এসো অপ্রিয় বিরস তিক্ত,
এসো গো অশ্রুসলিলসিক্ত,
এসো গো ভূষণবিহীন রিক্ত,
এসো গো চিত্তপাবন।
এসো গো পরম দুঃখনিলয়,
আশা অঙ্কুর করহ বিলয়;
এসো সংগ্রাম, এসো মহাজয়,
এসো গো মরণ-সাধন।

১৯ ফাল্গুন

ফল

ভিতরের সাধনা যখন আরম্ভ হয়ে গেছে তখন বাইরে তার কতকগুলি লক্ষণ আপনি প্রকাশ হয়ে পড়তে থাকে; সে লক্ষণগুলি কী রকম তা একটি উপমার সাহায্যে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করি।

গাছের ফলকে মানুষ বরাবর নিজের সার্থকতার সঙ্গে তুলনা করে এসেছে। বস্তুত, মানুষের লক্ষ্যসিদ্ধি মানুষের চেষ্টার পরিণামের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এমন জিনিস যদি জগতে কোথাও থাকে তবে সে গাছের ফলে। নিজের কর্মের রূপটিকে নিজের জীবনের পরিণামকে যেন ফলের মধ্যে আমরা চক্ষে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই।

ফল জিনিসটা সমগ্র গাছের শেষ লক্ষ্য— পরিণত মানুষটি তেমনি সমস্ত সংসারবৃক্ষের শেষলাভ।

কিন্তু মানুষের পরিণতি যে আরম্ভ হয়েছে তার লক্ষণ কী? একটি আমফল যে পাকছে তারই বা লক্ষণ কী?

সব প্রথমে দেখা যায়, তার বাইরে একটা প্রান্তে একটু রঙ ধরতে আরম্ভ করেছে, তার শ্যামবর্ণ ঘুচবে ঘুচবে করছে— সোনা হয়ে ওঠবার চেষ্টা।

আমাদেরও ভিতরে যখন পরিণতি আরম্ভ হয় বাইরে তার দীপ্তি দেখা দেয়। কিন্তু সব জায়গায় সমান নয়, কোথাও কালো কোথাও সোনা। তার সকল কাজ সকল ভাব সমান উজ্জ্বলতা পায় না, কিন্তু এখানে-ওখানে যেন জ্যোতি দেখা দিতে থাকে।

নিজের পাতারই সঙ্গে ফলের যে বর্ণসাদৃশ্য ছিল সেটা ক্রমশ ঘুচে আসতে থাকে, চারি দিকে আকাশের আলোর যে রঙ সেই রঙের সঙ্গেই তার মিলন হয়ে আসে। যে গাছে তার জন্ম সেই গাছের সঙ্গে নিজের রঙে পার্থক্য সে আর কিছুতেই সংবরণ করতে পারে না— চারি দিকের নিবিড় শ্যামলতার আচ্ছাদন থেকে সে বাহিরের আকাশে প্রকাশ পেয়ে উঠতে থাকে।

তার পরে তার বাহিরটি ক্রমশই কোমল হয়ে আসে। আগে বড়ো শক্ত আঁট ছিল কিন্তু এখন আর সে কঠোরতা নেই। দীপ্তিময় সুগন্ধময় কোমলতা।

পূর্বে তার যে রস ছিল সে রসে তীব্র অম্লতা ছিল, এখন সমস্ত মাধুর্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ এখন তার বাইরের পদার্থ সমস্ত বাইরেরই হয়, সকলেরই ভোগের হয়, সকলকে আহ্বান করে, কাউকে ঠেকাতে চায় না। সকলের কাছে সে কোমল সুন্দর হয়ে ওঠে। গভীরতর সার্থকতার অভাবেই মানুষের তীব্রতা কঠিনতা এমন উগ্রভাবে প্রকাশ পায়— সেই আনন্দের দৈন্যেই তার দৈন্য, সেইজন্যেই সে বাহিরকে আঘাত করতে উদ্যত হয়।

তার পরে তার ভিতরকার যেটি আসল জিনিস, তার আঁটি— যেটিকে বাইরে দেখাই যায় না, তার সঙ্গে তার বাহিরের অংশের একটা বিশ্লিষ্টতা ঘটতে থাকে। সেটা যে তার নিত্যপদার্থ নয় তা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসে। তার শস্য অংশের সঙ্গে তার ছালটা পৃথক হতে থাকে, ছাল অনায়াসে শাঁস থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া যায়, আবার তার শাঁসও আঁটি থেকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে ফেলা সহজ হয়। তার বোঁটা এতদিন গাছকে আঁকড়ে ছিল, তাও আলগা হয়ে আসে। গাছের সঙ্গে নিজেকে সে আর অত্যন্ত এক করে রাখে না— নিজের বাহিরের আচ্ছাদনের সঙ্গেও নিজের ভিতরের আঁটিকে সে নিতান্ত একাকার করে থাকে না।

সাধক তেমনি যখন নিজের ভিতরে নিজের অমরত্বকে লাভ করতে থাকেন, সেখানটি যখন সুদৃঢ় সুসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন তাঁর বাইরের পদার্থটি ক্রমশই শিথিল হয়ে আসতে থাকে— তখন তাঁর লাভটা হয় ভিতরে, আর দানটা হয় বাইরে।

তখন তাঁর ভয় নেই, কেননা তখন তাঁর বাইরের ক্ষতিতে তাঁর ভিতরের ক্ষতি হয় না। তখন শাঁসকে আঁটি আঁকড়ে থাকে না ; শাঁস কাটা পড়লে অনাবৃত আঁটির মৃত্যুদশা ঘটে না। তখন পাখিতে যদি ঠোকরায় ক্ষতি নেই, ঝড়ে যদি আঘাত করে বিপদ নেই, গাছ যদি শুকিয়ে যায় তাতেও মৃত্যু নেই। কারণ, ফল তখন আপন অমরত্বকে আপন অন্তরের মধ্যে নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করে, তখন সে "অতিমৃত্যুমেতি"। তখন সে আপনাকে আপনার নিত্যতার মধ্যেই সত্য বলে জানে, অনিত্যতার মধ্যেই নিজেকে সে নিজে বলে জানে না— নিজেকে সে শাঁস বলে জানে না, খোসা বলে জানে না, বোঁটা বলে জানে না— সুতরাং ঐ শাঁস খোসা বোঁটার জন্যে তার আর কোনো ভয় ভাবনাই নেই।

এই অমৃতকে নিজের মধ্যে বিশেষরূপে লাভ করার অপেক্ষা আছে। সেইজন্যেই উপনিষৎ বারংবার বলেছেন, অমরতাকে লাভ করার একটি বিশেষ অবস্থা আছে— "য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"

ভিতরে যখন সেই অমৃতের সঞ্চার হয় তখন অমরাত্মা বাইরেকে আর একান্তরূপে ভোগ করতে চায় না। তখন, তার যা গন্ধ, যা বর্ণ, যা রস, যা আচ্ছাদন, তাতে তার নিজের কোনো প্রয়োজন নেই— সে এ-সমস্তের মধ্যেই নিহিত থেকে একান্ত নির্লিপ্ত, এর ভালোমন্দ তার ভালোমন্দ আর নয়, এর থেকে সে কিছুই প্রার্থনা করে না।

তখন ভিতরে সে লাভ করে, বাইরে সে দান করে ; ভিতরে তার দৃঢ়তা, বাইরে তার কোমলতা ; ভিতরে সে নিত্যসত্যের, বাইরে সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ; ভিতরে সে পুরুষ, বাইরে সে প্রকৃতি। তখন বাইরে তার প্রয়োজন থাকে না বলেই পূর্ণভাবে বাইরের প্রয়োজন সাধন করতে থাকে, তখন সে ফলভোগী পাখির ধর্ম ত্যাগ করে ফলদর্শী পাখির ধর্ম গ্রহণ করে। তখন সে আপনাতে আপনি সমাপ্ত হয়ে নির্ভয়ে নিঃসংকোচে সকলের জন্যে আপনাকে সমর্পণ করতে পারে। তখন তার যা-কিছু, সমস্তই তার প্রয়োজনের অতীত, সুতরাং সমস্তই তার ঐশ্বর্য।

২০ ফাল্গুন ১৩১৫

৭

সত্যকে দেখা

আমাদের ধ্যানের দ্বারা সৃষ্টিকর্তাকে তাঁর সৃষ্টির মাঝখানে ধ্যান করি। ভূর্‌ভুবঃস্বঃ তাঁ হতেই সৃষ্টি হচ্ছে, সূর্যচন্দ্র গ্রহতারা প্রতিমুহূর্তেই তাঁর থেকে প্রকাশ হচ্ছে, আমাদের চৈতন্য প্রতিমুহূর্তেই তাঁর থেকে প্রেরিত হচ্ছে, তিনিই অবিরত সমস্ত প্রকাশ করছেন, এই হচ্ছে আমাদের ধ্যান।

এই দেখাকেই বলে সত্যকে দেখা। আমরা সমস্ত ঘটনাকে কেবল বাহ্যঘটনা বলেই দেখি। তাতে আমাদের কোনো আনন্দ নেই। সে আমাদের কাছে পুরাতন হয়ে যায়, সে আমাদের কাছে দম-দেওয়া কলের মতো আকার ধারণ করে ; এইজন্যে পাথরের নুড়ির উপর দিয়ে যেমন স্রোত চলে যায় সেইরকম করে জগৎস্রোত আমাদের মনের উপর দিয়ে অবিশ্রাম বয়ে যাচ্ছে। চিত্ত তাতে সাড়া দিচ্ছে না, চারি দিকের দৃশ্যগুলো তুচ্ছ এবং দিনগুলো অকিঞ্চিৎকর হয়ে দেখা দিচ্ছে। সেইজন্যে কৃত্রিম উত্তেজনা এবং নানা বৃথা কর্মসৃষ্টি -দ্বারা আমরা চেতনাকে জাগিয়ে রেখে তবে আমোদ পাই।

যখন কেবল ঘটনার দিকে তাকিয়ে থাকি তখন এইরকমই হয়। সে আমাদের রস দেয় না, খাদ্য দেয় না। সে কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়কে মনকে হৃদয়কে কিছু দূর পর্যন্ত অধিকার করে, শেষ পর্যন্ত পৌঁছোয় না। এইজন্যে তার যেটুকু রস আছে তা উপরের থেকেই শুকিয়ে আসে, তা আমাদের গভীরতর চেতনাকে উদ্‌বোধিত করে না। সূর্য উঠছে তো উঠছে, নদী বইছে তো বইছে, গাছপালা বাড়ছে তো বাড়ছে, প্রতিদিনের কাজ নিয়মমত চলছে তো চলছে। সেইজন্যে এমন কোনো দৃশ্য দেখতে ইচ্ছা করি যা প্রতিদিন দেখি নে, এমন কোনো ঘটনা জানতে কৌতূহল হয় যা আমাদের অভ্যস্ত ঘটনার সঙ্গে মেলে না।

কিন্তু সত্যকে যখন জানি তখন আমাদের আত্মা পরিতৃপ্ত হয়। সত্য চিরনবীন— তার রস অক্ষয়। সমস্ত ঘটনাবলীর মাঝখানে সেই অন্তরতম সত্যকে দেখলে দৃষ্টি সার্থক হয়। তখন সমস্তই মহত্ত্বে বিস্ময়ে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এইজন্যেই আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে আমরা প্রতিদিন অন্তত একবার সমস্ত বিশ্বব্যাপারের মাঝখানে বিশ্বের যিনি পরমসত্য তাঁকে ধ্যান করবার চেষ্টা করে থাকি। ঘটনাপুঞ্জের মাঝখানে যিনি এক মূলশক্তি তাঁকে দর্শন করবার জন্যে দৃষ্টিকে অন্তরে ফেরাই। তখন দৃষ্টি থেকে জড়ত্বের আবরণ ঘুচে যায়, জগৎ একটা যন্ত্রের মতো আমাদের অভ্যাসের কক্ষ জুড়ে পড়ে থাকে না ; প্রতিমুহূর্তেই এই অনন্ত-আকাশ ব্যাপী প্রকাণ্ড প্রকাশ একটি জ্ঞানময় সত্য হতে নিঃসৃত হচ্ছে, বিকীর্ণ হচ্ছে, ইহাই অনুভব করে আমাদের চেতনা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন অগ্নি জল ওষধি বনস্পতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারি— অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ব্রহ্ম, সর্বত্রই আনন্দরূপে অমৃতরূপে তাঁর প্রকাশ।

অগণ্য ঘটনাকে অগণ্য ঘটনারূপে দেখেই চলে যাব না— তার মাঝখানে অনন্ত সত্যকে স্থির হয়ে স্তব্ধ হয়ে দেখব এইজন্যই আমাদের ধ্যানের মন্ত্র গায়ত্রী।

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।

ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, ইহাই যিনি নিয়ত সৃষ্টি করেছেন, সেই দেবতার বরণীয় শক্তিকে ধ্যান করি— যিনি আমাদের ধীশক্তিকেও নিয়ত প্রেরণ করছেন।

৩ চৈত্র ১৩১৫

সৃষ্টি

এই যে আমরা কয়জন প্রাতঃকালে এইখানে উপাসনা করতে বসি— এও একটি সৃষ্টি। এর মাঝখানেও সেই সবিতা আছেন।

আমরা বলে থাকি এটা এইরকম হয়ে উঠেছে। আমরা দু-চারজন পরামর্শ করলুম, তার পরে একত্র হয়ে বসলুম, তার পরে রোজ রোজ এইরকম চলে আসছে।

ঘটনা এই বটে, কিন্তু সত্য এই নয়। ঘটনার দিক থেকে দেখলে এ একটি সামান্য ব্যাপার, কিন্তু সত্যের দিক থেকে দেখলে এ বড়ো আশ্চর্য, প্রতিদিনই আশ্চর্য। সত্য মাঝখানে এসে নানা অপরিচিতকে নানা দিক থেকে টেনে এই একটি উপাসনামণ্ডলী নিরন্তর সৃষ্টি করছেন। আমরা মনে করছি আমরা এখানে খানিকক্ষণের জন্য বসে কাজ সেরে তার পরে অন্য কাজে চলে গেলুম, বাস চুকে গেল— কিন্তু এ তো ছোটো ব্যাপার নয়। আমরা যখন পড়ছি, পড়াচ্ছি, খাচ্ছি, বেড়াচ্ছি, তখনো এই আমাদের মণ্ডলীটির সৃষ্টিকর্তা এরই সৃষ্টিকার্যে রয়েছেন। সেই জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ বিশ্বকর্মা আমাদের মধ্যে কাজ করে চলেছেন, তিনি আমাদের এই কয়জন ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এর উপকরণ সাজিয়ে তুলছেন। তাঁর যেন আর অন্য কোনো কাজ নেই, বিশ্বসৃষ্টি তাঁর যত বড়ো কাজ এও যেন তাঁর তত বড়োই কাজ। আমাদের এই উপাসনালোকটি কেবলই হচ্ছে, হচ্ছে, হয়ে উঠছে— দিনরাত, দিনরাত। আমরা যখন ঘুমোচ্ছি তখনো হচ্ছে, আমরা যখন ভুলে আছি তখনো হচ্ছে। সত্য যখন আছে, তখন কিছুই হচ্ছে না বা এক মুহূর্তও তার বিরাম আছে এ কখনো হতেই পারে না।

বিশ্বভুবনের মাঝখানে একটি সত্যং বিরাজ করছেন বলেই প্রতিদিনই বিশ্বভুবনকে তার যথাস্থানে যথানিয়মে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের কয়জনের মাঝখানে একটি সত্যং কাজ করছেন বলেই প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমরা এখানে এসে বসছি। বিশ্বভুবন সেই এক সত্যকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করছে। যেখানে আমাদের দূরবীন পৌঁছোয় না, মন পৌঁছোয় না, সেখানেও কত জ্যোতির্ময় লোক তাঁকে বেষ্টন করে করে বলছে নমোনমঃ। আমরাও তেমনি করেই আমাদের এই উপাসনালোকের সত্যকে বেষ্টন করে বসেছি, যিনি লোক-লোকান্তরের মাঝখানে বসে আছেন তিনি এই প্রাঙ্গণে বসে আছেন; কেবল যে আমাদের মধ্যে চৈতন্য বিকীর্ণ করছেন তা নয়, আমাদের কয়জনকে নিয়ে যে বিশেষ সৃষ্টি চলছে তারও শক্তি বিকীর্ণ করছেন, আমাদের কয়েকজনের মনকে এই বিশেষ ব্যাপারে নানারকম করে চালাচ্ছেন, আমাদের কয়জনের প্রকৃতি সংস্কার ও শিক্ষার নানা বৈচিত্র্যকে সেই এক এই মুহূর্তেই একটি ঐক্যের মধ্যে গড়ে তুলছেন এবং আমরা যখন এখান থেকে উঠে অন্যত্র চলে যাব তখনো তিনি তাঁর এই কাজে বিশ্রাম দেবেন না।

আমাদের মাঝখানের সেই সত্যকে, আমাদের উপাসনাজগতের সেই সবিতাকে এইখানে প্রত্যক্ষ দর্শন করে যাব, তাঁকে প্রদক্ষিণ করে তাঁকে একসঙ্গে প্রণাম করে যাব। আমরা প্রত্যহ জেনে যাব, সূর্যচন্দ্র গ্রহতারা যেমন তাঁর অনন্ত সৃষ্টি, আমাদের কয়জনকে যে এখানে বসিয়েছেন এও তাঁর তেমনি সৃষ্টি। তাঁর অবিরাম আনন্দ এই কাজটিতে প্রকাশিত হচ্ছে, সেই প্রকাশককে আমরা দেখে যাব।

৩ চৈত্র ১৩১৫

মৃত্যু ও অমৃত

সম্প্রতি অকস্মাৎ আমার একটি বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। এই উপলক্ষে জগতে সকলের চেয়ে পরিচিত যে মৃত্যু তার সঙ্গে আর-একবার নূতন পরিচয় হল।

জগৎটা গায়ের চামড়ার মতো আঁকড়ে ধরেছিল, মাঝখানে কোনো ফাঁক ছিল না। মৃত্যু যখন প্রত্যক্ষ হল তখন সেই জগৎটা যেন কিছু দূরে চলে গেল, আমার সঙ্গে আর যেন সে অত্যন্ত সংলগ্ন হয়ে রইল না।

এই বৈরাগ্যের দ্বারা আত্মা যেন নিজের স্বরূপ কিছু উপলব্ধি করতে পারল। সে যে জগতের সঙ্গে একেবারে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত নয়, তার যে একটি স্বকীয় প্রতিষ্ঠা আছে, মৃত্যুর শিক্ষায় এই কথাটা যেন অনুভব করতে পারলুম।

যাঁর মৃত্যু হল তিনি ভোগী ছিলেন এবং তাঁর ঐশ্বর্যের অভাব ছিল না। তাঁর সেই ভোগের জীবন ভোগের আয়োজন— যা কেবল তাঁর কাছে নয়, সর্বসাধারণের কাছে অত্যন্ত সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল, যা কত প্রকার সাজে সজ্জায় জাঁকে-জমকে লোকের চক্ষুকর্ণকে ঈর্ষা ও লুব্ধতায় আকৃষ্ট করে আকাশে মাথা তুলেছিল— তা একটি মুহূর্তেই শ্মশানের ভস্মমুষ্টির মধ্যে অনাদরে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

সংসার যে এতই মিথ্যা, তা যে কেবল স্বপ্ন কেবল মরীচিকা, নিশ্চিত মৃত্যুকে স্মরণ করে শাস্ত্র সেই কথা চিন্তা করবার জন্যে বার বার উপদেশ করেছেন। নতুবা আমরা কিছুই ত্যাগ করতে পারি নে এবং ভোগের বন্ধনে জড়িত থেকে আত্মা নিজের বিশুদ্ধ মুক্তস্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না।

কিন্তু সংসারকে মিথ্যা মরীচিকা বলে ত্যাগকে সহজ করে তোলার মধ্যে সত্যও নেই, গৌরবও নেই। যে দেশে আমাদের টাকা চলে না সেই দেশে এখানকার টাকার বোঝাটাকে জঞ্জালের মতো মাটিতে ফেলে দেওয়ার মধ্যে ঔদার্য কিছুই নেই। কোনোপ্রকারে সংসারকে যদি একেবারেই অলীক বলে নিজের কাছে যথার্থই সপ্রমাণ করতে পারি তা হলে ধনজনমান তো মন থেকে খসে পড়ে একেবারেই শূন্যের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে।

কিন্তু সেরকম ছেড়ে দেওয়া, ফেলে দেওয়া, নিতান্তই একটা রিক্ততা মাত্র। সে যেন স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার মতো— যা ছিল না তাকেই চমকে উঠে নেই বলে জানা।

বস্তুত সংসার তো মিথ্যা নয়, জোর করে তাকে মিথ্যা বলে লাভ কী। যিনি গেলেন তিনি গেলেন বটে, কিন্তু সংসারে তো ক্ষতির কোনো লক্ষণই দেখি নে। সূর্যালোকে তো কোনো কালিমা পড়ে নি, আকাশের নীল নির্মলতায় মৃত্যুর চাকা তো ক্ষতির একটি রেখাও কাটতে পারে নি ; অফুরান সংসারের ধারা আজও পূর্ণবেগেই চলেছে।

তবে অসত্য কোন্‌টা ? এই সংসারকে আমার বলে জানা। এর একটি সূচ্যগ্র বিন্দুকেও আমার বলে আমি ধরে রাখতে পারব না। যে ব্যক্তি চিরজীবন কেবল ঐ আমার উপরেই সমস্ত জিনিসের প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সেই বালির উপর ঘর বাঁধে। মৃত্যু যখন ঠেলা দেয় তখন সমস্তই ধুলায় পড়ে ধূলিসাৎ হয়।

আমি বলে যে কাঙালটা সব জিনিসকেই গালের মধ্যে নিতে চায়, সব জিনিসকেই মুঠোর মধ্যে পেতে চায়, মৃত্যু কেবল তাকেই ফাঁকি দেয়— তখন সে মনের খেদে সমস্ত সংসারকেই ফাঁকি বলে গাল দিতে থাকে, কিন্তু সংসার যেমন তেমনিই থেকে যায়, মৃত্যু তার গায়ে আঁচড়টি কাটতে পারে না।

অতএব মৃত্যুকে যখন কোথাও দেখি তখন সর্বত্রই তাকে দেখতে থাকা মনের একটা বিকার। যেখানে অহং সেইখানেই কেবল মৃত্যুর হাত পড়ে, আর কোথাও না। জগৎ কিছুই হারায় না, যা হারাবার সে কেবল অহং হারায়।

অতএব আমাদের যা-কিছু দেবার সে কাকে দেব ? সংসারকেই দেব, অহংকে দেব না। কারণ সংসারকে দিলেই সত্যকে দেওয়া হবে, অহংকে দিলেই মৃত্যুকে দেওয়া হবে। সংসারকে যা দেব সংসার তা রাখবে, অহংকে যা দেব অহং তা শত চেষ্টাতেও রাখতে পারবে না।

যে ব্যক্তি ভোগী সে অহংকেই সমস্ত পূজা জোগায়, সে চিরজীবন এই অহং-এর মুখ তাকিয়ে খেটে মরে। মৃত্যুর সময় তার সেই ভোগস্ফীত ক্ষুধার্ত অহং কপালে হাত দিয়ে বলে, 'সমস্তই রইল পড়ে, কিছুই নিয়ে যেতে পারলুম না।'

মৃত্যুর কথা চিন্তা করে এই অহংটাকেই যদি চিরন্তন বলে না জানি তা হলেই যথেষ্ট হল না— কারণ, সেরকম বৈরাগ্যে কেবল শূন্যতাই আনে। সেসঙ্গে এও জানতে হবে যে এই সংসারটা থাকবে। অতএব আমার যা-কিছু দেবার তা শূন্যের মধ্যে ত্যাগরূপে দেব না, সংসারের মধ্যে দানরূপে দিতে হবে। এই দানের দ্বারাই আত্মার ঐশ্বর্য প্রকাশ হবে, ত্যাগের দ্বারা নয়— আত্মা নিজে কিছু নিতে চায় না, সে দিতে চায়, এতেই তার মহত্ত্ব। সংসার তার দানের ক্ষেত্র এবং অহং তার দানের সামগ্রী।

ভগবান এই সংসারের মাঝখানে থেকে নিজেকে কেবলই দিচ্ছেন, তিনি নিজের জন্যে কিছুই নিচ্ছেন না। আমাদের আত্মাও যদি ভগবানের সেই প্রকৃতিকে পায় তবে সত্যকে লাভ করে। সেও সংসারের মাঝখানে ভগবানের পাশে তাঁর সখারূপে দাঁড়িয়ে নিজেকে সংসারের জন্য উৎসর্গ করবে, নিজের ভোগের জন্যে লালায়িত হয়ে সমস্তই নিজের দিকে টানবে না। এই দেবার দিকেই অমৃত, নেবার দিকেই মৃত্যু। টাকাকড়ি শক্তি-সামর্থ্য সমস্তই সত্য যদি তা দান করি— যদি তা নিজে নিতে চাই তো সমস্তই মিথ্যা। সেই কথাটা যখন ভুলি তখন সমস্তই উলটা-পালটা হয়ে যায়— তখনই শোক দুঃখ ভয়, তখনই কাম ক্রোধ লোভ। তখনই, স্রোতের মুখে যে নৌকা আমাকেই বহন করে নিয়ে যেত, উজানে তাকে প্রাণপণে বহন করবার জন্য আমাকেই ঠেলাঠেলি টানাটানি করে মরতে হয়। যে জিনিস স্বভাবতই দেবার তাকে নেবার চেষ্টা করার এই পুরস্কার। যখন মনে করি যে নিজে নিচ্ছি তখন দিই সেটা মৃত্যুকে— এবং সেইসঙ্গে শোক চিন্তা ভয় প্রভৃতি মৃত্যুর অনুচরকে তাদের খোরাকিস্বরূপ হৃদয়ের রক্ত জোগাতে থাকি।

৪ চৈত্র।

তরী বোঝাই

'সোনার তরী' বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম, এই উপলক্ষে তার একটা মানে বলা যেতে পারে।

মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের খেতটুকু দ্বীপের মতো, চারি দিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত, ঐ একটুখানিই তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে। সেইজন্যে গীতা বলেছেন—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥

যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চারি দিকের জল বেড়ে উঠছে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ঐ চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হল— তখন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা-কিছু নিত্য ফল তা সে ঐ সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না। কিন্তু যখন মানুষ বলে 'ঐসঙ্গে আমাকেও নাও— আমাকেও রাখো', তখন সংসার বলে— তোমার জন্যে জায়গা কোথায়? তোমাকে নিয়ে আমার হবে কী? তোমার জীবনের ফসল যা-কিছু রাখবার তা সমস্তই রাখব, কিন্তু তুমি তো রাখবার যোগ্য নও।

প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু-না-কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, রক্ষা করছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না— কিন্তু মানুষ যখন সেইসঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে। এই যে জীবনটি ভোগ করা গেল, অহংটিকেই তার খাজনাস্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে। ওটি কোনোমতেই জমাবার জিনিস নয়।

৪ চৈত্র

স্বভাবকে লাভ

আমাদের জীবনের একটিমাত্র সাধনা এই যে, আমাদের আত্মার যা স্বভাব সেই স্বভাবটিকেই যেন বাধামুক্ত করে তুলি।

আত্মার স্বভাব কী। পরমাত্মার যা স্বভাব আত্মারও স্বভাব তাই।

পরমাত্মার স্বভাব কী? তিনি গ্রহণ করেন না, তিনি দান করেন।

তিনি সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি করার অর্থই হচ্ছে বিসর্জন করা। এই যে তিনি বিসর্জন করেন এর মধ্যে কোনো দায় নেই, কোনো বাধ্যতা নেই। আনন্দের ধর্মই হচ্ছে স্বতই দান করা, স্বতই বিসর্জন করা। আমরাও তা জানি। আমাদের আনন্দ আমাদের প্রেম বিনা কারণে আত্মবিসর্জনেই আপনাকে চরিতার্থ করে। এইজন্যেই উপনিষৎ বলেন— আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। সেই আনন্দময়ের স্বভাবই এই।

আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার একটি সাধর্ম্য আছে। আমাদের আত্মাও নিয়ে খুশি নয়, সে দিয়ে খুশি। নেব, কাড়ব, সঞ্চয় করব, এই বেগই যদি ব্যাধির বিকারের মতো জেগে ওঠে, তা হলে ক্ষোভের ও তাপের সীমা থাকে না। যখন আমরা সমস্ত মন দিয়ে বলি 'দেব', তখনই আমাদের আনন্দের দিন। তখনই সমস্ত ক্ষোভ দূর হয়, সমস্ত তাপ শান্ত হয়ে যায়।

আত্মার এই আনন্দময় স্বরূপটিকে উপলব্ধি করবার সাধনা করতে হবে। কেমন করে করব? ঐ যে একটা ক্ষুধিত অহং আছে, যে কাঙাল সব জিনিসই মুঠো করে ধরতে চায়, যে কৃপণ নেবার মতলব ছাড়া কিছু দেয় না, ফলের মতলব ছাড়া কিছু করে না, সেই অহংটাকে বাইরে রাখতে হবে— তাকে পরমাত্মীয়ের মতো সমাদর করে অন্তঃপুরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। সে বস্তুত আত্মার আত্মীয় নয়, কেননা সে যে মরে আর আত্মা যে অমর।

আত্মা যে, ন জায়তে ম্রিয়তে, না জন্মায় না মরে। কিন্তু ঐ অহংটা জন্মেছে, তার একটা নামকরণ হয়েছে; কিছু না পারে তো, অন্তত তার ঐ নামটাকে স্থায়ী করবার জন্যে তার প্রাণপণ যত্ন।

এই যে আমার অহং, একে একটা বাইরের লোকের মতো আমি দেখব। যখন তার দুঃখ হবে তখন বলব তার দুঃখ হয়েছে। শুধু দুঃখ কেন, তার ধনজন খ্যাতি-প্রতিপত্তি কিছুতে আমি অংশ নেব না।

আমি বলব না যে, এ সমস্ত আমি পাচ্ছি, আমি নিচ্ছি। প্রতিদিনই এই চেষ্টা করব আমার অহং যা-কিছুকে আঁকড়ে ধরতে চায় আমি তাকে যেন গ্রহণ না করি। আমি বার বার করে বলব— ও আমার নয়, ও আমার বাইরে।

যা বাইরেকার তাকে বাইরে রাখতে প্রাণ সরে না বলে আবর্জনায় ভরে উঠলুম, বোঝায় চলা দায় হল। সেই মৃত্যুময় উপকরণের বিকারে প্রতিদিনই আমি মরছি। এই মরণধর্মী অহংটাকেই আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে তার শোকে, তার দুঃখে, তার ভারে ক্লান্ত হচ্ছি।

অহং-এর স্বভাব হচ্ছে নিজের দিকে টানা, আর আত্মার স্বভাব হচ্ছে বাইরের দিকে দেওয়া— এইজন্যে এই দুটোতে জড়িয়ে গেলে ভারি একটা পাকের সৃষ্টি হয়। একটা বেগ প্রবাহিত হয়ে যেতে চায়, আর-একটা বেগ কেবলই ভিতরের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে; ভারি একটা সংকট ঘনিয়ে ওঠে। আত্মা তার স্বভাবের বিরুদ্ধে আকৃষ্ট হয়ে ঘূর্ণিত হতে থাকে, সে অনন্তের অভিমুখে চলে না, সে একই বিন্দুর চারি দিকে ঘানির বলদের মতো পাক খায়। সে চলে অথচ এগোয় না— সুতরাং এ চলায় কেবল তার কষ্ট, এতে তার সার্থকতা নয়।

তাই বলছিলুম এই সংকট থেকে উদ্ধার পেতে হবে। অহং-এর সঙ্গে একেবারে এক হয়ে মিলে যাব না, তার সঙ্গে বিচ্ছেদ রাখব। দান করব, কর্ম করব, কিন্তু অহং যখন সেই কর্মের ফল হাতে করে তাকে লেহন করে দংশন করে নাচতে নাচতে উপস্থিত হবে তখন তার সেই উচ্ছিষ্ট ফলকে কোনোমতেই গ্রহণ করব না। কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

অহং

তবে অহং আছে কেন ? এই অহং-এর যোগে আত্মা জগতের কোনো জিনিসকে আমার বলতে চায় কেন ?

তার একটি কারণ আছে।

ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেন তার জন্যে তাঁকে কিছুই সংগ্রহ করতে হয় না। তাঁর আনন্দ স্বভাবতই দানরূপে বিকীর্ণ হচ্ছে।

আমাদের তো সে ক্ষমতা নেই। দান করতে গেলে আমাদের যে উপকরণ চাই। সেই উপকরণ তো কেবলমাত্র আনন্দের দ্বারা আমরা সৃষ্টি করতে পারি নে।

তখন আমার অহং উপকরণ সংগ্রহ করে আনে। সে যা-কিছু সংগ্রহ করে তাকে সে 'আমার' বলে। কারণ, তাকে নানা বাধা কাটিয়ে সংগ্রহ করতে হয়, এই বাধা কাটাতে তাকে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। সেই শক্তির দ্বারা এই উপকরণে তার অধিকার জন্মায়।

শক্তির দ্বারা অহং শুধু যে উপকরণ সংগ্রহ করে তা নয়, সে উপকরণকে বিশেষ ভাবে সাজায়, তাকে একটি বিশেষত্ব দান করে গড়ে তোলে। এই বিশেষত্ব-দানের দ্বারা সে যা-কিছু গড়ে তোলে তাকে সে নিজের জিনিস বলেই গৌরব বোধ করে।

এই গৌরবটুকু ঈশ্বর তাকে ভোগ করতে দিয়েছেন। এই গৌরবটুকু যদি সে বোধ না করবে তবে সে দান করবে কী করে ? যদি কিছুই তার 'আমার' না থাকে তবে সে দেবে কী ?

অতএব দানের সামগ্রীটিকে প্রথমে একবার 'আমার' করে নেবার জন্যে এই অহং-এর দরকার। বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর বলে রেখেছেন জগতের মধ্যে যেটুকুকেই আমার আত্মা এই অহং-এর গণ্ডি দিয়ে ঘিরে নিতে পারবে তাকে তিনি 'আমার' বলতে দেবেন— কারণ তার প্রতি যদি মমত্বের অধিকার না জন্মে তবে আত্মা যে একেবারেই দরিদ্র হয়ে থাকবে। সে দেবে কী ? বিশ্বভুবনের কিছুকেই তার আমার বলবার নেই।

ঈশ্বর ঐখানে নিজের অধিকারটি হারাতে রাজি হয়েছেন। বাপ যেমন ছোটো শিশুর সঙ্গে কুস্তির খেলা খেলতে-খেলতে ইচ্ছাপূর্বক হার মেনে পড়ে যান, নইলে কুস্তির খেলাই হয় না, নইলে স্নেহের আনন্দ জমে না, নইলে ছেলের মুখে হাসি ফোটে না, সে হতাশ হয়ে পড়ে— তেমনি ঈশ্বর আমাদের মতো অনধিকারী শক্তিহীনের কাছে এক জায়গায় হার মানেন, এক জায়গায় তিনি হাসিমুখে বলতে দেন যে আমাদেরই জিত, বলতে দেন যে আমার শক্তিতেই হল, বলতে দেন যে আমারই টাকাকড়ি ধনজন, আমারই সসাগরা বসুন্ধরা।

তা যদি না দেন তবে তিনি যে খেলা খেলেন সেই আনন্দের খেলায়, সেই সৃষ্টির খেলায়, আমার আত্মা একেবারেই যোগ দিতে পারে না। তাকে খেলা বন্ধ করে হতাশ হয়ে চুপ করে বসে থাকতে হয়। সেইজন্য তিনি কাঠবিড়ালির পিঠে করুণ হাত বুলিয়ে বলেন, বাবা, কালসমুদ্রের উপরে তুমিও সেতু বাঁধছ বটে, শাবাশ তোমাকে !

এই যে তিনি 'আমার' বলবার অধিকার দিয়েছেন, এই অধিকারটি কেন ? এর চরম উদ্দেশ্যটি কী ?

এর চরম উদ্দেশ্য এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যে একটি সমান ধর্ম আছে সেই ধর্মটি সার্থক হবে। সেই ধর্ম হচ্ছে সৃষ্টির ধর্ম, অর্থাৎ দেবার ধর্ম। দেবার ধর্মই হচ্ছে আনন্দের ধর্ম। আত্মার যথার্থস্বরূপ হচ্ছে আনন্দময়স্বরূপ— সেই স্বরূপে সে সৃষ্টিকর্তা, অর্থাৎ দাতা। সেই স্বরূপে সে কৃপণ নয়, সে কাঙাল নয়। অহং-এর দ্বারা আমরা 'আমার' জিনিস সংগ্রহ করি, নইলে বিসর্জন করবার আনন্দ যে ম্লান হয়ে যাবে।

নদীর জল যখন নদীতে আছে তখন সে সকলেরই জল— যখন আমার ঘড়ায় তুলে আনি তখন সে আমার জল, তখন সেই জল আমার ঘড়ার বিশেষত্ব-দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কোনো তৃষ্ণাতুরকে যদি বলি নদীতে গিয়ে জল খাও গে, তা হলে জল দান করা হল না— যদিচ সে জল প্রচুর বটে এবং

নদীও হয়তো অত্যন্ত কাছে। কিন্তু আমার পাত্র থেকে সেই নদীরই জল এক গণ্ডূষ দিলেও সেটা জল দান করা হল।

বনের ফুল তো দেবতার সম্মুখেই ফুটেছে। কিন্তু তাকে আমার ডালিতে সাজিয়ে একবার আমার করে নিলে তবে তার দ্বারা দেবতার পূজা হয়। দেবতাও তখন হেসে বলেন, হাঁ, তোমার ফুল পেলুম। সেই হাসিতেই আমার ফুল তোলা সার্থক হয়ে যায়।

অহং আমাদের সেই ঘট, সেই ডালি। তার বেষ্টনের মধ্যে যা এসে পড়ে তাকেই 'আমার' বলবার অধিকার জন্মায়— একবার সেই অধিকারটি না জন্মালে দানের অধিকার জন্মে না।

তবেই দেখা যাচ্ছে, অহং-এর ধর্মই হচ্ছে সংগ্রহ করা, সঞ্চয় করা। সে কেবলই নেয়। পেলুম বলে যতই তার গৌরব বোধ হয় ততই তার নেবার আগ্রহ বেড়ে যায়। অহং-এর যদি এইরকম সব জিনিসেই নিজের নাম নিজের সীলমোহর চিহ্নিত করবার স্বভাব না থাকত, তা হলে আত্মার যথার্থ কাজটি চলত না, সে দরিদ্র এবং জড়বৎ হয়ে থাকত।

কিন্তু অহং-এর এই নেবার ধর্মটিই যদি একমাত্র হয়ে ওঠে, আত্মার দেবার ধর্ম যদি আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তবে কেবলমাত্র নেওয়ার লোলুপতার দ্বারা আমাদের দারিদ্র্য বীভৎস হয়ে দাঁড়ায়। তখন আত্মাকে আর দেখা যায় না, অহংটাই সর্বত্র ভয়ংকর হয়ে প্রকাশ পায়। তখন আমার আনন্দময়স্বরূপ কোথায় ? তখন কেবল ঝগড়া, কেবল কান্না, কেবল ভয়, কেবল ভাবনা।

তখন ডালির ফুল নিয়ে আত্মা পূজা করতে পায় না। অহং বলে 'এ সমস্তই আমি নিলুম'। সে মনে করে 'আমি পেয়েছি'। কিন্তু ডালির ফুল তো বনের ফুল নয় যে, কখনো ফুরোবে না, নিত্যই নূতন নূতন করে ফুটবে। পেলুম বলে যখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে ফুল তখন শুকিয়ে যাচ্ছে। দুদিনে সে কালো হয়ে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যায়, পাওয়া একেবারে ফাঁকি হয়ে যায়।

তখন বুঝতে পারি পাওয়া জিনিসটা, নেওয়া জিনিসটা, কখনোই নিত্য হতে পারে না। আমরা পাব, নেব, আমার করব, কেবল দেওয়ার জন্য। নেওয়াটা কেবল দেওয়ারই উপলক্ষ— অহংটা কেবল অহংকারকে বিসর্জন করতে হবে বলেই। নিজের দিকে একবার টেনে আনব বিশ্বের দিকে উৎসর্গ করবার অভিপ্রায়ে। ধনুকে তীর যোজনা করে প্রথমে নিজের দিকে তাকে যে আকর্ষণ করি, সে তো নিজেকে বিদ্ধ করবার জন্যে নয়, সম্মুখেই তাকে ক্ষেপণ করবার জন্যে।

তাই বলছিলুম অহং যখন তার নিজের সঞ্চয়গুলি এনে আত্মার সম্মুখে ধরবে তখন আত্মাকে বলতে হবে, 'না, ও আমার নয়, ও আমি নেব না। ও সমস্তই বাইরে রাখতে হবে, বাইরে দিতে হবে, ওর এক কণাও আমি ভিতরে তুলব না।' অহং-এর এইসমস্ত নিরন্তর সঞ্চয়ের দ্বারা আত্মাকে বদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না। কারণ এই বদ্ধতা আত্মার স্বাভাবিক নয়, আত্মা দানের দ্বারা মুক্ত হয়। পরমাত্মা যেমন সৃষ্টির দ্বারা বদ্ধ নন, তিনি সৃষ্টির দ্বারাই মুক্ত, কেননা তিনি নিচ্ছেন না, তিনি দিচ্ছেন, আত্মাও তেমনি অহং-এর রচনা-দ্বারা বদ্ধ হবার জন্যে হয় নি, এই রচনাগুলি-দ্বারাই সে মুক্ত হবে, তার আনন্দস্বরূপ মুক্ত হবে, কারণ এইগুলিই সে দান করবে। এই দানের দ্বারাই তার যথার্থ প্রকাশ। ঈশ্বরেরও আনন্দরূপ অমৃতরূপ বিসর্জনের দ্বারাই প্রকাশিত। সেইজন্য অহং তখনই আত্মার যথার্থ প্রকাশ হয়, যখন আত্মা তাকে উৎসর্গ করে দেয়, আত্মা তাকে নিজেই গ্রহণ না করে।

৬ চৈত্র

নদী ও কূল

অমর আত্মার সঙ্গে এই মরণধর্মী অহংটা আলোর সঙ্গে ছায়ার মতো যে নিয়তই লেগে রয়েছে। শিক্ষার দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা, ঘটনাসংঘাতের দ্বারা, স্থানিক এবং সাময়িক নানা প্রভাবের দ্বারা, শরীর মন হৃদয়ের প্রকৃতিগত প্রবৃত্তির বেগের দ্বারা, অহরহ নানা সংস্কার গড়ে তুলছে এবং কেবলই এই সংস্কার-দেহটির পরিবর্তন ঘটাচ্ছে— আমাদের আত্মার নামরূপময় একটি চিরচঞ্চল পরিবেষ্টন তৈরি করছে। এই অহংকে যদি একেবারে মিথ্যা মায়া বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করি, তা হলেই সে যে ঘরে গিয়ে মরে থাকবে এমন আশঙ্কা নেই। যেমন সংসারকে মনের ক্ষোভে মিথ্যা বললেই সে মিথ্যা হয় না, তেমনি এই অহংকে রাগ করে মিথ্যা অপবাদ দিলে তার তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটে না।

আত্মার সঙ্গে তার একটি সত্য সম্বন্ধ আছে, সেইখানেই সে সত্য, সেই সম্বন্ধের বিকার ঘটলেই সে মিথ্যা। এই উপলক্ষে আমি একটি উপমার অবতারণ করতে চাই।

নদীর ধারাটা চিরন্তন। সে পর্বতের গুহা থেকে নিঃসৃত হয়ে সমুদ্রের অতলের মধ্যে প্রবেশ করছে। সে যে-ক্ষেত্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সেই ক্ষেত্র থেকে উপকরণ-রাশি তার গতিবেগে আহরিত হয়ে চর বেঁধে উঠছে— কোথাও নুড়ি, কোথাও বালি, কোথাও মাটি জমছে, তার সঙ্গে নানা দেশের কত ধাতুকণা এবং জৈব পদার্থ এসে মিলছে। এই চর কতবার ভাঙছে, কতবার গড়ছে, কত স্থান ও আকার পরিবর্তন করছে। এর কোথাও বা গাছপালা উঠছে, কোথাও বা মরুভূমি। কোথাও জলাশয়ে পাখি চরছে, কোথাও বা বালির উপর কুমিরের ছানা হাঁ করে পড়ে রোদ পোয়াচ্ছে।

এই চিরপরিবর্তনশীল চরগুলিই যদি একান্ত প্রবল হয়ে ওঠে তা হলেই নদীর চিরন্তন ধারা বাধা পায়। ক্রমে ক্রমে নদী হয়ে পড়ে গৌণ, চরই হয়ে পড়ে মুখ্য। শেষকালে ফল্গুর মতো নদীটা একেবারেই আচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে।

আত্মা সেই চিরস্রোত নদীর মতো। অনাদি তার উৎপত্তিশিখর, অনন্ত তার সঞ্চারক্ষেত্র। আনন্দই তাকে গতিবেগ দিয়েছে, সেই গতির বিরাম নেই।

এই আত্মা যে-দেশ দিয়ে যে-কাল দিয়ে চলেছে তার গতিবেগে সেই দেশ ও সেই কালের নানা উপকরণ সঞ্চিত হয়ে তার একটি সংস্কাররূপ তৈরি হতে থাকে— এই জিনিসটি কেবলই ভাঙছে, গড়ছে, কেবলই আকার পরিবর্তন করছে।

কিন্তু সৃষ্টি কোনো কোনো অবস্থায় সৃষ্টিকর্তাকে ছাপিয়ে উঠতে পারে। আত্মাকেও তার দেশকালজাত অহং প্রবল হয়ে উঠে অবরুদ্ধ করতে পারে। এমন হতে পারে অহংটাকেই তার স্তূপাকার উপকরণ-সমেত দেখা যায়, আত্মাকে আর দেখা যায় না। অহং চারি দিকেই বড়ো হয়ে উঠে আত্মাকে বলতে থাকে— 'তুমি চলতে পাবে না, তুমি এইখানেই থেকে যাও, তুমি এই ধন-দৌলতেই থাকো, এই ঘর-বাড়িতেই থাকো, এই খ্যাতি-প্রতিপত্তিতেই থাকো।'

যদি আত্মা আটকা পড়ে তবে তার স্বরূপ ক্লিষ্ট হয়, তার স্বভাব নষ্ট হয়। সে তার গতি হারায়। অনন্তের মুখে সে আর চলে না, সে মজে যায়, সে মরতে থাকে।

আত্মা দেশকালপাত্রের মধ্যে দিয়ে নানা উপকরণে এই যে নিজের উপকূল রচনা করতে থাকে তার প্রধান সার্থকতা এই যে, এই কূলের দ্বারাই তার গতি সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। এই কূল না থাকলে সে ব্যাপ্ত হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে অচল হয়ে থাকত। অহং লোকে লোকান্তরে আত্মার গতিবেগকে বাড়িয়ে তার গতিপথকে এগিয়ে নিয়ে চলে। উপকূলই নদীর সীমা এবং নদীর রূপ, অহংই আত্মার সীমা, আত্মার রূপ। এই রূপের মধ্য দিয়েই আত্মার প্রবাহ, আত্মার প্রকাশ। এই প্রকাশপরম্পরার ভিতর দিয়েই সে নিজেকে নিয়ত উপলব্ধি করছে, অনন্তের মধ্যে সঞ্চরণ করছে। এই অহং-উপকূলের নানা ঘাতে প্রতিঘাতেই তার তরঙ্গ, তার সংগীত।

কিন্তু যখনই উপকূলই প্রধান হয়ে উঠতে থাকে, যখন সে নদীর আনুগত্য না করে, তখনই গতির সহায় না হয়ে সে গতিরোধ করে। তখন অহং নিজে ব্যর্থ হয় এবং আত্মাকে ব্যর্থ করে। যেটুকু বাধায়

আত্মা বেগ পায় তার চেয়ে অধিক বাধায় আত্মা অবরুদ্ধ হয়। তখন উপকূল নদীর সামগ্রী না হয়ে নদীই উপকূলের সামগ্রী হয়ে ওঠে এবং আত্মাই অহং-এর বশীভূত হয়ে নিজের অমরত্ব ভুলে সংসারে নিতান্ত দীনহীন হয়ে বাস করতে থাকে। নিজেকে দানের দ্বারা যে সার্থক হত, সঞ্চয়ের বহুতর শুষ্কবালুময় বেষ্টনের মধ্যে সে মৃত্যুশয্যায় পড়ে থাকে। তবু মরে না, কেবল নিজের দুর্গতিকেই ভোগ করে।

৭ চৈত্র

আত্মার প্রকাশ

প্রকাশ এবং যাঁর প্রকাশ উভয়ের মধ্যে একটি বৈপরীত্য থাকে, সেই বৈপরীত্যের সামঞ্জস্যের দ্বারাই উভয়ে সার্থকতা লাভ করে। বস্তুত বিরোধের মিলন ছাড়া প্রকাশ হতেই পারে না।

কর্মের মধ্যে শক্তির একটি বাধা আছে— সেই বাধাকে অতিক্রম করে কর্মের সঙ্গে সংগত হয় বলেই শক্তিকে শক্তি বলি। কর্মের মধ্যে শক্তির সেই বিরোধ যদি না থাকত তা হলে শক্তিকে শক্তিই বলতুম না। আবার, যদি কেবল বিরোধই থাকত, তার কোনো সামঞ্জস্যই না থাকত, তা হলেও শক্তিকে শক্তি বলা যেত না।

জগতের মধ্যে জগদীশ্বরের যে প্রকাশ সে হচ্ছে সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ। এই সীমায় অসীমে বৈপরীত্য আছে, তা না হলে অসীমের প্রকাশ হতে পারত না। কিন্তু কেবলই যদি বৈপরীত্যই থাকত তা হলেও সীমা অসীমকে আচ্ছন্ন করেই থাকত।

এক জায়গায় সীমার সঙ্গে অসীমের সামঞ্জস্য আছে। সে কোথায় ? যেখানে সীমা আপনার সীমার মধ্যেই স্থির হয়ে বসে নেই, যেখানে সে অহরহই অসীমের দিকে চলেছে। সেই চলায় তার শেষ নেই, সেই চলায় সে অসীমকে প্রকাশ করছে।

মনে করো একটি বৃহৎ দৈর্ঘ্য স্থির হয়ে রয়েছে, ছোটো মাপকাঠি কী করে সেই দৈর্ঘ্যের বৃহত্ত্বকে প্রকাশ করে। না, ক্রমাগতই সেই স্তব্ধ দৈর্ঘ্যের পাশে পাশে চঞ্চল হয়ে অগ্রসর হতে হতে। সে প্রত্যেকবার অগ্রসর হয়ে বলে, না, এখনো শেষ হল না। সে যদি চুপ করে পড়ে থাকত তা হলে বৃহত্ত্বের সঙ্গে কেবলমাত্র নিজের বৈপরীত্যটুকুই জানত, কিন্তু সে নাকি চলেছে, এই চলার দ্বারাই বৃহত্ত্বকে পদে পদে উপলব্ধি করে চলেছে। এই চলার দ্বারা মাপকাঠি ক্ষুদ্র হয়েও বৃহত্ত্বকে প্রচার করছে। এইরূপে ক্ষুদ্রে বৃহতে বৈপরীত্যের মধ্যে যেখানে একটা সামঞ্জস্য ঘটছে সেইখানেই ক্ষুদ্রের দ্বারা বৃহতের প্রকাশ হচ্ছে।

জগৎও তেমনি সীমাবদ্ধভাবে কেবল স্থির নিশ্চল নয়— তার মধ্যে নিরন্তর একটি অভিব্যক্তি আছে, একটি গতি আছে। রূপ হতে রূপান্তরে চলতে-চলতে সে ক্রমাগতই বলছে, 'আমার সীমা দ্বারা তাঁর প্রকাশকে শেষ করতে পারলুম না।' এইরূপে রূপের দ্বারা জগৎ সীমাবদ্ধ হয়ে গতির দ্বারা অসীমকে প্রকাশ করছে। রূপের সীমাটি না থাকলে তার গতিও থাকতে পারত না, তার গতি না থাকলে অসীম তো অব্যক্ত হয়েই থাকতেন।

আত্মার প্রকাশরূপ যে অহং, তার সঙ্গে আত্মার একটি বৈপরীত্য আছে। আত্মা ন জায়তে ম্রিয়তে। না জন্মায় না মরে। অহং জন্মমরণের মধ্যে দিয়ে চলেছে। আত্মা দান করে, অহং সংগ্রহ করে। আত্মা অনন্তের মধ্যে সঞ্চরণ করতে চায়, অহং বিষয়ের মধ্যে আসক্ত হতে থাকে।

এই বৈপরীত্যের বিরোধের মধ্যে যদি একটি সামঞ্জস্য স্থাপিত না হয় তবে অহং আত্মাকে প্রকাশ না করে তাকে আচ্ছন্নই করবে।

অহং আপনার মৃত্যুর দ্বারাই আত্মার অমরত্ব প্রকাশ করে। কোনো সীমাবদ্ধ পদার্থ নিশ্চল হয়ে এই

অমর আত্মাকে নিজের মধ্যে একভাবে রুদ্ধ করে রাখতে পারে না। অহং-এর মৃত্যুর দ্বারা আত্মা রূপকে বর্জন করতে-করতেই নিজের রূপাতীত স্বরূপকে প্রকাশ করে। রূপ কেবলই বলে, 'একে আমি বাঁধতে পারলুম না, এ আমাকে নিরন্তর ছাড়িয়ে চলছে।' এই জন্মমৃত্যুর দ্বারগুলি আত্মার পক্ষে রুদ্ধ দ্বার নয়। সে যেন তার রাজপথের বিজয়তোরণের মতো, তার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে-করতে সে চলে যাচ্ছে, এগুলি কেবল তার গতির পরিমাপ করছে মাত্র। অহং নিয়ত চঞ্চল হয়ে আত্মাকে কেবল মাপছে আর কেবলই বলছে— 'না, একে আমি সীমাবদ্ধ করে রাখতে পারলুম না।' সে যেমন সব জিনিসকেই বদ্ধ করে রাখতে চায় তেমনি আত্মাকেও সে বাঁধতে চায়। বদ্ধ করতে চাওয়াই তার ধর্ম। অথচ একেবারে বদ্ধ করে রাখা তার ক্ষমতার মধ্যে নেই। যেমন বদ্ধ করা তার প্রবৃত্তি, তেমনি বদ্ধ করাই যদি তার ক্ষমতা হত তবে অমন সর্বনেশে জিনিস আর কী হত।

তাই বলছিলুম অহং আত্মাকে যে কেবলই বাঁধছে এবং ছেড়ে দিচ্ছে, সেই বাঁধা এবং ছেড়ে দেওয়ার দ্বারাই সে আত্মার মুক্ত-স্বভাবকে প্রকাশ করছে। যদি না বাঁধত তা হলে এই মুক্তির প্রকাশ কোথায় থাকত? যদি না ছেড়ে দিত তা হলেই বা কোথায় থাকত?

আত্মা দান করে এবং অহং সংগ্রহ করে, এই বৈপরীত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায় সে কথার আলোচনা কাল করেছি। আত্মা দান করবে বলেই অহং সংগ্রহ করে, এইটেই হচ্ছে ওর সামঞ্জস্য। অহং সে কথা ভোলে— সে মনে করে সংগ্রহ করা ভোগেরই জন্যে। এই মিথ্যাকে যতই সে আঁকড়ে ধরতে চায় এই মিথ্যা ততই তাকে দুঃখ দেয়, ফাঁকি দেয়। আত্মা তার অহংবৃক্ষে ফল ফলাবে বটে, কিন্তু ফল আত্মসাৎ করবে না, দান করবে।

আমাদের জীবনের সাধনা এই যে, অহং-এর দ্বারা আমরা আত্মাকে প্রকাশ করব। যখন তা না করে ধনকে মানকে বিদ্যাকেই প্রকাশ করতে চাই তখন অহং নিজেকেই প্রকাশ করে, আত্মাকে প্রকাশ করে না। তখন ভাষা নিজের বাহাদুরি দেখাতে চায়, ভাব ম্লান হয়ে যায়।

যাঁরা সাধুপুরুষ তাঁদের অহং চোখেই পড়ে না, তাঁদের আত্মাকেই দেখি। সেইজন্যে তাঁদের মহাধনী মহামানী মহাবিদ্বান বলি নে, তাঁদের মহাত্মা বলি। তাঁদের জীবনে আত্মারই প্রকাশ, সুতরাং তাঁদের জীবন সার্থক। তাঁদের অহং আত্মাকে মুক্তই করছে, বাধাগ্রস্ত করছে না।

এইজন্যেই আমাদের প্রার্থনা যে, আমরা যেন এই মানবজীবনে সত্যকেই প্রকাশ করি, অসত্যকে নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত হয়ে না থাকি। আমরা যেন প্রবৃত্তির অন্ধকারের মধ্যেই আত্মাকে আচ্ছন্ন করে না রাখি, আত্মা যেন এই ঘোর অন্ধকারে আপনাকে আপনি না হারায়, মোহমুক্ত নির্মল জ্যোতিতে আপনাকে আপনি উপলব্ধি করে, সে যেন নানা অনিত্য উপকরণের সঞ্চয়ের মধ্যে পদে পদে আঘাত খেতে খেতে হাতড়ে না বেড়ায়, সে যেন আপনার অমৃতরূপকে আনন্দরূপকে তোমার মধ্যে লাভ করে। হে স্বপ্রকাশ, আত্মা যেন নিজের সকল প্রকাশের মধ্যে তোমাকেই প্রকাশ করে— নিজের অহংকেই প্রকাশ না করে, মানবজীবনকে একেবারে নিরর্থক করে না দেয়।

৮ চৈত্র

আদেশ

কোন্ কোন্ মন্দ কাজ করবে না তার বিশেষ উল্লেখ করে সেইগুলিকে ধর্মশাস্ত্র ঈশ্বরের বিশেষ নিষেধরূপে প্রচার করেছেন।

সেরকম ভাবে প্রচার করলে মনে হয় যেন ঈশ্বর কতকগুলি নিজের ইচ্ছামত আইন করে দিয়েছেন, সেই আইনগুলি লঙ্ঘন করলে বিশ্বরাজের কোপে পড়তে হবে। সে কথাটাকে এইরূপ ক্ষুদ্র ও কৃত্রিম -ভাবে মানতে পারি নে। তিনি কোনো বিশেষ আদেশ জানান নি, কেবল তাঁর একটি আদেশ তিনি ঘোষণা করেছেন, সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উপরে তাঁর সেই আদেশ— সেই একমাত্র আদেশ।

তিনি কেবলমাত্র বলেছেন, প্রকাশিত হও। সূর্যকেও তাই বলেছেন, পৃথিবীকেও তাই বলেছেন, মানুষকেও তাই বলেছেন। সূর্য তাই জ্যোতির্ময় হয়েছে, পৃথিবী তাই জীবধাত্রী হয়েছে, মানুষকেও তাই আত্মাকে প্রকাশ করতে হবে।

বিশ্বজগতের যে-কোনো প্রান্তে তাঁর এই আদেশ বাধা পাচ্ছে, সেইখানেই কুঁড়ি মুষড়ে যাচ্ছে, সেইখানেই নদী স্রোতোহীন হয়ে শৈবালজালে রুদ্ধ হচ্ছে— সেইখানেই বন্ধন, বিকার, বিনাশ।

বুদ্ধদেব যখন বেদনাপূর্ণ চিত্তে ধ্যান-দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন যে, মানুষের বন্ধন বিকার বিনাশ কেন, দুঃখ জরা মৃত্যু কেন, তখন তিনি কোন্ উত্তর পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন ? তখন তিনি এই উত্তরই পেয়েছিলেন যে, মানুষ আত্মাকে উপলব্ধি করলেই, আত্মাকে প্রকাশ করলেই মুক্তিলাভ করবে। সেই প্রকাশের বাধাতেই তার দুঃখ— সেইখানেই তার পাপ।

এইজন্যে তিনি প্রথমে কতকগুলি নিষেধ স্বীকার করিয়ে মানুষকে শীল গ্রহণ করতে আদেশ করেন। তাকে বললেন, 'তুমি লোভ কোরো না, হিংসা কোরো না, বিলাসে আসক্ত হোয়ো না।' যে-সমস্ত আবরণ তাকে বেষ্টন করে ধরেছে সেইগুলি প্রতিদিনের নিয়ত অভ্যাসে মোচন করে ফেলবার জন্যে তাকে উপদেশ দিলেন। সেই আবরণগুলি মোচন হলেই আত্মা আপনার বিশুদ্ধ স্বরূপটি লাভ করবে।

সেই স্বরূপটি কী ? শূন্যতা নয়, নৈষ্কর্ম্য নয়। সে হচ্ছে মৈত্রী, করুণা, নিখিলের প্রতি প্রেম। বুদ্ধ কেবল বাসনা ত্যাগ করতে বলেন নি, তিনি প্রেমকে বিস্তার করতে বলেছেন। কারণ এই প্রেমকে বিস্তারের দ্বারাই আত্মা আপন স্বরূপকে পায়— সূর্য যেমন আলোককে বিকীর্ণ করার দ্বারাই আপনার স্বভাবকে পায়।

সর্বলোকে আপনাকে পরিকীর্ণ করা আত্মার ধর্ম— পরমাত্মারও সেই ধর্ম। তাঁর সেই ধর্ম পরিপূর্ণ, কেননা, তিনি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং। তিনি নির্বিকার, তাঁতে পাপের কোনো বাধা নেই। সেইজন্যে সর্বত্রই তাঁর প্রবেশ।

পাপের বন্ধন মোচন করলে আমাদেরও প্রবেশ অব্যাহত হবে। তখন আমরা কী হব ? পরমাত্মার মতো সেই স্বরূপটি লাভ করব, যে স্বরূপে তিনি কবি, মনীষী, প্রভু, স্বয়ম্ভূ। আমরাও আনন্দময় কবি হব, মনের অধীশ্বর হব, দাসত্ব থেকে মুক্ত হব, আপন নির্মল আলোকে আপনি প্রকাশিত হব। তখন আত্মা সমস্ত চিন্তায় বাক্যে কর্মে আপনাকে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্ -রূপে প্রকাশ করবে— আপনাকে ক্ষুব্ধ করে লুব্ধ করে খণ্ডবিখণ্ডিত করে দেখাবে না।

মৈত্রেয়ীর প্রার্থনাও সেই প্রকাশের প্রার্থনা। যে প্রার্থনা বিশ্বের সমস্ত কুঁড়ির মধ্যে, কিশলয়ের মধ্যে, যে প্রার্থনা দেশকালের অপরিতৃপ্ত গভীরতার মধ্য হতে নিয়ত উঠছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণুতে পরমাণুতে যে প্রার্থনা, যে প্রার্থনার যুগ-যুগান্তর-ব্যাপী ক্রন্দনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলেই বেদে এই অন্তরীক্ষকে ক্রন্দসী রোদসী বলেছে, সেই মানবাত্মার চিরন্তন প্রার্থনাই মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা। আমাকে প্রকাশ করো, আমাকে প্রকাশ করো। আমি অসত্যে আচ্ছন্ন, আমাকে সত্যে প্রকাশ করো। আমি অন্ধকারে আবিষ্ট, আমাকে জ্যোতিতে প্রকাশ করো। আমি মৃত্যুর দ্বারা আবিষ্ট, আমাকে অমৃতে প্রকাশ করো। হে আবিঃ, হে পরিপূর্ণ প্রকাশ, তোমার মধ্যেই আমার প্রকাশ হোক, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ কোনো বাধা না পাক— সেই প্রকাশ নির্মুক্ত হলেই তোমার দক্ষিণ মুখের জ্যোতিতে আমি চিরকালের জন্যে রক্ষা পাব। সেই প্রকাশের বাধাতেই তোমার অপ্রসন্নতা।

বুদ্ধ সমস্ত মানবের হয়ে নিজের জীবনে এই পরিপূর্ণ প্রকাশের প্রার্থনাই করেছিলেন— এ ছাড়া মানুষের আর দ্বিতীয় কোনো প্রার্থনাই নেই।

৯ চৈত্র

সাধন

আমরা অনেকেই প্রতিদিন এই বলে আক্ষেপ করছি যে, আমরা ঈশ্বরকে পাচ্ছি নে কেন ? আমাদের মন বসছে না কেন ? আমাদের ভাব জমছে না কেন ?

সে কি অমনি হবে ? আপনি হয়ে উঠবে ? এতবড়ো লাভের খুব একটা বড়ো সাধনা নেই কি ? ঈশ্বরকে পাওয়া বলতে কতখানি বোঝায় তা ঠিকমত জানলে এ সম্বন্ধে বৃথা চঞ্চলতা অনেকটা দূর হয়।

ব্রহ্মকে পাওয়া বলতে যদি একটা কোনো চিন্তায় মনকে বসানো বা একটা কোনো ভাবে মনকে রসিয়ে তোলা হত তা হলে কোনো কথাই ছিল না— কিন্তু ব্রহ্মকে পাওয়া তো অমন একটি ছোটো ব্যাপার নয়। তার জন্যে শিক্ষা হল কই ? তার জন্যে সমস্ত চিত্তকে একমনে নিযুক্ত করলুম কই ? তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানতে চাও। এই যে উপদেশ, সে উপদেশের মতো তপস্যা হল কই।

কেবল কি নিয়মিত সময়ে তাঁর নাম করা, নাম শোনাই তপস্যা ? জীবনের অল্প একটু উদ্‌বৃত্ত জায়গা তাঁর জন্যে ছেড়ে দেওয়াই কি তপস্যা ? সেইটুকুমাত্র ছেড়ে দিয়েই তুমি রোজ তার হিসেব নিকেশ·করে নেবার তাগাদা কর ? বল যে 'এই তো উপাসনা করছি কিন্তু ব্রহ্মকে পাচ্ছি নে কেন' ? এত সস্তায় কোন্ জিনিসটা পেয়েছ ?

কেবল পাঁচজন মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার উপযুক্ত হবার জন্যে কী তপস্যাই না করতে হয়েছে ? বাপ মা'র কাছে শিক্ষা, প্রতিবেশীর কাছে শিক্ষা, বন্ধুর কাছে শিক্ষা, শত্রুর কাছে শিক্ষা, ইস্কুলে শিক্ষা, আপিসে শিক্ষা, রাজার শাসন, সমাজের শাসন, শাস্ত্রের শাসন। সেজন্য ক্রমাগতই প্রবৃত্তিকে দমন করতে হয়েছে, ব্যবহারকে সংযত করতে হয়েছে, ইচ্ছাবৃত্তিকে পরিমিত করতে হয়েছে। এত করেও পরিপূর্ণ সামাজিক জীব হয়ে উঠি নি— কত অসতর্কতা কত শৈথিল্যবশত কত অপরাধ করি তার ঠিক নেই। তাই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমাদের সমাজসাধনা চলেইছে।

সমাজবিহারের জন্য যদি এত কঠিন ও নিরন্তর সাধনা, তবে ব্রহ্মবিহারের জন্য বুঝি কেবল মাঝে মাঝে নিয়মমত দুই-চারিটি কথা শুনে বা দুই-চারিটি কথা বলেই কাজ হয়ে যাবে ?

এরকম আশা যদি কেউ করে তবে বোঝা যাবে, সে ব্যক্তি মুখে যাই বলুক, সাধনার লক্ষ্য যেখানে সে স্থাপন করেছে সেটা একটা ছোটো জায়গা। সে জায়গায় এমন কিছুই নেই যা তোমার সমস্ত সংসারের চেয়েও বড়ো— বরং এমন কিছু আছে যার চেয়ে তোমার সংসারের অধিকাংশ জিনিসই বড়ো।

এইটি মনে রাখতে হবে প্রতিদিন সকল কর্মের মধ্যে আমাদের সাধনাকে জাগিয়ে রাখতে হবে। এই সাধনাটিকে আমাদের গড়তে হবে। শরীরটিকে মনটিকে হৃদয়টিকে সকল দিক দিয়ে ব্রহ্মবিহারের অনুকূল করে তুলতে হবে।

সমাজের জন্য আমাদের এই শরীর মন হৃদয়কে আমরা তো একটু একটু করে গড়ে তুলেছি। শরীরকে সমাজের উপযোগী সাজ করতে অভ্যাস করিয়েছি— শরীর সমাজের উপযোগী লজ্জাসংকোচ করতে শিখেছে। তার হাত পা চাহনি হাসি সমাজের প্রয়োজন অনুসারে শায়েস্তা হয়ে এসেছে। সভাস্থলে স্থির হয়ে বসতে তার আর কষ্ট হয় না, পরিচিত ভদ্রলোক দেখলে হাসিমুখে শিষ্ট সম্ভাষণ করতে তার আর চেষ্টা করতে হয় না। সমাজের সঙ্গে মিলে থাকবার জন্যে বিশেষ অভ্যাসের দ্বারা অনেক ভালোলাগা মন্দলাগা অনেক ঘৃণাভয় এমন করে গড়ে তুলতে হয়েছে যে, সেগুলি শারীরিক সংস্কারে পরিণত হয়েছে ; এমন-কি, সেগুলি আমাদের সহজ সংস্কারের চেয়েও বড়ো হয়ে উঠেছে। এমনি করে কেবল শরীর নয়, হৃদয় মনকে প্রতিদিন সমাজের ছাঁচে ফেলে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গড়ে তুলতে হয়েছে।

ব্রহ্মবিহারের জন্যও শরীর মন হৃদয়কে সকল দিক দিয়েই সকল প্রকারেই নিজের চেষ্টায় গড়ে

তুলতে হবে। যদি প্রশ্ন করবার কিছু থাকে তো সেইটেই প্রশ্ন করবার যে, আমি কি সেই চেষ্টা করছি? আমি কি ব্রহ্মকে পেয়েছি, সে প্রশ্ন এখন থাক।

প্রথমে শরীরটাকে তো বিশুদ্ধ করে তুলতে হবে। আমাদের চোখ মুখ হাত পা'কে এমন করতে হবে যে, পবিত্র সংযম তাদের পক্ষে একেবারে সংস্কারের মতো হয়ে আসবে। সম্মুখে যেখানে লজ্জার বিষয় আছে সেখানে মন লজ্জা করবার পূর্বে চক্ষু আপনি লজ্জিত হবে— যে ঘটনায় সহিষ্ণুতার প্রয়োজন আছে সেখানে মন বিবেচনা করবার পূর্বে বাক্য আপনি ক্ষান্ত হবে, হাত পা আপনি স্তব্ধ হবে। এর জন্যে মুহূর্তে মুহূর্তে আমাদের চেষ্টার প্রয়োজন। তনুকে ভাগবতী তনু করে তুলতে হবে— এ তনু ভগবানের সঙ্গে কোথাও বিরোধ করবে না, অতি সহজেই সর্বত্রই তাঁর অনুগত হবে।

প্রতিদিন প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদের বাসনাকে সংযত করে আমাদের ইচ্ছাকে মঙ্গলের মধ্যে বিস্তীর্ণ করতে হবে, অর্থাৎ ভগবানের যে-ইচ্ছা সর্বজীবের মধ্যে প্রসারিত, নিজের রাগ-দ্বেষ লোভ-ক্ষোভ ভুলে সেই ইচ্ছার সঙ্গে সচেষ্টভাবে যোগ দিতে হবে। সেই ইচ্ছার মধ্যে প্রত্যহই আমাদের ইচ্ছাকে অল্প অল্প করে ব্যাপ্ত করে দিতে হবে। যে পরিমাণে ব্যাপ্ত হতে থাকবে ঠিক সেই পরিমাণেই আমরা ব্রহ্মকে পাব। এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে যদি বলি যে দূর লক্ষ্যস্থানে পৌঁচচ্ছি না কেন সে যেমন অসংগত বলা, তেমনি নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে স্বার্থবেষ্টনের কেন্দ্রে অচল হয়ে বসে কেবলমাত্র জপতপের দ্বারা ব্রহ্মকে পাচ্ছি নে কেন এ প্রশ্নও তেমনি অদ্ভুত।

১০ চৈত্র

ব্রহ্মবিহার

ব্রহ্মবিহারের এই সাধনার পথে বুদ্ধদেব মানুষকে প্রবর্তিত করবার জন্যে বিশেষরূপে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি জানতেন কোনো পাবার যোগ্য জিনিস ফাঁকি দিয়ে পাওয়া যায় না, সেইজন্যে তিনি বেশি কথা না বলে একেবারে ভিত খোঁড়া থেকে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন শীলগ্রহণ করাই মুক্তিপথের পাথেয় গ্রহণ করা। চরিত্র শব্দের অর্থই এই, যাতে করে চলা যায়। শীলের দ্বারা সেই চরিত্র গড়ে ওঠে। শীল আমাদের চলবার সম্বল।

পাণং ন হানে, প্রাণীকে হত্যা করবে না, এই কথাটি শীল। ন চ অদিন্নমাদিয়ে, যা তোমাকে দেওয়া হয় নি তা নেবে না, এই একটি শীল। মুসা ন ভাসে, মিথ্যা কথা বলবে না, এই একটি শীল। ন চ মজ্জপো সিয়া, মদ খাবে না, এই একটি শীল। এমনি করে যথাসাধ্য একটি একটি করে শীল সঞ্চয় করতে হবে।

আর্যশ্রাবকেরা প্রতিদিন নিজেদের এই শীলকে স্মরণ করেন— ইধ অরিয়সাবকো অত্তনো সীলানি অনুস্‌সরতি। শীলসকলকে কী বলে অনুস্মরণ করেন?

অখণ্ডানি, অচ্ছিদ্দানি, অসবলানি, অকম্মাসানি ভুজিস্‌সানি, বিঞ্ঞুপ্পসত্থানি, অপরামট্‌ঠানি, সমাধিসংবত্তনিকানি।

অর্থাৎ—

আমার এই শীল খণ্ডিত হয় নি, এতে ছিদ্র হয় নি, আমার এই শীল জোর করে রক্ষিত হয় নি অর্থাৎ ইচ্ছা করেই রাখছি, এই শীলে পাপ স্পর্শ করে নি, এই শীল ধন মান প্রভৃতি কোনো স্বার্থসাধনের জন্য আচরিত নয়, এই শীল বিজ্ঞজনের অনুমোদিত, এই শীল বিদলিত হয় নি এবং এই শীল মুক্তিপ্রবর্তন করবে।

এই বলে আর্যশ্রাবকগণ নিজ নিজ শীলের গুণ বারংবার স্মরণ করেন। এই শীলগুলিই হচ্ছে মঙ্গল। মঙ্গললাভই প্রেম ও মুক্তিলাভের সোপান। বুদ্ধদেব কাকে যে মঙ্গল বলেছেন তা 'মঙ্গলসুত্তে'

কথিত আছে। সেটি অনুবাদ করে দিই—

বহূ দেবা মনুস্সা চ মঙ্গলানি অচিন্তয়ুং
অকঙ্খমানা সোত্থানং ব্রূহি মঙ্গলমুত্তমং।

বুদ্ধকে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে—

বহু দেবতা বহু মানুষ যাঁরা শুভ আকাঙক্ষা করেন তাঁরা মঙ্গলের চিন্তা করে এসেছেন, সেই মঙ্গলটি কী বলো।

বুদ্ধ উত্তর দিচ্ছেন—

অসেবনা চ বালানং পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা
পূজা চ পূজনেয়্যানং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অসৎগণের সেবা না করা, সজ্জনের সেবা করা, পূজনীয়কে পূজা করা এই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।

পতিরূপদেসবাসো পুব্বে চ কতপুঞ্ঞতা
অত্তসম্মাপণিধি চ এতং মঙ্গলমুত্তমং।

যে দেশে ধর্মসাধন বাধা পায় না সেই দেশে বাস, পূর্বকৃত পুণ্যকে বর্ধিত করা, আপনাকে সৎকর্মে প্রণিধান করা এই উত্তম মঙ্গল।

বহুসচ্চঞ্চ সিপ্পঞ্চ বিনয়ো চ সুসিক্খিতো
সুভাসিতা চ যা বাচা এতং মঙ্গলমুত্তমং।

বহু শাস্ত্র-অধ্যয়ন, বহু শিল্পশিক্ষা, বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া এবং সুভাষিত বাক্য বলা এই উত্তম মঙ্গল।

মাতাপিতু-উপট্ঠানং পুত্তদারস্স সংগহো
অনাকুলা চ কম্মানি এতং মঙ্গলমুত্তমং।

মাতা পিতাকে পূজা করা, স্ত্রী পুত্রের কল্যাণ করা, অনাকুল কর্ম করা এই উত্তম মঙ্গল।

দানঞ্চ ধম্মচরিয়ঞ্চ ঞ্ঞাতকানঞ্চ সংগহো
অনবজ্জানি কম্মানি এতং মঙ্গলমুত্তমং।

দান, ধর্মচর্যা, জ্ঞাতিবর্গের উপকার, অনিন্দনীয় কর্ম এই উত্তম মঙ্গল।

আরতী বিরতি পাপা মজ্জপানা চ সঞ্ঞমো
অপ্পমাদো চ ধম্মেসু এতং মঙ্গলমুত্তমং।

পাপে অনাসক্তি এবং বিরতি, মদ্যপানে বিতৃষ্ণা, ধর্মকর্মে অপ্রমাদ এই উত্তম মঙ্গল।

গারবো চ নিবাতো চ সন্তুট্ঠী চ কতঞ্ঞুতা
কালেন ধম্মসবনং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

গৌরব অথচ নম্রতা, সন্তুষ্টি, কৃতজ্ঞতা, যথাকালে ধর্মকথাশ্রবণ এই উত্তম মঙ্গল।

খন্তী চ সোবচস্সতা সমণানঞ্চ দস্সনং
কালেন ধম্মসাকচ্ছা এতং মঙ্গলমুত্তমং

ক্ষমা, প্রিয়বাদিতা, সাধুগণকে দর্শন, যথাকালে ধর্মালোচনা এই উত্তম মঙ্গল।

তপো চ ব্রহ্মচরিয়ঞ্চ অরিয়সচ্চান দস্সনং
নিব্বানসচ্ছিকিরিয়া এতং মঙ্গলমুত্তমং।

তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শ্রেষ্ঠ সত্যকে জানা, মুক্তিলাভের উপযুক্ত সৎকার্য এই উত্তম মঙ্গল।

ফুট্ঠস্স লোকধম্মেহি চিত্তং যস্স ন কম্পতি
অসোকং বিরজং খেমং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

লাভ ক্ষতি নিন্দা প্রশংসা প্রভৃতি লোকধর্মের দ্বারা আঘাত পেলেও যার চিত্ত কম্পিত হয় না, যার

শোক নেই, মলিনতা নেই, যার ভয় নেই, সে উত্তম মঙ্গল পেয়েছে।

এতাদিসানি কত্বান সব্বত্থমপরাজিতা
সব্বত্থ সোত্থি গচ্ছন্তি তং তেসং মঙ্গলমুত্তমন্তি।

এই রকম যারা করেছে, তারা সর্বত্র অপরাজিত, তারা সর্বত্র স্বস্তি লাভ করে, তাদের উত্তম মঙ্গল হয়।

যারা বলে ধর্মনীতিই বৌদ্ধধর্মের চরম তারা ঠিক কথা বলে না। মঙ্গল একটা উপায় মাত্র। তবে নির্বাণই চরম? তা হতে পারে, কিন্তু সেই নির্বাণটি কী? সে কি শূন্যতা?

যদি শূন্যতাই হত তবে পূর্ণতার দ্বারা তাতে গিয়ে পৌঁছোনো যেত না। তবে কেবলই সমস্তকে অস্বীকার করতে-করতে, নয় নয় নয় বলতে-বলতে, একটার পর একটা ত্যাগ করতে-করতেই সেই সর্বশূন্যতার মধ্যে নির্বাপণ লাভ করা যেত।

কিন্তু বৌদ্ধধর্মে সে পথের ঠিক উলটা পথ দেখি যে। তাতে কেবল তো মঙ্গল দেখছি নে— মঙ্গলের চেয়েও বড়ো জিনিসটি দেখছি যে।

মঙ্গলের মধ্যেও একটা প্রয়োজনের ভাব আছে। অর্থাৎ তাতে একটা কোনো ভালো উদ্দেশ্য সাধন করে, কোনো একটা সুখ হয় বা সুযোগ হয়।

কিন্তু প্রেম যে সকল প্রয়োজনের বাড়া। কারণ প্রেম হচ্ছে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা, সে কিছুই নেওয়ার অপেক্ষা করে না, সে যে কেবলই দেওয়া।

যে দেওয়ার মধ্যে কোনো নেওয়ার সম্বন্ধ নেই সেইটেই হচ্ছে শেষের কথা— সেইটেই ব্রহ্মের স্বরূপ— তিনি নেন না।

এই প্রেমের ভাবে, এই আদানবিহীন প্রদানের ভাবে আত্মাকে ক্রমশ পরিপূর্ণ করে তোলবার জন্যে বুদ্ধদেবের উপদেশ আছে, তিনি তার সাধনপ্রণালীও বলে দিয়েছেন।

এ তো বাসনা-সংহরণের প্রণালী নয়, এ তো বিশ্ব হতে বিমুখ হবার প্রণালী নয়, এ যে সকলের অভিমুখে আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পদ্ধতি। এই প্রণালীর নাম মেত্তিভাবনা— মৈত্রীভাবনা। প্রতিদিন এই কথা ভাবতে হবে—

সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্‌ঝা হোন্তু, সুখী আত্তানং পরিহরন্তু; সব্বে সত্তা মা যথালব্ধসম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।

সকল প্রাণী সুখিত হোক, শত্রুহীন হোক, সুখী অহিংসিত হোক, সুখী আত্মা হয়ে কালহরণ করুক। সকল প্রাণী আপন যথালব্ধ সম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হোক।

মনে ক্রোধ দ্বেষ লোভ ঈর্ষা থাকলে এই মৈত্রীভাবনা সত্য হয় না— এইজন্য শীলগ্রহণ শীলসাধন প্রয়োজন। কিন্তু শীলসাধনার পরিণাম হচ্ছে সর্বত্র মৈত্রীকে দয়াকে বাধাহীন করে বিস্তার। এই উপায়েই আত্মাকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

এই মৈত্রীভাবনার দ্বারা আত্মাকে সকলের মধ্যে প্রসারিত করা এ তো শূন্যতার পন্থা নয়। তা যে নয় তা বুদ্ধ যাকে ব্রহ্মবিহার বলছেন তা অনুশীলন করলেই বোঝা যাবে।

করণীয় মত্থ কুসলেন
যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ
সক্কো উজূ চ সুহুজূ চ,
সুবচো চস্‌স মৃদু অনতিমানী।

শান্তপদ লাভ করে পরমার্থকুশল ব্যক্তির যা করণীয় তা এই— তিনি শক্তিমান, সরল, অতি সরল, সুভাষী, মৃদু, নম্র এবং অনভিমানী হবেন

সন্তুসসকো চ সুভরো চ
অপপকিচ্চো চ সল্লহুকবুত্তি

সন্তিন্দ্রিয়ো চ নিপকো চ
অপ্পগব্ভো কুলেসু অননুগিদ্ধো।

তিনি সন্তুষ্টহৃদয় হবেন, অল্পেই তাঁর ভরণ হবে, তিনি নিরুদ্‌বেগ, অল্পভোজী, শান্তেন্দ্রিয়, সদ্‌বিবেচক, অপ্রগল্‌ভ এবং সংসারে অনাসক্ত হবেন।

ন চ খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি
যেন বিঞ্‌ঞূপরে উপবদেয্যুং।
সুখিনো বা খেমিনো বা
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

এমন ক্ষুদ্র অন্যায়ও কিছু আচরণ করবেন না যার জন্যে অন্যে তাঁকে নিন্দা করতে পারে। তিনি কামনা করবেন সকল প্রাণী সুখী হোক, নিরাপদ হোক, সুস্থ হোক।

যে কেচি পাণভূতত্থি
তসা বা থাবরা বা অনবসেসা।
দীঘা বা যে মহন্তা বা
মজ্ঝিমা রস্‌সকা অণুকথুলা।
দিট্‌ঠা বা যে চ অদিট্‌ঠা
যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে।
ভূতা বা সম্‌ভবসেবী বা
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

যে কোনো প্রাণী আছে, কী সবল কী দুর্বল, কী দীর্ঘ কী প্রকাণ্ড, কী মধ্যম কী হ্রস্ব, কী সূক্ষ্ম কী স্থূল, কী দৃষ্ট কী অদৃষ্ট, যারা দূরে বাস করছে বা যারা নিকটে, যারা জন্মেছে বা যারা জন্মাবে, অনবশেষে সকলেই সুখী-আত্মা হোক।

ন পরোপরং নিকুব্বেথ
নাতিমঞ্‌ঞেথ কত্থচি ন কঞ্চি
ব্যারোসনা পটিঘ সঞ্‌ঞা
নঞ্‌ঞ মঞ্‌ঞস্‌স দুক্‌খমিচ্ছেয্য।

পরস্পরকে বঞ্চনা কোরো না— কোথাও কাউকে অবজ্ঞা কোরো না, কায়ে বাক্যে বা মনে ক্রোধ করে অন্যের দুঃখ ইচ্ছা কোরো না।

মাতা যথা নিযং পুত্তং
আয়ুসা একপুত্তমনুরক্‌খে
এবম্পি সর্ব্বভূতেসু
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।

মা যেমন একটি মাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন, সমস্ত প্রাণীতে সেই প্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করবে।

মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ
অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।

ঊর্ধ্বে অধোতে চার দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন, হিংসাহীন, শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে।

তিট্ঠং চরং নিসিন্নো বা
সয়ানো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্ধো
এতং সতিং অধিট্ঠেয্যং
ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু।

যখন দাঁড়িয়ে আছ বা চলছ, বসে আছ বা শুয়ে আছ, যে পর্যন্ত না নিদ্রা আসে সে পর্যন্ত এই প্রকার স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকে ব্রহ্মবিহার বলে।

অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলাকে ব্রহ্মবিহার বলে। সে প্রীতি সামান্য প্রীতি নয়— মা তাঁর একটিমাত্র পুত্রকে যেরকম ভালোবাসেন সেইরকম ভালোবাসা।

ব্রহ্মের অপরিমিত মানস যে বিশ্বের সর্বত্রই রয়েছে, এক পুত্রের প্রতি মাতার যে প্রেম সেই প্রেম যে তাঁর সর্বত্র। তাঁরই সেই মানসের সঙ্গে মানস, প্রেমের সঙ্গে প্রেম না মেশালে সে তো ব্রহ্মবিহার হল না।

কথাটা খুব বড়ো। কিন্তু বড়ো কথাই যে হচ্ছে। বড়ো কথাকে ছোটো কথা করে তো লাভ নেই। ব্রহ্মকে চাওয়াই যে সকলের চেয়ে বড়োকে চাওয়া। উপনিষৎ বলেছেন : ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। ভূমাকেই, সকলের চেয়ে বড়োকেই, জানতে চাইবে।

সেই চাওয়া সেই পাওয়ার রূপটা কী সে তো স্পষ্ট করে পরিষ্কার করে সম্মুখে ধরতে হবে। ভগবান বুদ্ধ ব্রহ্মবিহারকে সুস্পষ্ট করে ধরেছেন— তাকে ছোটো করে ঝাপসা করে সকলের কাছে চলনসই করবার চেষ্টা করেন নি।

অপরিমিত মানসে অপরিমিত মৈত্রীকে সর্বত্র প্রসারিত করে দিলে ব্রহ্মের বিহারক্ষেত্রে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন হয়।

এই তো হল লক্ষ্য। কিন্তু এ তো আমরা একেবারে পারব না। এই দিকে আমাদের প্রত্যহ চলতে হবে। এই লক্ষ্যের সঙ্গে তুলনা করে প্রত্যহ বুঝতে পারব আমরা কতদূর অগ্রসর হলুম।

ঈশ্বরের প্রতি আমার প্রেম জন্মাচ্ছে কি না সে সম্বন্ধে আমরা নিজেকে নিজে ভোলাতে পারি। কিন্তু সকলের প্রতি আমার প্রেম বিস্তৃত হচ্ছে কি না, আমার শত্রুতা ক্ষয় হচ্ছে কি না, আমার মঙ্গলভাব বাড়ছে কি না, তার পরিমাণ স্থির করা শক্ত নয়।

একটা কোনো নির্দিষ্ট সাধনার সুস্পষ্ট পথ পাবার জন্যে মানুষের একটা ব্যাকুলতা আছে। বুদ্ধদেব এক দিকে উদ্দেশ্যকে যেমন খর্ব করেন নি তেমনি তিনি পথকেও খুব নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কেমন করে ভাবতে হবে এবং কেমন করে চলতে হবে তা তিনি খুব স্পষ্ট করে বলেছেন। প্রত্যহ শীলসাধনা-দ্বারা তিনি আত্মাকে মোহ থেকে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং মৈত্রীভাবনা-দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পথ দেখিয়েছেন। প্রতিদিন এই কথা স্মরণ করো যে, আমার শীল অখণ্ড আছে, অচ্ছিদ্র আছে— এবং প্রতিদিন চিত্তকে এই ভাবনায় নিবিষ্ট করো যে, ক্রমশ সকল বিরোধ কেটে গিয়ে আমার আত্মা সর্বভূতে প্রসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ এক দিকে বাধা কাটছে আর-এক দিকে স্বরূপ লাভ হচ্ছে। এই পদ্ধতিকে তো কোনোক্রমেই শূন্যতালাভের পদ্ধতি বলা যায় না। এই তো নিখিললাভের পদ্ধতি, এই তো আত্মলাভের পদ্ধতি, পরমাত্মলাভের পদ্ধতি।

১১ চৈত্র

পূর্ণতা

আর এক মহাপুরুষ যিনি তাঁর পিতার মহিমা প্রচার করতে জগতে এসেছিলেন, তিনি বলেছেন, তোমার পিতা যেরকম সম্পূর্ণ তুমি তেমনি সম্পূর্ণ হও।

এ কথাটিও ছোটো কথা নয়। মানবাত্মার সম্পূর্ণতার আদর্শকে তিনি পরমাত্মার মধ্যে স্থাপন করে সেই দিকেই আমাদের লক্ষ স্থির করতে বলেছেন। সেই সম্পূর্ণতার মধ্যেই আমাদের ব্রহ্মবিহার, কোনো ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে নয়। পিতা যেমন সম্পূর্ণ, পুত্র তেমনি সম্পূর্ণ হতে নিয়ত চেষ্টা করবে। এ না হলে পিতাপুত্রে সত্যযোগ হবে কেমন করে।

এই সম্পূর্ণতার যে একটি লক্ষণ নির্দেশ করেছেন সেও বড়ো কম নয়। যেমন বলেছেন, তোমার প্রতিবেশীকে তোমার আপনার মতো ভালোবাসো। কথাটাকে লেশমাত্র খাটো করে বলেন নি। বলেন নি যে প্রতিবেশীকে ভালোবাসো; বলেছেন প্রতিবেশীকে আপনারই মতো ভালোবাসো। যিনি ব্রহ্মবিহার কামনা করেন তাঁকে এই ভালোবাসায় গিয়ে পৌঁছোতে হবে— এই পথেই তাঁকে চলা চাই।

ভগবান যিশু বলেছেন, শত্রুকেও প্রীতি করবে। শত্রুকে ক্ষমা করবে বলে ভয়ে ভয়ে মাঝপথে থেমে যান নি। শত্রুকে প্রীতি করবে বলে তিনি ব্রহ্মবিহার পর্যন্ত লক্ষকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন। বলেছেন, যে তোমার গায়ের জামা কেড়ে নেয় তাকে তোমার উত্তরীয় পর্যন্ত দান করো।

সংসারী লোকের পক্ষে এগুলি একেবারে অত্যুক্তি। তার কারণ, সংসারের চেয়ে বড়ো লক্ষ্যকে সে মনের সঙ্গে বিশ্বাস করে না। সংসারকে সে তার জামা ছেড়ে উত্তরীয় পর্যন্ত দিয়ে ফেলতে পারে যদি তাতে তার সাংসারিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। কিন্তু ব্রহ্মবিহারকে সে যদি প্রয়োজনের চেয়ে ছোটো বলে জানে তবে জামাটুকু দেওয়াও শক্ত হয়।

কিন্তু যাঁরা জীবনের কাছে সেই ব্রহ্মকে সেই সকলের চেয়ে বড়োকেই ঘোষণা করতে এসেছেন তাঁরা তো সংসারী লোকের দুর্বল বাসনার মাপে ব্রহ্মকে অতি ছোটো করে দেখাতে চান নি। তাঁরা সকলের চেয়ে বড়ো কথাকেই অসংকোচে একেবারে শেষ পর্যন্ত বলেছেন।

এই বড়ো কথাকে এত বড়ো করে বলার দরুন তাঁরা আমাদের একটা মস্ত ভরসা দিয়েছেন। এর দ্বারা তাঁরা প্রকাশ করেছেন মনুষ্যত্বের গতি এতদূর পর্যন্তই যায়, তার প্রেম এত বড়োই প্রেম, তার ত্যাগ এত বড়োই ত্যাগ।

অতএব এই বড়ো লক্ষ্য এবং বড়ো পথে আমাদের হতাশ না করে আমাদের সাহস দেবে। নিজের অন্তরতর মাহাত্ম্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাকে বাড়িয়ে দেবে। আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে পূর্ণভাবে উদ্‌বোধিত করে তুলবে।

লক্ষ্যকে অসত্যের দ্বারা কেটে ক্ষুদ্র করলে, উপায়কে দুর্বলতার দ্বারা বেড়া দিয়ে সংকীর্ণ করলে, তাতে আমাদের ভরসাকে কমিয়ে দেয়— যা আমাদের পাবার তা পাই নে, যা পারবার তা পারি নে।

কিন্তু মহাপুরুষেরা আমাদের কাছে যখন মহৎ লক্ষ্য স্থাপিত করেছেন তখন তাঁরা আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। বুদ্ধ আমাদের কারও প্রতি অশ্রদ্ধা অনুভব করেন নি, যখন তিনি বলেছেন— মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং। যিশু আমাদের মধ্যে দীনতমের প্রতিও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নি যখন তিনি বলেছেন, তোমার পিতা যেমন সম্পূর্ণ তুমি তেমনি সম্পূর্ণ হও।

তাঁদের সেই শ্রদ্ধায় আমরা নিজের প্রতি শ্রদ্ধালাভ করি। তখন আমরা ভূমাকে পাবার এই দুরূহ পথকে অসাধ্য পথ বলি নে— তখন আমরা তাঁদের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে তাঁদের মাভৈঃ বাণী অনুসরণ করে এই অপরিমাণের মহাযাত্রায় আনন্দের সঙ্গে যাত্রা করি। যিশুর বাণী অত্যুক্তি নয়। যদি শ্রেয় চাও তবে এই সম্পূর্ণসত্যের সম্পূর্ণতাই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করো।

একবার ভিতরের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখো— প্রতিদিন কোনখানে ঠেকছে। একজন মানুষের সঙ্গেও যখন মিলতে যাচ্ছি তখন কত জায়গায় বেধে যাচ্ছে। তার সঙ্গে মিল সম্পূর্ণ হচ্ছে না। অহংকারে ঠেকছে, স্বার্থে ঠেকছে, ক্রোধে ঠেকছে, লোভে ঠেকছে— অবিবেচনার দ্বারা আঘাত

করছি, উদ্ধত হয়ে আঘাত পাচ্ছি। কোনোমতেই সেই নম্রতা মনের মধ্যে আনতে পারছি নে যার দ্বারা আত্মসমর্পণ অত্যন্ত সহজ এবং মধুর হয়। এই বাধা যখন স্পষ্ট রয়েছে দেখতে পাচ্ছি তখন আমার প্রকৃতিতে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলনের বাধা যে অসংখ্য আছে তাতে কি আর সন্দেহ আছে? যাতে আমাকে একটি মানুষের সঙ্গেও সম্পূর্ণভাবে মিলতে দেবে না তাতেই যে ব্রহ্মের সঙ্গেও মিলনের বাধা স্থাপন করবে। যাতে প্রতিবেশী পর হবে তাতে তিনিও পর হবেন, যাতে শত্রুকে আঘাত করব তাতে তাঁকেও আঘাত করব। এইজন্য ব্রহ্মবিহারের কথা বলবার সময় সংসারের কোনো কথাকেই এতটুকু বাঁচিয়ে বলবার জো নেই। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা কিছুই বাঁচিয়ে বলেন নি— হাতে রেখে কথা কন নি। তাঁরা বলছেন, একেবারে নিঃশেষে মরে তবে তাঁতে বেঁচে উঠতে হবে। তাঁদের সেই পথ অবলম্বন করে প্রতিদিন অহংকারের দিকে, স্বার্থের দিকে, আমাদের নিঃশেষে মরতে হবে এবং মৈত্রীর দিকে, প্রেমের দিকে, পরমাত্মার দিকে, অপরিমাণরূপে বাঁচতে হবে। যাঁরা এই মহাপথে যাত্রা করবার জন্য মানবকে নির্ভর দিয়েছেন, একান্ত ভক্তির সঙ্গে প্রণাম করে তাঁদের শরণাপন্ন হই।

১২ চৈত্র

নীড়ের শিক্ষা

এই অপরিমাণ পথটি নিঃশেষ না করে পরমাত্মার কোনো উপলব্ধি নেই, এ কথা বললে মানুষের চেষ্টা অসাড় হয়ে পড়ে। এতদিন তা হলে খোরাক কী? মানুষ বাঁচবে কী নিয়ে?

শিশু মাতৃভাষা শেখে কী করে? মায়ের মুখ থেকে শুনতে-শুনতে খেলতে-খেলতে আনন্দে শেখে।

যতটুকুই সে শেখে— ততটুকুই সে প্রয়োগ করতে থাকে। তখন তার কথাগুলি আধো-আধো, ব্যাকরণ-ভুলে পরিপূর্ণ। তখন সেই অসম্পূর্ণ ভাষায় সে যতটুকু ভাব ব্যক্ত করতে পারে তাও খুব সংকীর্ণ। কিন্তু তবু শিশুবয়সে ভাষা শেখবার এই একটি স্বাভাবিক উপায়।

শিশুর ভাষার এই অশুদ্ধতা এবং সংকীর্ণতা দেখে যদি শাসন করে দেওয়া যায় যে যতক্ষণ পর্যন্ত নিঃশেষে ব্যাকরণের সমস্ত নিয়মে না পাকা হতে পারবে ততক্ষণ ভাষায় শিশুর কোনো অধিকার থাকবে না, ততক্ষণ তাকে কথা শুনতে বা পড়তে দেওয়া হবে না, এবং সে কথা বলতেও পারবে না— তা হলে ভাষাশিক্ষা তার পক্ষে যে কেবল কষ্টকর হবে তা নয়, তার পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠবে।

শিশু মুখে মুখে যে ভাষা গ্রহণ করছে, ব্যাকরণের ভিতর দিয়ে তাকেই আবার তাকে শিখে নিতে হবে, সেটাকে সর্বত্র পাকা করে নিতে হবে, কেবল সাধারণভাবে মোটামুটি কাজ চালাবার জন্যে নয়, তাকে গভীরতর উচ্চতর ব্যাপকতর ভাবে শোনা বলা ও লেখায় ব্যবহার করবার উপযোগী করতে হবে বলে রীতিমত চর্চার দ্বারা শিক্ষা করতে হবে। এক দিকে পাওয়া আর-এক দিকে শেখা। পাওয়াটা মুখের থেকে মুখে, প্রাণের থেকে প্রাণে, ভাবের থেকে ভাবে; আর শেখাটা নিয়মে, কর্মে— সেটা ক্রমে ক্রমে, পদে পদে। এই পাওয়া এবং শেখা দুটোই যদি পাশাপাশি না চলে, তা হলে হয় পাওয়াটা কাঁচা হয়, নয় শেখাটা নীরস ব্যর্থ হতে থাকে।

বুদ্ধদেব কঠোর শিক্ষকের মতো দুর্বল মানুষকে বলেছিলেন, 'এরা ভারি ভুল করে, কাকে কী বোঝে, কাকে কী বলে তার কিছুই ঠিক নেই। তার একমাত্র কারণ এরা শেখবার পূর্বেই পাবার কথা তোলে। অতএব আগে এরা শিক্ষাটা সমাধা করুক, তা হলে যথাসময়ে পাবার জিনিসটা এরা আপনিই পাবে— আগেভাগে চরম কথাটার কোনো উত্থাপনমাত্র এদের কাছে করা হবে না।'

কিন্তু ঐ চরম কথাটি কেবল যে গমাস্থান তা তো নয়, ওটা যে পাথেয়ও বটে। ওটি কেবল স্থিতি দেবে তা নয়, ও যে গতিও দেবে

অতএব আমরা যতই ভুল করি, যাই করি, কেবলমাত্র ব্যাকরণশিক্ষার কথা মানতে পারব না; কেবল পাঠশালায় শিক্ষকের কাছেই শিখব এ চলবে না, মায়ের কাছেও শিক্ষা পাব।

মায়ের কাছে যা পাই তার মধ্যে অনেক শক্ত নিয়ম অজ্ঞাতসারে আপনি অন্তঃসাৎ হয়ে থাকে, সেই সুযোগটুকু কি ছাড়া যায়?

পক্ষিশাবককে একদিন চরে খেতে হবে সন্দেহ নেই, একদিন তাকে নিজের ডানা বিস্তার করে উড়তে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে মার মুখ থেকে সে খাবার খায়। যদি তাকে বলি, যে পর্যন্ত না চরে খাবার শক্তি সম্পূর্ণ হবে সে পর্যন্ত খেতেই পাবে না, তা হলে সে যে শুকিয়ে মরে যাবে।

আমরা যতদিন অশক্ত আছি ততদিন যেমন অল্প অল্প করে শক্তির চর্চা করব, তেমনি প্রতিদিন ঈশ্বরের প্রসাদের জন্যে ক্ষুধিত চঞ্চুপুট মেলতে হবে; তার কাছ থেকে সহজ কৃপার দৈনিক খাদ্যটুকু পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে কলরব করতে হবে। এ ছাড়া উপায় দেখি নে।

এখন তো অনন্তে ওড়বার ডানা পাকা হয় নি, এখন তো নীড়েই পড়ে আছি। ছোটোখাটো কুটোকাটা দিয়ে যে সামান্য বাসা তৈরি হয়েছে এই আমার আশ্রয়। এই আশ্রয়ের মধ্যে বদ্ধ থেকেই অনন্ত আকাশ হতে আহরিত খাদ্যের প্রত্যাশা যদি আমাদের একেবারেই ছেড়ে দিতে হয়, তা হলে আমাদের কী দশা হবে?

তুমি বলতে পারো, 'ঐ খাদ্যের দিকেই যদি তুমি তাকিয়ে থাক তা হলে চিরদিন নিশ্চেষ্ট হয়েই থাকবে, নিজের শক্তির পরিচয় পাবে না।

সে শক্তিকে যে একেবারে চালনা করব না সে কথা বলি নে। ওড়বার প্রয়াসে দুর্বল পাখা আন্দোলন করে তাকে শক্ত করে তুলতে হবে। কিন্তু কৃপার খাদ্যটুকু, প্রেমের পুষ্টিটুকু, প্রতিদিনই সঙ্গে সঙ্গে চাই।

সেটি যদি নিয়মিত লাভ করি তা হলে যখনই পুরোপুরি বল পাব তখন নীড়ে ধরে রাখে এমন সাধ্য কার? দ্বিজশাবকের স্বাভাবিক ধর্মই যে অনন্ত আকাশে ওড়া। তখন নিজের প্রকৃতির গরজেই, সে সংসারনীড়ে বাস করবে বটে, কিন্তু অনন্ত আকাশে বিহার করবে।

এখন সে অক্ষম ডানাটি নিয়ে বাসায় পড়ে পড়ে কল্পনাও করতে পারে না যে, আকাশে ওড়া সম্ভব। তার যে শক্তিটুকু আছে সেইটুকুকে অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দেখলেও সে কেবল ডালে ডালে লাফাবার কথাই মনে করতে পারে। সে যখন তার কোনো প্রবীণ সহোদরের কাছে আকাশে উধাও হবার কথা শোনে তখন সে মনে করে দাদা একটা অত্যুক্তি প্রয়োগ করছেন— যা বলছেন তার ঠিক মানে কখনোই এ নয় যে সত্যিই আকাশে ওড়া। ঐ যে লাফাতে গেলে মাটির সংস্রব ছেড়ে যেটুকু নিরাধার ঊর্ধ্বে উঠতে হয় সেই ওঠাটুকুকেই তাঁরা আকাশে ওড়া বলে প্রকাশ করছেন— ওটা কবিত্বমাত্র, ওর মানে কখনোই এতটা হতে পারে না।

বস্তুত এই সংসারনীড়ের মধ্যে আমরা যে অবস্থায় আছি তাতে বুদ্ধদেব যাকে ব্রহ্মবিহার বলেছেন, ভগবান যিশু যাকে সম্পূর্ণতালাভ বলেছেন, তাকে কোনোমতেই সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে করতে পারি নে।

কিন্তু এ-সব আশ্চর্য কথা তাঁদেরই কথা যাঁরা জেনেছেন, যাঁরা পেয়েছেন। সেই আশ্বাসের আনন্দ যেন একান্ত ভক্তিভরে গ্রহণ করি। আমাদের আত্মা দ্বিজশাবক, সে আকাশে ওড়বার জন্যেই প্রস্তুত হচ্ছে, সেই বার্তা যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের প্রতি যেন শ্রদ্ধা রক্ষা করি— তাঁদের বাণীকে আমরা যেন খর্ব করে তার প্রাণশক্তিকে নষ্ট করবার চেষ্টা না করি। প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে যখন তাঁর প্রসাদসুধা চাইব সেইসঙ্গে এই কথাও বলব, 'আমার ডানাকেও তুমি সক্ষম করে তোলো। আমি কেবল আনন্দ চাই নে, শিক্ষা চাই; ভাব চাই নে, কর্ম চাই।'

১৩ চৈত্র

ভূমা

বুদ্ধকে যখন মানুষ জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় থেকে এই সমস্ত হয়েছে, আমরা কোথা থেকে এসেছি, আমরা কোথায় যাব ; তখন তিনি বললেন, 'তোমার ও-সব কথায় কাজ কী ? আপাতত তোমার যেটা অত্যন্ত দরকার সেইটেতে তুমি মন দাও। তুমি বড়ো দুঃখে পড়েছ, তুমি যা চাও তা পাও না, যা পাও তা রাখতে পারো না, যা রাখ তাতে তোমার আশা মেটে না। এই নিয়ে তোমার দুঃখের অবধি নেই। সেইটে মেটাবার উপায় করে তবে অন্য কথা।' এই বলে দুঃখনিবৃত্তিকেই তিনি পরম লক্ষ্য বলে, তার থেকে মুক্তির পথে আমাদের ডাক দিলেন।

কিন্তু কথা এই যে, একান্ত দুঃখনিবৃত্তিকেই তো মানুষ পরম লক্ষ্য বলে ধরে নিতে পারে না। সে যে তার স্বভাবই নয়। আমি যে স্পষ্ট দেখছি দুঃখকে অঙ্গীকার করে নিতে সে আপত্তি করে না। অনেক সময় গায়ে পড়ে সে দুঃখকে বরণ করে নেয়।

আল্‌প্‌স পর্বতের দুর্গম শিখরের উপর একবার কেবল পদার্পণ করে আসবার জন্যে প্রাণপণ করা তার পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, কিন্তু বিনা কারণে মানুষ সেই দুঃখ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়। এমন দৃষ্টান্ত ঢের আছে।

তার কারণ কী ? তার কারণ এই যে, দুঃখের সম্বন্ধে মানুষের একটা স্পর্ধা আছে। 'আমি দুঃখ সইতে পারি, আমার মধ্যে সেই শক্তি আছে'— এ কথা মানুষ নিজেকে এবং অন্যকে জানাতে চায়।

আসল কথা, মানুষের সকলের চেয়ে সত্য ইচ্ছা হচ্ছে বড়ো হবার ইচ্ছা, সুখী হবার ইচ্ছা নয়। আলেকজান্ডারের হঠাৎ ইচ্ছা হল দুর্গম নদী গিরি মরু সমুদ্র পার হয়ে দিগ্বিজয় করে আসবেন। রাজসিংহাসনের আরাম ছেড়ে এমন দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়ে তাঁকে পথে পথে ঘোরায় কে ? ঠিক রাজ্যলোভ নয়, বড়ো হবার ইচ্ছা— বড়ো হওয়ার দ্বারা নিজের শক্তিকে বড়ো করে উপলব্ধি করা। এই অভিপ্রায়ে মানুষ কোনো দুঃখ থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায় না।

যে লোক লক্ষপতি হবে বলে দিন রাত টাকা জমাচ্ছে— বিশ্রামের সুখ নেই, খাবার সুখ নেই, রাত্রে ঘুম নেই, লাভক্ষতির নিরন্তর আন্দোলনে মনে চিন্তার সীমা নেই— সে কী জন্যে এই অসহ্য কষ্ট স্বীকার করে নিয়েছে ? ধনের পথে যতদূর সম্ভব বড়ো হয়ে ওঠবার জন্যে।

তাকে এ কথা বলা মিথ্যা যে, 'তোমাকে দুঃখনিবারণের পথ বলে দিচ্ছি।' তাকে এ কথাও বলা মিথ্যা যে, 'ভোগের বাসনা ত্যাগ করো, আরামের আকাঙ্ক্ষা মনে রেখো না।' ভোগ এবং আরাম সে যেমন ত্যাগ করেছে এমন আর কে করতে পারে।

বুদ্ধদেব যে দুঃখনিবৃত্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সে পথের একটা সকলের চেয়ে বড়ো আকর্ষণ কী ? সে এই যে, অত্যন্ত দুঃখ স্বীকার করে এই পথে অগ্রসর হতে হয়। এই দুঃখস্বীকারের দ্বারা মানুষ আপনাকে বড়ো করে জানে। খুব বড়োরকম করে ত্যাগ, খুব বড়োরকম করে ব্রতপালনের মাহাত্ম্য মানুষের শক্তিকে বড়ো করে দেখায় বলে মানুষের মন তাতে ধাবিত হয়।

এই পথে অগ্রসর হয়ে যদি সত্যিই এমন কোনো একটি জায়গায় মানুষ ঠেকতে পারত যেখানে একান্ত দুঃখনিবৃত্তির শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই, তা হলে ব্যাকুল হয়ে তাকে জগতে দুঃখের সন্ধানে বেরোতে হত।

অতএব মানুষকে যখন বলি দুঃখনিবৃত্তির উদ্দেশে তোমাকে সমস্ত সুখের বাসনা ত্যাগ করতে হবে তখন সে রাগ করে বলতে পারে 'চাই নে আমি দুঃখনিবৃত্তি।' ওর চেয়ে বড়ো কিছু একটাকে দিতে হবে, কারণ মানুষ বড়োকেই চায়।

সেইজন্যে উপনিষৎ বলেছেন : ভূমৈব সুখং। অর্থাৎ সুখ সুখই নয়, বড়োই সুখ। ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। এই বড়োকেই জানতে হবে, এঁকেই পেতে হবে। এই কথাটির তাৎপর্য যদি ঠিকমত বুঝি তা হলে কখনোই বলি নে যে, চাই নে তোমার বড়োকে।

কেননা, টাকায় বলো, বিদ্যাতে বলো, খ্যাতিতে বলো, কোনো-না-কোনো বিষয়ে আমরা সুখকে

ত্যাগ করে বড়োকেই চাচ্ছি। অথচ যাকে বড়ো বলে চাচ্ছি সে এমন বড়ো নয় যাকে পেয়ে আমার আত্মা বলতে পারে 'আমার সব পাওয়া হল'।

অতএব যিনি ব্রহ্ম, যিনি ভূমা, যিনি সকলের বড়ো, তাঁকেই মানুষের সামনে লক্ষ্যরূপে স্থাপন করলে মানুষের মন তাতে সায় দিতে পারে, দুঃখনিবৃত্তিকে নয়।

কেউ কেউ এ কথা বলতে পারেন তাঁকে উদ্দেশ্যরূপে স্থাপন করলেই কী আর না করলেই কী। এই সিদ্ধি এতই দূরে যে এখন থেকে এ সম্বন্ধে চিন্তা না করলেও চলে। আগে বাসনা দূর করো, শুচি হও, সবল হও— আগে কঠোর সাধনার সুদীর্ঘ পথ নিঃশেষে উত্তীর্ণ হও, তার পরে তাঁর কথা হবে।

যিনি উদ্দেশ্য তাঁকে যদি গোড়া থেকেই সাধনার পথে কিছু-না-কিছু না পাই, তা হলে এই দীর্ঘ অরাজকতার অবকাশে সাধনাটাই সিদ্ধির স্থান অধিকার করে, শুচিতাটাই প্রাপ্তি বলে মনে হয়, অনুষ্ঠানটিই দেবতা হয়ে ওঠে— পদে পদে সকল বিষয়েই মানুষের এই বিপদ দেখা গেছে। অহরহ ব্যাকরণ পড়তে পড়তে মানুষ কেবলই বৈয়াকরণ হয়ে ওঠে, ব্যাকরণ যে সাহিত্যের সোপান সেই সাহিত্যে সে প্রবেশই করে না।

দুধে তেঁতুল দিয়ে সেই দুধকে দধি করবার চেষ্টা করলে হয়তো বহু চেষ্টাতেও সে দুধ না জমে উঠতে পারে, কিন্তু যে দইয়ে তার পরিণতি সেই দই গোড়াতেই যোগ করে দিলে দেখতে-দেখতে দুধ সহজেই দই হয়ে উঠতে থাকে। তেমনি যেটা আমাদের পরিণামে, সেটাকে গোড়াতেই যোগ করে দিলে স্বভাবের সহজ নিয়মে পরিণাম সুসিদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে।

আমরা যাঁকে সাধনার দ্বারা চাই, গোড়াতেই তাঁর হাতে আমাদের হাত সমর্পণ করে দিতে হবে, তিনিই আমাদের হাতে ধরে তাঁরই দিকে নিয়ে চলবেন। তা হলে চলাও আনন্দ, পৌঁছনোও আনন্দ হয়ে উঠবে। তা হলে, অভাব থেকে ভাব হয় না, অসৎ থেকে সৎ হয় না, একেবারে না-পাওয়া থেকে পাওয়া হয় না— এই উপদেশটাকে মেনে চলা হবে। যিনিই আনন্দরূপে আমাদের কাছে চিরদিন ধরা দেবেন, তিনিই কৃপারূপে আমাদের প্রতিদিন ধরে নিয়ে যাবেন।

১৪ চৈত্র

৮

ওঁ

ওঁ শব্দের অর্থ— হাঁ। আছে এবং পাওয়া গেল এই কথাটাকে স্বীকার। কাল আমরা ছান্দোগ্য উপনিষৎ আলোচনা করতে করতে ওঁ শব্দের এই তাৎপর্যের আভাস পেয়েছি।

যেখানে আমাদের আত্মা 'হাঁ'কে পায় সেইখানেই সে বলে ওঁ।

দেবতারা এই হাঁকে যখন খুঁজতে বেরিয়েছিলেন তখন তাঁরা কোথায় খুঁজে শেষে কোথায় পেলেন? প্রথমে তাঁরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে আঘাত করলেন। বললেন চোখে দেখার মধ্যে এই হাঁ'কে পাওয়া যাবে। কিন্তু দেখলেন চোখে দেখার মধ্যে সম্পূর্ণতা নেই— তা হাঁ এবং না'এ খণ্ডিত। তার মধ্যে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতা নেই— তা ভালোও দেখে মন্দও দেখে, খানিকটা দেখে খানিকটা দেখে না; সে দেখে কিন্তু শোনে না।

এমনি করে কান নাক বাক্য মন সর্বত্রই সন্ধান করে দেখলেন, সর্বত্রই খণ্ডতা আছে, সর্বত্রই দ্বন্দ্ব আছে।

অবশেষে প্রাণের প্রাণে গিয়ে যখন পৌঁছোলেন তখন এই শরীরের মধ্যে একটা 'হাঁ' পেলেন। কারণ এই প্রাণই শরীরের সব প্রাণকে অধিকার করে আছে। এই প্রাণের মধ্যেই সকল ইন্দ্রিয়ের সকল শক্তির ঐক্য। এই মহাপ্রাণ যতক্ষণ আছে ততক্ষণই চোখও দেখছে, কানও শুনছে, নাসিকাও ঘ্রাণ করছে। এর মধ্যে যে কেবল একটা 'হাঁ' এবং অন্যটা 'না' হয়ে আছে তা নয়, এর মধ্যে দৃষ্টি শ্রুতি আঘ্রাণ সকলগুলিই এক জায়গায় 'হাঁ' হয়ে আছে। অতএব শরীরের মধ্যে এইখানেই আমরা পেলুম ওঁ। বাস অঞ্জলি ভরে উঠল।

ছান্দোগ্য বলছেন মিথুনের মাঝখানে, অর্থাৎ দুই যেখানে মিলেছে সেইখানেই, এই ওঁ। যেখানে এক দিকে ঋক্ এক দিকে সাম, এক দিকে বাক্য এক দিকে সুর, এক দিকে সত্য এক দিকে প্রাণ ঐক্য লাভ করেছে, সেইখানেই এই পরিপূর্ণতার সংগীত ওঁ।

যাঁর মধ্যে কিছুই বাদ পড়ে নি, যাঁর মধ্যে সমস্ত খণ্ডই অখণ্ড হয়েছে, সমস্ত বিরোধ মিলিত হয়েছে, আমাদের আত্মা তাঁকেই অঞ্জলি জোড় করে হাঁ বলে স্বীকার করে নিতে চায়। তার পূর্বে সে নিজের পরম পরিতৃপ্তি স্বীকার করতে পারে না ; তাকে ঠেকতে হয়, তাকে ঠকতে হয় ; মনে করে ইন্দ্রিয়েই হাঁ, ধনেই হাঁ, মানেই হাঁ। শেষকালে দেখে, এর সব-তাতেই পাপ আছে, দ্বন্দ্ব আছে, 'না' তার সঙ্গে মিশিয়ে আছে।

সকল দ্বন্দ্বের সমাধানের মধ্যে উপনিষৎ সেই পরম পরিপূর্ণকে দেখেছেন বলেই সত্যের এক দিকেই সমস্ত ঝোঁকটা দিয়ে তার অন্য দিকটাকে একেবারে নির্মূল করে দিতে চেষ্টা করেন নি। সেইজন্যে তিনি যেমন বলেছেন

এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।

অর্থাৎ—

আত্মাতেই যিনি নিত্য স্থিতি করছেন তিনিই জানবার যোগ্য, তাঁর পর জানবার যোগ্য আর কিছুই নেই।

তেমনি আবার বলেছেন—

তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

অর্থাৎ—

সেই ধীরেরা যুক্তাত্মা হয়ে সর্বব্যাপীকে সকল দিক হতেই লাভ করে সর্বত্রই প্রবেশ করেন।

'আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি' নয়, কেবল আত্মার মধ্যেই আত্মাকে দেখা নয়, সেই দেখাই আবার সর্বত্রই।

আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে এক সীমায় রয়েছে ভূর্ভুবঃস্বঃ, অন্য সীমায় রয়েছে আমাদের ধী আমাদের চেতনা। মাঝখানে এই দুইকেই একে বেঁধে সেই বরণীয় দেবতা আছেন যিনি এক দিকে ভূর্ভুবঃস্বঃকেও সৃষ্টি করছেন আর-এক দিকে আমাদের ধীশক্তিকেও প্রেরণ করছেন। কোনোটাকেই বাদ দিয়ে তিনি নেই। এইজন্যই তিনি ওঁ।

এইজন্যেই উপনিষৎ বলেছেন যারা অবিদ্যাকেই, সংসারকেই, একমাত্র করে জানে তারা অন্ধকারে পড়ে— আবার যারা বিদ্যাকে, ব্রহ্মজ্ঞানকে, ঐকান্তিক করে বিচ্ছিন্ন করে জানে তারা গভীরতর অন্ধকারে পড়ে। এক দিকে বিদ্যা আর-এক দিকে অবিদ্যা, এক দিকে ব্রহ্মজ্ঞান এবং আর-এক দিকে সংসার। এই দুইয়ের যেখানে সমাধান হয়েছে সেইখানেই আমাদের আত্মার স্থিতি।

দূরের দ্বারা নিকট বর্জিত, নিকটের দ্বারা দূর বর্জিত ; চলার দ্বারা থামা বর্জিত, থামার দ্বারা চলা বর্জিত ; অন্তরের দ্বারা বাহির বর্জিত, বাহিরের দ্বারা অন্তর বর্জিত। কিন্তু—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।

তিনি চলেন অথচ চলেন না, তিনি দূরে অথচ নিকটে, তিনি সকলের অন্তরে অথচ তিনি সকলের বাহিরেও।

অর্থাৎ চলা না-চলা দূর নিকট, ভিতর বাহির, সমস্তর মাঝখানে সমস্তকে নিয়ে তিনি ; কাউকে ছেড়ে তিনি নন। এইজন্যই তিনি ওঁ।

তিনি প্রকাশ ও অপ্রকাশের মাঝখানে। এক দিকে সমস্তই তিনি প্রকাশ করছেন, আর-এক দিকে কেউ তাঁকে প্রকাশ করে উঠতে পারছে না। তাই উপনিষদ বলেন—

> ন তত্র সূর্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং
> নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
> তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।

সেখানে সূর্য আলো দেয় না, চন্দ্র তারাও না, এই বিদ্যুৎসকলও দীপ্তি দেয় না, কোথায় বা আছে এই অগ্নি— তিনি প্রকাশিত তাই সমস্ত প্রকাশমান, তাঁর আভাতেই সমস্ত বিভাত।

তিনি শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। শান্তম্ বলতে এ বোঝায় না সেখানে গতির সংস্রব নেই। সকল বিরুদ্ধ গতিই সেখানে শান্তিতে ঐক্যলাভ করেছে। কেন্দ্রাতিগ এবং কেন্দ্রানুগ গতি, আকর্ষণের গতি এবং বিকর্ষণের গতি, পরস্পরকে কাটতে চায় কিন্তু এই দুই বিরুদ্ধ গতিই তাঁর মধ্যে অবিরুদ্ধ বলেই তিনি শান্তম্। আমার স্বার্থ তোমার স্বার্থকে মানতে চায় না, তোমার স্বার্থে আমার স্বার্থকে মানতে চায় না, কিন্তু মাঝখানে যেখানে মঙ্গল সেখানে তোমার স্বার্থই আমার স্বার্থ এবং আমার স্বার্থই তোমার স্বার্থ। তিনি শিব, তাঁর মধ্যে সকলেরই স্বার্থ মঙ্গলে নিহিত রয়েছে। তিনি অদ্বিতীয়, তিনি এক। তার মানে এ নয় যে, তবে এ-সমস্ত কিছুই নেই। তার মানে, এই সমস্তই তাঁতে এক। আমি বলছি 'আমি তুমি নয়', তুমি বলছ তুমি আমি নয়, এমন বিরুদ্ধ আমাকে-তোমাকে এক করে রয়েছেন সেই অদ্বৈতম্।

মিথুন যেখানে মিলেছে, সেইখানেই হচ্ছেন তিনি— কেউ যেখানে বর্জিত হয় নি সেইখানেই তিনি। এই যে পরিপূর্ণতা, যা সমস্তকে নিয়ে অথচ যা কোনো খণ্ডকে আশ্রয় করে নয়— যা চন্দ্রে নয়, সূর্যে নয়, মানুষে নয় অথচ সমস্ত চন্দ্র সূর্য মানুষে— যা কানে নয়, চোখে নয়, বাক্যে নয়, মনে নয় অথচ সমস্ত কানে চোখে বাক্যে মনে— সেই এককেই, সেই হাঁ'কেই— সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সেই পরিপূর্ণতাকেই স্বীকার হচ্ছে ওঙ্কার।

১৫ চৈত্র

স্বভাবলাভ

মানুষের একদিন ছিল যখন সে যেখানে কিছু অদ্ভুত দেখত সেইখানে ঈশ্বরের কল্পনা করত। যদি দেখলে কোথাও জলের থেকে আগুন উঠছে অমনি সেখানে পূজার আয়োজন করত। তখন সে কোনো একটা অসামান্য লক্ষণ দেখে বা কল্পনা করে বলত অমুক মানুষে দেবতা ভর করেছেন, অমুক গাছে দেবতার আবির্ভাব হয়েছে, অমুক মূর্তিতে দেবতা জাগ্রত হয়ে আছেন।

ক্রমে অখণ্ড বিশ্বনিয়মকে চরাচরে যখন সর্বত্র এক বলে দেখবার শিক্ষা মানুষের হল তখন সে জানতে পারল যে, যাকে অসামান্য বলে মনে হয়েছিল সেও সামান্য নিয়ম হতে ভ্রষ্ট নয়। তখনই ব্রহ্মের আবির্ভাবকে অখণ্ডভাবে সর্বত্র ব্যাপ্ত করে দেখবার অধিকার সে লাভ করল। এবং সেই বিরাট অবিচ্ছিন্ন ঐক্যের ধারণায় সে আনন্দ ও আশ্রয় পেল। তখনই মানুষের জ্ঞান প্রেম কর্ম মোহমুক্ত হয়ে প্রশস্ত এবং প্রসন্ন হয়ে উঠল। তার ধর্ম থেকে, সমাজ থেকে, রাজ্য থেকে মূঢ়তা ক্ষুদ্রতা দূর হতে লাগল।

এই দেখা হচ্ছে ব্রহ্মকে সর্বত্র দেখা, স্বভাবে দেখা।

কিন্তু সমস্ত স্বভাব থেকে চুরি করে এনে তাঁকে স্বেচ্ছাপূর্বক কোনো একটা কৃত্রিমতার মধ্যে বিশেষ করে দেখবার চেষ্টা এখনো মানুষের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এমন-কি, কেউ কেউ স্পর্ধা করে বলেন সেইরকম করে দেখাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট দেখা। সব রূপ হতে ছাড়িয়ে একটি কোনো বিশেষরূপে, সব মানুষ হতে সরিয়ে একটি কোনো বিশেষ মানুষে, ঈশ্বরকে পূজা করাই তাঁরা বলেন পূজার চরম।

জানি মানুষ এরকম কৃত্রিম উপায়ে কোনো একটা হৃদয়বৃত্তিকে অতিপরিমাণে বিক্ষুব্ধ করে তুলতে পারে, কোনো একটা রসকে অত্যন্ত তীব্র করে দাঁড় করাতে পারে। কিন্তু সেইটে করাই কি সাধনার লক্ষ্য ?

অনেক সময় দেখা যায় অন্ধ হলে স্পর্শশক্তি অতিরিক্ত বেড়ে যায়। কিন্তু সেইরকম এক দিকের চুরির দ্বারা অন্য দিককে উপচিয়ে তোলাকেই কি বলে শক্তির সার্থকতা ? যে দিকটা নষ্ট হল সে দিকটার হিসাব কি দেখতে হবে না ? সে দিকের দণ্ড হতে কি আমরা নিষ্কৃতি পাব ?

কোনোপ্রকার বাহ্য ও সংকীর্ণ উপায়ের দ্বারা সম্মোহনকে মেস্‌মেরিজ্‌মকে ধর্মসাধনার প্রধান অঙ্গ করে তুললে আমাদের চিত্ত স্বাস্থ্য থেকে, স্বভাব থেকে, সুতরাং মঙ্গল থেকে বিচ্যুত হবেই হবে। আমরা ওজন হারাব— আমরা যে দিকটাতে এইরকম অসংগত ঝোঁক দেব সেই দিকটাকেই বিপর্যস্ত করে দেব।

বস্তুত স্বভাবের পরিপূর্ণতাকে লাভ করাই ধর্ম ও ধর্মনীতির শ্রেষ্ঠ লাভ। মানুষ নানা কারণে তার স্বভাবের ওজন রাখতে পারে না, সে সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলে— এই তো তার পাপের মূল এবং ধর্মনীতি তো এইজন্যই তাকে সংযমে প্রবৃত্ত করে।

এই সংযমের কাজটা কী ? প্রবৃত্তিকে উন্মূল করা নয়, প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করা। কোনো একটা প্রবৃত্তি যখন বিশেষরূপ প্রশ্রয় পেয়ে স্বভাবের সামঞ্জস্যকে পীড়িত করে তখনই পাপের উৎপত্তি হয়। অর্জনস্পৃহা যখন অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠে টাকা অর্জনের দিকেই মানুষের শক্তিকে একান্ত বাঁধতে চায় তখনই সেটা লোভ হয়ে দাঁড়ায়। তখনই সে মানুষের চিত্তকে তার সমস্ত স্বাভাবিক দিক থেকে চুরি করে এই দিকেই জড়ো করে। এই প্রকারে স্বভাব থেকে যে-ব্যক্তি ভ্রষ্ট হয় সে কখনোই যথার্থ মঙ্গলকে পায় না, সুতরাং ঈশ্বরকে লাভ তার পক্ষে অসাধ্য। কোনো মানুষের প্রতি অনুরাগ যখন স্বভাব থেকে আমাদের বিচ্যুতি করে তখনই তা কাম হয়ে ওঠে। সেই কাম আমাদের ঈশ্বরলাভের বাধা।

এইজন্য সামঞ্জস্য থেকে, বিকৃতি থেকে, মানুষের চিত্তকে স্বভাবে উদ্ধার করাই হচ্ছে ধর্মনীতির একান্ত চেষ্টা।

উপনিষদে ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলবার সময় যখন তাঁকে অপাপবিদ্ধ বলা হয়েছে তখন তার তাৎপর্য এই। তিনি স্বভাবে অবাধে পরিব্যাপ্ত। পাপ তাঁকে কোনো একটা বিশেষ সংকীর্ণতায় আকৃষ্ট আবদ্ধ করে অন্যত্র থেকে পরিহরণ করে নেয় না— এই গুণেই তিনি সর্বব্যাপী। আমাদের মধ্যে পাপ সমগ্রের ক্ষতি করে কোনো-একটাকেই স্ফীত করতে থাকে। তাতে করে কেবল যে নিজের স্বভাবের মধ্যে নিজের সামঞ্জস্য থাকে না তা নয়, চারি দিকের সঙ্গে সমাজের সঙ্গে আমাদের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায়।

ধর্মনীতিতে আমরা এই যে স্বভাবলাভের সাধনায় প্রবৃত্ত আছি, সমাজ এবং নীতি শাস্ত্র এজন্যে দিনরাত তাড়না করছে। এইখানেই কি এর শেষ ? ঈশ্বরসাধনাতেও কি এই নিয়মের স্থান নেই ? সেখানেও কি আমরা কোনো-একটি ভাবকে কোনো-একটি রসকে সংকীর্ণ অবলম্বনের দ্বারা অতিমাত্র আন্দোলিত করে তোলাকেই মানুষের একটি চরম লাভ বলে গণ্য করব ?

দুর্বলের মনে একটা উত্তেজনা জাগিয়ে তার হৃদয়কে প্রলুব্ধ করবার জন্যে এই-সকল উপায়ের প্রয়োজন এমন কথা অনেকে বলেন।

যে লোক মদ খেয়ে আনন্দ পায় তার সম্বন্ধে কি আমরা ঐরূপ তর্ক করতে পারি ? আমরা কি বলতে পারি মদেই যখন ও বিশেষ আনন্দ পায় তখন ঐটেই ওর পক্ষে শ্রেয়।

ভুঞ্জীথাঃ, তিনি যা দান করেছেন তাই ভোগ করবে। মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং, আর কারো ধনে লোভ করবে না।

এর মানে হচ্ছে এই যে, যেমন জগতে যা-কিছু আছে তার সমস্তই তিনি পরিপূর্ণ করে আছেন এইটেই উপলব্ধি করতে হবে, তেমনি তুমি যা-কিছু পেয়েছ সমস্তই তিনি দিয়েছেন বলে জানতে হবে। তা হলেই কী হবে ? না, তুমি যা-কিছু পেয়েছ তার মধ্যেই তোমার পাওয়া তৃপ্ত হবে। আরো কিছু যোগ করে দাও এটা আমাদের প্রার্থনার বিষয় নয়— কারণ সেরকম দিয়ে দেওয়ার শেষ কোথায় ? কিন্তু আমি যা-কিছু পেয়েছি সমস্তই তিনি দিয়েছেন এইটেই যেন উপলব্ধি করতে পারি। তা হলেই অল্পই হবে বহু, তা হলেই সীমার মধ্যে অসীমকে পাব। নইলে সীমাকেই ক্রমাগত জুড়ে জুড়ে বড়ো করে কখনোই অসীমকে পাওয়া যায় না— এবং কোটির পরে কোটিকে উপাসনা করেও সেই একের উপাসনায় গিয়ে পৌঁছোনো যেতে পারে না। জগতের সমস্ত খণ্ড প্রকাশ সার্থকতা লাভ করেছে তাঁর অখণ্ড প্রকাশে এবং আমাদের অসংখ্য ভোগের বস্তু সার্থকতা লাভ করেছে তাঁরই দানে। এইটেই ঠিকমত জানতে পারলে ঈশ্বরকে পাবার জন্যে কোনো বিশেষ স্থানের কোনো বিশেষ রূপের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে হয় না। এবং ভোগের তৃপ্তিহীন স্পৃহা মেটাবার জন্যে কোনো বিশেষ ভোগের সামগ্রীর জন্যে বিশেষভাবে লোলুপ হয়ে উঠতে হয় না।

১৭ চৈত্র

আত্মসমর্পণ

তাই বলছিলুম, ব্রহ্মকে ঠিক পাওয়ার কথাটা বলা চলে না। কেননা তিনি তো আপনাকে দিয়েই বসে আছেন— তাঁর তো কোনোখানে কমতি নেই— এ কথা তো বলা চলে না যে, এই জায়গায় তাঁর অভাব আছে, অতএব আর-এক জায়গায় তাঁকে খুঁজে বেড়াতে হবে।

অতএব ব্রহ্মকে পেতে হবে এ কথাটা বলা ঠিক চলে না— আপনাকে দিতে হবে বলতে হবে। ঐখানেই অভাব আছে— সেইজন্যেই মিলন হচ্ছে না। তিনি আপনাকে দিয়েছেন, আমরা আপনাকে দিই নি। আমরা নানা প্রকার স্বার্থের, অহংকারের, ক্ষুদ্রতার বেড়া দিয়ে নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র, এমন-কি, বিরুদ্ধ করে রেখেছি।

এইজন্যই বুদ্ধদেব এই স্বাতন্ত্র্যের অতি কঠিন বেষ্টন নানা চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে ক্ষয় করে ফেলবার উপদেশ করেছেন। এর চেয়ে বড়ো সত্তা বড়ো আনন্দ যদি কিছুই না থাকে, তা হলে এই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিরন্তর অভ্যাসে নষ্ট করে ফেলবার কোনো মানে নেই। কারণ, কিছুই যদি না থাকে তা হলে তো আমাদের এই অহং, এই ব্যক্তিগত বিশেষত্বই, একেবারে পরম লাভ— তা হলে একে আঁকড়ে না রেখে এত করে নষ্ট করব কেন ?

কিন্তু আসল কথা এই যে, যিনি পরিপূর্ণরূপে নিজেকে দান করেছেন আমরাও তাঁর কাছে পরিপূর্ণরূপে নিজেকে দান না করলে তাঁকে প্রতিগ্রহ করাই হবে না। আমাদের দিকেই বাকি আছে।

তাঁর উপাসনা তাঁকে লাভ করবার উপাসনা নয়— আপনাকে দান করবার উপাসনা। দিনে দিনে ভক্তি-দ্বারা, ক্ষমা-দ্বারা, সন্তোষের দ্বারা, সেবার দ্বারা তাঁর মধ্যে নিজেকে মঙ্গলে ও প্রেমে বাধাহীনরূপে ব্যাপ্ত করে দেওয়াই তাঁর উপাসনা।

অতএব আমরা যেন না বলি যে তাঁকে পাচ্ছি নে কেন, আমরা যেন বলতে পারি তাঁকে দিচ্ছি নে কেন ? আমাদের প্রতিদিনের আক্ষেপ হচ্ছে এই যে—

আমার যা আছে আমি সকল দিতে
পারি নি তোমারে নাথ।

তাও আমার মধ্যে আছে। তাকে ধরতে পারি নে, ছুঁতে পারি নে, কিন্তু তা একটি রহস্যময় পদার্থরূপে আমার মধ্যে রয়েছে।

একে আমি বলি শক্তি। আমার দেহের শক্তি যে কেবল বর্তমানেই দেহকে প্রকাশ করে কৃতার্থ হয়ে বসে আছে তা নয়— সেই শক্তি দশ বৎসরের পরেও আমার এই দেহকে পুষ্ট করবে, বর্ধিত করবে। যে পরিণাম এখন উপস্থিত নেই সেই পরিণামের দিকে শক্তি আমাকে বহন করবে।

আমাদের মানসিক শক্তিরও এইরূপ প্রকৃতি। আমাদের চিন্তাশক্তি যে কেবলমাত্র আমাদের চিন্তিত বিষয়গুলির মধ্যেই সম্পূর্ণ পর্যাপ্ত তা নয়— যা চিন্তা করি নি, ভবিষ্যতে করব, তার সম্বন্ধেও সে আছে। যা চিন্তা করতে পারতুম, প্রয়োজন উপস্থিত হলে যা চিন্তা করতুম, তার সম্বন্ধেও সে আছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যা প্রত্যক্ষ সত্যরূপে বর্তমান, তার মধ্যে আর একটি পদার্থ বিদ্যমান যা তাকে অতিক্রম করে অনাদি অতীত হতে অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে ব্যাপ্ত।

এই যে শক্তি, যা আমাদের সত্যকে নিশ্চল জড়ত্বের মধ্যে নিঃশেষ করে রাখে নি, যা তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে তাকে অনন্তের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, এ যে কেবলমাত্র গতিরূপে অহরহ আপনাকে অনাগতের অভিমুখে প্রকাশ করে চলেছে তা নয়, এর আর-একটি ভাব দেখছি। এ একের সঙ্গে আরকে, ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টিকে যোজনা করছে।

যেমন আমাদের দেহের শক্তি। এ যে কেবল আমাদের আজকের এই দেহকে কালকের দেহের মধ্যে পরিণত করছে তা নয়, এ আমাদের দেহটিকে নিরন্তর একটি সমগ্রদেহ করে বেঁধে রাখছে। এ এমন করে কাজ করছে যাতে আমাদের শরীরের "আজ"ই একান্ত হয়ে না দাঁড়ায়, শরীরের "কাল"ও আপনার দাবি রক্ষা করতে পারে— তেমনি আমাদের শরীরের একাংশই একান্ত হয়ে না ওঠে, শরীরের অন্যাংশের সঙ্গে তার এমন সম্বন্ধ থাকে যাতে পরস্পর পরস্পরের সহায় হয়। পায়ের জন্যে হাত মাথা পেট সকলেই খাটছে, আবার হাত মাথা পেটের জন্যেও পা খেটে মরছে। এই শক্তি হাতের স্বার্থকে পায়ের স্বার্থ করে রেখেছে, পায়ের স্বার্থকে হাতের স্বার্থ করে রেখেছে।

এইটিই হচ্ছে শরীরের পক্ষে মঙ্গল। তার প্রত্যেক প্রত্যঙ্গ সমস্ত অঙ্গকে রক্ষা করছে, সমগ্র অঙ্গ প্রত্যেক প্রত্যঙ্গকে পালন করছে। অতএব শক্তি আয়ুরূপে শরীরকে অনাগত পরিণামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং মঙ্গলরূপে তাকে অখণ্ড সমগ্রতায় বন্ধন করছে, ধারণ করছে।

এই শক্তির প্রকাশ শুধু যে মঙ্গলে তা তো নয়, কেবল যে তার দ্বারা যন্ত্রের মতো রক্ষাকার্য চলে যাচ্ছে তা নয়, এর মধ্যে আবার একটি আনন্দ রয়েছে।

আয়ুর মধ্যে আনন্দ আছে। সমগ্র শরীরের মঙ্গলের মধ্যে, স্বাস্থ্যের মধ্যে, একটি আনন্দ আছে।

এই আনন্দকে ভাগ করলে দুটি জিনিস পাওয়া যায়, একটি হচ্ছে জ্ঞান এবং আর একটি প্রেম।

আমার মধ্যে যে একটি সমগ্রতা আছে তার সঙ্গে জ্ঞান আছে। সে জানছে আমি হচ্ছি আমি, আমি হচ্ছি একটি সম্পূর্ণ আমি।

শুধু জানছে নয়, এই জানায় তার একটি প্রীতি আছে। এই একটি সম্পূর্ণতাকে সে এত ভালোবাসে যে এর কোনো ক্ষতি সে সহ্য করতে পারে না ; এর মঙ্গলে তার লাভ, এর সেবায় তার আনন্দ।

তা হলে দেখতে পাচ্ছি শক্তি একটি সমগ্রতাকে বাঁধছে, রাখছে এবং তাকে অহরহ একটি ভাবী সম্পূর্ণতার দিকে চালনা করে নিয়ে যাচ্ছে।

তার পরে দেখতে পাচ্ছি এই-যে সমগ্রতা, যার মধ্যে একটি সক্রিয় শক্তি অংশ প্রত্যংশকে এক করে রয়েছে, অতীত অনাগতকে এক করে রয়েছে— সেই শক্তির মধ্যে কেবল যে মঙ্গল রয়েছে, অর্থাৎ সত্য কেবল সমগ্র আকারে রক্ষা পাচ্ছে ও পরিণতি লাভ করছে তা নয়, তার মধ্যে একটি আনন্দ রয়েছে। অর্থাৎ তার মধ্যে একটি সমগ্রতার জ্ঞান এবং সমগ্রতার প্রেম আছে। সে সমস্তকে জানে এবং সমস্তকে ভালোবাসে।

যেটি আমার নিজের মধ্যে দেখছি, ঠিক এইটেই আবার সমাজের মধ্যে দেখছি। সমাজসত্তার ভিতরে একটি শক্তি বর্তমান, যা সমাজকে কেবলই বর্তমানে আবদ্ধ করছে না, তাকে তার ভাবী

পায়। এইজন্যই পরমাত্মাকে "একান্তপ্রত্যয়সারং" বলা হয়েছে। অর্থাৎ নিজের প্রতি আত্মার যে একটি সহজ প্রত্যয় আছে সেই প্রত্যয়েরই সার হচ্ছেন তিনি। আমাদের আত্মা যে স্বভাবতই নিজেকে এক বলে জানে, সেই এক জানারই সার হচ্ছে পরম একেকে জানা। তেমনি আমাদের যে একটি আত্মপ্রেম আছে, আত্মাতে আত্মার আনন্দ, এই আনন্দই হচ্ছে মানবাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি, বিশ্বাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি, পরমাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি। অর্থাৎ এই আত্মপ্রেমেরই পরিপূর্ণতম সত্যতম বিকাশ হচ্ছে পরমাত্মার প্রতি প্রেম— সেই ভূমানন্দেই আত্মার আনন্দের পরিণতি। আমাদের আত্মপ্রেমের চরম সেই পরমাত্মায় আনন্দ। তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতর যদয়মাত্মা।

২১ চৈত্র

ধীর যুক্তাত্মা

এই কথাটিকে আলোচনা করে কেবল কঠিন করে তোলা হচ্ছে। অথচ এইটিই আমাদের সকলের চেয়ে সহজ কথা— একেবারে গোড়াকার প্রথম কথা এবং শেষের শেষ কথা। আমরা নিজের মধ্যে একটি এক পেয়েছি এবং একেকেই আমরা বহুর মধ্যে সর্বত্রই খুঁজে বেড়াচ্ছি। এমন-কি, শিশু যখন নানা জিনিসকে ছুঁয়ে শুঁকে খেয়ে দেখবার জন্যে চারি দিকে হাত বাড়াচ্ছে তখনো সে সেই একেকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমরাও শিশুরই মতো নানা জিনিসকে ছুঁচ্ছি, শুঁকছি, মুখে দিচ্ছি, তাকে আঘাত করছি, তার থেকে আঘাত পাচ্ছি, তাকে জমাচ্ছি এবং তাকে আবর্জনার মতো ফেলে দিচ্ছি। এইসমস্ত পরীক্ষা এই-সমস্ত চেষ্টার ভিতর দিয়ে সমস্ত দুঃখে সমস্ত লাভে আমরা সেই একেকেই চাচ্ছি। আমাদের জ্ঞান একে পৌঁছোতে চায়, আমাদের প্রেম একে মিলতে চায়। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো কথা নেই।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দ আপনাকে নানারূপে নানাকালে প্রকাশ করছেন, আমরা সেই নানারূপকেই কেবল দেখছি, কিন্তু আমাদের আত্মা দেখতে চায় নানার ভিতর দিয়ে সেই মূল এক আনন্দকে। যতক্ষণ সেই মূল আনন্দের কোনো আভাস না দেখি ততক্ষণ কেবলই বস্তুর পর বস্তু— ঘটনার পর ঘটনা আমাদের ক্লান্ত করে, ক্লিষ্ট করে, আমাদের অন্তহীন পথে ঘুরিয়ে মারে। আমাদের বিজ্ঞান সমস্ত বস্তুর মধ্যে এক সত্যকে খুঁজছে, আমাদের ইতিহাস সমস্ত ঘটনার মধ্যে এক অভিপ্রায়কে খুঁজছে, আমাদের প্রেম সমস্ত সত্তার মধ্যে এক আনন্দকে খুঁজছে। নইলে সে কোনোখানেই বলতে পারছে না— ওঁ। বলতে পারছে না— হাঁ, পাওয়া গেল।

আমরা যখন একটা অন্ধকার ঘরে আমাদের প্রার্থনীয় বস্তুকে খুঁজে বেড়াই তখন চারি দিকে মাথা ঠুকতে থাকি, উঁচট খেতে থাকি, তখন কত ছোটো জিনিসকে বড়ো মনে করি, কত তুচ্ছ জিনিসকে বহুমূল্য বলে মনে করি, কত জিনিসকে আঁকড়ে ধরে বলি 'এই তো পেয়েছি'— তার পরে দেখি মুঠোর মধ্যেই সেটা গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যায়।

আসল কথা, এই অন্ধকারে আমি জানিই নে আমি কাকে চাচ্ছি। কিন্তু যেমনি একটি আলো জ্বালা হয় অমনি এক মুহূর্তেই সমস্ত সহজ হয়ে যায়— অমনি এতদিনের এত খোঁজা, এত মাথা ঠোকার পরে এক পলকেই জানতে পারি যে, যা সমস্ত আমার হাতে ঠেকছিল তাই আমার প্রার্থনীয় জিনিস নয়। যে মা এই সমস্ত ঘরটি সাজিয়ে চুপ করে বসেছিলেন তিনিই আমার যথার্থ কামনার ধন। যেমনি আলোটি জ্বলল অমনি সব জিনিস ছেড়ে দু-হাত বাড়িয়ে ছুটে তাঁর কাছে গেলুম।

অথচ মাকে পাবামাত্রই অমনি তাঁর সঙ্গে সব জিনিসকেই একত্রে পাওয়া গেল, কোনো জিনিস স্বতন্ত্র হয়ে আমার পথের বাধারূপে আমাকে আটক করলে না। মাকে জানবামাত্র মায়ের এই সাজানো ঘরটি আমারই হয়ে গেল। তখন ঘরের সমস্ত আসবাবপত্রের মধ্যে আমার সঞ্চরণ অবাধ হয়ে উঠল,

নিজেকে নিয়মের পথে দৃঢ় করে ধরে রাখবার সাধনা অনেক জায়গায় দেখা যায়, কিন্তু নিজেকে তাঁর হাতে সমর্পণ করে দেবার সাধনা অল্পই দেখতে পাই। এখানেও মানুষের যেন একটা কৃপণতা আছে। সে নিজেকে নিজের হাতে রাখতে চায় ছাড়তে চায় না। একটা কোনো কঠোর ব্রতে সে প্রতিদিন নিজের শক্তির পরিচয় পায়। প্রতিদিন একটা হিসাব পেতে থাকে যে, নিয়ম দৃঢ় রেখে এতখানি চলা হল। এতেই তার একটা বিশেষ অভিমানের আনন্দ আছে।

নিজের জীবনকে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করে দেবার এ মানে নয় যে, আমি যা করছি সমস্তই তিনি করছেন এইটি কল্পনা করা। করছি কাজ আমি, অথচ নিচ্ছি তাঁর নাম, এবং দায়িক করছি তাঁকে— এমন দুর্বিপাক না যেন ঘটে।

ঈশ্বরের হাওয়ার কাছে জীবনটাকে একেবারে ঠিক করে ধরে রাখতে হবে। সেটিকে সম্পূর্ণ মানতে হবে। কাত হয়ে সেটিকে পাশ কাটিয়ে চললে হবে না। তাঁর আহ্বান তাঁর প্রেরণাকে পুরাপুরি গ্রহণ করবার মুখে জীবন প্রতিমুহূর্তে যেন আপনাকে প্রসারিত করে রাখে। "কী ইচ্ছা, প্রভু, কী আদেশ" এই প্রশ্নটিকে জাগ্রত করে রেখে সে যেন সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকে। যা শ্রেয় তা যেন সহজেই তাকে চালায় এবং শেষ পর্যন্তই তাকে নিয়ে যায়।

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

এ শ্লোকের মানে এমন নয় যে, আমি ধর্মেই থাকি আর অধর্মেই থাকি তুমি আমাকে যেমন চালাচ্ছ আমি তেমনি চলছি। এর ভাব এই যে, আমার প্রবৃত্তির উপরেই যদি আমি ভার দিই তবে সে আমাকে ধর্মের দিকে নিয়ে যায় না, অধর্ম থেকে নিরস্ত করে না ; তাই হে প্রভু, স্থির করেছি তোমাকেই আমি হৃদয়ে রাখব এবং তুমি আমাকে যে দিকে চালাবে সেই দিকে চলব। স্বার্থ আমাকে যে দিকে চালাতে চায় সে দিকে চলব না, অহংকার আমাকে যে পথ থেকে নিবৃত্ত করতে চায় আমি সে পথ থেকে নিবৃত্ত হব না।

অতএব তাঁকে হৃদয়ের মধ্যে স্থাপিত করে তাঁর হাতে নিজের ভার সমর্পণ করা, প্রত্যহ আমাদের ইচ্ছাশক্তির এই একটিমাত্র সাধনা হোক।

এইটি করতে গেলে গোড়াতেই অহংকারকে তার চূড়ার উপর থেকে একেবারে নামিয়ে আনতে হবে। পৃথিবীর সকলের সঙ্গে সমান হও, সকলের পিছনে এসে দাঁড়াও, সকলের নীচে গিয়ে বোসো, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। তোমার দীনতা ঈশ্বরের প্রসাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক, তোমার নম্রতা সুমধুর অমৃতফলভারে সার্থক হোক। সর্বদা লড়াই করে নিজের জন্যে ঐ একটুখানি স্বতন্ত্র জায়গা বাঁচিয়ে রাখবার কী দরকার, তার কী মূল্য? জগতের সকলের সমান হয়ে বসতে লজ্জা কোরো না— সেইখানেই তিনি বসে আছেন। যেখানে সকলের চেয়ে উঁচু হয়ে থাকবার জন্যে তুমি একলা বসে আছ সেখানে তাঁর স্থান অতি সংকীর্ণ।

যতদিন তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ না করবে ততদিন তোমার হার-জিত তোমার সুখদুঃখ ঢেউয়ের মতো কেবলই টলাবে, কেবলই ঘোরাবে। প্রত্যেকটা পুরো আঘাত তোমাকে নিতে হবে। যখন তোমার পালে তাঁর হাওয়া লাগবে তখন তরঙ্গ সমানই থাকবে, কিন্তু তুমি হু হু করে চলে যাবে। তখন সেই তরঙ্গ আনন্দের তরঙ্গ। তখন প্রত্যেক তরঙ্গটি কেবল তোমাকে নমস্কার করতে থাকবে এবং এই কথাটিরই প্রমাণ দেবে যে, তুমি তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছ।

তাই বলছিলুম জীবনযাত্রার সাধনায় নিজের শক্তির চর্চা যতই করি, ঈশ্বরের চিরপ্রবাহিত অনুকূল দক্ষিণ বায়ুর কাছে সমস্ত পালগুলি একেবারেই পূর্ণভাবে ছড়িয়ে দেবার কথাটা না ভুলি যেন।

২৪ চৈত্র

নমস্তেহস্তু

কোনো লতা গোল গোল আঁকড়ি দিয়ে আপনার আশ্রয়কে বেষ্টন করে, কোনো লতা সরু সরু শিকড় মেলে দিয়ে আশ্রয়কে চেপে ধরে, কোনো লতা নিজের সমস্ত দেহকে দিয়েই তার অবলম্বনকে ঘিরে ফেলে।

আমরাও যে-সকল সম্বন্ধ দিয়ে ঈশ্বরকে ধরব তা একরকম নয়। আমরা তাঁকে পিতাভাবেও আশ্রয় করতে পারি, প্রভুভাবেও পারি, বন্ধুভাবেও পারি। জগতে যতরকম সম্বন্ধসূত্রেই আমরা নিজেকে বাঁধি সমস্তের মূলে তিনিই আছেন। যে-রসের দ্বারা সেই-সকল সম্বন্ধ পুষ্ট হয় সে রস তাঁরই। এইজন্যে সব সম্বন্ধই তাঁতে খাটতে পারে, সকল রকম ভাব দিয়েই মানুষ তাঁকে পেতে পারে।

সব সম্বন্ধের মধ্যে প্রথম সম্বন্ধ হচ্ছে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ।

পিতা যত বড়োই হোন আর পুত্র যত ছোটোই হোক, উভয়ের মধ্যে শক্তির যতই বৈষম্য থাক্, তবু উভয়ের মধ্যে গভীরতর ঐক্য আছে। সেই ঐক্যটির যোগেই এতটুকু ছেলে তার এত বড়ো বাপকে লাভ করে।

ঈশ্বরকেও যদি পেতে চাই তবে তাঁকে একটি কোনো সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে পেতে হবে, নইলে তিনি আমাদের কাছে কেবলমাত্র একটি দর্শনের তত্ত্ব, ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হয়ে থাকবেন, আমাদের আপন হয়ে উঠবেন না।

তিনি তো কেবল আমাদের বুদ্ধির বিষয় নন, তিনি তার চেয়ে অনেক বেশি ; তিনি আমাদের আপন। তিনি যদি আমাদের আপন না হতেন তা হলে সংসারে কেউ আমাদের আপন হত না, তা হলে আপন কথাটার কোনো মানেই থাকত না। তিনি যেমন বৃহৎ সূর্যকে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর আপন করে এত লক্ষ যোজন ক্রোশের দূরত্ব ঘুচিয়ে মাঝখানে রয়েছেন, তেমনি তিনিই নিজে এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের সম্বন্ধরূপে বিরাজ করছেন। নইলে একের সঙ্গে আরের ব্যবধান যে অনন্ত ; মাঝখানে যদি অনন্ত মিলনের সেতু না থাকতেন তা হলে এই অনন্ত ব্যবধান পার হতুম কী করে!

অতএব তিনি দুরূহ তত্ত্বকথা নন, তিনি অত্যন্ত আপন। সকল আপনের মধ্যেই তিনি একমাত্র চিরন্তন অখণ্ড আপন। গাছের ফলকে তিনি যে কেবল একটি সত্যরূপে গাছে ঝুলিয়ে রেখেছেন তা নয়, স্বাদে গন্ধে শোভায় তিনি বিশেষরূপে তাকে আমার আপন করে রেখেছেন। তিনিই আমার আপন বলে ফলকে নানা রসে আমার আপন করেছেন, নইলে ফল-নামক সত্যটিকে আমি কোনো দিক থেকেই কোনো রকমেই এতটুকুও নাগাল পেতুম না।

কিন্তু আপন যে কতদূর পর্যন্ত যায়, কত গভীরতা পর্যন্ত, তা তিনি মানুষের সম্বন্ধে মানুষকে দেখিয়েছেন— শরীর মন হৃদয় সর্বত্র তার প্রবেশ, কোথাও তার বিচ্ছেদ নেই, বিরহ এবং মৃত্যুও তাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।

সেইজন্যে মানুষের এই সম্বন্ধগুলির মধ্য দিয়েই আমরা কতকটা উপলব্ধি করতে পারি, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যিনি আমাদের নিত্যকালের আপন তিনি আমাদের কী? সেই তিনি যাঁকে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' বলে আমাদের শেষ কথা বলা হয় না। তার চেয়ে চরমতম অন্তরতর কথা হচ্ছে : তুমি আমার আপন, তুমি আমার মাতা, আমার পিতা, আমার বন্ধু, আমার প্রভু, আমার বিদ্যা, আমার ধন, ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব। তুমি আমার এবং আমি তোমার, তোমাতে আমাতে এই-যে যোগ এই যোগটিই আমার সকলের চেয়ে বড়ো সত্য, আমার সকলের চেয়ে বড়ো সম্পদ। তুমি আমার মহত্তম সত্যতম আপনস্বরূপ।

ঈশ্বরের সঙ্গে এই যোগ উপলব্ধি করবার একটি মন্ত্র হচ্ছে— পিতা নোঽসি, তুমি আমাদের পিতা। যিনি অনন্ত সত্য তাঁকে আমাদের আপন সত্য করবার এই একটি মন্ত্র : তুমি আমাদের পিতা।

আমি ছোটো, তুমি ব্রহ্ম, তবু তোমাতে আমাতে মিল আছে : তুমি পিতা। আমি অবোধ, তুমি অনন্ত জ্ঞান, তবু তোমাতে আমাতে মিল আছে : তুমি পিতা।

এই-যে যোগ, এই যোগটি দিয়ে তোমাতে আমাতে বিশেষভাবে যাতায়াত, তোমাতে আমাতে বিশেষভাবে দেনাপাওনা। এই যোগটিকে যেন আমি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে সম্পূর্ণ সবলে অবলম্বন করি। তাই আমার প্রার্থনা এই যে, পিতা নো বোধি, তুমি যে পিতা আমাকে সেই বোধটি দাও। তুমি তো— পিতা নোঽসি, পিতা আছ ; কিন্তু শুধু আছ বললে তো হবে না— পিতা নো বোধি, তুমি আমার পিতা হয়ে আছ এই বোধটি আমাকে দাও।

আমার চৈতন্য ও বুদ্ধি -যোগে যে-কিছু জ্ঞান আমি পাচ্ছি সমস্তই তাঁর কাছ থেকে পাচ্ছি— ধিয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ, যিনি আমাদের ধীশক্তিসকল প্রেরণ করছেন। যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অখণ্ড এক করে রয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে ছাড়া কোনো জ্ঞান, আর কোথা পাব ! কিন্তু সেইসঙ্গে যেন এই বোধটুকু পাই যে তিনিই দিচ্ছেন।

তিনিই পিতারূপে আমাকে জ্ঞান দিচ্ছেন এই বোধটুকু আমার অন্তরে থাকলে তবেই তাঁকে আমি যথার্থভাবে নমস্কার করতে পারি। আমি সমস্তই তাঁর কাছ থেকে নিচ্ছি, পাচ্ছি, তবু তাঁকে নমস্কার করতে পারছি নে, আমার মন শক্ত হয়েই আছে, মাথা উদ্ধত হয়েই রয়েছে। কেননা তাঁর সঙ্গে আমার যে যোগ সেটা আমার বোধে খুঁজে পাচ্ছি নে।

তাই আমাদের প্রার্থনা এই যে, নমস্তেঽস্তু। তোমাতে আমাদের নমস্কারটি যেন হয়। সেটি যেন নম্রতায় আত্মসমর্পণে পরিপূর্ণ হয়ে তোমার পায়ের কাছে এসে নামে। আমার সমস্ত জীবন যেন তোমার প্রতি নমস্কাররূপে পরিণত হয়।

তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধই এই যে, তুমি আমাকে দেবে আর আমি নমস্কারে নত হয়ে পড়ে তা গ্রহণ করব। এই নমস্কারটি অতি মধুর। এ জলভারনত মেঘের মতো, ফলভারনত শাখার মতো, রসে ও মঙ্গলে পরিপূর্ণ। এই নমস্কারের দ্বারা জীবন কল্যাণে ভরে ওঠে, সৌন্দর্যে উপচে পড়ে। এই নমস্কার যে কেবল নিবিড় মাধুর্য তা নয়, এ প্রবল শক্তি। এ যেমন অনায়াসে গ্রহণ করে ও বহন করে, উদ্ধত অহংকার তেমন করে পারে না। একে কেউ পরাভূত করতে পারে না। জীবন এই নমস্কারের দ্বারা সমস্ত আঘাত ক্ষতি বিপদ ও মৃত্যুর উপরে অতি সহজেই জয়ী হয়। এই নমস্কারের দ্বারা জীবনের সমস্ত ভার এক মুহূর্তে লঘু হয়ে যায়, পাপ তার উপর দিয়ে মুহূর্তকালীন বন্যার মতো চলে যায়, তাকে ভেঙে দিয়ে যেতে পারে না। এইজন্য প্রতিদিনই প্রার্থনা করি, নমস্তেঽস্তু। তোমাতে আমার নমস্কার হোক। সুখ আসুক দুঃখ আসুক, নমস্তেঽস্তু। মান আসুক অপমান আসুক, নমস্তেঽস্তু। তুমি শিক্ষা দিচ্ছ এই জেনে— নমস্তেঽস্তু। তুমি রক্ষা করছ এই জেনে— নমস্তেঽস্তু। তুমি নিত্য নিয়তই আমার কাছে আছ এই জেনে— নমস্তেঽস্তু। তোমার গৌরবেই আমার একমাত্র গৌরব এই জেনেই নমস্তেঽস্তু। অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কালের অধীশ্বর তুমিই পিতা নোঽসি এই জেনেই— নমস্তেঽস্তু নমস্তেঽস্তু। বিষয়কেই আশ্রয় বলে জানা ঘুচিয়ে দাও, নমস্তেঽস্তু। সংসারকে প্রবল বলে জানা ঘুচিয়ে দাও, নমস্তেঽস্তু। আমাকেই বড়ো বলে জানা ঘুচিয়ে দাও, নমস্তেঽস্তু। তোমাকেই যথার্থরূপে নমস্কার করে চিরদিনের মতো পরিত্রাণ লাভ করি।

২৬ চৈত্র

মন্ত্রের বাঁধন

বীণার কোনো তার পিতলের, কোনো তার ইস্পাতের, কোনো তার মোটা, কোনো তার সরু, কোনো তার মধ্যম সুরে বাঁধবার, কোনো তার পঞ্চমে। কিন্তু তবু বাঁধতে হবে, তার থেকে একটা কোনো বিশুদ্ধ সুর জাগিয়ে তুলতে হবে, নইলে সব মাটি।

জগতে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কোনো বিশেষ আপন সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। একটা কোনো বিশেষ সুর বাজাতে হবে।

সূর্য চন্দ্র তারা ওষধি বনস্পতি সকলেই এই বিশাল বিশ্বসংগীতে নিজের একটা-না-একটা বিশেষ সুর যোগ করে দিয়েছে। মানুষের জীবনকেও কি এই চির-উদ্‌গীত সংগীতে যোগ দিতে হবে না?

কিন্তু এখনো এই জীবনটাকে তারের মতো বাঁধি নি। এর মধ্যে এখনো কোনো গানের আবির্ভাব হয় নি। এ জীবন সূত্রবিচ্ছিন্ন বিচিত্র তুচ্ছতার মধ্যে অকৃতার্থ হয়ে আছে। যেমন করেই পারি এর একটি কোনো নিত্য সুরকে ধ্রুব করে তুলতে হবে।

তারকে বাঁধব কেমন করে?

ঈশ্বরের বীণায় অনেকগুলি বাঁধবার সম্বন্ধ আছে, তার মধ্যে নিজের মনের মতো একটি-কিছু স্থির করে নিতে হবে।

মন্ত্র জিনিসটি একটি বাঁধবার উপায়। মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা মননের বিষয়কে মনের সঙ্গে বেঁধে রাখি। এ যেন বীণার কানের মতো। তারকে এঁটে রাখে, খুলে পড়তে দেয় না।

বিবাহের সময় স্ত্রীপুরুষের কাপড়ে কাপড়ে গ্রন্থি বেঁধে দেয়, সেইসঙ্গে মন্ত্র পড়ে দেয়। সেই মন্ত্র মনের মধ্যেও গ্রন্থি বাঁধতে থাকে।

ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যে গ্রন্থিবন্ধনের প্রয়োজন আছে মন্ত্র তার সহায়তা করে। এই মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা তাঁর সঙ্গে একটা কোনো বিশেষ সম্বন্ধকে পাকা করে নেব।

সেইরূপ একটি মন্ত্র হচ্ছে— পিতা নোঽসি।

এই সুরে জীবনটাকে বাঁধলে সমস্ত চিন্তায় ও কর্মে একটি বিশেষ রাগিণী জেগে উঠবে। আমি তাঁর পুত্র এইটেই মূর্তি ধরে আমার সমস্তের মধ্যেই এই কথাটাই প্রকাশ করবে যে, আমি তাঁর পুত্র।

আজ আমি কিছুই প্রকাশ করছি নে। আহার করছি, কাজ করছি, বিশ্রাম করছি, এই পর্যন্তই। কিন্তু অনন্ত কালে অনন্ত জগতে আমার পিতা যে আছেন তার কোনো লক্ষণই প্রকাশ পাচ্ছে না। অনন্তের সঙ্গে আজও আমার কোনো গ্রন্থি কোথাও বাঁধা হয় নি।

ঐ মন্ত্রটিকে দিয়ে জীবনের তার আজ বাঁধা যাক। আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে ঐ মন্ত্রটি বারংবার আমার মনের মধ্যে বাজতে থাক্ : পিতা নোঽসি। জগতে আমার পিতা আছেন এই কথাটি সকলে জানুক, কারও কাছে গোপন না থাক্।

ভগবান যিশু ঐ সুরটিকে পৃথিবীতে বাজিয়ে গিয়েছেন। এমনি ঠিক করে তাঁর জীবনের তার বাঁধা ছিল যে মরণান্তিক যন্ত্রণার দুঃসহ আঘাতেও সেই তার লেশমাত্র বেসুর বলে নি— সে কেবলই বলেছে ; পিতা নোঽসি।

সেই যে সুরের আদর্শটি তিনি দেখিয়ে গেছেন সেই খাঁটি আদর্শের সঙ্গে একান্ত যত্নে মিশিয়ে তারটি বাঁধতে হবে, যাতে আর ভাবতে না হয়, যাতে সুখে দুঃখে প্রলোভনে আপনিই সে গেয়ে ওঠে পিতা নোঽসি।

হে পিতা, আমি যে তোমার পুত্র এই সুরটি ঠিকমত প্রকাশ করা বড়ো কম কথা নয়। কেননা, আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ। পুত্র যে পিতারই প্রকাশ। সন্তানের মধ্যে পিতাই যে স্বয়ং সম্ভূত হন। তোমারই অপাপবিদ্ধ আনন্দময় পরিপূর্ণতাকে যদি ব্যক্ত করে না তুলতে পারি তবে তো এই সুর বাজবে না যে : পিতা নোঽসি।

সেইজন্যেই এই আমার প্রতিদিনের একান্ত প্রার্থনা হোক : পিতা নো বোধি, নমস্তেঽস্তু।

২৭ চৈত্র

প্রাণ ও প্রেম

পিতা নোঽসি এই মন্ত্রটি আমরা জীবনের মধ্যে গ্রহণ করব। কার কাছ থেকে গ্রহণ করব। যিনি পিতা তাঁর কাছ থেকেই গ্রহণ করব। তাঁকে বলব, তুমি যে পিতা সে তুমিই আমাকে বুঝিয়ে দাও। আমার জীবনের সমস্ত ইতিহাসের ভিতর দিয়ে সমস্ত সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

পিতার সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ সে তো কোনো তৈরি-করা সম্বন্ধ নয়। রাজার সঙ্গে প্রজার, প্রভুর সঙ্গে ভৃত্যের একটা পরস্পর বোঝাপড়া আছে, সেই বোঝাপড়ার উপরেই তাদের সম্বন্ধ। কিন্তু পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধ বাহ্যিক নয়, সে একেবারে আদিতম সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ পুত্রের অস্তিত্বের মূলে। অতএব এই গভীর আত্মীয়সম্বন্ধ কোনো বাহ্য অনুষ্ঠান কোনো ক্রিয়াকলাপের দ্বারা রক্ষিত হয় না, কেবল ভক্তির দ্বারা এবং ভক্তিজনিত কর্মের দ্বারাই এই সম্বন্ধকে স্বীকার করতে হয়।

পিতার সঙ্গে পুত্রের মূল সম্বন্ধটি কোথায় ? প্রাণের মধ্যে। পিতার প্রাণই সন্তানের প্রাণে সঞ্চারিত।

কেনোপনিষৎ প্রশ্ন করেছেন— কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্ত ? প্রাণ কাহার দ্বারা তার প্রথম প্রৈতি (energy) লাভ করেছে ? এই প্রশ্নের মধ্যেই উত্তরটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে, যিনি মহাপ্রাণ তাঁর দ্বারা।

জগতে কোনো প্রাণই তো একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে, নিজের মধ্যে, নিজে আবদ্ধ নয়। সমস্ত জগতের প্রাণের সঙ্গে তার যোগ। আমার এই শরীরের মধ্যে যে প্রাণের চেষ্টা চলছে সে তো কেবলমাত্র এই শরীরের নয়। জগৎজোড়া আকর্ষণ বিকর্ষণ, জগৎজোড়া রাসায়নিক শক্তি, জল, বাতাস, আলোক ও উত্তাপ একে নিখিলপ্রাণের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছে। বিশ্বের প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যেও যে অবিশ্রাম চেষ্টা আছে আমার এই শরীরের চেষ্টাও সেই বিরাট প্রাণেরই একটি মাত্রা। সেইজন্যই উপনিষৎ বলেছেন— যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্, বিশ্বে এই যা-কিছু চলছে সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই স্পন্দিত হচ্ছে। এই প্রাণের স্পন্দন দূরতম নক্ষত্রেও যেমন আমার হৃৎপিণ্ডেও তেমনি, ঠিক একই সুরে একই তালে।

প্রাণ কেবল শরীরের নয়। মনেরও প্রাণ আছে। মনের মধ্যেও চেষ্টা আছে। মন চলছে, মন বাড়ছে, মনের ভাঙাগড়া পরিবর্তন হচ্ছে। এই স্পন্দিত তরঙ্গিত মন কখনোই কেবল আমার ক্ষুদ্র বেড়াটির মধ্যে আবদ্ধ নয়। ঐ নর্তমান প্রাণের সঙ্গেই হাতধরাধরি করে নিখিল বিশ্বে সে আন্দোলিত হচ্ছে, নইলে আমি তাকে কোনোমতেই পেতে পারতুম না। মনের দ্বারা আমি সমস্ত জগতের মনের সঙ্গেই যুক্ত। সেইজন্যেই সর্বত্র তার গতিবিধি। নইলে আমার এই একঘরে অন্ধ মন কেবল আমারই অন্ধকারাগারে পড়ে দিনরাত্রি কেঁদে মরত।

আমার মনপ্রাণ অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিল বিশ্বের ভিতর দিয়ে সেই অনন্ত কারণের সঙ্গে যোগযুক্ত। প্রতিমুহূর্তেই সেইখান হতে আমি প্রাণ চৈতন্য ধীশক্তি লাভ করছি। এই কথাটিকে কেবল বিজ্ঞানে জানা নয়, এই কথাটিকে ভক্তিদ্বারা উপলব্ধি করতে পারলে তবে ঐ মন্ত্র সার্থক হবে : ওঁ পিতা নোঽসি। আমার প্রাণের মধ্যে বিশ্বপ্রাণ— মনের মধ্যে বিশ্বমন আছে বললে এত বড়ো কথাটাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয় না, একে বাইরেই বসিয়ে রাখা হয়। আমার প্রাণের মধ্যে পিতার প্রাণ, আমার মনের মধ্যে পিতার মন আছে, এই কথাটি নিজেকে ভালো করে বলাতে হবে।

পিতার দিক থেকে কেবল যে আমাদের দিকে প্রাণ প্রবাহিত হচ্ছে তা নয়। তাঁর দিক থেকে আমাদের দিকে অবিশ্রাম প্রেম সঞ্চারিত হচ্ছে। আমাদের মধ্যে কেবল যে একটা চেষ্টা আছে, গতি আছে তা নয়, একটা আনন্দ আছে। আমরা কেবল বেঁচে আছি, কাজ করছি নয়, আমরা রস পাচ্ছি। আমাদের দেখায় শোনায় আহারে বিহারে কাজে কর্মে, মানুষের সঙ্গে নানাপ্রকার যোগে, নানা সুখ— নানা প্রেম।

এই রসটি কোথা থেকে পাচ্ছি ? এইটিই কি আমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ? এটা কেবল আমার এই একটি ছোটো কারখানাঘরের সুরঙ্গের মধ্যে অন্ধকারে তৈরি হচ্ছে ?

তা নয়। বিশ্বভুবনের মধ্যে সমস্তকে পরিপূর্ণ করে তিনি আনন্দিত। জলে স্থলে আকাশে তিনি আনন্দময়। তাঁর সেই আনন্দকে সেই প্রেমকে তিনি নিয়তই প্রেরণ করছেন, সেইজন্যেই আমি বেঁচে থেকে আনন্দিত, কাজ করে আনন্দিত, জেনে আনন্দিত, মানুষের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে আনন্দিত। তাঁরই প্রেমের তরঙ্গ আমাকে কেবলই স্পর্শ করছে, আঘাত করছে, সচেতন করছে।

এই যে অহোরাত্র সেই ভূমার প্রেম নানা বর্ণে গন্ধে গীতে, নানা স্নেহে সখ্যে শ্রদ্ধায়, জোয়ারের বেগের মতো আমাদের মধ্যে এসে পড়ছে, এই বোধের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যেন আমরা বলি : ওঁ পিতা নোঽসি। কেবলই তিনি প্রাণে ও প্রেমে আমাকে ভরে দিচ্ছেন, এই অনুভূতিটি যেন আমরা না হারাই। এই অনুভূতি যাঁদের কাছে অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিল তাঁরাই বলেছেন— কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষহ্যেবানন্দয়াতি। কেই-বা কিছুমাত্র শরীরচেষ্টা প্রাণের চেষ্টা করত ? আকাশে যদি আনন্দ না থাকতেন। এই আনন্দই সকলকে আনন্দ দিচ্ছেন।

২৮ চৈত্র

ভয় ও আনন্দ

ওঁ পিতা নোঽসি, এই মন্ত্রে দুটি ভাবের সামঞ্জস্য আছে। এক দিকে পিতার সঙ্গে পুত্রের সাম্য আছে, পুত্রের মধ্যে পিতা আপনাকেই প্রকাশ করেছেন।

আর-এক দিকে পিতা হচ্ছেন বড়ো, পুত্র ছোটো।

এক দিকে অভেদের গৌরব, আর-এক দিকে ভেদের প্রণতি। পিতার সঙ্গে অভেদ নিয়ে আমরা আনন্দ করতে পারি, কিন্তু স্পর্ধা করতে পারি নে। আমার যেখানে সীমা আছে সেখানে আমাকে মাথা নত করতে হবে।

কিন্তু এই নতির মধ্যে অপমান নেই। কেননা তিনি কেবলমাত্র আমার বড়ো নন, তিনি আমার আপন, আমার পিতা। তিনি আমারই বড়ো, আমি তাঁরই ছোটো। তাঁকে প্রণাম করে আমি আমার বড়ো আমাকেই প্রণাম করি। এর মধ্যে বাইরের কোনো তাড়না নেই, জবরদস্তি নেই। যে বড়োর মধ্যে আমি আছি, যে বড়োর মধ্যেই পরিপূর্ণ সার্থকতা, তাঁকে প্রণাম করাই একমাত্র স্বাভাবিক প্রণাম। কিছু পাব বলে প্রণাম নয়, কিছু দেব বলে প্রণাম নয়, ভয়ে প্রণাম নয়, জোরে প্রণাম নয়। আমারই অনন্ত গৌরবের উপলব্ধির কাছে প্রণাম। এই প্রণামটির মহত্ত্ব অনুভব করেই প্রার্থনা করা হয়েছে— নমস্তেঽস্তু, তোমাতে আমার নমস্কার সত্য হয়ে উঠুক।

তাঁকে 'পিতা নোঽসি' বলে স্বীকার করলে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের একটি পরিমাণ রক্ষা হয়। তাঁকে নিয়ে কেবল ভাবরসে প্রমত্ত হবার যে একটি উচ্ছৃঙ্খল আত্মবিস্মৃতি আছে সেটি আমাদের আক্রমণ করতে পারে না। সম্ভ্রমের দ্বারা আমাদের আনন্দ গাম্ভীর্য লাভ করে, অচঞ্চল গৌরব প্রাপ্ত হয়।

প্রাচীন বেদ সমস্ত মানবসম্বন্ধের মধ্যে কেবল এই পিতার সম্বন্ধটিকেই ঈশ্বরের মধ্যে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেছেন। মাতার সম্বন্ধকেও সেখানে তাঁরা স্থান দেন নি।

কারণ, মাতার সম্বন্ধেও এক দিকে যেন ওজন কম আছে, এক দিকে সম্পূর্ণতার অভাব আছে।

মাতা সন্তানের সুখ দেখেন, আরাম দেখেন ; তার ক্ষুধাতৃপ্তি করেন, তার শোকে সান্ত্বনা দেন, তার রোগে শুশ্রূষা করেন। এ সমস্তই সন্তানের উপস্থিত অভাবনিবৃত্তির প্রতিই লক্ষ করে।

পিতার দৃষ্টি সন্তানের সমস্ত জীবনের বৃহৎক্ষেত্রে। তার সমস্ত জীবন সমগ্রভাবে সার্থক হবে এই তিনি কামনা করেন। এইজন্যই সন্তানের আরাম ও সুখই তাঁর কাছে একান্ত নয়। এইজন্য তিনি সন্তানকে দুঃখও দেন। তাকে শাসন করেন, তাকে বঞ্চিত করেন, যাতে নিয়ম লঙ্ঘন করে ভ্রষ্টতা প্রাপ্ত না হয়, সে দিকে তিনি সর্বদা সতর্ক থাকেন।

অর্থাৎ পিতার মধ্যে মাতার স্নেহ আছে, কিন্তু সে-স্নেহ সংকীর্ণ সীমায় বদ্ধ নয় বলেই তাকে অতি প্রকট করে দেখা যায় না এবং তাকে নিয়ে যেমন ইচ্ছা খেলা চলে না।

সেইজন্যে পিতাকে নমস্কার করবার সময় বলা হয়েছে— নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ। যিনি সুখকর তাঁকে নমস্কার, যিনি কল্যাণকর তাঁকে নমস্কার।

পিতা কেবল আমাদের সুখের আয়োজন করেন না, তিনি মঙ্গলের বিধান করেন। সেইজন্যেই সুখেও তাঁকে নমস্কার, দুঃখেও তাঁকে নমস্কার। ঐখানেই পিতার পূর্ণতা ; তিনি দুঃখ দেন।

উপনিষৎ এক দিকে বলেছেন— আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দ হতেই যা-কিছু সমস্ত জন্মেছে। আবার আর-এক দিকে বলেছেন— ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ। ইঁহার ভয়ে অগ্নি জ্বলছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য তাপ দিচ্ছে।

তাঁর আনন্দ উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ নয়, তার মধ্যে একটি অমোঘ নিয়মের শাসন আছে। অনন্ত দেশে অনন্তকালে কোথাও একটি কণাও লেশমাত্র ভ্রষ্ট হতে পারে না। সেই অমোঘ নিয়মই হচ্ছে ভয়। তার সঙ্গে কিছুমাত্র চাতুরী খাটে না, সে কোথাও কাউকে তিলমাত্র প্রশ্রয় দেয় না।

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্‌। এই যা-কিছু জগৎ সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে— সেই যে প্রাণ, যাঁর থেকে সমস্ত উদ্‌ভূত হয়েছে এবং যাঁর মধ্যে সমস্তই চলছে, তিনি কী রকম ? না, তিনি উদ্যত বজ্রের মতো মহাভয়ংকর। সেইজন্যেই তো সমস্ত চলছে— নইলে বিশ্বব্যবস্থা উন্মত্ত প্রলাপের মতো অতি নিদারুণ হয়ে উঠত। আমাদের পিতা যে ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষাণানাং। এই ভয়ের দ্বারাই অনাদি কাল থেকে সর্বত্র সকলের সীমা ঠিক আছে, সর্বত্র সকলের পরিমাণ রক্ষা হচ্ছে।

আমাদেরও যে দিকটা চলবার দিক, কী বাক্যে, কী ব্যবহারে, সেই দিকে পিতা দাঁড়িয়ে আছেন— মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্‌। সে দিকে কোনো ব্যত্যয় নেই, কোনো স্খলনের ক্ষমা নেই, কোনো পাপের নিষ্কৃতি নেই।

অতএব আমরা যখন বলি 'পিতা নোঽসি', তার মধ্যে আদরের দাবি নেই, উন্মত্ততার প্রশ্রয় নেই। অত্যন্ত সংযত আত্মসংবৃত বিনম্র নমস্কার আছে। যে বলে 'পিতা নোঽসি', সে তাঁর সামনে 'শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতঃ' হয়ে থাকে। সে নিজেকে প্রত্যেক ক্ষুদ্র অধৈর্য ক্ষুদ্র আত্মবিস্মৃতি থেকে রক্ষা করে চলতে থাকে।

২৯ চৈত্র

নিয়ম ও মুক্তি

সুখ জিনিসটা কেবল আমার, কল্যাণ জিনিসটা সমস্ত জগতের। পিতার কাছে যখন প্রার্থনা করি— যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব, যা ভালো তাই আমাদের দাও, তার মানে হচ্ছে সমস্ত জগতের ভালো আমাদের মধ্যে প্রেরণ করো। কারণ সেই ভালোই আমার পক্ষেও সত্য ভালো, আমার পক্ষেও নিত্য ভালো। যা বিশ্বের ভালো তাই আমার ভালো, কারণ যিনি বিশ্বের পিতা তিনিই আমার পিতা।

যেখানে কল্যাণ নিয়ে, অর্থাৎ বিশ্বের ভালো নিয়ে কথা, সেখানে অত্যন্ত কড়া নিয়ম। সেখানে উপস্থিত সুখসুবিধা কিছুই খাটে না ; সেখানে ব্যক্তিবিশেষের আরাম বিরামের স্থান নেই। সেখানে দুঃখও শ্রেয়, মৃত্যুও বরণীয়।

যেখানে বিশ্বের ভালো নিয়ে কথা সেখানে সমস্ত নিয়ম একেবারে শেষ পর্যন্ত মানতেই হবে। সেখানে কোনো বন্ধন কোনো দায়কেই অস্বীকার করতে পারব না।

আমাদের পিতা এইখানেই মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতম। এইখানেই তিনি পুত্রকে এক চুল প্রশ্রয় দেন

না। বিশ্বের ভাগ থেকে একটি কণা হরণ করেও তিনি কোনো বিশেষ পুত্রের পাতে দেন না। এখানে কোনো স্তব-স্তুতি অনুনয়-বিনয় খাটে না।

তবে মুক্তি কাকে বলে ? এই নিয়মকে পরিপূর্ণভাবে আত্মসাৎ করে নেওয়াকেই বলে মুক্তি। নিয়ম যখন কোনো জায়গায় আমার বাইরের জিনিস হবে না, সম্পূর্ণ আমার ভিতরকার জিনিস হবে, তখনই সেই অবস্থাকে বলব মুক্তি।

এখনো নিয়মের সঙ্গে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয় নি। এখনো চলতে ফিরতে বাধে। এখনো সকলের ভালোকে আমার ভালো বলে অনুভব করি নে। সকলের ভালোর বিরুদ্ধে আমার অনেক স্থানেই বিদ্রোহ আছে।

এইজন্যে পিতার সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ মিলন হচ্ছে না, পিতা আমার পক্ষে রুদ্র হয়ে আছেন। তাঁর শাসনকেই আমি পদে পদে অনুভব করছি, তাঁর প্রসন্নতাকে নয়। পিতার মধ্যে পুত্রের সম্পূর্ণ মুক্তি হচ্ছে না।

অর্থাৎ মঙ্গল এখনো আমার পক্ষে ধর্ম হয়ে ওঠে নি। যার ধর্ম যেটা সেটা তার পক্ষে বন্ধন নয়, সেইটেই তার আনন্দ। চোখের ধর্ম দেখা, তাই দেখাতেই চোখের আনন্দ, দেখায় বাধা পেলেই তার কষ্ট। মনের ধর্ম মনন করা, মননেই তার আনন্দ, মননে বাধা পেলেই তার দুঃখ।

বিশ্বের ভালো যখন আমার ধর্ম হয়ে উঠবে তখন সেইটেতেই আমার আনন্দ এবং তার বাধাতেই আমার পীড়া হবে।

মায়ের ধর্ম যেমন পুত্রস্নেহ, ঈশ্বরের ধর্মই তেমনি মঙ্গল। সমস্ত জগৎচরাচরের ভালো করাই তাঁর স্বভাব, তাতেই তাঁর আনন্দ।

আমাদের স্বভাবেও সেই মঙ্গল আছে, সমগ্র-হিতেই নিজের হিতবোধ মানুষের একটা ধর্ম। এই ধর্ম স্বার্থের বন্ধন কাটিয়ে পূর্ণপরিণত হয়ে ওঠবার জন্যে নিয়তই মনুষ্যসমাজে প্রয়াস পাচ্ছে। আমাদের এই ধর্ম অপরিণত এবং বাধাগ্রস্ত বলেই আমরা দুঃখ পাচ্ছি, পূর্ণ মঙ্গলের সঙ্গে মিলনের আনন্দ ঘটে উঠছে না।

যতদিন ভিতরের থেকে এই পরিণতিলাভ না হবে, এই বাধা কেটে গিয়ে আমাদের স্বভাব নিজেকে উপলব্ধি না করবে ততদিন বাহিরের বন্ধন আমাদের মানতেই হবে। ছেলের পক্ষে যতদিন চলাফেরা স্বাভাবিক হয়ে না ওঠে, ততদিন ধাত্রী বাইরে থেকে তার হাত ধরে তাকে চালায়। তখনই তার মুক্তি হয়, যখন চলার শক্তি তার স্বাভাবিক শক্তি হয়।

অতএব নিয়মের শাসন থেকে আমরা মুক্তি লাভ করব নিয়মকে এড়িয়ে নয়, নিয়মকে আপন করে নিয়ে। আমাদের দেশে একটা শ্লোক প্রচলিত আছে— প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ, ষোলো বছর বয়স হলে পুত্রের প্রতি মিত্রের মতো ব্যবহার করবে।

তার কারণ কী ? তার কারণ এই, যে পর্যন্ত না পুত্রের শিক্ষা পরিণতি লাভ করবে, অর্থাৎ সেই-সমস্ত শিক্ষা তার স্বভাবসিদ্ধ হয়ে উঠবে, ততক্ষণ তার প্রতি একটি বাইরের শাসন রাখার দরকার হয়। বাইরের শাসন যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পুত্রের সঙ্গে পিতার অন্তরের যোগ কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না। যখনই সেই বাইরের শাসনের প্রয়োজন চলে যায় তখনই পিতাপুত্রের মাঝখানে আনন্দসম্বন্ধ একেবারে অব্যাহত হয়ে ওঠে। তখনই সমস্ত অসত্য সত্যে বিলীন হয়, অন্ধকার জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হয়, মৃত্যু অমৃতে নিঃশেষিত হয়ে যায়। তখনই পিতার প্রকাশ পুত্রের কাছে সম্পূর্ণ হয়। তখনই যিনি রুদ্ররূপে আঘাত করেছিলেন তিনি প্রসন্নতাদ্বারা রক্ষা করেন। ভয় তখন আনন্দে এবং শাসন তখন মুক্তিতে পরিণত হয় ; সত্য তখন প্রিয়-অপ্রিয়ের-দ্বন্দ্ব-বর্জিত সৌন্দর্যে উজ্জ্বল হয়, মঙ্গল তখন ইচ্ছা-অনিচ্ছার-দ্বিধা-বর্জিত প্রেমে এসে উপনীত হয়। তখনই আমাদের মুক্তি। সে মুক্তিতে কিছুই বাদ পড়ে না, সমস্ত সম্পূর্ণ হয় ; বন্ধন শূন্য হয়ে যায় না, বন্ধনই অবন্ধন হয়ে ওঠে ; কর্ম চলে যায় না, কিন্তু কর্মই আসক্তিশূন্য বিরামস্বরূপ ধারণ করে।

৩০ চৈত্র

দশের ইচ্ছা

আমার সমস্ত জীবন একদিন তাঁকে পিতা নোঽসি বলতে পারবে, আমি তাঁরই পুত্র এই কথাটা একদিন সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে, এই আকাঙ্ক্ষাটিকে উজ্জ্বল করে ধরে রাখা বড়ো কঠিন।

অথচ আমাদের মনে কত অত্যাকাঙ্ক্ষা আছে, কত অসাধ্যসাধনের সংকল্প আছে, কিছুতেই সেগুলি নিরস্ত হতে চায় না। বাইরে থেকে যদি বা খাদ্য জোগাতে নাও পারি, তবু বুকের রক্ত দিয়ে তাকে পোষণ করি।

অথচ যে-আকাঙ্ক্ষা সকলের চেয়ে বড়ো, যা সকলের চেয়ে চরমের দিকে যায়, তাকে প্রতিদিন জাগ্রত করে রাখা এত শক্ত কেন ?

তার কারণ আছে। আমরা মনে করি আকাঙ্ক্ষা জিনিসটা আমার নিজেরই মনের সামগ্রী— আমিই ইচ্ছা করছি এবং সে ইচ্ছার আরম্ভ আমারই মধ্যে।

বস্তুত তা নয়। আমার মধ্যে আমার চতুর্দিক ইচ্ছা করে। আমার জারক রস আমার জঠরেরই উৎপন্ন সামগ্রী বটে, কিন্তু আমার ইচ্ছা কেবল আমারই মনের উৎপন্ন পদার্থ নয়। অনেকের ইচ্ছা আমার মধ্যে ইচ্ছিত হয়ে ওঠে।

মাড়োয়ারিদিগের মধ্যে অনেক লোকেই টাকাকে ইচ্ছা করে। মাড়োয়ারির ঘরে একটি ছোটো ছেলেও টাকার ইচ্ছাকে পোষণ করে। কিন্তু এই ইচ্ছা কি তার একান্ত নিজের ইচ্ছা ? সে ছেলে কিছুমাত্র বিচার করে দেখে না টাকা জিনিসটা কেন লোভনীয়। টাকার সাহায্যে যে ভালো খাবে, ভালো পরবে, সে-কথা তার মনেও নেই। কারণ, বস্তুতই টাকার লোভে সে ভালো খাওয়া পরা পরিত্যাগ করেছে। টাকার দ্বারা সে অন্য কোনো সুখকে চাচ্ছে না, অন্য সব সুখকে অবজ্ঞা করছে, সে টাকাকেই চাচ্ছে।

এমনতরো একটা অহেতুক চাওয়া নিশিদিন মাড়োয়ারি ছেলের মনে প্রচণ্ড হয়ে আছে তার কারণ— এই ইচ্ছা তার একলার নয়, সকলে মিলেই তাকে ইচ্ছা করাচ্ছে, কোনোমতেই তার ইচ্ছাকে থামতে দিচ্ছে না।

কোনো সমাজে যদি কোনো একটা নিরর্থক আচরণের বিশেষ গৌরব থাকে তবে অনেক লোককেই দেখা যাবে সেই আচারের জন্য তারা নিজের সুখসুবিধা পরিত্যাগ করে তাতেই নিযুক্ত আছে। দশজনে এইটে আকাঙ্ক্ষা করে এই হচ্ছে ওর জোর, আর কোনো তাৎপর্য নেই।

যে-দেশে অনেক লোকেই দেশকে খুব বড়ো জিনিস বলে জানে সে-দেশে বালকেও দেশের জন্যে প্রাণ দিতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। অন্য দেশে এই দেশানুরাগের উপযোগিতা উপকারিতা সম্বন্ধে যতই আলোচনা হোক-না, তবু দেশহিতের আকাঙ্ক্ষা সত্য হয়ে মনের মধ্যে জেগে ওঠে না। কারণ, দশের ইচ্ছা প্রত্যেকের ইচ্ছাকে জন্ম দিচ্ছে না, পালন করছে না।

বিশ্বপিতার সঙ্গে পুত্ররূপে আমাদের মিলন হবে, রাজচক্রবর্তী হওয়ার চেয়েও এটা বড়ো ইচ্ছা। কিন্তু এতবড়ো ইচ্ছাকেও অহরহ সত্য করে জাগিয়ে রাখা কঠিন হয়েছে এইজন্যেই। আমার চারি দিকের লোক এই ইচ্ছাটা আমার মধ্যে করছে না। এর চেয়ে ঢের যৎসামান্য, এমন-কি, ঢের অর্থহীন ইচ্ছাকেও তারা আমার মনে সত্য করে তুলেছে এবং তাকে কোনোমতে নিবে যেতে দিচ্ছে না।

এখানে আমাকে একলাই ইচ্ছা করতে হবে। এই একটি মহৎ ইচ্ছাকে আমার নিজের মধ্যেই আমার নিজের শক্তিতেই সার্থক করে রাখতে হবে। দশজনের কাছে আনুকূল্য প্রত্যাশা করলে হতাশ হব।

শুধু তাই নয়, শত সহস্র ক্ষুদ্র অর্থকে, কৃত্রিম অর্থকে, সংসারের লোক রাত্রিদিন আমার কাছে অত্যন্ত বড়ো করে সত্য করে রেখেছে। সেই ইচ্ছাগুলিকে শিশুকাল হতে একেবারে আমার সংস্কারগত করে রেখেছে। তারা কেবলই আমার মনকে টানছে, আমার চেষ্টাকে কাড়ছে। বুদ্ধিতে যদি বা বুঝি তারা তুচ্ছ এবং নিরর্থক কিন্তু দশের ইচ্ছাকে ঠেলতে পারি নে।

দশের ইচ্ছা যদি কেবল বাইরে থেকে তাড়না করে তবে তাকে কাটিয়ে ওঠা যায়, কিন্তু সে যখন আমারই ইচ্ছা-আকার ধরে আমারই চূড়ার উপরে বসে হাল চেপে ধরে, আমি যখন জানতেও পারি নে যে বাইরে থেকে সে আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে, তখন তার সঙ্গে লড়াই করবার ইচ্ছামাত্রও চলে যায়।

এতবড়ো একটা সম্মিলিত বিরুদ্ধতার প্রতিকূলে আমার একলা মনের ইচ্ছাটিকে জাগিয়ে রাখতে হবে, এই হয়েছে আমার কঠিন সাধনা।

কিন্তু আশার কথা এই যে, নারায়ণকে যদি সারথি করি তবে অক্ষৌহিণী সেনাকে ভয় করতে হবে না। লড়াই একদিনে শেষ হবে না, কিন্তু শেষ হবেই, জিত হবে তার সন্দেহ নেই।

এই একলা লড়াইয়ের একটা মস্ত সুবিধা এই যে, এর মধ্যে কোনোমতেই ফাঁকি ঢোকাবার জো নেই। দশজনের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে কোনো কৃত্রিমতাকে ঘটিয়ে তোলবার আশঙ্কা নেই। নিতান্ত খাঁটি হয়ে চলতে হবে।

টাকা, বিদ্যা, খ্যাতি প্রভৃতির একটা আকর্ষণ এই যে, সেগুলোকে নিয়ে সকলে মিলে কাড়াকাড়ি করে। অতএব আমি যদি তার কিছু পাই তবে অন্যের চেয়ে আমার জিত হয়। এইজন্যেই সমস্ত উপার্জনের মধ্যে এত ঈর্ষা ক্রোধ লোভ রয়েছে। এইজন্যে লোকে এত ফাঁকি চালায়। যার অর্থ কম সে প্রাণপণে দেখাতে চেষ্টা করে তার অর্থ বেশি, যার বিদ্যা অল্প সে সেটা যথাসাধ্য গোপন করবার চেষ্টায় ফেরে।

এই-সকল জিনিসের দ্বারা মানুষ মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়, সুতরাং জিনিসে যদি কম পড়ে তবে ফাঁকিতে সেটা পূরণ করবার ইচ্ছা হয়। মানুষকে ঠকানোও একেবারে অসাধ্য নয়, এইজন্যে সংসারে অনেক প্রতারণা অনেক আড়ম্বর চলে, এইজন্যে ভিতরে যদি-বা কিছু জমাতে পারি বাইরে তার সাজসরঞ্জাম করি অনেক বেশি।

যে-সব সামগ্রী দশের কাড়াকাড়ির সামগ্রী সেইগুলির সম্বন্ধে এই ফাঁকি অলক্ষ্যে নিজের অগোচরেও এসে পড়ে। ঠাট বজায় রাখবার চেষ্টাকে আমরা দোষের মনে করি নে। এমন-কি, বাহিরের সাজের দ্বারা আমরা ভিতরের জিনিসকে পেলুম বলে নিজেকেও ভোলাই।

কিন্তু যেখানে আমার আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা সেখানে যদি ফাঁকি চালাবার চেষ্টা করি তবে যে একেবারে মূলেই ফাঁকি হবে। গয়লা দশের দুধে জল মিশিয়ে ব্যাবসা চালাতে পারে, কিন্তু নিজের দুধে জল মিশিয়ে তার মুনফা কী হবে।

অতএব এইখানে একেবারে সম্পূর্ণ সত্য হতে হবে। যিনি সত্যস্বরূপ তাঁকে কেউ কোনোদিন ফাঁকি দিয়ে পার পাবে না। যিনি অন্তর্যামী তাঁর কাছে জাল জালিয়াতি খাটবে না। আমি তাঁর কাছে কতটা খাঁটি হলুম তা তিনিই জানবেন— মানুষকে যদি জানাবার ইচ্ছা মনের মধ্যে আসে তবে কোনোদিন জাল-দলিল বানিয়ে তাঁকে সুদ্ধ মানুষের হাটে বিকিয়ে দিয়ে বসে থাকব। ঐখানে দশকে আসতে দিয়ো না, নিজেকে খুব করে বাঁচাও। তুমি যে তাঁকে চাও এই আকাঙ্ক্ষাটির দ্বারা তুমি তাঁকেই লাভ করতে চেষ্টা করো, এর দ্বারা মানুষকে ভোলাবার ইচ্ছা যেন তোমার মনের এক কোণেও না আসে। তোমার এই সাধনায় সবাই যদি তোমাকে পরিত্যাগ করে তাতে তোমার মঙ্গলই হবে, কারণ, ঈশ্বরের আসনে সবাইকে বসাবার প্রলোভন তোমার কেটে যাবে। ঈশ্বরকে যদি কোনোদিন পাও তবে কখনো তাঁকে একলা নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারবে না। কিন্তু সে একটি কঠিন সময়। দশের মধ্যে এসে পড়লেই জল মেশাবার লোভ সামলানো শক্ত হয়, মানুষ তখন মানুষকে চঞ্চল করে, তখন খাঁটি ভগবানকে চালাতে পারি নে, লুকিয়ে লুকিয়ে খানিকটা নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে বসে থাকি। ক্রমে নিজের মিশালটাই বেড়ে উঠতে থাকে, ক্রমে সত্যের বিকারে অমঙ্গলের সৃষ্টি হয়। অতএব পিতাকে যেদিন পিতা বলতে পারব সেদিন পিতাই যেন সে-কথা আমার মুখ থেকে শোনেন, মানুষ যদি শুনতে পায় তো যেন পাশের ঘর থেকেই শোনে।

৩১ চৈত্র

বর্ষশেষ

যাওয়া আসায় মিলে সংসার। এই দুটির মাঝখানে বিচ্ছেদ নেই। বিচ্ছেদ আমরা মনে মনে কল্পনা করি। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় একেবারেই এক হয়ে আছে। সর্বদাই এক হয়ে আছে। সেই এক হয়ে থাকাকেই বলে জগৎসংসার।

আজ বর্ষশেষের সঙ্গে কাল বর্ষারম্ভের কোনো ছেদ নেই— একেবারে নিঃশব্দে অতি সহজে এই শেষ ঐ আরম্ভের মধ্যে প্রবেশ করছে।

কিন্তু এই শেষ এবং আরম্ভের মাঝখানে একবার থেমে দাঁড়ানো আমাদের পক্ষে দরকার। যাওয়া এবং আসাকে একবার বিচ্ছিন্ন করে জানতে হবে, নইলে এই দুটিকে মিলিয়ে জানতে পারব না।

সেইজন্যে আজ বর্ষশেষের দিনে আমরা কেবল যাওয়ার দিকেই মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছি। অস্তাচলকে সম্মুখে রেখে আজ আমাদের পশ্চিম মুখ করে উপাসনা। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি— সমস্ত যাওয়াই যাঁর মধ্যে প্রবেশ করছে, দিবসের শেষ মুহূর্তে যাঁর পায়ের কাছে সকলে নীরবে ভূমিষ্ঠ হয়ে নত হয়ে পড়ছে, আজ সায়াহ্নে তাঁকে আমরা নমস্কার করব।

অবসানকে বিদায়কে মৃত্যুকে আজ আমরা ভক্তির সঙ্গে গভীরভাবে জানব— তার প্রতি আমরা অবিচার করব না। তাকে তাঁরই ছায়া বলে জানব, যস্য ছায়ামৃতম্ যস্য মৃত্যুঃ।

মৃত্যু বড়ো সুন্দর, বড়ো মধুর। মৃত্যুই জীবনকে মধুময় করে রেখেছে। জীবন বড়ো কঠিন ; সে সবই চায়, সবই আঁকড়ে ধরে ; তার বজ্রমুষ্টি কৃপণের মতো কিছুই ছাড়তে চায় না। মৃত্যুই তার কঠিনতাকে রসময় করেছে, তার আকর্ষণকে আলগা করেছে ; মৃত্যুই তার নীরস চোখে জল এনে দেয়, তার পাষাণস্থিতিকে বিচলিত করে।

আসক্তির মতো নিষ্ঠুর শক্ত কিছুই নেই ; সে নিজেকেই জানে, সে কাউকে দয়া করে না, সে কারো জন্যে কিছুমাত্র পথ ছাড়তে চায় না। এই আসক্তিই হচ্ছে জীবনের ধর্ম ; সমস্তকেই সে নেবে বলে সকলের সঙ্গেই সে কেবল লড়াই করছে।

ত্যাগ বড়ো সুন্দর, বড়ো কোমল। সে দ্বার খুলে দেয়। সঞ্চয়কে সে কেবল এক জায়গায় স্তূপাকাররূপে উদ্ধত হয়ে উঠতে দেয় না। সে ছড়িয়ে দেয়, বিলিয়ে দেয়। মৃত্যুরই সেই ঔদার্য। মৃত্যুই পরিবেশন করে, বিতরণ করে। যা এক জায়গায় বড়ো হয়ে উঠতে চায় তাকে সর্বত্র বিস্তীর্ণ করে দেয়।

সংসারের উপরে মৃত্যু আছে বলেই আমরা ক্ষমা করতে পারি। নইলে আমাদের মনটা কিছুতে নরম হত না। সব যায়, চলে যায়, আমরাও যাই। এই বিষাদের ছায়ায় সর্বত্র একটি করুণা মাখিয়ে দিয়েছে। চারি দিকে পূরবী রাগিণীর কোমল সুরগুলি বাজিয়ে তুলে আমাদের মনকে আর্দ্র করেছে। এই বিদায়ের সুরটি যখন কানে এসে পৌঁছোয় তখন ক্ষমা খুবই সহজ হয়ে যায়, তখন বৈরাগ্য নিঃশব্দে এসে আমাদের নেবার জেদটাকে দেবার দিকে আস্তে আস্তে ফিরিয়ে দেয়।

কিছুই থাকে না এইটে যখন জানি তখন পাপকে দুঃখকে ক্ষতিকে আর একান্ত বলে জানি নে। দুর্গতি একটা ভয়ংকর বিভীষিকা হয়েই উঠত যদি জানতুম সে যেখানে আছে সেখান থেকে তার আর নড়চড় নেই। কিন্তু আমরা জানি সমস্তই সরছে এবং সেও সরছে, সুতরাং তার সম্বন্ধে আমাদের হতাশ হতে হবে না। অনন্ত চলার মাঝখানে পাপ কেবল একটা জায়গাতেই পাপ, কিন্তু সেখান থেকে সে এগোচ্ছে। আমরা সব সময়ে দেখতে পাই নে, কিন্তু সে চলছে। ঐখানেই তার পথের শেষ নয়— সে পরিবর্তনের মুখে, সংশোধনের মুখেই রয়েছে। পাপীর মধ্যে পাপ যদি স্থির হয়েই থাকত তা হলে সেই স্থিরত্বের উপর রুদ্রের অসীম শাসনদণ্ড ভয়ানক ভার হয়ে তাকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিত। কিন্তু বিধাতার দণ্ড তো তাকে এক জায়গায় চেপে রাখছে না, সেই দণ্ড তাকে তাড়না করে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই চালানোই তাঁর ক্ষমা। তাঁর মৃত্যু কেবলই মার্জনা করছে, কেবলই ক্ষমার অভিমুখে বহন করছে।

আজ বর্ষশেষ আমাদের জীবনকে কি তাঁর সেই ক্ষমার দ্বারে এনে উপনীত করবে না ? যার উপরে মরণের সীলমোহর দেওয়া আছে, যা যাবার জিনিস, তাকে কি আজও আমরা যেতে দেব না। বছর ভরে যে-সব পাপের আবর্জনা সঞ্চয় করেছি, আজ বৎসরকে বিদায় দেবার সময় কি তার কিছুই বিদায় দিতে পারব না ? ক্ষমা করে ক্ষমা নিয়ে নির্মল হয়ে নব বৎসরে প্রবেশ করতে পাব না ?

আজ আমার মুষ্টি শিথিল হোক। কেবল কাড়ব এবং কেবল মারব এই করে কোনো সুখ কোনো সার্থকতা পাই নি। যিনি সমস্ত গ্রহণ করেন আজ তাঁর সম্মুখে এসে, ছাড়ব এবং মরব এই কথাটা আমার মন বলুক। আজ তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ ছাড়তে সম্পূর্ণ মরতে এক মুহূর্তে পারব না ; তবু ঐ দিকেই মন নত হোক, নিজেকে দেবার দিকেই তার অঞ্জলি প্রসারিত করুক, সূর্যাস্তের সুরেই বাঁশি বাজতে থাক্, মৃত্যুর মোহন রাগিণীতেই প্রাণ কেঁদে উঠুক। নববর্ষের ভারগ্রহণের পূর্বে আজ সন্ধ্যাবেলায় সেই সর্বভারমোচনের সমুদ্রতটে সকল বোঝাই নামিয়ে দিয়ে আত্মসমর্পণের মধ্যে অবগাহন করি ; নিস্তরঙ্গ নীল জলরাশির মধ্যে শীতল হই ; বৎসরের অবসানকে অন্তরের মধ্যে পূর্ণভাবে গ্রহণ করে স্তব্ধ হই, শান্ত হই, পবিত্র হই।

৩১ চৈত্র

অনন্তের ইচ্ছা

আমার শরীরের মধ্যে কতকগুলি ইচ্ছা আছে যা আমার শরীরের গোচর। যেমন আমার খেতে ইচ্ছা করে, স্নান করতে ইচ্ছা করে, শীতের সময় গরম হতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু সমস্ত শরীরের মধ্যে একটি ইচ্ছা আছে যা আমার অগোচরেই আছে। সেটি হচ্ছে স্বাস্থ্যের ইচ্ছা, সে আমাকে খবর না জানিয়েই রোগে এবং অরোগে নিয়ত কাজ করছে। সে ব্যাধির সময় কতরকম প্রতিকারের আশ্চর্য ব্যবস্থা করছে তা আমরা জানিই নে এবং অরোগের সময় সমস্ত শরীরের মধ্যে বিচিত্র ক্রিয়ার সামঞ্জস্য-স্থাপনার জন্যে তার কৌশলের অন্ত নেই, তারও কোনো খবর সে আমাদের জানায় না। এই স্বাস্থ্যের ইচ্ছাটি শরীরের মূলে আমাদের চেতনার অগোচরে রাত্রিদিন নিদ্রায় জাগরণে অবিশ্রাম বিরাজ করছে।

শরীর সম্বন্ধে যে ব্যক্তি জ্ঞানী তিনি এইটিকেই জানেন। তিনি জানেন আমাদের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যতত্ত্ব আছে। শরীরের এই মূল অব্যক্ত ইচ্ছাটিকে যিনি জেনেছেন তিনি শরীরগত সমস্ত ব্যক্ত ইচ্ছাকে এর অনুগত করে তোলেন। ব্যক্ত ইচ্ছা যখন খাব বলে আবদার করছে তখন তাকে তিনি এই অব্যক্ত স্বাস্থ্যের ইচ্ছারই শাসনে নিয়মিত করবার চেষ্টা করেন। শরীর সম্বন্ধে এইটেই হচ্ছে সাধনা।

পাঁচজনের সঙ্গে মিলে আমরা যে একটা সামাজিক শরীর রচনা করে আছি, তার মধ্যেও ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ইচ্ছা আছে। সমাজের প্রত্যেকের নিজের স্বার্থ সুবিধা সুখ ও স্বাধীনতার জন্যে যে ইচ্ছা এইটেই তার ব্যক্ত ইচ্ছা। সকলেই বেশি পেতে চাচ্ছে, সকলেই জিততে চাচ্ছে, যত কম মূল্য দিয়ে যত বেশি পরিমাণ আদায় করতে পারে এই সকলের ইচ্ছা। এই ইচ্ছার সংঘাতে কত ফাঁকি, কত যুদ্ধ, কত দলাদলি চলছে তার আর সীমা নেই।

কিন্তু এরই মধ্যে একটি অব্যক্ত ইচ্ছা ধ্রুব হয়ে আছে। তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু সে আছেই, না থাকলে কোনোমতেই সমাজ রক্ষা পেত না— সে হচ্ছে মঙ্গলের ইচ্ছা। অর্থাৎ সমস্ত সমাজের সুখ হোক, ভালো হোক এই ইচ্ছা প্রত্যেকের মধ্যে নিগূঢ়ভাবেই আছে। এই থাকার উপরেই সমাজ বেঁধে উঠেছে, কোনো প্রত্যক্ষ সুবিধার উপরে নয়।

সমাজ সম্বন্ধে যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা এইটেই জেনেছেন। তাঁরা সমুদয় সুখ সুবিধা স্বাধীনতার ব্যক্ত

ইচ্ছাকে এই গভীরতর অব্যক্ত মঙ্গল-ইচ্ছার অনুগত করতে চেষ্টা করেন। তাঁরা এই নিগূঢ় নিত্য ইচ্ছার কাছে সমস্ত অনিত্য ইচ্ছাকে ত্যাগ করতে পারেন।

আমাদের আত্মার মধ্যেও ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ইচ্ছা আছে। আত্মা আপনাকে নানা দিকে বড়ো বলে অনুভব করতে চায়। সে ধনে বড়ো, বিদ্যায় বড়ো, খ্যাতিতে বড়ো হয়ে নিজেকে বড়ো জানতে চায়। এর জন্যে কাড়াকাড়ি মারামারির অন্ত নেই।

কিন্তু তার মধ্যে প্রতিনিয়ত একটি অব্যক্ত ইচ্ছা রয়েইছে। সকলের বড়ো যিনি, অনন্ত, অখণ্ড, এক, সেই ব্রহ্মের মধ্যে মিলনেই নিজেকে উপলব্ধি করবার ইচ্ছা তার মধ্যে নিগূঢ়রূপে ধ্রুবরূপে রয়েছে। এই অব্যক্ত ইচ্ছাই তার সকলের চেয়ে বড়ো ইচ্ছা।

তিনিই আত্মবিৎ যিনি এই কথাটি জানেন। তিনি আত্মার সমস্ত ইচ্ছাকে সেই নিগূঢ় এক ইচ্ছার অধীন করেন।

শরীরের নানা ইচ্ছা ঐক্যলাভ করেছে একটি একের মধ্যে সেইটি হচ্ছে স্বাস্থ্যের ইচ্ছা, এই গভীর ইচ্ছাটি শরীরের সমস্ত বর্তমান ইচ্ছাকে অতিক্রম করে অনাগতের মধ্যে চলে গেছে। শরীরের যে ভবিষ্যৎটি এখন নেই সেই ভবিষ্যৎকেও সে অধিকার করে রয়েছে।

সমাজশরীরেও নানা ইচ্ছা এক অন্তরতম গোপন ইচ্ছার মধ্যে ঐক্যলাভ করেছে ; সে ঐ মঙ্গল-ইচ্ছা। সে ইচ্ছাও বর্তমান সুখদুঃখের সীমা ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের অভিমুখে চলে গেছে।

আত্মার অন্তরতম ইচ্ছা দেশে কালে কোথাও বদ্ধ নয়। তার যে-সকল ইচ্ছা কেবল পৃথিবীতেই সার্থক হতে পারে সেই-সকল ইচ্ছার মধ্যেই তার সমাপ্তি নয়, অনন্তের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষাই তার জ্ঞান প্রেম কর্মকে কেবলই আকর্ষণ করছে ; সে যেখানে গিয়ে পৌঁচচ্ছে সেখানে গিয়ে থামতে পারছে না। কেবলই ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছা তার সমস্ত ইচ্ছার ভিতরে নিরন্তর জাগ্রত হয়ে রয়েছে।

শরীরের মধ্যে এই স্বাস্থ্যের শান্তি, সমাজের মধ্যে মঙ্গল এবং আত্মার মধ্যে অদ্বিতীয়ের প্রেম, ইচ্ছারূপে বিরাজ করছে। এই ইচ্ছা অনন্তের ইচ্ছা, ব্রহ্মের ইচ্ছা। তাঁর এই ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের সচেতন ইচ্ছাকে সংগত করে দেওয়াই আমাদের মুক্তি। এই ইচ্ছার সঙ্গে অসামঞ্জস্যই আমাদের বন্ধন, আমাদের দুঃখ। ব্রহ্মের যে ইচ্ছা আমাদের মধ্যে আছে সে আমাদের দেশকালের বাইরের দিকে নিয়ে যাবার ইচ্ছা, কোনো বর্তমানের বিশেষ স্বার্থ বা সুখের মধ্যে আবদ্ধ করবার ইচ্ছা নয়। সে-ইচ্ছা কিনা তাঁর প্রেম, এইজন্যে সে তাঁরই দিকে আমাদের টানছে। এই অনন্ত প্রেম যা আমাদের মধ্যেই আছে, তার সঙ্গে আমাদের প্রেমকে যোগ করে দিয়ে আমাদের আনন্দকে বাধামুক্ত করে দেওয়াই আমাদের সাধনা। কী শরীরে, কী সমাজে, কী আত্মায়, সর্বত্রই আমরা এই যে দুটি ইচ্ছার ধারাকে দেখতে পাচ্ছি— একটি আমাদের গোচর অথচ চিরপরিবর্তনশীল, আর-একটি আমাদের অগোচর অথচ চিরন্তন ; একটি কেবল বর্তমানের প্রতিই আকৃষ্ট, আর-একটি অনাগতের দিকে আকর্ষণকারী ; একটি কেবল ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই বদ্ধ, আর-একটি নিখিলের সঙ্গে যোগযুক্ত। এই দুটি ইচ্ছার গতি নিরীক্ষণ করো, এর তাৎপর্য গ্রহণ করো। এদের উভয়ের মধ্যে মিলিত হবার যে একটা তত্ত্ব বিরোধের দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করছে, সেইটি উপলব্ধি করে এই মিলনের জন্যই সমস্ত-জীবন প্রতিদিনই আপনাকে প্রস্তুত করো।

৩ বৈশাখ

পাওয়া ও না-পাওয়া

সেই পাওয়াতেই মানুষের মন আনন্দিত যে পাওয়ার সঙ্গে না-পাওয়া জড়িত হয়ে আছে।

যে-সুখ কেবলমাত্র পাওয়ার দ্বারাই আমাদের উন্মত্ত করে তোলে না— অনেকখানি না-পাওয়ার মধ্যে যার স্থিতি আছে বলেই যার ওজন ঠিক আছে, সেইজন্যেই যাকে আমরা গভীর সুখ বলি— অর্থাৎ, যে-সুখের সকল অংশই একেবারে সুস্পষ্ট সুব্যক্ত নয়, যার এক অংশ নিগূঢ়তার মধ্যে অগোচর, যা প্রকাশের মধ্যেই নিঃশেষিত নয়, তাকেই আমরা উচ্চ শ্রেণীর সুখ বলি।

পেট ভরে আহার করলে পর আহার করবার সুখটা সম্পূর্ণ পাওয়া যায়, দর্শনে স্পর্শনে ঘ্রাণে স্বাদে সর্বপ্রকারে তাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা হয়। সে-সুখের প্রতি যতই লোভ থাকুক, মানুষ তাকে আনন্দের কোঠায় ফেলে না।

কিন্তু যে-সৌন্দর্যবোধকে আমরা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়বোধের দ্বারা সেরে ফেলতে পারি নে— যা বীণার অনুরণনের মতো চেতনার মধ্যে স্পন্দিত হতে থাকে, যা সমাপ্ত হতেই চায় না, সে-আনন্দকে আমরা আহারের আনন্দের সঙ্গে এক শ্রেণীতে গণ্যই করি নে। কেবলমাত্র পাওয়া তাকে অপমানিত করে না, না-পাওয়া তাকে গৌরব দান করে।

আমরা জগতে পাওয়ার মতো পাওয়া তাকেই বলি যে-পাওয়ার মধ্যে অনির্বচনীয়তা আছে। যে-জ্ঞান কেবলমাত্র একটি খবর তার মূল্য অতি অল্প, কেননা সেটা একটা সংকীর্ণ জানার মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। কিন্তু যে জ্ঞান তথ্য নয়, তত্ত্ব, অর্থাৎ যাকে কেবল একটি ঘটনার মধ্যে নিঃশেষ করা যায় না, যা অসংখ্য অতীত ঘটনার মধ্যেও আছে এবং যা অসংখ্য ভাবী ঘটনার মধ্যেও আপনাকে প্রকাশ করবে, যা কেবল ঘটনা-বিশেষের মধ্যে ব্যক্ত বটে কিন্তু অনন্তের মধ্যে অব্যক্তরূপে বিরাজমান, সেই জ্ঞানেই আমাদের আনন্দ। কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন তুচ্ছ খবরে নিতান্ত জড়বুদ্ধি অলস লোকের বিলাস।

ক্ষণিক আমোদ বা ক্ষণিক প্রয়োজনে আমরা অনেক লোকের সঙ্গে মিলি, আমাদের কাছে তারা সেইটুকুর মধ্যেই নিঃশেষিত। কিন্তু যে আমার প্রিয়, কোনো-এক সময়ের আলাপে আমোদে, কোনো-এক সময়ের প্রয়োজনে তার শেষ পাই নে। তার সঙ্গে যে সময়ে যে আলাপে যে কর্মে নিযুক্ত আছি, সে সময়কে সেই আলাপকে সেই কর্মকে বহুদূরে ছাড়িয়ে সে রয়েছে। কোনো বিশেষ দেশে বিশেষ কালে বিশেষ ঘটনায় আমরা তাকে সমাপ্ত করলুম বলে মনেই করতে পারি নে, সে আমার কাছে প্রাপ্ত অথচ অপ্রাপ্ত, এই অপ্রাপ্তি তাকে আমার কাছে এমন আনন্দময় করে রেখেছে।

এর থেকে বোঝা যায় আমাদের আত্মা যে পেতেই চাচ্ছে তা নয়, সে না পেতেও চায়। এইজন্যেই সংসারের সমস্ত দৃশ্যস্পৃশ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে বলছে কেবলই পেয়ে পেয়ে আমি শ্রান্ত হয়ে গেলুম, আমার না-পাওয়ার ধন কোথায়? সেই চিরদিনের না-পাওয়াকে পেলে যে আমি বাঁচি।

যতোবাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

বাক্য মন যাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে সেই আমার না-পাওয়া ব্রহ্মের আনন্দে আমি সমস্ত ক্ষুদ্র ভয় হতে যে রক্ষা পেতে পারি।

এইজন্যেই উপনিষৎ বলেছেন, অবিজ্ঞাতম্ বিজানতাং বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্, যিনি বলেন 'আমি তাঁকে জানি নি' তিনিই জানেন, যিনি বলেন 'আমি জেনেছি' তিনি জানেন না।

আমি তাঁকে জানতে পারলুম না এ কথাটা জানবার অপেক্ষা আছে। পাখি যেমন করে জানে আমি আকাশ পার হতে পারলুম না তেমনি করে জানা চাই, পাখি আকাশকে জানে বলেই সে জানে যে আকাশ পার হওয়া গেল না। আকাশ পার হওয়া গেল না জানে বলেই তার আনন্দ, এইজন্যেই সে আকাশে উড়ে বেড়ায়। কোনো প্রাপ্তি নয়, কেনো সমাপ্তি নয়, কোনো প্রয়োজন নয়, কিন্তু উড়েই তার আনন্দ।

পাখি আকাশকে জানে বলেই সে জানে আমি আকাশকে শেষ করে জানলুম না এবং এই জেনে

না-জানাতেই তার আনন্দ, ব্রহ্মকে জানার কথাতেও এই কথাটাই খাটে। সেইজন্যেই উপনিষৎ বলেন— নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ, আমি যে ব্রহ্মকে বেশ জেনেছি এও নয়, আমি যে একেবারে জানি নে এও নয়।

কেউ কেউ বলেন আমরা ব্রহ্মকে একেবারেই জানতে চাই, যেমন করে এই সমস্ত জিনিসপত্র জানি; নইলে আমার কিছুই হল না।

আমি বলছি আমরা তা চাই নে। যদি চাইতুম তা হলে সংসারই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এখানে জিনিসপত্রের অন্ত কোথায়? এর উপরে আবার কেন? নীড়ের পাখি যেমন আকাশকে চায় তেমনি আমরা এমন কিছুকে চাই যাকে পাওয়া যায় না।

আমার মনে আছে, যাঁরা ব্রহ্মকে চান তাঁদের প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশ করে একজন পণ্ডিত অনেকদিন হল বলেছিলেন— একদল গাঁজাখোর রাত্রে গাঁজা খাবার সভা করেছিল। টিকা ধরাবার আগুন ফুরিয়ে যাওয়াতে তারা সংকটে পড়েছিল। তখন রক্তবর্ণ হয়ে চাঁদ আকাশে উঠছিল। একজন বললে, ঐ যে, ঐ আলোতে টিকা ধরাব। বলে টিকা নিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে চাঁদের অভিমুখে বাড়িয়ে ধরলে। টিকা ধরল না। তখন আর-একজন বললে, দূর, চাঁদ বুঝি অত কাছে! দে আমাকে দে। বলে সে আরো কিছু দূরে গিয়ে টিকা বাড়িয়ে ধরলে। এমনি করে সমস্ত গাঁজাখোরের শক্তি পরাস্ত হল— টিকা ধরল না।

এই গল্পের ভাবখানা হচ্ছে এই যে, যে-ব্রহ্মের সীমা পাওয়া যায় না তাঁর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধস্থাপনের চেষ্টা এইরকম বিড়ম্বনা।

এর থেকে দেখা যাচ্ছে কারও কারও মতে সাংসারিক প্রার্থনা ছাড়া আমাদের মনে আর কোনো প্রার্থনা নেই। আমরা কেবল প্রয়োজনসিদ্ধিই চাই— টিকেয় আমাদের আগুন ধরাতে হবে।

এ কথাটা যে কত অমূলক তা ঐ চাঁদের কথা ভাবলেই বোঝা যাবে। আমরা দেশলাইকে যে ভাবে চাই চাঁদকে সে ভাবে চাই নে, চাঁদকে চাঁদ বলেই চাই, চাঁদ আমাদের বিশেষ কোনো সংকীর্ণ প্রয়োজনের অতীত বলেই তাকে চাই। সেই চিরঅতৃপ্ত অসমাপ্ত পাওয়ার চাওয়াটাই সব চেয়ে বড়ো চাওয়া। সেইজন্যেই পূর্ণচন্দ্র আকাশে উঠলেই নদীতে, নৌকায়, ঘাটে, গ্রামে, পথে, নগরের হর্ম্যতলে, গাছের নীড়ে, চারি দিক থেকে গান জেগে ওঠে; কারও টিকেয় আগুন ধরে না বলে কোথাও কোনো ক্ষোভ থাকে না।

ব্রহ্ম তো তাল বেতাল নন যে তাঁকে আমরা বশ করে নিয়ে প্রয়োজনসিদ্ধি করব। কেবল প্রয়োজন সিদ্ধিতেই পাওয়ার দরকার, আনন্দের পাওয়াতে ঠিক তার উলটো। তাতে না-পাওয়াটাই হচ্ছে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস। যে-জিনিস আমরা পাই তাতে আমাদের যে সুখ সে অহংকারের সুখ। আমার আয়ত্তের জিনিস আমার ভৃত্য, আমার অধীন, আমি তার চেয়ে বড়ো।

কিন্তু এই সুখই মানুষের সব চেয়ে বড়ো সুখ নয়। আমার চেয়ে যে বড়ো তার কাছে আত্মসমর্পণ করার সুখই হচ্ছে আনন্দ। আমার যিনি অতীত আমি তাঁরই এইটি জানাতেই অভয়, এইটি অনুভব করাতেই আনন্দ। যেখানে ভূমানন্দ সেখানে আমি বলি— আমি আর পারলুম না, আমি হাল ছেড়ে দিলুম, আমি গেলুম। গেল আমার অহংকার, গেল আমার শক্তির ঔদ্ধত্য। এই না পেরে ওঠার মধ্যে, এই না-পাওয়ার মধ্যে, নিজেকে একান্ত ছেড়ে দেওয়াই মুক্তি।

মানুষ তো সমাপ্ত নয়, সে তো হয়ে-বয়ে যায় নি, সে যেটুকু হয়েছে সে তো অতি অল্পই। তার না-হওয়াই যে অনন্ত। মানুষ যখন আপনার এই হওয়া-রূপী জীবের বর্তমান প্রয়োজন সাধন করতে চায় তখন প্রয়োজনের সামগ্রীকে নিজের অভাবের সঙ্গে একেবারে সম্পূর্ণ করে চারি দিকে মিলিয়ে নিতে হয়, তার বর্তমানটি একেবারে সম্পূর্ণ বর্তমানকেই চাচ্ছে। কিন্তু সে তো কেবল বর্তমান নয়, সে তো কেবলই হওয়া-রূপী নয়, তার না-হওয়ারূপী অনন্ত যদি কিছুই না পায় তবে তার আনন্দ নেই। পাওয়ার সঙ্গে অনন্ত না-পাওয়া তার সেই অনন্ত না-হওয়াকে আশ্রয় দিচ্ছে, খাদ্য দিচ্ছে। এইজন্যেই মানুষ কেবলই বলে— অনেক দেখলুম, অনেক শুনলুম, অনেক বুঝলুম, কিন্তু আমার না-দেখার ধন,

না-শোনার ধন, না-বোঝার ধন কোথায় ? যা অনাদি বলেই অনন্ত, যা হয় না বলেই যায় না, যাকে পাই নে বলেই হারাই নে, যা আমাকে পেয়েছে বলেই আমি আছি, সেই অশেষের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ করবার জন্যেই আত্মা কাঁদছে। সেই অশেষকে সশেষ করতে চায় এমন ভয়ংকর নির্বোধ সে নয়। যাকে আশ্রয় করবে তাকে আশ্রয় দিতে চায় এমন সমূলে আত্মঘাতী নয়।

৪ বৈশাখ

হওয়া

পাওয়া মানেই আংশিকভাবে পাওয়া। প্রয়োজনের জন্যে আমরা যাকে পাই তাকে তো কেবল প্রয়োজনের মতোই পাই, তার বেশি তো পাই নে। অন্ন কেবল খাওয়ার সঙ্গে মেলে, বস্ত্র কেবল পরার সঙ্গেই মেলে, বাড়ি কেবল বাসের সঙ্গে মেলে। এদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ঐ-সকল ক্ষুদ্র প্রয়োজনের সীমাতে এসে ঠেকে, সেটাকে আর লঙ্ঘন করা যায় না।

এইরকম বিশেষ প্রয়োজনের সংকীর্ণ পাওয়াকেই আমরা লাভ বলি। সেইজন্যে ঈশ্বরকে লাভের কথা যখন ওঠে তখনো ভাষা এবং অভ্যাসের টানে ঐরকম লাভের কথাই মনে উদয় হয়। সে যেন কোনো বিশেষ স্থানে কোনো বিশেষ কালে লাভ, তাঁকে দর্শন মানে কোনো বিশেষ মূর্তিতে কোনো বিশেষ মন্দিরে বা বিশেষ কল্পনায় দর্শন।

কিন্তু পাওয়া বলতে যদি আমরা এই বুঝি তবে ঈশ্বরকে পাওয়া হতেই পারে না। আমরা যা কিছুকে পেলুম বলে মনে করি সে আমাদের ঈশ্বর নয়। তিনি আমাদের পাওয়ার সম্পূর্ণ অতীত। তিনি আমাদের বিষয়-সম্পত্তি নন।

ও জায়গায় আমাদের কেবল হওয়া, পাওয়া নয়। তাঁকে আমরা পাব না, তাঁর মধ্যে আমরা হব। আমার সমস্ত শরীর মন হৃদয় নিয়ে আমি কেবলই হয়ে উঠতে থাকব। ছাড়তে-ছাড়তে বাড়তে-বাড়তে মরতে-মরতে বাঁচতে-বাঁচতে আমি কেবলই হব। পাওয়াটা কেবল এক অংশে পাওয়া, হওয়াটা যে একেবারে সমগ্রভাবে হওয়া— সে তো লাভ নয়, সে বিকাশ।

ভীরু লোকে বলবে— বল কী ! তুমি ব্রহ্ম হবে ! এমন কথা তুমি মুখে আন কী করে !

হাঁ, আমি ব্রহ্মই হব। এ কথা ছাড়া অন্য কথা আমি মুখে আনতে পারি নে। আমি অসংকোচেই বলব আমি ব্রহ্ম হব। কিন্তু আমি ব্রহ্মকে পাব এতবড়ো স্পর্ধার কথা বলতে পারি নে।

তবে কি ব্রহ্মেতে আমাতে তফাত নেই ? মস্ত তফাত আছে। তিনি ব্রহ্ম হয়েই আছেন, আমাকে ব্রহ্ম হতে হচ্ছে। তিনি হয়ে রয়েছেন, আমি হয়ে উঠছি, আমাদের দুজনের মধ্যে এই লীলা চলছে। হয়ে থাকার সঙ্গে হয়ে ওঠার নিয়ত মিলনেই আনন্দ।

নদী কেবলই বলছে আমি সমুদ্র হব। সে তার স্পর্ধা নয়— সে যে সত্য কথা, সুতরাং সেই তার বিনয়। তাই সে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্রমাগতই সমুদ্র হয়ে যাচ্ছে— তার আর সমুদ্র হওয়া শেষ হল না।

বস্তুত চরমে সমুদ্র হতে থাকা ছাড়া তার আর গতিই নেই। তার দুই দীর্ঘ উপকূলে কত খেত কত শহর কত গ্রাম কত বন আছে তার ঠিক নেই। নদী তাদের তুষ্ট করতে পারে, পুষ্ট করতে পারে, কিন্তু তাদের সঙ্গে মিলে যেতে পারে না। এইসমস্ত শহর গ্রাম বনের সঙ্গে তার কেবল আংশিক সম্পর্ক। নদী হাজার ইচ্ছা করলেও শহর গ্রাম বন হয়ে উঠতে পারে না।

সে কেবল সমুদ্রই হতে পারে। তার ছোটো সচল জল সেই বড়ো অচল জলের একই জাত। এইজন্যে তার সমস্ত উপকূল পার হয়ে বিশ্বের মধ্যে সে কেবল ঐ বড়ো জলের সঙ্গেই এক হতে পারে।

সে সমুদ্র হতে পারে, কিন্তু সে সমুদ্রকে পেতে পারে না। সমুদ্রকে সংগ্রহ করে এনে নিজের কোনো বিশেষ প্রয়োজনে তাকে কোনো বিশেষ গুহা-গহ্বরে লুকিয়ে রাখতে পারে না। যদি কোনো ছোটো জলকে দেখিয়ে সে মূঢ়ের মতো বলে 'হাঁ, সমুদ্রকে এইখানে আমি নিজের সম্পত্তি করে রেখেছি', তাকে উত্তর দেব, 'ও তোমার সম্পত্তি হতে পারে, কিন্তু ও তোমার সমুদ্র নয়। তোমার চিরন্তন জলধারা এই জলাটাকে চায় না, সে সমুদ্রকেই চায়। কেননা সে সমুদ্র হতে চাচ্ছে, সে সমুদ্রকে পেতে চাচ্ছে না।'

আমরাও কেবল ব্রহ্মই হতে পারি, আর কিছুই হতে পারি নে। আর কোনো হওয়াতে তো আমরা সম্পূর্ণ হই নে। সমস্তই আমরা পেরিয়ে যাই; পেরোতে পারি নে ব্রহ্মকে। ছোটো সেখানে বড়ো হয়। কিন্তু তার সেই বড়ো হওয়া শেষ হয় না, এই তার আনন্দ।

আমরা এই আনন্দেরই সাধনা করব! আমরা ব্রহ্মে মিলিত হয়ে অহরহ কেবল ব্রহ্মই হতে থাকব। যেখানে বাধা পাব সেখানে হয় ভেঙে নয় এড়িয়ে যাব। অহংকার স্বার্থ এবং জড়তা যেখানে নিষ্ফল বালির স্তূপ হয়ে পথরোধ করে দাঁড়াবে সেখানে প্রতিমুহূর্তে তাকে ক্ষয় করে ফেলব।

সকালবেলায় এইখানে বসে যে একটুখানি উপাসনা করি, এই দেশকালবদ্ধ আংশিক জিনিসটাকে আমরা যেন সিদ্ধি বলে ভ্রম না করি। একটু রস, একটু ভাব, একটু চিন্তাই ব্রহ্ম নয়। এইটুকুমাত্রকে নিয়ে কোনোদিন জমছে কোনোদিন জমছে না বলে খুঁতখুঁত কোরো না। এই সময় এবং এই অনুষ্ঠানটিকে একটি অভ্যস্ত আরামে পরিণত করে সেটাকে একটা পরমার্থ বলে কল্পনা কোরো না। সমস্ত দিন সমস্ত চিন্তায় সমস্ত কাজে একেবারে সমগ্র নিজেকে ব্রহ্মের অভিমুখে চালনা করো— উলটো দিকে নয়, নিজের দিকে নয়, কেবলই সেই ভূমার দিকে, শ্রেয়ের দিকে, অমৃতের দিকে। সমুদ্রে নদীর মতো তাঁর সঙ্গে মিলিত হও— তা হলে তোমার সমস্ত সত্তার ধারা কেবলই তিনিময় হতে থাকবে, কেবলই তুমি ব্রহ্ম হয়ে উঠবে। তা হলে তুমি তোমার সমস্ত জীবন দিয়ে সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে জানতে পারবে ব্রহ্মই তোমার পরমা গতি, পরমা সম্পৎ, পরম আশ্রয়, পরম আনন্দ, কেননা তাঁতেই তোমার পরম হওয়া।

৬ বৈশাখ

মুক্তি

এই যে সকালবেলাটি প্রতিদিন আমাদের কাছে প্রকাশিত হয় এতে আমাদের আনন্দ অল্পই। এই সকাল আমাদের অভ্যাসের দ্বারা জীর্ণ হয়ে গেছে।

অভ্যাস আমাদের নিজের মনের তুচ্ছতা দ্বারা সকল মহৎ জিনিসকেই তুচ্ছ করে দেয়। সে নাকি নিজে বদ্ধ, এইজন্যে সে সমস্ত জিনিসকেই বদ্ধ করে দেয়।

আমরা যখন বিদেশে বেড়াতে যাই তখন কোনো নূতন পৃথিবীকে দেখতে যাই নে। এই মাটি এই জল এই আকাশকেই আমাদের অভ্যাস থেকে বিমুক্ত করে দেখতে যাই। আবরণটাকে ঘুচিয়ে এই পৃথিবীর উপরে চোখ মেললেই এই চিরদিনের পৃথিবীতেই সেই অভাবনীয়কে দেখতে পাই যিনি কোনোদিন পুরাতন নন। তখনই আনন্দ পাই।

যে আমাদের প্রিয়, অভ্যাস তাকে সহজে বেষ্টন করতে পারে না। এইজন্যই প্রিয়জন চিরদিনই অভাবনীয়কে অনন্তকে আমাদের কাছে প্রকাশ করতে পারে। তাকে যে আমরা দেখি সেই দেখাতেই আমাদের দেখা শেষ হয় না— সে আমাদের দেখা শোনা আমাদের সমস্ত বোধকেই ছাড়িয়ে বাকি থাকে। এইজন্যেই তাতে আমাদের আনন্দ।

তাই উপনিষৎ— আনন্দরূপমমৃতং— ঈশ্বরের আনন্দরূপকে অমৃত বলেছেন। আমাদের কাছে যা

মরে যায়, যা ফুরিয়ে যায়, তাতে আমাদের আনন্দ নেই— যেখানে আমরা সীমার মধ্যে অসীমকে দেখি, অমৃতকে দেখি, সেখানেই আমাদের আনন্দ।

এই অসীমই সত্য— তাঁকে দেখাই সত্যকে দেখা। যেখানে তা না দেখবে সেইখানেই বুঝতে হবে আমাদের নিজের জড়তা মূঢ়তা অভ্যাস ও সংস্কারের দ্বারা আমরা সত্যকে অবরুদ্ধ করেছি, সেইজন্যে তাতে আমরা আনন্দ পাচ্ছি নে।

বৈজ্ঞানিক বলো, দার্শনিক বলো, কবি বলো, তাঁদের কাজই মানুষের এই সমস্ত মূঢ়তা ও অভ্যাসের আবরণ মোচন করে এই জগতের মধ্যে সত্যের অনন্তরূপকে দেখানো, যা-কিছু দেখছি একেই সত্য করে দেখানো, নূতন কিছু তৈরি করা নয়, কল্পনা করা নয়। এই সত্যকে মুক্ত করে দেখানোর মানেই হচ্ছে মানুষের আনন্দের অধিকার বাড়িয়ে দেওয়া।

যেমন ঘর ছেড়ে দিয়ে কোনো দূরদেশে যাওয়াকে অন্ধকারমুক্তি বলে না, ঘরের দরজাকে খুলে দেওয়াই বলে অন্ধকার-মোচন, তেমনি জগৎসংসারকে ত্যাগ করাই মুক্তি নয়— পাপ স্বার্থ অহংকার জড়তা মূঢ়তা ও সংস্কারের বন্ধন কাটিয়ে, যা দেখছি একেই সত্য করে দেখা, যা করছি একেই সত্য করে করা, যার মধ্যে আছি এরই মধ্যে সত্য করে থাকাই মুক্তি।

যদি এই কথাই সত্য হয় যে, ব্রহ্ম কেবল আপনার অব্যক্তস্বরূপেই আনন্দিত তা হলে তাঁর সেই অব্যক্তস্বরূপের মধ্যে বিলীন না হলে নিরানন্দের হাত থেকে আমাদের কোনোক্রমেই নিস্তার থাকত না। কিন্তু তা তো নয়, প্রকাশেই যে তাঁর আনন্দ। নইলে এই জগৎ তিনি প্রকাশ করলেন কেন? বাইরে থেকে কোনো প্রকাণ্ড পীড়া জোর করে তাঁকে প্রকাশ করিয়েছে? মায়া-নামক কোনো একটা পদার্থ ব্রহ্মকে একেবারে অভিভূত করে নিজেকে প্রকাশমান করেছে?

সে তো হতেই পারে না। তাই উপনিষৎ বলেছেন, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি, এই যে প্রকাশমান জগৎ এ আর কিছু নয়, তাঁর মৃত্যুহীন আনন্দই রূপধারণ করে প্রকাশ পাচ্ছে। আনন্দই তাঁর প্রকাশ, প্রকাশেই তাঁর আনন্দ।

তিনি যদি প্রকাশেই আনন্দিত তবে আমি কি আনন্দের জন্যে অপ্রকাশের সন্ধান করব। তাঁর যদি ইচ্ছাই হয় প্রকাশ, তবে আমার এই ক্ষুদ্র ইচ্ছাটুকুর দ্বারা আমি তাঁর সেই প্রকাশের হাত এড়াই বা কেমন করে?

তাঁর আনন্দের সঙ্গে যোগ না দিয়ে আমি কিছুতেই আনন্দিত হতে পারব না। এর সঙ্গে যেখানেই আমার যোগ সম্পূর্ণ হবে সেইখানেই আমার মুক্তি হবে, সেইখানেই আমার আনন্দ হবে। বিশ্বের মধ্যে তাঁর প্রকাশকে অবাধে উপলব্ধি করেই আমি মুক্ত হব— নিজের মধ্যে তার প্রকাশকে অবাধে দীপ্যমান করেই আমি মুক্ত হব। ভববন্ধন অর্থাৎ হওয়ার বন্ধন ছেদন করে মুক্তি নয়— হওয়াকেই বন্ধনস্বরূপ না করে মুক্তিস্বরূপ করাই হচ্ছে মুক্তি। কর্মকে পরিত্যাগ করাই মুক্তি নয়, কর্মকে আনন্দোদ্ভব কর্ম করাই মুক্তি। তিনি যেমন আনন্দ প্রকাশ করছেন তেমনি আনন্দেই প্রকাশকে বরণ করা, তিনি যেমন আনন্দে কর্ম করছেন তেমনি আনন্দেই কর্মকে গ্রহণ করা, একেই বলি মুক্তি। কিছুই বর্জন না করে সমস্তকেই সত্যভাবে স্বীকার করে মুক্তি।

প্রতিদিনের এই যে অভ্যস্ত পৃথিবী আমার কাছে জীর্ণ, অভ্যস্ত প্রভাত আমার কাছে ম্লান, কবে এরাই আমার কাছে নবীন ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে? যেদিন প্রেমের দ্বারা আমার চেতনা নবশক্তিতে জাগ্রত হয়। যাকে ভালোবাসি আজ তার সঙ্গে দেখা হবে এই কথা স্মরণ হলে কাল যা কিছু শ্রীহীন ছিল আজ সেই সমস্তই সুন্দর হয়ে ওঠে। প্রেমের দ্বারা চেতনা যে পূর্ণশক্তি লাভ করে সেই পূর্ণতার দ্বারাই সে সীমার মধ্যে অসীমকে, রূপের মধ্যে অরূপকে, দেখতে পায়; তাকে নূতন কোথাও যেতে হয় না। ঐ অভাবটুকুর দ্বারাই অসীম সত্য তার কাছে সীমায় বদ্ধ হয়ে ছিল।

বিশ্ব তাঁর আনন্দরূপ; কিন্তু আমরা রূপকে দেখছি আনন্দকে দেখছি নে, সেইজন্যে রূপ কেবল পদে পদে আমাদের আঘাত করছে। আনন্দকে যেমনি দেখব অমনি কেউ আর আমাদের কোনো বাধা দিতে পারবে না। সেই তো মুক্তি।

সেই মুক্তি বৈরাগ্যের মুক্তি নয়, সেই মুক্তি প্রেমের মুক্তি। ত্যাগের মুক্তি নয়, যোগের মুক্তি। লয়ের মুক্তি নয়, প্রকাশের মুক্তি।

৭ বৈশাখ

মুক্তির পথ

যে-ভাষা জানি নে সেই ভাষার কাব্য যদি শোনা যায় তবে শব্দগুলো কেবলই আমার কানে ঠেকতে থাকে, সেই ভাষা আমাকে পীড়া দেয়।

ভাষার সঙ্গে যখন পরিচয় হয় তখন শব্দ আর আমার বাধা হয় না। তখন তার ভিতরকার ভাবটি গ্রহণ করবামাত্র শব্দই আনন্দকর হয়ে ওঠে, তখন তাকে কাব্য বলে বুঝতে পারি, ভোগ করতে পারি।

বালক যখন কোনো দুর্বোধ ভাষার কাব্য শোনার পীড়া হতে মুক্তি প্রার্থনা করে তখন কাব্যপাঠ বন্ধ করে তাকে যে মুক্তি দেওয়া যায় সে মুক্তির মূল্য অতি তুচ্ছ। কিন্তু সেই পাঠটিকে তার পক্ষে সত্য করে তুলে পূর্ণ করে তুলে তাকে যে মূঢ়তার পীড়া হতে মুক্তি দেওয়া হয় সেই হচ্ছে যথার্থ মুক্তি, চিরন্তন মুক্তি।

পৃথিবীতে তেমনি হওয়াতেই যদি আমরা দুঃখ পাই, তাকে আমরা ভবযন্ত্রণা বলি। জগৎ যদি আমাদের আনন্দ না দেয়, তবে বিশ্বকবির এই বিরাট কাব্যকে অর্থহীন অমূলক পদার্থ বলে এর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াকেই আমরা চরিতার্থতা বলব।

কিন্তু এই কাব্যখানিকে আমরা নিজের ইচ্ছামত ছিঁড়ে পুড়িয়ে একেবারে এর চিহ্ন লোপ করে দিতে পারি এমন কথা মনে করবার কোনো হেতু নেই।

সমুদ্রকে বিলুপ্ত করে দিয়ে সমুদ্র পার হবার চেষ্টা করার চেয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে পার হওয়া ঢের বেশি সহজ। এ পর্যন্ত কোনো দেশের মানুষ সমুদ্র সেঁচে ফেলবার চেষ্টা করে নি, তারা সাধ্যমত নৌকো জাহাজ বানিয়েছে।

বিশ্বকাব্যকে নিরর্থক অপবাদ দিয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করবার তপস্যায় প্রবৃত্ত না হয়ে বিশ্বকাব্য শোনাকে সার্থক করে তোলাই হচ্ছে যথার্থ মুক্তি।

এই বিশ্বপ্রকাশের রূপের মধ্যে যখন আনন্দকে দেখব, কেবলই রূপকে দেখব না, তখন রূপ আমাকে আর বাধা দেবে না। সে যে কেবল পথ ছেড়ে দেবে তা নয়, আনন্দই দেবে। ভাবটি বোঝবামাত্র ভাষা যে কেবল তার পীড়াকরতা ত্যাগ করে তা নয়, ভাষা তখন নিজের সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটন করে আনন্দময় হয়ে ওঠে, ভাবে ভাষায় অন্তরে বাহিরে মিলন তখন আমাদের মুগ্ধ করে। তখন সেই ভাষার উপরে যদি কেউ কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করে সে আমাদের পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই-যে ভিতরকার আনন্দ এটা বাইরে থেকে বোঝা যায় না, এটা নিজের ভিতর থেকেই বুঝতে হয়। যে ভাষা জানি নে কেবলমাত্র বাইরে থেকে বইয়ের উপর চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে কোনোকালেই তাকে পাওয়া যায় না। চোখ কান সেখান থেকে প্রতিহতই হতে থাকে। নিজের ভিতরকার জ্ঞানের শক্তিতেই তাকে বুঝতে হয়। যখন একবার ভিতর বুঝি তখন বাইরে আর কোনো বাধা থাকে না। তখন বাইরেও আনন্দ প্রকাশিত হয়।

আমার মধ্যে যখন আনন্দের আবির্ভাব হয় তখন বাইরের আনন্দরূপ আপনি আমার কাছে অমৃতে পূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। পাওয়াই পাওয়াকে টেনে নিয়ে আসে। মরুভূমির রসহীন তপ্ত বাতাসের ঊর্ধ্ব দিয়ে কত মেঘ চলে যায়— শুষ্ক হাওয়া তার কাছ থেকে বৃষ্টি আদায় করে নিতে পারে না। যেখানে হাওয়ার মধ্যেই জল আছে সেখানে সজল মেঘের সঙ্গে তার যোগ হয়ে বর্ষণ উপস্থিত হয়।

আমার মধ্যে যদি আনন্দ না থাকে তবে বিশ্বের চিরানন্দপ্রবাহ আমার উপর দিয়ে নিরর্থক হয়েই চলে যায়— আমি তার কাছ থেকে রস আদায় করতে পারি নে।

আমার মধ্যে জ্ঞানের উন্মেষ হলে তখনই সেই জ্ঞানদৃষ্টিতেই জানতে পারি বিশ্বের কোথাও জ্ঞানের ব্যত্যয় নেই, তাকেই আমরা বিজ্ঞান বলি। যে মূঢ়, যার জ্ঞানদৃষ্টি খোলে নি, সে বিশ্বেও সর্বত্র মূঢ়তা দেখে. বিশ্ব তার কাছে ভূতপ্রেত দৈত্যদানায় বিভীষিকাপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এমনি সকল বিষয়েই। আমার মধ্যে যদি প্রেম না জাগে, আনন্দ না থাকে, তবে বিশ্ব আমার পক্ষে কারাগার। সেই কারাগার থেকে পালাবার চেষ্টা মিথ্যা, প্রেমকে জাগিয়ে তোলাই মুক্তি। কোনো ব্যায়ামের দ্বারা, কোনো কৌশলের দ্বারা মুক্তি নেই।

বিজ্ঞানের সাধনা যেমন আমাদের প্রাকৃতিক জ্ঞানের বন্ধন মোচন করছে, তেমনি মঙ্গলের সাধনাই আমাদের প্রেমের, আমাদের আনন্দের, বন্ধন মোচন করে দেয়। এই মঙ্গলসাধনাই আমাদের সংকীর্ণ প্রেমকে প্রশস্ত, খামখেয়ালি প্রেমকে জ্ঞানসম্মত করে তোলে।

বিজ্ঞানে প্রকৃতির মধ্যে আমাদের জ্ঞান যোগযুক্ত হয়। সে বিচ্ছিন্ন জ্ঞান নয়, সে অতীতে বর্তমানে ভবিষ্যতে, দূরে ও নিকটে, সর্বত্র ঐক্যের দ্বারা অনন্তের সঙ্গে যুক্ত। মঙ্গলেও তেমনি প্রেম সর্বত্র যোগযুক্ত হয়। সমস্ত সাময়িকতা ও স্থানিকতাকে অতিক্রম করে সে অনন্তে মিলিত হয়। তার কাছে দূর নিকটের ভেদ ঘোচে, পরিচিত অপরিচিতের ভেদ ঘুচে যায়। তখনই প্রেমের বন্ধন মোচন হয়ে যায়। একেই তো বলে মুক্তি।

বুদ্ধদেব শূন্যকে মানতেন কি পূর্ণকে মানতেন সে তর্কের মধ্যে যেতে চাই নে। কিন্তু তিনি মঙ্গলসাধনার দ্বারা প্রেমকে বিশ্বচরাচরে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর মুক্তির সাধনাই ছিল স্বার্থত্যাগ অহংকারত্যাগ ক্রোধত্যাগের সাধনা— ক্ষমার সাধনা, দয়ার সাধনা, প্রেমের সাধনা। এমনি করে প্রেম যখন অহং-এর শাসন অতিক্রম করে বিশ্বের মধ্যে অনন্তের মধ্যে মুক্ত হয়, তখন সে যা পায় তাকে যে নামই দাও-না কেন, সে কেবল ভাষার বৈচিত্র্যমাত্র, কিন্তু সেই-ই মুক্তি। এই প্রেম যা যেখানে আছে কিছুকেই ত্যাগ করে না, সমস্তকেই সত্যময় করে পূর্ণতম করে উপলব্ধি করে। নিজেকে পূর্ণের মধ্যে সমর্পণ করবার কোনো বাধাই মানে না।

আত্মার মধ্যে পরমাত্মার অনন্ত প্রেম অনন্ত আনন্দকে অবাধে উপলব্ধি করবার উপায় হচ্ছে— পাপপরিশূন্য মঙ্গলসাধন। সেই উপলব্ধি যতই বন্ধনহীন যতই সত্য হতে থাকবে ততই বিশ্বসংসারে সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধে চিন্তায় ভাবে কর্মে আমাদের আনন্দ অব্যাহত হবে। আমরা তখন পরমাত্মার দিক থেকেই জগৎকে দেখব— নিজের দিক থেকে নয়। তখনই জগতের সত্য আমাদের কাছে আনন্দে পরিপূর্ণ হবে, মহাকবির চিরন্তন কাব্য আমাদের কাছে সার্থক হয়ে উঠবে।

৭ বৈশাখ

৯

আশ্রম

শান্তিনিকেতনের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে

প্রভাতের সূর্য যে উৎসবদিনটির পদ্মদলগুলিকে দিকে দিকে উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন তারই মর্মকোষের মধ্যে প্রবেশ করবার জন্যে আজ আমাদের আহ্বান আছে। তার স্বর্ণরেণুর অন্তরালে যে মধু সঞ্চিত আছে, সেখান থেকে কি কোনো সুগন্ধ আজ আমাদের হৃদয়ের মাঝখানে এসে পৌঁছোয় নি? এই বিশ্ব-উপবনের রহস্য-নিলয়ের ভিতরটিতে প্রবেশের সহজ অধিকার আছে যার, সেই চিত্তমধুকর কি আজও এখনো জাগল না? কোনো বাতাসে এখনো সে কি খবর পায় নি? আজকের দিন যে একটি অনেক দিনের খবর নিয়ে বেরিয়েছে এবং সে যে সম্মুখের অনেক দিনের দিকেই চলেছে। সে যে দূর ভবিষ্যতের পথিক। আজ তাকে ধরে দাঁড় করিয়ে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, তার যা-কিছু কথা আছে সমস্ত আদায় করে নেওয়া চাই। সমস্ত মন দিয়ে না জিজ্ঞাসা করলে সে কাউকে কিছুই বলে না, তখন আমরা মনে করি— এই গান, এই বাদ্যধ্বনি, এই জনতার কোলাহল, এই বুঝি তার যা ছিল সমস্ত, আর বুঝি তার কোনো বাণী নেই। কিন্তু এমন করে তাকে যেতে দেওয়া হবে না, আজ এই সমস্ত কোলাহলের মধ্যে যে নিস্তব্ধ হয়ে আছে সেই পথিকটিকে জিজ্ঞাসা করো— আজ এ কিসের উৎসব?

প্রতি বৎসর বসন্তে আমের বনে ফলভরা শাখার মধ্যে দক্ষিণের বাতাস বইতে থাকে, সেই সময়ে আমের বনে তার বার্ষিক উৎসবের ঘটা। কিন্তু এই উৎসবের উৎসবত্ব কী নিয়ে, কিসের জন্যে? না, যে বীজ থেকে আমের গাছ জন্মেছে সেই বীজ অমর হয়ে গেছে এই শুভ খবরটি দেবার জন্যে। বৎসরে বৎসরে ফল ধরছে, সে ফলের মধ্যে সেই একই বীজ, সেই পুরাতন-বীজ। সে আর কিছুতেই ফুরোচ্ছে না, সে নিত্যকালের পথে নিজেকে দ্বিগুণিত চতুরগুণিত সহস্রগুণিত করে চলেছে।

শান্তিনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসবের সফলতার মর্মস্থান যদি উদ্‌ঘাটন করে দেখি তবে দেখতে পাব এর মধ্যে সেই বীজ অমর হয়ে আছে যে বীজ থেকে এই আশ্রম-বনস্পতি জন্মলাভ করেছে।

সে হচ্ছে সেই দীক্ষাগ্রহণের বীজ। মহর্ষির সেই জীবনের দীক্ষা এই আশ্রম-বনস্পতিতে আজ আমাদের জন্যে ফলছে এবং আমাদের আগামীকালের উত্তরবংশীয়দের জন্যে ফলতেই চলবে।

বহুকাল পূর্বে কোন্ একদিনে মহর্ষি দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, সে খবর কজন লোকই বা জানত? যারা জেনেছিল, যারা দেখেছিল, তারা মনে মনে ঠিক করেছিল এই একটি ঘটনা আজকে ঘটল এবং আজকেই এটা শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু এই দীক্ষাগ্রহণ ব্যাপারটিকে সেই সুদূর কালের ৭ই পৌষ নিজের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিঃশেষ করে ফেলতে পারে নি। সেই একটি দিনের মধ্যেই একে কুলিয়ে উঠল না। সেদিন যার খবর কেউ পায় নি এবং তার পরে বহুকাল পর্যন্ত যার পরিচয় পৃথিবীর কাছে অজ্ঞাত ছিল, সেই ৭ই পৌষের দীক্ষার দিন আজ অমর হয়ে বৎসরে বৎসরে উৎসবফল প্রসব করছে।

আমাদের জীবনে কত শত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, কিন্তু চিরপ্রাণ তো তাদের স্পর্শ করে না; তারা ঘটছে এবং মিলিয়ে যাচ্ছে— তার হিসেব কোথাও থাকছে না।

কিন্তু মহাপ্রাণ এসে কার জীবনের কোন্ মুহূর্তটিতে কখন লুকিয়ে স্পর্শ করে দেন, তার উপরে নিজের অদৃশ্য চিহ্নটি লিখে দিয়ে চলে যান, তার পরে তাকে কেউ না দেখুক, না জানুক, সে হেলায় ফেলায় পড়ে থাক্, তাকে আবর্জনা বলে লোকে ঝেঁটিয়ে ফেলুক, সেদিনকার এবং তার পরে বহুদিনকার ইতিহাসের পাতে তার কোনো উল্লেখ না থাকুক, কিন্তু সে রয়ে গেল। জগতের রাশি রাশি মৃত্যু ও বিস্মৃতির মাঝখান থেকে সে আপনার অঙ্কুরটি নিয়ে অতি অনায়াসে মাথা তুলে ওঠে, নিত্যকালের সূর্যালোক এবং নিত্যকালের সমীরণ তাকে পালন করবার ভার গ্রহণ করে, সদাচঞ্চল সংসারের ভয়ংকর ঠেলাঠেলিতেও তাকে আর সরিয়ে ফেলতে পারে না।

মহর্ষির জীবনের একটি ৭ই পৌষকে সেই প্রাণস্বরূপ অমৃতপুরুষ একদিন নিঃশব্দে স্পর্শ করে গিয়েছেন, তার উপরে আর মৃত্যুর অধিকার রইল না। সেই দিনটি তাঁর জীবনের সমস্ত দিনকে ব্যাপ্ত করে কিরকম করে প্রকাশ পেয়েছে তা কারও অগোচর নেই। তার পরে তাঁর দীর্ঘ জীবনের মধ্যেও সেই দিনটির শেষ হয় নি। আজও সে বেঁচে আছে— শুধু বেঁচে নেই, তার প্রাণশক্তির বিকাশ ক্রমশই প্রবলতর হয়ে উঠছে।

পৃথিবীতে আমরা অধিকাংশ লোকই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছি। আমাদের মধ্যে সেই প্রকাশ নেই যে-প্রকাশকে ঋষি আহ্বান করে বলেছেন : আবিরাবীর্ম এধি— হে প্রকাশ, তুমি আমাতে প্রকাশিত হও। তাঁর সেই প্রকাশ যাঁর জীবনে আবির্ভূত তিনি তো আর নিজের ঘরের প্রাচীরের দ্বারা নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারেন না এবং তিনি নিজের আয়ুটুকুর মধ্যেই নিজে সমাপ্ত হয়ে থাকেন না। নিজের মধ্যে থেকে তাঁকে সর্বদেশে এবং নিত্যকালে বাহির হতেই হবে। সেইজন্যেই উপনিষৎ বলেছেন—

> যদৈতম্ অনুপশ্যতি আত্মানং দেবম্ অঞ্জসা
> ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।

যখন এই দেবতাকে, এই পরমাত্মাকে, এই ভূতভবিষ্যতের ঈশ্বরকে কোনো ব্যক্তি সাক্ষাৎ দেখতে পান তখন তিনি আর গোপনে থাকতে পারেন না।

তাঁকে যিনি সাক্ষাৎ দেখেছেন, অর্থাৎ একেবারে নিজের অন্তরাত্মার মাঝখানেই দেখেছেন, তাঁর আর পর্দা নেই, দেয়াল নেই, প্রাচীর নেই। তিনি সমস্ত দেশের, সমস্ত কালের। তাঁর কথার মধ্যে, আচরণের মধ্যে, নিত্যতার লক্ষণ আপনিই প্রকাশ পেতে থাকে।

এর কারণ কী ? এর কারণ হচ্ছে এই যে, তিনি যে আত্মানং, সকল আত্মার আত্মাকে দেখেছেন। যারা সেই আত্মাকে দেখে নি তারা অহংকেই বড়ো করে দেখে। তারা বাহিরের দরজার কাছেই ঠেকে গিয়েছে। তারা কেবল আমার খাওয়া আমার পরা, আমার বুদ্ধি আমার মত, আমার খ্যাতি আমার বিত্ত— একেই প্রধান করে দেখে। এই-যে অহংকার এতে সত্য নেই, নিত্য নেই ; এ আলোকের দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না, আঘাতের দ্বারা প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।

কিন্তু যে-লোক আত্মাকে দেখেছে সে আর অহং-এর দিকে দৃক্‌পাত করতে চায় না। তার সমস্ত অহং-এর আয়োজন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যে-প্রদীপে আলোকের শিখা ধরে নি সেই তো নিজের প্রচুর তেল ও পলতের সঞ্চয় নিয়ে গর্ব করে। আর যাতে আলো একবার ধরে গিয়েছে সে কি আর নিজের তেল পলতের দিকে ফিরে তাকায় ? সে ঐ আলোটির পিছনে তার সমস্ত তেল সমস্ত পলতে উৎসর্গ করে দেয়। কিন্তু সে একেবারে প্রকাশ হয়ে পড়ে, সে আর নিজের আড়ালে গোপনে থাকতে পারে না।

ন ততো বিজুগুপ্সতে। কেন ? কেননা তিনি অনুপশ্যতি আত্মানং দেবং। তিনি আত্মাকে দেখেছেন, দেবকে দেখেছেন। দেব শব্দের অর্থ দীপ্তিমান। আত্মা যে দেব, আত্মা যে জ্যোতির্ময়। আত্মা যে স্বতঃপ্রকাশিত। অহং প্রদীপ মাত্র, আর আত্মা যে আলোক। অহং-দীপ যখন এই দীপ্তিকে, এই আত্মাকে উপলব্ধি করে তখন সে কি আর অহংকারের সঞ্চয় নিয়ে থাকে ? তখন সে আপনার সব দিয়েই সেই আলোককেই প্রকাশ করে।

সে যে তাঁকে দেখেছে যিনি ঈশানো ভূতভব্যস্য, যিনি অতীত ও ভবিষ্যতের অধিপতি। সেইজন্যেই সে যে সেই বৃহৎ কালের ক্ষেত্রেই আপনাকে এবং সবকিছুকেই দেখতে পায়। সে তো কোনো সাময়িক আসক্তির দ্বারা বদ্ধ হয় না, কোনো সাময়িক ক্ষোভের দ্বারা বিচলিত হতে পারে না। এইজন্যই তার বাক্য ও কর্ম নিত্য হয়ে ওঠে। তা কালে কালে ক্রমশই প্রবলতর হয়ে ব্যক্ত হতে থাকে। যদি-বা কোনো এক সময়ে কোনো কারণে তা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তবে নিজের আচ্ছাদনকে দগ্ধ করে আবার নবীনতর উজ্জ্বলতায় সে দীপ্যমান হয়ে ওঠে।

মহর্ষির ৭ই পৌষের দীক্ষার উপরে আত্মার দীপ্তি পড়েছিল, তার উপরে ভূত-ভবিষ্যতের যিনি ঈশান তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। এইজন্যে সেই দীক্ষা ভিতরে থেকে তাঁর জীবনকে ধনীগৃহের

প্রস্তরকঠিন আচ্ছাদন থেকে সর্বদেশ সর্বকালের দিকে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে। এবং সেই ৭ই পৌষ এই শান্তিনিকেতন আশ্রমকে সৃষ্টি করেছে এবং এখনো প্রতিদিন একে সৃষ্টি করে তুলছে।

তিনি আজ প্রায় অর্ধ শতাব্দী হল যেদিন এর সপ্তপর্ণের ছায়ায় এসে বসলেন সেদিন তিনি জানতেন না যে, তাঁর জীবনের সাধনা এইখানে নিত্য হয়ে বিরাজ করবে। তিনি ভেবেছিলেন নির্জন উপাসনার জন্যে এখানে তিনি একটি বাগান তৈরি করেছেন। কিন্তু, ন ততো বিজুগুপ্সতে। যে-জায়গায় বড়ো এসে দাঁড়ান সে-জায়গাকে ছোটো বেড়া দিয়ে আর ঘেরা যায় না। ধনীর সন্তান নিজেকে যেমন পারিবারিক ধনমানসম্ভ্রমের মধ্যে ধরে রাখতে পারেন নি, সকলের কাছে তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে, তেমনি এই শান্তিনিকেতনকেও তিনি আর বাগান করে রাখতে পারলেন না। এ তাঁর বিষয়সম্পত্তির আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে বেরিয়ে পড়েছে। এ আপনিই আজ আশ্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যিনি ঈশানো ভূতভব্যস্য তাঁর স্পর্শে বোলপুরের মাঠের এই ভূখণ্ডটুকু ভূত ও ভবিষ্যতের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই আশ্রমটির মধ্যে ভারতবর্ষের একটি ভূতকালের আবির্ভাব আছে। সে হচ্ছে সেই তপোবনের কাল। যে-কালে ভারতবর্ষ তপোবনে শিক্ষালাভ করেছে, তপোবনে সাধনা করেছে এবং সংসারের কর্ম সমাধা করে তপোবনে জীবিতেশ্বরের কাছে জীবনের শেষ নিশ্বাস নিবেদন করে দিয়েছে। যে-কালে ভারতবর্ষ জল স্থল আকাশের সঙ্গে আপনার যোগ স্থাপন করেছে এবং তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ দূর করে দিয়ে— সর্বভূতেষু চাত্মানং— আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দর্শন করেছে।

শুধু ভূতকাল নয়, এই আশ্রমটির মধ্যে একটি ভবিষ্যৎকালের আবির্ভাব আছে। কারণ, সত্য কোনো অতীতকালের জিনিস হতেই পারে না। যা একেবারেই হয়ে চুকে গেছে, যার মধ্যে ভবিষ্যতে আর হবার কিছুই নেই তা মিথ্যা, তা মায়া। বিশ্বপ্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আত্মার সঙ্গে ভূমার যোগসাধনা এই যদি সত্য সাধনা হয়, তবে এই সাধনার মধ্যে এসে উপস্থিত না হলে কোনো কালের কোনো সমস্যার মীমাংসা হতে পারবে না। এই সাধনা না থাকলে সত্যের সঙ্গে মঙ্গলকে আমরা এক করে দেখতে পাব না, মঙ্গলের সঙ্গে সুন্দরের আমরা বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বসব। এই সাধনা না থাকলে আমরা জগতে অনৈক্যকেই বড়ো করে জানব এবং স্বাতন্ত্র্যকেই পরম পদার্থ বলে জ্ঞান করব, পরস্পরকে খর্ব করে প্রবল হয়ে ওঠবার জন্য কেবলই ঠেলাঠেলি করতে থাকব। সমস্তকে এক করে নিয়ে যিনি শান্তং শিবং অদ্বৈতম্‌-রূপে বিরাজ করছেন তাঁকে সর্বত্র উপলব্ধি করবার জন্যে না পাব অবকাশ, না পাব মনের শান্তি।

অতএব সংসারের সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত কাড়াকাড়ি মারামারি যাতে একান্ত হয়ে উত্তপ্ত হয়ে না ওঠে সেজন্যে এক জায়গায় শান্তং শিবং অদ্বৈতম্‌-এর সুরটিকে বিশুদ্ধভাবে জাগিয়ে রাখবার জন্যে তপোবনের প্রয়োজন। সেখানে ক্ষণিকের আবর্ত নয়, সেখানে নিত্যের আবির্ভাব ; সেখানে পরস্পরের বিচ্ছেদ নয়, সেখানে সকলের সঙ্গে যোগের উপলব্ধি। সেখানকারই প্রার্থনামন্ত্র হচ্ছে— অসতোমা সদ্‌গময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়।

সেই তপোবনটি মহর্ষির জীবনের প্রভাবে এখানে আপনি হয়ে উঠেছে। এখানকার বিরাট প্রান্তরের মধ্যে তপস্যার দীপ্তি আপনিই বিস্তীর্ণ হয়েছে। এখানকার তরুলতার মধ্যে সাধনার নিবিড়তা আপনিই সঞ্চিত হয়ে উঠেছে। ঈশানো ভূতভব্যস্য এখানকার আকাশের মধ্যে তাঁর একটি বড়ো আসন পেতেছেন। সেই মহৎ আবির্ভাবটি আশ্রমবাসী প্রত্যেকের মধ্যে প্রতিদিন কাজ করছে। প্রত্যেক দিনটি প্রান্তরের প্রান্ত হতে নিঃশব্দে উঠে এসে তাদের দুই চক্ষুকে আলোকের অভিষেকে নির্মল করে দিচ্ছে। সমস্ত দিনই আকাশ অলক্ষ্যে তাদের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে জীবনের সমস্ত সংকোচগুলিকে দুই হাত দিয়ে ধীরে ধীরে প্রসারিত করে দিচ্ছে। তাদের হৃদয়ের গ্রন্থি অল্পে অল্পে মোচন হচ্ছে, তাদের সংস্কারের আবরণ ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, তাদের ধৈর্য দৃঢ়তর ক্ষমা গভীরতর হয়ে উঠছে এবং আনন্দময় পরমাত্মার সঙ্গে তাদের অব্যবহিত চেতনাময় যোগের ব্যবধান একদিন ক্ষীণ হয়ে দূর হয়ে যাবে সেই শুভক্ষণের জন্যে তারা প্রতিদিন পূর্ণতর আশার সঙ্গে প্রতীক্ষা করে

আছে। তারা দুঃখকে অপমানকে আঘাতকে উদার শক্তির সঙ্গে বহন করবার জন্যে দিনে দিনে প্রস্তুত হচ্ছে এবং যে জ্যোতির্ময় পরমানন্দধারা বিশ্বের দুই কূলকে উদ্‌বেল করে দিয়ে নিরন্তর ধারায় দিগ্‌দিগন্তরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে জীবনকে তারই কাছে নত করে ধরবার জন্যে তারা একটি আহ্বান শুনতে পাচ্ছে।

এই তপোবনটির মধ্যে একটি নিগূঢ় রহস্যময় সৃষ্টির কাজ চলছে, সেই রহস্যটি আমাদের মধ্যে কে দেখতে পাচ্ছে! যে একটি জীবন দেহের আবরণ আজ ঘুচিয়ে দিয়ে পরমপ্রাণের পদপ্রান্তে আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়েছে সেই জীবনের ভাষামুক্ত স্বরমুক্ত অতি বিশুদ্ধ আনন্দ এখানকার নিস্তব্ধ আকাশের মধ্যে নির্মল ভক্তিরসে-সরস একটি পবিত্র বাণীকে কেবলই বিকীর্ণ করছে, কেবলই বলছে 'তিনি আমার প্রাণের আরাম আত্মার শান্তি মনের আনন্দ'— সে বলা আর শেষ হচ্ছে না। সেই আনন্দের কাজ আর ফুরালো না।

জগতে একমাত্র আনন্দই যে সৃষ্টি করে, সৃষ্টির শক্তি তো আর কিছুরই নেই। এখানকার আকাশপ্লাবী অবারিত আলোকের মাঝখানে বসে আনন্দের সঙ্গে তাঁর যে আনন্দ মিলেছিল, সেই আনন্দ, সেই আনন্দসম্মিলন তো শূন্যতার মধ্যে বিলীন হতে পারে না। এই আনন্দই আজও সৃষ্টি করছে, এই আশ্রমকে সৃষ্টি করে তুলছে, এখানকার গাছপালা শ্যামলতার উপরে একটি প্রগাঢ় শান্তির সুস্নিগ্ধ অঞ্জন প্রতিদিন যেন নিবিড় করে মাখিয়ে দিচ্ছে। অনেক দিনের অনেক সুগভীর আনন্দমুহূর্ত এখানকার সূর্যোদয়কে সূর্যাস্তকে এবং নিশীথ রাত্রের নীরব নক্ষত্রলোককে দেবর্ষি নারদের বীণার তারগুলির মতো অনির্বচনীয় ভক্তির সুরে আজও কম্পিত করে তুলছে। সেই আনন্দসৃষ্টির অমৃতময় রহস্য আমরা আশ্রমবাসীরা কি প্রতিদিন উপলব্ধি করতে পারব না? একদিন একজন সাধক অকস্মাৎ কোথা থেকে কোথায় যেতে এই ছায়াশূন্য বিপুল প্রান্তরের মধ্যে যুগল সপ্তপর্ণ গাছের তলায় বসলেন, সেই দিনটি আর মরল না। সেই দিনটি বিশ্বকর্মার সৃষ্টি শক্তির মধ্যে চিরদিনের মতো আটকা পড়ে গেল। শূন্য প্রান্তরের পটের উপরে রঙের পর রঙ, প্রাণের পর প্রাণ ফলিয়ে তুলতে লাগল। যেখানে কিছুই ছিল না, যেখানে ছিল বিভীষিকা, সেখানে একটি পূর্ণতার মূর্তি প্রথমে আভাসে দেখা দিল তার পরে ক্রমে-ক্রমে দিনে-দিনে বর্ষে-বর্ষে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। এই-যে আশ্চর্য রহস্য, জীবনের নিগূঢ় ক্রিয়া, আনন্দের নিত্যলীলা, সে কি আমরা এখানকার শালবনের মর্মরে, এখানকার আম্রবনের ছায়াতলে, উপলব্ধি করতে পারব না? শরতের অপরিমেয় শুভ্রতা যখন এখানে শিউলি ফুলের অজস্র বিকাশের মধ্যে আপনাকে প্রভাতের পর প্রভাতে ব্যক্ত করে করে কিছুতে আর ক্লান্তি মানতে চায় না, তখন সেই অপর্যাপ্ত পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে আরো একটি অপরূপ শুভ্রতার অমৃতবর্ষণ কি নিঃশব্দে আমাদের জীবনের মধ্যে অবতীর্ণ হতে থাকে না? এই পৌষের শীতের প্রভাতে দিক্‌প্রান্তের উপর থেকে একটি সূক্ষ্ম শুভ্র কুহেলিকার আচ্ছাদন যখন উঠে যায়, আমলকীকুঞ্জের ফলভারপূর্ণ কম্পিত শাখাগুলির মধ্যে উত্তর বায়ু সূর্যকিরণকে পাতায় পাতায় নৃত্য করাতে থাকে এবং সমস্ত দিন শীতের রৌদ্র এখানকার অবাধ-প্রসারিত মাঠের উপরকার সুদূরতাকে একটি অনির্বচনীয় বাণীর দ্বারা ব্যাকুল করে তোলে, তখন এর ভিতর থেকে আর-একটি গভীরতর আনন্দ-সাধনার স্মৃতি কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে না? একটি পবিত্র প্রভাব, একটি অপরূপ সৌন্দর্য, একটি পরম প্রেম কি ঋতুতে ঋতুতে ফলপুষ্পপল্লবের নব নব বিকাশে আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণে তার অধিকার বিস্তার করছে না? নিশ্চয়ই করছে। কেননা এইখানেই যে একদিন সকলের চেয়ে বড়ো রহস্যনিকেতনের একটি দ্বার খুলে গিয়েছে। এখানে গাছের তলায় প্রেমের সঙ্গে প্রেম মিলেছে, দুই আনন্দ এক হয়েছে। সেই— এষঃ অস্য পরম আনন্দঃ, যে ইনি ইহার পরমানন্দ, সেই ইনি এবং এ কতদিন এইখানে মিলেছে— হঠাৎ কত উষার আলোয়, কত দিনের অবসানবেলায়, কত নিশীথ রাত্রে নিস্তব্ধ প্রহরে— প্রেমের সঙ্গে প্রেম, আনন্দের সঙ্গে আনন্দ! সেদিন যে দ্বার খোলা হয়েছে সেই দ্বারের সম্মুখে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি, কিছুই কি শুনতে পাব না? কাউকেই কি দেখা যাবে না? সেই মুক্ত দ্বারের সামনে আজ আমাদের উৎসবের মেলা বসেছে, ভিতর থেকে কি একটি আনন্দগান বাহির হয়ে এসে আমাদের এই

সমস্ত দিনের কলরবকে সুধাসিক্ত করে তুলবে না ? না, তা কখনোই হতে পারে না। বিমুখ চিত্তও ফিরবে, পাষাণহৃদয়ও গলবে, শুষ্ক শাখাতেও ফুল ফুটে উঠবে। হে শান্তিনিকেতনের অধিদেবতা, পৃথিবীতে যেখানেই মানুষের চিত্ত বাধামুক্ত পরিপূর্ণ প্রেমের দ্বারা তোমাকে স্পর্শ করেছে, সেইখানেই অমৃতবর্ষণে একটি আশ্চর্য শক্তি সঞ্জাত হয়েছে। সে শক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না, সে শক্তি চারি দিকের গাছপালাকেও জড়িয়ে ওঠে, চারি দিকের বাতাসকে পূর্ণ করে। কিন্তু তোমার এই একটি আশ্চর্য লীলা, শক্তিকে তুমি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ করে রেখে দিতে চাও না। তোমার পৃথিবী আমাদের একটি প্রচণ্ড টানে টেনে রেখেছে, কিন্তু তার দড়িদড়া তার টানাটানি কিছুই চোখে পড়ে না। তোমার বাতাস আমাদের উপর যে ভার চাপিয়ে রেখেছে সেটি কম ভার নয়, কিন্তু বাতাসকে আমরা ভারী বলেই জানি নে। তোমার সূর্যালোক নানাপ্রকারে আমাদের উপর যে শক্তিপ্রয়োগ করছে যদি গণনা করতে যাই তার পরিমাণ দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই, কিন্তু তাকে আমরা আলো বলেই জানি, শক্তি বলে জানি নে। তোমার শক্তির উপরে তুমি এই একটি হুকুম জারি করেছ সে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের কাজ করবে এবং দেখাবে যেন সে খেলা করছে।

কিন্তু তোমার এই আধিভৌতিক শক্তি, যা আলো হয়ে আমাদের সামনে নানা রঙের ছবি আঁকছে, যা বাতাস হয়ে আমাদের কানে নানা সুরে গান করছে, যা বলছে 'আমি জল', ব'লে আমাদের স্নান করাচ্ছে, যা বলছে 'আমি স্থল', ব'লে আমাদের কোলে করে রেখেছে— যখন শক্তির সঙ্গে আমাদের জ্ঞানের যোগ হয়, যখন তাকে আমরা শক্তি বলেই জানতে পারি— তখন তার ক্রিয়াকে আমরা অনেক বেশি করে অনেক বিচিত্র করে লাভ করি। তখন তোমার যে শক্তি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে কাজ করছিল সে আর ন ততো বিজুগুপ্সতে। তখন বাষ্পের শক্তি আমাদের দূরে বহন করে, বিদ্যুতের শক্তি আমাদের দুঃসাধ্য প্রয়োজন সাধন করতে থাকে। তেমনি তোমার অধ্যাত্মশক্তি আনন্দে প্রস্রবণ থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে এই আশ্রমটির মধ্যে আপনিই নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে, দিনে দিনে, ধীরে ধীরে, গভীরে গোপনে। কিন্তু সচেতন সাধনার দ্বারা যে মুহূর্তে আমাদের বোধের সঙ্গে তার যোগ ঘটে যায় সেই মুহূর্ত হতেই সেই শক্তির ক্রিয়া দেখতে দেখতে আমাদের জীবনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ও বিচিত্র হয়ে ওঠে। তখন সেই যে কেবল একলা কাজ করে তা নয়, আমরাও তখন তাকে কাজে লাগাতে পারি। তখন তাতে আমাতে মিলে সে এক আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে উঠতে থাকে। তখন যাকে কেবলমাত্র চোখে দেখতুম, কানে শুনতুম, অন্তর বাহিরের যোগে তার অনন্ত আনন্দরূপটি একেবারে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে— সে আর ন ততো বিজুগুপ্সতে। সে তো কেবল বস্তু নয়, কেবল ধ্বনি নয়, সেই আনন্দ, সেই আনন্দ।

জ্ঞানের যোগে আমরা জগতে তোমার শক্তিরূপ দেখি, অধ্যাত্মযোগে জগতে তোমার আনন্দরূপ দেখতে পাই। তোমার সাধকের এই আশ্রমটির যে একটি আনন্দরূপ আছে সেইটি দেখতে পেলেই আমাদের আশ্রমবাসের সার্থকতা হবে। কিন্তু সেটি তো অচেতনভাবে হবে না, সেটি তো মুখ ফিরিয়ে থাকলে পাব না। হে যোগী, তুমি যে আমাদের দিক থেকেও যোগ চাও— জ্ঞানের যোগ, প্রেমের যোগ, কর্মের যোগ। আমরা শক্তির দ্বারাই তোমার শক্তিকে পাব, ভিক্ষার দ্বারা নয়, এই তোমার অভিপ্রায়। তোমার জগতে যে ভিক্ষুকতা করে সেই সব চেয়ে বঞ্চিত হয়। যে সাধক আত্মার শক্তিকে জাগ্রত করে আত্মানং পরিপশ্যাতি, ন ততো বিজুগুপ্সতে। সে এমনি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে যে আপনাকে আর গোপন করতে পারে না। আজ উৎসবের দিনে তোমার কাছে সেই শক্তির দীক্ষা আমরা গ্রহণ করব। আমরা আজ জাগ্রত হব, চিত্তকে সচেতন করব, হৃদয়কে নির্মল করব, আমরা আজ যথার্থভাবে এই আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করব। আমরা এই আশ্রমকে গভীর করে, বৃহৎ করে, সত্য করে, ভূত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে একে সংযুক্ত করে দেখব— যে সাধক এখানে তপস্যা করেছেন তাঁর আনন্দময় বাণী এর সর্বত্র বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে সেটি আমরা অন্তরের মধ্যে অনুভব করব— এবং তাঁর সেই জীবনপূর্ণ বাণীর দ্বারা বাহিত হয়ে এখানকার ছায়ায় এবং আলোকে, আকাশে এবং প্রান্তরে, কর্মে এবং বিশ্রামে, আমাদের জীবন তোমার অচল আশ্রয়ে, নিবিড় প্রেমে, নিরতিশয় আনন্দে গিয়ে উত্তীর্ণ

হবে এবং চন্দ্র সূর্য অগ্নি বায়ু তরুলতা পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ সকলের মধ্যে তোমার গভীর শান্তি, উদার মঙ্গল ও প্রগাঢ় অদ্বৈতরস অনুভব করে শক্তিতে এবং ভক্তিতে সকল দিকেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকবে।

৭ পৌষ, প্রাতঃকাল, ১৩১৬

তপোবন

আধুনিক সভ্যতালক্ষ্মী যে পদ্মের উপর বাস করেন সেটি ইঁট কাঠে তৈরি, সেটি শহর। উন্নতির সূর্য যতই মধ্যগগনে উঠছে ততই তার দলগুলি একটি একটি করে খুলে গিয়ে ক্রমশই চারি দিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। চুন সুরকির জয়যাত্রাকে বসুন্ধরা কোথাও ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না।

এই শহরেই মানুষ বিদ্যা শিখছে, বিদ্যা প্রয়োগ করছে, ধন জমাচ্ছে, ধন খরচ করছে, নিজেকে নানা দিক থেকে শক্তি ও সম্পদে পূর্ণ করে তুলছে। এই সভ্যতার সকলের চেয়ে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ পদার্থ তা নগরের সামগ্রী।

বস্তুত এ ছাড়া অন্য রকম কল্পনা করা শক্ত। যেখানে অনেক মানুষের সম্মিলন সেখানে বিচিত্র বুদ্ধির সংঘাতে চিত্ত জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং চার দিক থেকে ধাক্কা খেয়ে প্রত্যেকের শক্তি গতি প্রাপ্ত হয়। এমনি করে চিত্তসমুদ্রের মন্থন হতে থাকলে মানুষের নিগূঢ় সারপদার্থসকল আপনিই ভেসে উঠতে থাকে।

তার পরে মানুষের শক্তি যখন জেগে ওঠে তখন সে সহজেই এমন ক্ষেত্র চায় যেখানে আপনাকে ফলাও রকম করে প্রয়োগ করতে পারে। সে ক্ষেত্র কোথায়? যেখানে অনেক মানুষের অনেক প্রকার উদ্যম নানা সৃষ্টিকার্যে সর্বদাই সচেষ্ট হয়ে রয়েছে। সেই ক্ষেত্রই হচ্ছে শহর।

গোড়ায় মানুষ যখন খুব ভিড় করে এক জায়গায় শহর সৃষ্টি করে বসে, তখন সেটা সভ্যতার আকর্ষণে নয়। অধিকাংশ স্থলেই শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কোনো সুরক্ষিত সুবিধার জায়গায় মানুষ একত্র হয়ে থাকবার প্রয়োজন অনুভব করে। কিন্তু যে কারণেই হোক, অনেকে একত্র হবার একটা উপলক্ষ ঘটলেই সেখানে নানা লোকের প্রয়োজন এবং বুদ্ধি একটা কলেবরবদ্ধ আকার ধারণ করে এবং সেইখানেই সভ্যতার অভিব্যক্তি আপনি ঘটতে থাকে।

কিন্তু ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ শহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠে নি। সেখানে গাছপালা নদী সরোবর মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল। সেখানে মানুষও ছিল, ফাঁকাও ছিল, ঠেলাঠেলি ছিল না। অথচ এই ফাঁকায় ভারতবর্ষের চিত্তকে জড়প্রায় করে দেয় নি, বরঞ্চ তার চেতনাকে আরো উজ্জ্বল করে দিয়েছিল। এরকম ঘটনা জগতে আর কোথাও ঘটেছে বলে দেখা যায় না।

আমরা এই দেখেছি— যে-সব মানুষ অবস্থাগতিকে বনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তারা বুনো হয়ে ওঠে। হয় তারা বাঘের মতো হিংস্র হয়, নয় তারা হরিণের মতো নির্বোধ হয়।

কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে দেখতে পাই অরণ্যের নির্জনতা মানুষের বুদ্ধিকে অভিভূত করে নি বরঞ্চ তাকে এমন একটি শক্তি দান করেছিল যে, সেই অরণ্যবাসনিঃসৃত সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে এবং আজ পর্যন্ত তার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় নি।

এইরকমে আরণ্যকদের সাধনা থেকে ভারতবর্ষ সভ্যতার যে প্রৈতি (energy) লাভ করেছিল সেটা নাকি বাইরের সংঘাত থেকে ঘটে নি, নানা প্রয়োজনের প্রতিযোগিতা থেকে জাগে নি। এইজন্যে সেই শক্তিটা প্রধানত বহিরভিমুখী হয় নি। সে ধ্যানের দ্বারা বিশ্বের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করেছে,

নিখিলের সঙ্গে আত্মার যোগ স্থাপন করেছে। সেইজন্যে ঐশ্বর্যের উপকরণেই প্রধানভাবে ভারতবর্ষ আপনার সভ্যতার পরিচয় দেয় নি। এই সভ্যতার যাঁরা কাণ্ডারী তাঁরা নির্জনবাসী, তাঁরা বিরলবসন তপস্বী।

সমুদ্রতীর যে জাতিকে পালন করেছে তাকে বাণিজ্যসম্পদ দিয়েছে, মরুভূমি যাদের অল্পস্তন্যদানে ক্ষুধিত করে রেখেছে তারা দিগ্বিজয়ী হয়েছে। এমনি করে এক-একটি বিশেষ সুযোগে মানুষের শক্তি এক-একটি বিশেষ পথ পেয়েছে।

সমতল আর্যাবর্তের অরণ্যভূমিও ভারতবর্ষকে একটি বিশেষ সুযোগ দিয়েছিল। ভারতবর্ষের বুদ্ধিকে সে জগতের অন্তরতম রহস্যলোক-আবিষ্কারে প্রেরণ করেছিল। সেই মহাসমুদ্রতীরের নানা সুদূর দ্বীপ-দ্বীপান্তর থেকে সে যে-সমস্ত সম্পদ আহরণ করে এনেছিল, সমস্ত মানুষকেই দিনে দিনে তার প্রয়োজন স্বীকার করতেই হবে। যে ওষধি-বনস্পতির মধ্যে প্রকৃতির প্রাণের ক্রিয়া দিনে রাত্রে ও ঋতুতে ঋতুতে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে এবং প্রাণের লীলা নানা অপরূপ ভঙ্গিতে, ধ্বনিতে ও রূপবৈচিত্র্যে নিরন্তর নূতন নূতন ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, তারই মাঝখানে ধ্যানপরায়ণ চিত্ত নিয়ে যাঁরা ছিলেন তাঁরা নিজের চারি দিকেই একটি আনন্দময় রহস্যকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। সেইজন্যে তাঁরা এত সহজে বলতে পেরেছিলেন— যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং, এই যা-কিছু সমস্তই পরমপ্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে। তাঁরা স্বরচিত ইঁট কাঠ লোহার কঠিন খাঁচার মধ্যে ছিলেন না, তাঁরা যেখানে বাস করতেন সেখানে বিশ্বব্যাপী বিরাট জীবনের সঙ্গে তাঁদের জীবনের অবারিত যোগ ছিল। এই বন তাঁদের ছায়া দিয়েছে, ফলফুল দিয়েছে, কুশ-সমিৎ জুগিয়েছে, তাঁদের প্রতিদিনের সমস্ত কর্ম অবকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে এই বনের আদান-প্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল। এই উপায়েই নিজের জীবনকে তাঁরা চারি দিকের একটি বড়ো জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে জানতে পেরেছিলেন। চতুর্দিককে তাঁরা শূন্য বলে, নির্জীব বলে, পৃথক বলে জানতেন না। বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়ে আলোক বাতাস অন্নজল প্রভৃতি যে-সমস্ত দান তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন সেই দানগুলি যে মাটির নয়, গাছের নয়, শূন্য আকাশের নয়, একটি চেতনাময় অনন্ত আনন্দের মধ্যেই তার মূল প্রস্রবণ, এইটি তাঁরা একটি সহজ অনুভবের দ্বারা জানতে পেরেছিলেন। সেইজন্যেই নিশ্বাস আলো অন্নজল সমস্তই তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে, ভক্তির সঙ্গে, গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্যেই নিখিলচরাচরকে নিজের প্রাণের দ্বারা, চেতনার দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা, বোধের দ্বারা, নিজের আত্মার সঙ্গে আত্মীয়রূপে এক করে পাওয়াই ভারতবর্ষের পাওয়া।

এর থেকেই বোঝা যাবে বন ভারতবর্ষের চিত্তকে নিজের নিভৃত ছায়ার মধ্যে নিগূঢ় প্রাণের মধ্যে কেমন করে পালন করেছে। ভারতবর্ষে যে দুই বড়ো বড়ো প্রাচীনযুগ চলে গেছে, বৈদিকযুগ ও বৌদ্ধযুগ, সেই দুই যুগকে বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করেছে। কেবল বৈদিক ঋষিরা নন, ভগবান বুদ্ধও কত আম্রবন কত বেণুবনে তাঁর উপদেশ বর্ষণ করেছেন। রাজপ্রাসাদে তাঁর স্থান কুলোয় নি, বনই তাঁকে বুকে করে নিয়েছিল।

ক্রমশ ভারতবর্ষে রাজ্য সাম্রাজ্য নগরনগরী স্থাপিত হয়েছে, দেশ-বিদেশের সঙ্গে তার পণ্য-আদানপ্রদান চলেছে, অন্নলোলুপ কৃষিক্ষেত্র অল্পে অল্পে ছায়ানিভৃত অরণ্যগুলিকে দূর হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেই প্রতাপশালী ঐশ্বর্যপূর্ণ যৌবনদৃপ্ত ভারতবর্ষ বনের কাছে নিজের ঋণ স্বীকার করতে কোনোদিন লজ্জাবোধ করে নি। তপস্যাকেই সে সকল প্রয়াসের চেয়ে বেশি সম্মান দিয়েছে, এবং বনবাসী পুরাতন তপস্বীদেরই আপনাদের আদি পুরুষ বলে জেনে ভারতবর্ষের রাজা মহারাজাও গৌরব বোধ করেছেন। ভারতবর্ষের পুরাণকথায় যা-কিছু মহৎ আশ্চর্য পবিত্র, যা-কিছু শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য, সমস্তই সেই প্রাচীন তপোবনস্মৃতির সঙ্গেই জড়িত। বড়ো বড়ো রাজার রাজত্বের কথা সে মনে করে রাখবার জন্যে চেষ্টা করে নি কিন্তু নানা বিপ্লবের ভিতর দিয়েও বনের সামগ্রীকেই তার প্রাণের সামগ্রী করে আজ পর্যন্ত সে বহন করে এসেছে। মানব-ইতিহাসে এইটেই হচ্ছে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব।

ভারতবর্ষে বিক্রমাদিত্য যখন রাজা, উজ্জয়িনী যখন মহানগরী, কালিদাস যখন কবি, তখন এ দেশে তপোবনের যুগ চলে গেছে। তখন মানবের মহামেলার মাঝখানে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। তখন চীন হূন শক পারসিক গ্রীক রোমক সকলে আমাদের চারি দিকে ভিড় করে এসেছে। তখন জনকের মতো রাজা এক দিকে স্বহস্তে লাঙল নিয়ে চাষ করছেন, অন্য দিকে দেশ-দেশান্তর হতে আগত জ্ঞানপিপাসুদের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন, এ দৃশ্য দেখবার আর কাল ছিল না। কিন্তু সেদিনকার ঐশ্বর্যমদগর্বিত যুগেও তখনকার শ্রেষ্ঠ কবি তপোবনের কথা কেমন করে বলেছেন তা দেখলেই বোঝা যায় যে, তপোবন যখন আমাদের দৃষ্টির বাহিরে গেছে তখনো কতখানি আমাদের হৃদয় জুড়ে বসেছে।

কালিদাস যে বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কবি, তা তাঁর তপোবনচিত্র থেকেই সপ্রমাণ হয়। এমন পরিপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে তপোবনের ধ্যানকে আর কে মূর্তিমান করতে পেরেছে!

রঘুবংশ কাব্যের যবনিকা যখনই উদ্‌ঘাটিত হল তখন প্রথমেই তপোবনের শান্ত সুন্দর পবিত্র দৃশ্যটি আমাদের চোখের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

সেই তপোবনের বনান্তর হতে কুশ সমিৎ ফল আহরণ করে তপস্বীরা আসছেন এবং যেন একটি অদৃশ্য অগ্নি তাঁদের প্রত্যুদ্‌গমন করছে। সেখানে হরিণগুলি ঋষিপত্নীদের সন্তানের মতো; তারা নীবারধান্যের অংশ পায় এবং নিঃসংকোচে কুটিরের দ্বার রোধ করে পড়ে থাকে। মুনিকন্যারা গাছে জল দিচ্ছেন এবং আলবাল যেমনি জলে ভরে উঠছে অমনি তাঁরা সরে যাচ্ছেন। পাখিরা নিঃশঙ্কমনে আলবালের জল খেতে আসে, এই তাঁদের অভিপ্রায়। রৌদ্র পড়ে এসেছে, নীবারধান্য কুটিরের প্রাঙ্গণে রাশীকৃত, এবং সেখানে হরিণরা শুয়ে রোমন্থন করছে। আহুতির সুগন্ধ ধূম বাতাসে প্রবাহিত হয়ে এসে আশ্রমোন্মুখ অতিথিদের সর্বশরীর পবিত্র করে দিচ্ছে।

তরুলতা পশুপক্ষী সকলের সঙ্গে মানুষের মিলনের পূর্ণতা, এই হচ্ছে এর ভিতরকার ভাব।

সমস্ত অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের মধ্যে ভোগলালসানিষ্ঠুর রাজপ্রাসাদকে ধিক্কার দিয়ে যে একটি তপোবন বিরাজ করছে তারও মূল সুরটি হচ্ছে ঐ, চেতন অচেতন সকলেরই সঙ্গে মানুষের আত্মীয়-সম্বন্ধের পবিত্র মাধুর্য।

কাদম্বরীতে তপোবনের বর্ণনায় কবি লিখছেন— সেখানে বাতাসে লতাগুলি মাথা নত করে প্রণাম করছে, গাছগুলি ফুল ছড়িয়ে পূজা করছে, কুটিরের অঙ্গনে শ্যামাক ধান শুকোবার জন্যে মেলে দেওয়া আছে, সেখানে আমলক লবলী লবঙ্গ কদলী বদরী ফল সংগ্রহ করা হয়েছে, বটুদের অধ্যয়নে বনভূমি মুখরিত, বাচাল শুকেরা অবিরত-শ্রবণের দ্বারা অভ্যস্ত আহুতিমন্ত্র উচ্চারণ করছে, অরণ্যকুক্কুটেরা বৈশ্বদেব-বলিপিণ্ড আহার করছে, নিকটে জলাশয় থেকে কলহংসশাবকেরা এসে নীবারবলি খেয়ে যাচ্ছে, হরিণীরা জিহ্বাপল্লব দিয়ে মুনিবালকদের লেহন করছে।

এর ভিতরকার কথাটা হচ্ছে ঐ। তরুলতা জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ দূর করে তপোবন প্রকাশ পাচ্ছে, এই পুরানো কথাই আমাদের দেশে বরাবর চলে এসেছে।

কেবল তপোবনের চিত্রেই যে এই ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তা নয়। মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সম্মিলনই আমাদের দেশের সমস্ত প্রসিদ্ধ কাব্যের মধ্যে পরিস্ফুট। যে-সকল ঘটনা মানবচরিত্রকে আশ্রয় করে ব্যক্ত হতে থাকে তাই নাকি প্রধানত নাটকের উপাদান, এইজন্যেই অন্য দেশের সাহিত্যে দেখতে পাই বিশ্বপ্রকৃতিকে নাটকে কেবল আভাসে রক্ষা করা হয় মাত্র, তার মধ্যে তাকে বেশি জায়গা দেবার অবকাশ থাকে না। আমাদের দেশের প্রাচীন যে নাটকগুলি আজ পর্যন্ত খ্যাতি রক্ষা করে আসছে তাতে দেখতে পাই প্রকৃতিও নাটকের মধ্যে নিজের অংশ থেকে বঞ্চিত হয় না।

মানুষকে বেষ্টন করে এই যে জগৎপ্রকৃতি আছে, এ যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে মানুষের সকল চিন্তা সকল কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। মানুষের লোকালয় যদি কেবলই একান্ত মানবময় হয়ে ওঠে, এর ফাঁকে ফাঁকে যদি প্রকৃতি কোনোমতে প্রবেশাধিকার না পায়, তা হলে আমাদের চিন্তা ও কর্ম ক্রমশ কলুষিত ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে নিজের অতলস্পর্শ আবর্জনার মধ্যে আত্মহত্যা করে মরে। এই যে প্রকৃতি আমাদের মধ্যে নিত্যনিয়ত কাজ করছে অথচ দেখাচ্ছে যেন সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন

আমরাই সব মস্ত কাজের লোক আর সে বেচারা নিতান্ত একটা বাহার মাত্র, এই প্রকৃতিকে আমাদের দেশের কবিরা বেশ করে চিনে নিয়েছেন। এই প্রকৃতি মানুষের সমস্ত সুখদুঃখের মধ্যে যে অনন্তের সুরটি মিলিয়ে রাখছে, সেই সুরটিকে আমাদের দেশের প্রাচীন কবিরা সর্বদাই তাঁদের কাব্যের মধ্যে বাজিয়ে রেখেছেন।

ঋতুসংহার কালিদাসের কাঁচা বয়সের লেখা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর মধ্যে তরুণ-তরুণীর যে মিলনসংগীত আছে তাতে স্বরগ্রাম লালসার নীচের সপ্তক থেকেই শুরু হয়েছে, শকুন্তলা কুমারসম্ভবের মতো তপস্যার উচ্চতম সপ্তকে গিয়ে পৌঁছোয় নি।

কিন্তু কবি নবযৌবনের এই লালসাকে প্রকৃতির বিচিত্র ও বিরাট সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে মুক্ত আকাশের মাঝখানে তাকে ঝংকৃত করে তুলেছেন। ধারাযন্ত্র-মুখরিত নিদাঘদিনান্তের চন্দ্রকিরণ এর মধ্যে আপনার সুরটুকু যোজনা করেছে, বর্ষায় নবজলসেকে ছিন্নতাপ বনান্তে পবনচলিত কদম্বশাখা এর ছন্দে আন্দোলিত, আপক্বশালি-রুচিরা শারদলক্ষ্মী তাঁর হংসরবনূপুরধ্বনিকে এর তালে তালে মন্দ্রিত করেছেন এবং বসন্তের দক্ষিণবায়ুচঞ্চল কুসুমিত আম্রশাখার কলমর্মর এরই তানে তানে বিস্তীর্ণ।

বিরাট প্রকৃতির মাঝখানে যেখানে যার স্বাভাবিক স্থান সেখানে তাকে স্থাপন করে দেখলে তার অত্যুগ্রতা থাকে না, সেইখান থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে কেবলমাত্র মানুষের গণ্ডির মধ্যে সংকীর্ণ করে দেখলে তাকে ব্যাধির মতো অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং রক্তবর্ণ দেখতে হয়। শেক্‌স্‌পীয়রের দুই-একটি খণ্ডকাব্য আছে, নরনারীর আসক্তি তার বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু সেই-সকল কাব্যে আসক্তিই একেবারে একান্ত, তার চার দিকে আর কিছুরই স্থান নেই— আকাশ নেই, বাতাস নেই, প্রকৃতির যে গীত-গন্ধবর্ণবিচিত্র বিশাল আবরণে বিশ্বের সমস্ত লজ্জা রক্ষা করে আছে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এইজন্যে সে-সকল কাব্যে প্রবৃত্তির উন্মত্ততা অত্যন্ত দুঃসহরূপে প্রকাশ পাচ্ছে।

কুমারসম্ভবে তৃতীয় সর্গে যেখানে মদনের আকস্মিক আবির্ভাবে যৌবনচাঞ্চল্যের উদ্দীপনা বর্ণিত হয়েছে, সেখানে কালিদাস উন্মত্ততাকে একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যেই সর্বময় করে দেখাবার প্রয়াসমাত্র পান নি। আতশ-কাচের ভিতর দিয়ে একটি বিন্দুমাত্রে সূর্যকিরণ সংহত হয়ে পড়লে সেখানে আগুন জ্বলে ওঠে, কিন্তু সেই সূর্যকিরণ যখন আকাশের সর্বত্র স্বভাবত ছড়িয়ে থাকে তখন সে তাপ দেয় বটে কিন্তু দগ্ধ করে না। কালিদাস বসন্তপ্রকৃতির সর্বব্যাপী যৌবনলীলার মাঝখানে হরপার্বতীর মিলন-চাঞ্চল্যকে নিবিষ্ট করে তার সম্ভ্রম রক্ষা করেছেন।

কালিদাস পুষ্পধনুর জ্যা-নির্ঘোষকে বিশ্বসংগীতের সুরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ও বেসুরো করে বাজান নি। যে পটভূমিকার উপরে তিনি তাঁর ছবিটি এঁকেছেন সেটি তরুলতা পশুপক্ষীকে নিয়ে সমস্ত আকাশে অতি বিচিত্রবর্ণে বিস্তারিত।

কেবল তৃতীয় সর্গ নয়, সমস্ত কুমারসম্ভব কাব্যটিই একটি বিশ্বব্যাপী পটভূমিকার উপরে অঙ্কিত। এই কাব্যের ভিতরকার কথাটি একটি গভীর এবং চিরন্তন কথা। যে পাপদৈত্য কোথা থেকে প্রবল হয়ে উঠে হঠাৎ স্বর্গলোককে ছারখার করে দেয় তাকে পরাভূত করবার মতো বীরত্ব কোন্ উপায়ে জন্মগ্রহণ করে।

এই সমস্যাটি মানুষের চিরকালের সমস্যা। প্রত্যেক লোকের জীবনের সমস্যাও এই বটে, আবার এই সমস্যা সমস্ত জাতির মধ্যে নূতন নূতন মূর্তিতে নিজেকে প্রকাশ করে।

কালিদাসের সময়েও একটি সমস্যা ভারতবর্ষে অত্যন্ত উৎকট হয়ে দেখা দিয়েছিল, তা কবির কাব্য পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে জীবনযাত্রায় যে একটি সরলতা ও সংযম ছিল তখন সেটি ভেঙে এসেছিল। রাজারা তখন রাজধর্ম বিস্মৃত হয়ে আত্মসুখপরায়ণ ভোগী হয়ে উঠেছিলেন। এ দিকে শকদের আক্রমণে ভারতবর্ষ তখন বারংবার দুর্গতি প্রাপ্ত হচ্ছিল।

তখন বাহিরের দিক থেকে দেখলে ভোগবিলাসের আয়োজনে, কাব্য সংগীত শিল্পকলার আলোচনায়, ভারতবর্ষ সভ্যতার প্রকৃষ্টতা লাভ করেছিল। কালিদাসের কাব্যকলার মধ্যেও তখনকার সেই উপকরণবহুল সম্ভোগের সুর যে বাজে নি তা নয়। বস্তুত তাঁর কাব্যের বহিরাংশ তখনকার

কালেরই কারুকার্যে খচিত হয়েছিল। এইরকম এক দিকে তখনকার কালের সঙ্গে তখনকার কবির যোগ আমরা দেখতে পাই।

কিন্তু এই প্রমোদভবনের স্বর্ণখচিত অন্তঃপুরের মাঝখানে বসে কাব্যলক্ষ্মী বৈরাগ্যবিকল চিত্তে কিসের ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন? হৃদয় তো তাঁর এখানে ছিল না। তিনি এই আশ্চর্য কারুবিচিত্র মাণিক্যকঠিন কারাগার হতে কেবলই মুক্তিকামনা করছিলেন।

কালিদাসের কাব্যে বাহিরের সঙ্গে ভিতরের, অবস্থার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার একটা দ্বন্দ্ব আছে। ভারতবর্ষের যে তপস্যার যুগ তখন অতীত হয়ে গিয়েছিল, ঐশ্বর্যশালী রাজসিংহাসনের পাশে বসে কবি সেই নির্মল সুদূর কালের দিকে একটি বেদনা বহন করে তাকিয়ে ছিলেন।

রঘুবংশ কাব্যে তিনি ভারতবর্ষের পুরাকালীন সূর্যবংশীয় রাজাদের চরিতগানে যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার মধ্যে কবির সেই বেদনাটি নিগূঢ় হয়ে রয়েছে। তার প্রমাণ দেখুন।

আমাদের দেশের কাব্যে পরিণামকে অশুভকর ভাবে দেখানো ঠিক প্রথা নয়। বস্তুত যে রামচন্দ্রের জীবনে রঘুর বংশ উচ্চতম চূড়ায় অধিরোহণ করেছে, সেইখানেই কাব্য শেষ করলে তবেই কবির ভূমিকার কাব্যগুলি সার্থক হত।

তিনি ভূমিকায় বলেছেন— সেই যাঁরা জন্মকাল অবধি শুদ্ধ, যাঁরা ফলপ্রাপ্তি অবধি কর্ম করতেন, সমুদ্র অবধি যাঁদের রাজ্য, এবং স্বর্গ অবধি যাঁদের রথবর্ত্ম ; যথাবিধি যাঁরা অগ্নিতে আহুতি দিতেন, যথাকাম যাঁরা প্রার্থীদের অভাব পূর্ণ করতেন, যথাপরাধ যাঁরা দণ্ড দিতেন এবং যথাকালে যাঁরা জাগ্রত হতেন ; যাঁরা ত্যাগের জন্যে অর্থ সঞ্চয় করতেন, যাঁরা সত্যের জন্য মিতভাষী, যাঁরা যশের জন্য জয় ইচ্ছা করতেন এবং সন্তানলাভের জন্য যাঁদের দারগ্রহণ ; শৈশবে যাঁরা বিদ্যাভ্যাস করতেন, যৌবনে যাঁদের বিষয়সেবা ছিল, বার্ধক্যে যাঁরা মুনিবৃত্তি গ্রহণ করতেন এবং যোগান্তে যাঁদের দেহত্যাগ হত— আমি বাক্‌সম্পদে দরিদ্র হলেও সেই রঘুরাজদের বংশকীর্তন করব, কারণ তাঁদের গুণ আমার কর্ণে প্রবেশ করে আমাকে চঞ্চল করে তুলেছে।

কিন্তু গুণকীর্তনেই এই কাব্যের শেষ নয়। কবিকে যে কিসে চঞ্চল করে তুলেছে, তা রঘুবংশের পরিণাম দেখলেই বুঝা যায়।

রঘুবংশ যাঁর নামে গৌরবলাভ করেছে তাঁর জন্মকাহিনী কী? তাঁর আরম্ভ কোথায়?

তপোবনে দিলীপদম্পতির তপস্যাতেই এমন রাজা জন্মেছেন। কালিদাস তাঁর রাজপ্রভুদের কাছে এই কথাটি নানা কাব্যে নানা কৌশলে বলেছেন যে, কঠিন তপস্যার ভিতর দিয়ে ছাড়া কোনো মহৎ ফললাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। যে রঘু উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের সমস্ত রাজাকে বীরতেজে পরাভূত করে পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজত্ব বিস্তার করেছিলেন, তিনি তাঁর পিতামাতার তপঃসাধনার ধন। আবার যে ভরত বীর্যবলে চক্রবর্তী সম্রাট হয়ে ভারতবর্ষকে নিজনামে ধন্য করেছেন তাঁর জন্মঘটনায় অবারিত প্রবৃত্তির যে কলঙ্ক পড়েছিল, কবি তাকে তপস্যার অগ্নিতে দগ্ধ এবং দুঃখের অশ্রুজলে সম্পূর্ণ ধৌত না করে ছাড়েন নি।

রঘুবংশ আরম্ভ হল রাজোচিত ঐশ্বর্যগৌরবের বর্ণনায় নয়। সুদক্ষিণাকে বামে নিয়ে রাজা দিলীপ তপোবনে প্রবেশ করলেন। চতুঃসমুদ্র যাঁর অনন্যশাসনা পৃথিবীর পরিখা সেই রাজা অবিচলিত নিষ্ঠায় কঠোর সংযমে তপোবনধেনুর সেবায় নিযুক্ত হলেন।

সংযমে তপস্যায় তপোবনে রঘুবংশের আরম্ভ, আর মদিরায় ইন্দ্রিয়মত্ততায় প্রমোদভবনে তার উপসংহার। এই শেষ সর্গের চিত্রে বর্ণনার উজ্জ্বলতা যথেষ্ট আছে। কিন্তু যে অগ্নি লোকালয়কে দগ্ধ ক'রে সর্বনাশ করে সেও তো কম উজ্জ্বল নয়। এক পত্নীকে নিয়ে দিলীপের তপোবনে বাস শান্ত এবং অনতিপ্রকট বর্ণে অঙ্কিত, আর বহু নায়িকা নিয়ে অগ্নিবর্ণের আত্মঘাতসাধন অসমবৃত বাহুল্যের সঙ্গে যেন জ্বলন্ত রেখায় বর্ণিত।

প্রভাত যেমন শান্ত, যেমন পিঙ্গলজটাধারী ঋষিবালকের মতো পবিত্র, প্রভাত যেমন মুক্তাপাণ্ডুর সৌম্য আলোকে শিশিরস্নিগ্ধ পৃথিবীর উপরে ধীরপদে অবতরণ করে এবং নবজীবনের অভ্যুদয়বার্তায়

জগৎকে উদ্‌বোধিত করে তোলে, কবির কাব্যেও তপস্যার দ্বারা সুসমাহিত রাজমাহাত্ম্য তেমনি স্নিগ্ধতেজে এবং সংযত বাণীতেই মহোদয়শালী রঘুবংশের সূচনা করেছিল। আর নানাবর্ণবিচিত্র মেঘজালের মধ্যে আবিষ্ট অপরাহ্ণ আপনার অদ্ভুত রশ্মিচ্ছটায় পশ্চিম আকাশকে যেমন ক্ষণকালের জন্যে প্রগল্‌ভ করে তোলে এবং দেখতে দেখতে ভীষণ ক্ষয় এসে তার সমস্ত মহিমা অপহরণ করতে থাকে, অবশেষে অনতিকালেই বাক্যহীন কর্মহীন অচেতন অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়, কবি তেমনি করেই কাব্যের শেষ সর্গে বিচিত্র ভোগায়োজনের ভীষণ সমারোহের মধ্যেই রঘুবংশজ্যোতিষ্কের নির্বাপণ বর্ণনা করেছেন।

কাব্যের এই আরম্ভ এবং শেষের মধ্যে কবির একটি অন্তরের কথা প্রচ্ছন্ন আছে। তিনি নীরব দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলছেন— ছিল কী, আর হয়েছে কী। সেকালে যখন সম্মুখে ছিল অভ্যুদয় তখন তপস্যাই ছিল সকলের চেয়ে প্রধান ঐশ্বর্য, আর একালে যখন সম্মুখে দেখা যাচ্ছে বিনাশ তখন বিলাসের উপকরণরাশির সীমা নেই আর ভোগের অতৃপ্ত বহ্নি সহস্র শিখায় জ্বলে উঠে চারি দিকের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

কালিদাসের অধিকাংশ কাব্যের মধ্যেই এই দ্বন্দ্বটি সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই দ্বন্দ্বের সমাধান কোথায় কুমারসম্ভবে তাই দেখানো হয়েছে। কবি এই কাব্যে বলেছেন ত্যাগের সঙ্গে ঐশ্বর্যের, তপস্যার সঙ্গে প্রেমের সম্মিলনেই শৌর্যের উদ্ভব, সেই শৌর্যেই মানুষ সকল-প্রকার পরাভব হতে উদ্ধার পায়।

অর্থাৎ ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্যেই পূর্ণ শক্তি। ত্যাগী শিব যখন একাকী সমাধিমগ্ন তখনো স্বর্গরাজ্য অসহায়, আবার সতী যখন তাঁর পিতৃভবনের ঐশ্বর্যে একাকিনী আবদ্ধ তখনো দৈত্যের উপদ্রব প্রবল।

প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলেই ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্য ভেঙে যায়।

কোনো একটি সংকীর্ণ জায়গায় যখন আমরা অহংকারকে বা বাসনাকে ঘনীভূত করি তখন আমরা সমগ্রের ক্ষতি করে অংশকে বড়ো করে তুলতে চেষ্টা করি। এর থেকে ঘটে অমঙ্গল। অংশের প্রতি আসক্তিবশত সমগ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এই হচ্ছে পাপ।

এইজন্যই ত্যাগের প্রয়োজন। এই ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করার জন্যে নয়, নিজেকে পূর্ণ করবার জন্যেই। ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্য, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্য, অহংকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্য, সুখকে ত্যাগ আনন্দের জন্য। এইজন্যেই উপনিষদে বলা হয়েছে— ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, আসক্তির দ্বারা নয়।

প্রথমে পার্বতী মদনের সাহায্যে শিবকে চেয়েছিলেন, সে চেষ্টা ব্যর্থ হল, অবশেষে ত্যাগের সাহায্যে তপস্যার দ্বারাতেই তাঁকে লাভ করলেন।

কাম হচ্ছে কেবল অংশের প্রতিই আসক্ত, সমগ্রের প্রতি অন্ধ। কিন্তু শিব হচ্ছেন সকল দেশের সকল কালের, কামনা ত্যাগ না হলে তাঁর সঙ্গে মিলন ঘটতেই পারে না।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করবে এইটি উপনিষদের অনুশাসন, এইটেই কুমারসম্ভব কাব্যের মর্মকথা, এবং এইটেই আমাদের তপোবনের সাধনা। লাভ করবার জন্যে ত্যাগ করবে।

sacrifice এবং resignation, আত্মত্যাগ এবং দুঃখস্বীকার— এই দুটি পদার্থের মাহাত্ম্য আমরা কোনো কোনো ধর্মশাস্ত্রে বিশেষভাবে বর্ণিত দেখেছি। জগতের সৃষ্টিকার্যের উত্তাপ যেমন একটি প্রধান জিনিস, মানুষের জীবনগঠনে দুঃখও তেমনি একটি খুব বড়ো রাসায়নিক শক্তি ; এর দ্বারা চিত্তের দুর্ভেদ্য কাঠিন্য গলে যায় এবং অসাধ্য হৃদয়গ্রন্থির ছেদন হয়। অতএব সংসারে যিনি দুঃখকে দুঃখরূপেই নম্রভাবে স্বীকার করে নিতে পারেন তিনি যথার্থ তপস্বী বটেন।

কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন এই দুঃখস্বীকারকেই উপনিষৎ লক্ষ্য করছেন। ত্যাগকে দুঃখরূপে অঙ্গীকার করে নেওয়া নয়, ত্যাগকে ভোগরূপেই বরণ করে নেওয়া উপনিষদের অনুশাসন। উপনিষৎ যে ত্যাগের কথা বলছেন সেই ত্যাগই পূর্ণতর গ্রহণ, সেই ত্যাগই গভীরতর আনন্দ। সেই ত্যাগই

নিখিলের সঙ্গে যোগ, ভূমার সঙ্গে মিলন। অতএব ভারতবর্ষের যে আদর্শ তপোবন সে তপোবন শরীরের বিরুদ্ধে আত্মার, সংসারের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসের একটা নিরন্তর হাতাহাতি যুদ্ধ করবার মল্লক্ষেত্র নয়। যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, অর্থাৎ যা-কিছু-সমস্তের সঙ্গে ত্যাগের দ্বারা বাধাহীন মিলন, এইটেই হচ্ছে তপোবনের সাধনা। এইজন্যেই তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে ভারতবর্ষের আত্মীয়-সম্বন্ধের যোগ এমন ঘনিষ্ঠ যে, অন্য দেশের লোকের কাছে সেটা অদ্ভুত মনে হয়।

এইজন্যেই আমাদের দেশের কবিত্বে যে প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় অন্য দেশের কাব্যের সঙ্গে তার যেন একটা বিশিষ্টতা আছে। আমাদের এ প্রকৃতির প্রতি প্রভুত্ব করা নয়, প্রকৃতিকে ভোগ করা নয়, এ প্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলন।

অথচ এই সম্মিলন অরণ্যবাসীর বর্বরতা নয়। তপোবন আফ্রিকার বন যদি হত তা হলে বলতে পারতুম প্রকৃতির সঙ্গে মিলে থাকা একটা তামসিকতা মাত্র। কিন্তু মানুষের চিত্ত যেখানে সাধনার দ্বারা জাগ্রত আছে সেখানকার মিলন কেবলমাত্র অভ্যাসের জড়ত্বজনিত হতে পারে না। সংস্কারের বাধা ক্ষয় হয়ে গেলে যে মিলন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে তপোবনের মিলন হচ্ছে তাই।

আমাদের কবিরা সকলেই বলেছেন তপোবন শান্তরসাস্পদ। তপোবনের যে একটি বিশেষ রস আছে সেটি শান্তরস। শান্তরস হচ্ছে পরিপূর্ণতার রস। যেমন সাতটা বর্ণরশ্মি মিলে গেলে তবে সাদা রঙ হয়, তেমনি চিত্তের প্রবাহ নানা ভাগে বিভক্ত না হয়ে যখন অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিলের সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্যকে একেবারে কানায় কানায় ভরে তোলে তখনই শান্তরসের উদ্ভব হয়।

তপোবনে সেই শান্তরস। এখানে সূর্য-অগ্নি বায়ু-জল স্থল-আকাশ তরুলতা মৃগপক্ষী সকলের সঙ্গেই চেতনার একটি পরিপূর্ণ যোগ। এখানে চতুর্দিকের কিছুর সঙ্গেই মানুষের বিচ্ছেদ নেই এবং বিরোধ নেই।

ভারতবর্ষের তপোবনে এই যে একটি শান্তরসের সংগীত বাঁধা হয়েছিল এই সংগীতের আদর্শেই আমাদের দেশে অনেক মিশ্র রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি হয়েছে। সেইজন্যেই আমাদের কাব্যে মানবব্যাপারের মাঝখানে প্রকৃতিকে এতবড়ো স্থান দেওয়া হয়েছে। এ কেবল সম্পূর্ণতার জন্যে আমাদের যে একটি স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আছে সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করবার উদ্দেশে।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে যে দুটি তপোবন আছে সে দুটিই শকুন্তলার সুখদুঃখকে একটি বিশালতার মধ্যে সম্পূর্ণ করে দিয়েছে। তার একটি তপোবন পৃথিবীতে, আর-একটি স্বর্গলোকের সীমায়। একটি তপোবনে সহকারের সঙ্গে নবমল্লিকার মিলনোৎসবে নবযৌবনা ঋষিকন্যারা পুলকিত হয়ে উঠছেন, মাতৃহীন মৃগশিশুকে তাঁরা নীবারমুষ্টি দিয়ে পালন করছেন, কুশসূচিতে তার মুখ বিদ্ধ হলে ইঙ্গুদীতৈল মাখিয়ে শুশ্রূষা করছেন ; এই তপোবনটি দুষ্যন্তশকুন্তলার প্রেমকে সারল্য সৌন্দর্য এবং স্বাভাবিকতা দান করে তাকে বিশ্বসুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে।

আর সান্ধ্যমেঘের মতো কিম্পুরুষপর্বত যে হেমকূট, যেখানে সুরাসুরগুরু মরীচি তাঁর পত্নীর সঙ্গে মিলে তপস্যা করছেন, লতাজালজড়িত যে হেমকূট পক্ষিনীড়খচিত অরণ্যজটামণ্ডল বহন করে যোগাসনে অচল শিবের মতো সূর্যের দিকে তাকিয়ে ধ্যানমগ্ন, যেখানে কেশর ধ'রে সিংহশিশুকে মাতার স্তন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যখন দুরন্ত তপস্বিবালক তার সঙ্গে খেলা করে তখন পশুর সেই দুঃখ ঋষিপত্নীর পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে— সেই তপোবন শকুন্তলার অপমানিত বিচ্ছেদদুঃখকে অতি বৃহৎ শান্তি ও পবিত্রতা দান করেছে।

এ কথা স্বীকার করতে হবে প্রথম তপোবনটি মর্তলোকের, আর দ্বিতীয়টি অমৃতলোকের। অর্থাৎ প্রথমটি হচ্ছে যেমন-হয়ে-থাকে, দ্বিতীয়টি হচ্ছে যেমন-হওয়া-ভালো। এই 'যেমন-হওয়া-ভালো'র দিকে 'যেমন-হয়ে-থাকে' চলেছে। এরই দিকে চেয়ে সে আপনাকে শোধন করছে, পূর্ণ করছে। 'যেমন-হয়ে-থাকে' হচ্ছেন সতী অর্থাৎ সত্য, আর 'যেমন-হওয়া-ভালো' হচ্ছেন শিব অর্থাৎ মঙ্গল। কামনা ক্ষয় করে তপস্যার মধ্য দিয়ে এই সতী ও শিবের মিলন হয়। শকুন্তলার জীবনেও 'যেমন-হয়ে-থাকে' তপস্যার দ্বারা অবশেষে 'যেমন-হওয়া-ভালো'র মধ্যে এসে আপনাকে সফল করে

তুলেছে। দুঃখের ভিতর দিয়ে মর্ত শেষকালে স্বর্গের প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে।

মানসলোকের এই যে দ্বিতীয় তপোবন, এখানেও প্রকৃতিকে ত্যাগ করে মানুষ স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে নি। স্বর্গে যাবার সময় যুধিষ্ঠির তাঁর কুকুরকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের কাব্যে মানুষ যখন স্বর্গে পৌঁছোয় প্রকৃতিকে সঙ্গে নেয়, বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজে বড়ো হয়ে ওঠে না। মরীচির তপোবনে মানুষ যেমন তপস্বী হেমকূটও তেমনি তপস্বী, সিংহও সেখানে হিংসা ত্যাগ করে, গাছপালাও সেখানে ইচ্ছাপূর্বক প্রার্থীর অভাব পূরণ করে। মানুষ একা নয়, নিখিলকে নিয়ে সে সম্পূর্ণ, অতএব কল্যাণ যখন আবির্ভূত হয় তখন সকলের সঙ্গে যোগেই তার আবির্ভাব।

রামায়ণে রামের বনবাস হল। কেবল রাক্ষসের উপদ্রব ছাড়া সে বনবাসে তাঁদের আর কোনো দুঃখই ছিল না। তাঁরা বনের পর বন, নদীর পর নদী, পর্বতের পর পর্বত পার হয়ে গেছেন, তাঁরা পর্ণকুটিরে বাস করেছেন, মাটিতে শুয়ে রাত্রি কাটিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা ক্লেশবোধ করেন নি। এই-সমস্ত নদীগিরি অরণ্যের সঙ্গে তাঁদের হৃদয়ের মিলন ছিল। এখানে তাঁরা প্রবাসী নন।

অন্য দেশের কবি রাম লক্ষ্মণ সীতার মাহাত্ম্যকে উজ্জ্বল করে দেখাবার জন্যেই বনবাসের দুঃখকে খুব কঠোর করেই চিত্রিত করতেন। কিন্তু বাল্মীকি একেবারেই তা করেন নি— তিনি বনের আনন্দকেই বারংবার পুনরুক্তিদ্বারা কীর্তন করে চলেছেন।

রাজৈশ্বর্য যাঁদের অন্তঃকরণকে অভিভূত করে আছে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলন কখনোই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে না। সমাজগত সংস্কার ও চিরজন্মের কৃত্রিম অভ্যাস পদে পদেই তাঁদের বাধা না দিয়ে থাকতে পারে না। সেই-সকল বাধার ভিতর থেকে প্রকৃতিকে তাঁরা কেবল প্রতিকূলই দেখতে থাকেন।

আমাদের রাজপুত্র ঐশ্বর্যে পালিত, কিন্তু ঐশ্বর্যের আসক্তি তাঁর অন্তকরণকে অভিভূত করে নি। ধর্মের অনুরোধে বনবাস স্বীকার করাই তার প্রথম প্রমাণ। তাঁর চিত্ত স্বাধীন ছিল, শান্ত ছিল, এইজন্যেই তিনি অরণ্যে প্রবাসদুঃখ ভোগ করেন নি ; এইজন্যেই তরুলতা পশুপক্ষী তাঁর হৃদয়কে কেবলই আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দ প্রভুত্বের আনন্দ নয়, ভোগের আনন্দ নয়, সম্মিলনের আনন্দ। এই আনন্দের ভিত্তিতে তপস্যা, আত্মসংযম। এর মধ্যেই উপনিষদের সেই বাণী : তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাঃ।

কৌশল্যার রাজগৃহবধূ সীতা বনে চলেছেন—

> একৈকং পাদপং গুল্মং
> লতাং বা পুষ্পশালিনীম্
> অদৃষ্টরূপাং পশ্যন্তী
> রামং পপ্রচ্ছ সাবলা।
> রমণীয়ান্ বহুবিধান্
> পাদপান্ কুসুমোৎকরান
> সীতাবচনসংরব্ধ
> আনয়ামাস লক্ষ্মণঃ।
> বিচিত্রবালুকাজলাং
> হংসসারসনাদিতাম্
> রেমে জনকরাজস্য
> সুতা প্রেক্ষ্য তদা নদীম্।

যে-সকল তরুগুল্ম কিংবা পুষ্পশালিনী লতা সীতা পূর্বে কখনো দেখেন নি তাদের কথা তিনি রামকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। লক্ষ্মণ তাঁর অনুরোধে তাঁকে পুষ্পমঞ্জরীতে ভরা বহুবিধ গাছ তুলে এনে দিতে লাগলেন। সেখানে বিচিত্রবালুকাজলা হংসসারসমুখরিতা নদী দেখে জানকী মনে আনন্দ বোধ করলেন।

প্রথমে বনে গিয়ে রাম চিত্রকূট পর্বতে যখন আশ্রয় গ্রহণ করলেন, তিনি

সুরম্যমাসাদ্য তু চিত্রকূটং
নদীঞ্চ তাং মাল্যবতীং সুতীর্থাং
ননন্দ হৃষ্টো মৃগপক্ষিজুষ্টাং
জহৌ চ দুঃখং পুরবিপ্রবাসাৎ।

সেই সুরম্য চিত্রকট, সেই সুতীর্থা মাল্যবতী নদী, সেই মৃগপক্ষিসেবিতা বনভূমিকে প্রাপ্ত হয়ে পুরবিপ্রবাসের দুঃখকে ত্যাগ করে হৃষ্টমনে রাম আনন্দ করতে লাগলেন।

দীর্ঘকালোষিতস্তস্মিন্ গিরৌ গিরিবনপ্রিয়ঃ— গিরিবনপ্রিয় রাম দীর্ঘকাল সেই গিরিতে বাস করে একদিন সীতাকে চিত্রকূটশিখর দেখিয়ে বলছেন—

ন রাজ্যভ্রংশনং ভদ্রে ন সুহৃদ্ভির্বিনাভবঃ
মনো মে বাধতে দৃষ্ট্বা রমণীয়মিমং গিরিম্।

রমণীয় এই গিরিকে দেখে রাজ্যভ্রংশনও আমাকে দুঃখ দিচ্ছে না, সুহৃদ্‌গণের কাছ থেকে দূরে বাসও আমার পীড়ার কারণ হচ্ছে না।

সেখান থেকে রাম যখন দণ্ডকারণ্যে গেলেন যেখানে গগনে সূর্যমণ্ডলের মতো দুর্দর্শ প্রদীপ্ত তাপসাশ্রমমণ্ডল দেখতে পেলেন। এই আশ্রম শরণ্যং সর্বভূতানাম্। ইহা ব্রাহ্মীলক্ষ্মী-দ্বারা সমাবৃত। কুটিরগুলি সুমার্জিত, চারি দিকে কত মৃগ কত পক্ষী।

রামের বনবাস এমনি করেই কেটেছিল— কোথাও বা রমণীয় বনে, কোথাও বা পবিত্র তপোবনে।

রামের প্রতি সীতার ও সীতার প্রতি রামের প্রেম তাঁদের পরস্পর থেকে প্রতিফলিত হয়ে চারি দিকের মৃগ পক্ষীকে আচ্ছন্ন করেছিল। তাঁদের প্রেমের যোগে তাঁরা কেবল নিজেদের সঙ্গে নয়, বিশ্বলোকের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়েছিলেন। এইজন্য সীতাহরণের পর রাম সমস্ত অরণ্যকেই আপনার বিচ্ছেদবেদনার সহচর পেয়েছিলেন। সীতার অভাব কেবল রামের পক্ষে নয়— সমস্ত অরণ্যই যে সীতাকে হারিয়েছে। কারণ, রামসীতার বনবাসকালে অরণ্য একটি নূতন সম্পদ পেয়েছিল— সেটি হচ্ছে মানুষের প্রেম। সেই প্রেমে তার পল্লবঘনশ্যামলতাকে, তার ছায়াগম্ভীর গহনতার রহস্যকে, একটি চেতনার সঞ্চারে রোমাঞ্চিত করে তুলেছিল।

শেকস্‌পীয়রের As You Like It নাটক একটি বনবাসকাহিনী— টেম্পেস্ট্‌ও তাই, Midsummer Night's Dream ও অরণ্যের কাব্য। কিন্তু সে-সকল কাব্যে মানুষের প্রভুত্ব ও প্রবৃত্তির লীলাই একেবারে একান্ত— অরণ্যের সঙ্গে সৌহার্দ্য দেখতে পাই নে। অরণ্যবাসের সঙ্গে মানুষের চিত্তের সামঞ্জস্যসাধন ঘটে নি। হয় তাকে জয় করবার, নয় তাকে ত্যাগ করবার চেষ্টা সর্বদাই রয়েছে; হয় বিরোধ, নয় বিরাগ, নয় ঔদাসীন্য। মানুষের প্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতিকে ঠেলেঠুলে স্বতন্ত্র হয়ে উঠে আপনার গৌরব প্রকাশ করেছে।

মিল্‌টনের প্যারাডাইস লস্ট্ কাব্যে আদি মানবদম্পতির স্বর্গারণ্যে বাস বিষয়টিই এমন যে অতি সহজেই সেই কাব্যে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলনটি সরল প্রেমের সম্বন্ধে বিরাট ও মধুর হয়ে প্রকাশ পাবার কথা। কবি প্রকৃতিসৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন, জীবজন্তুরা সেখানে হিংসা পরিত্যাগ করে একত্রে বাস করছে তাও বলেছেন, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাদের কোনো সাত্ত্বিক সম্বন্ধ নেই। তারা মানুষের ভোগের জন্যেই বিশেষ করে সৃষ্ট, মানুষ তাদের প্রভু। এমন আভাসটি কোথাও পাই নে যে এই আদি দম্পতি প্রেমের আনন্দ-প্রাচুর্যে তরুলতা পশুপক্ষীর সেবা করছেন, ভাবনাকে কল্পনাকে নদী গিরি অরণ্যের সঙ্গে নানা লীলায় সম্মিলিত করে তুলছেন। এই স্বর্গারণ্যের যে নিভৃত নিকুঞ্জটিতে মানবের প্রথম পিতামাতা বিশ্রাম করতেন সেখানে—

Beast, bird, insect or worm durst enter none;
such was their awe of man... ... ...

অর্থাৎ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ কেউ প্রবেশ করতে সাহস করত না, মানুষের প্রতি এমনি তাদের একটি সভয় সম্ভ্রম ছিল।

এই যে নিখিলের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ, এর মূলে একটি গভীরতর বিচ্ছেদের কথা আছে। এর মধ্যে— ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ— জগতে যা-কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা সমাবৃত করে জানবে, এই বাণীটির অভাব আছে। এই পাশ্চাত্য কাব্যে ঈশ্বরের সৃষ্টি ঈশ্বরের যশোকীর্তন করবার জন্যেই ; ঈশ্বর স্বয়ং দূরে থেকে তাঁর এই বিশ্বরচনা থেকে বন্দনা গ্রহণ করছেন।

মানুষের সঙ্গেও আংশিক পরিমাণে প্রকৃতির সেই সম্বন্ধ প্রকাশ পেয়েছে, অর্থাৎ প্রকৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠতা প্রচারের জন্যে।

ভারতবর্ষও যে মানুষের শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করে তা নয়। কিন্তু প্রভুত্ব করাকেই, ভোগ করাকেই, সে শ্রেষ্ঠতার প্রধান লক্ষণ বলে মানে না। মানুষের শ্রেষ্ঠতার সর্বপ্রধান পরিচয়ই হচ্ছে এই যে, মানুষ সকলের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। সে মিলন মূঢ়তার মিলন নয়, সে মিলন চিত্তের মিলন, সুতরাং আনন্দের মিলন। এই আনন্দের কথাই আমাদের কাব্যে কীর্তিত।

উত্তরচরিতে রাম ও সীতার যে প্রেম, সেই প্রেম আনন্দের প্রাচুর্যবেগে চারি দিকের জল স্থল আকাশের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাই রাম দ্বিতীয়বার গোদাবরীর গিরিতট দেখে বলে উঠেছিলেন— যত্র দ্রুমা অপি মৃগা অপি বন্ধবো মে। তাই সীতাবিচ্ছেদকালে তিনি তাঁদের পূর্বনিবাসভূমি দেখে আক্ষেপ করেছিলেন যে, মৈথিলী তাঁর করকমলবিকীর্ণ জল নীবার ও তৃণ দিয়ে যে-সকল গাছ পাখি ও হরিণদের পালন করেছিলেন তাদের দেখে আমার হৃদয় পাষাণ গলার মতো গলে যাচ্ছে।

মেঘদূতে যক্ষের বিরহ নিজের দুঃখের টানে স্বতন্ত্র হয়ে একলা কোণে বসে বিলাপ করছে না। বিরহদুঃখই তার চিত্তকে নববর্ষায় প্রফুল্ল পৃথিবীর সমস্ত নদ নদী অরণ্য নগরীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে। মানুষের হৃদয়বেদনাকে কবি সংকীর্ণ করে দেখান নি, তাকে বিরাটের মধ্যে বিস্তীর্ণ করেছেন, এইজন্যই প্রভুশাপগ্রস্ত একজন যক্ষের দুঃখবার্তা চিরকালের মতো বর্ষাঋতুর মর্মস্থান অধিকার করে প্রণয়ীহৃদয়ের খেয়ালকে বিশ্বসংগীতের ধ্রুপদে এমন করে বেঁধে দিয়েছে।

ভারতবর্ষের এইটেই হচ্ছে বিশেষত্ব। তপস্যার ক্ষেত্রেও এই দেখি, যেখানে তার হৃদয়বৃত্তির লীলা সেখানেও এই দেখতে পাই।

মানুষ দুই রকম করে নিজের মহত্ত্ব উপলব্ধি করে— এক স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে, আর-এক মিলনের মধ্যে। এক ভোগের দ্বারা, আর-এক যোগের দ্বারা। ভারতবর্ষ স্বভাবতই শেষের পথ অবলম্বন করেছে। এইজন্যেই দেখতে পাই যেখানেই প্রকৃতির মধ্যে কোনো বিশেষ সৌন্দর্য বা মহিমার আবির্ভাব সেইখানেই ভারতবর্ষের তীর্থস্থান। মানবচিত্তের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির মিলন যেখানে স্বভাবতই ঘটতে পারে সেই স্থানটিকেই ভারতবর্ষ পবিত্র তীর্থ বলে জেনেছে। এ-সকল জায়গায় মানুষের প্রয়োজনের কোনো উপকরণ নেই— এখানে চাষও চলে না বাসও চলে না, এখানে পণ্যসামগ্রীর আয়োজন নেই, এখানে রাজার রাজধানী নয়— অন্তত সেই সমস্তই এখানে মুখ্য নয়। এখানে নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ আপনার যোগ উপলব্ধি করে আত্মাকে সর্বগ ও বৃহৎ বলে জানে। এখানে প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজন-সাধনের ক্ষেত্র বলে মানুষ জানে না, তাকে আত্মার উপলব্ধি-সাধনের ক্ষেত্র বলেই মানুষ অনুভব করে, এইজন্যেই তা পুণ্যস্থান।

ভারতবর্ষের হিমালয় পবিত্র, ভারতবর্ষের বিন্ধ্যাচল পবিত্র, ভারতবর্ষের যে নদীগুলি লোকালয়সকলকে অক্ষয়ধারায় স্তন্য দান করে আসছে তারা সকলেই পুণ্যসলিলা। হরিদ্বার পবিত্র, হৃষীকেশ পবিত্র, কেদারনাথ বদরিকাশ্রম পবিত্র, কৈলাস পবিত্র, মানসসরোবর পবিত্র, পুষ্কর পবিত্র, গঙ্গার মধ্যে যমুনার মিলন পবিত্র, সমুদ্রের মধ্যে গঙ্গার অবসান পবিত্র। যে বিরাট প্রকৃতির দ্বারা মানুষ পরিবেষ্টিত, যার আলোক এসে তার চক্ষুকে সার্থক করেছে, যার উত্তাপ তার সর্বাঙ্গে প্রাণকে স্পন্দিত করে তুলছে, যার জলে তার অভিষেক, যার অন্নে তার জীবন, যার অভ্রভেদী রহস্যনিকেতনের নানা দ্বার দিয়ে নানা দূত বেরিয়ে এসে শব্দে গন্ধে বর্ণে ভাবে মানুষের চৈতন্যকে নিত্যনিয়ত জাগ্রত করে

রেখে দিয়েছে, ভারতবর্ষ সেই প্রকৃতির মধ্যে আপনার ভক্তিবৃত্তিকে সর্বত্র ওতপ্রোত করে প্রসারিত করে রেখে দিয়েছে, জগৎকে ভারতবর্ষ পূজার দ্বারা গ্রহণ করেছে, তাকে কেবলমাত্র উপভোগের দ্বারা খর্ব করে নি, তাকে ঔদাসীন্যের দ্বারা নিজের কর্মক্ষেত্রের বাইরে দূরে সরিয়ে রেখে দেয় নি ; এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে পবিত্র যোগেই ভারতবর্ষ আপনাকে বৃহৎ করে সত্য করে জেনেছে, ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলি এই কথাই ঘোষণা করছে।

বিদ্যালাভ করা কেবল বিদ্যালয়ের উপরেই নির্ভর করে না। প্রধানত ছাত্রের উপরেই নির্ভর করে। অনেক ছাত্র বিদ্যালয়ে যায়, এমন-কি, উপাধিও পায়, অথচ বিদ্যা পায় না। তেমনি তীর্থে অনেকেই যায় কিন্তু তীর্থের যথার্থ ফল সকলে লাভ করতে পারে না। যারা দেখবার জিনিসকে দেখবে না, পাবার জিনিসকে নেবে না, শেষ পর্যন্তই তাদের বিদ্যা পুঁথিগত ও ধর্ম বাহ্য আচারে আবদ্ধ থাকে। তারা তীর্থে যায় বটে কিন্তু যাওয়াকেই তারা পুণ্য মনে করে, পাওয়াকে নয়। তারা বিশেষ জল বা বিশেষ মাটির কোনো বস্তুগুণ আছে বলেই কল্পনা করে ; এতে মানুষের লক্ষ ভ্রষ্ট হয়, যা চিত্তের সামগ্রী তাকে বস্তুর মধ্যে নির্বাসিত ক'রে নষ্ট করে। আমাদের দেশে সাধনামার্জিত চিত্তশক্তি যতই মলিন হয়েছে এই নিরর্থক বাহ্যিকতা ততই বেড়ে উঠেছে এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু আমাদের এই দুর্গতির দিনের জড়ত্বকেই আমি কোনোমতেই ভারতবর্ষের চিরন্তন অভিপ্রায় বলে গ্রহণ করতে পারি নে।

কোনো একটি বিশেষ নদীর জলে স্নান করলে নিজের অথবা ত্রিকোটিসংখ্যক পূর্বপুরুষের পারলৌকিক সদ্‌গতি ঘটার সম্ভাবনা আছে, এ বিশ্বাসকে আমি সমূলক বলে মেনে নিতে রাজি নই এবং এ বিশ্বাসকে আমি বড়ো জিনিস বলে শ্রদ্ধা করি নে। কিন্তু অবগাহনস্নানের সময় নদীর জলকে যে ব্যক্তি যথার্থ ভক্তির দ্বারা সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনে গ্রহণ করতে পারে, আমি তাকে ভক্তির পাত্র বলেই জ্ঞান করি। কারণ, নদীর জলকে সামান্য তরল পদার্থ বলে সাধারণ মানুষের যে একটা স্থূল সংস্কার, একটা তামসিক অবজ্ঞা আছে, সাত্ত্বিকতার দ্বারা অর্থাৎ চৈতন্যময়তার দ্বারা সেই জড় সংস্কারকে সে লোক কাটিয়ে উঠেছে— এইজন্যে নদীর জলের সঙ্গে কেবলমাত্র তার শারীরিক ব্যবহারের বাহ্য সংস্রব ঘটে নি, তার সঙ্গে তার চিত্তের যোগসাধন হয়েছে। এই নদীর ভিতর দিয়ে পরম চৈতন্য তার চেতনাকে এক ভাবে স্পর্শ করেছেন। সেই স্পর্শের দ্বারা স্নানের জল কেবল তার দেহের মলিনতা নয়, তার চিত্তেরও মোহপ্রলেপ মার্জনা করে দিচ্ছে।

অগ্নি জল মাটি অন্ন প্রভৃতি সামগ্রীর অনন্ত রহস্য পাছে অভ্যাসের দ্বারা আমাদের কাছে একেবারে মলিন হয়ে যায় এইজন্যে প্রত্যহই নানা কর্মে নানা অনুষ্ঠানে তাদের পবিত্রতা আমাদের স্মরণ করবার বিধি আছে। যে লোক চেতনভাবে তাই স্মরণ করতে পারে, তাদের সঙ্গে যোগে ভূমার সঙ্গে আমাদের যোগ এ কথা যার বোধশক্তি স্বীকার করতে পারে, সে লোক খুব একটি মহৎ সিদ্ধি লাভ করেছে। স্নানের জলকে আহারের অন্নকে শ্রদ্ধা করবার যে শিক্ষা সে মূঢ়তার শিক্ষা নয়, তাতে জড়ত্বের প্রশ্রয় হয় না, কারণ, এই-সমস্ত অভ্যস্ত সামগ্রীকে তুচ্ছ করাই হচ্ছে জড়তা, তার মধ্যেও চিত্তের উদ্‌বোধন এ কেবল চৈতন্যের বিশেষ বিকাশেই সম্ভবপর। অবশ্য, যে ব্যক্তি মূঢ়, সত্যকে গ্রহণ করতে যার প্রকৃতিতে স্থূল বাধা আছে, সমস্ত সাধনাকেই সে বিকৃত করে এবং লক্ষ্যকে সে কেবলই ভুল জায়গায় স্থাপন করতে থাকে এ কথা বলাই বাহুল্য।

বহুকোটি লোক, প্রায় একটি সমগ্র জাতি, মৎস্য মাংস-আহার একেবারে পরিত্যাগ করেছে— পৃথিবীতে কোথাও এর তুলনা পাওয়া যায় না। মানুষের মধ্যে এমন জাতি দেখি নে যে আমিষ আহার না করে।

ভারতবর্ষ এই যে আমিষ পরিত্যাগ করেছে সে কৃচ্ছ্রব্রত সাধনের জন্যে নয়, নিজের শরীরকে পীড়া দিয়ে কোনো শাস্ত্রোপদিষ্ট পুণ্যলাভের জন্যে নয়। তার একমাত্র উদ্দেশ্য— জীবের প্রতি হিংসা ত্যাগ করা।

এই হিংসা ত্যাগ না করলে জীবের সঙ্গে জীবের যোগসামঞ্জস্য নষ্ট হয়। প্রাণীকে যদি আমরা খেয়ে

ফেলবার, পেট ভরাবার জিনিস বলে দেখি তবে কখনোই তাকে সত্যরূপে দেখতে পারি নে। তবে প্রাণ জিনিসটাকে এতই তুচ্ছ করে দেখা অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, কেবল আহারের জন্য নয়, শুদ্ধমাত্র প্রাণিহত্যা করাই আমাদের অঙ্গ হয়ে ওঠে। এবং নিদারুণ অহৈতুকী হিংসাকে জলে স্থলে আকাশে গুহায় গহ্বরে দেশে বিদেশে মানুষ ব্যাপ্ত করে দিতে থাকে।

এই যোগভ্রষ্টতা, এই বোধশক্তির অসাড়তা থেকে ভারতবর্ষ মানুষকে রক্ষা করবার জন্যে চেষ্টা করেছে।

মানুষের জ্ঞান বর্বরতা থেকে অনেক দূরে অগ্রসর হয়েছে তার একটি প্রধান লক্ষণ কী ? না, মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের সর্বত্রই নিয়মকে দেখতে পাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তা না দেখতে পাচ্ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তার জ্ঞানের সম্পূর্ণ সার্থকতা ছিল না। ততক্ষণ বিশ্বচরাচরে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করছিল— সে দেখছিল জ্ঞানের নিয়ম কেবল তার নিজের মধ্যেই আছে আর এই বিরাট বিশ্ব-ব্যাপারের মধ্যে নেই। এইজন্যেই তার জ্ঞান আছে বলেই সে যেন জগতে একঘরে হয়ে ছিল। কিন্তু আজ তার জ্ঞান অণু হতে অণুতম ও বৃহৎ হতে বৃহত্তম সকলের সঙ্গেই নিজের যোগস্থাপনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। এই হচ্ছে বিজ্ঞানের সাধনা।

ভারতবর্ষ যে সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ।

গীতা বলেছেন—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ।

ইন্দ্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলা হয়ে থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, আবার মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধির চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ তা হচ্ছেন তিনি।

ইন্দ্রিয়সকল কেন শ্রেষ্ঠ, না, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগসাধন হয়। কিন্তু সে যোগ আংশিক। ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, কারণ মনের দ্বারা যে জ্ঞানময় যোগ ঘটে তা ব্যাপকতর। কিন্তু জ্ঞানের যোগেও সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ দূর হয় না। মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ বোধের দ্বারা যে চৈতন্যময় যোগ তা একেবারে পরিপূর্ণ। সেই যোগের দ্বারাই আমরা সমস্ত জগতের মধ্যে তাঁকেই উপলব্ধি করি যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

এই সকলের-চেয়ে-শ্রেষ্ঠকে সকলের মধ্যেই বোধের দ্বারা অনুভব করা ভারতবর্ষের সাধনা।

অতএব যদি আমরা মনে করি ভারতবর্ষের এই সাধনাতেই দীক্ষিত করা ভারতবাসীর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তবে এটা মনে স্থির রাখতে হবে যে, কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানায় দক্ষতা-শিক্ষা নয়, স্কুল-কলেজে পরীক্ষায় পাস করা নয়, আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে— প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে।

আমাদের স্কুল-কলেজেও তপস্যা আছে কিন্তু সে মনের তপস্যা, জ্ঞানের তপস্যা। বোধের তপস্যা নয়।

জ্ঞানের তপস্যায় মনকে বাধামুক্ত করতে হয়। যে-সকল পূর্বসংস্কার আমাদের মনের ধারণাকে এক-ঝোঁকা করে রাখে তাদের ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার করে দিতে হয়। যা নিকটে আছে বলে বড়ো এবং দূরে আছে বলে ছোটো, যা বাইরে আছে বলেই প্রত্যক্ষ এবং ভিতরে আছে বলেই প্রচ্ছন্ন, যা বিচ্ছিন্ন করে দেখলে নিরর্থক, সংযুক্ত করে দেখলেই সার্থক, তাকে তার যাথার্থ্য রক্ষা করে দেখবার শিক্ষা দিতে হয়।

বোধের তপস্যার বাধা হচ্ছে রিপুর বাধা ; প্রবৃত্তি অসংযত হয়ে উঠলে চিত্তের সাম্য থাকে না, সুতরাং বোধ বিকৃত হয়ে যায়। কামনার জিনিসকে আমরা শ্রেয় দেখি, সে জিনিসটা সত্যই শ্রেয় বলে

নয়, আমাদের কামনা আছে বলেই ; লোভের জিনিসকে আমরা বড়ো দেখি, সে জিনিসটা সত্যই বড়ো বলে নয়, আমাদের লোভ আছে বলেই।

এইজন্যে ব্রহ্মচর্যের সংযমের দ্বারা বোধশক্তিকে বাধামুক্ত করবার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। ভোগবিলাসের আকর্ষণ থেকে অভ্যাসকে মুক্তি দিতে হয়, যে-সমস্ত সাময়িক উত্তেজনা লোকের চিত্তকে ক্ষুব্ধ এবং বিচারবুদ্ধিকে সামঞ্জস্যভ্রষ্ট করে দেয় তার ধাক্কা থেকে বাঁচিয়ে বুদ্ধিকে সরল করে বাড়তে দিতে হয়।

যেখানে সাধনা চলছে, যেখানে জীবনযাত্রা সরল ও নির্মল, যেখানে সামাজিক সংস্কারের সংকীর্ণতা নেই, যেখানে ব্যক্তিগত ও জাতিগত বিরোধবুদ্ধিকে দমন করবার চেষ্টা আছে, সেইখানেই ভারতবর্ষ যাকে বিশেষভাবে বিদ্যা বলেছে তাই লাভ করবার স্থান।

আমি জানি অনেকেই বলে উঠবেন এ একটা ভাবুকতার উচ্ছ্বাস, কাণ্ডজ্ঞানবিহীনের দুরাশামাত্র। কিন্তু সে আমি কোনোমতেই স্বীকার করতে পারি নে। যা সত্য তা যদি অসাধ্য হয় তবে তা সত্যই নয়। অবশ্য, যা সকলের চেয়ে শ্রেয় তাই যে সকলের চেয়ে সহজ তা নয়, সেইজন্যেই তার সাধনা চাই। আসলে, প্রথম শক্ত হচ্ছে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করা। টাকা জিনিসটার দরকার আছে এই বিশ্বাস যখন ঠিক মনে জন্মায় তখন এ আপত্তি আমরা আর করি নে যে, টাকা উপার্জন করা শক্ত। তেমনি ভারতবর্ষ যখন বিদ্যাকেই নিশ্চয়রূপে শ্রদ্ধা করেছিল তখন সেই বিদ্যালাভের সাধনাকে অসাধ্য বলে হেসে উড়িয়ে দেয় নি। তখন তপস্যা আপনি সত্য হয়ে উঠেছিল।

অতএব প্রথমত দেশের সেই সত্যের প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা যদি জন্মে তবে দুর্গম বাধার মধ্য দিয়েও তার পথ আপনিই তৈরি হয়ে উঠবে।

বর্তমানকালে এখনই দেশে এইরকম তপস্যার স্থান, এইরকম বিদ্যালয় যে অনেকগুলি হবে আমি এমনতরো আশা করি নে। কিন্তু আমরা যখন বিশেষভাবে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সম্প্রতি জাগ্রত হয়ে উঠেছি, তখন ভারতবর্ষের বিদ্যালয় যেমনটি হওয়া উচিত অন্তত তার একটি মাত্র আদর্শ দেশের নানা চাঞ্চল্য নানা বিরুদ্ধভাবের আন্দোলনের ঊর্ধ্বে জেগে ওঠা দরকার হয়েছে।

ন্যাশনাল বিদ্যাশিক্ষা বলতে য়ুরোপ যা বোঝে আমরা যদি তাই বুঝি তবে তা নিতান্তই বোঝার ভুল হবে। আমাদের দেশের কতকগুলি বিশেষ সংস্কার, আমাদের জাতের কতকগুলি লোকাচার, এইগুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ করে আমাদের স্বাজাত্যের অভিমানকে অত্যুগ্র করে তোলবার উপায়কে আমি কোনোমতে ন্যাশনাল শিক্ষা বলে গণ্য করতে পারি নে। জাতীয়তাকে আমরা পরম পদার্থ বলে পূজা করি নে এইটেই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তা। ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ— এইটিই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তার মন্ত্র।

প্রাচীন ভারতের তপোবনে যে মহাসাধনার বনস্পতি একদিন মাথা তুলে উঠেছিল এবং সর্বত্র তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে সমাজের নানা দিককে অধিকার করে নিয়েছিল, সেই ছিল আমাদের ন্যাশনাল সাধনা। সেই সাধনা যোগসাধনা। যোগসাধনা কোনো উৎকট শারীরিক মানসিক ব্যায়ামচর্চা নয়। যোগসাধনা মানে সমস্ত জীবনকে এমনভাবে চালনা করা যাতে স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বিক্রমশালী হয়ে ওঠাই আমাদের লক্ষ্য না হয়, মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠাকেই আমরা চরম পরিণাম বলে মানি— ঐশ্বর্যকে সঞ্চিত করে তোলা নয়, আত্মাকে সত্যে উপলব্ধি করাই আমরা সফলতা বলে স্বীকার করি।

বহু প্রাচীনকালে একদিন অরণ্যসংকুল ভারতবর্ষে আমাদের আর্য পিতামহেরা প্রবেশ করেছিলেন। আধুনিক ইতিহাসে য়ুরোপীয়দল ঠিক তেমনি করেই নূতন আবিষ্কৃত মহাদ্বীপের মহারণ্যে পথ উদ্‌ঘাটন করেছেন। তাঁদের মধ্যে সাহসিকগণ অগ্রগামী হয়ে অপরিচিত ভূখণ্ডসকলকে অনুবর্তীদের জন্যে অনুকূল করে নিয়েছেন। আমাদের দেশেও অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিরা অগ্রগামী ছিলেন। তাঁরা অপরিচিত দুর্গমতার বাধা অতিক্রম করে গহন অরণ্যকে বাসোপযোগী করে তুলেছিলেন। পূর্বতন অধিবাসীদের সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই তখনো যেমন হয়েছিল এখনো তেমনি হয়েছে। কিন্তু এই দুই ইতিহাসের ধারা যদিও ঠিক একই অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, তবু একই সমুদ্রে এসে পৌঁছোয় নি।

আমেরিকার অরণ্যে যে তপস্যা হয়েছে তার প্রভাবে বনের মধ্যে থেকে বড়ো বড়ো শহর ইন্দ্রজালের মতো জেগে উঠেছে। ভারতবর্ষেও তেমন করে শহরের সৃষ্টি হয় নি তা নয়, কিন্তু ভারতবর্ষ সেইসঙ্গে অরণ্যকেও অঙ্গীকার করে নিয়েছিল। অরণ্য ভারতবর্ষের দ্বারা বিলুপ্ত হয় নি, ভারতবর্ষের দ্বারা সার্থক হয়েছিল ; যা বর্বরের আবাস ছিল তাই ঋষির তপোবন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমেরিকায় অরণ্য যা অবশিষ্ট আছে তা আজ আমেরিকার প্রয়োজনের সামগ্রী, কোথাও বা তা ভোগের বস্তুও বটে, কিন্তু যোগের আশ্রম নয়। ভূমার উপলব্ধি দ্বারা এই অরণ্যগুলি পুণ্যস্থান হয়ে ওঠে নি। মানুষের শ্রেষ্ঠতর অন্তরতর প্রকৃতির সঙ্গে এই আরণ্য প্রকৃতির পবিত্র মিলন স্থাপিত হয় নি। অরণ্যকে নব্য আমেরিকা আপনার বড়ো জিনিস কিছুই দেয় নি, অরণ্যও তাকে আপনার বড়ো পরিচয় থেকে বঞ্চিত করেছে। নূতন আমেরিকা যেমন তার পুরাতন অধিবাসীদের প্রায় লুপ্তই করেছে, আপনার সঙ্গে যুক্ত করে নি, তেমনি অরণ্যগুলিকে আপনার সভ্যতার বাইরে ফেলে দিয়েছে— তার সঙ্গে মিলিত করে নেয় নি। নগর-নগরীই আমেরিকার সভ্যতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন— এই নগর-স্থাপনার দ্বারা মানুষ আপনার স্বাতন্ত্র্যের প্রতাপকে অভ্রভেদী করে প্রচার করেছে। আর তপোবনই ছিল ভারতবর্ষের সভ্যতার চরম নিদর্শন ; এই বনের মধ্যে মানুষ নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার মিলনকেই শান্তসমাহিতভাবে উপলব্ধি করেছে।

কেউ না মনে করেন ভারতবর্ষের এই সাধনাকেই আমি একমাত্র সাধনা বলে প্রচার করতে ইচ্ছা করি। আমি বরঞ্চ বিশেষ করে এই কথাই জানাতে চাই যে, মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যের সীমা নেই। সে তালগাছের মতো একটি মাত্র ঋজুরেখায় আকাশের দিকে ওঠে না, সে বটগাছের মতো অসংখ্য ডালে-পালায় আপনাকে চারি দিকে বিস্তীর্ণ করে দেয়। তার যে শাখাটি যে দিকে সহজে যেতে পারে তাকে সেই দিকেই সম্পূর্ণভাবে যেতে দিলে তবেই সমগ্র গাছটি পরিপূর্ণতা লাভ করে, সুতরাং সকল শাখারই তাতে মঙ্গল।

মানুষের ইতিহাস জীবধর্মী। সে নিগূঢ় প্রাণশক্তিতে বেড়ে ওঠে। সে লোহা পিতলের মতো ছাঁচে ঢালবার জিনিস নয়। বাজারে কোনো বিশেষকালে কোনো বিশেষ সভ্যতার মূল্য অত্যন্ত বেড়ে গেছে বলেই সমস্ত মানবসমাজকে একই কারখানায় ঢালাই করে ফ্যাশনের বশবর্তী মূঢ় খরিদ্দারকে খুশি করে দেবার দুরাশা একেবারেই বৃথা।

ছোটো পা সৌন্দর্য বা আভিজাত্যের লক্ষণ, এই মনে করে কৃত্রিম উপায়ে তাকে সংকুচিত করে চীনের মেয়ে ছোটো পা পায় নি, বিকৃত পা পেয়েছে। ভারতবর্ষও হঠাৎ জবরদস্তি-দ্বারা নিজেকে য়ুরোপীয় আদর্শের অনুগত করতে গেলে প্রকৃত য়ুরোপ হবে না, বিকৃত ভারতবর্ষ হবে মাত্র।

এ কথা দৃঢ়রূপে মনে রাখতে হবে— এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির অনুকরণ-অনুসরণের সম্বন্ধ নয়, আদান-প্রদানের সম্বন্ধ। আমার যে জিনিসের অভাব নেই, তোমারও যদি ঠিক সেই জিনিসটাই থাকে, তবে তোমার সঙ্গে আমার আর অদলবদল চলতে পারে না, তা হলে তোমাকে সমকক্ষভাবে আমার আর প্রয়োজন হয় না। ভারতবর্ষ যদি খাঁটি ভারতবর্ষ হয়ে না ওঠে, তবে পরের বাজারে মজুরি করা ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কোনো প্রয়োজনই থাকবে না। তা হলে তার আপনার প্রতি আপনার সম্মান-বোধ চলে যাবে এবং আপনাতে আপনার আনন্দও থাকবে না।

তাই আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিতভাবে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কী। সে সত্য প্রধানত বণিগ্‌বৃত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয় ; সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। সেই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্বমানবের নিত্যব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্যে তপস্যা করেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও কবীর নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পরবর্তী মহাপুরুষগণ সেই সত্যকেই প্রচার করে গেছেন। ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা। ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সেই তপস্যা আজ হিন্দু

মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে ; দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে, সাধকভাবে। যতদিন তা না ঘটবে ততদিন আমাদের দুঃখ পেতে হবে, অপমান সইতে হবে, ততদিন নানা দিক থেকে আমাদের বারংবার ব্যর্থ হতে হবে। ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মজ্ঞান, সর্বজীবে দয়া, সর্বভূতে আত্মোপলব্ধি একদিন এই ভারতে কেবল কাব্যকথা কেবল মতবাদ রূপে ছিল না ; প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে একে সত্য করে তোলবার জন্যে অনুশাসন ছিল ; সেই অনুশাসনকে আজ যদি আমরা বিস্মৃত না হই, আমাদের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষাকে সেই অনুশাসনের যদি অনুগত করি, তবেই আমাদের আত্মা বিরাটের মধ্যে আপনার স্বাধীনতা লাভ করবে এবং কোনো সাময়িক বাহ্য অবস্থা আমাদের সেই স্বাধীনতাকে বিলুপ্ত করতে পারবে না।

প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখায় বলেই তাকে বড়ো মনে হয়, কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায় নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে, এই যোগ অহংকারকে দূর করে বিনম্র হয়ে। এই বিনম্রতা একটি আধ্যাত্মিক শক্তি, এ দুর্বল স্বভাবের অধিগম্য নয়। বায়ুর যে প্রবাহ নিত্য, শান্ততার দ্বারাই ঝড়ের চেয়ে তার শক্তি বেশি। এইজন্যেই ঝড় চিরদিন টিকতে পারে না, এইজন্যেই ঝড় কেবল সংকীর্ণ স্থানকেই কিছুকালের জন্য ক্ষুব্ধ করে, আর শান্ত বায়ুপ্রবাহ সমস্ত পৃথিবীকে নিত্যকাল বেষ্টন করে থাকে। যথার্থ নম্রতা. যা সাত্ত্বিকতার তেজে উজ্জ্বল, যা ত্যাগ ও সংযমের কঠোর শক্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, সেই নম্রতাই সমস্তের সঙ্গে অবাধে যুক্ত হয়ে সত্যভাবে নিত্যভাবে সমস্তকে লাভ করে। সে কাউকে দূর করে না, বিচ্ছিন্ন করে না, আপনাকে ত্যাগ করে এবং সকলকেই আপন করে। এইজন্যেই ভগবান যিশু বলেছেন যে, যে বিনম্র সেই পৃথ্বীবিজয়ী, শ্রেষ্ঠধনের অধিকার একমাত্র তারই।

[অগ্রহায়ণ ১৩১৬]

ছুটির পর

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে

ছুটির পর আমরা সকলে আবার এখানে একত্র হয়েছি। কর্ম থেকে মাঝে মাঝে আমরা যে এইরূপ অবসর নিই সে কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য নয়— কর্মের সঙ্গে যোগকে নবীন রাখবার এই উপায়।

মাঝে মাঝে কর্মক্ষেত্র থেকে যদি এইরকম দূরে না যাই তবে কর্মের যথার্থ তাৎপর্য আমরা বুঝতে পারি নে। অবিশ্রাম কর্মের মাঝখানে নিবিষ্ট হয়ে থাকলে কর্মটাকেই অতিশয় একান্ত করে দেখা হয়। কর্ম তখন মাকড়সার জালের মতো আমাদের চারি দিক থেকে এমনি আচ্ছন্ন করে ধরে যে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী তা বুঝবার সামর্থ্যই আমাদের থাকে না। এইজন্য অভ্যস্ত কর্মকে পুনরায় নূতন করে দেখবার সুযোগ লাভ করব বলেই এক-একবার কর্ম থেকে আমরা সরে যাই। কেবলমাত্র ক্লান্ত শক্তিকে বিশ্রাম দেওয়াই তার উদ্দেশ্য নয়।

আমরা কেবলই কর্মকেই দেখব না। কর্তাকেও দেখতে হবে। কেবল আগুনের প্রখর তাপ ও এঞ্জিনের কঠোর শব্দের মধ্যে আমরা এই সংসার-কারখানার মুটে-মজুরের মতোই সর্বাঙ্গে কালিঝুল মেখে দিন কাটিয়ে দেব না। একবার দিনান্তে স্নান করে কাপড় ছেড়ে কারখানার মনিবকে যদি দেখে আসতে পারি তবে তাঁর সঙ্গে আমাদের কাজের যোগ নির্ণয় করে কলের একাধিপত্যের হাত এড়াতে পারি, তবেই কাজে আমাদের আনন্দ জন্মে। নতুবা কেবলই কলের চাকা চালাতে চালাতে আমরাও কলেরই শামিল হয়ে উঠি।

আজ ছুটির শেষে আমরা আবার আমাদের কর্মক্ষেত্রে এসে পৌঁচেছি। এবার কি আবার নূতন দৃষ্টিতে কর্মকে দেখছি না? এই কর্মের মর্মগত সত্যটি অভ্যাসবশত আমাদের কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছিল; তাকে পুনরায় উজ্জ্বল করে দেখে কি আনন্দ বোধ হচ্ছে না?

এ আনন্দ কিসের জন্যে? এ কি সফলতার মূর্তিকে প্রত্যক্ষ দেখে? এ কি এই মনে করে যে, আমরা যা করতে চেয়েছিলুম তা করে তুলেছি? এ কি আমাদের আত্মকীর্তির গর্বানুভবের আনন্দ?

তা নয়। কর্মকেই চরম মনে করে তার মধ্যে ডুবে থাকলে মানুষ কর্মকে নিয়ে আত্মশক্তির গর্ব উপলব্ধি করে। কিন্তু কর্মের ভিতরকার সত্যকে যখন আমরা দেখি তখন কর্মের চেয়ে বহুগুণে বড়ো জিনিসটিকে দেখি। তখন যেমন আমাদের অহংকার দূর হয়ে যায়, সম্ভ্রমে মাথা নত হয়ে পড়ে, তেমনি আর-এক দিকে আনন্দে আমাদের বক্ষ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। তখন আমাদের আনন্দময় প্রভুকে দেখতে পাই, কেবল লৌহময় কলের আস্ফালনকে দেখি না।

এখানকার এই বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি মঙ্গলচেষ্টা আছে। কিন্তু সে কি কেবল একটি মঙ্গলের কল মাত্র। কেবল নিয়ম-রচনা এবং নিয়মে চালানো? কেবল ভাষা শেখানো, অঙ্ক কষানো, খেটে মরা এবং খাটিয়ে মারা? কেবল মস্ত একটা ইস্কুল তৈরি করে মনে করা খুব একটা ফল পেলুম? তা নয়।

এই চেষ্টাকে বড়ো করে দেখা, এই চেষ্টার ফলকেই বড়ো ফল বলে গর্ব করা সে নিতান্তই ফাঁকি। মঙ্গল-অনুষ্ঠানে মঙ্গলফল লাভ হয় সন্দেহ নেই কিন্তু সে গৌণ ফল মাত্র। আসল কথাটি এই যে, মঙ্গলকর্মের মধ্যে মঙ্গলময়ের আবির্ভাব আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদি ঠিক জায়গায় দৃষ্টি মেলে দেখি তবে মঙ্গলকর্মের উপরে সেই বিশ্বমঙ্গলকে দেখতে পাই। মঙ্গল-অনুষ্ঠানের চরম সার্থকতা তাই। মঙ্গলকর্ম সেই বিশ্বকর্মাকে সত্যদৃষ্টিতে দেখবার একটি সাধনা। অলস যে, সে তাঁকে দেখতে পায় না। নিরুদ্যম যে, তার চিত্তে তাঁর প্রকাশ আচ্ছন্ন। এইজন্যই কর্ম, নইলে কর্মের মধ্যেই কর্মের গৌরব থাকতে পারে না।

যদি মনে জানি আমাদের এই কর্ম সেই কল্যাণময় বিশ্বকর্মাকেই লাভ করবার একটি সাধনা, তা হলে কর্মের মধ্যে যা-কিছু বিঘ্ন অভাব প্রতিকূলতা আছে তা আমাদের হতাশ করতে পারে না। কারণ, বিঘ্নকে অতিক্রম করাই যে আমাদের সাধনার অঙ্গ। বিঘ্ন না থাকলে যে আমাদের সাধনাই অসম্পূর্ণ হয়। তখন প্রতিকূলতাকে দেখলে কর্মনাশের ভয়ে আমরা ব্যাকুল হয়ে উঠি নে, কারণ, কর্মফলের চেয়ে আরো যে বড়ো ফল আছে। প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করলে আমরা কৃতকার্য হব বলে কোমর বাঁধলে চলবে না, বস্তুত কৃতকার্য হব কি না তা জানি নে। কিন্তু প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করতে করতে আমাদের অন্তরের বাধা ক্ষয় হয়, তাতে আমাদের তেজ ভস্মমুক্ত হয়ে ক্রমশ দীপ্যমান হয়ে ওঠে এবং সেই দীপ্তিতেই, যিনি বিশ্বপ্রকাশ, আমার চিত্তে তাঁর প্রকাশ উন্মুক্ত হতে থাকে। আনন্দিত হও যে, কর্মে বাধা আছে। আনন্দিত হও যে, কর্ম করতে গেলেই তোমাকে নানা দিক থেকে নানা আঘাত সইতে হবে এবং তুমি যেমনটি কল্পনা করছ বারংবার তার পরাভব ঘটবে। আনন্দিত হও যে, লোকে তোমাকে ভুল বুঝবে ও অপমানিত করবে। আনন্দিত হও যে, তুমি যে বেতনটি পাবে বলে লোভ করে বসেছিলে বারংবার তা হতে বঞ্চিত হবে। কারণ, সেই তো সাধনা। যে ব্যক্তি আগুন জ্বালতে চায় সে ব্যক্তির কাঠ পুড়ছে বলে দুঃখ করলে চলবে কেন? যে কৃপণ শুধু শুষ্ক কাঠই স্তূপাকার করে তুলতে চায় তার কথা ছেড়ে দাও। তাই ছুটির পরে কর্মের সমস্ত বাধাবিঘ্ন সমস্ত অভাব অসম্পূর্ণতার মধ্যে আজ আনন্দের সঙ্গে প্রবেশ করছি। কাকে দেখে? যিনি কর্মের উপরে বসে আছেন তাঁর দিকেই চেয়ে।

তাঁর দিকে চাইলে কর্মের বল বাড়ে অথচ উগ্রতা চলে যায়। চেষ্টার চেষ্টারূপ আর দেখতে পাই নে, তার শান্তিমূর্তিই ব্যক্ত হয়। কাজ চলতে থাকে অথচ স্তব্ধতা আসে, ভরা জোয়ারের জলের মতো সমস্ত থম্‌থম্ করতে থাকে। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ঘোষণা রটনা এ সমস্ত একেবারেই ঘুচে যায়। চিন্তায় বাক্যে কর্মে বাড়াবাড়ি কিছুমাত্র থাকে না। শক্তি তখন আপনাকে আপনি আড়াল করে দিয়ে সুন্দর হয়ে ওঠে— যেমন সুন্দর আজকের এই সন্ধ্যাকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী। তার প্রচণ্ড তেজ, প্রবল

গতি, তার ভয়ংকর উদ্যম কী পরিপূর্ণ শান্তির ছবি বিস্তার করে কী কমনীয় হাসিই হাসছে। আমরাও আমাদের কর্মের আসনে পরমশক্তির সেই শান্তিময় মহাসুন্দররূপ দেখে উদ্ধত চেষ্টাকে প্রশান্ত করব। কর্মের উদগ্র আক্ষেপকে সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে আচ্ছন্ন করে দেব। আমাদের কর্ম, মধু দ্যৌঃ, মধু নক্তম্, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ— এই সমস্তের সঙ্গে মিলে মধুময় হয়ে উঠবে।

[১৩১৬]

বর্তমান যুগ

আমি পূর্বেই একটি কথা তোমাদিগকে বলেছি— তোমরা যে এই সময়ে জন্মগ্রহণ করতে পেরেছ, এ তোমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলতে হবে। তোমরা জান না এই কাল কত বড়ো কাল, এর অভ্যন্তরে কী প্রচ্ছন্ন আছে। হাজার হাজার শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীতে এমন শতাব্দী খুব অল্পই এসেছে। কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবী জুড়ে এক উত্তাল তরঙ্গ উঠেছে। বিশ্বমানবপ্রকৃতির মধ্যে একটা চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছে— সবাই আজ জাগ্রত। পুরাতন জীর্ণ সংস্কার ত্যাগ করবার জন্য, সকলপ্রকার অন্যায়কে চূর্ণ করবার জন্য, মানবমাত্রেই উঠে পড়ে লেগেছে— নূতন ভাবে জীবনকে দেশকে গড়ে তুলবে। বসন্ত এলে বৃক্ষ যেমন করে তার দেহ হতে শুষ্ক পত্র ঝেড়ে ফেলে নব পল্লবে সেজে ওঠে, মানবপ্রকৃতি কোন্-এক প্রাণপূর্ণ হাওয়ায় ঠিক তেমনি করে সেজে ওঠবার জন্য ব্যাকুল। মানবপ্রকৃতি পূর্ণতার আস্বাদ পেয়েছে, একে এখন কোনোমতেই বাইরের শক্তি-দ্বারা চেপে ছোটো করে রাখা চলবে না।

আসল জিনিসটা সহসা আমাদের চোখে পড়ে না, অনেক সময়ে এমন-কি তার অস্তিত্ব পর্যন্তও অস্বীকার করে বসি। আজ আমরা বাহির হতে দেখছি চারি দিকে একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত, যাকে আমরা পলিটিক্স (politics) বলি। তাকে যত বড়ো করেই দেখি-না কেন, সে নিতান্তই বাহিরের জিনিস। আমাদের আত্মাকে কিছুতে যদি জাগরিত করছে সত্য হয়, তবে তা ধর্ম ছাড়া আর-কিছুই নয়। এই ধর্মের মূল-শক্তিটি প্রচ্ছন্ন থেকে কাজ করছে বলেই আমাদের চোখে ধরা পড়ছে না; পলিটিক্সের চাঞ্চল্যই আমাদের সমস্ত চিত্তকে আকর্ষণ করেছে। আমরা উপরকার তরঙ্গটাকেই দেখে থাকি, ভিতরকার স্রোতটাকে দেখি না। কিন্তু বস্তুত ভগবান যে মানবসমাজকে ধর্মের ভিতর দিয়ে একটা মস্ত নাড়া দিয়েছেন— এই তো বিংশ শতাব্দীর বার্তা। বিশ্বাস করো, অনুভব করো, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সমস্ত বিশ্বের ভিতর দিয়ে আজ এই ধর্মের বৈদ্যুতশক্তি ছুটে চলেছে। পৃথিবীতে আজ যে-কোনো তাপস সাধনায় প্রবৃত্ত আছে, তার পক্ষে এমন অনুকূল সময় আর আসবে না। আজ কি তোমাদের নিশ্চেষ্ট থাকবার দিন? তন্দ্রা কি ছুটবে না? আকাশ হতে যখন বর্ষণ হয়, ছোটো বড়ো যেখানে যত জলাশয় খনন করা আছে, জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে আজ যেখানেই কোনো মঙ্গলের আধার পূর্ব হতে প্রস্তুত হয়ে আছে, সেখানেই তা কল্যাণে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। সার্থকতা আজ সহজ হয়ে এসেছে; এমন সুযোগকে ব্যর্থ হতে দিলে চলবে না। তোমরা আশ্রমবাসী এই শুভযোগে আশ্রমকে সার্থক করে তোলো। প্রস্তরের উপর দিয়ে জলস্রোত যেমন করে বহে যায়, সেখানে দাঁড়াবার কোনোই স্থান পায় না, আমাদের হৃদয়ের উপর দিয়ে তেমনি করে এই প্রবাহ যেন বহে না যায়। ঈশ্বরের প্রসাদস্রোত আজ সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়ে বিশেষভাবে প্রবাহিত হবার সময় এখানে এসে একবারটি যেন পাক খেয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত আশ্রমটি যেন কানায় কানায় ভরে ওঠে। শুধু আমাদের এই ক্ষুদ্র আশ্রমটি কেন, পৃথিবীর যেখানে যে-কোনো ছোটো বড়ো সাধনার ক্ষেত্র আছে মঙ্গলবারিতে আজ পূর্ণ হোক। আশ্রমে বাস করে এই দিনে জীবনকে ব্যর্থ হতে দিয়ো না। এখানে কি শুধু তুচ্ছ কথায় মেতে হিংসা দ্বেষের মধ্যে থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে দিন কাটাতে এসেছ? শুধু পড়া

মুখস্থ করে পরীক্ষা পাস করে ফুটবল খেলে এতবড়ো একটা জীবনকে নিঃশেষ করে দেবে ? কখনোই না— এ হতে পারে না। এই যুগের ধর্ম তোমাদের প্রাণকে স্পর্শ করুক। তপস্যার দ্বারা সুন্দর হয়ে তোমরা ফুটে ওঠো। আশ্রমবাস তোমাদের সার্থক হোক। তোমরা যদি মনুষ্যত্বের সাধনাকে প্রাণপণ করে ধরে না রাখ, শুধু খেলাধুলা পড়াশুনার ভিতর দিয়েই যদি জীবনকে চালিয়ে দাও, তবে যে তোমাদের অপরাধ হবে, তার আর মার্জনা নেই— কারণ, তোমরা আশ্রমবাসী।

আবার বলি, তোমরা কোন্ কালে এই পৃথিবীতে এসেছ, ভালো করে সেই কালের বিষয় ভেবে দেখো। বর্তমান কালের একটি সুবিধা এই, বিশ্বের মধ্যে যে চাঞ্চল্য উঠেছে একই সময়ে সকল দেশের লোক তা অনুভব করছে। পূর্বে একস্থানে তরঙ্গ উঠলে অন্য স্থানের লোকেরা তার কোনোই খবর পেত না। প্রত্যেক দেশটি স্বতন্ত্র ছিল। এক দেশের খবর অন্য দেশে গিয়ে পৌঁছোবার উপায় ছিল না। এখন আর সে দিন নেই। দেশের কোনো স্থানে ঘা লেগে তরঙ্গ উঠলে সেই তরঙ্গ শুধু দেশের মধ্যে না, সমস্ত পৃথিবীর ভিতর দিয়ে তীরের মতো ছুটে চলে। আমরা সকলে এক হয়ে দাঁড়াই। কত দিক হতে আমরা বল পাই, সত্যকে আঁকড়ে ধরবার যে মহা নির্যাতন তাকে অনায়াসেই সহ্য করতে পারি, নানা দিক হতে দৃষ্টান্ত ও সমবেদনা এসে জোর দেয়— এ কি কম কথা। নিজেকে অসহায় বলে মনে করি না। এই তো মহা সুযোগ। এমন দিনে আশ্রমবাসের সুযোগকে হারিয়ো না। জীবন যদি তোমাদের ব্যর্থ হয়, আশ্রমের কিছুই আসে যায় না— ক্ষতি তোমাদেরই। গাছ ভরে বউল আসে। সকল বউলেই যে ফল হয় এমন নয়। কত ঝরে পড়ে, শুকিয়ে যায়, তবু ফলের অভাব হয় না। ডাল ভরে ফল ফলে ওঠে। ফল হল না বলে গাছ দুঃখ করে না, দুঃখ ঝরাবউলের, তারা যে ফলে পরিণত হয়ে উঠতে পারল না।

এই আশ্রম যখন প্রস্তুত হতেছিল, বৃক্ষগুলি যখন ধীরে ধীরে আলোর দিকে মাথা তুলে ধরছিল, তখনো নূতন যুগের কোনোই সংবাদ এসে পৃথিবীতে পৌঁছোয় নি। অজ্ঞাতসারেই আশ্রমের ঋষি এই যুগের জন্য আশ্রমের রচনাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন ; তখনো বিশ্বমন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় নি, শঙ্খ ধ্বনিত হয়ে ওঠে নি। বিংশ শতাব্দীর জন্য বিশ্বদেবতা গোপনে গোপনে কী যে এক বিপুল আয়োজন করছিলেন, তার লেশমাত্রও আমরা জানতুম না। আজ সহসা মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হল— আমাদের কী পরম সৌভাগ্য ! আজ বিশ্বদেবতাকে দর্শন করতেই হবে, অন্ধ হয়ে ফিরে গেলে কিছুতেই চলবে না। আজ প্রকাণ্ড উৎসব ; এই উৎসব একদিনের নয়, দু দিনের নয়— শতাব্দীব্যাপী উৎসব। এই উৎসব কোনো বিশেষ স্থানের নয়, কোনো বিশেষ জাতির নয়। এই উৎসব সমগ্র মানবজাতির জগৎ-জোড়া উৎসব। এসো আমরা সকলে একত্র হই,বাহির হয়ে পড়ি। দেশে কোনো রাজার যখন আগমন হয়, তাঁকে দেখবার জন্য যখন পথে বাহির হয়ে আসি, তখন মলিন জীর্ণ বস্ত্রকে ত্যাগ করতে হয়, তখন নবীন বস্ত্রে দেহকে সজ্জিত করি। আজ, দেশের রাজা নন, সমগ্র জগতের রাজা এসে সম্মুখে দাঁড়িয়েছেন। নত করো উদ্ধত মস্তক। দূর করো সমস্ত বর্ষের সঞ্চিত আবর্জনা। মনকে শুভ্র করে তোলো। শান্ত হও, পবিত্র হও। তাঁর চরণে প্রণাম করে গৃহে ফেরো। তিনি তোমাদের শিরে আশীর্বাদ ঢেলে দিন— মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন।

১০

ভক্ত

কবির কাব্যের মধ্যে যেমন কবির পরিচয় থাকে তেমনি এই যে শান্তিনিকেতন আশ্রমটি তৈরি হয়ে উঠেছে, উঠেছে কেন, প্রতিদিনই তৈরি হয়ে উঠছে, এর মধ্যে একটি জীবনের পরিচয় আছে।

সেই জীবন কী চেয়েছিল এবং কী পেয়েছিল তা এই আশ্রমের মধ্যে যেমন করে লিখে গিয়েছে এমন আর কোথাও লিখে যেতে পারে নি। অনেক বড়ো বড়ো রাজা তাম্রশাসনে শিলালিপিতে তাঁদের জয়লব্ধ রাজ্যের কথা ক্ষোদিত করে রেখে যান। কিন্তু এমন লিপি কোথায় পাওয়া যায়। এমন অবাধ মাঠে, এমন উদার আকাশে, এমন জীবনময় অক্ষর— এমন ঋতুতে ঋতুতে পরিবর্তনশীল নব নব বর্ণের লিপি।

মহর্ষি তাঁর জীবনে অনেক সভা স্থাপন করেছেন, অনেক ব্রাহ্মসমাজগৃহের প্রতিষ্ঠা করেছেন, অনেক উপদেশ দিয়েছেন, অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সে-সমস্ত কাজের সঙ্গে তাঁর এই আশ্রমের একটি পার্থক্য আছে। যেমন গাছের ডাল থেকে খুঁটি হতে পারে, তাকে চিরে তার থেকে নানা প্রকার জিনিস তৈরি হতে পারে, কিন্তু সেই গাছে যে ফুলটি ফোটে, যে ফলটি ধরে সে এই সমস্ত জিনিস থেকেই পৃথক, তেমনি মহর্ষির জীবনের অন্যান্য সমস্ত কর্মের থেকে এই আশ্রমের একটি বিশিষ্টতা আছে। এর জন্যে তাঁকে চিন্তা করতে হয় নি, চেষ্টা করতে হয় নি, বাইরের লোকের সঙ্গে মিলতে হয় নি, চারি দিকের সঙ্গে কোনো ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করতে হয় নি। এ তাঁর জীবনের মধ্যে থেকে একটি মূর্তি ধরে আপনা-আপনি উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে। এইজন্যেই এর মধ্যে এমন একটি সৌন্দর্য, এমন একটি সম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। এইজন্যেই এর মধ্যে এমন একটি সুধাগন্ধ, এমন একটি মধুসঞ্চয়। এইজন্যেই এর মধ্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ যেমন সহজ যেমন গভীর এমন আর কোথাও নেই।

এই আশ্রমে আছে কী ? মাঠ এবং আকাশ এবং ছায়াগাছগুলি, চারি দিকে একটি বিপুল অবকাশ এবং নির্মলতা। এখানকার আকাশে মেঘের বিচিত্র লীলা এবং চন্দ্রসূর্য গ্রহতারার আবর্তন কিছুতে আচ্ছন্ন হয়ে নেই। এখানে প্রান্তরের মাঝখানে ছোটো বনটিতে ঋতুগুলি নিজের মেঘ-আলো বর্ণগন্ধ ফুলফল— নিজের সমস্ত বিচিত্র আয়োজন নিয়ে সম্পূর্ণ মূর্তিতে আবির্ভূত হয়। কোনো বাধার মধ্যে তাদের খর্ব হয়ে থাকতে হয় না। চার দিকে বিশ্বপ্রকৃতির এই অবাধ প্রকাশ এবং তাঁর মাঝখানটিতে 'শান্তংশিবমদ্বৈতম্'-এর দুই সন্ধ্যা নিত্য আরাধনা— আর কিছুই নয়। গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে, উপনিষদের মন্ত্র পঠিত হচ্ছে, স্তবগান ধ্বনিত হচ্ছে, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, সেই নিভৃতে, সেই নির্জনে, সেই বনের মর্মরে, সেই পাখির কূজনে, সেই উদার আলোকে, সেই নিবিড় ছায়ায়।

এই আশ্রমের মধ্যে থেকে দুটি সুর উঠেছে— একটি বিশ্বপ্রকৃতির সুর, একটি মানবাত্মার সুর। এই দুটি সুরধারার সংগমের মুখেই এই তীর্থটি স্থাপিত। এই দুটি সুরই অতি পুরাতন এবং চিরদিনই নূতন। এই আকাশ নিরন্তর যে নীরব মন্ত্র জপ করছে সে আমাদের পিতামহেরা আর্যাবর্তের সমতল প্রান্তরের উপরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কত শতাব্দী পূর্বেও চিত্তের গভীরতার মধ্যে গ্রহণ করেছেন। এই যে বনটির পল্লবঘন নিস্তব্ধতার মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে ছায়া এবং আলো দুই ভাই বোনে মিলে পৃথিবীর উপরে নামাবলীর উত্তরীয় রচনা করছে, সেই পবিত্র শিল্পচাতুরী আমাদের বনবাসী আদি পুরুষেরা সেদিনও দেখেছেন যেদিন তাঁরা সরস্বতীর কূলে প্রথম কুটির নির্মাণ করতে আরম্ভ করেছেন। এ সেই আকাশ, এ সেই ছায়ালোক, এ সেই অনির্বচনীয় একটি প্রকাশের ব্যাকুলতা, যার দ্বারা সমস্ত শূন্যকে ক্রন্দিত করে শুনেছিলেন বলেই ঋষি-পিতামহেরা এই অন্তরীক্ষকে ক্রন্দসী নাম দিয়েছিলেন।

আবার এখানে মানবের কণ্ঠ থেকে যে মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে সেও কত যুগের প্রাচীন বাণী। পিতা নোঽসি, পিতা নোবোধি, নমস্তেঽস্তু— এই কথাটি কত সরল, কত পরিপূর্ণ এবং কত পুরাতন। যে

ভাষায় এ বাণীটি প্রথম ব্যক্ত হয়েছিল সে ভাষা আজ প্রচলিত নেই, কিন্তু এই বাক্যটি আজও বিশ্বাসে ভক্তিতে নির্ভরে ব্যগ্রতায় এবং বিনতিতে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। এই কটি মাত্র কথায় মানবের চিরদিনের আশা এবং আশ্বাস এবং প্রার্থনা ঘনীভূত হয়ে রয়ে গেছে।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, এই অত্যন্ত ছোটো অথচ অত্যন্ত বড়ো কথাটি কোন্ সুদূর কালের! আধুনিক যুগের সভ্যতা তখন বর্বরতার গর্ভের মধ্যে গুপ্ত ছিল, সে ভূমিষ্ঠও হয় নি। কিন্তু অন্তরের উপলব্ধি আজও এই বাণীকে নিঃশেষ করতে পারে নি।

অসতোমা সদ্‌গময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়— এতবড়ো প্রার্থনা যেদিন নরকণ্ঠ হতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল সেদিনকার ছবি ইতিহাসের দূরবীক্ষণ-দ্বারাও আজ স্পষ্টরূপে গোচর হয়ে ওঠে না। অথচ এই পুরাতন প্রার্থনাটির মধ্যে মানবাত্মার সমস্ত প্রার্থনা পর্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।

এক দিকে এই পুরাতন আকাশ পুরাতন আলোক এবং তরুলতার মধ্যে পুরাতন জীবনবিকাশের নিত্যনূতনতা, আর-এক দিকে মানবচিত্তের মৃত্যুহীন পুরাতন বাণী— এই দুইকে এক করে নিয়ে এই শান্তিনিকেতনের আশ্রম।

বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবচিত্ত, এই দুইকে এক করে মিলিয়ে আছেন যিনি তাঁকে এই দুয়েরই মধ্যে একরূপে জানবার যে ধ্যানমন্ত্র, সেই মন্ত্রটিকেই ভারতবর্ষ তার সমস্ত পবিত্র শাস্ত্রের সার মন্ত্র বলে বরণ করেছে। সেই মন্ত্রটিই গায়ত্রী— ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি, ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।

এক দিকে ভূলোক অন্তরীক্ষ জ্যোতিষ্কলোক, আর-এক দিকে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, আমাদের চেতনা— এই দুইকেই যাঁর এক শাস্তি বিকীর্ণ করছে, এই দুইকেই যাঁর এক আনন্দ যুক্ত করছে— তাঁকে, তাঁর এই শক্তিকে, বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার বুদ্ধির মধ্যে ধ্যান করে উপলব্ধি করবার মন্ত্র হচ্ছে এই গায়ত্রী।

যাঁরা মহর্ষির আত্মজীবনী পড়েছেন তাঁরা সকলেই জানেন তিনি তাঁর দীক্ষার দিনে এই গায়ত্রীমন্ত্রকেই বিশেষ করে তাঁর উপাসনার মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই দীক্ষার মন্ত্রটিই শান্তিনিকেতনের আশ্রমকে আকার দান করছে— এই নিভৃতে মানুষের চিত্তকে প্রকৃতির প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত করে, বরেণ্যং ভর্গঃ সেই বরণীয় তেজকে ধ্যানগম্য করে তুলছে।

এই গায়ত্রীমন্ত্রটি আমাদের দেশের অনেকেরই জপের মন্ত্র— কিন্তু এই মন্ত্রটি মহর্ষির ছিল জীবনের মন্ত্র। এই মন্ত্রটিকে তিনি তাঁর জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত জীবনের ভিতর থেকে প্রকাশ করেছিলেন।

এই মন্ত্রটিকে তিনি যে গ্রহণ করেছিলেন এবং রক্ষা করেছিলেন, লোকাচারের অনুসরণ তার কারণ নয়। হাঁস যেমন স্বভাবতই জলকে আশ্রয় করে তিনি তেমনি স্বভাবতই এই মন্ত্রটিকে অবলম্বন করেছিলেন।

শিশু যেমন মাতৃস্তন্যের জন্য কেঁদে ওঠে, তখন তাকে আর কিছু দিয়েই থামিয়ে রাখা যায় না, তেমনি মহর্ষির হৃদয় একদিন তাঁর যৌবনারম্ভে কী অসহ্য ব্যাকুলতায় ক্রন্দন করে উঠেছিল সে কথা আপনারা সকলেই জানেন।

সে ক্রন্দন কিসের? চার দিকে তিনি কোন্ জিনিসটি কোনোমতেই খুঁজে পাচ্ছিলেন না? যখন আকাশের আলো তাঁর চোখে কালো হয়ে উঠেছিল, যখন তাঁর পিতৃগৃহের অতুল ঐশ্বর্যের আয়োজন এবং মানসম্ভ্রমের গৌরব তাঁর মনকে কোনোমতেই শান্তি দিচ্ছিল না, তখন তাঁর যে কী প্রয়োজন, কী হলে তাঁর হৃদয়ের ক্ষুধা মেটে, তা তিনি নিজেই বুঝতে পারছিলেন না।

ভোগবিলাসে তাঁর অরুচি জন্মে গিয়েছিল এবং তাঁর ভক্তিবৃত্তি নিজের চরিতার্থতা অন্বেষণ করছিল, কেবল এই কথাটুকুই সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ, ভক্তিবৃত্তিকে ভুলিয়ে রাখবার আয়োজন কি তাঁর ঘরের মধ্যেই ছিল না? যে দিদিমার সঙ্গে তিনি ছায়ার মতো সর্বদা ঘুরে বেড়াতেন, তিনি জপতপ দানধ্যান পূজা-অর্চনা নিয়েই তো দিন কাটিয়েছেন, তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকলাপেই শিশুকাল থেকেই মহর্ষি তাঁর সঙ্গের

সঙ্গী ছিলেন। যখন বৈরাগ্য উপস্থিত হল, যখন ধর্মের জন্য তাঁর ব্যাকুলতা জন্মাল, তখন এই অভ্যস্ত পথেই তাঁর সমস্ত মন কেন ছুটে গেল না ? ভক্তিবৃত্তিকে ব্যাপৃত করে রাখবার উপকরণ তো তাঁর খুব নিকটেই ছিল।

তাঁর ভক্তিকে যে এই দিকে তিনি কখনো নিয়োজিত করেন নি তা নয়। তিনি যখন বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে যেতেন পথিমধ্যে দেবীমন্দিরে ভক্তিভরে প্রণাম করতে ভুলতেন না ; তিনি একবার এত সমারোহে সরস্বতীর পূজা করেছিলেন যে সেবার পূজার দিনে শহরে গাঁদাফুল দুর্লভ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যেদিন শ্মশানঘাটে পূর্ণিমার রাতে তাঁর চিত্ত জাগ্রত হয়ে উঠল সেদিন এই-সকল চিরাভ্যস্ত পথকে তিনি পথ বলেই লক্ষ্য করলেন না। তাঁর তৃষ্ণার জল যে এ দিকে নেই তা বুঝতে তাঁকে চিন্তামাত্র করতে হয় নি।

তাই বলছিলুম, ভক্তিকে বাইরের দিকে নিয়োজিত করে তিনি নিজেকে ফাঁকি দিতে পারেন নি। অন্তঃপুরে তাঁর ডাক পড়েছিল। তিনি জগতের মধ্যেই জগদীশ্বরকে, অন্তরাত্মার মধ্যেই পরমাত্মাকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন। তাঁকে আর কিছুতে ভুলিয়ে রাখে কার সাধ্য ! যারা নানা ক্রিয়াকর্মে আপনাকে ব্যাপৃত রাখতে চায় তাদের নানা উপায় আছে, যারা ভক্তির মধুর রসকে আস্বাদন করতে চায় তাদেরও অনেক উপলক্ষ মেলে। কিন্তু যারা একেবারে তাঁকেই চেয়ে বসে, তাদের তো ঐ একটি বৈ আর দ্বিতীয় কোনো পন্থা নেই। তারা কি আর বাইরে ঘুরে বেড়াতে পারে ? তাদের সামনে কোনো রঙিন জিনিস সাজিয়ে তাদের কি কোনোমতেই ভুলিয়ে রাখা যায় ? নিখিলের মধ্যে এবং আত্মার মধ্যে তাদের প্রবেশ করতেই হবে।

কিন্তু এই অধ্যাত্মলোকের এই বিশ্বলোকের মন্দিরের পথ তাঁর চার দিকে যে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অন্তরের ধনকে দূরে সন্ধান করবার প্রণালীই যে সমাজে চারি দিকে প্রচলিত ছিল। এই নির্বাসনের মধ্যে থেকেই তো তাঁর সমস্ত প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। তাঁর আত্মা যে আশ্রয় চাচ্ছিল, সে আশ্রয় বাইরের খণ্ডতর রাজ্যে সে কোথায় খুঁজে পাবে ?

আত্মার মধ্যেই পরমাত্মাকে, জগতের মধ্যেই জগদীশ্বরকে দেখতে হবে, এই কথাটি এতই অত্যন্ত সহজ যে হঠাৎ মনে হয় এ নিয়ে এত খোঁজাখুঁজি কেন, এত কান্নাকাটি কিসের জন্যে ? কিন্তু বরাবর মানুষের ইতিহাসে এই ঘটনাটি ঘটে এসেছে। মানুষের প্রবৃত্তি কিনা বাইরের দিকে ছোটবার জন্যে সহজেই প্রবণ, এই কারণে সেই ঝোঁকের মাথায় সে মূল কেন্দ্রের আকর্ষণ এড়িয়ে শেষে কোথায় গিয়ে পৌঁছোয় তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। সে বাহ্যিকতাকেই দিনে দিনে এমনি বৃহৎ ও জটিল করে দাঁড় করায় যে অবশেষে একদিন আসে, যখন যা তার আন্তরিক, যা তার স্বাভাবিক, তাকেই খুঁজে বের করা তার পক্ষে সকলের চেয়ে কঠিন হয়ে ওঠে। এত কঠিন হয় যে তাকে সে আর খোঁজেই না, তার কথা সে ভুলেই যায়, তাকে আর সত্য বলে উপলব্ধিই করে না ; বাহ্যিকতাকেই একমাত্র জিনিস বলে জানে, আর কিছুকে বিশ্বাসই করতে পারে না।

মেলার দিনে ছোটো ছেলে মার হাত ধরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তার মন কিনা চার দিকে, এইজন্যে মুঠো কখন সে ছেড়ে দেয় ; তার পর থেকেই ভিড়ের মধ্যে, গোলমালের মধ্যে, কেবলই সে বাইরে থেকে বাইরে, দূর থেকে দূরে চলে যেতে থাকে। ক্রমে মার কথা তার আর মনেই থাকে না, বাইরের যে-সমস্ত সামগ্রী সে দেখে সেইগুলিই তার সমস্ত হৃদয়কে অধিকার করে বড়ো হয়ে ওঠে। যে মা তার সব চেয়ে আপন তিনিই তার কাছে সব চেয়ে ছায়াময়, সব চেয়ে দূর হয়ে ওঠেন। শেষকালে এমন হয় যে অন্য সমস্ত জিনিসের মধ্যেই সে আহত প্রতিহত হয়ে বেড়ায়, কেবল নিজের মাকে খুঁজে পাওয়াই সন্তানের পক্ষে সব চেয়ে কঠিন হয়ে ওঠে। আমাদের সেই দশা ঘটে।

এমন সময়ে এক-একজন মহাপুরুষ জন্মান যাঁরা সেই অনেক-দিনকার-হারিয়ে-যাওয়া স্বাভাবিকের জন্যে আপনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। যার জন্যে চার দিকের কারও কিছুমাত্র দরদ নেই তারই জন্যে তাঁদের কান্না কোনোমতেই থামতে চায় না। তাঁরা এক মুহূর্তে বুঝতে পারেন আসল জিনিসটি আছে অথচ কোথাও তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সেইটিই একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিস, অথচ কেউ

তার কোনো খোঁজ করছে না। জিজ্ঞাসা করলে, হয় হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে, নয় ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে আঘাত করতে আসছে।

এমনি করে যেটি সহজ, যেটি স্বাভাবিক, যেটি সত্য, যেটি না হলে নয়, পৃথিবীতে এক-একজন লোক আসেন সেটিকেই খুঁজে বের করতে। ঈশ্বরের এই এক লীলা— যেটি সব চেয়ে সহজ তাকে তিনি শক্ত করে তুলতে দেন— যা নিতান্তই কাছের তাকে তিনি হারিয়ে ফেলতে দেন— পাছে সহজ বলেই তাকে না দেখতে পাওয়া যায়, পাছে খুঁজে বের করতে না হলে তার সমস্ত তাৎপর্যটি আমরা না পাই। যিনি আমাদের অন্তরতর তাঁর মতো এত সহজ আর কী আছে। তিনি আমাদের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের চেয়ে সহজ, তবু তাঁকে আমরা হারাই, সে কেবল তাঁকে আমরা খুঁজে বের করব বলেই। হঠাৎ যখন তিনি ধরা পড়েন, হঠাৎ যখন কেউ হাততালি দিয়ে বলে ওঠে 'এই যে এইখানেই', আমরা ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করি— কই ? কোথায় ? এই যে হৃদয়ের হৃদয়ে, এই যে আত্মার আত্মায়। যেখানে তাঁকে পাওয়ার বড়োই দরকার, সেইখানেই তিনি বরাবর বসে আছেন, কেবল আমরাই দূরে দূরে ছুটোছুটি করে মরছিলুম, এই সহজ কথাটি বোঝার জন্যেই— এই যিনি অত্যন্তই কাছে আছেন তাঁকেই খুঁজে পাবার জন্যে এক-একজন লোকের এত কান্নার দরকার। এই কান্না মিটিয়ে দেবার জন্যে যখনই তিনি সাড়া দেন তখনই ধরা পড়ে যান। তখনই সহজ আবার সহজ হয়ে আসে।

নিজের রচিত জটিল জাল ছেদন করে চিরন্তন আকাশ চিরন্তন আলোকের অধিকার আবার ফিরে পাবার জন্য মানুষকে চিরকালই এইরকম মহাপুরুষদের মুখ তাকাতে হয়েছে। কেউ বা ধর্মের ক্ষেত্রে, কেউ বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে, কেউ বা কর্মের ক্ষেত্রে এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন। যা চিরদিনের জিনিস তাকে তাঁরা ক্ষণিকের আবরণ থেকে মুক্ত করবার জন্যে পৃথিবীতে আসেন। বিশেষ স্থানে গিয়ে বিশেষ মন্ত্র পড়ে বিশেষ অনুষ্ঠান করে মুক্তি লাভ করা যায় এই বিশ্বাসের অরণ্যে যখন মানুষ পথ হারিয়েছিল, তখন বুদ্ধদেব এই অত্যন্ত সহজ কথাটি আবিষ্কার ও প্রচার করবার জন্যে এসেছিলেন যে, স্বার্থত্যাগ করে, সর্বভূতে দয়া বিস্তার করে, অন্তর থেকে বাসনাকে ক্ষয় করে ফেললে তবেই মুক্তি হয়। কোনো স্থানে গেলে বা জলে স্নান করলে বা অগ্নিতে আহুতি দিলে বা মন্ত্র উচ্চারণ করলে হয় না। এই কথাটি শুনতে নিতান্তই সরল, কিন্তু এই কথাটির জন্যে একটি রাজপুত্রকে রাজ্যত্যাগ করে বনে বনে পথে পথে ফিরতে হয়েছে— মানুষের হাতে এটি এতই কঠিন হয়ে উঠেছিল। য়িহুদিদের মধ্যে ফ্যারিসি সম্প্রদায়ের অনুশাসনে যখন বাহ্য নিয়মপালনই ধর্ম বলে গণ্য হয়ে উঠেছিল, যখন তারা নিজের গণ্ডির বাইরে অন্য জাতি অন্য ধর্মপন্থীদের ঘৃণা করে তাদের সঙ্গে একত্রে আহার বিহার বন্ধ করাকেই ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় বলে স্থির করেছিল, যখন য়িহুদির ধর্মানুষ্ঠান য়িহুদি জাতিরই নিজস্ব স্বতন্ত্র সামগ্রী হয়ে উঠেছিল, তখন যিশু এই অত্যন্ত সহজ কথাটি বলবার জন্যেই এসেছিলেন যে, ধর্ম অন্তরের সামগ্রী, ভগবান অন্তরের ধন, পাপপুণ্য বাহিরের কৃত্রিম বিধি-নিষেধের অনুগত নয়— সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান, মানুষের প্রতি ঘৃণাহীন প্রেম ও পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাসপূর্ণ ভক্তির দ্বারাই ধর্মসাধনা হয়— বাহ্যিকতা মৃত্যুর নিদান, অন্তরের সার পদার্থেই প্রাণ পাওয়া যায়। কথাটি এতই অত্যন্ত সরল যে শোনবামাত্রই সকলকেই বলতে হয় যে, হাঁ। কিন্তু, তবুও এই কথাটিকেই সকল দেশেই মানুষ এতই কঠিন করে তুলেছে যে, এর জন্যে যিশুকে মরুপ্রান্তরে গিয়ে তপস্যা করতে এবং ক্রুসের উপরে অবমানিত মৃত্যুদণ্ডকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

মহম্মদকেও সেই কাজ করতে হয়েছিল। মানুষের ধর্মবুদ্ধি খণ্ড খণ্ড হয়ে বাহিরে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাকে তিনি অন্তরের দিকে, অখণ্ডের দিকে, অনন্তের দিকে নিয়ে গিয়েছেন। সহজে পারেন নি, এর জন্যে সমস্ত জীবন তাঁকে মৃত্যুসংকুল দুর্গম পথ মাড়িয়ে চলতে হয়েছে, চারি দিকের শত্রুতা ঝড়ের সমুদ্রের মতো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে তাঁকে নিরন্তর আক্রমণ করেছে। মানুষের পক্ষে যা যথার্থ স্বাভাবিক, যা সরল সত্য, তাকেই স্পষ্ট অনুভব করতে ও উদ্ধার করতে, মানুষের মধ্যে যাঁরা সর্বোচ্চশক্তিসম্পন্ন তাঁদেরই প্রয়োজন হয়।

মানুষের ধর্মরাজ্যে যে তিনজন মহাপুরুষ সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিরোহণ করেছেন এবং ধর্মকে দেশগত

জাতিগত লোকাচারগত সংকীর্ণ সীমা থেকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে সূর্যের আলোকের মতো, মেঘের বারিবর্ষণের মতো, সর্বদেশ ও সর্বকালের মানবের জন্য বাধাহীন আকাশে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, তাঁদের নাম করেছি। ধর্মের প্রকৃতি যে বিশ্বজনীন, তাকে যে কোনো বিশেষ দেশের প্রচলিত মূর্তি বা আচার বা শাস্ত্র কৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না, এই কথাটি তাঁরা সর্বমানবের ইতিহাসের মধ্যে নিজের জীবন দিয়ে লিখে দিয়ে গেছেন। দেশে দেশে কালে কালে সত্যের দুর্গম পথে কারা যে ঈশ্বরের আদেশে আমাদের পথ দেখাবার জন্যে নিজের জীবন-প্রদীপকে জ্বালিয়ে তুলেছেন সে আজ আমরা আর ভুল করতে পারব না, তাঁদের আদর্শ থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারব। সে প্রদীপটি কারও বা ছোটো হতে পারে কারও বা বড়ো হতে পারে, সেই প্রদীপের আলো কারও বা দিগ্‌দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ে, কারও বা নিকটের পথিকদেরই পদক্ষেপের সহায়তা করে, কিন্তু সেই শিখাটিকে আর চেনা শক্ত নয়।

তাই বলছিলুম মহর্ষি যে অত্যন্ত একটি সহজকে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তাঁর চার দিকে তার কোনো সহায়তা ছিল না। সকলেই তাকে হারিয়ে বসেছিল, সে পথের চিহ্ন কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। সেইজন্যে যেখানে সকলেই নিশ্চিন্তমনে বিচরণ করছিল সেখানে তিনি যেন মরুভূমির পথিকের মতো ব্যাকুল হয়ে লক্ষ্য স্থির করবার জন্যে চারি দিকে তাকাচ্ছিলেন, মধ্যাহ্নের আলোকও তাঁর চক্ষে কালিমাময় হয়ে উঠেছিল এবং ঐশ্বর্যের ভোগায়োজন তাঁকে মৃগতৃষ্ণিকার মতো পরিহাস করছিল। তাঁর হৃদয় এই অত্যন্ত সহজ প্রার্থনাটি নিয়ে দিকে দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল যে, পরমাত্মাকে আমি আত্মার মধ্যেই পাব, জগদীশ্বরকে আমি জগতের মধ্যেই দেখব— আর কোথাও নয়, দূরে নয়, বাইরে নয়, নিজের কল্পনার মধ্যে নয়, অন্য দশজনের চিরাভ্যস্ত জড়তার মধ্যে নয়। এই সহজ প্রার্থনার পথটিই চারি দিকে এত বাধাগ্রস্ত এত কঠিন হয়ে উঠেছিল বলেই তাঁকে এত খোঁজ খুঁজতে হয়েছে, এত কান্না কাঁদতে হয়েছে।

এ কান্না যে সমস্ত দেশের কান্না। দেশ আপনার চিরদিনের যে জিনিসটি মনের ভুলে হারিয়ে বসেছিল, তার জন্যে কোনোখানেই বেদনা বোধ না হলে সে দেশ বাঁচবে কী করে! চার দিকেই যখন অসাড়তা তখন এমন একটি হৃদয়ের আবশ্যক যার সহজ-চেতনাকে সমাজের কোনো সংক্রামক জড়তা আচ্ছন্ন করতে পারে না। এই চেতনাকে অতি কঠিন বেদনা ভোগ করতে হয়, সমস্ত দেশের হয়ে বেদনা। যেখানে সকলে সংজ্ঞাহীন হয়ে আছে সেখানে একলা তাকে হাহাকার বহন করে আনতে হয়, সমস্ত দেশের স্বাস্থ্যকে ফিরে পাবার জন্যে একলা তাকে কান্না জাগিয়ে তুলতে হয়; বোধহীনতার জন্যেই চারি দিকের জনসমাজ যে-সকল কৃত্রিম জিনিস নিয়ে অনায়াসে ভুলে থাকে, অসহ্য ক্ষুধাতুরতা দিয়ে তাকে জানাতে হয় প্রাণের খাদ্য তার মধ্যে নেই। যে দেশ কাঁদতে ভুলে গেছে, খোঁজবার কথা যার মনেও নেই, তার হয়ে একলা কাঁদা, একলা খোঁজা, এই হচ্ছে মহত্ত্বের একটি অধিকার। অসাড় দেশকে জাগাবার জন্যে যখন বিধাতার আঘাত এসে পড়তে থাকে তখন যেখানে চৈতন্য আছে সেইখানেই সমস্ত আঘাত বাজতে থাকে, সেইখানকার বেদনা দিয়েই দেশের উদ্‌বোধন আরম্ভ হয়।

আমরা যাঁর কথা বলছি তাঁর সেই সহজ চেতনা কিছুতেই লুপ্ত হয় নি, সেই তাঁর চেতনা চেতনাকেই খুঁজছিল, স্বভাবতই কেবল সেই দিকেই সে হাত বাড়াচ্ছিল, চার দিকে যে-সকল স্থূল জড়ত্বের উপকরণ ছিল তাকে সে প্রাণপণ বলে ঠেলে ফেলে দিচ্ছিল— চৈতন্য না হলে.চৈতন্য আশ্রয় পায় না যে।

এমন সময় এই অত্যন্ত ব্যাকুলতার মধ্যে তাঁর সামনে উপনিষদের একখানি ছিন্ন পত্র উড়ে এসে পড়ল। মরুভূমির মধ্যে পথিক যখন হতাশ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন অকস্মাৎ জলচর পাখিকে আকাশে উড়ে যেতে দেখে সে যেমন জানতে পারে তার তৃষ্ণার জল যেখানে সেখানকার পথ কোন্‌দিকে, এই ছিন্ন পত্রটিও তেমনি তাঁকে একটি পথ দেখিয়ে দিলে। সেই পথটি সকলের চেয়ে প্রশস্ত এবং সকলের চেয়ে সরল— যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, জগতে যেখানে যা-কিছু আছে সমস্তর

ভিতর দিয়েই সে পথ চলে গিয়েছে এবং সমস্তর ভিতর দিয়েই সেই পরমচৈতন্যস্বরূপের কাছে গিয়ে পৌঁচেছে যিনি সমস্তকেই আচ্ছন্ন করে রয়েছেন।

তার পর থেকে তিনি নদী পর্বত সমুদ্র প্রান্তরে যেখানেই ঘুরে বেড়িয়েছেন। কোথাও আর তাঁর প্রিয়তমকে হারান নি— কেননা তিনি যে সর্বত্রই আর তিনি যে আত্মার মাঝখানেই। যিনি আত্মার ভিতরেই তাঁকেই আবার দেশে দেশে দিকে দিকে সর্বত্রই ব্যাপক ভাবে দেখতে পাবার কত সুখ, যিনি বিশাল বিশ্বের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে রূপ রস গীত গন্ধের নব নব রহস্যকে নিত্য নিত্য জাগিয়ে তুলে সমস্তকে আচ্ছন্ন করে রয়েছেন তাঁকেই আত্মার অন্তরতম নিভৃতে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করবার কত আনন্দ!

এই উপলব্ধি করার মন্ত্রই হচ্ছে গায়ত্রী। অন্তরকে এবং বাহিরকে, বিশ্বকে এবং আত্মাকে একের মধ্যে যোগযুক্ত করে জানাই হচ্ছে এই মন্ত্রের সাধনা এবং সাধনাই ছিল মহর্ষির জীবনের সাধনা।

জীবনের এই সাধনাটিকে তিনি তাঁর উপদেশ ও বক্তৃতার মধ্যে ভাষার দ্বারা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সকলের চেয়ে সম্পূর্ণ সৌন্দর্যে প্রকাশ পেয়েছে শান্তিনিকেতন আশ্রমটির মধ্যে। কারণ, এই প্রকাশের ভার তিনি একলা নেন নি। এই প্রকাশের কাজে এক দিকে তাঁর ভগবৎ-পূজায়-উৎসর্গ-করা সমস্ত জীবনটি রয়ে গেছে, আর-এক দিকে আছে সেই প্রান্তর, সেই আকাশ, সেই তরুশ্রেণী— এই দুই এখানে মিলিত হয়েছে, ভূর্ভুবঃ স্বঃ এবং ধিয়ঃ। এমনি করে গায়ত্রী মন্ত্র যেখানেই প্রত্যক্ষরূপ ধারণ করেছে, যেখানেই সাধকের মঙ্গলপূর্ণ চিত্তের সঙ্গে প্রকৃতির শান্তিপূর্ণ সৌন্দর্য মিলিত হয়ে গেছে, সেইখানেই পুণ্যতীর্থ।

আমরা যারা এই আশ্রমে বাস করছি, হে শান্তিনিকেতনের অধিদেবতা, আজ উৎসবের শুভদিনে তোমার কাছে আমাদের এই প্রার্থনা, তুমি আমাদের সেই চেতনাটি সর্বদা জাগিয়ে রেখে দাও যাতে আমরা যথার্থ তীর্থবাসী হয়ে উঠতে পারি। গ্রন্থের মধ্যে কীট যেমন তীক্ষ্ণ ক্ষুধার দংশনে গ্রন্থকে কেবল নষ্টই করে, তার সত্যকে লেশমাত্রও লাভ করে না, আমরাও যেন তেমনি করে নিজেদের অসংযত প্রবৃত্তি-সকল নিয়ে এই আশ্রমের মধ্যে কেবল ছিদ্র বিস্তার করতে না থাকি, আমরা এর ভিতরকার আনন্দময় সত্যটিকে যেন প্রতিদিন জীবনের মধ্যে গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত হতে পারি। আমরা যে সুযোগ যে অধিকার পেয়েছি অচেতন হয়ে কেবলই যেন তাকে নষ্ট করতে না থাকি। এখানে যে সাধকের চিত্তটি রয়েছে সে যেন আমাদের চিত্তকে উদ্‌বোধিত করে তোলে, যে মন্ত্রটি রয়েছে সে যেন আমাদের মননের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে ওঠে; আমরাও যেন আমাদের জীবনটিকে এই আশ্রমের সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে যেতে পারি যে, সেটি এখানকার পক্ষে চিরদিনের দানস্বরূপ হয়। হে আশ্রমদেব, দেওয়া এবং পাওয়া যে একই কথা। আমরা যদি নিজেকে না দিতে পারি তা হলে আমরা পাবও না, আমরা যদি এখান থেকে কিছু পেয়ে যাই এমন ভাগ্য আমাদের হয় তা হলে আমরা দিয়েও যাব। তা হলে আমাদের জীবনটি আশ্রমের তরুপল্লবের মর্মরধ্বনির মধ্যে চিরকাল মর্মরিত হতে থাকবে। এখানকার আকাশের নির্মল নীলিমার মধ্যে আমরা মিশব, এখানকার প্রান্তরের উদার বিস্তারের মধ্যে আমরা বিস্তীর্ণ হব, আমাদের আনন্দ এখানকার পথিকদের স্পর্শ করবে, এখানকার অতিথিদের অভ্যর্থনা করবে। এখানে যে সৃষ্টিকার্যটি নিঃশব্দে চিরদিনই চলছে তারই মধ্যে আমরাও চিরকালের মতো ধরা পড়ে যাব। বৎসরের পর বৎসর যেমন আসবে, ঋতুর পর ঋতু যেমন ফিরবে, তেমনি এখানকার শালবনে ফুল ফোটার মধ্যে, পূর্বদিগন্তে মেঘ ওঠার মধ্যে, এই কথাটি চিরদিন ফিরে ফিরে আসবে, ঘুরে ঘুরে বেড়াবে যে— হে আনন্দময়, তোমার মধ্যে আনন্দ পেয়েছি; হে সুন্দর, তোমার পানে চেয়ে মুগ্ধ হয়েছি; হে পবিত্র, তোমার শুভ্র হস্ত আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে; হে অন্তরের ধন, তোমাকে বাহিরে পেয়েছি; হে বাহিরের ঈশ্বর, তোমাকে অন্তরের মধ্যে লাভ করেছি।

হে ভক্তের হৃদয়ানন্দ, আমরা যে তোমাকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভক্তি করতে পারি নে তার একটিমাত্র কারণ এই, আমরা তোমার মতো হতে পারি নি। তুমি আত্মদা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তুমি আপনাকে অজস্র দান করছ। আমরা স্বার্থ নিয়েই আছি, আমাদের ভিক্ষুকতা কিছুতেই ঘোচে না। আমাদের কর্ম,

আমাদের ত্যাগ, স্বতঃউচ্ছ্বসিত আনন্দের মধ্য থেকে উদ্‌বেল হয়ে উঠছে না। সেইজন্যে তোমার সঙ্গে আমাদের মিল হচ্ছে না। আনন্দের টানে আপনি আমরা আনন্দস্বরূপের মধ্যে গিয়ে পৌঁছোতে পারছি নে, আমাদের ভক্তি তাই সহজ ভক্তি হয়ে উঠছে না। তোমার যাঁরা ভক্ত তাঁরাই আমাদের এই অনৈক্যের সেতুস্বরূপ হয়ে তোমার সঙ্গে আমাদের মিলিয়ে রেখে দেন, আমরা তোমার ভক্তদের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখতে পাই, তোমারই স্বরূপকে মানুষের ভিতর দিয়ে ঘরের মধ্যে লাভ করি। দেখি যে তাঁরা কিছু চান না, কেবল আপনাকে দান করেন ; সে দান মঙ্গলের উৎস থেকে আপনিই উৎসারিত হয়, আনন্দের নির্ঝর থেকে আপনিই ঝরে পড়ে, তাঁদের জীবন চার দিকে মঙ্গললোক সৃষ্টি করতে থাকে— সেই সৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি। এমনি করে তাঁরা তোমার সঙ্গে মিলেছেন। তাঁদের জীবনে ক্লান্তি নেই, ভয় নেই, ক্ষতি নেই, কেবলই প্রাচুর্য, কেবলই পূর্ণতা। দুঃখ যখন তাঁদের আঘাত করে তখনো তাঁরা দান করেন, সুখ যখন তাঁদের ঘিরে থাকে তখনো তাঁরা বর্ষণ করেন। তাঁদের মধ্যে মঙ্গলের এই রূপ যখন দেখতে পাই, আনন্দের এই প্রকাশ যখন উপলব্ধি করি, তখন, হে পরম মঙ্গল, পরমানন্দ, তোমাকে আমরা কাছে পাই ; তখন তোমাকে নিঃসংশয় সত্যরূপে বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে তেমন অসাধ্য হয় না। ভক্তের হৃদয়ের ভিতর দিয়ে তোমার যে মধুময় প্রকাশ, ভক্তের জীবনের উপর দিয়ে তোমার প্রসন্ন মুখের যে প্রতিফলিত স্নিগ্ধ রশ্মি, সেও তোমার জগদ্‌ব্যাপী বিচিত্র আত্মদানের একটি বিশেষ ধারা ; ফুলের মধ্যে যেমন তোমার গন্ধ, ফলের মধ্যে যেমন তোমার রস, ভক্তের ভিতর দিয়েও তোমার আত্মদানকে আমরা যেন তেমনি আনন্দের সঙ্গে ভোগ করতে পারি। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এই ভক্তিসুধা-সরস তোমার অতিমধুর লাবণ্য যেন আমরা না দেখে চলে না যাই। তোমার এই সৌন্দর্য তোমার কত ভক্তের জীবন থেকে কত রঙ নিয়ে যে মানবলোকের আনন্দকানন সাজিয়ে তুলেছে, তা যে দেখেছে সেই মুগ্ধ হয়েছে। অহংকারের অন্ধতা থেকে যেন এই দেবদুর্লভ দৃশ্য হতে বঞ্চিত না হই। যেখানে তোমার একজন ভক্তের হৃদয়ের প্রেমস্রোতে তোমার আনন্দধারা একদিন মিলেছিল, আমরা সেই পুণ্যসংগমের তীরে নিভৃত বনচ্ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছি ; মিলন-সংগীত এখনো সেখানকার সূর্যোদয়ে সূর্যাস্তে, সেখানকার নিশীথরাত্রের নিস্তব্ধতায় বেজে উঠছে। থাকতে-থাকতে শুনতে-শুনতে সেই সংগীতে আমরাও যেন কিছু সুর মিলিয়ে যেতে পারি এই আশীর্বাদ করো। কেননা জগতে যত সুর বাজে তার মধ্যে এই সুরই সব চেয়ে গভীর— সব চেয়ে মিষ্ট। মিলনের আনন্দে মানুষের আত্মার এই গান, ভক্তিবীণায় এই তোমার অঙ্গুলির স্পর্শ, এই সোনার তারের মূর্ছনা।

৭ই পৌষ, রাত্রি ১৩১৬

চিরনবীনতা

প্রভাত এসে প্রতিদিনই একটি রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করে দেয় ; প্রতিদিনই সে একটি চিরন্তন কথা বলে, অথচ প্রতিদিন মনে হয় সে কথাটি নূতন। আমরা চিন্তা করতে করতে, কাজ করতে করতে, লড়াই করতে করতে প্রতিদিনই মনে করি, বহুকালের এই জগৎটা ক্লান্তিতে অবসন্ন, ভাবনায় ভারাক্রান্ত এবং ধূলায় মলিন হয়ে পড়েছে। এমন সময় প্রত্যুষে প্রভাত এসে পূর্ব আকাশের প্রান্তে দাঁড়িয়ে স্মিতহাস্যে জাদুকরের মতো জগতের উপর থেকে অন্ধকারের ঢাকাটি আস্তে আস্তে খুলে দেয়। দেখি সমস্তই নবীন, যেন সৃজনকর্তা এই মুহূর্তেই জগৎকে প্রথম সৃষ্টি করলেন। এই যে প্রথমকালের এবং চিরকালের নবীনতা এ আর কিছুতেই শেষ হচ্ছে না, প্রভাত এই কথাই বলছে।

আজ এই যে দিনটি দেখা দিল এ কি আজকের ? এ যে কোন্ যুগারম্ভে জ্যোতিবাষ্পের আবরণ ছিন্ন করে যাত্রা আরম্ভ করেছিল সে কি কেউ গণনায় আনতে পারে ? এ দিনের নিমেষহীন দৃষ্টির

সামনে তরল পৃথিবী কঠিন হয়ে উঠেছে, কঠিন পৃথিবীতে জীবনের নাট্য আরম্ভ হয়েছে এবং সেই নাট্যে অঙ্কের পর অঙ্কে কত নূতন নূতন প্রাণী তাদের জীবলীলা আরম্ভ করে সমাধা করে দিয়েছে ; এই দিন মানুষের ইতিহাসের কত বিস্মৃত শতাব্দীকে আলোক দান করেছে, এবং কোথাও বা সিন্ধুতীরে কোথাও মরুপ্রান্তরে কোথাও অরণ্যচ্ছায়ায় কত বড়ো বড়ো সভ্যতার জন্ম এবং অভ্যুদয় এবং বিনাশ দেখে এসেছে, এ সেই অতিপুরাতন দিন যে এই পৃথিবীর প্রথম জন্মমুহূর্তেই তাকে নিজের শুভ্র আঁচল পেতে কোলে তুলে নিয়েছিল— সৌরজগতের সকল গণনাকেই যে একেবারে প্রথম সংখ্যা থেকেই আরম্ভ করে দিয়েছিল। সেই অতি প্রাচীন দিনই হাস্যমুখে আজ প্রভাতে আমাদের চোখের সামনে বীণাবাদক প্রিয়দর্শন বালকটির মতো এসে দাঁড়িয়েছে। এ একেবারে নবীনতার মূর্তি, সদ্যোজাত শিশুর মতোই নবীন। এ যাকে স্পর্শ করে সেই তখনই নবীন হয়ে ওঠে, এ আপনার গলার হারটিতে চিরযৌবনের স্পর্শমণি ঝুলিয়ে এসেছে।

এর মানে কী ? এর মানে হচ্ছে এই, চিরনবীনতাই জগতের অন্তরের ধন, জগতের নিত্য সামগ্রী। পুরাতনতা জীর্ণতা তার উপর দিয়ে ছায়ার মতো আসছে যাচ্ছে, দেখা দিতে না দিতেই মিলিয়ে যাচ্ছে, একে কোনোমতেই আচ্ছন্ন করতে পারছে না। জরা মিথ্যা, মৃত্যু মিথ্যা, ক্ষয় মিথ্যা। তারা মরীচিকার মতো, জ্যোতির্ময় আকাশের উপরে তারা ছায়ার নৃত্য নাচে এবং নাচতে নাচতে তারা দিক্‌প্রান্তরের অন্তরালে বিলীন হয়ে যায়। সত্য কেবল নিঃশেষহীন নবীনতা, কোনো ক্ষতি তাকে স্পর্শ করে না, কোনো আঘাত তাতে চিহ্ন আঁকে না, প্রতিদিন প্রভাতে এই কথাটি প্রকাশ পায়।

এই যে পৃথিবীর অতিপুরাতন দিন, একে প্রত্যহ প্রভাতে নূতন করে জন্মলাভ করতে হয়। প্রত্যহই একবার করে তাকে আদিতে ফিরে আসতে হয়, নইলে তার মূল সুরটি হারিয়ে যায়। প্রভাত তাকে তার চিরকালের ধুয়োটি বার বার করে ধরিয়ে দেয়, কিছুতেই ভুলতে দেয় না। দিন ক্রমাগতই যদি একটানা চলে যেত, কোথাও যদি তার চোখে নিমেষ না পড়ত, ঘোরতর কর্মের ব্যস্ততা এবং শক্তির ঔদ্ধত্যের মাঝখানে একবার করে যদি অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে সে নিজেকে ভুলে না যেত এবং তার পরে আবার সেই আদিম নবীনতার মধ্যে যদি তার নবজন্মলাভ না হত তা হলে ধুলার পর ধুলা, আবর্জনার পর আবর্জনা, কেবলই জমে উঠত। চেষ্টার ক্ষোভে, অহংকারের তাপে, কর্মের ভারে তার চিরন্তন সত্যটি আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। তা হলে কেবলই মধ্যাহ্নের প্রখরতা, প্রয়াসের প্রবলতা, কেবলই কাড়তে যাওয়া, কেবলই ধাক্কা খাওয়া, কেবলই অন্তহীন পথ, কেবলই লক্ষ্যহীন যাত্রা— এরই উন্মাদনার তপ্ত বাষ্প জমতে-জমতে পৃথিবীকে যেন একদিন বুদ্‌বুদের মতো বিদীর্ণ করে ফেলত।

এখনো দিনের বিচিত্র সংগীত তার সমস্ত মূর্ছনার সঙ্গে বেজে ওঠে নি। কিন্তু এই দিন যতই অগ্রসর হবে, কর্মসংঘাত ততই বেড়ে উঠতে থাকবে, অনৈক্য এবং বিরোধের সুরগুলি ক্রমেই উগ্র হয়ে উঠতে চাইবে। দেখতে দেখতে পৃথিবী জুড়ে উদ্‌বেগ তীব্র, ক্ষুধাতৃষ্ণার ক্রন্দনস্বর প্রবল এবং প্রতিযোগিতার ক্ষুব্ধ গর্জন উন্মত্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্নিগ্ধ প্রভাত প্রতিদিনই দেবদূতের মতো এসে ছিন্ন তারগুলিকে সেরে সুরে নিয়ে যে মূল সুরটিকে বাজিয়ে তোলে সেটি যেমন সরল তেমনি উদার, যেমন শান্ত তেমনি গম্ভীর। তার মধ্যে দাহ নেই, সংঘর্ষ নেই ; তার মধ্যে খণ্ডতা নেই, সংশয় নেই। সে একটি বৃহৎ সমগ্রতার, সম্পূর্ণতার সুর। নিত্যরাগিণীর মূর্তিটি অতি সৌম্যভাবে তার মধ্যে থেকে প্রকাশ পেয়ে ওঠে।

এমনি করে প্রতিদিনই প্রভাতের মুখ থেকে আমরা ফিরে ফিরে এই একটি কথা শুনতে পাই যে, কোলাহল যতই বিষম হোক-না কেন তবু সে চরম নয়, আসল জিনিসটি হচ্ছে শান্তম্‌। সেইটিই ভিতরে আছে, সেইটিই আদিতে আছে, সেইটিই শেষে আছে। সেইজন্যই দিনের সমস্ত উন্মত্ততার পরও প্রভাতে আবার যখন সেই শান্তকে দেখি তখন দেখি তাঁর মূর্তিতে একটু আঘাতের চিহ্ন নেই, একটু ধূলির রেখা নেই। সে মূর্তি চিরস্নিগ্ধ, চিরশুভ্র, চিরপ্রশান্ত।

সমস্ত দিন সংসারের ক্ষেত্রে দুঃখ দৈন্য মৃত্যুর আলোড়ন চলেইছে, কিন্তু রোজ সকালবেলায় একটি বাণী আমাদের এই কথাটিই বলে যায় যে, এই-সমস্ত অকল্যাণই চরম নয়, চরম হচ্ছেন শিবম্‌।

প্রভাতে তাঁর একটি নির্মল মূর্তিকে দেখতে পাই— চেয়ে দেখি সেখানে ক্ষতির বলিরেখা কোথায় ? সমস্তই পূরণ হয়ে আছে। দেখি যে, বুদ্‌বুদ যখন কেটে যায় সমুদ্রের তখনো কণামাত্র ক্ষয় হয় না। আমাদের চোখের উপরে যতই উলটপালট হয়ে যাক-না তবু দেখি যে, সমস্তই ধ্রুব হয়ে আছে, কিছুই নড়ে নি। আদিতে শিবম্‌, অন্তে শিবম্‌ এবং অন্তরে শিবম্‌।

সমুদ্রের ঢেউ যখন চঞ্চল হয়ে ওঠে তখন সেই ঢেউদের কাণ্ড দেখে সমুদ্রকে আর মনে থাকে না। তারাই অসংখ্য, তারাই প্রকাণ্ড, তারাই প্রচণ্ড, এই কথাই কেবল মনে হতে থাকে। তেমনি সংসারের অনৈক্যকে বিরোধকেই সব চেয়ে প্রবল বলে মনে হয়। তা ছাড়া আর যে কিছু আছে তা কল্পনাতেও আসে না। কিন্তু প্রভাতের মুখে একটি মিলনের বার্তা আছে, যদি তা কান পেতে শুনি তবে শুনতে পাব— এই বিরোধ এই অনৈক্যই চরম নয়, চরম হচ্ছেন অদ্বৈতম্‌। আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই হানাহানির সীমা নেই, কিন্তু তার পরে দেখি ছিন্নবিচ্ছিন্নতার চিহ্ন কোথায় ? বিশ্বের মহাসেতু লেশমাত্রও টলে নি। গণনাহীন অনৈক্যকে একই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে বেঁধে চিরদিন্‌ বসে আছেন সেই অদ্বৈতম্‌, সেই একমাত্র এক। আদিতে অদ্বৈতম্‌, অন্তে অদ্বৈতম্‌, অন্তরে অদ্বৈতম্‌।

মানুষ যুগে যুগে প্রতিদিন প্রাতঃকালে দিনের আরম্ভে প্রভাতের প্রথম জাগ্রত আকাশ থেকে এই মন্ত্রটি অন্তরে বাহিরে শুনতে পেয়েছে— শান্তম্‌ শিবম্‌ অদ্বৈতম্‌। একবার তার সমস্ত কর্মকে থামিয়ে দিয়ে, তার সমস্ত প্রবৃত্তিকে শান্ত করে নবীন আলোকের এই আকাশব্যাপী বাণীটি তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে— শান্তম্‌ শিবম্‌ অদ্বৈতম্‌। এমন হাজার হাজার বৎসর ধরে প্রতিদিনই এই একই বাণী, তার কর্মারম্ভের এই একই দীক্ষামন্ত্র।

আসল সত্য কথাটা হচ্ছে এই যে, যিনি প্রথম তিনি আজও প্রথম হয়েই আছেন। মুহূর্তে মুহূর্তেই তিনি সৃষ্টি করছেন, নিখিল জগৎ এইমাত্র প্রথম সৃষ্টি হল এ কথা বললে মিথ্যা বলা হয় না। জগৎ একদিন আরম্ভ হয়েছে, তার পরে তার প্রকাণ্ড ভার বহন করে তাকে কেবলই একটা সোজা পথে টেনে আনা হচ্ছে, এ কথা ঠিক নয়। জগৎকে কেউ বহন করছে না, জগৎকে কেবলই সৃষ্টি করা হচ্ছে। যিনি প্রথম, জগৎ তাঁর কাছ থেকে নিমেষে নিমেষেই আরম্ভ হচ্ছে। সেই প্রথমের সংস্রব কোনোমতেই ঘুচছে না। এইজন্যেই গোড়াতেও প্রথম, এখনো প্রথম ; গোড়াতেও নবীন, এখনো নবীন। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ— বিশ্বের আরম্ভেও তিনি, অন্তেও তিনি, সেই প্রথম, সেই নবীন, সেই নির্বিকার।

এই সত্যটিকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, আমাদের মুহূর্তে মুহূর্তে নবীন হতে হবে, আমাদের ফিরে ফিরে নিমেষে নিমেষে তাঁর মধ্যে জন্মলাভ করতে হবে। কবিতা যেমন প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় আপনার ছন্দটিতে গিয়ে পৌঁছোয়, প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় মূল ছন্দটিকে নূতন করে স্বীকার করে, এবং সেইজন্যেই সমগ্রের সঙ্গে তার প্রত্যেক অংশের যোগ সুন্দর হয়ে ওঠে। আমাদেরও তাই করা চাই। আমরা প্রবৃত্তির পথে, স্বাতন্ত্র্যের পথে একেবারে একটানা চলে যাব তা হবে না ; আমাদের চিত্ত বারংবার সেই মূলে ফিরে আসবে ; সেই মূলে ফিরে এসে তাঁর মধ্যে সমস্ত চরাচরের সঙ্গে আপনার যে অখণ্ড যোগ সেইটিকে বার বার অনুভব করে নেবে, তবেই সে মঙ্গল হবে, তবেই সে সুন্দর হবে।

এ যদি না হয়, আমরা যদি মনে করি সকলের সঙ্গে যে যোগে আমাদের মঙ্গল, আমাদের স্থিতি, আমাদের সামঞ্জস্য, যে যোগ আমাদের অস্তিত্বের মূলে, তাকে ছাড়িয়ে নিজে অত্যন্ত উন্নত হয়ে ওঠবার আয়োজন করব, নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই একেবারে নিত্য এবং উৎকট করে তোলবার চেষ্টা করব, তবে তা কোনোমতেই সফল এবং স্থায়ী হতে পারবেই না। একটা মস্ত ভাঙাচোরার মধ্যে তার অবসান হতেই হবে।

জগতে যত-কিছু বিপ্লব, সে এমনি করেই হয়েছে। যখনই প্রতাপ এক জায়গায় পুঞ্জিত হয়েছে, যখনই বর্ণের কুলের ধনের ক্ষমতার ভাগ-বিভাগ ভেদ-বিভেদ পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানকে একেবারে দুর্লঙ্ঘ্য করে তুলেছে, তখনই সমাজে ঝড় উঠেছে। যিনি অদ্বৈতম্‌, যিনি নিখিল জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যকে একের সীমা লঙ্ঘন করতে দেন না, তাঁকে একাকী ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে জয়ী হতে পারবে এতবড়ো শক্তি কোন্‌ রাজার বা রাজ্যের আছে। কেননা সেই অদ্বৈতের সঙ্গে যোগেই শক্তি,

সেই যোগের উপলব্ধিকে শীর্ণ করলেই দুর্বলতা। এইজন্যেই অহংকারকে বলে বিনাশের মূল, এইজন্যেই ঐক্যহীনতাকেই বলে শক্তিহীনতার কারণ।

অদ্বৈতই যদি জগতের অন্তরতররূপে বিরাজ করেন এবং সকলের সঙ্গে যোগসাধনই যদি জগতের মূলতত্ত্ব হয় তবে স্বাতন্ত্র্য জিনিসটা আসে কোথা থেকে, এই প্রশ্ন মনে আসতে পারে। স্বাতন্ত্র্যও সেই অদ্বৈত থেকেই আসে, স্বাতন্ত্র্যও সেই অদ্বৈতেরই প্রকাশ।

জগতে এই-সব স্বাতন্ত্র্যগুলি কেমন ? না, গানের যেমন তান। তান যতদূর পর্যন্ত যাক-না, গানটিকে অস্বীকার করতে পারে না, সেই গানের সঙ্গে তার মূলে যোগ থাকে। সেই যোগটিকে সে ফিরে ফিরে দেখিয়ে দেয়। গান থেকে তানটি যখন হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে চলে তখন মনে হয় সে বুঝি বিক্ষিপ্ত হয়ে উধাও হয়ে চলে গেল বা, কিন্তু তার সেই ছুটে যাওয়া কেবল মূল গানটিতে আবার ফিরে আসবার জন্যেই, এবং সেই ফিরে আসার রসটিকেই নিবিড় করার জন্যে। বাপ যখন লীলাচ্ছলে দুই হাতে করে শিশুকে আকাশের দিকে তোলেন, তখন মনে হয় যেন তিনি তাকে দূরেই নিক্ষেপ করতে যাচ্ছেন— শিশুর মনের ভিতরে ভিতরে তখন একটু ভয়-ভয় করতে থাকে, কিন্তু একবার তাকে উৎক্ষিপ্ত করেই আবার পরমুহূর্তেই তাকে বুকের কাছে টেনে ধরেন। বাপের এই লীলার মধ্যে সত্য জিনিস কোন্‌টা ? বুকের কাছে টেনে ধরাটাই, তাঁর কাছ থেকে ছুঁড়ে ফেলাটাই নয়। বিচ্ছেদের ভাবটি এবং ভয়টুকুকে সৃষ্টি করা এইজন্যে যে, সত্যকার বিচ্ছেদ নেই সেই আনন্দকেই বারংবার পরিস্ফুট করে তুলতে হবে বলে।

অতএব গানের তানের মতো আমাদের স্বাতন্ত্র্যের সার্থকতা হচ্ছে সেই পর্যন্ত, যে পর্যন্ত মূল ঐক্যকে সে লঙ্ঘন করে না, তাকেই আরো অধিক করে প্রকাশ করে ; সমস্তের মূলে যে শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার সঙ্গে সে নিজের যোগ স্বীকার করে— অর্থাৎ যে স্বাতন্ত্র্য লীলারূপেই সুন্দর, তাকে বিদ্রোহরূপে বিকৃত না করে। বিদ্রোহ করে মানুষের পরিত্রাণই বা কোথায় ? যতদূরই যাক-না সে যাবে কোথায় ? তার মধ্যে ফেরবার সহজ পথটি যদি সে না রাখে, যদি সে প্রবৃত্তির বেগে একেবারে হাউয়ের মতোই উধাও হয়ে চলে যেতে চায়, কোনোমতেই নিখিলের সেই মূলকে মানতে না চায়, তবে তবু তাকে ফিরতেই হবে কিন্তু সেই ফেরা প্রলয়ের দ্বারা, পতনের দ্বারা ঘটবে— তাকে বিদীর্ণ হয়ে, দগ্ধ হয়ে, নিজের সমস্ত শক্তির অভিমানকে ভস্মসাৎ করেই ফিরতে হবে। এই কথাটিকেই খুব জোর করে সমস্ত প্রতিকূল সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ প্রচার করেছে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥

অধর্মের দ্বারা লোকে বৃদ্ধিপ্রাপ্তও হয়, তাতেই সে ইষ্টলাভ করে, তার দ্বারা সে শত্রুদের জয়ও করে থাকে, কিন্তু একেবারে মূলের থেকে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

কেননা সমস্তের মূলে যিনি আছেন তিনি শান্ত, তিনি মঙ্গল, তিনি এক— তাঁকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে যাবার জো নেই। কেবল তাঁকে ততটুকুই ছাড়িয়ে যাওয়া চলে যাতে ফিরে আবার তাঁকেই নিবিড় করে পাওয়া যায়, যাতে বিচ্ছেদের দ্বারা তাঁর প্রকাশ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে।

এইজন্যে ভারতবর্ষে জীবনের আরম্ভেই সেই মূল সুরে জীবনটিকে বেশ ভালো করে বেঁধে নেবার আয়োজন ছিল। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল তাই। এই অনন্তের সুরে সুর মিলিয়ে নেওয়াই ছিল ব্রহ্মচর্য— খুব বিশুদ্ধ করে, নিখুঁত করে, সমস্ত তারগুলিকেই সেই আসল গানটির অনুগত করে বেশ টেনে বেঁধে দেওয়া, এই ছিল জীবনের গোড়াকার সাধনা।

এমনি করে বাঁধা হলে, মূল গানটি উপযুক্তমত সাধা হলে, তার পরে গৃহস্থাশ্রমে ইচ্ছামত তান খেলানো চলে, তাতে আর সুর-লয়ের স্খলন হয় না— সমাজের নানা সম্বন্ধের মধ্যে সেই একের সম্বন্ধকেই বিচিত্রভাবে প্রকাশ করা হয়।

সুরকে রক্ষা করে গান শিখতে মানুষকে কতদিন ধরে কত সাধনাই করতে হয়। তেমনি যারা সমস্ত মানবজীবনটিকেই অনন্তের রাগিণীতে বাঁধা একটি সংগীত বলে জেনেছিল, তারাও সাধনায় শৈথিল্য

করতে পারে নি। সুরটিকে চিনতে এবং কণ্ঠটিকে সত্য করে তুলতে তারা উপযুক্ত গুরুর কাছে বহুদিন সংযমসাধন করতে প্রস্তুত হয়েছিল।

এই ব্রহ্মচর্য আশ্রমটি প্রভাতের মতো সরল, নির্মল, স্নিগ্ধ। মুক্ত আকাশের তলে, বনের ছায়ায়, নির্মল স্রোতস্বিনীর তীরে তার আশ্রয়। জননীর কোল এবং জননীর দুই বাহু বক্ষই যেমন নগ্ন শিশুর আবরণ, এই আশ্রমে তেমনি নগ্নভাবে অবারিতভাবে সাধক বিরাটের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে থাকেন, ভোগবিলাস ঐশ্বর্য-উপকরণ খ্যাতি-প্রতিপত্তির কোনো ব্যবধান থাকে না। এ একেবারে সেই গোড়ায় গিয়ে শান্তের সঙ্গে, মঙ্গলের সঙ্গে, একের সঙ্গে গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে বসা— কোনো প্রমত্ততা, কোনো বিকৃতি সেখান থেকে তাকে বিক্ষিপ্ত করতে না পারে এই হচ্ছে সাধনা।

তার পরে গৃহস্থাশ্রমের কত কাজকর্ম, অর্জন ব্যয়, লাভ ক্ষতি, কত বিচ্ছেদ ও মিলন। কিন্তু এই বিক্ষিপ্ততাই চরম নয়। এরই মধ্যে দিয়ে যত দূর যাবার গিয়ে আবার ফিরতে হবে। ঘর যখন ভরে গেছে, ভাণ্ডার যখন পূর্ণ, তখন তারই মধ্যে আবদ্ধ হয়ে বসলে চলবে না। আবার প্রশস্ত পথে বেরিয়ে পড়তে হবে— আবার সেই মুক্ত আকাশ, সেই বনের ছায়া, সেই ধনহীন উপকরণহীন জীবনযাত্রা। নাই আভরণ, নাই আবরণ, নাই কোনো বাহ্য আয়োজন। আবার সেই বিশুদ্ধ সুরটিতে পৌঁছোনো, সেই সমে এসে শান্ত হওয়া। যেখান থেকে আরম্ভ সেইখানেই প্রত্যাবর্তন— কিন্তু এই ফিরে আসাটি মাঝখানের কর্মের ভিতর দিয়ে, বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে, গভীরতা লাভ করে। যাত্রা করার সময়ে গ্রহণ করার সাধনা আর ফেরবার সময়ে আপনাকে দান করার সাধনা।

উপনিষৎ বলছেন আনন্দ হতেই সমস্ত জীবের জন্ম, আনন্দের মধ্যে সকলের জীবনযাত্রা এবং সেই আনন্দের মধ্যেই আবার সকলের প্রত্যাবর্তন। বিশ্বজগতে এই যে আনন্দসমুদ্রে কেবলই তরঙ্গলীলা চলছে, প্রত্যেক মানুষের জীবনটিকে এরই ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে জীবনের সার্থকতা। প্রথমেই এই উপলব্ধি তাকে পেতে হবে যে, সেই অনন্ত আনন্দ হতেই সে জেগে উঠছে, আনন্দ হতেই তার যাত্রারম্ভ, তার পরে কর্মের বেগে সে যত দূর পর্যন্তই উচ্ছ্রিত হয়ে উঠুক-না, এই অনুভূতিটিই যেন সে রক্ষা করে যে, সেই অনন্ত আনন্দসমুদ্রেই তার লীলা চলছে— তার পরে কর্ম সমাধা করে আবার যেন সে অতি সহজেই নত হয়ে সেই আনন্দসমুদ্রের মধ্যেই আপনার সমস্ত বিক্ষেপকে প্রশান্ত করে দেয়। এই হচ্ছে যথার্থ জীবন। এই জীবনের সঙ্গেই সমস্ত জগতের মিল। সেই মিলেই শান্তি এবং মঙ্গল এবং সৌন্দর্য প্রকাশ পায়।

হে চিত্ত, এই মিলটিকেই চাও। প্রবৃত্তির বেগে সমস্তকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা কোরো না। সকলের চেয়ে বড়ো হব, সকলের চেয়ে কৃতকার্য হয়ে উঠব এইটেকেই তোমার জীবনের মূল তত্ত্ব বলে জেনো না। এ পথে অনেকে অনেক পেয়েছে, অনেক সঞ্চয় করেছে, প্রতাপশালী হয়ে উঠেছে তা আমি জানি, তবু বলছি এ পথ তোমার না হোক। তুমি প্রেমে নত হতে চাও, নত হয়ে একেবারে সেইখানে গিয়ে তোমার মাথা ঠেকুক যেখানে জগতের ছোটো বড়ো সকলেই এসে মিলেছে। তুমি তোমার স্বাতন্ত্র্যকে প্রত্যহই তাঁর মধ্যে বিসর্জন করে তাকে সার্থক করো। যতই উঁচু হয়ে উঠবে ততই নত হয়ে তার মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে থাকবে, যতই বাড়বে ততই ত্যাগ করবে, এই তোমার সাধনা হোক। ফিরে এসো ফিরে এসো বার বার তাঁর মধ্যে ফিরে ফিরে এসো— দিনের মধ্যে মাঝে মাঝে ফিরে এসো সেই অনন্তে। তুমি ফিরে আসবে বলেই এমন করে সমস্ত সাজানো রয়েছে। কত কথা, কত গোলমাল, বাইরের দিকে কত টানাটানি, সব ভুল হয়ে যায়, কোনো কিছুর পরিমাণ ঠিক থাকে না এবং সেই অসত্যের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির মধ্যে বিকৃতি এসে পড়ে। প্রতিদিন মুহূর্তে মুহূর্তে এইরকম ঘটছে, তারই মাঝখানে সতর্ক হও, টেনে আনো আপনাকে, ফিরে এসো, আবার ফিরে এসো, সেই গোড়ায়, সেই শান্তের মধ্যে মঙ্গলের মধ্যে, সেই একের মধ্যে। কাজ করতে করতে কাজের মধ্যে একেবারে হারিয়ে যেয়ো না, তারই মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে এসো তাঁর কাছে ; আমোদ করতে করতে আমাদের মধ্যে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যেয়ো না, তারই মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে এসো যেখানে সেই তাঁর কিনারা। শিশু খেলতে খেলতে মার কাছে বার বার ফিরে আসে, সেই ফিরে আসার যোগ যদি একেবারেই

বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তা হলে তার আনন্দের খেলা কী ভয়ংকর হয়ে ওঠে! তোমার সংসারের কর্ম সংসারের খেলা ভয়ংকর হয়ে উঠবে যদি তাঁর মধ্যে ফেরবার পথ বন্ধ হয়ে যায়, সে পথ যদি অপরিচিত হয়ে ওঠে। বার বার যাতায়াতের দ্বারা সেই পথটি এমনি সহজ করে রাখো যে অমাবস্যার রাতেও সেখানে তুমি অনায়াসে যেতে পার, দুর্যোগের দিনেও সেখানে তোমার পা পিছলে না পড়ে। দিনে দুপুরে বেলায় অবেলায় যখন তখন সেই পথ দিয়ে যাও আর আসো, তাতে যেন কাঁটাগাছ জন্মাবার অবকাশ না ঘটে।

সংসারে দুঃখ আছে শোক আছে, আঘাত আছে অপমান আছে, হার মেনে তাদের হাতে আপনাকে একেবারে সমর্পণ করে দিয়ো না, মনে কোরো না তারা তোমাকে ভেঙে ফেলেছে, গ্রাস করেছে, জীর্ণ করেছে। আবার ফিরে এসো তাঁর মধ্যে, একেবারে নবীন হয়ে নাও। দেখতে দেখতে তুমি সংস্কারে জড়িত হয়ে পড়, লোকাচার তোমার ধর্মের স্থান অধিকার করে, যা তোমার আন্তরিক ছিল তাই বাহ্যিক হয়ে দাঁড়ায়, যা চিন্তার দ্বারা বিচারের দ্বারা সচেতন ছিল তাই অভ্যাসের দ্বারা অন্ধ হয়ে ওঠে, যেখানে তোমার দেবতা ছিলেন সেখানেই অলক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতা এসে তোমাকে বেষ্টন করে ধরে। বাঁধা পোড়ো না এর মধ্যে। ফিরে এসো তাঁর কাছে, বারবার ফিরে এসো। জ্ঞান আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, বুদ্ধি আবার নূতন হবে। জগতে যা-কিছু তোমার জানবার বিষয় আছে, বিজ্ঞান বলো, দর্শন বলো, ইতিহাস বলো, সমাজতত্ত্ব বলো, সমস্তকেই থেকে থেকে তাঁর মধ্যে নিয়ে যাও, তাঁর মধ্যে রেখে দেখো। তা হলেই তাদের উপরকার আবরণ খুলে যাবে, সমস্তই প্রশস্ত হয়ে সত্য হয়ে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে। জগতের সমস্ত সংকোচ, সমস্ত আচ্ছাদন, সমস্ত পাপ, এমনি করে বার বার তাঁর মধ্যে গিয়ে লুপ্ত হচ্ছে। এমনি করে জগৎ যুগের পর যুগ সুস্থ হয়ে সহজ হয়ে আছে। তুমিও তাঁর মধ্যে তেমনি সুস্থ হও, সহজ হও; বার বার করে তাঁর মধ্যে দিয়ে পূর্ণ হয়ে এসো— তোমার দৃষ্টিকে, তোমার চিত্তকে, তোমার হৃদয়কে, তোমার কর্মকে নির্মলরূপে সত্য করে তোলো।

একদিন এই পৃথিবীতে নগ্ন শিশু হয়ে প্রবেশ করেছিলুম— হে চিত্ত, তুমি তখন সেই অনন্ত নবীনতার একেবারে কোলের উপরে খেলা করতে। এইজন্যে সেদিন তোমার কাছে সমস্তই অপরূপ ছিল, ধুলাবালিতেও তখন তোমার আনন্দ ছিল; পৃথিবীর সমস্ত বর্ণগন্ধরস যা-কিছু তোমার হাতের কাছে এসে পড়ত তাকেই তুমি লাভ বলে জানতে, দান বলে গ্রহণ করতে। এখন তুমি বলতে শিখেছ এটা পুরানো, ওটা সাধারণ, এর কোনো দাম নেই। এমনি করে জগতে তোমার অধিকার সংকীর্ণ হয়ে আসছে। জগৎ তেমনিই নবীন আছে, কেননা এ যে অনন্ত রসসমুদ্রে পদ্মের মতো ভাসছে; নীলাকাশের নির্মল ললাটে বার্ধক্যের চিহ্ন পড়ে নি; আমাদের শিশুকালের সেই চিরসুহৃদ্‌ চাঁদ আজও পূর্ণিমার পর পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নার দানসাগর ব্রত পালন করছে; ছয় ঋতুর ফুলের সাজি আজও ঠিক তেমনি করে আপনা-আপনি ভরে উঠছে; রজনীর নীলাম্বরের আঁচলা থেকে আজও একটি চুমকিও খসে নি; আজও প্রতি রাত্রির অবসানে প্রভাত তার সোনার ঝুলিটিতে আশাময় রহস্য বহন করে জগতের প্রত্যেক প্রাণীর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলছে, 'বলো দেখি আমি তোমার জন্যে কী এনেছি!' তবে জগতে জরা কোথায়? জরা কেবল কুঁড়ির উপরকার পত্রপুটের মতো নিজেকে বিদীর্ণ করে খসিয়ে খসিয়ে ফেলছে, চিরনবীনতার পুষ্পই ভিতর থেকে কেবলই ফুটে ফুটে উঠছে। মৃত্যু কেবলই আপনাকে আপনি ধ্বংস করছে— সে যা-কিছুকে সরাচ্ছে তাতে কেবল আপনাকেই সরিয়ে ফেলছে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বৎসর ধরে তার আক্রমণে এই জগৎপাত্রের অমৃতে একটি কণারও ক্ষয় হয় নি।

হে আমার চিত্ত, আজ এই উৎসবের দিনে তুমি একেবারে নবীন হও, এখনই তুমি নবীনতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করো, জরাজীর্ণতার বাহ্য আবরণ তোমার চার দিক থেকে কুয়াশার মতো মিলিয়ে যাক, চিরনবীন চিরসুন্দরকে আজ ঠিক একেবারে তোমার সম্মুখেই চেয়ে দেখো— শৈশবের সত্যদৃষ্টি ফিরে আসুক, জল স্থল আকাশ রহস্যে পূর্ণ হয়ে উঠুক, মৃত্যুর আচ্ছাদন থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে চিরযৌবন দেবতার মতো করে একবার দেখো, সকলকে অমৃতের পুত্র বলে একবার বোধ করো।

সংসারের সমস্ত আবরণকে ভেদ করে আজ একবার আত্মাকে দেখো— কত বড়ো একটি মিলনের মধ্যে সে নিমগ্ন হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে, সে কী নিবিড়, কী নিগূঢ়, কী আনন্দময় ! কোনো ক্লান্তি নেই, জরা নেই, ম্লানতা নেই। সেই মিলনেরই বাঁশি জগতের সমস্ত সংগীতে বেজে উঠছে, সেই মিলনেরই উৎসবসজ্জা সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত হয়েছে। এই জগৎজোড়া সৌন্দর্যের কেবল একটিমাত্র অর্থ আছে— তোমার সঙ্গে তাঁর মিলন হয়েছে সেইজন্যেই এত শোভা, এত আয়োজন। এই সৌন্দর্যের সীমা নেই, এই আয়োজনের ক্ষয় নেই, চিরযৌবন তুমি চিরযৌবন, চিরসুন্দরের বাহুপাশে তুমি চিরদিন বাঁধা, সংসারের সমস্ত পর্দা সরিয়ে ফেলে সমস্ত লোভ মোহ অহংকারের জঞ্জাল কাটিয়ে আজ একবার সেই চিরদিনের আনন্দের মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ করো, সত্য হোক তোমার জীবন তোমার জগৎ, জ্যোতির্ময় হোক, অমৃতময় হোক।

দেখো, আজ দেখো, তোমার গলায় কে পারিজাতের মালা নিজের হাতে পরিয়েছেন— কার প্রেমে তুমি সুন্দর, কার প্রেমে তোমার মৃত্যু নেই, কার প্রেমের গৌরবে তোমার চারি দিক থেকে তুচ্ছতার আবরণ কেবলই কেটে কেটে যাচ্ছে— কিছুতেই তোমাকে চিরদিনের মতো আবৃত আবদ্ধ করতে পারছে না। বিশ্বে তোমার বরণ হয়ে গেছে— প্রিয়তমের অনন্তমহল বাড়ির মধ্যে তুমি প্রবেশ করেছ, চারি দিকে দিকে-দিগন্তে দীপ জ্বলছে, সুরলোকের সপ্তঋষি এসেছেন তোমাকে আশীর্বাদ করতে। আজ তোমার কিসের সংকোচ। আজ তুমি নিজেকে জানো, সেই জানার মধ্যে প্রফুল্ল হয়ে ওঠো, পুলকিত হয়ে ওঠো। তোমারই আত্মার এই মহোৎসবসভায় স্বপ্নাবিষ্টের মতো এক ধারে পড়ে থেকো না, যেখানে তোমার অধিকারের সীমা নেই সেখানে ভিক্ষুকের মতো উঞ্ছবৃত্তি কোরো না।

হে অন্তরতর, আমাকে বড়ো করে জানাবার ইচ্ছা তুমি একেবারেই সব দিক থেকে ঘুচিয়ে দাও। তোমার সঙ্গে মিলিত করে আমার যে জানা সেই আমাকে জানাও। আমার মধ্যে তোমার যা প্রকাশ তাই কেবল সুন্দর, তাই কেবল মঙ্গল, তাই কেবল নিত্য। আর সমস্তের কেবল এইমাত্র মূল্য যে তারা সেই প্রকাশের উপকরণ। কিন্তু তা না হয়ে যদি তারা বাধা হয় তবে নির্মমভাবে তাদের চূর্ণ করে দাও। আমার ধন যদি তোমার ধন না হয় তবে দারিদ্র্যের দ্বারা আমাকে তোমার বুকের কাছে টেনে নাও, আমার বুদ্ধি যদি তোমার শুভবুদ্ধি না হয় তবে অপমানে তার গর্ব চূর্ণ করে তাকে সেই ধুলায় নত করে দাও যে ধুলার কোলে তোমার বিশ্বের সকল জীব বিশ্রাম লাভ করে। আমার মনে যেন এই আশা সর্বদাই জেগে থাকে যে, একেবারে দূরে তুমি আমাকে কখনোই যেতে দেবে না, ফিরে ফিরে তোমার মধ্যে আসতেই হবে, বারংবার তোমার মধ্যে নিজেকে নবীন করে নিতেই হবে। দাহ বেড়ে চলে, বোঝা ভারী হয়, ধুলা জমে ওঠে, কিন্তু এমন করে বরাবর চলে না, দিনের শেষে জননীর হাতে পড়তেই হয়, অনন্ত সুধাসমুদ্রে অবগাহন করতেই হয়, সমস্ত জুড়িয়ে যায়, সমস্ত হালকা হয়, ধুলার চিহ্ন থাকে না ; একেবারে তোমারই যা সেই গোড়াটুকুতেই গিয়ে পৌঁছোতে হয়, যা কিছু আমার সে সমস্ত জঞ্জাল ঘুচে যায়। মৃত্যুর আঁচলের মধ্যে ঢেকে তুমি একেবারে তোমার অবারিত হৃদয়ের উপরে আমাদের টেনে নাও। তখন কোনো ব্যবধান রাখ না। তার পরে বিরাম-রাত্রির শেষে হাতে পাথেয় দিয়ে মুখচুম্বন করে হাসিমুখে জীবনের স্বাতন্ত্র্যের পথে আবার পাঠিয়ে দাও। নির্মল প্রভাতে প্রাণের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, গান করতে করতে বেরিয়ে পড়ি, মনে গর্ব হয়, বুঝি নিজের শক্তিতে নিজের সাহসে, নিজের পথেই দূরে চলে যাচ্ছি। কিন্তু প্রেমের টান তো ছিন্ন হয় না, শুষ্ক গর্ব নিয়ে তো আত্মার ক্ষুধা মেটে না। শেষকালে নিজের শক্তির গৌরবে ধিক্কার জন্মে, সম্পূর্ণ বুঝতে পারি এই শক্তিকে যতক্ষণ তোমার মধ্যে না নিয়ে যাই ততক্ষণ এ কেবল দুর্বলতা। তখন গর্বকে বিসর্জন দিয়ে নিখিলের সমান ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে চাই। তখনই তোমাকে সকলের মাঝখানে পাই, কোথাও আর কোনো বাধা থাকে না। সেইখানে এসে সকলের সঙ্গে একত্রে বসে যাই যেখানে— মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে। শান্তম্‌ শিবমদ্বৈতম্‌ এই মন্ত্র গভীর সুরে বাজুক সমস্ত মনের তারে, সমস্ত কর্মের ঝংকারে। বাজতে বাজতে একেবারে নীরব হয়ে যাক। শান্তের মধ্যে, শিবের মধ্যে, একের মধ্যে, তোমার মধ্যে নীরব হয়ে যাক। পবিত্র হয়ে পরিপূর্ণ হয়ে সুধাময় হয়ে নীরব হয়ে যাক। সুখদুঃখ পূর্ণ

হয়ে উঠুক, জীবনমৃত্যু পূর্ণ হয়ে উঠুক, অন্তর-বাহির পূর্ণ হয়ে উঠুক, ভূর্ভুবঃস্বঃ পূর্ণ হয়ে উঠুক। বিরাজ করুন অনন্ত দয়া, অনন্ত প্রেম, অনন্ত আনন্দ। বিরাজ করুন শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্।

প্রাতঃকাল
১১ মাঘ ১৩১৬

বিশ্ববোধ

প্রত্যেক জাতিই আপনার সভ্যতার ভিতর দিয়ে আপনার শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে প্রার্থনা করছে। গাছের শিকড় থেকে আর ডালপালা পর্যন্ত সমস্তেরই যেমন একমাত্র চেষ্টা এই যে, যেন তার ফলের মধ্যে তার সকলের চেয়ে ভালো বীজটি জন্মায়, অর্থাৎ তার শক্তির যতদূর পরিণতি হওয়া সম্ভব তার বীজে যেন তারই আবির্ভাব হয়, তেমনি মানুষের সমাজও এমন মানুষকে চাচ্ছে যার মধ্যে সে আপনার শক্তির চরম পরিণতিকে প্রত্যক্ষ করতে পারে।

এই শক্তির চরম পরিণতিটি যে কী, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলতে যে কাকে বোঝায় তার কল্পনা প্রত্যেক জাতির বিশেষ ক্ষমতা অনুসারে উজ্জ্বল অথবা অপরিস্ফুট। কেউ বা বাহুবলকে, কেউ বুদ্ধিচাতুরীকে, কেউ চারিত্রনীতিকেই মানুষের শ্রেষ্ঠতার মুখ্য উপাদান বলে গণ্য করেছে এবং সেই দিকেই অগ্রসর হবার জন্যে নিজের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা শাস্ত্রশাসনকে নিযুক্ত করছে।

ভারতবর্ষও একদিন মানুষের পূর্ণ শক্তিকে উপলব্ধি করবার জন্যে সাধনা করেছিল। ভারতবর্ষ মনের মধ্যে আপনার শ্রেষ্ঠ মানুষের ছবিটি দেখেছিল। সে শুধু মনের মধ্যেই কি? বাইরে যদি মানুষের আদর্শ একেবারেই দেখা না যায়, তা হলে মনের মধ্যেও তার প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত গুণী জ্ঞানী শূর বীর রাজা মহারাজার মধ্যে এমন কোন্ মানুষদের দেখেছিল যাদের নরশ্রেষ্ঠ বলে বরণ করে নিয়েছিল? তাঁরা কে?

> সংপ্রাপ্যৈনম্ ঋষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
> কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ
> তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা –
> যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

তাঁরা ঋষি। সেই ঋষি কারা? না, যাঁরা পরমাত্মাকে জ্ঞানের মধ্যে পেয়ে জ্ঞানতৃপ্ত, আত্মার মধ্যে মিলিত দেখে কৃতাত্মা, হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করে বীতরাগ, সংসারের কর্মক্ষেত্রে দর্শন করে প্রশান্ত। সেই ঋষি তাঁরা, যাঁরা পরমাত্মাকে সর্বত্র হতেই প্রাপ্ত হয়ে ধীর হয়েছেন, সকলের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছেন, সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছেন।

ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত সাধনার দ্বারা এই ঋষিদের চেয়েছিল। এই ঋষিরা ধনী নন, ভোগী নন, প্রতাপশালী নন, তাঁরা ধীর, তাঁরা যুক্তাত্মা।

এর থেকেই দেখা যাচ্ছে পরমাত্মার যোগে সকলের সঙ্গেই যোগ উপলব্ধি করা, সকলের মধ্যেই প্রবেশ লাভ করা, এইটেকেই ভারতবর্ষ মনুষ্যত্বের চরম সার্থকতা বলে গণ্য করেছিল। ধনী হয়ে, প্রবল হয়ে, নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই চারি দিকের সকলের চেয়ে উচ্চে খাড়া করে তোলাকেই ভারতবর্ষ সকলের চেয়ে গৌরবের বিষয় বলে মনে করে নি।

মানুষ বিনাশ করতে পারে, কেড়ে নিতে পারে, অর্জন করতে পারে, সঞ্চয় করতে পারে, আবিষ্কার করতে পারে, কিন্তু এইজন্যেই যে মানুষ বড়ো তা নয়। মানুষের মহত্ত্ব হচ্ছে মানুষ সকলকেই আপন করতে পারে। মানুষের জ্ঞান সব জায়গায় পৌঁছোয় না, তার শক্তি সব জায়গায় নাগাল পায় না, কেবল তার আত্মার অধিকারের সীমা নেই। মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা পরিপূর্ণ বোধশক্তির দ্বারা

এই কথা বলতে পেরেছেন যে, ছোটো হোক বড়ো হোক, উচ্চ হোক নীচ হোক, শত্রু হোক মিত্র হোক, সকলেই আমার আপন।

মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা এমন জায়গায় সকলের সঙ্গে সমান হয়ে দাঁড়ান যেখানে সর্বব্যাপীর সঙ্গে তাঁদের আত্মার যোগস্থাপন হয়। যেখানে মানুষ সকলকে *ঠেলেঠুলে* নিজে বড়ো হয়ে উঠতে চায় সেখানেই তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। সেইজন্যেই যাঁরা মানবজন্মের সফলতা লাভ করেছেন উপনিষৎ তাঁদের ধীর বলেছেন, যুক্তাত্মা বলেছেন। অর্থাৎ তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই শান্ত, তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই সেই পরম একের সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছেদ নেই, তাঁরা যুক্তাত্মা।

খ্রীস্টের উপদেশ-বাণীর মধ্যেও এই কথাটির আভাস আছে। তিনি বলেছেন সূচির ছিদ্রের ভিতর দিয়ে যেমন উট প্রবেশ করতে পারে না, ধনীর পক্ষে মুক্তিলাভও তেমনি দুঃসাধ্য।

তার মানে হচ্ছে এই যে, ধন বলো, মান বলো, যা-কিছু আমরা জমিয়ে তুলি তার দ্বারা আমরা স্বতন্ত্র হয়ে উঠি ; তার দ্বারা সকলের সঙ্গে আমাদের যোগ নষ্ট হয়। তাকেই বিশেষভাবে আগলাতে সামলাতে গিয়ে সকলকে দূরে *ঠেকিয়ে* রাখি। সঞ্চয় যতই বাড়তে থাকে ততই সকলের চেয়ে নিজেকে স্বতন্ত্র বলে গর্ব হয়। সেই গর্বের টানে এই স্বাতন্ত্র্যকে কেবলই বাড়িয়ে নিয়ে চলতে চেষ্টা হয়। এর আর সীমা নেই— আরো বড়ো, আরো বড়ো— আরো বেশি, আরো বেশি। এমনি করে মানুষ সকলের সঙ্গে যোগ হারাবার দিকেই চলতে থাকে, তার সর্বত্র প্রবেশের অধিকার কেবল নষ্ট হয়। উট যেমন সূচির ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে গলতে পারে না সেও তেমনি কেবলই স্থূল হয়ে উঠে নিখিলের কোনো পথ দিয়েই গলতে পারে না, সে আপনার বড়োত্বের মধ্যেই বন্দী। সে ব্যক্তি মুক্তস্বরূপকে কেমন করে পাবে যিনি এমন প্রশস্ততম জায়গায় থাকেন যেখানে জগতের ছোটোবড়ো সকলেরই সমান স্থান।

সেইজন্যে আমাদের দেশে এই একটি অত্যন্ত বড়ো কথা বলা হয়েছে যে, তাঁকে পেতে হলে সকলকেই পেতে হবে। সমস্তকে ত্যাগ করাই তাঁকে পাওয়ার পন্থা নয়।

য়ুরোপের কোনো কোনো আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানী, যাঁরা পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে উপনিষদের কাছেই বিশেষভাবে ঋণী, তাঁরা সেই ঋণকে অস্বীকার করেই বলে থাকেন— ভারতবর্ষের ব্রহ্ম একটি অবচ্ছিন্ন (Abstract) পদার্থ। অর্থাৎ জগতে যেখানে যা-কিছু আছে সমস্তকে ত্যাগ করে, বাদ দিয়েই, সেই অনন্তস্বরূপ— অর্থাৎ এক কথায় তিনি কোনোখানেই নেই, আছেন কেবল তত্ত্বজ্ঞানে।

এরকম কোনো দার্শনিক মতবাদ ভারতবর্ষে আছে কি না সে কথা আলোচনা করতে চাই নে, কিন্তু এটি ভারতবর্ষের আসল কথা নয়। বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থের মধ্যেই অনন্তস্বরূপকে উপলব্ধি করার সাধনা ভারতবর্ষে এতদূরে গেছে যে অন্য দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা সাহস করে ততদূরে যেতে পারেন না।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ— জগতে যেখানে যা-কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরকে দিয়ে আচ্ছন্ন করে দেখবে, এই তো আমাদের প্রতি উপদেশ।

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

এঁকেই কি বলে বিশ্ব থেকে বাদ দিয়ে তাঁকে দেখা ? তিনি যেমন অগ্নিতেও আছেন তেমনি জলেও আছেন, অগ্নি ও জলের কোনো বিরোধ তাঁর মধ্যে নেই। ধান, গম, যব প্রভৃতি যে-সমস্ত ওষধি কেবল কয়েক মাসের মতো পৃথিবীর উপর এসে আবার স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যায় তার মধ্যেও সেই নিত্য সত্য যেমন আছেন, আবার যে বনস্পতি অমরতার প্রতিমাস্বরূপ সহস্র বৎসর ধরে পৃথিবীকে ফল ও ছায়া দান করছে তার মধ্যেও তিনি তেমনিই আছেন। শুধু আছেন এইটুকুকে জানা নয়— নমোনমঃ। তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, সর্বত্রই তাঁকে নমস্কার।

আবার আমাদের ধ্যানের মন্ত্রেরও সেই একই লক্ষ্য— তাঁকে সমস্তর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা, ভূলোকের সঙ্গে নক্ষত্রলোকের, বাহিরের সঙ্গে অন্তরের।

আমাদের দেশে বুদ্ধ এসেও বলে গিয়েছেন— যা-কিছু উর্ধ্বে আছে অধোতে আছে, দূরে আছে নিকটে আছে, গোচরে আছে অগোচরে আছে, সমস্তের প্রতিই বাধাহীন হিংসাহীন শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে। যখন দাঁড়িয়ে আছ বা চলছ, বসে আছ বা শুয়ে আছ, যে পর্যন্ত না নিদ্রা আসে সে পর্যন্ত এই প্রকার স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকেই বলে ব্রহ্মবিহার।

অর্থাৎ ব্রহ্মের যে ভাব সেই ভাবটির মধ্যে প্রবেশ করাই হচ্ছে ব্রহ্মবিহার। ব্রহ্মের সেই ভাবটি কী ?

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ— যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ সর্বানুভূ হয়ে আছেন তিনিই ব্রহ্ম। সর্বানুভূ, অর্থাৎ সমস্তই তিনিই অনুভব করছেন এই তাঁর ভাব। তিনি যে কেবল সমস্তর মধ্যে ব্যাপ্ত তা নয়, সমস্তই তাঁর অনুভূতির মধ্যে। শিশুকে মা যে বেষ্টন করে থাকেন সে কেবল তাঁর বাহু দিয়ে তাঁর শরীর দিয়ে নয়, তাঁর অনুভূতি দিয়ে। সেইটেই হচ্ছে মাতার ভাব, সেই তাঁর মাতৃত্ব। শিশুকে মা আদ্যোপান্ত অত্যন্ত প্রগাঢ়রূপে অনুভব করেন। তেমনি সেই অমৃতময় পুরুষের অনুভূতি সমস্ত আকাশকে পূর্ণ করে সমস্ত জগৎকে সর্বত্র নিরতিশয় আচ্ছন্ন করে আছে। সমস্ত শরীরে মনে আমরা তাঁর অনুভূতির মধ্যে মগ্ন হয়ে রয়েছি। অনুভূতি, অনুভূতি— তাঁর অনুভূতির ভিতর দিয়ে বহু যোজন ক্রোশ দূর হতে সূর্য পৃথিবীকে টানছে, তাঁরই অনুভূতির মধ্য দিয়ে আলোকতরঙ্গ লোক হতে লোকান্তরে তরঙ্গিত হয়ে চলেছে। আকাশে কোথাও তার বিচ্ছেদ নেই, কালে কোথাও তার বিরাম নেই।

শুধু আকাশে নয়— যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ— এই আত্মাতেও তিনি সর্বানুভূ। যে আকাশ ব্যাপ্তির রাজ্য সেখানে তিনি সর্বানুভূ, যে আত্মা সমাপ্তির রাজ্য সেখানেও তিনি সর্বানুভূ।

তা হলেই দেখা যাচ্ছে যদি সেই সর্বানুভূকে পেতে চাই তা হলে অনুভূতির সঙ্গে অনুভূতি মেলাতে হবে। বস্তুত মানুষের যতই উন্নতি হচ্ছে ততই তার এই অনুভূতির বিস্তার ঘটছে। তার কাব্য দর্শন বিজ্ঞান কলাবিদ্যা ধর্ম সমস্তই কেবল মানুষের অনুভূতিকে বৃহৎ হতে বৃহত্তর করে তুলছে। এমনি করে অনুভূ হয়েই মানুষ বড়ো হয়ে উঠছে, প্রভু হয়ে নয়। মানুষ যতই অনুভূ হবে প্রভুত্বের বাসনা ততই তার খর্ব হতে থাকবে। জায়গা জুড়ে থেকে মানুষ অধিকার করে না, বাহিরের ব্যবহারের দ্বারাও মানুষের অধিকার নয়— যে পর্যন্ত মানুষের অনুভূতি সেই পর্যন্তই সে সত্য, সেই পর্যন্তই তার অধিকার।

ভারতবর্ষ এই সাধনার 'পরেই সকলের চেয়ে বেশি জোর দিয়েছিল— এই বিশ্ববোধ, সর্বানুভূতি। গায়ত্রীমন্ত্রে এই বোধকেই ভারতবর্ষ প্রত্যহ ধ্যানের দ্বারা চর্চা করেছে, এই বোধের উদ্‌বোধনের জন্যেই উপনিষৎ সর্বভূতকে আত্মায় ও আত্মাকে সর্বভূতে উপলব্ধি করে ঘৃণাপরিহারের উপদেশ দিয়েছেন এবং বুদ্ধদেব এই বোধকেই সম্পূর্ণ করবার জন্যে সেই প্রণালী অবলম্বন করতে বলেছেন যাতে মানুষের মন অহিংসা থেকে দয়ায়, দয়া থেকে মৈত্রীতে সর্বত্র প্রসারিত হয়ে যায়।

এই-যে সমস্তকে পাওয়া, সমস্তকে অনুভব করা, এর একটি মূল্য দিতে হয়। কিছু না দিয়ে পাওয়া যায় না। এই সকলের চেয়ে বড়ো পাওয়ার মূল্য কী ? আপনাকে দেওয়া। আপনাকে দিলে তবে সমস্তকে পাওয়া যায়। আপনার গৌরবই তাই— আপনাকে ত্যাগ করলে সমস্তকে লাভ করা যায়, এইটেই তার মূল্য, এইজন্যই সে আছে।

তাই উপনিষদে একটি সংকেত আছে— ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই লাভ করো, ভোগ করো। মা গৃধঃ, লোভ কোরো না।

বুদ্ধদেবের যে শিক্ষা সেও বাসনাবর্জনের শিক্ষা ; গীতাতেও বলছে— ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে নিরাসক্ত হয়ে কাজ করবে। এই-সকল উপদেশ হতেই অনেকে মনে করেন ভারতবর্ষ জগৎকে মিথ্যা বলে কল্পনা করে বলেই এই প্রকার উদাসীনতার প্রচার করেছে। কিন্তু কথাটা ঠিক এর উলটো।

যে লোক আপনাকেই বড়ো করে চায় সে আর সমস্তকেই খাটো করে। যার মনে বাসনা আছে সে কেবল সেই বাসনার বিষয়েই বদ্ধ, বাকি সমস্তের প্রতিই উদাসীন। উদাসীন শুধু নয়, হয়তো নিষ্ঠুর। এর কারণ এই— প্রভুত্বে কেবল তারই রুচি যে ব্যক্তি সমগ্রের চেয়ে আপনাকেই সত্যতম বলে জানে ; বাসনার বিষয়ে তারই রুচি যার কাছে সেই বিষয়টি সত্য, আর সমস্তই মায়া। এই-সকল লোকেরা হচ্ছে যথার্থ মায়াবাদী।

মানুষ নিজেকে যতই ব্যাপ্ত করতে থাকে ততই তার অহংকার এবং বাসনার বন্ধন কেটে যায়। মানুষ যখন নিজেকে একেবারে একলা বলে না জানে, যখন সে বাপ মা ভাই বন্ধুদের সঙ্গে নিজেকে এক বলে উপলব্ধি করে, তখনই সে সভ্যতার প্রথম সোপানে পা ফেলে, তখনই সে বড়ো হতে শুরু করে। কিন্তু সেই বড়ো হবার মূল্যটি কী ? নিজের প্রবৃত্তিকে বাসনাকে অহংকারকে খর্ব করা। এ না হলে পরিবারের মধ্যে তার আত্মোপলব্ধি সম্ভবপর হয় না। গৃহের সকলেরই কাছে আপনাকে ত্যাগ করলে তবেই যথার্থ গৃহী হতে পারা যায়।

এমনি করে গৃহী হবার জন্যে, সামাজিক হবার জন্যে, স্বাদেশিক হবার জন্যে মানুষকে শিশুকাল থেকে কী সাধনাই না করতে হয়। তার যে-সকল প্রবৃত্তি নিজেকে বড়ো করে পরকে আঘাত করে তাকে কেবলই খর্ব করতে হয়। তার যে-সকল হৃদয়বৃত্তি সকলের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে চায় তাকেই উৎসাহ-দ্বারা এবং চর্চার দ্বারা কেবল বাড়িয়ে তুলতে হয়। পরিবারবোধের চেয়ে সমাজবোধে, সমাজবোধের চেয়ে স্বদেশবোধে মানুষ এক দিকে যতই বড়ো হয় অন্য দিকে ততই তাকে আত্মবিলোপ সাধন করতে হয়। ততই তার শিক্ষা কঠিন হয়ে ওঠে, ততই তাকে বৃহৎ ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হতে হয়। একেই তো বলে বীতরাগ হওয়া। এইজন্যেই মহত্ত্বের সাধনা মাত্রই মানুষকে বলে— ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। বলে— মা গৃধঃ। এইরূপে নিজের ঐক্যবোধের ক্ষেত্রকে ক্রমশ বড়ো করে তোলবার চেষ্টা, এই হচ্ছে মনুষ্যত্বের চেষ্টা। আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি পাশ্চাত্যদেশে এই চেষ্টা সাম্রাজ্যিকতাবোধে গিয়ে পৌঁচেছে। এক জাতির সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে-সমস্ত রাজ্য আছে তাদের সমস্তকে এক সাম্রাজ্যসূত্রে গেঁথে বৃহৎভাবে প্রবল হয়ে ওঠবার একটা ইচ্ছা সেখানে জাগ্রত হয়েছে। এই বোধকে সাধারণের মধ্যে উজ্জ্বল করে তোলবার জন্যে বহুতর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হচ্ছে। বিদ্যালয় নাট্যশালায় গানে কাব্যে উপন্যাসে ভূগোলে ইতিহাসে সর্বত্রই এই সাধনা ফুটে উঠেছে।

সাম্রাজ্যিকতাবোধকে য়ুরোপ যেমন পরম মঙ্গল বলে মনে করছে এবং সেজন্যে বিচিত্রভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে— বিশ্ববোধকেই ভারতবর্ষ মানবাত্মার পক্ষে তেমনি চরম পদার্থ বলে জ্ঞান করেছিল এবং এইটিকে উদ্‌বোধিত করবার জন্যে নানা দিকেই তার চেষ্টাকে চালনা করেছে। শিক্ষায় দীক্ষায় আহারে বিহারে সকল দিকেই সে তার এই অভিপ্রায় বিস্তার করেছে। এই হচ্ছে সাত্ত্বিকতার, অর্থাৎ চৈতন্যময়তার সাধনা। তুচ্ছ বৃহৎ সকল ব্যাপারেই প্রবৃত্তিকে খর্ব করে সংযমের দ্বারা চৈতন্যকে নির্মল উজ্জ্বল করে তোলার সাধনা। কেবল জীবের প্রতি অহিংসামাত্র নয়, নানা উপলক্ষে পশুপক্ষী, এমন-কি, গাছপালার প্রতিও সেবাধর্মের চর্চা করা— অন্য জল নদী পর্বতের প্রতি হৃদয়ের একটি সম্বন্ধ-সূত্র প্রসারিত করা— ধর্মের যোগ যে সকলের সঙ্গেই এই সত্যটিকে নানা ধ্যানের দ্বারা, স্মরণের দ্বারা, কর্মের দ্বারা মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে দেওয়া। বিশ্ববোধ ব্যাপারটি যত বড়ো তার চৈতন্যও তত বড়ো হওয়া চাই, এইজন্যই গৃহীর ভোগে এবং যোগীর ত্যাগে সর্বত্রই এমনতরো সাত্ত্বিক সাধনা।

ভারতবর্ষের কাছে অনন্ত সকল ব্যবহারের অতীত শূন্য পদার্থ নয়, কেবল তত্ত্বকথা নয়। অনন্ত তার কাছে করতলন্যস্ত আমলকের মতো স্পষ্ট বলেই তো জলে স্থলে আকাশে অন্নে পানে বাক্যে মনে সর্বত্র সর্বদাই এই অনন্তকে সর্বসাধারণের প্রত্যক্ষ বোধের মধ্যে সুপরিস্ফুট করে তোলবার জন্যে ভারতবর্ষ এত বিচিত্র ব্যবস্থা করেছে এবং এইজন্যেই ভারতবর্ষ ঐশ্বর্য বা স্বদেশ বা স্বাজাতিকতার মধ্যেই মানুষের বোধশক্তিকে আবদ্ধ করে তাকেই একান্ত ও অত্যুগ্র করে তোলবার দিকে লক্ষ করে নি।

এই-যে বাধাহীন চৈতন্যময় বিশ্ববোধটি ভারতবর্ষে অত্যন্ত সত্য হয়ে উঠেছিল, এই কথাটি আজ

আমরা যেন সম্পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি। এই কথাটি স্মরণ করে আমাদের বক্ষ যেন প্রশস্ত হয়, আমাদের চিত্ত যেন আশান্বিত হয়ে ওঠে। যে বোধ সকলের চেয়ে বড়ো সেই বিশ্ববোধ— যে লাভ সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মলাভ কাল্পনিকতা নয় ; তারই সাধনা প্রচার করবার জন্যে এ দেশে মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ব্রহ্মকেই সমস্তের মধ্যে উপলব্ধি করাটাকে তাঁরা এমন একটি অত্যন্ত নিশ্চিত পদার্থ বলে জেনেছেন যে জোরের সঙ্গে এই কথা বলেছেন—

ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি
ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাৎ অমৃতা ভবন্তি।

এঁকে যদি জানা গেল তবেই সত্য হওয়া গেল, এঁকে যদি না জানা গেল তবেই মহাবিনাশ ভূতে ভূতে সকলের মধ্যেই তাঁকে চিন্তা করে ধীরেরা অমৃতত্ব লাভ করেন।

ভারতবর্ষের এই মহৎ সাধনার উত্তরাধিকার যা আমরা লাভ করেছি তাকে আমরা অন্য দেশের শিক্ষা ও দৃষ্টান্তে ছোটো করে মিথ্যা করে তুলতে পারব না। এই মহৎ সত্যটিকেই নানা দিক দিয়ে উজ্জ্বল করে তোলবার ভার আমাদের দেশের উপরেই আছে। আমাদের দেশের এই তপস্যাটিকেই বড়োরকম করে সার্থক করবার দিন আজ আমাদের এসেছে। জিগীষা নয়, জিঘাংসা নয়, প্রভুত্ব নয়, প্রবলতা নয়, বর্ণের সঙ্গে বর্ণের— ধর্মের সঙ্গে ধর্মের— সমাজের সঙ্গে সমাজের— স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের ভেদ বিরোধ বিচ্ছেদ নয়, ছোটোবড়ো আত্মপর সকলের মধ্যেই উদারভাবে প্রবেশের যে সাধনা সেই সাধনাকেই আমরা আনন্দের সঙ্গে বরণ করব। আজ আমাদের দেশে কত ভিন্ন জাতি, কত ভিন্ন ধর্ম, কত ভিন্ন সম্প্রদায় তা কে গণনা করবে ? এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের কথায় কথায় পদে পদে যে ভেদ এবং আহারে বিহারে সর্ব বিষয়েই মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারে যে নিষ্ঠুর অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রকাশ পায় জগতের অন্য কোথাও তার আর তুলনা পাওয়া যায় না। এতে করে আমরা হারাচ্ছি তাঁকে যিনি সকলকে নিয়েই এক হয়ে আছেন— যিনি তাঁর প্রকাশকে বিচিত্র করেছেন, কিন্তু বিরুদ্ধ করেন নি। তাঁকে হারানো মানেই হচ্ছে মঙ্গলকে হারানো, শক্তিকে হারানো, সামঞ্জস্যকে হারানো এবং সত্যকে হারানো। তাই আজ আমাদের মধ্যে দুর্গতির সীমা পরিসীমা নেই ; যা ভালো তা কেবলই বাধা পায়, পদে পদেই খণ্ডিত হতে থাকে, তার ক্রিয়া সর্বত্র ছড়াতে পায় না। সদনুষ্ঠান একজন মানুষের আশ্রয়ে মাথা তোলে এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়, কালে কালে পুরুষে পুরুষে তার অনুবৃত্তি থাকে না। দেশে যেটুকু কল্যাণের উদ্ভব হয় তা কেবলই পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুর মতো টলমল করতে থাকে। তার কারণ আর কিছুই নয়— আমরা খাওয়া-শোওয়া ওঠা-বসায় যে সাত্ত্বিকতার সাধনা বিস্তার করেছিলুম তাই আজ লক্ষ্যহীন প্রাণহীন হয়ে বিকৃত হয়ে উঠেছে। তার যা উদ্দেশ্য ছিল ঠিক তারই বিপরীত কাজ করছে। যে বিশ্ববোধকে সে অবারিত করবে, তাকেই সে সকলের চেয়ে আবরিত করছে। দুই পা অন্তর এক-একটি প্রভেদকে সে সৃষ্টি করে তুলছে এবং মানবঘৃণার কাঁটাগাছ দিয়ে অতি নিবিড় করে তার বেড়া নির্মাণ করছে। এমনি করেই ভূমাকে আমরা হারালুম, মনুষ্যত্বকে তার বৃহৎক্ষেত্রে দাঁড় করাতে আর পারলুম না, নিরর্থক কতকগুলি আচার মেনে চলাই আমাদের কর্ম হয়ে দাঁড়াল, শক্তিকে বিচিত্র পথে উদারভাবে প্রসারিত করা হল না, চিত্তের গতিবিধির পথ সংকীর্ণ হয়ে এল, আমাদের আশা ছোটো হয়ে গেল, ভরসা রইল না, পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়াবার কোনো টান নেই, কেবলই তফাতে তফাতে সরে যাবার দিকেই তাড়না, কেবলই টুকরো টুকরো করে দেওয়া, কেবলই ভেঙে ভেঙে পড়া— শ্রদ্ধা নেই, সাধনা নেই, শক্তি নেই, আনন্দ নেই। যে মাছ সমুদ্রের সে যদি অন্ধকার গুহার ক্ষুদ্র বদ্ধ জলের মধ্যে গিয়ে পড়ে তবে সে যেমন ক্রমে অন্ধ হয়ে ক্ষীণ হয়ে আসে, তেমনি আমাদের যে আত্মার স্বাভাবিক বিহারক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্ব, আনন্দলোক হচ্ছেন ভূমা, তাকে এই সমস্ত শত খণ্ডিত খাওয়া-ছোঁওয়ার ছোটো ছোটো গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে প্রতিদিন তার বুদ্ধিকে অন্ধ, হৃদয়কে বন্দী এবং শক্তিকে পঙ্গু করে ফেলা হচ্ছে। নিতান্ত প্রত্যক্ষ এই

মহতী বিনষ্টি হতে কে আমাদের বাঁচাবে ? আমাদের সত্য করে তুলবে কিসে ? এর যে যথার্থ উত্তর সে আমাদের দেশেই আছে— ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি, ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ। ইহাকে যদি জানা গেল তবেই সত্য হওয়া গেল, ইহাকে যদি না জানা গেল তবেই মহাবিনাশ। এঁকে কেমন করে জানতে হবে ? না, ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য। প্রত্যেকের মধ্যে, সকলেরই মধ্যে, তাঁকে চিন্তা করে, তাঁকে দর্শন করে। গৃহেই বলো, সমাজেই বলো, রাষ্ট্রেই বলো, যে-পরিমাণে সকলের মধ্যে আমরা সেই সর্বানুভূকে উপলব্ধি করি সেই পরিমাণেই সত্য হই ; যে-পরিমাণে না করি সেই পরিমাণেই আমাদের বিনাশ। এইজন্য সকল দেশের সর্বত্রই মানুষ জেনে এবং না জেনে এই সাধনাই করছে, সে বিশ্বানুভূতির মধ্যেই আত্মার সত্য উপলব্ধি খুঁজছে, সকলের মধ্যে দিয়ে সেই এককেই সে চাচ্ছে, কেননা সেই একই অমৃত, সেই একের থেকে বিচ্ছিন্নতাই মৃত্যু।

কিন্তু আমার মনে কোনো নৈরাশ্য নেই। আমি জানি অভাব যেখানে অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে মূর্তি ধারণ করে সেখানেই তার প্রতিকারের শক্তি সম্পূর্ণ বেগে প্রবল হয়ে ওঠে। আজ যে-সকল দেশ স্বজাতি স্বরাজ্য সাম্রাজ্য প্রভৃতি নিয়ে অত্যন্ত ব্যাপৃত হয়ে আছে তারাও বিশ্বের ভিতর দিয়ে সেই পরম একের সন্ধানে সজ্ঞানে প্রবৃত্ত নেই, তারাও সেই একের বোধকে এক জায়গায় এসে আঘাত করছে, কিন্তু তবু তারা বৃহতের অভিমুখে আছে— একটা বিশেষ সীমার মধ্যে ঐক্যবোধকে তারা প্রশস্ত করে নিয়েছে। সেইজন্যে জ্ঞানে ভাবে কর্মে এখনো তারা ব্যাপ্ত হচ্ছে, তাদের শক্তি এখনো কোথাও তেমন করে অভিহিত হয় নি। তারা চলেছে, তারা বদ্ধ হয় নি। কিন্তু সেইজন্যেই তাদের পক্ষে সুস্পষ্ট করে বোঝা শক্ত পরম পাওয়াটি কী ? তারা মনে করছে তারা যা নিয়ে আছে তাই বুঝি চরম, এর পরে বুঝি আর কিছু নেই, যদি থাকে মানুষের তাতে প্রয়োজন নেই। তারা মনে করে মানুষের যা-কিছু প্রয়োজন তা বুঝি ভোট দেবার অধিকারের উপর নির্ভর করছে, আজকালকার দিনের উন্নতি বলতে লোকে যা বোঝে তাই বুঝি মানুষের চরম অবলম্বন।

কিন্তু বিধাতা এই ভারতবর্ষেই সমস্যাকে সব চেয়ে ঘনীভূত করে তুলেছেন, সেইজন্যে আমাদেরই এই সমস্যার আসল উত্তরটি দিতে হবে, এবং এর উত্তর আমাদের দেশের বাণীতে যেমন অত্যন্ত স্পষ্ট করে ব্যক্ত হয়েছে এমন আর কোথাও হয় নি।—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুগুপ্সতে।

যিনি সমস্ত ভূতকে পরমাত্মার মধ্যেই দেখেন এবং পরমাত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন, তিনি আর কাউকেই ঘৃণা করেন না।

সর্বব্যাপী স ভগবান তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ। সেই ভগবান সর্বব্যাপী, এইজন্যে তিনিই হচ্ছেন সর্বগত মঙ্গল। বিভাগের দ্বারা, বিরোধের দ্বারা যতই তাঁকে খণ্ডিত করে জানব ততই সেই সর্বগত মঙ্গলকে বাধা দেব।

একদিন ভারতবর্ষের বাণীতে মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো সমস্যার যে উত্তর দেওয়া হয়েছে, আজ ইতিহাসের মধ্যে আমাদের সেই উত্তরটি দিতে হবে। আজ আমাদের দেশে নানা জাতি এসেছে, বিপরীত দিক থেকে নানা বিরুদ্ধ শক্তি এসে পড়েছে, মতের অনৈক্য, আচারের পার্থক্য, স্বার্থের সংঘাত ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভারতবর্ষের বাণীকে আজই সত্য করে তোলবার সময় এসেছে। যতক্ষণ তা না করব ততক্ষণ বার বার কেবলই আঘাত পেতে থাকব, কেবলই অপমান কেবলই ব্যর্থতা ঘটতে থাকবে, বিধাতা একদিনের জন্যেও আমাদের আরামে বিশ্রাম করতে দেবেন না।

আমরা মানুষের সমস্ত বিচ্ছিন্নতা মিটিয়ে দিয়ে তাকে যে এক করে জানবার সাধনা করব তার কারণ এ নয় যে সেই উপায়ে আমরা প্রবল হব, আমাদের বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়বে, আমাদের স্বজাতি সকল জাতির চেয়ে বড়ো হয়ে উঠবে। কিন্তু তার একটিমাত্র কারণ এই যে, সকল মানুষের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা সেই ভূমার মধ্যে সত্য হয়ে উঠবে যিনি 'সর্বগতঃ শিবঃ', যিনি 'সর্বভূতগুহাশয়ঃ', যিনি

'সর্বানুভূঃ'। তাঁকেই চাই, তিনিই আরম্ভে, তিনিই শেষে। যদি বলো এমন করে দেখলে আমাদের উন্নতি হবে না, তা হলে আমি বলব আমাদের বিনতিই ভালো। যদি বলো এই সাধনায় আমাদের স্বজাতীয়তা দৃঢ় হয়ে উঠবে না, তা হলে আমি বলব স্বজাতি-অভিমানের অতি নিষ্ঠুর মোহ কাটিয়ে ওঠাই যে মানুষের পক্ষে শ্রেয় এই শিক্ষা দেবার জন্যেই ভারতবর্ষ চিরদিন প্রস্তুত হয়েছে। ভারতবর্ষ এই কথাই বলেছে 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম'— সমস্ত উদ্ধত সভ্যতার সভাদ্বারে দাঁড়িয়ে আবার একবার ভারতবর্ষকে বলতে হবে ঃ যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। প্রবলরা দুর্বল বলে অবজ্ঞা করবে, ধনীরা তাকে দরিদ্র বলে উপহাস করবে, কিন্তু তবু তাকে এই কথা বলতে হবে : যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। এই কথা বলবার শক্তি আমাদের কণ্ঠে তিনিই দিন, য একঃ, যিনি এক ; অবর্ণঃ, যাঁর বর্ণ নেই ; বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ, যিনি সমস্তের আরম্ভে এবং সমস্তের শেষে। সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, তিনি আমাদের শুভবুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করুন, শুভবুদ্ধির দ্বারা দূরনিকট আত্মপর সকলের সঙ্গে যুক্ত করুন।

হে সর্বানুভূ, তোমার যে অমৃতময় অনন্ত অনুভূতির দ্বারা বিশ্বচরাচরের যা-কিছু সমস্তকেই তুমি নিবিড় করে বেষ্টন করে ধরেছ, সেই তোমার অনুভূতিকে এই ভারতবর্ষের উজ্জ্বল আকাশের তলে দাঁড়িয়ে একদিন এখানকার ঋষি তাঁর নিজের নির্মল চেতনার মধ্যে যে কী আশ্চর্য গভীররূপে উপলব্ধি করেছেন তা মনে করলে আমার হৃদয় পুলকিত হয়। মনে হয় যেন তাঁদের সেই উপলব্ধি এ দেশের এই বাধাহীন নীলাকাশে এই কুহেলিকাহীন উদার আলোকে আজও সঞ্চারিত হচ্ছে। মনে হয় যেন এই আকাশের মধ্যে আজও হৃদয়কে উদ্‌ঘাটিত করে নিস্তব্ধ করে ধরলে তাঁদের সেই বৈদ্যুতময় চেতনার অভিঘাত আমাদের চিত্তকে বিশ্বস্পন্দনের সমান ছন্দে তরঙ্গিত করে তুলবে। কী আশ্চর্য পরিপূর্ণতার মূর্তিতে তুমি তাঁদের কাছে দেখা দিয়েছিলে— এমন পূর্ণতা যে, কিছুতে তাঁদের লোভ ছিল না। যতই তাঁরা ত্যাগ করেছেন ততই তুমি পূর্ণ করেছ, এইজন্যে ত্যাগকেই তাঁরা ভোগ বলেছেন। তাঁদের দৃষ্টি এমন চৈতন্যময় হয়ে উঠেছিল যে, লেশমাত্র শূন্যকে কোথাও তাঁরা দেখতে পান নি, মৃত্যুকেও বিচ্ছেদরূপে তাঁরা স্বীকার করেন নি। এইজন্যে অমৃতকে যেমন তাঁরা তোমার ছায়া বলেছেন তেমনি মৃত্যুকেও তাঁরা তোমার ছায়া বলেছেন : যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ। এইজন্যে তাঁরা বলেছেন : প্রাণো মৃত্যুঃ প্রাণ স্তক্মা। প্রাণই মৃত্যু, প্রাণই বেদনা। এইজন্যেই তাঁরা ভক্তির সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে বলেছেন : নমস্তে অস্তু আয়তে, নমো অস্তু পরায়তে। যে প্রাণ আসছ তোমাকে নমস্কার : যে প্রাণ চলে যাচ্ছ তোমাকে নমস্কার। প্রাণে হ ভূতং ভব্যং চ। যা চলে গেছে তা প্রাণেই আছে, যা ভবিষ্যতে আসবে তাও প্রাণের মধ্যেই রয়েছে। তাঁরা অতি সহজেই এই কথাটি বুঝেছিলেন যে, যোগের বিচ্ছেদ কোনোখানেই নেই। প্রাণের যোগ যদি জগতের কোনো এক জায়গাতেও বিচ্ছিন্ন হয় তা হলে জগতে কোথাও একটি প্রাণীও বাঁচতে পারে না। সেই বিরাট প্রাণসমুদ্রই তুমি। যদিদং কিঞ্চ প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। এই যা-কিছু সমস্তই সেই প্রাণ হতে নিঃসৃত হচ্ছে এবং প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে। নিজের প্রাণকে তাঁরা অনন্তের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি, সেইজন্যেই প্রাণকে তাঁরা সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত দেখে বলেছেন : প্রাণো বিরাট্। সেই প্রাণকেই তাঁরা সূর্যচন্দ্রের মধ্যে অনুসরণ করে বলেছেন : প্রাণো হ সূর্যশ্চন্দ্রমা। নমস্তে প্রাণ ক্রন্দায়, নমস্তে স্তনয়িত্নবে। যে প্রাণ ক্রন্দন করছ সেই তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ গর্জন করছ সেই তোমাকে নমস্কার। নমস্তে প্রাণ বিদ্যুতে, নমস্তে প্রাণ বর্ষতে। যে প্রাণ বিদ্যুতে জ্বলে উঠছ সেই তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ বর্ষণে গলে পড়ছ সেই তোমাকে নমস্কার। প্রাণ, প্রাণ, প্রাণ, সমস্ত প্রাণময়— কোথাও তার রন্ধ্র নেই, অন্ত নেই। এমনতরো অখণ্ড অনবচ্ছিন্ন উপলব্ধির মধ্যে তোমার যে সাধকেরা একদিন বাস করেছেন তাঁরা এই ভারতবর্ষেই বিচরণ করেছেন। তাঁরা এই আকাশের দিকেই চোখ তুলে একদিন এমন নিঃসংশয় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন ; কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। কেই বা শরীরচেষ্টা করত, কেই বা জীবনধারণ করত, যদি এই আকাশে আনন্দ না থাকতেন। যাঁরা নিজের বোধের মধ্যে সমস্ত আকাশকেই আনন্দময় বলে জেনেছিলেন তাঁদের পদধূলি এই ভারতবর্ষের মাটির মধ্যে রয়েছে। সেই

পবিত্র ধূলিকে মাথায় নিয়ে, হে সর্বব্যাপী পরমানন্দ, তোমাকে সর্বত্র স্বীকার করবার শক্তি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হোক। যাক সমস্ত বাধাবন্ধ ভেঙে যাক। দেশের মধ্যে এই আনন্দবোধের বন্যা এসে পড়ুক। সেই আনন্দের বেগে মানুষের সমস্ত ঘরগড়া ব্যবধান চূর্ণ হয়ে যাক, শত্রু মিত্র মিলে যাক, স্বদেশ বিদেশ এক হোক। হে আনন্দময়, আমরা দীন নই দরিদ্র নই। তোমার অমৃতময় অনুভূতিদ্বারা আমরা আকাশে এবং আত্মায়— অন্তরে বাহিরে পরিবেষ্টিত— এই অনুভূতি আমাদের দিনে দিনে জাগ্রত হয়ে উঠুক। তা হলেই আমাদের ত্যাগই ভোগ হবে, অভাবও ঐশ্বর্যময় হবে, দিন পূর্ণ হবে, রাত পূর্ণ হবে, নিকট পূর্ণ হবে, দূর পূর্ণ হবে, পৃথিবীর ধূলি পূর্ণ হবে, আকাশের নক্ষত্রলোক পূর্ণ হবে। যাঁরা তোমাকে নিখিল আকাশে পরিপূর্ণভাবে দেখেছেন তাঁরা তো কেবল তোমাকে জ্ঞানময় বলে দেখেন নি। কোন্ প্রেমের সুগন্ধ বসন্তবাতাসে তাঁদের হৃদয়ের মধ্যে এই বার্তা সঞ্চারিত করেছে যে, তোমার যে বিশ্বব্যাপী অনুভূতি তা রসময় অনুভূতি। বলেছেন 'রসো বৈ সঃ'— সেইজন্যেই জগৎ জুড়ে এত রূপ, এত রঙ, এত গন্ধ, এত গান, এত সখ্য, এত স্নেহ, এত প্রেম। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানিভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। তোমার এই অখণ্ড পরমানন্দ রসকেই আমরা সমস্ত জীবজন্তু দিকে দিকে মুহূর্তে মুহূর্তে মাত্রায় মাত্রায় কণায় কণায় পাচ্ছি— দিনে রাত্রে, ঋতুতে ঋতুতে, অন্নে জলে, ফুলে ফলে, দেহে মনে, অন্তরে বাহিরে বিচিত্র করে ভোগ করছি। হে অনির্বচনীয় অনন্ত, তোমাকে রসময় বলে দেখলে সমস্ত চিত্ত একেবারে সকলের নীচে নত হয়ে পড়ে। বলে— দাও দাও, আমাকে তোমার ধুলার মধ্যে তৃণের মধ্যে ছড়িয়ে দাও। দাও আমাকে রিক্ত করে কাঙাল করে, তার পরে দাও আমাকে রসে ভরে দাও। চাই না ধন, চাই না মান, চাই না কারও চেয়ে কিছুমাত্র বড়ো হতে। তোমার যে রস হাটবাজারে কেনবার নয়, রাজভাণ্ডারে কুলুপ দিয়ে রাখবার নয়, যা আপনার অন্তহীন প্রাচুর্যে আপনাকে আর ধরে রাখতে পারছে না, চার দিকে ছড়াছড়ি যাচ্ছে— তোমার যে রসে মাটির উপর ঘাস সবুজ হয়ে আছে, বনের মধ্যে ফুল সুন্দর হয়ে আছে— যে রসে সকল দুঃখ সকল বিরোধ সকল কাড়াকাড়ির মধ্যেও আজও মানুষের ঘরে ঘরে ভালোবাসার অজস্র অমৃতধারা কিছুতেই শুকিয়ে যাচ্ছে না, ফুরিয়ে যাচ্ছে না— মুহূর্তে মুহূর্তে নবীন হয়ে উঠে পিতায়-মাতায় স্বামী-স্ত্রীতে পুত্রে-কন্যায় বন্ধু-বান্ধবে নানা দিকে নানা শাখায় বয়ে যাচ্ছে— সেই তোমার নিখিল রসের নিবিড় সমষ্টিরূপ যে অমৃত তারই একটু কণা আমার হৃদয়ের মাঝখানটিতে একবার ছুঁইয়ে দাও। তার পর থেকে আমি দিনরাত্রি তোমার সবুজ ঘাসপাতার সঙ্গে আমার প্রাণকে সরস করে মিলিয়ে দিয়ে তোমার পায়ের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে থাকি। যারা তোমারই, সেই তোমার-সকলের মাঝখানেই গরিব হয়ে, নিশ্চিন্ত হয়ে, খুশি হয়ে, যে জায়গাটিতে কারও লোভ নেই সেইখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তোমার প্রেমমুখশ্রীর চিরপ্রসন্ন আলোকে পরিপূর্ণ হয়ে থাকি। হে প্রভু, কবে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ করে সত্য করে জানিয়ে দেবে যে, রিক্ততার প্রার্থনাই তোমার কাছে চরম প্রার্থনা। আমার সমস্তই নাও, সমস্তই ঘুচিয়ে দাও, তা হলেই তোমার সমস্তই পাব— মানবজীবনে সকলের এই শেষ কথাটি ততক্ষণ বলবার সাহস হবে না যতক্ষণ অন্তরের ভিতর থেকে বলতে না পারব ; রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি : তিনিই রস, যা-কিছু আনন্দ সে এই রসকে পেয়েই।

[মহর্ষিভবন : কলিকাতা
মাঘোৎসব ১৩১৬]

গ্রন্থপরিচয়

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণ, বর্তমানে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত সংস্করণ, রচনাবলী-সংস্করণ, এই তিনের পার্থক্য সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে নির্দেশ করা গেল।

বিশ্বভারতী-প্রচলিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ খণ্ড বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইল।

পলাতকা

পলাতকা ১৩২৫ (১৯১৮) সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

বিভিন্ন কবিতার সাময়িক পত্রে প্রকাশের সূচী নিম্নে মুদ্রিত হইল—

১	পলাতকা[১]	প্রবাসী। বৈশাখ ১৩২৫
২	চিরদিনের দাগা	ভারতী। বৈশাখ ১৩২৫
৩	মুক্তি	সবুজ পত্র। বৈশাখ ১৩২৫
৪	ফাঁকি	মানসী ও মর্ম্মবাণী। জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫
৫	মায়ের সম্মান	ভারতী। জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫
৬	নিষ্কৃতি[২]	প্রবাসী। জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫
৭	মালা	প্রবাসী। আষাঢ় ১৩২৫
৮	ভোলা	ভারতী। আষাঢ় ১৩২৫
৯	ছিন্ন পত্র	সবুজ পত্র। জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫
১০	কালো মেয়ে	সবুজ পত্র। আষাঢ় ১৩২৫
১১	আসল	প্রবাসী। শ্রাবণ ১৩২৫
১২	ঠাকুরদাদার ছুটি	পার্ব্বণী। আশ্বিন ১৩২৫
১৩	হারিয়ে-যাওয়া	ভারতী। শ্রাবণ ১৩২৫
১৪	শেষ গান[৩]	সবুজ পত্র। জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪
১৫	শেষ প্রতিষ্ঠা	

শিশু ভোলানাথ

শিশু ভোলানাথ ১৩২৯ (১৯২২) সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা 'মৌচাক', 'সন্দেশ', 'প্রবাসী'; 'বঙ্গবাণী', 'রংমশাল', 'শ্রেয়সী' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। "সময়হারা" কবিতাটি ১৩৩০ বৈশাখের সন্দেশ পত্রিকা হইতে শিশু

১ প্রবাসীতে শিরোনাম : নিরুদ্দেশ

২ প্রবাসীতে শিরোনাম : যেনাস্যাঃ পিতরো যাতাঃ

৩ সবুজ পত্রে শিরোনাম : পরমায়ু

গ্রন্থে সংকলন-কালে কিছু কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে। অধিকতর পরিবর্তিত একটি পাঠ 'পূরবী' গ্রন্থের প্রথমেই মুদ্রিত রহিয়াছে।

ভোলানাথ গ্রন্থে (১৩৫০) এবং রচনাবলী-সংস্করণে (১৩৪৯) নূতন সংকলিত হইয়াছে।

শিশু ভোলানাথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারিতে ('যাত্রী') লিখিয়াছেন :

একজন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে একদিন এক-মোটরে নিমন্ত্রণ-সভায় যাচ্ছিলুম। তিনি আমাকে কথাপ্রসঙ্গে খবর দিলেন যে, আজকাল পদ্য আকারে যে-সব রচনা করছি সেগুলি লোকে তেমন পছন্দ করছে না। যারা পছন্দ করছে না তাদের সুযোগ্য প্রতিনিধিস্বরূপে তিনি উল্লেখ করলেন তাঁর কোনো কোনো আত্মীয়ের কথা— সেই আত্মীয়েরা কবি ; আর যে-সব পদ্য-রচনা লোকে পছন্দ করে না, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন আমার গানগুলো, আর আমার শিশু ভোলানাথ নামক আধুনিক কাব্যগ্রন্থ। তিনি বললেন, আমার বন্ধুরাও আশঙ্কা করছেন আমার কাব্য লেখবার শক্তি ক্রমেই ম্লান হয়ে আসছে।

কালের ধর্মই এই। মর্তলোকে বসন্ত-ঋতু চিরকাল থাকে না। মানুষের ক্ষমতার ক্ষয় আছে, অবসান আছে। যদি কখনো কিছু দিয়ে থাকি, তবে মূল্য দেবার সময় তারই হিসাবটা স্মরণ করা ভালো। রাত্রিশেষে দীপের আলো নেববার সময় যখন সে তার শিখার পাখাতে বার-কতক শেষ ঝাপটা দিয়ে লীলা সাঙ্গ করে, তখন আশা দিয়ে নিরাশ করবার দাবিতে প্রদীপের নামে নালিশ করাটা বৈধ নয়। দাবিটাই যার বেহিসাবী, দাবি অপূরণ হবার হিসাবটাতেও তার ভুল থাকবেই। পঁচানব্বই বছর বয়সে একটা মানুষ ফস করে মারা গেল বলে চিকিৎসাশাস্ত্রটাকে ধিক্কার দেওয়া বৃথা বাক্যব্যয়। অতএব কেউ যদি বলে আমার বয়স যতই বাড়ছে আমার আয়ু ততই কমে যাচ্ছে, তা হলে তাকে আমি নিন্দুক বলি নে, বড়োজোর এই বলি যে, লোকটা বাজে কথা এমনভাবে বলে যেন সেটা দৈববাণী। কালক্রমে আমার ক্ষমতা হ্রাস হয়ে যাচ্ছে, এই বিধিলিপি নিয়ে যুবক হোক বৃদ্ধ হোক, কবি হোক অকবি হোক, কারও সঙ্গে তকরার করার চেয়ে ততক্ষণ একটা গান লেখা ভালো মনে করি, তা সেটা পছন্দসই হোক আর না হোক। এমন-কি, সেই অবসরে শিশু ভোলানাথের জাতের কবিতা যদি লিখতে পারি, তা হলেও মনটা খুশি থাকে।...

ঐ শিশু ভোলানাথের কবিতাগুলো খামকা কেন লিখতে বসেছিলুম ? সেও লোকরঞ্জনের জন্যে নয়, নিতান্ত নিজের গরজে।

পূর্বেই বলেছি, কিছুকাল আমেরিকার প্রৌঢ়তার মরুপারে ঘোরতর কার্যপটুতার পাথরের দুর্গে আটকা পড়েছিলুম। সেদিন খুব স্পষ্ট বুঝেছিলুম জমিয়ে তোলবার মতো এতবড়ো মিথ্যে ব্যাপার জগতে আর কিছুই নেই। এই জমাবার জমাদারটা বিশ্বের চিরচঞ্চলতাকে বাধা দেবার স্পর্ধা করে ; কিন্তু কিছুই থাকবে না, আজ বাদে কাল সব সাফ হয়ে যাবে। যে-স্রোতের ঘূর্ণিপাকে এক-এক জায়গায় এই-সব বস্তুর পিণ্ডগুলোকে স্তূপাকার করে দিয়ে গেছে, সেই স্রোতেরই অবিরত বেগে ঠেলে ঠেলে সমস্ত ভাসিয়ে নীল সমুদ্রে নিয়ে যাবে— পৃথিবীর বক্ষ সুস্থ হবে। পৃথিবীতে সৃষ্টির যে লীলাশক্তি আছে সে যে নির্লোভ, সে নিরাসক্ত, সে অকৃপণ— সে কিছু জমতে দেয় না ; কেননা জমার জঞ্জালে তার সৃষ্টির পথ আটকায়— সে যে নিত্যনূতনের নিরন্তর প্রকাশের জন্যে তার অবকাশকে নির্মল করে রেখে দিতে চায়। লোভী মানুষ কোথা থেকে জঞ্জাল্ জড়ো করে সেইগুলোকে আগলে রাখবার জন্যে নিগড়বদ্ধ লক্ষ লক্ষ দাসকে দিয়ে প্রকাণ্ড সব ভাণ্ডার তৈরি করে তুলছে। সেই ধ্বংসশাপগ্রস্ত ভাণ্ডারের কারাগারে জড়বস্তুপুঞ্জের অন্ধকারে বাসা বেঁধে সঞ্চয়-গর্বের ঔদ্ধত্যে মহাকালকে কৃপণটা বিদ্রূপ করছে— এ বিদ্রূপ মহাকাল কখনোই সইবে না। আকাশের উপর দিয়ে যেমন ধুলানিবিড় আঁধি ক্ষণকালের জন্যে সূর্যকে পরাভূত করে দিয়ে তার পরে নিজের দৌরাত্ম্যের কোনো চিহ্ন না রেখে চলে যায়, এ-সব তেমনি করেই শূন্যের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

কিছুকালের জন্যে আমি এই বস্তু-উদ্‌গারের অন্ধযন্ত্রের মুখে এই বস্তুসঞ্চয়ের অন্ধভাণ্ডারে বদ্ধ হয়ে আতিথ্যহীন সন্দেহের বিষবাষ্পে শ্বাসরুদ্ধপ্রায় অবস্থায় কাটিয়েছিলুম। তখন আমি এই ঘন দেয়ালের বাইরের রাস্তা থেকে চিরপথিকের পায়ের শব্দ শুনতে পেতুম। সেই শব্দের ছন্দই যে আমার রক্তের মধ্যে বাজে, আমার ধ্যানের মধ্যে ধ্বনিত হয়। আমি সেদিন স্পষ্ট বুঝেছিলুম, আমি ঐ পথিকের সহচর।

আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই শিশু ভোলানাথ লিখতে বসেছিলুম। বন্দী যেমন ফাঁক পেলেই ছুটে আসে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে তেমনি করে। দেয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট করে আবিষ্কার করে, তার চিত্তের জন্যে এতবড়ো আকাশেরই ফাঁকাটা দরকার। প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে-শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে-লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।…

৭ অক্টোবর ১৯২৪

পূরবী

পূরবী ১৩৩২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থখানি দুই অংশে বিভক্ত, 'পূরবী' ও 'পথিক'[৪]। ১৩২৪-১৩৩০ সালে রচিত কবিতা 'পূরবী' অংশে ও ১৩৩১ সালে য়ুরোপে ও দক্ষিণ আমেরিকায় ভ্রমণকালে লিখিত কবিতা 'পথিক' অংশে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পথিক অংশের অনেক কবিতার ইতিহাস 'যাত্রী' গ্রন্থের 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' অংশে (রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে 'বিশ্বযাত্রী' পর্যায়ে স্বতন্ত্র মুদ্রিত, ১৩৬৮) সন্নিবদ্ধ আছে।

পথিক অংশের প্রথম কবিতা 'সাবিত্রী' (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৪) প্রসঙ্গে 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'র এই অংশগুলি দ্রষ্টব্য :

হারুনা-মারু জাহাজ
২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৪

সকাল আটটা। আকাশে ঘন মেঘ, দিগন্ত বৃষ্টিতে ঝাপসা, বাদলার হাওয়া খুঁতখুঁতে ছেলের মতো কিছুতেই শান্ত হতে চাচ্ছে না। বন্দরের শান-বাঁধানো বাঁধের ওপারে দুরন্ত সমুদ্র লাফিয়ে লাফিয়ে গর্জে উঠছে, কাকে যেন ঝুঁটি ধরে পেড়ে ফেলতে চায়, নাগাল পায় না।

২৫ সেপ্টেম্বর

কাল সমস্ত দিন জাহাজ মাল বোঝাই করছিল। রাত্রে যখন ছাড়ল তখন বাতাসের আক্ষেপ কিছু শান্ত কিন্তু তখনো মেঘগুলো দল পাকিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে। আজ সকালে একখানা ভিজে অন্ধকারে আকাশ ঢাকা। এবার আলোকের অভিনন্দন পেলুম না।…

৪ পূরবীর প্রথম মুদ্রণে তৃতীয় একটি অংশ ছিল "সঞ্চিতা"— পুরাতন যে-সব কবিতা অন্য কোনো বইতে গ্রথিত হয় নাই সেগুলি এই বিভাগে মুদ্রিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে এই বিভাগটি পরিত্যক্ত হয়, রচনাবলীতেও বর্জিত হইল। এই বিভাগে মুদ্রিত কয়েকটি কবিতা রবীন্দ্র-রচনাবলীর দশম খণ্ডে (সুলভ, পঞ্চম খণ্ডে) 'উৎসর্গ' গ্রন্থের সংযোজন অংশে মুদ্রিত হইয়াছে।

২৬ সেপ্টেম্বর

আজ ক্ষণে ক্ষণে রৌদ্র উঁকি মারছে, কিন্তু সে যেন তার গারদের গরাদের ভিতর থেকে। তার সংকোচ এখনো ঘুচল না। বাদল-রাজের কালো-উর্দিপরা মেঘগুলো দিকে দিকে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

আচ্ছন্ন সূর্যের আলোয় আমার চৈতন্যের স্রোতস্বিনীতে যেন ভাঁটা পড়ে গেছে। জোয়ার আসবে রৌদ্রের সঙ্গে সঙ্গে।

পশ্চিমে, বিশেষত আমেরিকায়, দেখেছি বাপমায়ের সঙ্গে অধিকাংশ বয়স্ক ছেলেমেয়ের নাড়ীর টান ঘুচে গেছে। আমাদের দেশে শেষ পর্যন্তই সেটা থাকে। তেমনিই দেখেছি সূর্যের সঙ্গে মানুষের প্রাণের যোগ সে দেশে তেমন যেন অন্তরঙ্গভাবে অনুভব করে না। সেই বিরলরৌদ্রের দেশে তারা ঘরে সূর্যের আলো ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে যখন পর্দা কখনো বা অর্ধেক কখনো বা সম্পূর্ণ নামিয়ে দেয়, তখন সেটাকে আমি ঔদ্ধত্য বলে মনে করি।

প্রাণের যোগ নয় তো কী ? সূর্যের আলোর ধারা তো আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে বইছে। আমাদের প্রাণমন আমাদের রূপরস সবই তো উৎসরূপে রয়েছে ঐ মহা জ্যোতিষ্কের মধ্যে। সৌরজগতের সমস্ত ভাবীকাল একদিন তো পরিকীর্ণ হয়ে ছিল ওরই বহ্নিবাষ্পের মধ্যে। আমার দেহের কোষে কোষে ঐ তেজই তো শরীরী, আমার ভাবনার তরঙ্গে তরঙ্গে ঐ আলোই তো প্রবহমান। বাহিরে ঐ আলোরই বর্ণচ্ছটায় মেঘে মেঘে পত্রে পুষ্পে পৃথিবীর রূপ বিচিত্র, অন্তরে ঐ তেজই মানসভাব ধারণ করে আমাদের চিন্তায় ভাবনায় বেদনায় রাগে অনুরাগে রঞ্জিত। সেই এক জ্যোতিরই এত রঙ এত রূপ এত ভাব এত রস। ঐ যে-জ্যোতি আঙুরের গুচ্ছে গুচ্ছে এক এক চুমুক মদ হয়ে সঞ্চিত, সেই জ্যোতিই তো আমার গানে গানে সুর হয়ে পুঞ্জিত হল। এখনই আমার চিত্ত হতে এই যে চিন্তা ভাষার ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে সে কি সেই জ্যোতিরই একটি চঞ্চল চিন্ময়স্বরূপ নয়, যে-জ্যোতি বনস্পতির শাখায় শাখায় স্তব্ধ ওঙ্কার-ধ্বনির মতো সংহত হয়ে আছে।

হে সূর্য, তোমারই তেজের উৎসের কাছে পৃথিবীর অন্তর্গূঢ় প্রার্থনা ঘাস হয়ে গাছ হয়ে আকাশে উঠছে, বলছে, জয় হোক। বলছে অপাবৃণু, ঢাকা খুলে দাও। এই ঢাকা খোলাই তার প্রাণের লীলা, এই ঢাকা খোলাই তার ফুলফলের বিকাশ। অপাবৃণু, এই প্রার্থনারই নির্ঝরধারা আদিম জীবাণু থেকে যাত্রা করে আজ মানুষের মধ্যে এসে উপস্থিত, প্রাণের ঘাট পেরিয়ে চিত্তের ঘাটে পাড়ি দিয়ে চলল। আমি তোমার দিকে বাহু তুলে বলছি, হে পূষণ, হে পরিপূর্ণ, অপাবৃণু— তোমার হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ খোলো, আমার মধ্যে যে গুহাহিত সত্য তোমার মধ্যে তার অবারিত জ্যোতিঃস্বরূপ দেখে নিই। আমার পরিচয় আলোকে আলোকে উদ্‌ঘাটিত হোক।

২৬ সেপ্টেম্বর

কাল অপরাহ্ণে আচ্ছন্ন সূর্যের উদ্দেশে একটা কবিতা শুরু করেছি, আজ সকালে শেষ হল।

ঘন অশ্রুবাষ্পে ঘেরা মেঘের দুর্যোগে খড়্গ হানি
ফেলো, ফেলো টুটি।...[৫]

'লিপি' (৪ অক্টোবর ১৯২৪) কবিতা-প্রসঙ্গে 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'র এই অংশ পঠনীয় :

৫ প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩১, পৃ ২০৩

৩ অক্টোবর ১৯২৪
হারুনা-মারু জাহাজ

এখনো সূর্য ওঠে নি। আলোকের অবতরণিকা পূর্ব-আকাশে। জল স্থির হয়ে আছে সিংহবাহিনীর পায়ের তলাকার সিংহের মতো। সূর্যোদয়ের এই আগমনীর মধ্যে মজে গিয়ে আমার মুখে হঠাৎ ছন্দে-গাঁথা এই কথাটা আপনিই ভেসে উঠল :

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড় বারে বারে।

বুঝতে পারলুম, আমার কোনো একটি আগন্তুক কবিতা মনের মধ্যে এসে পৌছবার আগেই তার ধুয়োটা এসে পৌঁচেছে। এইরকমের ধুয়ো অনেক সময়ে উড়ো বীজের মতো মনে এসে পড়ে, কিন্তু সব সময়ে তাকে এমন স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যায় না।

সমুদ্রের দূরতীরে যে-ধরণী আপনার নানা-রঙ আঁচলখানি বিছিয়ে দিয়ে পুবের দিকে মুখ করে একলা বসে আছে, ছবির মতো দেখতে পেলুম তার কোলের উপর একখানি চিঠি পড়ল খসে কোন্ উপরের থেকে। সেই চিঠিখানি বুকের কাছে তুলে ধরে সে একমনে পড়তে বসে গেল ; তাল-তমালের নিবিড় বনচ্ছায়া পিছনে রইল এলিয়ে, নুয়ে-পড়া মাথার থেকে ছড়িয়ে পড়া এলোচুল।

আমার কবিতার ধুয়ো বলছে, প্রতিদিন সেই একই চিঠি, সেই একখানির বেশি আর দরকার নেই ; সে-ই ওর যথেষ্ট। সে এত বড়ো, তাই সে এত সরল। সেই একখানিতেই সব-আকাশ এমন সহজে ভরে গেছে।

ধরণী পাঠ করছে কত যুগ থেকে। সেই পাঠ-করাটা আমি মনে মনে চেয়ে দেখছি। সুরলোকের বাণী, পৃথিবীর বুকের ভিতর দিয়ে কণ্ঠের ভিতর দিয়ে রূপে রূপে বিচিত্র হয়ে উঠল। বনে বনে হল গাছ, ফুলে ফুলে হল গন্ধ, প্রাণে প্রাণে হল নিঃশ্বসিত, একটি চিঠির সেই একটিমাত্র কথা— সেই আলো, সেই সুন্দর, সেই ভীষণ ; সেই হাসির ঝিলিকে ঝিকিমিকি, সেই কান্নার কাঁপনে ছলছল।

এই চিঠি-পড়াটাই সৃষ্টির স্রোত— যে দিচ্ছে আর যে পাচ্ছে, সেই দুজনের কথা এতে মিলেছে, সেই মিলনেই রূপের ঢেউ। সেই মিলনের জায়গাটা হচ্ছে বিচ্ছেদ। কেননা দূর-নিকটের ভেদ না ঘটলে স্রোত বয় না, চিঠি চলে না। সৃষ্টি-উৎসের মুখে কী একটা কাণ্ড আছে, সে এক ধারাকে দুই ধারায় ভাগ করে। বীজ ছিল নিতান্ত এক, তাকে দ্বিধা করে দিয়ে দুখানি কচি পাতা বেরল, তখনি সেই বীজ পেল তার বাণী, নইলে সে বোবা, নইলে সে কৃপণ, আপন ঐশ্বর্য আপনি ভোগ করতে জানে না। জীব ছিল একা, বিদীর্ণ হয়ে স্ত্রী-পুরুষে সে দুই হয়ে গেল। তখনি তার সেই বিভাগের ফাঁকের মধ্যে বসল তার ডাক-বিভাগ। ডাকের পর ডাক, তার অন্ত নেই। বিচ্ছেদের এই ফাঁক একটা বড়ো সম্পদ, এ নইলে সব চুপ সব বন্ধ। এই ফাঁকটার বুকের ভিতর দিয়ে একটা অপেক্ষার ব্যথা একটা আকাঙ্ক্ষার টান টনটন করে উঠল, দিতে-চাওয়ার আর পেতে-চাওয়ার উত্তর-প্রত্যুত্তর এপারে-ওপারে চালাচালি হতে লাগল। এতেই দুলে উঠল সৃষ্টিতরঙ্গ, বিচলিত হল ঋতুপর্যায় ; কখনো বা গ্রীষ্মের তপস্যা, কখনো বর্ষার প্লাবন, কখনো বা শীতের সংকোচ, কখনো বা বসন্তের দাক্ষিণ্য। একে যদি মায়া বল তো দোষ নেই, কেননা এই চিঠি লিখনের অক্ষরে আবছায়া, ভাষায় ইশারা— এর আবির্ভাব-তিরোভাবের পুরো মানে সব সময়ে বোঝা যায় না। যাকে চোখে দেখা যায় না, সেই উত্তাপ কখন আকাশ-পথ থেকে মাটির আড়ালে চলে যায় ; মনে ভাবি একেবারেই গেল বুঝি। কিছুকাল যায়, একদিন দেখি মাটির পর্দা ফাঁক করে দিয়ে একটি অঙ্কুর উপরের দিকে কোন্-এক

আর-জন্মের চেনা-মুখ খুঁজছে। যে-উত্তাপটা ফেরার হয়েছে বলে সেদিন রব উঠল, সেই তো মাটির তলার অন্ধকারে সেঁধিয়ে কোন্ ঘুমিয়ে-পড়া বীজের দরজায় বসে বসে ঘা দিচ্ছিল। এমনি করেই কত অদৃশ্য ইশারার উত্তাপ এক হৃদয়ের থেকে আর-এক হৃদয়ের ফাঁকে ফাঁকে কোন্ চোরকোঠায় গিয়ে ঢোকে, সেখানে কার সঙ্গে কী কানাকানি করে জানি নে, তার পরে কিছুদিন বাদে একটি নবীন বাণী পর্দার বাইরে এসে বলে, "এসেছি।"

আমার সহযাত্রী বন্ধু আমার ডায়ারি পড়ে বললেন— তুমি ধরণীর চিঠি পড়ায় আর মানুষের চিঠি পড়ায় মিশিয়ে দিয়ে একটা যেন কী গোল পাকিয়েছ। কালিদাসের মেঘদূতে বিরহী-বিরহিণীর বেদনাটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তোমার এই লেখায় কোন্খানে রূপক কোন্খানে সাদা কথা বোঝা শক্ত হয়ে উঠেছে। আমি বললুম— কালিদাস যে মেঘদূত কাব্য লিখেছেন সেটাও বিশ্বের কথা। নইলে তার একপ্রান্তে নির্বাসিত যক্ষ রামগিরিতে, আর-একপ্রান্তে বিরহিণী কেন অলকাপুরীতে ? স্বর্গ-মর্তের এই বিরহই তো সকল সৃষ্টিতে। এই মন্দাক্রান্তা-ছন্দেই তো বিশ্বের গান বেজে উঠছে। বিচ্ছেদের ফাঁকের ভিতর দিয়ে অণু-পরমাণু নিত্য যে অদৃশ্য চিঠি চালাচালি করে, সেই চিঠিই সৃষ্টির বাণী। স্ত্রী-পুরুষের মাঝখানেও, চোখে-চোখেই হোক, কানে-কানেই হোক, মনে-মনেই হোক, আর কাগজে-পত্রেই হোক, যে-চিঠি চলে সেও ঐ বিশ্ব-চিঠিরই একটি বিশেষ রূপ।

"পূরবী" কবিতাটির পূর্ব পাঠ পলাতকায় "শেষ গান" নামে মুদ্রিত হইয়াছে। "পূরবী" ও "বিজয়ী" ১৩২৪ সালে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, রচনা-তারিখ পাওয়া যায় নাই।

১৩২৯ সালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরলোকগমনে কলিকাতায় যে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রনাথ "সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত" কবিতাটি তথায় পাঠ করেন। ঐ কবিতাটির 'দিয়ে গেলে তোমার সংগীত' (পৃ ১০০) স্থলে 'দিয়েছ সংগীত তব' এবং 'রেখে গেলে' স্থলে 'রেখে গেছ' পরিবর্তন কবি করিয়াছিলেন ; এই সংশোধন করিয়া কবিতাটি পড়িতে হইবে। (স্বতন্ত্র পূরবী গ্রন্থের আষাঢ় ১৩৫১ মুদ্রণে এই পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে)। কবিকৃত এইরূপ আর-একটি সংশোধন, "আনমনা" কবিতার (পৃ ১৩৬) দ্বিতীয় ছত্রে 'মালাখানি' স্থলে 'মাল্যখানি'। "বেঠিক পথের পথিক" কবিতাটি প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবার সময় এই পাঠনির্দেশ মুদ্রিত ছিল : "এই কবিতাটির অকারান্ত সমস্ত শব্দকে হসন্তরূপে গণ্য করিতে হইবে ও কবিতাটি দাদরা তালে পড়িতে হইবে।"

"তৃতীয়া" ও "বিরহিণী" কবিতা দুইটি কবির পৌত্রী শ্রীমতী নন্দিনীর উদ্দেশে রচিত ; রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডের প্রারম্ভে নন্দিনীর চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির সাহায্যে কোনো কোনো কবিতার তারিখ ও পাঠ সংশোধিত হইয়াছে। পাণ্ডুলিপির কোনো কোনো বর্জিত অংশ অতঃপর সংকলিত হইল।—

"সাবিত্রী", ষষ্ঠ স্তবক 'চিহ্ন নাহি রাখে'র পর

তোমার উৎসবধারা আসা-যাওয়া দু-কূল ধ্বনিয়া
নিত্য ছুটে যায়।
তোমার নর্তকী-দল বিরহমিলন ঝঞ্ঝনিয়া
খঞ্জনী বাজায়।
স্মৃতি-বিস্মৃতির ছন্দ-আন্দোলনে উত্তালছন্দিত
মুক্তি আর বন্ধ দোঁহে নৃত্য করে নূপুর-মন্দ্রিত,
দুঃখ আর সুখ।

বিশ্বের হৃৎপিণ্ড সেই দ্বন্দ্ববেগে ব্যথিত স্পন্দিত,
করে ধুকধুক।

এই ভালো, এই মন্দ, এই দ্বন্দ্ব আঘাতে সংঘাতে
নিক মোরে টেনে।
আলো-আঁধারের দোলে পুনঃপুনঃ আশা-আশঙ্কাতে
যাক মোরে হেনে।
সেই তরঙ্গের ঊর্ধ্বে দিক দেখা, হে রুদ্র নিষ্ঠুর,
জ্যোতিঃশতদল তব স্থির দীপ্ত আসন বিষ্ণুর,
অম্লান-মহিমা।
সব দ্বন্দ্ব মগ্ন করে গন্ধ তার আনন্দের সুর
নাহি তার সীমা।

"মুক্তি", প্রথম স্তবক 'সেথা মোর চিরন্তন শেষ'-এর পর

পথে যেতে যদি কভু সাথি বলে চিনি বিশ্বপতি,
তোমারে কোথাও—
প্রভু, যদি কভু তব প্রভুত্বের দাবি মোর প্রতি
ছেড়ে দিতে চাও!
তা হলে আসুক সন্ধ্যা বিরামের মহাসিন্ধুতটে,
শান্তিবারি পূর্ণ হোক গোধূলির স্বর্ণময় ঘটে ;
শিশুর মতন তুমি এঁকে দাও আকাশের পটে
আনমনে যাহা-তাহা ছবি।
শিশুর মতন বসি একাসনে তোমা সনে কবি।

"দুঃখসম্পদ", 'চিরদিন গোপনে বিরাজে'র পর

যখনি কুঁড়ির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেয় তাপে,
তখনি তো জানি, ফুল চিরদিন ছিল তারি চাপে।
দুঃখ চেয়ে আরো বড়ো না থাকিত কিছু
জীবনের প্রতিদিন হত মাথা নিচু,
তবে জীবনের অবসান
মৃত্যুর বিদ্রূপহাস্যে আনিত চরম অসম্মান।

"কিশোর প্রেম", তৃতীয় স্তবক 'অজানা কোন্ ভাষা'র পর

তার পরে সেই তীরে বসে কত কাঁদন কাঁদা।
ওপার-পানে যাবার লাগি
আঁধার রাতে ছিলাম জাগি,
কে জানিত তটচ্ছায়ায় তরী ছিল বাঁধা,
মিছে কত কাঁদন কাঁদা।

"আনমনা" ও "বদল" কবিতা দুইটির গীত-রূপ প্রথম-সংস্করণ তৃতীয়-খণ্ড গীতবিতানে দ্রষ্টব্য। গান দুইটির প্রথম ছত্র যথাক্রমে "আনমনা, আনমনা" ও "তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার"।

লেখন

লেখন ১৩৩৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

লেখন

যখন চীনে জাপানে গিয়েছিলেম প্রায় প্রতিদিনই স্বাক্ষরলিপির দাবি মেটাতে হত। কাগজে, রেশমের কাপড়ে, পাখায় অনেক লিখতে হয়েছে। সেখানে তারা আমার বাংলা লেখাই চেয়েছিল, কারণ বাংলাতে এক দিকে আমার, আবার আর-এক দিকে সমস্ত বাঙালি জাতিরই স্বাক্ষর। এমনি করে যখন-তখন পথে-ঘাটে যেখানে-সেখানে দু-চার লাইন কবিতা লেখা আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। এই লেখাতে আমি আনন্দও পেতুম। দু-চারটি বাক্যের মধ্যে এক-একটি ভাবকে নিবিষ্ট করে দিয়ে তার যে একটি বাহুল্যবর্জিত রূপ প্রকাশ পেত তা আমার কাছে বড়ো লেখার চেয়ে অনেক সময় আরো বেশি আদর পেয়েছে। আমার নিজের বিশ্বাস বড়ো বড়ো কবিতা পড়া আমাদের অভ্যাস বলেই কবিতার আয়তন কম হলে তাকে কবিতা বলে উপলব্ধি করতে আমাদের বাধে। অতিভোজনে যারা অভ্যস্ত, জঠরের সমস্ত জায়গাটা বোঝাই না হলে আহারের আনন্দ তাদের অসম্পূর্ণ থাকে ; আহার্যের শ্রেষ্ঠতা তাদের কাছে খাটো হয়ে যায় আহারের পরিমাণ পরিমিত হওয়াতেই। আমাদের দেশে পাঠকদের মধ্যে আয়তনের উপাসক অনেক আছে— সাহিত্য সম্বন্ধেও তারা বলে, নাল্পে সুখমস্তি— নাট্য সম্বন্ধেও তারা রাত্রি তিনটে পর্যন্ত অভিনয় দেখার দ্বারা টিকিট কেনার সার্থকতা বিচার করে।

জাপানে ছোটো কাব্যের অমর্যাদা একেবারেই নেই। ছোটোর মধ্যে বড়োকে দেখতে পাওয়ার সাধনা তাদের— কেননা তারা জাত-আর্টিস্ট। সৌন্দর্য-বস্তুকে তারা গজের মাপে বা সেরের ওজনে হিসাব করবার কথা মনেই করতে পারে না। সেইজন্যে জাপানে যখন আমার কাছে কেউ কবিতা দাবি করেছে, দুটি-চারটি লাইন দিতে আমি কুণ্ঠিত হই নি। তার কিছুকাল পূর্বেই আমি যখন বাংলাদেশে গীতাঞ্জলি প্রভৃতি গান লিখছিলুম, তখন আমার অনেক পাঠকই লাইন গণনা করে আমার শক্তির কার্পণ্যে হতাশ হয়েছিলেন— এখনো সে-দলের লোকের অভাব নেই।

এইরকম ছোটো ছোটো লেখায় একবার আমার কলম যখন রস পেতে লাগল তখন আমি অনুরোধনিরপেক্ষ হয়েও খাতা টেনে নিয়ে আপন মনে যা-তা লিখেছি এবং সেইসঙ্গে পাঠকদের মন ঠাণ্ডা করবার জন্যে বিনয় করে বলেছি :

> আমার লিখন ফুটে পথধারে ক্ষণিক কালের ফুলে;
> চলিতে চলিতে দেখে যারা তারে চলিতে চলিতে ভুলে।

কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে এটা ক্ষণিক কালের ফুলের দোষ নয়, চলতে চলতে দেখারই দোষ। যে-জিনিসটা বহরে বড়ো নয় তাকে আমরা দাঁড়িয়ে দেখি নে, যদি দেখতুম তবে মেঠো ফুল দেখে খুশি হলেও লজ্জার কারণ থাকত না। তার চেয়ে কুমড়োফুল যে রূপে শ্রেষ্ঠ তা নাও হতে পারে।

গেল বারে যখন ইটালিতে গিয়েছিলুম, তখন স্বাক্ষরলিপির খাতায় অনেক লিখতে হয়েছিল। লেখা যাঁরা চেয়েছিলেন তাঁদের অনেকেরই ছিল ইংরেজি লেখারই দাবি। এবারেও লিখতে লিখতে কতক তাঁদের খাতায় কতক আমার নিজের খাতায় অনেকগুলি ঐরকম ছোটো ছোটো লেখা জমা হয়ে উঠল। এইরকম অনেক সময়ই অনুরোধের খাতিরে লেখা শুরু হয়, তার পরে ঝোঁক চেপে গেলে আর অনুরোধের দরকার থাকে না।

জার্মানিতে গিয়ে দেখা গেল, এক উপায় বেরিয়েছে তাতে হাতের অক্ষর থেকেই ছাপানো

চলে। বিশেষ কালি দিয়ে লিখতে হয় এল্যুমিনিয়মের পাতের উপরে, তার থেকে বিশেষ ছাপার যন্ত্রে ছাপিয়ে নিলেই কম্পোজিটারের শরণাপন্ন হবার দরকার হয় না।

তখন ভাবলেম, ছোটো লেখাকে যাঁরা সাহিত্য হিসাবে অনাদর করেন তাঁরা কবির স্বাক্ষর হিসাবে হয়তো সেগুলোকে গ্রহণ করতেও পারেন। তখন শরীর যথেষ্ট অসুস্থ, সেই কারণে সময় যথেষ্ট হাতে ছিল, সেই সুযোগে ইংরেজি বাংলা এই ছুটকো লেখাগুলি এল্যুমিনিয়ম পাতের উপর লিপিবদ্ধ করতে বসলুম।

ইতিমধ্যে ঘটনাক্রমে আমার কোনো তরুণ বন্ধু বললেন, "আপনার কিছুকাল পূর্বেকার লেখা কয়েকটি ছোটো ছোটো কবিতা আছে। সেইগুলিকে এই উপলক্ষে যাতে রক্ষা করা হয় এই আমার একান্ত অনুরোধ।"

আমার ভোলবার শক্তি অসামান্য এবং নিজের পূর্বের লেখার প্রতি প্রায়ই আমার মনে একটা অহেতুক বিরাগ জন্মায়। এইজন্যই তরুণ লেখকরা সাহিত্যিক-পদবী থেকে আমাকে যখন বরখাস্ত করবার জন্যে কানাকানি করতে থাকেন তখন আমার মন আমাকে পরামর্শ দেয় যে, "আগেভাগে নিজেই তুমি মানে মানে রেজিগনেশন-পত্র পাঠিয়ে যৎসামান্য কিছু পেনসনের দাবি রেখে দাও।" এটা যে সম্ভব হয় তার কারণ আমার পূর্বেকার লেখাগুলো আমি যে-পরিমাণে ভুলি সেই পরিমাণেই মনে হয় তারা ভোলবারই যোগ্য।

তাই প্রস্তুত হয়েছিলেম, আমার বন্ধু পুরোনো ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে উঞ্ছস্বরূপ যা-কিছু সংগ্রহ করে আনবেন আবার তাদেরকে পুরোনোর তমিস্রলোকে বৈতরণী পার করে ফেরত পাঠাব।

গুটিপাঁচেক ছোটো কবিতা তিনি আমার সম্মুখে উপস্থিত করলেন। আমি বললেম, "কিছুতেই মনে পড়বে না এগুলি আমার লেখা," তিনি জোর করেই বললেন, "কোনো সংশয় নেই।"

আমার রচনা-সম্বন্ধে আমার নিজের সাক্ষ্যকে সর্বদাই অবজ্ঞা করা হয়। আমার গানে আমি সুর দিয়ে থাকি। যাকে হাতের কাছে পাই তাকে সেই সদ্যোজাত সুর শিখিয়ে দিই। তখন থেকে সে-গানের সুরগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার ছাত্রের। তার পর আমি যদি গাইতে যাই তারা এ কথা বলতে সংকোচমাত্র করে না যে, আমি ভুল করছি। এ সম্বন্ধে তাদের শাসন আমাকে বার বার স্বীকার করে নিতে হয়।

কবিতা কয়টি যে আমারই সেও আমি স্বীকার করে নিলেম। পড়ে বিশেষ তৃপ্তি বোধ হল— মনে হল ভালোই লিখেছি। বিস্মরণশক্তির প্রবলতাবশত নিজের কবিতা থেকে নিজের মন যখন দূরে সরে যায় তখন সেই কবিতাকে অপর সাধারণ পাঠকের মতোই নিরাসক্তভাবে আমি প্রশংসা এবং নিন্দাও করে থাকি। নিজের পুরোনো লেখা নিয়ে বিস্ময় বোধ করতে বা স্বীকার করতে আমার সংকোচ হয় না— কেননা তার সম্বন্ধে আমার অহমিকার ধার ক্ষয় হয়ে যায়। পড়ে দেখলাম :

> তোমারে ভুলিতে মোর হল না যে মতি,
> এ জগতে কারও তাহে নাই কোনো ক্ষতি।
> আমি তাহে দীন নহি, তুমি নহ ঋণী,
> দেবতার অংশ, তাও পাইবেন তিনি।

নিজের লেখা জেনেও আমাকে স্বীকার করতে হল যে, ছোটোর মধ্যে এই কবিতাটি সম্পূর্ণ ভরে উঠেছে। পেটুকচিত্ত পাঠকের পেট ভরাবার জন্যে একে পঁচিশ-ত্রিশ লাইন পর্যন্ত বাড়িয়ে তোলা যেতে পারত— এমন-কি, একে বড়ো আকারে লেখাই এর চেয়ে হত সহজ। কিন্তু লোভে পড়ে একে বাড়াতে গেলেই একে কমানো হত। তাই নিজের অলুব্ধ কবিবুদ্ধির প্রশংসাই করলেম।

তার পরে আর-একটা কবিতা :

ভোর হতে নীলাকাশ ঢাকে কালো মেঘে,
ভিজে ভিজে এলোমেলো বায়ু বহে বেগে।
কিছুই নাহি যে হায় এ বুকের কাছে—
যা-কিছু আকাশে আর বাতাসেতে আছে।

আবার বললেম, শাবাশ। হৃদয়ের ভিতরকার শূন্যতা বাইরের আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ করে হাহাকার করে উঠছে এ কথাটা এত সহজে এমন সম্পূর্ণ করে বাংলা সাহিত্যে আর কে বলেছে ? ওর উপরে আর একটি কথাও যোগ করবার জো নেই। ক্ষীণদৃষ্টি পাঠক এতটুকু ছোটো কবিতার সৌন্দর্য দেখতে পাবে না জেনেও আমি যে নিজের লেখনীকে সংযত করেছিলেম এজন্যে নিজেকে মনে মনে বলতে হল ধন্য।

তার পরে আর-একটি কবিতা :

আকাশে গহন মেঘে গভীর গর্জন,
শ্রাবণের ধারাপাতে প্লাবিত ভুবন।
কেন এতটুকু নামে সোহাগের ভরে
ডাকিলে আমারে তুমি ? পূর্ণ নাম ধরে
আজি ডাকিবার দিন, এ হেন সময়
শরম সোহাগ হাসি কৌতুকের নয়।
আঁধার অম্বর পৃথ্বী পথচিহ্নহীন,
এল চিরজীবনের পরিচয়-দিন।

'মানসী' লেখবার যুগে— সে আজকের কথা নয়— এই ভাবের দুই-একটা কবিতা লিখেছিলেম বলে মনে পড়ে। কিন্তু কোন্ অণিমাসিদ্ধি দ্বারা ভাবটি তনু আকারেই সম্পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

আর-একটি ছোটো কবিতা :

প্রভু, তুমি দিয়েছ যে-ভার
যদি তাহা মাথা হতে এই জীবনের পথে
নামাইয়া রাখি বার বার
জেনো তা বিদ্রোহ নয়, ক্ষীণ শ্রান্ত এ হৃদয়,
বলহীন পরান আমার॥

লেখাটি একেবারেই নিরাভরণ বলেই এর ভিতরকার বেদনা যেন বৃষ্টিক্লান্ত জুঁইফুলটির মতো ফুটে উঠেছে।

আমি বিশেষ তৃপ্তি এবং গর্বের সঙ্গেই এই কবিতা কয়টি এল্যুমিনিয়মের পাতের উপর স্বহস্তে নকল করে নিলেম। যথাসময়ে আমার অন্যান্য কবিতিকার সঙ্গে এ-কয়টিও আমার লেখন-নামধারী গ্রন্থে প্রকাশিত হয়ে গেল।

আজ প্রায় মাসখানেক পূর্বে কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর কাছে 'লেখন' একখণ্ড পাঠিয়ে দিয়েছিলেম। তিনি যে-পত্র লিখেছেন সেটা উদ্ধৃত করে দিই :

লেখন পড়লাম। এর কতকগুলি ছোটো ছোটো কবিতা বড়ো চমৎকার— দু-চার ছত্রে সম্পূর্ণ। কিন্তু যেন এক-একটি সু-সংস্কৃত মণি, আলো ঠিকরে পড়ছে। লেখনে দেখলাম ২৩-এর পৃষ্ঠায় আমার চারটি কবিতা সম্পূর্ণ গেছে, আর একটির প্রথম দু লাইন। যথা :

১। তোমারে ভুলিতে মোর হল নাকো মতি
২। ভোর হতে নীলাকাশ ঢাকা ঘন মেঘে
৩। আকাশে গহন মেঘে গভীর গর্জন
৪। প্রভু, তুমি দিয়েছ যে ভার
৫। শুধু এইটুকু সুখ অতি সুকুমার (প্রথম দু লাইন।)[৬]

সবগুলিই 'পত্রলেখা'য় ছাপা হয়ে গিয়েছে, ১৯০৮ সালে। তবে এ নিয়ে আর কাউকে যেন কিছু বলবেন না।

তখন আমার মনে পড়ল যখন 'পত্রলেখা'র পাণ্ডুলিপি প্রথম আমি পড়ে দেখি তখন প্রিয়ম্বদার বিরলভূষণ বাহুল্যবর্জিত কবিতার আমি যথেষ্ট সাধুবাদ দিয়েছি। বোধ করি সেই কারণেই কবিতাগুলি যথোচিত সম্মান লাভ করে নি। অন্তত 'পত্রলেখা'র কয়েকটি কবিতা সম্বন্ধে আমার ভ্রান্তিকে নিজের হাতের অক্ষরে আমার আপন রচনার মধ্যে স্থান দিয়ে তাঁর কবিতার প্রতি সমাদর প্রকাশ করতে পেরেছি বলে খুশি হলেম।

—প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৫
লেখন, রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংস্করণ, ১৩৬৮

এই প্রসঙ্গে এ কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, "এই লেখনগুলি শুরু" "চীনে জাপানে" হয় নাই, চীনে জাপানে যাইবার পূর্বেও কবিকে "স্বাক্ষরলিপির দাবি" মিটাইতে হইয়াছে, এবং লেখনের সব কবিতাই এইরূপ দাবি মিটাইবার জন্য রচিত নহে ; ২২৪ পৃষ্ঠার 'একা একা শূন্য মাত্র নাহি অবলম্ব' হইতে ২২৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অধিকাংশ কবিতা ১৯১২-১৩ সালে বিদেশভ্রমণের সময় জাহাজ, আরোগ্যশালা, নানা স্থানে রচিত। এই কবিতাগুচ্ছ 'দ্বিপদী' নামে ১৩২০ সালের প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়।

লেখন আদ্যোপান্ত কবির হস্তাক্ষরের প্রতিলিপিরূপে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহার নিদর্শনমাত্রস্বরূপ প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র, ভূমিকা, প্রথম পৃষ্ঠা ও শেষ পৃষ্ঠার প্রতিলিপি রচনাবলী সংস্করণে মুদ্রিত হইল। লেখনে ইংরেজি কবিতাও মুদ্রিত হইয়াছিল, রচনাবলী-সংস্করণে লেখনের প্রথম পৃষ্ঠায় তাহার নিদর্শন রহিয়াছে।

গুরু

গুরু ১৩২৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই নাটকটি অচলায়তনের "কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত এবং লঘুতর" আকার। এই রূপান্তরে রবীন্দ্রনাথ অচলায়তনের অনেক অংশ বর্জন করেন এবং কয়েকটি নূতন অংশ যোগ করেন।

বর্তমান সংস্করণের পাঠ প্রস্তুত করবার কাজে সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে গুরুর পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করিবার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে।

গুরু প্রসঙ্গে অচলায়তনের গ্রন্থপরিচয় (রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড ; সুলভ, ষষ্ঠ খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

৬ এই পাঁচটি কবিতাই রবীন্দ্র-রচনাবলীতে বর্জিত। পঞ্চম কবিতাটির শেষ দুই ছত্র :

স্থির হয়ে সহ্য করো পরিপূর্ণ ক্ষতি,
শেষটুকু নিয়ে যাক নিষ্ঠুর নিয়তি।

অরূপরতন

অরূপরতন ১৩২৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। "এই নাট্য-রূপকটি রাজা নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, নূতন করিয়া পুনর্লিখিত।" অভিনয় উপলক্ষে ১৩৪২ সালে অরূপরতনের পুনঃপরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়— রবীন্দ্র-রচনাবলীতে এই সংস্করণের পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে।

অরূপরতন প্রসঙ্গে রাজার গ্রন্থপরিচয় (রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড ; সুলভ, পঞ্চম খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

ঋণশোধ

ঋণশোধ ১৩২৮ (১৯২১) সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ইহা শারদোৎসবের রূপান্তর।

১৩২৮ সালের আশ্বিনে শান্তিনিকেতনে অভিনয়োপলক্ষে ইহাতে কয়েকটি নূতন অংশ যোজিত হয়, অভিনয়সৌকর্যের জন্য কোনো কোনো অংশ বর্জিত হয় ; এই পরিবর্তনগুলি কোথাও মুদ্রিত আকারে নাই। প্রমথনাথ বিশী এই অভিনয়ে শ্রুতিকার ছিলেন, তাঁহার সৌজন্যে অভিনয়ের সময়ে তাঁহার যে পুস্তকখানি ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা দেখিবার সুযোগ হইয়াছে ; অভিনয়-উপলক্ষে নূতন-লিখিত বলিয়া নির্দিষ্ট অংশগুলি উহা হইতে নীচে মুদ্রিত হইল :

৭ পৃ ৩০৭, 'সকল ছেলে জুটি'র পরে বসিবে। তুলনীয় পৃ ৩১১।

[প্রথম বালক।] ও ভাই, ও কে আসছে?
[দ্বিতীয় বালক।] ও পরদেশী।

বিজয়াদিত্যের প্রবেশ

বিজয়াদিত্য। না ভাই, আমি সবদেশী।

ছেলেরা। তুমি কী কর?

বিজয়াদিত্য। আমি সব জায়গাতেই আপন দেশ দেখে বেড়াই।

[ছেলেরা।] তার মানে কী?

বিজয়াদিত্য। দেখো না, রাজাগুলো দেশ পাবার জন্যে লড়াই করে মরে। তার মানে, পৃথিবীর রাজা তবু নিজের দেশ পায় নি।

ছেলেরা। তুমি পেয়েছ?

বিজয়াদিত্য। পেয়েছি কি না পরীক্ষা করতে বেরিয়েছি।

ছেলেরা। বেশ মজা, আমরাও সবদেশী হব। তোমাকে আমরা ছাড়ব না।

বিজয়াদিত্য। তোমরা ছাড়লে আমিই কি তোমাদের ছাড়ব? কী করবে আমাকে নিয়ে?

ছেলেরা। আজ আমাদের ছুটি, তোমাকে নিয়ে আজ তোমার সেই সবদেশে বেরিয়ে যাব।

বিজয়াদিত্য। আচ্ছা বেশ, তা হলে আমি আমার সবদেশীর সাজ পরে আসি গে।

[প্রস্থান

৭ এই উদ্ধৃতাংশের সর্বত্র পত্রাঙ্কদ্বারা রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান (সুলভ, সপ্তম) খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা নির্দেশ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় দলের প্রবেশ

পৃ ৩১০, সপ্তবিংশ ছত্র, 'ঝগড়া না, গান ধর্।' বর্জিত। তাহার পরে বসিবে

ছেলেরা। ঐ যে সবদেশী এসেছে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

পৃ ৩১৪, একাদশ-দ্বাদশ ছত্র, 'নৌকো বাচ করতে যাব। বেশ মজা!' ইহার পরে বসিবে

প্রথম বালক। কিন্তু লেখা শেষ করতে করতে আমাদের ছুটি ফুরিয়ে যাবে।
ছেলেরা। এই লেখার খেলা কিন্তু আর ভালো লাগছে না।

পৃ ৩১৫, নবম ছত্র, 'উপনন্দ। আমাকে বাঁচালে। এখন পুঁথিগুলি ফিরে দাও।' ইহার পরে বসিবে

তোমরা অন্য খেলা খেলো গে।
সন্ন্যাসী। গান
'কোন্ খেলা যে খেলব কখন ভাবি বসে সেই কথাটাই' ইত্যাদি

পৃ· ৩১৫, ত্রয়োদশ ছত্র, 'সকলে। না, সে চেঁচায়।' ইহার পরে বসিবে

তুমি কিন্তু যেয়ো না সন্ন্যাসী— আমরা কোপাই নদীর ধারে ছুটোছুটি করে আবার এখনি চলে আসছি।

[প্রস্থান

পৃ ৩১৮, উনবিংশ ছত্র, 'রাত্রে ঘুমোতে পারি নে [প্রস্থান।' ইহার পরে বসিবে

সন্ন্যাসী। ঐ লক্ষেশ্বরের কথাগুলি…[৮] শরতের আলোর উপর ওর হিসাবের খাতার কালো ছাপ একেবারে লেপে দিয়ে যায়।

ঠাকুরদা। আর ওর আওয়াজটা এমন যে আশ্বিনে হাওয়ার শ্বাসরোধ হতে থাকে।

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, তোমার গান দিয়ে হাওয়াটাকে শোধন করে বসিয়ে দিয়ে যাও।

ঠাকুরদা। গান
'শরৎ আলোর কমলবনে' ইত্যাদি

[লক্ষেশ্বরকে আসিতে দেখিয়া দ্রুত প্রস্থান

পৃ ৩২২, শেষ হইতে অষ্টম ছত্রে 'ওহে উদাসী, তুমি বল কী?' বর্জিত; তাহার পরে নিম্নমুদ্রিত ছত্র বসিবে

এমনি করে চক্র চলেছে, পাচ্ছি আর দিচ্ছি।

পৃ ৩২২-৩২৩, শেখরের গানও বর্জিত।

পৃ ৩২৫, চতুর্থ ছত্র বর্জিত; তৎপরিবর্তে বসিবে

সন্ন্যাসী। আচ্ছা এক কাজ করো, কাশবন থেকে কাশ তুলে আনো আর আঁচল ভরে আনো ধানের মঞ্জরী। শিউলিফুলের মালা তোমাদের তো গাঁথাই আছে। সেগুলো সব নিয়ে এসো।

পৃ ৩২৫, ত্রয়োবিংশ ছত্রের অনুবৃত্তি

ওরে ভাই তার একটা গান শুনবি?

৮ পাণ্ডুলিপি নষ্ট হইয়াছে।

ওরে রে লক্ষ্মণ, এ কী কুলক্ষণ
বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ
(ভাই) জানকীরে দিয়ে এসো বন।

পৃ ৩২৭, শেষ ছত্র, 'এবার বরণের গানটা ধরিয়ে দিই। গাও।' ইহার পরিবর্তে
ঠাকুরদা, এবার সুরে সুর মেলাবার রঙে রঙ মেলাবার গানটা ধরো।

গান

'সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে' ইত্যাদি।

এই নূতন অংশগুলি সন্নিবেশের প্রয়োজনে, এবং সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার জন্য কোনো কোনো অংশ বর্জিতও হইয়াছিল ; পাদটীকায় সেই বর্জিত অংশগুলি নির্দিষ্ট হইল।[১] এইরূপ বর্জনের পর সংগতিরক্ষার্থ, কোনো কোনো স্থলে সংলাপ বর্জন না করিয়াও বক্তা-পরিবর্তনের নির্দেশ বইখানিতে আছে ; যেমন শেখরের উক্তি অন্যের মুখে বসানো হইয়াছে।

ঋণশোধের সহিত শারদোৎসবের প্রধান পার্থক্য, ঋণশোধে ভূমিকা ও শেখরচরিত্রের সন্নিবেশ।

ঋণশোধ প্রসঙ্গে শারদোৎসবের গ্রন্থপরিচয় (রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড ; সুলভ,চতুর্থ খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

১ পৃ ৩০৯-১০ 'শেখর কবির প্রবেশ' হইতে 'অভ্যেস করেছে [প্রস্থান।' পর্যন্ত বর্জিত।

পৃ ৩১১-১২ 'ঠাকুরদা, ঐ দেখো' হইতে 'এ চমৎকার খেলা' পর্যন্ত বর্জিত।

৩১২ পৃষ্ঠায় কবিশেখরের কেন যে মন ভোলে, গানটিতে 'সে তো কানে আনে না'র পর, 'ছেলেরা। পরদেশী তোমার সঙ্গী কি কেউ নেই।' এই বাক্যটি বসাইবার, ও গানের পরবর্তী দুই ছত্র 'আমার খেয়া গেল পারে, আমি রইনু নদীর ধারে।' এইরূপ পরিবর্তনের নির্দেশ আলোচ্য গ্রন্থখানিতে রহিয়াছে। সম্ভবত অন্য কোনো বারের অভিনয়ে, যে বারে এই বর্জিত বলিয়া নির্দিষ্ট অংশ অভিনীত হইয়াছিল, তাহাতে এই বাক্যটি ব্যবহৃত হইয়াছিল।

পৃ ৩১৪-১৫ 'ছেলেরা। এই যে পরদেশী, আমাদের পরদেশী' হইতে 'সকলে। আজ এই পর্যন্ত থাক্।' পর্যন্ত বর্জিত।

পৃ ৩১৫ 'শেখর। তার মানে' হইতে '[বালকদলের সঙ্গে শেখরের প্রস্থান।' পর্যন্ত বর্জিত।

পৃ ৩১৬-১৭ 'শেখর ও রাজা সোমপালের প্রবেশ' হইতে 'ওঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।' পর্যন্ত বর্জিত।

পৃ ৩১৮ 'রাজদূতের প্রবেশ' হইতে 'চরণ ছাড়ছি নে [প্রস্থান।' পর্যন্ত বর্জিত।

পৃ ৩১৯ ত্রয়োবিংশ-চতুর্বিংশ ছত্র, 'এ নইলে··· জো নেই।' বর্জিত।

পৃ ৩১৯ বন্দিগণের গান বর্জিত।

পৃ ৩২২ 'ঠাকুরদাদা ও শেখরের প্রবেশ' এর পরিবর্তে 'ঠাকুরদাদার প্রবেশ।'

পৃ ৩২৩ দ্বাদশ-চতুর্দশ ছত্র, 'উপনন্দকে তুমি দেখেছ' হইতে 'ওর সব খবর পেলুম।' পর্যন্ত বর্জিত।

পৃ ৩২৪ প্রথম-ষষ্ঠ ছত্র, 'লক্ষেশ্বর। এই যে, এ লোকটি' হইতে 'আদায় না করে ছাড়ছি নে।' পর্যন্ত বর্জিত।

'কিন্তু এতক্ষণ তোমরা তিনজনে'র পরিবর্তে 'এতক্ষণ তোমরা দুজনে' হইবে।

পৃ ৩২৭ 'লেগেছে অমল ধবল পালে'র পরিবর্তে 'হৃদয়ে ছিলে জেগে।'

পৃ ৩২৮ 'আমার নয়ন-ভুলানো এলে' গানটি বর্জিত।

মুক্তধারা

মুক্তধারা ১৩২৯ সালের বৈশাখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ঐ মাসের প্রবাসীতে নাটকটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

কালিদাস নাগকে লিখিত একটি চিঠিতে (২১ বৈশাখ ১৩২৯) রবীন্দ্রনাথ মুক্তধারা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

আমি 'মুক্তধারা' বলে একটি ছোটো নাটক লিখেছি, এতদিনে প্রবাসীতে সেটা পড়ে থাকবে। তার ইংরেজি অনুবাদ মডার্ন রিভিউতে বেরিয়েছে। তোমার চিঠিতে তুমি machine সম্বন্ধে যে আলোচনার কথা লিখেছ সেই machine এই নাটকের একটা অংশ। এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করছে, অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্রকে অভিজিৎ ভেঙেছে, যন্ত্র দিয়ে নয়। যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে— কেননা যে-মনুষ্যত্বকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে— তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে। আমার নাটকের অভিজিৎ হচ্ছে সেই মারনেওয়ালার ভিতরকার পীড়িত মানুষ। নিজের যন্ত্রের হাত থেকে নিজে মুক্ত হবার জন্যে সে প্রাণ দিয়েছে। আর ধনঞ্জয় হচ্ছে যন্ত্রের হাতে মারখানেওয়ালার ভিতরকার মানুষ। সে বলছে, "আমি মারের উপরে ; মার আমাতে এসে পৌঁছয় না— আমি মারকে না-লাগা দিয়ে জিতব, আমি মারকে না-মার দিয়ে ঠেকাব।" যাকে আঘাত করা হচ্ছে সে সেই আঘাতের দ্বারাই আঘাতের অতীত হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু যে-মানুষ আঘাত করছে আত্মার ট্রাজেডি তারই— মুক্তির সাধনা তাকেই করতে হবে, যন্ত্রকে প্রাণ দিয়ে ভাঙবার ভার তারই হাতে। পৃথিবীতে যন্ত্রী বলছে, "মার লাগিয়ে জয়ী হব।" পৃথিবীতে মন্ত্রী বলছে, "হে মন, মারকে ছাড়িয়ে উঠে জয়ী হও।" আর নিজের যন্ত্রে নিজে বন্দী মানুষটি বলছে, "প্রাণের দ্বারা যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে— মুক্তি দিতে হবে।" যন্ত্রী হচ্ছে বিভূতি, মন্ত্রী হচ্ছে ধনঞ্জয়, আর মানুষ হচ্ছে অভিজিৎ।

'মুক্তধারা'র পূর্বকল্পিত নাম ছিল 'পথ' ; শ্রীমতী রানু অধিকারীকে একটি চিঠিতে (৪ মাঘ ১৩২৮) রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

আমি সমস্ত সপ্তাহ ধরে একটা নাটক লিখছিলুম— শেষ হয়ে গেছে, তাই আজ আমার ছুটি। এ নাটকটা 'প্রায়শ্চিত্ত' নয়, এর নাম 'পথ'। এতে কেবল প্রায়শ্চিত্ত নাটকের সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে, আর কেউ নেই— সে গল্পের কিছু এতে নেই, সুরমাকে এতে পাবে না।[১০]

চার অধ্যায়

চার অধ্যায় ১৩৪১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

চার অধ্যায়ের প্রথম সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের নিম্নমুদ্রিত ভূমিকাটি প্রকাশিত হইয়াছিল :

আভাস

একদা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় যখন Twentieth Century মাসিকপত্রের সম্পাদনায় নিযুক্ত তখন সেই পত্রে তিনি আমার নূতন-প্রকাশিত নৈবেদ্য গ্রন্থের এক সমালোচনা লেখেন। তৎপূর্বে আমার কোনো কাব্যের এমন অকুণ্ঠিত প্রশংসাবাদ কোথাও দেখি নি। সেই উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, অপর পক্ষে, বৈদান্তিক— তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রভাবশালী। অধ্যাত্মবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি আমাকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট করে।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় তাঁকেই আমার প্রধান সহযোগী পাই। এই

১০ 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', পত্র ৪৩

উপলক্ষে কতদিন আশ্রমের সংলগ্ন গ্রামপথে পদচারণ করতে করতে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনাকালে যে-সকল দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থিমোচন করতেন আজও তা মনে করে বিস্মিত হই।

এমন সময়ে লর্ড কর্জন বঙ্গব্যবচ্ছেদ-ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প হলেন। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রথম হিন্দু-মুসলমান-বিচ্ছেদের রক্তবর্ণ রেখাপাত হল। এই বিচ্ছেদ ক্রমশ আমাদের ভাষা সাহিত্য আমাদের সংস্কৃতিকে খণ্ডিত করবে, সমস্ত বাঙালিজাতকে কৃশ করে দেবে এই আশঙ্কা দেশকে প্রবল উদ্‌বেগে আলোড়িত করে দিল। বৈধ আন্দোলনের পন্থায় ফল দেখা গেল না। লর্ড মর্‌লি বললেন, যা স্থির হয়ে গেছে তাকে অস্থির করা চলবে না। সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন 'সন্ধ্যা' কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলে। এই কাগজেই প্রথমে দেখা গেল বাংলাদেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকাপন্থার সূচনা। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এতবড়ো প্রচণ্ড পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল।

এই সময়ে দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। মনে করেছিলুম হয়তো আমার সঙ্গে তাঁর রাষ্ট্র-আন্দোলন প্রণালীর প্রভেদ অনুভব করে আমার প্রতি তিনি বিমুখ হয়েছিলেন অবজ্ঞাবশতই।

নানা দিকে নানা উৎপাতের উপসর্গ দেখা দিতে লাগল। সেই অন্ধ উন্মত্ততার দিনে একদিন যখন জোড়াসাঁকোয় তেতালার ঘরে একলা বসে ছিলেম হঠাৎ এলেন উপাধ্যায়। কথাবার্তার মধ্যে আমাদের সেই পূর্বকালের আলোচনার প্রসঙ্গও কিছু উঠেছিল। আলাপের শেষে তিনি বিদায় নিয়ে উঠলেন। চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, "রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে।" এই বলেই আর অপেক্ষা করলেন না, গেলেন চলে। স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, এই মর্মান্তিক কথাটি বলবার জন্যেই তাঁর আসা। তখন কর্মজাল জড়িয়ে ধরেছে, নিষ্কৃতির উপায় ছিল না।

এই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা ও শেষ কথা।

উপন্যাসের আরম্ভে এই ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য।

চার অধ্যায়, বিশেষত উহার "আভাস" বা ভূমিকা সাময়িক পত্রে তীব্রভাবে সমালোচিত হয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ১৩৪২ সালের বৈশাখের প্রবাসীতে যে প্রত্যুত্তর প্রকাশ করেন, এস্থলে তাহা মুদ্রিত হইল :

চার অধ্যায় সম্বন্ধে কৈফিয়ত

আমার চার অধ্যায় গল্পটি সম্বন্ধে যত তর্ক ও আলোচনা উঠেছে তার অধিকাংশই সাহিত্যবিচারের বাইরে পড়ে গেছে। এটা স্বাভাবিক, কারণ, এই গল্পের যে ভূমিকা, সেটা রাষ্ট্রচেষ্টা-আলোড়িত বর্তমান বাংলাদেশের আবেগের বর্ণে উজ্জ্বল করে রঞ্জিত। আমরা কেবল যে তার অত্যন্ত বেশি কাছে আছি তা নয় তার তাপ আমাদের মনে সর্বদাই বিকীরিত হচ্ছে। এইজন্যেই গল্পের চেয়ে গল্পের ভূমিকাটাই অনেক পাঠকের কাছে মুখ্যভাবে প্রতিভাত। এই অধুনাতন কালের চিত্ত-আন্দোলন দূর অতীতে সরে গিয়ে যখন ইতিহাসের উত্তাপবিহীন আলোচ্য বিষয়মাত্রে পরিণত হবে তখন পাঠকের কল্পনা গল্পটিকে অনাসক্তভাবে গ্রহণ করতে বাধা পাবে না এই আশা করি। অর্থাৎ তখন এর সাহিত্যরূপ স্পষ্ট হতে পারবে।

এই রচনা সম্বন্ধে লেখকের তরফ থেকে আমার যা বক্তব্য সেটা বলে রাখি। বইটা লেখবার সময় আমি কী লিখতে বসেছিলুম সেটা আমার জানা সুতরাং এই ব্যক্তিগত খবরটা আমিই দিতে পারি ; সেটা কী হয়ে উঠেছে সে কথা পাঠক ও সমালোচক আপন বুদ্ধি ও

রুচি-অনুসারে বিচার করবেন। সেই বুদ্ধির মাত্রাভেদ ও রুচির বৈচিত্র্য স্বাভাবিক, সুতরাং আলোচনা হতে থাকবে নানা ছাঁচের ও নানা মূল্যের, কালের উপর নির্ভর করে সে-সম্বন্ধে উদাসীন থাকাই লেখকের কর্তব্য।

যেটাকে এই বইয়ের একমাত্র আখ্যানবস্তু বলা যেতে পারে সেটা এলা ও অতীন্দ্রের ভালোবাসা। নরনারীর ভালোবাসার গতি ও প্রকৃতি কেবল যে নায়কনায়িকার চরিত্রের বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে তা নয়, চারি দিকের অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতের উপরেও। নদী আপন নির্ঝরপ্রকৃতিকে নিয়ে আসে আপন জন্মশিখর থেকে, কিন্তু সে আপন বিশেষরূপ নেয় তটভূমির প্রকৃতি থেকে। ভালোবাসারও সেই দশা, এক দিকে আছে তার আন্তরিক সংরাগ, আর-এক দিকে তার বাহিরের সংবাধ। এই দুইয়ে মিলে তার সমগ্র চিত্রের বৈশিষ্ট্য। এলা ও অতীনের ভালোবাসার সেই বৈশিষ্ট্য এই গল্পে মূর্তিমান করতে চেয়েছি। তাদের স্বভাবের মূলধনটাও দেখাতে হয়েছে, সেইসঙ্গেই দেখাতে হয়েছে যে-অবস্থার সঙ্গে তাদের শেষ পর্যন্ত কারবার করতে হল তারও বিবরণ।

বাইরের এই অবস্থা যেটা আমাদের রাষ্ট্রপ্রচেষ্টার নানা সংঘট্টনে তৈরি, সেটার অনেকখানি অগত্যা আমার নিজের দৃষ্টিতে দেখা, ও তার কিছু কিছু আভাস আমার নিজের অভিজ্ঞতাকে স্পর্শ করেছে। তার সংবেদন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন রকমের হওয়ারই কথা, তার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারও পার্থক্য আছে। কিন্তু গল্পটাকে যদি সাহিত্যের বিষয় বলে মানতে হয় তা হলে এ নিয়ে তর্ক অনাবশ্যক, গল্পের ভূমিকারূপে আমার ভূমিকাকেই স্বীকার করে নিতে হবে। খৃস্টানও যদি কুমারসম্ভব পড়তে চায় তা হলে কালিদাসের বর্ণিত হরপার্বতীর আখ্যানকেই তার সত্য বলে মানা চাই, তা নিয়ে ধর্মতত্ত্বঘটিত তর্ক চলবে না। এই পৌরাণিক আখ্যানে সাংখ্যতত্ত্ব বিশুদ্ধভাবে নিরূপিত হয়েছে কি না সে-প্রশ্ন উত্তর দেবার যোগ্যই নয়, আসল কথাটা এই যে, এই আখ্যানের ভূমিকায় হরপার্বতীর প্রেম ও মিলনটাই মুখ্যভাবে গোচর। এমন-কি, কুমারের জন্মবিবরণকেও কালিদাস উপেক্ষা করেছেন।

যদি কোনো পাঠক বলেন আমার গল্পের ভূমিকা কোনো কোনো অংশে বা অনেক অংশে আমার স্বকপোলকল্পিত তা হলে গল্প-লিখিয়ে হিসাবে সে অভিযোগ মেনে নিলেও ক্ষতি হবে না। ইন্দ্রনাথ দ্বারা চালিত প্রচেষ্টার কী পরিণাম হল, কী হল বটুর বা কানাইয়ের সে সংবাদটাকে কোনো স্থান দেওয়া হয় নি, উপসংহারে একমাত্র ব্যঞ্জনা অন্তু-এলার প্রেমের, এই উপসংহারের দ্বারা ঐ প্রেমের রূপটিকেই সম্পূর্ণতা দেওয়া হল।

গল্পের উপক্রমণিকায় উপাধ্যায়ের কথাটা কেন এল এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই জিজ্ঞাস্য। অতীনের চরিত্রে দুটি ট্র্যাজেডি ঘটেছে, এক সে এলাকে পেলে না, আর সে নিজের স্বভাব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। এই শেষোক্ত ব্যাপারটি স্বভাববিশেষে মনস্তত্ত্ব হিসাবে বাস্তব হতে পারে, তারই সাক্ষ্য উপস্থিত করার লোভ সংবরণ করতে পারি নি। ভয় ছিল পাছে কেউ ভাবে যে, এই সম্ভাবনাটি কবিজাতীয় বিশেষ মত বা মেজাজ দিয়ে গড়া। এর বাস্তবতা সম্বন্ধে অসন্দিগ্ধ হলে এর বেদনার তীব্রতা পাঠকের মনে প্রবল হতে পারে এই আশা করেছিলুম। তা হোক তবু গল্পের দিক থেকে এর কোনো মূল্য নেই সে কথা মানি। গল্পের সাক্ষ্য গল্পের মধ্যে থাকাই ভালো।

একজন মহিলা আমাকে চিঠিতে জানিয়েছেন যে তাঁর মতে ইন্দ্রনাথের চরিত্রে উপাধ্যায়ের জীবনের বহিরংশ প্রকাশ পেয়েছে আর অতীন্দ্রের চরিত্রে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর অন্তরতর প্রকৃতি। এ কথাটি প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নেই।

আর-একটা তর্ক আছে। গল্পের প্রসঙ্গে বিপ্লবচেষ্টাসংক্রান্ত মতামত পাত্রদের মুখে প্রকাশ পেয়েছে। কোনো মতই যদি কোথাও না থাকত তা হলে গল্পের ভূমিকাটা হত নিরর্থক। ধরে নিতে হবে যারা বলছে, তাদেরই চরিত্রের সমর্থনের জন্যে এই-সব মত। যদি কেউ

সন্দেহ করেন এ-সকল মতের কোনো-কোনোটা আমার মতের সঙ্গে মেলে তবে বলব "এহ বাহ্য"। এ কথাটা মিথ্যে হলেও গল্পের মধ্যে তার যে মূল্য, সত্য হলেও তাই। কোনো মতপ্রকাশের দ্বারা পাত্রদের চরিত্রের যদি ব্যত্যয় ঘটে থাকে তা হলেই সেটা হবে অপরাধ।

যদি কোনো অধ্যাপক কোনোদিন নিঃসংশয়ে প্রমাণ করতে পারেন যে হ্যামলেটের মুখের অনেক কথা এবং তার ভাবভঙ্গি কবির নিজের, সেটা সত্য হোক আর মিথ্যে হোক তাতে নাটকের নাট্যত্বের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। তাঁর নাটকে কোথাও তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব কোনো ইঙ্গিতে প্রকাশ পায় নি এমনতরো অবিশ্বাস্য কথাও যদি কেউ বলেন তবে তার দ্বারাও তাঁর নাটক সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না।

অবশেষে সংক্ষেপে আমার মন্তব্যটি জানাই :

চার অধ্যায়ের রচনায় কোনো বিশেষ মত বা উপদেশ আছে কি না সে তর্ক সাহিত্যবিচারে অনাবশ্যক। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এর মূল অবলম্বন কোনো আধুনিক বাঙালি নায়কনায়িকার প্রেমের ইতিহাস। সেই প্রেমের নাট্যরসাত্মক বিশেষত্ব ঘটিয়েছে বাংলাদেশের বিপ্লবপ্রচেষ্টার ভূমিকায়। এখানে সেই বিপ্লবের বর্ণনা-অংশ গৌণ মাত্র ; এই বিপ্লবের ঝোড়ো আবহাওয়ায় দুজনের প্রেমের মধ্যে যে তীব্রতা যে বেদনা এনেছে সেইটেতেই সাহিত্যের পরিচয়। তর্ক ও উপদেশের বিষয় সাময়িক পত্রের প্রবন্ধের উপকরণ।

৮ চৈত্র ১৩৪১

গল্পগুচ্ছ

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ড হইতে রবীন্দ্রনাথ-রচিত গল্প, সাময়িক পত্রে প্রকাশকালের অনুক্রম যতদূর জানা যায় তদনুসারে, মুদ্রণ আরম্ভ হইল।

বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত গল্পগুলির সাময়িক পত্রে প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া গেল :

ঘাটের কথা	ভারতী। কার্তিক ১২৯১
রাজপথের কথা	নবজীবন। অগ্রহায়ণ ১২৯১
মুকুট	বালক। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২

"ঘাটের কথা" ও "রাজপথের কথা" সর্বপ্রথম 'ছোট গল্প' (১৫ ফাল্গুন ১৩০০) পুস্তকে প্রকাশিত হয়। "মুকুট" 'ছুটির পড়া' পুস্তকে প্রকাশিত হয়। মুকুটের নাট্যরূপ রবীন্দ্র-রচনাবলী অষ্টম (সুলভ. চতুর্থ) খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্প বিভিন্ন সময়ে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহে সংকলিত হয় :

ছোট গল্প। ১৫ ফাল্গুন ১৩০০
বিচিত্র গল্প, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ। ১৩০১
কথা-চতুষ্টয়। ১৩০১
গল্প-দশক। ১৩০২
গল্পগুচ্ছ ১ম খণ্ড।[১১] ১৩০৭
গল্প (গল্পগুচ্ছ) ২য় খণ্ড। ১৩০৭
কর্মফল। ১৩১০

১১ ১৯০৮-৯ সালে ইন্ডিয়ান প্রেস ছোটো গল্পের সংগ্রহ গল্পগুচ্ছ পাঁচ ভাগে প্রকাশ করেন। ১৯২৬-২৭ সালে তিন ভাগে বিশ্বভারতী-সংস্করণ গল্পগুচ্ছ প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী।[১২] হিতবাদীর উপহার। ১৩১১
আটটি গল্প[১৩] [২০ নভেম্বর ১৯১১]
গল্প চারিটি [১৮ মার্চ ১৯১২]
গল্পসপ্তক [১৩২৩]
পয়লা নম্বর। ১৩২৭
তিনসঙ্গী। পৌষ ১৩৪৭

এই সংগ্রহের কোনোটিতেই রবীন্দ্রনাথের সমস্ত ছোটো গল্প সংগৃহীত হয় নাই। বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত [১৯২৬-২৭] তিন খণ্ডে সমাপ্ত গল্পগুচ্ছেই সর্বাপেক্ষা অধিক গল্প ছিল। ১৩৬৯ আশ্বিনে, গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ডে 'তিনসঙ্গী' এবং 'ভিখারিনী', 'করুণা', 'মুকুট'— এই তিনটি প্রাক্তন রচনা যেমন, তেমনি রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের সমুদয় ছোটো গল্প বা গল্পের খসড়া একত্র সংকলন করা হইয়াছে। সেইসঙ্গে কোনো কোনো গল্পের উৎস এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য গ্রন্থপরিচয়ে যুক্ত হইয়াছে।

১২৮৪ সালের শ্রাবণ-ভাদ্রের ভারতীতে প্রকাশিত "ভিখারিনী" গল্প সাময়িক পত্রে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটো গল্প বলিয়া অনুমিত। কোনো পুস্তকে এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন নাই; প্রচলিত রচনাবলী সপ্তবিংশ খণ্ডে (১৩৭২) গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ডের সমস্ত গল্পই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

উপরে যে-সকল গল্পসংগ্রহের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা ছাড়া, নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্ররূপের গল্প স্থান পাইয়াছে; এগুলি প্রচলিত রচনাবলী ষড়্‌বিংশ খণ্ডে 'উপন্যাস ও গল্প' বিভাগে প্রকাশিত হইয়াছে।—

লিপিকা। ১৯২২
সে। বৈশাখ ১৩৪৪
গল্পসল্প। বৈশাখ ১৩৪৮

স্বরচিত ছোটো গল্প সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে যে-সকল উল্লেখ ও মন্তব্য করিয়াছেন অতঃপর তাহা উদ্ধৃত হইল।—

১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

বর্ষার সমান সুরে অন্তর বাহির পুরে
সংগীতের মুষলধারায়,
পরানের বহুদূর কূলে কূলে ভরপুর,
বিদেশী কাব্যে সে কোথা হায়।
তখন সে পুঁথি ফেলি দুয়ারে আসন মেলি
বসি গিয়ে আপনার মনে,
কিছু করিবার নাই চেয়ে চেয়ে ভাবি তাই
দীর্ঘদিন কাটিবে কেমনে।
মাথাটি করিয়া নিচু বসে বসে রচি কিছু
বহুযত্নে সারাদিন ধরে—
ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে।

১২ এই গ্রন্থাবলীর 'সংসার চিত্র', 'সমাজ চিত্র', 'রঙ্গচিত্র' ও 'বিচিত্র চিত্র' বিভাগে ছোটো গল্পগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৩ বালকপাঠ্য গল্পের সঞ্চয়ন।

ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি,
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।
জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত,
অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল,
অজ্ঞাত জীবনগুলা, অখ্যাত কীর্তির ধুলা,
কত ভাব, কত ভয় ভুল—
সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝরঝর বরষার মতো—
ক্ষণ-অশ্রু ক্ষণ-হাসি পড়িতেছে রাশি রাশি
শব্দ তার শুনি অবিরত।
সেই সব হেলাফেলা, নিমেষের লীলাখেলা
চারি দিকে করি স্তূপাকার,
তাই দিয়ে করি সৃষ্টি একটি বিস্মৃতিবৃষ্টি
জীবনের শ্রাবণ-নিশার। —"বর্ষাযাপন", 'সোনার তরী'

সাজাদপুর ৩০ আষাঢ় ১৮৯৩

... আমি বাস্তবিক ভেবে পাই নে কোনটা আমার আসল কাজ। এক-একসময় মনে হয় আমি ছোটো ছোটো গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারি নে— লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়। মদগর্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাতছাড়া করতে চায় না, আমার কতকটা যেন সেই দশা হয়েছে। 'মিউজ'দের মধ্যে আমি কোনোটিকেই নিরাশ করতে চাই নে— কিন্তু তাতে কাজ অত্যন্ত বেড়ে যায়... —ছিন্নপত্র

শিলাইদা ২৭ জুন ১৮৯৪

কাল থেকে হঠাৎ আমার মাথায় একটা হ্যাপি থট এসেছে। আমি চিন্তা করে দেখলুম পৃথিবীর উপকার করব ইচ্ছা থাকলেও কৃতকার্য হওয়া যায় না; কিন্তু তার বদলে যেটা করতে পারি সেইটে করে ফেললে অনেক সময় আপনিই পৃথিবীর উপকার হয়, নিদেন যা হোক একটা কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। আজকাল মনে হচ্ছে, যদি আমি আর কিছুই না করে ছোটো ছোটো গল্প লিখতে বসি তা হলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য হতে পারলে হয়তো পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। গল্প লেখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধঘরের সংকীর্ণতা দূর করবে এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের 'পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকালবেলায় তাই গিরিবালা নাম্নী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি ছোটো অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে। সবেমাত্র পাঁচটি লাইন লিখেছি এবং সে পাঁচ লাইনে কেবল এই কথা বলেছি যে, কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ বর্ষণ-অন্তে চঞ্চল মেঘ এবং চঞ্চল রৌদ্রের পরস্পর শিকার চলছে, হেনকালে পূর্বসঞ্চিত বিন্দু বিন্দু বারিশীকরবর্ষী তরুতলে গ্রামপথে উক্ত গিরিবালার আসা উচিত ছিল, তা

না হয়ে আমার বোটে আমলাবর্গের সমাগম হল— তাতে করে সম্প্রতি গিরিবালাকে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে হল। তা হোক তবু সে মনের মধ্যে আছে।... আমি ভাবলুম এই তো আমি কোনো উপকরণ না নিয়ে কেবল গল্প লিখে— নিজেকে নিজে সুখী করতে পারি।...

—ছিন্নপত্র

বোলপুর ২৮ ভাদ্র ১৩১৭

... সাধনা পত্রিকায় অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভূরিপরিমাণে ছিল।

এই সময়েই বিষয়কর্মের ভার আমার প্রতি অর্পিত হওয়াতে সর্বদাই আমাকে জলপথে ও স্থলপথে পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিতে হইত— কতকটা সেই অভিজ্ঞতার উৎসাহে আমাকে ছোটো গল্প রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল।

সাধনা বাহির হইবার পূর্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়।... সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোটো গল্প সমালোচনা ও সাহিত্যপ্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোটো গল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই। ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।

সাধনা চারি বৎসর চলিয়াছিল। বন্ধ হওয়ার কিছুদিন পরে এক বৎসর ভারতীর সম্পাদক ছিলাম, এই উপলক্ষেও গল্প ও অন্যান্য প্রবন্ধ কতকগুলি লিখিতে হয়।...

—পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত পত্র[১৪]

[চৈত্র ১৩৪৭]

... আমার রচনায় যাঁরা মধ্যবিত্ততার সন্ধান করে পান নি বলে নালিশ করেন তাঁদের কাছে আমার একটা কৈফিয়ত দেবার সময় এল।... একসময়ে মাসের পর মাস আমি পল্লীজীবনের গল্প রচনা করে এসেছি। আমার বিশ্বাস এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লীজীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয় নি। তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকের অভাব ছিল না। তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতাপসিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন। আমার আশঙ্কা হয় একসময় গল্পগুচ্ছ বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অসাহিত্য বলে অস্পৃশ্য হবে। এখনই যখন আমার লেখার শ্রেণীনির্ণয় করা হয় তখন এই লেখাগুলির উল্লেখমাত্র হয় না, যেন ওগুলির অস্তিত্বই নেই। জাতে ঠেলাঠেলি আমাদের রক্তের মধ্যে আছে তাই ভয় হয় এই আগাছাটাকে উপড়ে ফেলা শক্ত হবে।...

—শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্তকে লিখিত পত্র[১৫]

[মে ১৯৪১]

...অসংখ্য ছোটো ছোটো লিরিক লিখেছি— বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোনো কবি এত লেখেন নি— কিন্তু আমার অবাক লাগে তোমরা যখন বল যে আমার গল্পগুচ্ছ গীতধর্মী। একসময়ে ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে নদীতে, দেখেছি বাংলার পল্লীর বিচিত্র জীবনযাত্রা। একটি মেয়ে নৌকো করে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল, তার বন্ধুরা ঘাটে নাইতে-নাইতে বলাবলি করতে লাগল, আহা, যে পাগলাটে মেয়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ওর কি না জানি দশা হবে। কিংবা ধরো একটা খ্যাপাটে ছেলে সারা গ্রাম দুষ্টুমির চোটে মাতিয়ে বেড়ায়, তাকে হঠাৎ একদিন চলে যেতে হল শহরে তার মামার কাছে। এইটুকু চোখে দেখেছি, বাকিটা নিয়েছি কল্পনা করে। একে কি তোমরা গানজাতীয় পদার্থ বলবে ? আমি বলব আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটে নি।

১৪ দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথ, 'আত্মপরিচয়', পরিশিষ্ট

১৫ "সাহিত্যবিচার", 'কবিতা' আষাঢ় ১৩৪৮। দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যের স্বরূপ'

যা-কিছু লিখেছি নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। গল্পে যা লিখেছি তার মূলে আছে আমার অভিজ্ঞতা, আমার নিজের দেখা। তাকে গীতধর্মী বললে ভুল করবে। 'কঙ্কাল' কি 'ক্ষুধিত পাষাণ'কে হয়তো খানিকটা বলতে পার, কারণ সেখানে কল্পনার প্রাধান্য, কিন্তু তাও পুরোপুরি নয়। তোমরা আমার ভাষার কথা বল, বল যে গদ্যেও আমি কবি। আমার ভাষা যদি কখনো আমার গল্পাংশকে অতিক্রম করে স্বতন্ত্র মূল্য পায়, সেজন্য আমাকে দোষ দিতে পার না। এর কারণ, বাংলা গদ্য আমার নিজেকেই গড়তে হয়েছে। ভাষা ছিল না, পর্বে পর্বে স্তরে স্তরে তৈরি করতে হয়েছে আমাকে। আমার প্রথম দিককার গদ্যে, যেমন "কাব্যের উপেক্ষিতা", "কেকাধ্বনি", এ-সব প্রবন্ধে, পদ্যের ঝোঁক খুব বেশি ছিল, ও-সব যেন অনেকটা গদ্য-পদ্য গোছের। গদ্যের ভাষা গড়তে হয়েছে আমার গল্পপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে। মোপাসাঁর মতো যে-সব বিদেশী লেখকের কথা তোমরা প্রায়ই বল, তাঁরা তৈরি ভাষা পেয়েছিলেন। লিখতে লিখতে ভাষা গড়তে হলে তাঁদের কী দশা হত জানি নে।

ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে আমি যে ছোটো ছোটো গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালি সমাজের বাস্তবজীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে। বঙ্কিম যে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' লিখেছিলেন, সে-সব কি সত্যি ছিল ? সে-সব romantic situation কি তখন ঘটতে পারত ? সত্যি হচ্ছে এই যে, তিনি পড়েছিলেন ইংরেজি রোমান্স, পড়ে ভালো লেগেছিল। তৃপ্তির একটা ক্ষেত্র তো চাই। বঙ্কিম পেয়েছিলেন সে ক্ষেত্র, আমাদের দিয়েছিলেন। আমি তাই বলি, বঙ্কিমের রচনায় আমরা যা পাই তা সামন্ততন্ত্র নয়। তাকে নতুন একটা পিপাসা বলতে পার, যা মেটাবার রস তিনি যেখান থেকে হোক সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর বইগুলোতে যে-সব কাণ্ডকারখানা আছে, সেগুলো তাঁর স্মৃতির মধ্যেও ছিল না। আর মজা এই, আমাদের তা ভালোও লেগেছে, কারণ এ স্বাদ আমরা আগে কখনো পাই নি। নিন্দে করতে পারব না বঙ্কিমকে, নিশ্চয়ই বলব তিনি ও-রসের জোগান দিয়েছিলেন বলেই বেঁচে গিয়েছিলুম। কী dull সমাজ ছিল তখন। তারই মধ্যে বিদেশ থেকে আমদানি এ-সব রাজার লড়াই ইত্যাদি আমাদের গরিবের মনে একটা উন্মাদনা এনে দিয়েছিল। বিদেশ থেকে আমদানি ব'লে একে আমি ছোটো করছি না। এতে সন্দেহ নেই যে ইংরেজ ওদের যে-সাহিত্য আমাদের দেশে আনলে, তা আমাদের চিত্তবৃত্তিতে বিপ্লব ঘটিয়েছে। তবে এও সত্য যে বাংলাদেশে ক্ষেত্রও প্রস্তুত ছিল— আমাদের মনটাই সাহিত্যিক। য়ুরোপীয় কালচার ঠিক জায়গা পেয়েছিল আমাদের মধ্যে। সোনার ফসল ফলল ইংরেজ আসার দরুন নয়, আমরা ওদের সাহিত্য পেয়েছিলুম ব'লে। ইংরেজ না হয়ে ফরাসি যদি হত আজ আমরা সব মোপাসাঁ হয়ে উঠতুম। আমরা ব্যাকুল হয়ে ছিলুম, তাই পাওয়ামাত্র আগ্রহভরে নিয়েছি।

বঙ্কিমের গল্প এখন হয়তো তোমাদের কাছে আজগুবি ঠেকে, কিন্তু আমরা তাতে যে নতুন রস পেয়েছিলুম, তা ভুলতে পারি নে। এখন তোমরা বল তোমাদের সমাজেই সব আছে, গল্পের সব উপাদানই পাও তা থেকে। কিন্তু এখনকার সুখ দুঃখ ভালোবাসা কি তখন ছিল না ? তখনো ছিল, চোখে পড়ে নি। আবরণ রচনা করেছিল বিদেশী রোমান্স।...

—বুদ্ধদেব বসুর সহিত আলোচনার অনুলিপি[১৬]

[২৪ মে ১৯৪১]

... আমি একদা যখন বাংলাদেশের নদী বেয়ে তার প্রাণের লীলা অনুভব করেছিলুম তখন আমার অন্তরাত্মা আপন আনন্দে সেই সকল সুখদুঃখের বিচিত্র আভাস অন্তঃকরণের মধ্যে সংগ্রহ

১৬ দ্রষ্টব্য : "সাহিত্য, গান, ছবি", প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৮

করে মাসের পর মাস বাংলার যে পল্লীচিত্র রচনা করেছিল তার পূর্বে আর কেউ করে নি। কারণ সৃষ্টিকর্তা তাঁর রচনাশালায় একলা কাজ করেন। সে বিশ্বকর্মারই মতন আপনাকে দিয়ে রচনা করে। সেদিন কবি যে পল্লীচিত্র দেখেছিল নিঃসন্দেহ তাঁর মধ্যে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের আঘাত-প্রতিঘাত ছিল। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে মানবজীবনের সেই সুখদুঃখের ইতিহাস, যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম ক'রে বরাবর চলে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে পল্লীপার্বণে আপন প্রাত্যহিক সুখদুঃখ নিয়ে। কখনো বা মোগল রাজত্বে কখনো বা ইংরেজ রাজত্বে তার অতিসরল মানবত্ব প্রকাশ নিত্য চলেছে, সেইটেই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল গল্পগুচ্ছে, কোনো সামন্ততন্ত্র নয় কোনো রাষ্ট্রতন্ত্র নয়।...

—বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত পত্র[১৭]

উত্তরায়ণ, ৯ জুন ১৯৪১

আমার বয়স তখন অল্প ছিল। বাংলাদেশের পল্লীতে ঘাটে ঘাটে ভ্রমণ করে ফিরেছি। সেই আনন্দের পূর্ণতায় গল্পগুলি লেখা। চিরদিন এই গল্পগুলি আমার অত্যন্ত প্রিয় অথচ আমাদের দেশ গল্পগুলিকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করে নেয় নি, এই দুঃখ আমার মনে ছিল। এবার তোমাদের 'পরিচয়ে'[১৮] এতদিন পরে আমি যথোচিত পুরস্কার পেয়েছি। তার মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই, পুরোপুরি সম্ভোগের কথা। এই কৃতজ্ঞতা তোমাকে না জানিয়ে পারলুম না।

—হিরণকুমার সান্যালকে লিখিত পত্র

ধর্ম

ধর্ম গদ্যগ্রন্থাবলীর ষোড়শ ভাগরূপে ১৩১৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি অধিকাংশই শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষ, নববর্ষ, বা পৌষোৎসবে, বা/এবং আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক অনুষ্ঠিত মাঘোৎসবে কথিত বা পঠিত; 'ধর্মপ্রচার' ১৩১০ সালের '১২ই মাঘ আলোচনা-সমিতির বিশেষ অধিবেশনে সিটি কলেজ হলে পঠিত' এবং 'ততঃ কিম্‌' 'ওভারটুন হলে আহূত আলোচনা-সমিতির বিশেষ অধিবেশনে' পঠিত হয়। প্রবন্ধগুলির সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশের সূচী নিম্নে মুদ্রিত হইল—

উৎসব	বঙ্গদর্শন। মাঘ ১৩১২
দিন ও রাত্রি	বঙ্গদর্শন। মাঘ ১৩১০
মনুষ্যত্ব	বঙ্গদর্শন। ফাল্গুন ১৩১০
ধর্মের সরল আদর্শ	বঙ্গদর্শন। মাঘ ১৩০৯
প্রাচীন ভারতের একঃ	বঙ্গদর্শন। ফাল্গুন ১৩০৮
প্রার্থনা	বঙ্গদর্শন। আষাঢ় ১৩১১
ধর্মপ্রচার	বঙ্গদর্শন। ফাল্গুন ১৩১০
বর্ষশেষ[১৯]	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯[২১]
নববর্ষ[২০]	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯[২১]

১৭ "সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা"; 'কবিতা', আশ্বিন ১৩৪৮। দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যের স্বরূপ'
১৮ দ্রষ্টব্য: পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮, শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, "গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ":
১৯ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় শিরোনাম: শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষ।
২০ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় শিরোনাম: শান্তিনিকেতনে নববর্ষ।
২১ ১৮২৪ শক।

উৎসবের দিন	বঙ্গদর্শন। মাঘ ১৩১১
দুঃখ	বঙ্গদর্শন। ফাল্গুন ১৩১৪
শান্তং শিবমদ্বৈতম্‌	বঙ্গদর্শন। পৌষ ১৩১৩
ততঃ কিম্‌	বঙ্গদর্শন। অগ্রহায়ণ ১৩১৩
আনন্দরূপ	বঙ্গদর্শন। মাঘ ১৩১৩

শান্তিনিকেতন

'শান্তিনিকেতন' সতেরো খণ্ড ১৯০৯-১৬ সালে প্রকাশিত হয়। ১৩১৫ অগ্রহায়ণ হইতে ১৩২১ পৌষ পর্যন্ত শান্তিনিকেতন মন্দিরে ও অন্যত্র বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই এই সতেরো খণ্ডে সংগৃহীত হইয়াছিল। রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে ইহার প্রথম দশ খণ্ড মুদ্রিত হইল। পরবর্তী সাত খণ্ড (১১-১৭) সুলভ সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলীর অষ্টম খণ্ডে মুদ্রিত হইবে।

এই উপদেশাবলীর অনেকগুলি মৌখিক ভাষণ, পরে বক্তা-কর্তৃক নূতন করিয়া লিখিত; কতকগুলি মূলতই লিখিত ভাষণ।

১৩৪১-৪২ সালে পূর্বপ্রচারিত 'শান্তিনিকেতন' সতেরো খণ্ড, অন্যান্য কয়েকটি উপদেশ-সহ, দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে বহু অংশ বর্জিত হয় এবং নানাস্থানে পাঠপরিবর্তন হয়।

রবীন্দ্র-রচনাবলীতে 'শান্তিনিকেতন' প্রথম সংস্করণ অনুসারে মুদ্রিত হইল।

সতেরো খণ্ড 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের প্রথম তিন-খণ্ডের সবগুলি এবং বাকি খণ্ডগুলির অনেকগুলির পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত। তাহার সাহায্যে বর্তমান রবীন্দ্র-রচনালীর পাঠে কতকগুলি স্থূল পাঠ বা মুদ্রণ-প্রমাদের সংশোধন করা হইয়াছে। স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশিত[২২] শান্তিনিকেতন গ্রন্থে উল্লিখিত প্রসঙ্গে বিশদ তথ্য জানা যাইবে।

শ্রাবণ ১৩৯১ বঙ্গাব্দে (শক ১৯০৬) প্রকাশিত শান্তিনিকেতনে প্রথম খণ্ডের নূতন সংস্করণে রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি, সাময়িক পত্র এবং পূর্বমুদ্রিত বিভিন্ন সংস্করণের পাঠ মিলাইয়া আদ্যন্ত গ্রন্থের পাঠ-প্রমাদ বা মুদ্রণ-প্রমাদ সংশোধিত হইয়াছে। যন্ত্রস্থ দ্বিতীয় খণ্ডেও অনুরূপভাবে পাঠ সংশোধিত হইয়াছে।

২২ প্রথম-প্রচারিত ১৭ খণ্ড 'শান্তিনিকেতন'-এর একত্র সংকলন, পরিশিষ্ট এবং বিস্তারিত গ্রন্থপরিচয়-সহ: প্রথম খণ্ড, শ্রাবণ ১৩৯১; দ্বিতীয় খণ্ড, অগ্রহায়ণ ১৩৮২।

বর্ণানুক্রমিক সূচী